Cu-Ho4711-7-P0 35,986
Acc. No. ......
Book No. ......
LIBRARY

# বিচিত্রা

| অষ্টম বর্ষ, ১ম খণ্ড | শ্রাবণ, ১৩৪১ | ১ম সংখ্যা |
| --- | --- | --- |

P 35,986

## প্রত্যর্পণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(7)

কবির রচনা তব মন্দিরে
জ্বালে ছন্দের ধূপ।
সে মায়া-বাষ্পে আকার লভিল
তোমার ভাবের রূপ।
লভিলে হে নারী তনুর অতীত তনু,
পরশ-এড়ানো সে যেন ইন্দ্রধনু,
নানা রশ্মিতে রাঙা ;
পেলে রসধারা অমর বাণীর
অমৃত পাত্র-ভাঙা ॥

কামনা তোমায় ব'হে নিয়ে যায়
কামনার পরপারে।
সুদূরে তোমার আসন রচিয়া
ফাঁকি দেয় আপনারে।
ধ্যান প্রতিমারে স্বপ্নরেখায় আঁকে,
অপরূপ অবগুণ্ঠনে তারে ঢাকে,
অজানা করিয়া তোলে।
আবরণ তার ঘুচাতে না চায়
স্বপ্ন ভাঙিবে ব'লে ॥

ঐ যে মূরতি হয়েছে ভূষিত
মুগ্ধ মনের দানে,
অনেক প্রাণের নিঃশ্বাসতাপে
ভ'রে যে উঠিল প্রাণে,
এর মাঝে এল কিসের শক্তি সে যে,
দাঁড়াল সমুখে হোম-হুতাশন-তেজে,
পেল সে পরশমণি।
নয়নে তাহার জাগিল কেমনে
জাদু মন্ত্রের ধ্বনি॥

যে দান পেয়েছ তার বেশি দান
ফিরে দিলে সে কবিরে,
গোপনে জাগালে সুরের বেদনা
বাজে বীণা যে গভীরে।
প্রিয় হাত হতে পরো পুষ্পের হার,
দয়িতের গলে করো তুমি আরবার
দানের মাল্যদান।
নিজেরে সঁপিলে প্রিয়ের মূল্যে
করিয়া মূল্যবান॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# বিপ্রদাস

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[ ২১ ]

অনেকদিনের পরে বিপ্রদাস নীচেব আফিস ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। সম্মুখে টেবিলেব পরে কাগজ-পত্রের স্তূপ—কতদিনের কত কাজ বাকি। দেহ ক্লান্ত কিন্তু দ্বিজুর ভবসায় ফেলিয়া রাখাও আব চলে না। একটা খেরো-বাঁধানো মোটা খাতা টানিয়া লইয়া সে পাতা উল্টাইতেছিল, বাহিরে মোটরের বাঁশী কানে গেল এবং অনতিবিলম্বে পুবের খোলা দরজা দিয়া বন্দনা প্রবেশ করিল। আজ একা নয়, সঙ্গে একটি অপরিচিত যুবক। পরণে ধুতি-পাঞ্জাবি, পায়ে ফুলকাটা কটকি চটি এবং কাঁধ হইতে তির্য্যক্ ভঙ্গীতে জড়ানো মোটা শাদা চাদর। বয়স ত্রিশের নীচে, দেহেব গঠন আর একটু দীর্ঘচ্ছন্দেব হইলে অনায়াসে সুপুরুষ বলা চলিত। বিপ্রদাস অভ্যর্থনা করিতে চেয়াব ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বন্দনা কহিল, মুখুযে মশাই, ইনিই মিষ্টার চাউড্রি—বার এ্যাট-ল। কিন্তু এখানে অশোকবাবু বলে ডাকলেও অফেন্স নিতে পারবেন না এই সর্ত্তে আলাপ করিয়ে দিতে রাজি হয়ে সঙ্গে এনেচি। আলাপ হবে কিন্তু, তার আগে আপন কর্ত্তব্যটা সেরে নিই,—এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, পায়ের ধুলোটা কিন্তু এঁর সুমুখে নিতে পারলুম না পাছে মনে ক'রে বসেন ওঁদের সমাজের আমি কলঙ্ক। কিন্তু তাই বলে যেন অভিমান ভরে আপনিও ভেবে নেবেন না নতুন কায়দাটা আমার মাসির কাছে শেখা। তাঁর পরে আপনাব প্রসন্নতার বহরটা আমার পরিমাপ করা কিনা।

বিপ্রদাস কহিল, তোমার মাসিমাব কাছে এই ভাবেই আমার গুণগান করো নাকি? নবাগত যুবকটিব প্রতি ফিবিয়া চাহিয়া বলিল, বন্দনার মুখে আপনার কথা এত বেশি শুনেচি যে অসুস্থ না থাকলে আমি নিজেই যেতুম আলাপ করতে। দেখেই মনে হলো চেহারাটা পর্য্যন্ত চেনা যেন কতবার দেখেচি। ভালোই হলো অযথা বিলম্ব না করে উনি নিজেই সঙ্গে ক'রে আনলেন।

ভদ্রলোক প্রত্যুত্তরে কি-একটা বলিতে চাহিল কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই বন্দনা শাসনেব ভঙ্গীতে তর্জ্জনী তুলিয়া কহিল, মুখুয্যে মশাই, অত্যুক্তি অতিশয়োক্তিকে ছাড়িয়ে প্রায় মিথ্যের কোঠায় এলো,—এবার থামুন নইলে হাঙ্গামা করবো।

—ইহার অর্থ?

—ইহার অর্থ এই হয় যে আমাদের অতি-সাধারণদের মতো সত্যি-মিথ্যে যা' খুশি বানিয়ে বলা আপনারও চলে। আপনি মোটেই অসাধারণ ব্যক্তি নয়,—ঠিক আমাদের মতোই সাধারণ মনুষ্য।

বিপ্রদাস কহিল, না। সকলকে জিজ্ঞেসা করো তারা একবাক্যে সাক্ষ্য দেবে তোমাব অনুমান অশ্রদ্ধেয়, অগ্রাহ্য!

বন্দনা বলিল, এবার তাদের কাছেই আপনাকে নিয়ে গিয়ে বাইরের ঐ সিংহ-চর্ম্মটি দু' হাতে ছিঁড়ে ফেলে দেবো। তখন আসল মূর্ত্তিটি তারা দেখতে পাবে,—তাদের ভয় ভাঙবে। আমাকে আশীর্ব্বাদ করে বলবে তুমি রাজ-রাণী হও।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, আশীর্ব্বাদে আপত্তি নেই, এমন-কি নিজে করতেও প্রস্তুত, কিন্তু আশীর্ব্বাদ ত তোমরা চাও না, বলো কু-সংস্কার, বলো ও-শুধু কথার কথা!

বন্দনা পুনরায় আঙুল তুলিয়া বলিল, ফের খোঁচা দেবার চেষ্টা? কে বলেছে গুরুজনের আশীর্ব্বাদ আমরা চাইনে,—কে বলেছে কু-সংস্কার? এবাব কিন্তু সত্যিই রাগ হচ্চে মুখুয্যে মশাই।

বিপ্রদাস গম্ভীর হইয়া বলিল, সত্যিই রাগ হচ্চে নাকি? তবে থাক এ-সব গোলমেলে কথা। কিন্তু হঠাৎ সকালবেলাতেই আবির্ভাব কেন? কোন কাজ আছে না কি?

বন্দনা কহিল, অনেক। প্রথম আপনার কৈফিয়ৎ নেওয়া। কেন আমার বিনা হুকুমে নীচে নেমে কাজ সুরু করেছেন?

—করিনি করার সংকল্প করেছিলুম মাত্র। এই রইলো—বলিয়া সেই মোটা খাতাটা বিপ্রদাস দূরে ঠেলিয়া দিল।

বন্দনা প্রসন্ন মুখে কহিল, কৈফিয়ৎ satisfactory: অবাধ্যতা মার্জ্জনা করা গেল। ভবিষ্যতে এমনি অনুগত থাকলেই আমার কাজ চলে যাবে। এবার শুনুন মন দিয়ে। ততক্ষণ এর সঙ্গে বসে গল্প করুন—মুখুয্যেদের ঐশ্বর্য্যের বিবরণ, প্রজা শাসনের বহু রোমাঞ্চকর কাহিনী—যা খুশী। আমি ওপরে যাচ্চি অনুদিকে নিয়ে সমস্ত গুছিয়ে নিতে। কাল সকালের ট্রেণে আমরা বলরামপুর যাত্রা করবো, দিনে দিনে যাবো ঠাণ্ডা লাগার ভয় থাকবে না। মিষ্টার চাউড্রির ইচ্ছে সঙ্গে যান,—বড় ঘরের বড় রকমের যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া-কলাপ দীয়তাং ভুজ্যতাং ঘটা-পটা কখনো চোখে দেখেন নি,—আর কোথা থেকেই বা দেখবেন—

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, তুমি নিজে নিশ্চয়ই অনেক দেখেচো—

বন্দনা কহিল, এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর ও ভদ্ররুচি বিগর্হিত। উনি দেখেননি এই কথাই হচ্ছিলো। তা শুনুন। ওঁকে অনুমতি দিয়েছি সঙ্গে যাবার তাতে এত খুশি হয়েছেন যে তারপরে আমাকে সঙ্গে করে বোম্বাই পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে সম্মত হয়েছেন।

বিপ্রদাস মুখ অতিশয় গম্ভীর করিয়া কহিল, বলো কি? এতখানি ত্যাগ স্বীকার আমাদের সমাজে মেলে না এ শুধু তোমাদেব মধ্যেই পাওয়া যায়। শুনে বিস্ময় লাগচে।

বন্দনা বলিল, লাগবার কথাই যে। জপ-তপও আছে, ষোল আনা হিংসেও আছে। এই বলিয়া সে চোখের দৃষ্টিতে এক ঝলক বিদ্যুৎ ছড়াইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল বিপ্রদাস তাহাকে ডাকিয়া কহিল, এ

যেন কথামালার সেই কুকুরের ভূষি আগলানোর গল্প। খাবেও না আব ষাঁড়ের দল এসে যে মনের সাধে চিবোবে তাও দেবে না। মানুষ বাঁচে কি কোরে বলোত ?

বন্দনা দ্বাব প্রান্তে থমকিয়া দাঁড়াইয়া কৃত্রিম রোষে ভ্রূকুঞ্চিত করিল, বলিল, ঠিক আমাদের মতোই সাধাবণ মানুষ,—কিচ্ছু তফাৎ নেই। লোকগুলো কেবল মিথ্যে ভয় কবে মরে।

—তুমি গিয়ে এবার তাদের ভয় ভেঙ্গে দিয়ে এসো।

—তাই তো যাচ্চি। এবং ভুষির সঙ্গে একজনের উপমা দেবার দুর্বুদ্ধিরও শোধ নিয়ে আসবো—এই বলিয়া বন্দনা দীপ্ত কটাক্ষে পুনরায় তড়িৎ বৃষ্টি করিয়া দ্রুত পদে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিপ্রদাস কহিল, মিষ্টার—

অশোক সবিনয়ে বাধা দিল,—না না, চলবে না। ওটাকে বাদ দিতে বাধবে না বলেই ধুতি-চাদর এবং চটি জুতো পরে এসেচি বিপ্রদাস বাবু। উনিও ভবসা দিয়েছিলেন যে—

বিপ্রদাস মনে মনে খুশি হইয়া বলিল, ভালোই হলো অশোক বাবু সম্বোধনটা সহজ দাঁড়ালো। পাড়া-গাঁয়েব মানুষ মনেও থাকে না অভ্যাসও নেই, এবার স্বচ্ছন্দে আলাপ জমাতে পারবো। শুনলুম আমাদের পল্লীগ্রামের বাড়ীতে যেতে চেয়েছেন, সত্যিই যদি যান ত কৃতার্থ হবো। আমাদের সংসারের কর্ত্রী আমার মা, তাঁর পক্ষ থেকে আপনাকে আমি সসম্মানে আমন্ত্রণ করচি।

বিপ্রদাসের বিনয় বচনে অশোক পুলকিত চিত্তে বলিল, নিশ্চয় যাবো,—নিশ্চয় যাবো। কত দরিদ্র অনাথ আতুর আসবে নিমন্ত্রণ রাখতে, কত অধ্যাপক পণ্ডিত উপস্থিত হবেন বিদায় গ্রহণ করতে—আনন্দোৎসবে কত খাওয়া-দাওয়া, কত আসা-যাওয়া, কত বিচিত্র আয়োজন—

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, সমস্ত বাড়ানো কথা অশোকবাবু, বন্দনা শুধু বহস্য কবেছে।

—রহস্য করে তার লাভ কি বিপ্রদাস বাবু ?

—একটা লাভ আমাদেব অপ্রতিভ করা। বলরামপুরের মুখুয্যেদের ওপর সে মনে মনে চটা। দ্বিতীয় লাভ আপনাকে সে কোন ছলে বোম্বায়ে টেনে নিয়ে যেতে চায়।

অশোক বলিল, প্রয়োজন হলে বোম্বাই পর্য্যন্ত আমাকে সঙ্গে যেতে হবে এ কথা আছে, কিন্তু মুখুয্যেদেব পরে সে চটা, আপনাদের সে লজ্জিত করতে চায় এমন হতেই পারে না বিপ্রদাস বাবু। কালও বলরামপুরে যাবার স্থির ছিলনা কিন্তু আপনাদের কথা নিয়েই ওর মাসিব সঙ্গে হয়ে গেল ঝগড়া। মাসি বললেন বিপ্রদাসেব মা সর্ব্ব-সাধারণের হিতার্থে যদি জলাশয় খনন করিয়ে থাকেন ত তার প্রশংসা কবি, কিন্তু ঘটা করে প্রতিষ্ঠা করার কোন অর্থ নেই,—ওটা কুসংস্কার। কুসংস্কারে যোগ দেওয়া আমি অন্যায় মনে করি। বন্দনা বললেন ওঁরা বড় লোক, বড়লোকের কাজে-কর্ম্মে ঘটা তা হয়েই থাকে মাসিমা। তাতে আশ্চর্য্যেব কি আছে ? আমার পিসিমা বললেন বড়লোকের অপব্যয়ে আশ্চর্য্যের কিছু নেই আমি জানি, কিন্তু ও-তো কেবল ও-ই নয় ও-টা কুসংস্কার। তোমাব যাওয়াতেই আমার আপত্তি। বন্দনা

বললেন, আমি কিন্তু কুসংস্কার মনে করিনে মাসিমা। বরঞ্চ, এই মনে করি যে, যা' জানিনে, জানার কখনো চেষ্টা করিনি তাকে সরাসরি বিচার করতে যাওয়াই কুসংস্কার। ওর জবাব শুনে পিসিমা রাগে জ্বলে গেলেন, জিজ্ঞেসা করলেন তোমার বাবার অনুমতি নিয়েছো?

বন্দনা উত্তর দিলেন, বাবা বারণ করবেন না আমি জানি। দিদির স্বামী অসুস্থ, তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবার ভার পড়েছে আমার ওপর।

"ভার দিলে কে শুনি? তিনি নিজেই বোধ হয়!" প্রশ্ন শুনে বন্দনা যেন অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন; আমার মনে হলো তাঁর মাথায় দ্রুত রক্ত চড়ে যাচ্ছে, এবার হঠাৎ কি-একটা বলে ফেলবেন, কিন্তু, সে-সব কিছুই করলেন না শুধু আস্তে আস্তে বললেন, যে যা খুশি জিজ্ঞেসা করলেই যে আমাকে জবাব দিতে হবে ছেলেবেলা থেকে এ-শিক্ষা আমার হয় নি মাসিমা। পরশু সকালে মুখুয্যে মশাইকে নিয়ে আমি বলরামপুরে যাবো এর বেশি তোমাকে বলতে পারবো না।

পিসিমা রাগ করে উঠে গেলেন, আমি বললুম, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন? আমার ভারি ইচ্ছে করে ঐ-সব আচার অনুষ্ঠান চোখে দেখি। বন্দনা বললেন কিন্তু সে-সব যে কুসংস্কার অশোকবাবু! চোখে দেখলেও যে আপনাদের জাত যায়। বললুম, যদি আপনার না যায় ত আমারও যাবে না। আর যদি যায় ত দুজনের এক সঙ্গেই জাত যাক আমার কোন ক্ষতি নেই।

বন্দনা বললেন, আপনি ত বিশ্বাস করেন না, সে-সব চোখে দেখলে যে মনে মনে হাসবেন।

বললুম, আপনিই কি বিশ্বাস করেন নাকি? তিনি বললেন, না করিনে, কিন্তু মুখুয্যে মশাই করেন। আমি কেবল আশা করি তাঁর বিশ্বাসই যেন এক দিন আমারও সত্যি বিশ্বাস হয়ে ওঠে। বিপ্রদাস বাবু, আপনাকে বন্দনা মনে মনে পুজো করে, এত ভক্তি সে জগতে কাউকে করে না।

খবরটা অজানা নয়, নূতনও নয়, তথাপি অপরের মুখে শুনিয়া তাহার নিজের মুখ একেবারে ফাকাশে হইয়া গেল।

ক্ষণেক পরে প্রশ্ন করিল, আপনাদের যে বিবাহের প্রস্তাব হয়েছিল সে কি স্থির হয়ে গেছে? বন্দনা কি সম্মতি দিয়েছেন?

—না। কিন্তু অসম্মতিও জানাননি।

—এটা আশার কথা অশোক বাবু। চুপ করে থাকাটা অনেক ক্ষেত্রেই সম্মতির চিহ্ন।

অশোক সকৃতজ্ঞ চক্ষে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, না-ও হতে পারে বিপ্রদাসবাবু, অন্ততঃ নিজে আমি এখনো তাই মনে করি। একটু থামিয়া কহিল, মুস্কিল হয়েছে এই যে আমি গরিব কিন্তু বন্দনা ধনবতী। ধনে আমার লোভ নেই তা নয়, কিন্তু পিসিমার মতো ঐটেই আমার একমাত্র লক্ষ্য নয়। এ কথা বোঝাবো কি ক'রে যে পিসিমার সঙ্গে আমি চক্রান্ত করিনি।

এই লোকটির প্রতি মনে মনে বিপ্রদাসের একটা অবহেলার ভাব ছিল, তাহার বাক্যের সরলতায় সেই ভাবটা একটু কমিল। সদয় কণ্ঠে কহিল, পিসির ষড়যন্ত্রে আপনি যে যোগ দেননি সত্যি হলে একথা বন্দনা একদিন বুঝবেই, তখন প্রসন্ন হতেও তার বিলম্ব হবে না, ধনের পরিমাণ নিয়েও তখন বাধা ঘটবে না।

অশোক উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এ-কি আপনি নিশ্চয় জানেন বিপ্রদাস বাবু?

ইহার জবাব দিতে গিয়া বিপ্রদাস দ্বিধায় পড়িল, একটু ভাবিয়া বলিল, ওর যতটুকু জানি তাইতো মনে হয় অশোকবাবু।

অশোক কহিল, আমার কি মনে হয় জানেন? মনে হয়, ওঁর নিজের প্রসন্নতার চেয়েও আমার ঢের বেশি প্রয়োজন আপনার প্রসন্নতায়। সে যেদিন পাবো আমার না-পাবার কিছু থাকবে না।

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, আমার প্রসন্ন দৃষ্টি দিয়ে ও স্বামী নির্ব্বাচন করবে এমন অদ্ভুত ইঙ্গিত আপনাকে দিলে কে—বন্দনা নিজে? যদি দিয়ে থাকে ত নিছক পরিহাস করেছে এই কথাই কেবল বলতে পারি অশোক বাবু।

—না পরিহাস নয়, এ সত্য।

—কে বল্লে?

অশোক এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া কহিল, এ-সব মুখ দিয়ে বলার বস্তু নয় বিপ্রদাসবাবু। সেদিন মাসিমার সঙ্গে ঝগড়া করে বন্দনা আমার ঘরে এসে ঢুকলেন—এমন কখনো করেন না—একটা চৌকি টেনে নিয়ে বসে বললেন, আমাকে বোম্বায়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে অশোকবাবু। বললুম, যখনি হুকুম করবেন তখনি প্রস্তুত। বললেন, যাচ্চি বলরামপুরে সময় হলে তার পরে জানাবো। বললুম, তাই জানাবেন, কিন্তু মাসিকে অমন চটিয়ে দিলেন কেন? তাঁদের ঐ-সব পূজো-পাঠ, হোম-জপ, ঠাকুর দেবতা সত্যিইত আর বিশ্বাস করেন না, তবু বলেলন বিশ্বাস করতে পেলে বেঁচে যাই। কেন বললেন ও-কথা? বন্দনা বললেন, মিথ্যে বলিনি অশোকবাবু, ওঁদের মতো সত্য বিশ্বাসে ঐ সব যদি কখনো গ্রহণ করতে পারি আমি ধন্য হয়ে যাই। মুখুয্যে মশায়ের অসুখে সেবা করেছিলুম তাঁর কাছে একদিন বিশ্বাসের বর চেয়ে নেবো। তারপরে সুরু হলো আপনার কথা। এত শ্রদ্ধা যে কেউ কাউকে করে, কারো শুভ কামনায় কেউ যে এমন অনুক্ষণ মগ্ন থাকতে পারে এর আগে কখনো কল্পনাও করিনি বিপ্রদাসবাবু। কথায় কথায় তিনি একদিনের একটা ঘটনার উল্লেখ করলেন। তখন আপনি অসুস্থ, আপনার পূজো আহ্নিকের আয়োজন তিনিই করেন। সেদিন বেলা হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি আসতে কি একটা পায়ে ঠেক্‌লো, যতই নিজেকে বোঝাতে চাইলেন ও কিছু নয় ওতে পূজার ব্যাঘাত হবে না, ততই কিন্তু মন অবুঝ হয়ে উঠতে লাগলো পাছে কোথা দিয়েও আপনার কাজে ত্রুটি স্পর্শ করে। তাই আবার স্নান করে এসে সমস্ত আয়োজন তাঁকে নূতন ক'রে করতে হলো। আপনি কিন্তু সেদিন বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, বন্দনা সকালে যদি তোমার ঘুম না ভাঙে ত অন্নদাদিদিকে দিও পূজোর সাজ করতে। মনে পড়ে বিপ্রদাসবাবু?

বিপ্রদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, পড়ে।

অশোক বলিতে লাগিল, এম্‌নি কত দিনের কত ছোট খাটো বিষয় গল্প করে বলতে বলতে সেদিন রাত্রি অনেক হয়ে গেলো, শেষে বললেন. মাসি তাঁদের কুসংস্কারের খোঁটা দিলেন,—আমি নিজেও একদিন দিয়েছি অশোকবাবু—কিন্তু আজ কোনটা ভালো কোনটা মন্দ বুঝতে আমার গোল বাধে।

খাওয়ার বিচার ত কোন দিন করিনি, আজন্মের বিশ্বাস এতে দোষ নেই, কিন্তু এখন যেন বাধা ঠেকে। বুদ্ধি দিয়ে লজ্জা পাই, লোকের কাছে লুকোতে চাই, কিন্তু যখনই মনে হয় এ সব উনি ভালোবাসেন না তখনি মন যেন ওর থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে।

শুনিতে শুনিতে বিপ্রদাসের মুখ পাংশু হইয়া আসিল, জোর করিয়া হাসির চেষ্টা করিয়া বলিল, বন্দনা বুঝি এখন খাওয়া-ছোঁয়ার বিচার আরম্ভ করেছে? কিন্তু সে দিন যে এসে দম্ভ করে বলে গেল মাসির বাড়ীতে গিয়ে ও আপন সমাজ, আপন সহজ বুদ্ধি ফিরে পেয়েছে, মুখুয্যেদের বাড়ীর সহস্র প্রকারের কৃত্রিমতা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বেঁচে গেছে!...

অশোক সবিস্ময়ে কি একটা বলিতে গেল কিন্তু বিঘ্ন ঘটিল। পর্দ্দা সরাইয়া বন্দনা প্রবেশ করিয়া বলিল, মুখুয্যে মশাই সমস্ত গুছিয়ে রেখে এলুম। কাল সকাল সাড়ে ন'টার গাড়ী। পুজো টুজো বাজে কাজগুলো ওর মধ্যে সেরে রাখবেন। এত বিড়ম্বনাও ভগবান আপনার কপালে লিখেছিলেন।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, তাই হবে বোধহয়।

—বোধহয় নয় নিশ্চয়। ভাবি এগুলো কেউ আপনার ঘুচোতে পারতো। তা শুনুন। কালকের সকালের খাবার ব্যবস্থাও করে গেলুম,—আমি নিজে এসে খাওয়াবো, তারপরে কাপড়-চোপড় পরাবো, তারপরে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে যাবো। রোগা মানুষ কিনা—তাই। চলুন অশোকবাবু, এবার আমরা যাই। পায়ের ধুলো কিন্তু আর নেবোনা মুখুয্যে মশাই,—ওটা কুসংস্কার। ভদ্র সমাজে অচল। এই বলিয়া সে হাসিয়া হাত দুটো মাথায় ঠেকাইয়া বাহির হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্র

# শ্রীচৈতন্য-চরিত্রে সঙ্গীত ও কাব্যরসানুভূতি

শ্রীত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনা করিলে তাহাতে বিচিত্র ভাবের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে কিংবা প্রবলের অন্যায় উৎপীড়নে কখনও দেখা যায় তাঁহাদের হৃদয় "বজ্রাদপি" কঠোর, আবার কখনও দেখিতে পাওয়া যায়, আর্ত্তের কাতরতা বা দুঃখীর বেদনার গভীর স্পর্শে তাঁহাদের বিগলিত হৃদয় হইতে করুণার প্রস্রবণ উৎসারিত। শ্রীচৈতন্য-চরিত্রেও আমরা এইরূপ বিভিন্ন ভাবের বিচিত্র স্ফুরণ দেখিতে পাই। কখনও দেখি নিমাই পণ্ডিতের অত্যুজ্জ্বল প্রতিভার প্রখর দীপ্তি সহ্য করিতে না পারিয়া পণ্ডিতগণ সভয়ে দূরে পলায়ন করিতেছেন, আবার কখনও দেখি তিনি শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবগণকে প্রণাম ও নমস্কার করিয়া সকলের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন। একদিকে প্রকৃতি-সম্ভাষণ করিবার অপরাধের জন্য তিনি ছোট হরিদাসের প্রতি নির্ম্মম কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতেছেন, আবার অন্যদিকে দেখি তাঁহার অতুলনীয় প্রেম দৈন্যকে আশ্রয় করিয়া উদ্ধত অভিমানের শিলা-স্তম্ভকে বিগলিত করিয়া জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীকৃত সংস্কারের ভারবেগে প্রবাহিত জীবনের ধারাকে চির কল্যাণের পথে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

শ্রীচৈতন্য-চরিত্র যেন অপরূপ ভাব-কুসুমে গ্রথিত মালা। তাহার অপূর্ব্ব বিকাশ ও সুরভি যুগে যুগে ভক্তি ও ভাবুকগণের হৃদয়ে আনন্দ ও পুলকের প্রবাহ আনিয়া দেয়। সেই বিচিত্র ভাব-সমাবেশের অবকাশে একটি বৈশিষ্ট্য অতি উজ্জ্বলভাবে আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে,—তাহা তাঁহার কাব্য ও সঙ্গীতানুরাগ। তাঁহার এই কাব্য-প্রতিভা সূত্রের ন্যায় সমুদয় ভাব-বিন্যাসকে যেন গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। সন্ন্যাসাশ্রমে প্রকৃতি-সম্ভাষণ তো দূরের কথা, তদ্দর্শনও নিষিদ্ধ। শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া তদাশ্রমোচিত যাবতীয় নিয়ম যথারীতি পালন করিয়াছেন। এ বিষয়ে যাহাতে তাঁহার কোনও প্রকার ক্রটী-বিচ্যুত না ঘটে সেজন্য তিনি অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ দামোদরকে বিশেষ করিয়া সাবধান হইতে বলিয়াছেন। কিন্তু দেখা যায় তাঁহার কাব্যে-গড়া-প্রাণ কখন কখনও অনুভূতির তীব্র আবেগে সন্ন্যাসের সকল বাধাকে অতিক্রম করিয়া রসানুসন্ধানে ছুটিয়াছে। প্রভু একদিন জলেশ্বর-টোটায় যাইতেছেন, এমন সময়ে মনোহর সঙ্গীত-ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি শুনিলেন, গুর্জ্জরী রাগিণীতে গীত-গোবিন্দের সুললিত পদ গীত হইতেছে। প্রভু আনন্দে বিহ্বল হইয়া গীত-ধ্বনি অনুসরণ করিয়া ছুটিলেন। তাঁহার বাহ্য-জ্ঞান নাই। পথে সিজের কাঁটা ফুটিয়া তাঁহার অঙ্গ রক্তাক্ত হইল, তাঁহার ব্যথা-বোধ নাই। ভক্ত-প্রধান গোবিন্দ সঙ্গে ছিলেন, তিনিও প্রভুর পিছনে পিছনে ছুটিয়াছেন। জগন্নাথ-মন্দিরের গায়িকা নারীগণ যেখানে গান করিতেছিলেন প্রভু যখন তাহার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন এমন সময় গোবিন্দ প্রভুকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "প্রভু করেন কি? যাঁহারা গান গাহিতেছেন তাঁহারা যে স্ত্রীলোক।" স্ত্রীলোকের নাম শুনিয়া প্রভুর বাহ্য-জ্ঞান ফিরিয়া আসিল।

"প্রভু কহে "গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ॥
এ ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার।""

* * * *

একটা নিমিত্তমাত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া যে উচ্ছ্বসিত ভাবের প্রবাহ নিবিড় রসাস্বাদন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ছুটিয়াছিল কোনও আচার বা নিয়মের কঠোরতা তাহাতে

বাধা প্রদান করিতে পারে নাই। যিনি সর্ব্ব সুখ-রস-প্রস্রবণ তাঁহারই অমিয় রস-ধারা সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত প্রবাহের ভিতর দিয়া তিনি বিভোর হইয়া পান করিতেছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রমের কঠোর বিধান, তাঁহাকে সেই অপার্থিব রসানুভূতির আনন্দ-বিহ্বলতা হইতে বাহ্য জগতে ফিরাইয়া আনিল।

শ্রীচৈতন্যদেব সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক। শ্রীবাস-অঙ্গনে তিনি ভক্তগণের সহিত সুরলয় সংযোগে নাম সংকীর্ত্তন করিয়া প্রহরের পর প্রহর, নিশির পর নিশি যাপন করিয়াছেন। তিনি প্রচার করিয়াছিলেন,—

"কলিযুগে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥"

তিনি বুঝিয়াছিলেন, সাধন-পদ্ধতিকে সরস করিতে না পারিলে তাহা লোকের হৃদয়-গ্রাহী হইবে না। তাই তিনি স্বয়ং নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্র সহযোগে উচ্চৈঃস্বরে নাম-সংকীর্ত্তন করিয়া লোককে অপূর্ব্ব সাধন-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। তৎকালীন বিদ্যা-বিলাসী-পণ্ডিত-সমাজ তাঁহার মাধুর্য্য-পূরিত সাধন-পদ্ধতি সমর্থন করেন নাই, বরং তীব্র বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহারা কাজির সমীপে অভিযোগ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহা মর্ম্ম-মূলে একবার বাসা বাঁধে তাহাকে উৎপাটিত করা সহজ নহে। অনাড়ম্বর সুর-লয়-সম্বলিত হরিনাম কীর্ত্তন সঙ্গীত-রসের ভিতর দিয়া লোকের মর্ম্ম-স্থলে প্রবেশ করিল;—তাহারা আকৃষ্ট হইল। সেই আকর্ষণের ফল আজও আমরা চারিদিকে অনুক্ষণ প্রত্যক্ষ করিতেছি। এখনও বাঙ্গলার আকাশে বাতাসে কীর্ত্তনের সুর ছাইয়া আছে। কীর্ত্তনের সুর কর্ণে প্রবেশ করিলে এখনও মাঠের কৃষক তাহার কাজ ভুলিয়া যায়, তাহার অন্তস্থলে কোন্ এক সুদূরের পিপাসা জাগিয়া উঠে; গৃহ-কর্ম্ম-নিরতা ললনার মন ক্ষণকালের জন্য উদাসীন হইয়া কোন্ এক বিচিত্র রসানুসন্ধানের উদ্দেশে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে, ভোগ-সুখ-পরায়ণ ব্যক্তির ভোগের দুষ্পূরণীয় পিপাসা অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও শান্তি লাভ করে। প্রেমের প্রস্রবণ হইতে একদিন কীর্ত্তন গানের উদ্ভব হইয়াছে, সুতরাং তাহার অনির্ব্বচনীয় শক্তি যে চিরকাল মানবের অন্তর রস-সিক্ত করিবে তাহাতে সন্দেহ কি?

নীলাচলে শেষ দ্বাদশ বৎসর শ্রীচৈতন্যদেবের তীব্র বিরহ-অবস্থা। নিরন্তর সেই বিরহ-স্ফূর্ত্তির ভাব ভাষায় প্রকাশ হয় না। তাহার বিরহ-ভাব সেই দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়,—যেদিন ব্রজেশ্বরী রাধা শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে মহা যোগিনীর ভাব ধারণ করিয়াছিলেন, যেদিন কৃষ্ণ-হারা হইয়া তিনি নিখিল জগৎ শূন্যময় দেখিয়াছিলেন। শ্রীমতী রাধার ন্যায় শ্রীচৈতন্যেরও শেষ দ্বাদশ বৎসর নিরন্তর বিরহ-উন্মাদে কাটিয়াছে। রাত্রিতে নিদ্রা নাই, নয়নে অবিরাম অশ্রুর উৎস। গম্ভীরার ভিতরে তাঁহার অন্তরঙ্গ স্বরূপ ও রামানন্দ রায়ের নিকট কাতর হইয়া তিনি অন্তরের বিলাপ জানাইতেছেন,—

"কাঁহা করোঁ কাঁহা পাঁও ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন॥
কাহারে কহিব কথা কেবা জানে দুঃখ।
ব্রজেন্দ্র-নন্দন বিনু ফাটে মোর বুক॥"

একজন ব্যক্তিই তাঁহার ধ্যান ও ধারণার বিষয় ছিল,—তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন; একটি নদীকেই তিনি চিনিতেন তাহা যমুনা; একটি পর্ব্বতের কথাই তিনি জানিতেন—তাহা গোবর্দ্ধন। নিখিল জগতের যাহা কিছু সবই তাঁহার কাছে কৃষ্ণময়, যেখানে যত দেব-বিগ্রহ আছে সকলই শ্রীগোবিন্দের। তাই তিনি বলিতেছেন,—

"যত শুনি শ্রবণে—সকলই কৃষ্ণ নাম।
সকল ভুবন দেখোঁ—গোবিন্দের ধাম॥"

তাই বর্ষার নব-নীরদ-পুঞ্জ দেখিয়া শ্যামের অঙ্গ-কান্তি তাঁহার মনে পড়িত; চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত সমুদ্রের শুভ্র লহরী-লীলা দেখিয়া যমুনা-ভ্রমে তিনি তাহাতে নিপতিত হইতেন; দূরে চটক-পর্ব্বতকে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ভাবিয়া তাহার দিকে আত্মহারা হইয়া তিনি ছুটিয়া চলিতেন। তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় ও প্রাণ মন একান্ত হইয়া যেন সেই আনন্দময়ের সন্ধানে ছুটিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের সেই বিরহ-স্ফূর্ত্তি পরবর্ত্তী বৈষ্ণব

কবিগণকে এক নব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তাঁহার সেই অপূর্ব্ব ভাব-রাশি বৈষ্ণব-কবিগণের অমর লেখনীর তুলিকায় ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া এক অভিনব সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে। কবে কোন্ অতীত যুগে যে লীলা সংঘটিত হইয়াছে এখনও যেন তাহার জীবন্ত প্রভাব কাব্যের প্রতি-ছত্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে রস-মধুর করিয়া রাখিয়াছে। যে লীলা এক কালে প্রকট হইয়াছিল তাহার অভিনব রস আমরা এখন এই সকল সাহিত্যের ভিতর দিয়া আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।

শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিবার পর শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর আদেশে নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং হরিদাসের কুটীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই বৎসর প্রভু রথাগ্রে নৃত্য কীর্ত্তন করিবার সময়ে "কাব্য-প্রকাশ" হইতে উদ্ধৃত একটী শ্লোক পাঠ করেন,—

"যঃ কৌমার হরঃ স এব হি বরস্তা
এব চৈত্রক্ষপাস্তে চোন্মীলিত—
মালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
বা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত—
ব্যাপার লীলাবিধৌ রেবা রোধসি
বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥"

শ্লোকটীর অর্থ এই—"হে সখি, যিনি আমার কৌমার কাল হরণ করিয়াছেন, অধুনা তিনি আমার বর। সেই সকল চৈত্রমাসীর যামিনী, সেই সমস্ত প্রস্ফুটিত মালতী সৌরভ, সেই সমস্ত বিকসিত কদম্ব-কানন-সম্বন্ধীয় সমীর এবং সেই আমিও আছি, তথাপি রেবা তীরস্থ অশোক-মূলে আমাদের যে প্রথম বিহার ঘটিয়াছিল এবং তাহাতে যে সুখ হইয়াছিল, এখন আর তাহা পাইতেছি না। তাহার জন্য মন সমুৎকণ্ঠিত।"

শ্লোকটী আদি-রসাত্মক, এবং প্রেমাস্পদকে সম্বোধন করিয়া প্রেমিকা এইরূপ বলিতেছেন। প্রভু রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে রথারূঢ় তাঁহার পরম প্রেমাস্পদকে লক্ষ্য করিয়া শ্লোক-নিহিত নিগূঢ় রস আস্বাদন করিতেছেন। তাঁহার প্রধান অন্তরঙ্গ ভক্ত-স্বরূপ দামোদর ব্যতীত তাঁহার অন্তরের ভাব আর কেহই বুঝিতেছেন না। কিন্তু অশেষ ভাগ্য বলে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিলেন, এবং অনুরূপ ভাবের একটী শ্লোক রচনা করিলেন,—

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি
কুরুক্ষেত্র মিলিত স্তথাহং
সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গম সুখং
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলী পঞ্চম জুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥"

ভাবার্থ—হে সখি, কুরুক্ষেত্রে সেই শ্রীহরি মিলিত হইয়াছেন, আমিও সেই শ্রীমতী রাধিকাই আছি, উভয়ের সহবাস সুখও বটে, তথাপি কাননাভ্যন্তরে খেলিত মুরলীর পঞ্চম স্বর বিশিষ্ট সেই কালিন্দী সৈকত কাননের দিকে আমার চিত্ত স্পৃহা করিতেছে।

শ্রীরূপ একটি তাল-পত্রে শ্লোকটী লিখিলেন এবং সমুদ্রে স্নান করিতে যাইবার পূর্ব্বে তাহা চালে গুঁজিয়া রাখিলেন। শ্রীরূপ স্নান করিতে চলিয়া গেলে প্রভু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু তথায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া দৈবক্রমে যেমন চালের দিকে তাকাইলেন অমনি তাল-পত্রটী তাঁহার চোখে পড়িল। তিনি চাল হইতে সেটী বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। শ্লোক পড়িয়া প্রভু পুলকিত হইলেন। শ্রীরূপ ঠিক সেই সময়ে স্নান হইতে ফিরিয়া প্রভুকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। প্রভু শ্রীরূপকে সস্নেহে চপেটাঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার অন্তরের ভাব কিরূপে জানিলে?" শ্রীরূপ বলিলেন, "তুমিই কৃপা করিয়া আমাকে জানাইয়াছ।"

শ্রীরূপ গোস্বামী কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক যে সকল অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে বিদগ্ধ মাধব নাটক ও ললিত মাধব নাটক সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নীলাচলে হরিদাসের কুটীরে অবস্থান করিবার সময় শ্রীরূপ একদিন বিদগ্ধ মাধব নাটক রচনায় প্রবৃত্ত আছেন, এমন সময়ে প্রভু হঠাৎ

সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদাস ও শ্রীরূপ উভয়ে সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া প্রভু আসনে উপবেশন করিলেন। "কি পুঁথি লিখিতেছ?"—এই কথা শ্রীরূপকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রভু পুঁথির একখানি পত্র লইয়া দেখিতে লাগিলেন, এবং শ্রীরূপের হস্তাক্ষিত মুক্তার ন্যায় অক্ষরশ্রেণী দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইলেন। পত্রে একটী শ্লোক লিখিত আছে দেখিয়া প্রভু তাহা পড়িতে লাগিলেন, এবং পাঠ করিবামাত্র প্রেমে আবিষ্ট হইলেন।

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে
তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে, কর্ণক্রোড় কড়ম্বিনী
ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃ প্রাঙ্গনসঙ্গিনী বিজয়তে
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং, নো জানে জনিতা
কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥"

শ্লোকার্থ:—কৃষ্ণ এই বর্ণদ্বয় যে কি পরিমিত অমৃত দ্বারা গঠিত হইয়াছে, তাহা অবগত নহি। এই অমৃতময় শব্দ যৎকালে জিহ্বার নৃত্য করে, তখন রসনা-শ্রেণী প্রাপ্তির অভিলাষ হয়; শ্রবণ-বিবরে অঙ্কুরিত হইলে অর্ব্বুদ সংখ্য কর্ণলাভের স্পৃহা জন্মে এবং মনোরূপ প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইলে যাবতীয় ইন্দ্রিয় ব্যাপারই এতৎ সকাশে পরাভূত হইয়া পড়ে।

কোনও উৎকৃষ্ট বস্তু কিংবা বিষয় উপভোগ করিবার সময়ে প্রিয়জনের কথা মনে পড়ে, এবং তাহাদিগকেও সেই-রস আস্বাদন করাইবার জন্য মন উৎসুক হয়। সাধুমুখে ও শাস্ত্র-গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ-নামের মহিমা শুনা যায় বটে, কিন্তু উক্ত অপূর্ব্ব শ্লোকনিহিত ভাব প্রভুর এত মধুর লাগিয়াছে যে তিনি তাহা ভক্তগণকে আস্বাদন করাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। সার্ব্বভৌম, স্বরূপ, রামানন্দ রায় প্রভৃতি ভক্তগণের সমক্ষে শ্রীরূপের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া শ্রীরূপকে সেই শ্লোক পড়িতে আদেশ করিলেন। শ্লোক শুনিয়া ভক্তবৃন্দ সকলে আনন্দে-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

'সবে বলে "নাম-মহিমা শুনিয়াছি অপার।
এমন মাধুর্য্য কেহ বর্ণে নাহি আর॥"'

রায় তখন শ্রীরূপের কবিত্ব-শক্তির অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "প্রভুর শক্তি-সঞ্চার ভিন্ন জীবে এরূপ কবিত্ব-শক্তির বিকাশ হওয়া সম্ভব নয়।" শ্রীরূপ যে প্রভুর প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন তাহা প্রভুর উক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারি।

প্রভু কহে "আমা সনে ইহার মিলন।
ইহার গুণে আমার তুষ্ট হৈল মন॥
মধুর প্রসঙ্গে ইহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার॥"

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিখিত প্রভুর কাব্য-রসাস্বাদন-লীলা-বিষয়ক প্রসঙ্গগুলিকেই একমাত্র ঘটনা বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন। শ্রীচৈতন্য দেবের সমগ্র জীবনই ভাব-ময়, এবং এই ভাবের ভিতর দিয়াই তাঁহার প্রকট লীলার সূচনা, বিকাশ ও পরিণতি। তাঁহার বিচিত্র ভাব-রাশি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ও অতলস্পর্শ। সুতরাং ঘটনার সমাবেশে যে যে স্থলে এই সকল ভাব বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে তাহারই কিয়দংশ আমরা আস্বাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

শ্রীচৈতন্যদেব শাস্ত্রীয় যুক্তি ও প্রমাণাদি দ্বারা ভক্তগণকে সাধ্যসাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। বুদ্ধি ও বিচার দ্বারা যে সকল পরমতত্ত্ব বোধগম্য হয় না স্বীয় কৃপাবলে তাহা ভক্তগণকে অনুভব করাইয়াছেন। তিনি ভক্তগণকে বুঝাইয়াছেন, কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু ও সকলের ভর্ত্তা; তিনিই একমাত্র পুরুষ, আর সব প্রকৃতি। কিন্তু পরম বৈরাগী গুরুরূপী শ্রীচৈতন্যের এই সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া কখন কখনও আমরা দেখিতে পাই কবি ও প্রেমিক রূপী আর এক শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। নদীতে বান ডাকিলে নদীর দু-কূল প্লাবিত হইয়া যেমন সকল চিহ্ন নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, এবং শুধু জলরাশি ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না,—তেমনি কখন কখনও আমরা দেখিতে পাই নিবিড় রসানুভূতির এক প্রবল উচ্ছ্বাস সকল তত্ত্ব ও জ্ঞানকে তলাইয়া দিয়া তাঁহার অন্তরাত্মাকে পরম প্রিয়তমের

সন্নিধানে লইয়া চলিয়াছে। মাত্র প্রেম ও রস ছাড়া শ্রীচৈতন্যের ভিতরে সেই অবস্থায় আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। মনে হয় শ্রীচৈতন্যদেব প্রেম ও রসে গড়া যেন এক অপরূপ মূর্ত্তি।

যে কয়েকজন প্রধান অন্তরঙ্গ ভক্তের সহিত বিরহ-উন্মাদের সময় প্রভু কালাতিপাত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই দুই অন্তরঙ্গ ভক্তের সাহচর্য্যে প্রভুর বিরহ-ভাব সঙ্গীত ও কাব্যের ভিতর দিয়া আরও মধুরভাবে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল। এই সময়ে কি ভাবে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এইরূপ বর্ণিত আছে,—

"এই মত গৌর প্রভু প্রতি দিনে দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ রামানন্দ সনে॥
সেই দুইজন প্রভুর করে আশ্বাসন।
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক পঠন॥
কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীত গোবিন্দ।
ইহার শ্লোক-গীতে প্রভুর করায় আনন্দ॥"

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে যাইতে হঠাৎ একটী পুষ্পোদ্যান দেখিতে পাইলেন। পুষ্পোদ্যান দেখিয়া তাঁহার বৃন্দাবন ভ্রম হইল, এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাসলীলার স্মৃতি তাঁর অন্তরে স্ফুরিত হইল। তিনি রাসলীলার শ্লোক পড়িয়া ভাবাবেশে সখী ভাবে প্রতি তরুলতার নিকটে কৃষ্ণান্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি তখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য। তাঁহার অন্তরাত্মা পরম প্রেমাস্পদকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। প্রতি তরুলতাকে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর না পাইয়া প্রভু যমুনার দিকে অগ্রসর হইলেন,—

"এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে।
দেখে, তাহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে॥
কোটি-মন্মথ-মোহন মুরলী-বদন।
অপার সৌন্দর্য্যে হরে জগৎ-নেত্র-মন॥"

সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, এমন সময়ে স্বরূপাদি ভক্তগণ সেখানে মিলিত হইয়া তাঁহার চেতনা সঞ্চার করিলেন। প্রভু সংজ্ঞা লাভ করিয়া চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

'প্রভু কহে "কৃষ্ণ মুঞি এখনি দেখিনু।
আপনার দুর্দ্দৈবে পুনঃ হারাইনু॥
চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের, না রয় একস্থানে।
দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্ধানে॥"

অধীর হৃদয়কে শান্ত করিবার জন্য প্রভু স্বরূপকে একটী গান গাহিতে বলিলেন। স্বরূপ তখন মধুরকণ্ঠে প্রভুকে গীত-গোবিন্দের পদ শুনাইতে লাগিলেন,—

"রাসে হরিমিহ বিহিত বিলাসং।
স্মরতি মনোমম কৃত পরিহাসং॥"

যিনি বৃন্দাবন-পুলিনে মহারাসোৎসব কালে নানারূপ রস-কৌতুক ও পরিহাস প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অদ্য আমার চিত্ত সেই হরিকে স্মরণ করিতেছে।

গীত শুনিয়া প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবং অষ্টসাত্ত্বিক ভাব-সমূহ তাঁহার অঙ্গে প্রকাশ পাইতে লাগিল। প্রভুর শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই,—প্রভু আনন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেছেন। বহুক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল। তখন রামানন্দ রায় প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর শ্রম বুঝিতে পারিয়া শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন।

প্রাণপ্রিয় বন্ধু বা স্বজন যখন হৃদয় আঁধার করিয়া কোনও দূরদেশে চলিয়া যায় তখন ব্যাকুল হৃদয় কিছুতেই প্রবোধ মানিতে চায় না। তখন অবিরাম অশ্রুর প্রবাহে স্মৃতির তর্পণ ব্যতীত আর কিছুই ভাল লাগেনা। বিরহ-অনলের তীব্রদাহ কালক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসে বটে কিন্তু অন্তরের তুষানল একেবারে নির্ব্বাপিত হয় না, ধীরে ধীরে জ্বলিতে থাকে। সে অনল একেবারে ভস্মীভূত করেনা বটে, কিন্তু তাহাতে বিলক্ষণ জ্বালা বিদ্যমান থাকে। অতীতের কতকথা তখন সামান্য কোন সূত্র ধরিয়া স্মৃতিকে আলোড়িত করে। সাগরাভিমুখী নদী-প্রবাহের ন্যায় অন্তরাত্মা বাঞ্ছিতের মিলনাকাঙ্ক্ষায় কেবল ঘুরিয়ে বেড়ায়। প্রিয়তমের চিহ্নিত কোনো বস্তু তখন নয়ন-গোচর হইলে অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায়

তাহা বিরহ-সন্তাপকে অধিকতর প্রবল করিয়া তুলে। শ্রীচৈতন্যের বিরহাকুল প্রাণ প্রেমাস্পদের মিলন-আকাঙ্ক্ষায় অধীর আগ্রহে সেইরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তাই বর্ষা-বিধৌত কদম্ব-কোরকের মনোহর শোভা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ নব-অনুরাগে রঞ্জিয়া উঠিত; দিগন্তে নব-বর্ষার শ্যাম-মেঘ মালা এবং তাহার শীর্ষদেশে ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণচ্ছটা নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার কৃষ্ণের রূপ মনে পড়িত। তিনি বিভোর নয়নে সেই দৃশ্য—সৌন্দর্য্য পান করিতেন। অশ্রুধারে নয়ন-যুগল প্লাবিত, তিনি প্রসারিত হস্তে মেঘের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখা দিবার জন্য ব্যাকুল ভাবে মিনতি জানাইতেন। কুসুমিত উদ্যান-শোভা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনের কুঞ্জ তাঁহার মনে পড়িত, নদীর কুলুকুলু প্রবাহের মধ্যে তিনি যমুনার কল্লোল-গান শুনিতে পাইতেন। পত্র-শ্যাম তমাল-তরুর নিবিড় শোভা সন্দর্শনে যখনই তাঁহার কৃষ্ণ-স্মৃতি মনে উদিত হইত, তখনই প্রেম-পূরিত শ্লোক ও কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে তমাল-তরুকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিবার জন্য তিনি ছুটিয়া চলিতেন।

মহাপ্রভুর এই বিরহ-লীলা নিগূঢ় সাধনতত্ত্বেরই অভিব্যক্তি, এবং যুগে যুগে তাহা ভক্তসাধকগণের ভাব-সাধনার সহায়। ইহার অপূর্ব্ব স্ফুরণ পরিণতি লাভ করিয়াছে সঙ্গীত ও কাব্য-রসের ভিতর দিয়া। যিনি বিশ্বের আদি কবি, যাঁহার অতুল সৌন্দর্য্যের আভাষ এই বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি তাঁহাকে জানিবার অধিকারী যাঁহারা তাঁহাদের ভিতর দিয়াই এই অপূর্ব্ব কবিত্বের স্ফুরণ হওয়া সম্ভব। তাঁহাদের দৃষ্টি ও প্রতি অঙ্গ-সঞ্চালনে যে মধুর কাব্য ও সঙ্গীত তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে তাহা শুধু সেই মধুরতম আদি কবির প্রতি অর্ঘ্য-নিবেদন।

শ্রীত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

### ভ্রম-সংশোধন

গত আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের—"Bird of Fire" শীর্ষক ইংরেজি কবিতার তৃতীয় ষ্ট্যানজার চতুর্থ লাইনটি পাণ্ডুলিপির মধ্যে না থাকায় ছাপা হয় নি। সেই লাইনটি এই—A ruby of flame-petaled love in the silver-gold altar-vase of moon-edged night and rising day.

বিঃ সঃ

# পদ্মিনী

## শ্রীআশীষ গুপ্ত

প্রারম্ভেই একটা কথা বলিয়া রাখি, আমার দেহ অতিরিক্ত রকমের সুস্থ সবল, মন ততোধিক,—এবং আমি যে বিজ্ঞান কলেজের ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ছাত্র অতএব কবিকল্পনাতে ও দিবাস্বপ্নে একান্ত অনভ্যস্ত এই কাহিনী পাঠ করিবার পূর্ব্বে সে অপবাদটা জানিয়া রাখাও অত্যাবশ্যক। কিন্তু তবুও সুস্থ শরীর বাহাল, তবিয়ত, পূর্ণজ্ঞান এবং জাগ্রত বুদ্ধির প্রতিকূল চতুঃসীমায় বাস করিয়া এই কলিকাতা সহরের বুকের 'পরে বসিয়া দিবা দ্বিপ্রহরে এমন ঘটনাও ঘটে!

সেই যে ভবানীপুরে রসারোডের উপর গলির মোড়ের বাড়ী তাহার পানে একবার চাহিলে আর চোখ ফিরাইবার জো নাই। রাস্তার দিকের জানালা দরজা সমস্তই উন্মুক্ত, সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, রাত্রি কখনই তাহাদের বন্ধ দেখি নাই। বাহিরের সদর দরজার ভিতর দিয়া অন্দরমহলের দ্বার চোখে পড়ে,—ভিতরে সুপ্রশস্ত উঠান, উঠানের কোলে বারান্দা, বারান্দা বেষ্টন করিয়া সারি সারি ঘর। প্রতি গৃহের বারান্দার দিকের দ্বার উন্মুক্ত, কিন্তু অন্য সব জানালা বন্ধ বলিয়া ভিতরটা গভীর অন্ধকার। এদৃশ্য আমি নিত্য দেখিয়াছি,—কিন্তু কখনও একটি মানুষের ছায়া অবধি চোখে পড়ে নাই।

প্রথম দর্শনেই বাড়ীটার প্রতি এক অদ্ভুত ধরণের আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলাম। ছাদের আলিসার কোণে ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্দ্যে শ্যাওলা জমিয়াছে। গোলাপী রঙের প্রাচীনতার মাঝে বর্ণহীনতার প্রলেপ দেখা যাইতেছে জানালার সবুজ রঙ ধুইয়া গিয়া কাঠের আঁশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে কোথায় যে অসামান্যতা তাহা ভাবিয়া পাইলাম না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে দুর্নিবার কৌতূহল জাগ্রত হইয়া রহিল,—ওই পথ অতিক্রম করিবার সময় এই গৃহের প্রতি বারেক দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়া যাওয়া আসার আর উপায় রহিল না।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই আমার যেন একটা আতঙ্ক জন্মিয়া গেল! প্রত্যহ দেখি গৃহদ্বার একইভাবে উন্মুক্ত, উঠানের ঘরগুলির দরজাও তাই, তাহারই মধ্য হইতে বদ্ধ গবাক্ষ প্রকোষ্ঠের অন্ধকার যেন ভ্রূকুটি করিতে থাকে। মনে হয়, বাহিরের এই মুক্ত রূপেই ইহার সমাপ্তি নয়,—ইহাতে ভুলিলে ওই গভীর অন্ধকারের ঘূর্ণাবর্ত্তে ডুবিয়া মরিতে হইবে,—এমনই করিয়া লোক ঠকানোই যেন ওই বাড়ীটার ব্যবসা!

সেইদিন হইতে আমার নিকট এই গৃহের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেছে।

কলেজে যাওয়া আসা এবং অন্যান্য কারণে কখনও গাড়ীতে কখনও পদব্রজে এই গৃহের সম্মুখ দিয়া দিনের মধ্যে একাধিকবার যাতায়াত করিতে হয়। ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হই, কি এমন রহস্য ইহার অন্তরালে লুক্কায়িত আছে, কি ইহার গোপন ইতিহাস, লোকলোচনের দুনিরীক্ষ্য কি এমন এই গৃহের কাহিনী যে ইহার সম্বন্ধে আমার শঙ্কা ব্যাকুলতার সীমা নাই! কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমশই এমন জটিল হইয়া উঠিতেছে যে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একরকম অসম্ভব বলিয়াই মনে হয় অথচ না থাকে কৌতূহলের শেষ না রহে সন্ত্রাসের পরিসীমা।

চিত্তের এই দ্বিধাগ্রস্ত দোলায়মান অবস্থা অসহ্য হইয়া উঠিল।

জ্যৈষ্ঠের অমাবস্যার রাত্রি। মধ্যাহ্নে অনুভব করিয়াছিলাম কলিকাতা সহরের উত্তপ্ত কটাহে ভগবান যেন আমাদিগকে সযত্নে সিদ্ধ করিতেছেন,—সন্ধ্যার আকাশেরও

থম্‌থমে চেহারা, মেঘ নাই, বাতাস নাই,—চতুর্দ্দিকস্থ প্রকৃতিতে একটা দুঃসহ গুমট!

সন্ধ্যার পর ছাদের 'পরে একটা শীতল পাটি বিছাইয়া অন্ধকার গগনতলের দিকে চাহিয়া আছি, ষোল নম্বর বাড়ীর কথা মনে পড়িতেছে। আজ দ্বিপ্রহরে কলেজে বসিয়া স্থির করিয়াছি কাল সকালে ছাত্রপড়ানো চাকুরীর অজুহাতে ষোল নম্বরের গৃহস্বামীর সহিত আলাপ করিয়া ব্যাপারটাকে সহজ করিয়া তুলিব। মনে হইতেছে গৃহ যখন বটে তখন যেমনই হউক একজন গৃহস্বামী তাহার থাকিবেই,—আজিকার রাত্রি ত প্রভাত হউক তাহার পর কাল প্রত্যূষে তাহার সহিত আমার বোঝাপড়া।

কিন্তু কেন এমন হইল! আমি সবল, স্বাস্থ্যবান বিজ্ঞানের ছাত্র, চুলচেরা প্রমাণ ব্যতিরেকে নিজের চোখ কানকেও বিশ্বাস করি না,—অঙ্ক কসিয়া হিসাব-নিকাশ করিয়া ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুকেও ভ্রম ত্রুটির জগৎ হইতে সত্য সিদ্ধান্তে উত্থিত করার চেষ্টা করি,—সেই আমার 'পরে একি স্নায়ুর আক্রমণ!—কিন্তু কাল সকালে ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া তবে আমার শান্তি।

তবুও কেবলই মনে হয়, রহস্যটা কি। কারণ সত্য সত্যই ইহাকে স্নায়ুর অত্যাচার এবং অলীক কল্পনা বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না, দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি না। চন্দ্রহীন নভঃতলে নক্ষত্রগুলা তন্দ্রালু আলস্যে নিষ্প্রভ হইয়া রহিয়াছে। সেইদিকে চাহিয়া আমি আমার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি।

অকস্মাৎ শীতল পাটির 'পরে উঠিয়া বসিলাম,—সংশয় মাত্র রহিল না যে এইবার সুস্পষ্টভাবে সকল গোপন কথা বুঝিতে পারিতেছি!—ওই যে ষোল নম্বর ভবনের কাহিনী তাহা অত্যন্ত কুৎসিত কাহিনী,—সেই অপরিচ্ছন্নতা কেবল মাত্র ওই বংশের রক্ত যাহাদের দেহে প্রবাহিত তাহাদেরই সহ্য হইবার কথা,—সেইজন্যই ইহাদের তিন তিনটা বধূ ভিন্ন সংসার হইতে আসিয়া পর পর আত্মহত্যা করিয়া আত্মরক্ষা করিল, এ বস্তু অন্য ঘরের মেয়ের সহিল না। একজন মরিল বিষ খাইয়া, একজন মরিল গলায় দড়ি দিয়া, একজন মরিল জলে ডুবিয়া। মনে হইল, আমাদের ছাদের সিঁড়ির দরজার নিকট আসিয়া সেই তিন বধূ যেন কঠিনমুখে বলিতেছে, আমরা বাঁচিয়াছি!

সম্মুখপানে চাহিয়া আমি নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলাম। ষোল নম্বর ভবনে যে নরকের একটি উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে আমার চিন্তাধারা সহসা স্বচ্ছ হইয়া গেল। কত পাপ, কত অনাচার যে ওই গৃহের অধিবাসীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার আর যেন ইয়ত্তা নাই,—সারা সহরের লোকের নিশ্বাস যেন ওই বাড়ীটার উপর দিয়া বহিয়া গেছে। মর্ম্মান্তিক দুঃখের সহিত অনুভব করিতে লাগিলাম, আধুনিক কায়দায়, অসরল ভঙ্গীতে তাহাদের সমর্থন করিতে পারি, তাহাদের কৃত কর্ম্মকে শিল্পকার্য্যে অথবা সৃষ্টিকার্য্যে রূপান্তরিত করিতে পারি এমন উপায়টি অবধি তাহারা রাখে নাই। চাহিয়া দেখি, তিন বধূ তখনও সোপানপ্রান্তে দাঁড়াইয়া—মধ্যবর্ত্তিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সকল কথা জানতে চাও?"

জোরের সহিত বলিলাম, "না, সে সংবাদ জেনেও আমার কিছু করবার নেই—"

আহ্লাদীর আহ্লাদী নামটি আমারই দেওয়া, সোহাগ করিয়া রাখি নাই, সুতীক্ষ্ণভাবে অনুভব করিয়াছিলাম এ নাম ছাড়া তাহাকে মানায় না, এ যেন তাহার পক্ষে অনিবার্য্য! তাহার আদর্শ পিতামাতা কন্যারত্নের নামকরণ করিয়াছিলেন পদ্মিনী। ষোল নম্বরের নরককুণ্ডের মধ্যে আহ্লাদীই অপেক্ষাকৃত পুণ্যাত্মা লোক, অর্থাৎ মাংসাশী হইলেও সে এখন পর্য্যন্ত হাড় বাদ দিয়া চলে। আহ্লাদীর গায়ের রঙ ফরসা এবং শরীরের গঠন কিঞ্চিৎ পুষ্ট কিন্তু যেমন কুৎসিত তাহার চালচলন, তেমনই অমার্জ্জনীয় তাহার চেহারা।

আহ্লাদী ফোঁপাইতে লাগিল, বেশীক্ষণ ধরিয়া স্নান করার জন্য চোখ দুইটা লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই কোণে কয়েক ফোঁটা জল চকচক করিতেছে,—মনে হয় যেন আমাদের শশী চাকরটা কলতলা হইতে টোমাটো ধুইয়া লইয়া আসিল! এই তরুণী নারীর জন্য সৃষ্টিকর্ত্তার ভাণ্ডারে এত সৌন্দর্য্যও সঞ্চিত ছিল। একটা কথা, আহ্লাদী যে নারী তাহাতে সংশয় নাই এবং সে যে তরুণী সে বিষয়েও

সিদ্ধান্ত সর্ববাদী-সম্মত এবং এই দুইটা দুর্লভ গুণ সম্বন্ধে আহ্লাদী অতি সচেতন। তাঁহার এই সচেতন বুদ্ধির মাধুর্য্য আমি হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছি। কারণ আহ্লাদী আমার প্রেমে পড়িয়াছে! ব্যাপারটা এমন কিছু নূতন নয়,—আমার নিজের কথা বলি নাই, আহ্লাদীর দিক হইতে বলিতেছি! প্রেমিকতার তৃতীয় শ্রেণীর উন্মত্ততায় আমি অংশ গ্রহণ করিতে পারি একথা অতবড় ধূর্ত্ত বংশের কন্যা হইয়াও আহ্লাদী যে কি করিয়া বিশ্বাস করিতে পারিল তাহাই আমি ভাবি,—অন্য যে কোনও লোকের তুলনায় আহ্লাদী বহুগুণে ওস্তাদ হইলেও সে যে তাহাদের আপন কুলের কলঙ্কস্বরূপ তাহাতে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নাই! —কিন্তু এই প্রেমের ব্যাপারটা আমার পক্ষে অভিনব এবং চমকপ্রদ হইলেও যে-আহ্লাদী বিশ্বমানবকে প্রেম নিবেদন করিয়া বেড়ায়, তাহার দিক হইতে এমনই বা কি! মোটের উপর আহ্লাদীর মলিনতার অপেক্ষাও তাহার স্থূলত্বতায় যেন শঙ্কিত হইয়া উঠিতে হয়!

কিন্তু মাঝখানের কথাগুলার পূর্ব্বে সে ফোঁপাইতেছিল, অনেকক্ষণ ধরিয়া ফোঁপানোতে মুখচোখের কাঁচা রং ধুইয়া মুছিয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে, চোখের কাজল গণ্ডদেশে পৌঁছিয়াছে, মুখের রং পাঁচমিশেলী হইয়া উঠিয়াছে! তা হউক, ঘর যখন পুড়িতেছে তখন জুতার সন্ধান করা নবাবী আমলে পোষাইত, একালে তাহা অচল। প্রেমপাগলিনী আহ্লাদী তাহার টয়লেট অগ্রাহ্য করিয়া ফোঁপাইতে লাগিল, বাঘের থাবার ন্যায় তাহার কোমল করপল্লবে আমার দুই হাত ধারণ করিয়া বলিল, "আমায় তুমি ত্যাগ কোরো না—"

অত্যন্ত ভড়কিয়া গিয়া বলিলাম, "নেঃ ব্‌বাবা—"

কথাটা সাধু বাংলা নয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিখি নাই, কিন্তু জীবনের এই সকল অনুপ্রাণিত মুহূর্ত্তে কোন মানুষের মুখ হইতে শুদ্ধ ভাষা বাহির হইয়াছে বলিয়াও আমার জানা নাই,—অতএব বিশ্ববিদ্যালয় যদি ও জিনিষ আমাদের না শিখাইয়া থাকে ত সে দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের, আমার নয়।

সে হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিল, তাহার নাকের শ্লেষ্মা আমার হাতের 'পরে উদ্যত হইয়াছে এমনই সময়ে এক বিরাট হাঁচি!—চমকিয়া উঠিলাম, আহ্লাদীর কি সকলই অদ্ভুত!

কান্না থামাইয়া সে আমাকে চিমটি কাটিল, এবার আমার মুখ দিয়া যে শব্দ বাহির হইল তাহা প্রকৃতই দুঃখের! —আহ্লাদী কহিল, "তোমার রোগবালাই সব তুলে নিলাম--"

নিজেই সংবাদ দিল, "কাল থেকে একটু সর্দ্দির মতন হ'য়েছে—"

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনের সুযোগ পাইয়া সহসা উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম, তাহার স্বাস্থ্যের জন্য আমার আর দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না, কহিলাম, "সর্দ্দি হ'য়েছে ত এই অবেলায় স্নান করে' এলে কেন?"

আহ্লাদীর নাকের শ্লেষ্মা আবার আমার ভীতি উৎপাদন করিল, হাঁউমাউ করিয়া কাঁদিয়া সে কহিল, 'বেঁচে আর কি হ'বে?—তোমার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হ'য়ে আমি আর এ জীবন রাখ্‌ব না—"

শুনিয়া খুব যে চিন্তিত হইলাম তাহা নহে,—কেবল মনে হইল, আমি বাঁচিয়া থাকিতে কি সে শুভদিন আসিবে!

সে কহিল, "তুমি কিছুতেই আমাকে ত্যাগ করতে পারবে না—"

বুকের ভিতরটা আমার কাঁপিতে লাগিল, ভাবিলাম গ্রহণ করিলামই বা কবে?

—চাহিয়া দেখি, প্রভাত হইয়া গেছে! মেঘ্‌লা দিনের সকাল, সূর্য্যের আলো দেখা যায় না, বাহিরে টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বুকের কাঁপন কিন্তু তখনও আমার থামে নাই,—স্বপ্নে-দেখা আহ্লাদী যেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুই হাত মুঠা করিয়া আমাকে শাসাইতে লাগিল।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে ষোল নম্বর গৃহের ভয়াবহ মলিনতা আহ্লাদীর কৃপায় প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আমার কাছে এই 'বার্লেস্ক্' কোনও ট্র্যাজেডির চেয়ে কম মর্ম্মান্তিক নহে,—এবং পূর্ব্বদিনের সন্ধ্যাকালে এই গৃহ সম্বন্ধে যে সকল কথা আমার নিকট অতিশয় সহজ হইয়া গেছে তাহাতে ইহাই বুঝিয়াছি যে, ওই উন্মুক্ত দ্বারের

প্রহসন দিয়া যাহারা গৃহ প্রবেশ করে অন্ধকার গৃহের কুৎসিত ট্রাজেডিতে ঘটে তাহাদের পরিসমাপ্তি। অতএব রাত্রিবেলা যে সহসা-দৃষ্টা আহ্লাদী আমার প্রতি এমন করিয়া দরদ জানাইয়া গেল, তাহার কথা স্মরণ করিয়া আমি মনে মনে কাঁটা হইয়া রহিলাম,—স্বপ্নালোকের সেই কুৎসিত নারী যে বিড়ালের থাবার কাজ করিতেছে এই আশঙ্কায় আমার মনে আর শান্তি রহিল না!

কলেজে যাওয়ার সময় বাড়ীটার দিকে চাহিয়া আজ যেন আবার তাহার নূতন মূর্ত্তি দেখিলাম,—সে মূর্ত্তি নিরতিশয় লজ্জার, দুঃসহ বেদনার,—সমস্ত সহরের লোকের যেন ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নাই,—এই গৃহের লোক গুলাকে যেন সকলে মিলিয়া 'লিঞ্চ্' করিবে। ভাবিলাম, কেমন করিয়া ইহারা বাঁচিয়া আছে,—কেমন করিয়া ইহারা দিন কাটায়, কেমন করিয়াই বা ইহাদের চোখে ঘুম আসে! কিন্তু বেশীক্ষণ ওই গৃহের দিকে তাকাইয়া থাকিতে সাহস হয় না,—রক্ত-মাংসের আহ্লাদী যদি ভাগ্য-বিড়ম্বনায় সত্যই আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে যে নিমেষ মধ্যে আমি পাষাণে রূপান্তরিত হইয়া যাইব ইহা যেন অবধারিত। অতএব এতদিনের মধ্যে আজই সর্ব্বপ্রথম ভিন্নদিকে চাহিবার চেষ্টা করি, এবং গাড়ী পথ অতিক্রম করিতে থাকে।

অধ্যাপক কহিলেন, "জগদীশ, তোমার জন্য একটা ভালো চাকুরী জুটিয়েছি,—এ্যাডভাইজিং কেমিষ্টের কাজ, বিকেলবেলা গিয়ে ঘণ্টা তিনেক দেখাশোনা করলেই হ'বে, শ' দেড়েক টাকা মাইনে,—রাজী আছ ত?"

বলিলাম, "এক্ষুণি স্যার্,—বাবার পেন্‌শানের উপর আর কতকাল বোঝা হ'য়ে থাক্‌ব?—কিন্তু চাকরীটা কোথায়?"

"আমারই এক পরিচিত লোক অবশ্য পরিচয় অত্যন্তই অল্প,—একটা ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল কন্‌সার্ণ গোছের কর্‌বার মতলবে আছি,—টাকাওয়ালা মানুষ,—একজন ভালো ষ্টুডেণ্ট্ চায়, ওর অন্য কেমিষ্টদের পরামর্শদাতা হিসেবে,—আমায় বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে গিয়েছে,—তোমাকে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিতে পারি, কিন্তু তার আর দরকার নেই, কাল এসো আমার বাড়ী,—নিজেই নিয়ে যাব'খন, একটু জোরও হবে তাতে। আমায় ভালো করে' বুঝিয়ে দিয়ে গেছে বাড়ীটা কোথায়, কিছু অসুবিধে হ'বে না।"

—পরদিন সকালবেলা অধ্যাপকের গৃহে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার গাড়ীতে গলির পর গলি অতিক্রম করিয়া যখন বাড়ীটার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন আমার হৃৎস্পন্দন থামিয়া গেছে। ষোল নম্বর গৃহের সম্মুখে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া অধ্যাপক ডাকিলেন, "এস জগদীশ—" বলিয়া উন্মুক্ত দ্বারপথে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আমি পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় সেই রাস্তার 'পরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। এই গৃহের সকল কাহিনী মনে পড়িল, সর্ব্ব গ্লানি, সকল কদর্য্যতার কথা,—সোপানপ্রান্তবর্ত্তিনী বধূ তিনটি চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের পিছনে আসিয়াছে আহ্লাদী!

আমার মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলিতে থাকে, থাকিয়া থাকিয়া পায়ের নখ হইতে কেশাগ্র অবধি একটা অজ্ঞাত শঙ্কায় শিহরিয়া ওঠে। মনে হয় বারেক যদি ওই গৃহে প্রবেশ করি তাহা হইলে সৌভাগ্যক্রমে যদি আর কিছু না-ও ঘটে তাহা হইলেও আহ্লাদী আমায় পূরাপূরি গিলিয়া খাইবে!—উল্লসিত হইয়া উঠিবার মত সম্ভাবনা বোধ করি ইহা নহে।

অধ্যাপকের গাড়ীর ড্রাইভার আমার দিকে বিস্মিতনেত্রে একদৃষ্টে চাহিয়া কি যে ভাবে সে-ই জানে। কিন্তু তাহার ভাবভঙ্গী ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিতেছে, লোকটার চোখে মুখে নির্লজ্জ কৌতূহলের চিহ্ন। একবার মাত্র সেই দিকে তাকাইয়া মানুষ যেমন করিয়া আত্মহত্যা করিবার জন্য সহসা আগুনে ঝাঁপ দিয়া বসে, ঠিক তেমনই করিয়া ওই অভিশপ্ত গৃহের উন্মুক্ত দ্বারপথে মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় ছুটিয়া প্রবেশ করিলাম।

শ্রীআশীষ গুপ্ত

# সমস্ত কাজের অবসরে—

শ্রীমতী কল্পনা দেবী

সমস্ত কাজের অবসরে—
একান্তে নিরালা প্রান্তে এই ছোট ঘরে
তোমায় আমায় দেখা,—বন্ধন বিহীন
ব্যবধান স'রে যায় ;—অনন্ত অসীম
বিস্তৃতা বিপুলা ধরা—তারি' এক কোণে
আসন পাতিয়া রাখি,—সেটুকুর সনে
আর কারো যোগ নাই।
অন্যপ্রান্তে তার
ধরণীর সুখ দুঃখ ক্ষুব্ধ হাহাকার
তরঙ্গিত হয়ে ওঠে ;—সে কাঁপন শুধু
বাহিরে মর্ম্মরি' ফেরে—লাগে নাকো বঁধু
অন্তরের পদ্মদলে। একা সে মন্দিরে
আমি শুধু পূজারিণী ; ওই—ঘুরে ফিরে
সংসারের শতঝঞ্ঝা নিষ্ফল আক্রোশে
নিয়ত খুঁজিয়া মরে—একান্ত নিঃশেষে
লুপ্ত করি দিতে চায়—নিতে চায় হবি'
সমস্ত দিবস মোর—সমস্ত শর্ব্বরী
আপনার মুষ্ঠি তলে!

তাই ভয়ে ভয়ে—
পলাইয়া আসি এই গোপন নিলয়ে
জগতের আঁখি আড়ে ; হেথায় বাতাস
আনে খোলা বাতায়নে মুক্তির নিঃশ্বাস
আনে স্বস্তি নির্ভরতা, যেন মনে হয়—
'আজো আছি বেঁচে আছি, হইনিকো লয়
সংসারের চক্রতলে।' হেথা বাতায়নে
নিস্তব্ধ বসিয়া থাকি—মৃদুল স্বপনে
কাঁপে বায়ু—কাঁপে পাতা ; ওই দূরে গাছে
সবুজের বুকে বুকে স্বপ্ন রচিয়াছে
বিচিত্র রক্তিম ফুল ; সমুখে আমার
বিসর্পিত পথরেখা—শেষ প্রান্ত তার
কে জানে থেমেছে কোথা!

সেথায় কি তব—
ত্রিদিব বাঞ্ছিত পুরী—নিত্য অভিনব
সৌন্দর্য্যের রাজধানী ? সে কি বসন্তের
বিচিত্র উদয়াচল,—সেই কি অস্তের
শান্তিময় স্নিগ্ধ নীড় ?
প্রশ্ন জাগে মনে,—
থেকে থেকে স্বপ্ন টুটে—কিসের গুঞ্জনে
চমকি ফিরিয়া চাই ;—কার পদধ্বনি
কাণে কাণে দিয়ে যায় নূপুর রণণি
আশার সে পূর্ব্বাভাস !

মরি—মরি—মরি
এ তোমারি ফুল-গন্ধি রঙিন উত্তরী
ছুঁয়ে গেল এলো চুলে ; আর ভুল নয়—
এসেছ এসেছ তুমি তারি পরিচয়
সর্ব্বাঙ্গে ভরিয়া গেল।
মোর রাত্রি দিন
এই অনুভূতি করে মধুর রঙিন্
জীবনে বৈচিত্র্য আনে—সংসার ভোলায়
আশার আশ্বাসে নিত্য ব্যথারে রঙায়।

কল্পনা দেবী

# পরশমণি

শ্রীমতিলাল সেনগুপ্ত, এম্-এস্-সি

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা এমন একটি যুগের সহিত পরিচিত হই, যে যুগে জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতগণ জ্ঞানে, বিচারে এবং বুদ্ধিতে সম্যক্ উন্নত হইয়াও একটা মিথ্যা হেঁয়ালির রহস্যজালে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই রহস্যময় যুগ কবে কোন্ দেশে কি কারণে প্রারব্ধ হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন, তবে ইহা নিশ্চিত বলা যায় যে প্রতি দেশেই এই যুগের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রথা বিচার করিলে দেখা যায় যে ভাবের আদান-প্রদানই অধুনাতন জ্ঞান চর্চ্চার পরম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সেই যুগে, (যাহার সন তারিখ দিয়া ইতিহাস মিলাইবার পথ রুদ্ধ,) পরম পণ্ডিতগণও অপরাপর পণ্ডিত হইতে নিজের শ্রমলব্ধ জ্ঞান গোপন করিয়া বিশিষ্টতা বা শ্রেষ্ঠতা অর্জ্জন করিতে প্রয়াসী ছিলেন। আজকাল ভাবের আদান-প্রদানই জ্ঞানবিকাশের শ্রেষ্ঠ নিয়ামক; কিন্তু প্রাচীন যুগে ইহাই ছিল শ্রেষ্ঠ পরিপন্থী। ফলে, জ্ঞানচর্চ্চার মূলে যে সব হিংস্র অনুষ্ঠান, যে সকল লোমহর্ষণ ষড়যন্ত্র ও যে সকল নিষ্ঠুর নরহত্যার অভিনব লীলা চলিতেছিল, রসায়নের ইতিহাসে তাহা বাস্তবিকই ভয়ানক।

P 35,986

সভ্যতা যেমন একই সময়ে সকল দেশে আত্মবিকাশ করে নাই, সেই রহস্যময় জ্ঞান-চর্চ্চার যুগেরও একই সময়ে সকল দেশে আবির্ভাব হয় নাই। ইউরোপীয় রসায়নে ইহার নাম Alchemical Era এবং ইহারই ভারতীয় নাম তান্ত্রিক যুগ। Alchemy ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠান বা তন্ত্র একই জিনিষ বা বিদ্যা কিনা, ইহাতে মতভেদ থাকিতে পারে; তবে এই দুইটীরই লক্ষ এক,—এই হিসাবে এই দুইটীকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে।

কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য রসায়ন, এই দুইটীরই জাতচক্র যদি মিলাইয়া দেখা যায় এবং দুটীরই শৈশবের ইতিহাস একটু তলাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে অতি পুরাকালে এই রসায়নী বিদ্যা বনচারী ঋষি ও সঙ্গত্যাগী ধর্ম্মযাজকদের একটা গোপন বিদ্যা ছিল। কি উদ্দেশ্যে বা কি প্রচেষ্টায় তাহারা এই বিদ্যার অনুশীলন করিতেন, তাহা একবাক্যে আজকাল বিদ্বজ্জন স্বীকার করিয়া থাকেন যে সেই উদ্দেশ্য বা চেষ্টা ছিল সুধু অমৃতের বা Elixir of life-এর সন্ধান। ভারতীয় সেই সব ঋষিগণকে তান্ত্রিক এবং ইউরোপীয় ধর্ম্মযাজকগণকে Apothecary বলা হইত। সেই পরম ভেষজের সন্ধান কখনও মিলিয়াছিল কিনা, জানা যায় না, কারণ সেই সব তন্ত্র গ্রন্থ লুপ্ত বলিয়াই অনেকে মনে করিয়া থাকেন এবং যাহাও বা পাওয়া যায়, তাহা হইতেও নাকি কোনও রূপ সার সংগ্রহ করা যায় না। তবে এই একটী সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় যে, সেই পরম ভেষজের সন্ধান না পাইলেও তৎকালীন পণ্ডিতেরা এমন কিছুরও একটা সন্ধান পাইয়াছিলেন যাহা মানুষকে অমৃতত্বে না নিতে পারিলেও মৃত্যুর অকাল অবিচার হইতে রক্ষা করিয়া চিরযৌবন সুখ সহ মানুষকে বহুবর্ষ পৃথিবীতে বিচরণ করিবার সুযোগ দান করে। সেই মহদ্দ্রব্য আজ লুপ্ত। সন্দিগ্ধ আধুনিকদের মতে ইহা কল্পনা বা নিছক গাঁজাখুরি। সে যাহাই হোউক্, আজকাল যাঁহারা বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ইতিহাসের সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা হয়ত এই কল্পনাকে উপহাস করিতে চাহিবেন না। তান্ত্রিকদের সেই পরমৌষধির সমসাময়িক আর একটী মহদ্দ্রব্যের গুণগান আমরা বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, ইহাও তন্ত্র বা মন্ত্রবাদীদের কল্পনা প্রসূত কিনা ইহা লইয়া বহু বিচার হইয়াছে এবং এখনও

চলিতেছে। এতদ্ প্রবন্ধে সেই পরম পদার্থটীর গুণগান করিব। এই পদার্থের নাম পরশমণি বা Philosopher's stone। এই মহাপদার্থের নাম হইতেই সেই সুদূর রহস্যময় যুগের নাম তান্ত্রিক যুগ বা Alchemical Era। এই স্থলে নিতান্ত প্রাসঙ্গিক না হইলেও বলা প্রয়োজন যে ভারতীয় তান্ত্রিক যুগ ইউরোপীয় Alchemical Era হইতে বহু সুপ্রাচীন এবং বস্তুতঃ ইউরোপীয়েরা এই তান্ত্রিক মত আরবদের মধ্যস্থতায় গ্রীক্‌দের নিকট হইতে ধার করে এবং আরবেরা যে ভারতীয় তান্ত্রিক হইতে সেই সব তন্ত্র মত সংগ্রহ করিয়াছিল, রসায়ন ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে। ইহা হইতে সম্পূর্ণ প্রতীত হইবে যে ভারতীয় তন্ত্র ও ইউরোপীয় Alchemy একই বিজ্ঞান,—নিতান্ত নিকট অধস্তন জ্ঞাতি। বাস্তবিক পক্ষে আল্‌কেমির প্রথা ও তন্ত্রানুশীলন যে একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইহা অতি সহজেই প্রতিপন্ন করা যায়।

Alchemy সম্বন্ধে অনেক ইউরোপীয় লেখক লিখিয়াছেন —'Alchemy appears to have been a medieval system of philosophy and it sought to demonstrate the validity of its doctrines concerning the cosmos by transmuting the baser metals into gold.' এই উক্তি হইতে সহজে প্রতিপন্ন হয় যে ভারতীয় তন্ত্র Alchemy হইতে কতক বিভিন্ন। কারণ তন্ত্রশাস্ত্রে অন্যূন ১৫৬টী বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত, তন্মধ্যে 'বস্তুবিচার'টিকেই Alchemy সদৃশ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অধিকন্তু ভারতীয় তন্ত্রের প্রতিপাদ্য অনেক বিষয়ই নিছক কথার আড়ম্বর নয়,—ইহার মধ্যে বহু সত্য আছে, যাহা আধুনিক রাসায়নিক প্রণালী দ্বারাও প্রমাণ করা যায়। কিন্তু Alchemy সম্বন্ধে ইহা খাটেনা, সেই জন্যই ইউরোপীয় প্রাচীনগণের নৈরাশ্যপূর্ণ উক্তি যথা :—'There were many deceivers, but no true philosophers.' ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে N. Lemery লিখিয়া গিয়াছেন :—'They professed an art, the beginning of which was deceit, the progress of which was falsehood and the end beggary. ভারতীয় কোনও তান্ত্রিক লেখক্‌কেই কোন ভারতীয় charlatan বা imposter বলিয়া অপবাদ দিতে সাহসী হন নাই বা হইবেন না। অতএব তন্ত্র যে Alchemy হইতে শ্রেষ্ঠ ইহা সহজেই অনুমিত হয়।

কি প্রাচ্যে, কি প্রতীচ্যে, সবদেশেই পৌরাণিক দার্শনিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে জড়পদার্থ পঞ্চভৌতিক—পাঁচটী ভূত বা 'ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্‌ব্যোমঃ' ইত্যাদি করিয়া পাঁচটী different element দ্বারা জড়-পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। এই উক্তি অকাট্য কিনা, ইহার বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন; তবে আধুনিক মতবাদ এই যে জড়পদার্থ একই Element-এর বিচিত্র বিবর্ত্তন দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে। ইহাকে বলে Unitary theory of matter। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রাচীন তান্ত্রিকেরা কি এই মতবাদের উপর নির্ভর করিয়া ধাতুর অবস্থান্তরাপত্তি বা Transmutation of metals এই মতবাদের প্রচার করিয়াছিলেন? বিশেষজ্ঞদের মতের উপর নির্ভর করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, 'The idea did not originate from the philosophical views of the ancients on the unity of matter, but rather from the attempts of goldsmiths to make fraudulent substitutes for the precious metals.' অধুনা পরশমণির অস্তিত্ব বিদ্বজ্জনমাত্রেই অস্বীকার করেন এবং কখনও যে ইহা ছিল, ইহার যথেষ্ট প্রমাণাভাব আছে। কিন্তু পরশমণির কল্পনা প্রাচীনদের মনে এত বদ্ধমূল হইয়াছিল যে বস্তুজগত ছাড়াইয়া ইহা মানুষের মনোজগতেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং এখনও করিতেছে। পরশমণি নামক মহামণির সংস্কার প্রভাব প্রাচীন গ্রাম্যকবিদের পাঁচালীতে দৃষ্ট হয় এবং অধুনাতন এক গ্রাম্য বাউলের মুখের একটি ছড়া এই :—

"সে হয়েছে মানুষরতন সব থুয়ে যার কিছু নাই।
পরশমণি, সরসধনি, প্রেমসাগরে খেল্‌ছে সাই॥"

যাহা হউক, পরশমণি বলিয়া যে কোন বাস্তব পদার্থ ছিল না, ইহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। তাই

পরশমণির যাথার্থ্য সম্বন্ধে কবির এই উক্তিটুকুই যথেষ্ট—
'ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ-পাথর'।

এখন নিকৃষ্ট ধাতুকে উৎকৃষ্ট ধাতুতে রূপান্তরিত করা— এই ধারণা প্রাচীনদের মনে কি ভাবে আসিল, ইহার আলোচনা করা যাক্। খনিজ সীসক ধাতুর সহিত স্বর্ণ বা রৌপ্য আংশিক ভাবে বিদ্যমান থাকে। যখন খনিজ সীসক ধাতুকে গলাইয়া বা অন্য কোনও রূপ প্রক্রিয়া দ্বারা সীসক ধাতুতে পরিণত করা যায়, তখন সীসকের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রৌপ্য বা স্বর্ণের টুক্‌রা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনগণ এই তথ্যটুকু অর্থাৎ খনিজ সীসক ধাতুতে (Lead ores) যে রৌপ্য ও স্বর্ণ সংমিশ্রণ থাকিতে পারে ইহা জানিতেন না, তাই তাহারা মনে করিয়াছিলেন, ধাতব সীসকেরই একটী অংশ বুঝি সেই প্রক্রিয়ার ফলে রৌপ্য বা স্বর্ণে পরিণত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, লোহার বাসনকে তাম্রখনিতে কিছুদিন রাখিয়া দিলে দেখা যায় যে লোহার বাসনটীর উপরে তামার ছাউনি বা আবরণ পড়িয়াছে। প্রাচীনগণ এই Electro deposition বা ধাতু পদার্থের বৈদ্যুতিক ন্যাস সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না, তাই তাহারা মনে করিতেন যে লোহার বাসনটী বুঝি খনিতে রাখায় তাম্রপাত্রে পরিণত হইয়া গেল। এই রূপান্তর প্রাপ্তি দর্শন করিয়াই প্রাচীনগণ সিদ্ধান্ত করিলেন যে বোধ হয় বিশেষ কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে নিকৃষ্ট ধাতুকে উৎকৃষ্ট ধাতুতে রূপান্তরিত করা যায়। ফলে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উদ্ভব হইল,—জপ, মন্ত্র, হোম ইত্যাদির সাহায্যে সেই তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সিদ্ধি লাভের চেষ্টা হইল। সেই দুঃসাধ্য তান্ত্রিক সাধনার ফল কি হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ তন্ত্রশাস্ত্র হইতে উদ্ধার করা যায়। ইহা অবলম্বন করিয়া কিছুদিন আগে প্রবাসীতে 'স্বর্ণ' শীর্ষক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে শ্রীজগদ্বন্ধু মুখোপাধ্যায় মহাশয় যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। যে সমস্ত দুরূহ তান্ত্রিক সাধনার উল্লেখ ঐ সব তন্ত্র সংহিতায় আছে, তাহা পুনরায় উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করিতে চাহি না। তবে তাহাতে প্রাচীনেরা কি পরিমাণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমানের মাপকাঠীতে এবং বর্ত্তমান ঋষিদের আয়ত্তাধীন প্রচেষ্টার তৌলদণ্ডে তাহার গুরুত্ব যে খুব বেশী নয়, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

যদি পৌরাণিকগণের প্রতি সুবিচার করিতে হয়, তবে তাঁহাদের দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণ বিচার ক্ষমতার প্রশংসা করিতে হয়। দেবাদিদেব মহাদেব কিম্বা ঋষি দত্তাত্রেয়, এই দুই মহাপুরুষ যদি বাস্তবিকই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক রাসায়নিক হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের উক্তি হইতে দেখা যায় যে তাঁহারা তাম্র, লৌহ, পারদ এই কয়টী ধাতুকেই তন্ত্র, মন্ত্রাদির সাহায্যে সুবর্ণে পরিণত করিবার প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অধুনাতন বিজ্ঞানের ধ্রুবজ্যোতি যাঁহাদের চক্ষে পতিত হইয়াছে, তাঁহারা বাস্তবিকই বিস্মিত হইবেন যে পৌরাণিক রাসায়নিকগণ কোন্ বিদ্যাবলে তাম্র, লৌহ ও পারদকে সুবর্ণে রূপান্তরযোগ্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং অন্যান্য ধাতুগুলিকে কেন অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। নিশ্চয়ই তাঁহারা তাম্র, লৌহ কিম্বা পারদকে কোন না কোন অংশে সুবর্ণের সমধর্ম্মী বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। মৌলিক পদার্থের শ্রেণী বিভাগ বা periodic law of elements এবং আনবিক্ গঠন বা Atomic structure এর সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতিক্রমে দেখিবেন যে উক্ত শ্রেণী বিভাগে তাম্র, পারদ, রৌপ্য ও সুবর্ণ একই শ্রেণীভুক্ত ও বহু অংশে সমধর্ম্মী। তাম্র প্রদীপ-শিখায় পুড়াইলে লোহিতশিখা বিকীরণ করে,—স্বর্ণের শিখা হরিদ্রাভ হয়। প্রাচীনেরা লোহিতকে হরিদ্রা বর্ণে পরিবর্ত্তিত করিবার প্রক্রিয়া জানিতেন, সেই জন্যই তাম্র স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। অধুনাতন বর্ণচ্ছত্র দ্বারা ধাতু বিশ্লেষণ (Spectrum Analysis) কার্য্যের সহিত ইহার সুসামঞ্জস্য অনুভব করিলে আমরা তান্ত্রিক প্রথাকে একেবারে হেয় চক্ষে দেখিতে পারি না।

আজ পর্য্যন্ত যে সকল ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইউরেনিয়াম নামক ধাতুই সবচেয়ে ওজনে ভারী। ইহা আর একটী আশ্চর্য্য গুণ এই যে ইহা স্বতঃই রশ্মি বিকীরণ পূর্ব্বক ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ক্ষয়প্রাপ্তির কয়েকটী বিভিন্ন স্তর আছে ও এক স্তর হইতে অন্য স্তরে যাইতে একটী নির্দ্দি

সময়ের প্রয়োজন হয় এবং সেই সেই বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধাতুর সৃষ্টি হয়। রেডিয়াম ও থোরিয়াম্ নামক দুইটী মহদ্ধাতুরও সেই রকম স্বতঃ ক্ষয় হয় এবং ফলে অন্যান্য ধাতুর সৃষ্টি হয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে ইউরেনিয়াম ধাতু নিম্নোক্ত প্রকারে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নিকৃষ্টতর নিম্নতর ধাতুর সৃষ্টি করে।

ইউরেনিয়াম —— ইউরেনিয়াম (ক, খ) — ইউরেনিয়াম ২ ——. আয়োনিয়াম —— রেডিয়াম—— ——রেডিয়াম (ক—খ,——গ——ঘ——ঙ——চ) —— রেডিয়াম ছ

রেডিয়াম ধাতু নিজেও সেই প্রকার স্বতঃ ক্ষয়ের ফলে রেডিয়াম ছ তে আসিয়া পর্য্যবসিত হয়।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে রেডিয়াম ছ আর সীসক ধাতু একই পদার্থ ও সমধর্ম্মী,—কেবল মাত্র খনিজ সীসক ধাতু ও ইউরেনিয়াম বা রেডিয়ামের নিকৃষ্টতম নিম্নতম জাতি সীসক ধাতুর গুরুত্বের একটু অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। উল্লিখিত ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি চিহ্নিত ধাতু সকলেরও সমধর্ম্মী অন্যান্য ধাতু প্রাকৃতিক জগতে বিদ্যমান আছে এবং পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে সম্পূর্ণই প্রতীত হয় যে ধাতুর অবস্থান্তর বা রূপান্তর সংঘটন প্রকৃতির গর্ভে স্বভাবতঃই হইতেছে এবং কি উপায়ে বা কি প্রক্রিয়ায় ইহার সংঘটন হইতেছে, ইহা মানুষ শত চেষ্টায়ও আজ পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই এবং কখনও জানিবে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মানুষ অনাগত কাল পর্য্যন্ত সেই পরশমণির আশায় প্রাণপাত করিবে, কিন্তু শত লক্ষ প্রাণের বিনিময়েও সেই মহামণি মানবের করায়ত্ত হইবে কিনা কে জানে।

কিছুদিন পূর্ব্বেও ধাতুর অবস্থান্তরাপত্তি বৈজ্ঞানিকের চেষ্টায় সংঘটিত হইয়াছে, এইরূপ দুঃসাহসিক উক্তি শুনিয়াছি। নিম্নে সেইগুলি লিপিবদ্ধ করিতেছি। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ক্যামারণ ও র্যামসে নামক ইংরেজ বৈজ্ঞানিকদ্বয় তাম্রকে লিথিয়াম ও সোডিয়াম ধাতুতে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন,—কুরী ও গ্লেডিস্ নামা বৈজ্ঞানিকদ্বয় ইহার অসত্যতা প্রমাণ করেন, তাঁহারা বলেন, যে পাত্রে এই ক্রিয়া সংঘটিত হয়, সোডিয়াম উহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। র্যামসে সাহেবের অনুরূপ আবিষ্কার যথা—রেডিয়াম রশ্মি হইতে নিয়ন (Neon) নামক গ্যাসের উৎপত্তি, রাদারফোর্ড ও রয়েড অস্বীকার করেন,—তাঁহারা যন্ত্র মধ্যস্থ বায়ু হইতে Neon এর উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করেন। রেডিয়াম রশ্মি দ্বারা থোরিয়াম ও জারকোনিয়াম (Thorium and Zirconium) দ্রব হইতে র্যামসে সাহেব অঙ্গারক গ্যাসের সৃষ্টি করেন, ইহাও রাদারফোর্ড কর্তৃক অস্বীকৃত হয়—যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত Lubricant হইতেই ইহার উদ্ভব বলিয়া ইনি অনুমান করেন। ১৯১৩ সালে র্যামসে হাইড্রোজেনকে Neonএ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া প্রচার করেন, Curie ও Patterson বৈজ্ঞানিকদ্বয়ের দরবারে ইহার অসত্যতাও প্রমাণিত হয়। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে ধাতু হইতে ধাত্বান্তর প্রাপ্তি মানুষের সাধ্যায়ত্ত কর্ম্ম নহে। ইহার কল কৌশল প্রকৃতি নিজের হাতেই রাখিয়াছেন। সেই জন্যই Francis Bacon লিখিয়াছেন—Nature to be conquered must be obeyed.

পরিশেষে জিজ্ঞাস্য এই যে, পরশমণির দুরাশায় মানুষ যে যুগযুগান্ত ধরিয়া এই পণ্ডশ্রম করিয়া আসিয়াছে, ইহাতে মানবজাতির কিছু লাভ হইল কি? একজন বৈজ্ঞানিক এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছেন যে, এই যুগান্তর ব্যাপী সাধনার ফলে আমরা যে জানিতে পারিয়াছি যে মৌলিক পদার্থ (Elements) সকল একই আদি পদার্থ হইতে উদ্ভূত এবং তাহাদের একের অন্যের সহিত একটী গূঢ় সম্বন্ধ আছে—ইহাই যথেষ্ট। The spiritual part of Alchemy lives, though Alchemy is dead.

শ্রীমতিলাল সেনগুপ্ত

# ভারতের শিল্প ও শিল্পী

শ্রীসুধাংশু চৌধুরী ( লণ্ডন )

ভাবতবর্ষের সুকুমার শিল্পের পুষ্টি লাভ করার এক কারণ হ'চ্ছে সমাজের উপর ধর্ম্মের বিশেষ প্রভাব। কিন্তু এদেশের কল্পনা-প্রিয় শিল্পীবা কেবল যে ধর্ম্ম নিয়েই মেতে থাকৃত' তা নয় তাদের মনের গভীর যোগাযোগ ছিল প্রকৃতির সঙ্গে। সকল দেশেরই শিল্পের মূলতত্ত্ব হ'চ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরের রহস্যকে প্রকাশ করা, হুবহু নকল করার চেষ্টা কোন দেশে কোন কালে উচ্চাঙ্গের শিল্প ব'লে স্বীকৃত হয়নি। ভারতের রূপ-রসিকরা শিল্পের সেই মহৎ আদর্শ চিরকাল আঁকড়ে ছিল কারণ শিল্পই ছিল তাদের প্রাণ, নিজেদের অন্তরের ক্ষুধা মিটাবাব জন্যই তারা ক'রত সৃষ্টি, লোকসমাজের বাহবা কিংবা তাদের খেলো চাহিদা মিটাবার দিকে তাদের লক্ষ্য ছিল না।

প্রতীচ্যেব শিল্পীবা ছিল মুখ্যতঃ বস্তুতন্ত্রবাদী, ফলে তাদের উপর বৈজ্ঞানিক প্রভাব বিশেষ ভাবেই বিস্তার করে। সেজন্য কল্পনা সেখানে হ'য়েছিল আড়ষ্ট, মাছিমারা কেরাণীর মতই তারা সারা জীবন নিখুঁত ভাবে প্রকৃতির বাহ্যিক রূপের নকল করেছে—বাস্তব জগতের ঊর্দ্ধে তাদের মন উঠবার চেষ্টা করেনি। কি ক'রে রঞ্জন, পরিপ্রেক্ষা, আলোছায়া প্রভৃতি শিল্পের বৈজ্ঞানিক দিক নিখুঁত ভাবে তাদের কাজের ভিতর ফোটাতে পারবে এই ছিল তাদের চেষ্টা, সেই জন্য আদর্শ ও ভাব থেকে তারা স্বভাবতঃ পড়্‌ত' পেছিয়ে।

ভারতের শিল্পীরা মন দিয়েছিল অন্য দিকে, তার প্রমাণ—তারা দেবতাকে প্রকাশ ক'রেছিল তাদের ধ্যান ও অনুভূতি দিয়ে, মানুষকে নকল ক'রে কোনদিন তারা ভগবানের রূপ দেয়নি; বুদ্ধের মূর্ত্তি, মঞ্জুশ্রী, সুন্দরের মূর্ত্তি, নটরাজ প্রভৃতি মূর্ত্তির ভিতর দিয়ে সাধারণ লোক ও দেবতার তফাৎ বুঝাতে চেষ্টা ক'রেছে। কিন্তু গ্রীক বা রোমান যুগের মিনার্ভা, ডায়ানা, জুপিটারের মূর্ত্তির ভিতব ও-দেশেব শিল্পীরা সেই দেবত্ব দিতে পারেনি, সেখানে রক্তমাংসের গন্ধ আছে, সাধারণ মানব মানবীর সঙ্গে তাদের কোনই প্রভেদ নাই। কিন্তু বুদ্ধের মূর্ত্তির দিকে চাইলে যে কোন লোক ব'লতে পারবে যে, উহা মহামানবেব প্রতিমূর্ত্তি। ধ্যানী বুদ্ধের গাম্ভীর্য্য, বিরাটত্ব ও অতিমানবত্বেব চিহ্ন শিল্পীর কারিগরী দিয়ে প্রকাশ ক'রতে হয়নি, শিল্পী তার ধ্যান ধারণার প্রতিমূর্ত্তি সহজ ও অনাড়ম্বর ভাবে ধরতে চেষ্টা ক'রেছে প্রাণের সমস্ত অনুভূতি ও বিশ্বাস দিয়ে, তার আদর্শ হ'চ্ছে তার মনে, বাস্তব জগতের আবিলতাময় আবহাওয়ার কোন সৃষ্টির সঙ্গে তার মিল নাই, তার অন্তরের মণিকোঠায় যে সুন্দরকে সে পূজা করে তারই ছবি ফুটিয়ে তোলে।

সৌন্দর্য্য কখনও কোন বিশেষ জায়গায় আবদ্ধ থাকতে পারে না বা সৌন্দর্য্য ব'লে বিশেষ জিনিষ নেই আমাদের দেশের শিল্পের ধারণা এই ছিল। সৌন্দর্য্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক, তার বিস্তার অসীম, সেইজন্য যাদেব কেবল আধ্যাত্মিক দৃষ্টি আছে তারা সেই অপরূপ রূপের দর্শন পায়। আমাদের দেশের শিল্পীরা ছিল সাধক, তারা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে রহস্যময়ী প্রকৃতির প্রতিমার রূপের সেবা ক'রেছিল। সেই সেবা ও সাধনার উপলব্ধি আজও অজন্তা, ইলোরা, কোনারক, মাদুরা, নালান্দা, বোধগয়া প্রভৃতি জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে।

আধুনিক যুগে শিল্প হচ্ছে বিলাসের বস্তু, কিন্তু প্রাচীন ভারতে শিল্প ছিল ধর্ম্মের ভিত্তি, সামাজিক জীবনের একটী অতি আবশ্যকীয় অঙ্গ। সেজন্য দৈনন্দিন জীবনের উপর শিল্পের প্রভাব ছিল অত্যন্ত নিবিড়। বাড়ীর দরজায় আলপনা, ছেঁড়া কাঁথার উপর সূচি শিল্প, সিঁদুর-চুপড়ী

বরণ ডালা, বিনা সূতার মালা গাঁথা প্রভৃতি বহু ছোট খাট জিনিষের ভিতর দিয়ে আমাদের দেশের লোকের সৌন্দর্য্যবোধের প্রগাঢ়তা সহজেই বোঝা যায়।

ভারতের শিল্প ছিল ব্যঞ্জক, ভারতের শিল্পীরা কোন দিনই মনের ভাব নট-নটীর ভাবের অভিব্যক্তির মত প্রকাশ করবার চেষ্টা করেনি। সহজ সরল রেখায় তারা তাদের প্রেরণার ছবি, শিশুর সরল মনের ভাবের প্রকাশ করেছে, সেখানে তাদের ভাবের গভীরতার সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। শিল্প-নৈপুণ্যেও তারা কোন ক্রমেই হেয় ছিল না, তাদের শক্তি ছিল অসীম কিন্তু খুব সংযত ভাবেই তারা তাদের নিপুণতা ব্যক্ত করেছে, কোন রকম শক্তির অপব্যবহার না ক'রে।

কোনারকের সূর্য্যমন্দির, গোপুরম, আবু পর্ব্বতে জৈন মন্দির, খাজুরাহে বিষ্ণুর দেউল, সাঁচীর স্তূপ, ভারুত অমরাবতীর স্থাপত্য, সারনাথের বৌদ্ধমঠ তাদের শ্রেষ্ঠ রচনার ও নিপুণতার অপূর্ব্ব নিদর্শন। প্রাচীন ব্যাবিলন, মিশর, পার্শিপলিস গ্রীক, রোমান প্রভৃতি বৃহৎ সভ্য দেশের শিল্পের দানের পাশে ভারতের দান কারুর চাইতে বড় না হ'লেও, একটুও ছোট নয়।

পশ্চিমের সভ্যতার চশমা প'রে ভারতের অন্তরকে বোঝা যেমন শক্ত তেমনি ভারতীয় শিল্পের মূল সূত্রকে উপলব্ধি করা আরও অসম্ভব। প্রাচ্যের শিল্পকলার প্রাণতন্ত্রী অতি সূক্ষ্ম, বস্তুতন্ত্রবাদীদের বৈজ্ঞানিক ঠুলি লাগান-চোখে তার অস্তিত্ব ধরা পড়ে না, তাদের অনুসন্ধিৎসু মন সব সময় সব জিনিষের মানে কারণ জানতে চায়, অনুভূতি দিয়ে অনুভব ক'রতে তারা নারাজ।

আজকালকার দিনের অনেক সমালোচক ভারত শিল্পের অঙ্কন-প্রণালীকে ভুল প্রমাদপূর্ণ বলে থাকেন। তাঁদের প্রথম দৃষ্টান্ত হচ্ছে ভারতের ছবি ও মূর্ত্তির লম্বা লম্বা হাত পা এবং পরিপ্রেক্ষা সম্বন্ধে অজ্ঞানতা। ইউরোপীয় অঙ্কন প্রণালীর মত দ্রষ্টব্য বস্তুকে হুবহু নকল তারা করত না ব'লে যে তাদের নকল করবার শক্তি ছিল না, এটা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বীকার ক'রবে না। আমার মনে হয় আমাদের দেশের শিল্পীরা চর্ম্ম চক্ষে সাধারণত যতটুকু দেখতে পেত তার চাইতে অনেক দূরে যেতে চাইত, তাদের কাছে বাহ্যিক আবরণের মূল্য চিরকাল খুব কমই ছিল, তাঁরা চাইত অন্তরের ছবিকে মূর্ত্ত ক'রতে, যা কৌশল বা নিপুণতার জালে ধরা পড়ে না।

মধ্যযুগে ইটালিয়ান কলাশিল্প যখন উন্নতির উচ্চ সোপানে, তখন বাস্তবতার প্রভাব শিল্পীদের মনে খুবই কম ছিল। ডোনা টেলো, বটি-চেলি, ফ্রা আঞ্জেলিকো প্রভৃতি ইউরোপের নবজাগরণ (Renaissance) যুগের বিখ্যাত অমর শিল্পীদের কাজের ভিতর কল্পলোকের ও ভাবের ঐকান্তিক খেলা বেশী দেখা যায়। প্রাচ্যের শিল্পীদের মত কলা-কৌশল ও নিপুণতাও তাদের কাছে গৌণ উদ্দেশ্য ছিল, অন্তরের ভাব ফুটিয়ে তোলাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। কৌশলের দিক থেকে তারা অপটু থাকতে পারে বটে কিন্তু তাদের কাজের ভিতর সেজন্য মর্ম্মস্পর্শী ভাবের অভাব ঘটত না। সাধনার উপলব্ধি একমাত্র সাধকই সহজে প্রকাশ ক'রতে পারে, তার জন্য তার ভড়ঙের দরকার করে না, কিন্তু যাদের সিদ্ধি হয়নি বা ধ্যানের বস্তুর উপলব্ধি হয়নি, তারাই অবান্তর উপকরণ দিয়ে অনভিজ্ঞ সমাজকে মুগ্ধ করে।

আমাদের দেশে প্রতিকৃতি শিল্প নেই বলে অনেকে আক্ষেপ করেন। তাই সেদিক দিয়ে অনেকে আমাদের অক্ষমতা প্রমাণ ক'রতে চান। কেন যে শিল্পের ওই বিশেষ দিক পুষ্টিলাভ করেনি, মাথা ঘামিয়ে চেষ্টা ক'রলে কারণ খুঁজে বার ক'রতে বিশেষ কষ্ট হয় না।

প্রাচীন কালে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জাতির ইতিহাসের পাতায় বেঁচে থাকতে চাইত, নিজের তৈলচিত্র বা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে নয়। তারা সৃষ্টি ক'রত পূজারীর জন্য দেউল, আর্ত্তের জন্য অতিথিশালা, জ্ঞান-পিপাসুর জন্য মঠ, তৃষিতের জন্য দীঘি ও পুষ্করিণী। এতেই স্পষ্ট দেখা যায় প্রতিকৃতি অঙ্কন করার চাহিদা তখন ছিল না, সেজন্য শিল্পীরা বিশেষ কোন উৎসাহ দেখায় নি। তথাপি তারা বিশেষ চরিত্র অঙ্কনে সিদ্ধ হস্ত ছিল তার ভুরি ভুরি প্রমাণ বহু জায়গায় পাওয়া যায়। অজন্তার চিত্রে মাতাল নাগরিকদের হুল্লোড় ও মত্ততা; যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সেনার আর্ত্তনাদ, দীন ভিখারীর মুখে

নৈরাশ্য ও অভাবের করুণ ছাপ বিশেষ দরদ দিয়েই তারা ফুটিয়ে গেছে।

যে ভারতবাসীরা আদিম যুগ থেকে শিবের আরাধনা ক'রছে, তুষারধবলিত হিমাদ্রির প্রতীক ক'বে, ব্রহ্মাকে অগ্নির প্রতীক ব'লে, বায়ু বরুণকে যারা ক'রল পূজা, তাদের প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের উপাসনা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা কি ধৃষ্টতা নয়?

যে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আজও কেদারনাথ, বদরিনাথ, পশুপতিনাথ, সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করবার জন্য আকুল, বন্ধুর পথের কষ্ট বিঘ্ন যারা যুগ যুগান্তর ধ'রে তুচ্ছ ক'রে এসেছে কেবল লীলাময়ী প্রকৃতির অন্তরের রহস্য উপভোগ করবার জন্য, তাদের শিল্পীদের সঙ্গে বিশ্ব-প্রকৃতির গভীর যোগাযোগ ছিল না বলা আমার মতে একান্ত মূঢ়তার পরিচায়ক।

ভারতের শিল্প ও ধর্ম্মের দানের সাক্ষ্য নবদ্বীপ, শ্যাম, কম্বোজ, বালি, চীন, জাপানে আজও বেঁচে র'য়েছে, যে সভ্যতাকে আমরা বৃহত্তর ভারতের বলে থাকি। আমাদের শিল্পের বুনিয়াদ যদি পাকা না হ'ত, দেশ দেশান্তরের ইতিহাসের পাতায় আজ পর্য্যন্ত তা হ'লে তাহা শ্রদ্ধার জের টেনে চল্‌তে পারত না।

সুধাংশু চৌধুরী

---

# বাদল সাঁঝে আঁধার নেমে আসে

শ্রীবিমলজ্যোতি সেনগুপ্ত

বাদল সাঁঝে আঁধার নেমে আসে,
গাছের মাথায় দিনের শেষের
আব্‌ছা আলো হাসে;
কৃষ্ণচূড়ার চূড়ায় চূড়ায়
বাদল-বারি মুক্তা ছড়ায়,
সবুজ ধানের ওড়্‌না উড়ায়
পুব্‌-হাওয়া নিঃশ্বাসে,
বাদল সাঁঝে আঁধার নেমে আসে।

ওই দূরেতে আব্‌ছা গাছের সারি—
ওই খানেতে বাদল নামে
দিগন্ত মাঠ ছাড়ি'।
তাল তেঁতুলের মাথায় মাথায়
দেব্‌দারুদের পাতায় পাতায়
খেজুর বনে ঘুঙুর বাজায়—
বাজায় বাদল বারি;
বাদল নামে দিগন্ত মাঠ ছাড়ি'।

বাতাস মাতে হাস্নুহানার ঝাড়ে;
বাতাস মাতে দূরের গাঁয়ে
নদীর পর-পারে।
ঝাপ্‌সা সবুজ গাছের শিরে
চরণ ফেলে আস্তে ধীরে
সাঁঝের আঁধার আস্‌ল ঘিরে
শ্যাম বনানীর ধারে;
আঁধার নামে নদীর পরপারে।

আঁধার নামে সারা ভুবন জুড়ে'!
আঁধার নামে নদীর জলে
অনেক দূরে দূরে!
গাঙ্‌মাঝিদের ক্লান্ত মুখে
আঁধার নামে শান্ত সুখে,
শ্রান্ত নদীর অধীর বুকে
ঢেউয়ের সুরে সুরে,
আঁধার নামে সারা ভুবন জুড়ে।

# সাগর দোলায় ঢেউ

শ্রীনবগোপাল দাস, আই-সি-এস

*

* *

শীলার ডায়েরী হ'তে :

মঙ্গলবার, দুপুরবেলা। কাল রাতের শেষভাগেই আমরা পুব-দেশের সীমানা ছেড়ে চলে এসেছি। কর্ণেল গ্রীণ ত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এসে আমায় প্রশ্ন করছেন, দেশের হাওয়া আমার কেমন লাগছে।···তাঁর মনটা ভয়ানকভাবে উৎফুল্ল, বহুদিন পরে দেশে ফিরে আসছেন ব'লে।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করছিলুম, কর্ণেল, তুমি ত' দেশে ফিরে যাচ্ছ···সেখানে তোমাকে অভ্যর্থনা করবার কে আছে?

হেসে কর্ণেল বল্‌লেন, অভ্যর্থনা করবার কি আবার লোকের দরকার হবে না কি? দেশের আকাশ-বাতাস, আলো-আঁধার সবই যে আমার প্রত্যুদ্‌গমন করতে উৎসুক হয়ে উঠ্‌বে!

বল্‌লুম, মান্‌ছি; তবু প্রশ্ন করছি, কর্ণেল···তোমার আত্মীয় কি কেউ কর্ণেল?

একটুখানি চিন্তা করে কর্ণেল বললেন, আছে—আমার দিদির এক নাত্‌নী আছে, বয়স বোধ হয় তোমারই মত হ'বে।···সে যদি আমার অভ্যর্থনা করতে এসে আমার এই থুব্‌ড়ো গালে গোটা দুই উষ্ণ চুমো খায় তাহ'লে আমি তার পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ব একেবারে···

কর্ণেলের রসিকতা সবসময় লেগেই আছে। দোষ আছে তাঁর যথেষ্ট, কিন্তু এই স্বচ্ছ হাসিখুশী ব্যবহারের জন্য আমি তাঁর সব দোষ ভুলে যাই।...আমার নিজের দেশের পরিচিত পুরুষদের যদি কারোর সঙ্গ আমি কামনা করি তাহ'লে সে এই কর্ণেল গ্রীণ-এর।

কর্ণেল আজ ভোরবেলা আমাকে প্রথম প্রশ্নটি করলেন কালকের দিনটি সম্বন্ধে। বল্‌লেন, কাল একা একা কেমন লাগ্‌ল, মিস্ রজার্স?

আমি বল্‌লুম, বেরিয়েছিলুম একা কর্ণেল, কিন্তু পথে হঠাৎ সাথী জুটে গেল!

—কে সেই ভাগ্যবান্ পুরুষটি?

—তুমি তাকে চেন, কর্ণেল—যাকে নিয়ে দু'দিন আগে তোমরা সভা আর মিটিং বসিয়েছিলে এখানে···

আহতস্বরে কর্ণেল বললেন, আমাকে তুমি এর মধ্যে টেনে এনোনা, মিস্ রজার্স। তুমি জানো এর মধ্যে আমার কোনই সংশ্রব ছিল না!···একবারটি মাত্র তোমার বন্ধুদের একজনের সাথে আমি এবিষয় নিয়ে আলাপ করেছিলুম, তাদের সাথে পরিচয় করবার জন্যে, তাদের মধ্যে যথার্থ মানুষটিকে দেখ্‌বার জন্যে।···মুগ্ধ এবং প্রীত হয়ে আমি ফিরে এসেছি!

আমি সান্ত্বনাভরা সুরে বল্‌লুম, তুমি ব্যথিত হয়োনা, কর্ণেল, তোমাকে কি আমার জানতে বাকি আছে?··· আমি ব্যক্তিগত ভাবে তোমাকে কখ্‌খনোই কিছু বলিনি,' যা' কিছু বলেছি তা' আমাদের এই অসাড় দম্ভতাপূর্ণ সভ্যতার খোলসটার প্রতি···

সত্যি, নিজের দেশের সাগরের মধ্যে এসে পড়েছি ব'লে আমার মনে একটুও আনন্দ হচ্ছে না, কিন্তু! বরং একটা অজানিত আশঙ্কায় আমার বুক কেঁপে উঠ্‌ছে।... দেশের এই আবাহন, এত' আবাহন নয়···এযে অন্য একটা বিদায়ের সূচনা!

কায়রো থেকে পোর্ট সেড্ পর্য্যন্ত সারাটা পথ মোহিত একটিও কথা বলেনি'। সেকেণ্ডক্লাশের যে কামরাটিতে আমরা উঠেছিলুম সেখানে আর কেউই ছিলনা...আমার জাহাজের সব বন্ধুরাই ফার্ষ্ট ক্লাশে যাচ্ছিলেন।···শুধু গাড়ীর

শব্দ হচ্ছিল, আর তার চাকাগুলো পিষে পিষে চল্‌ছিল লোহার লাইনের উপর দিয়ে।···জ্যোৎস্নাধৌত রাত্রিতে মরুভূমির ছবি ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল—সাদা বালুর উপর যেন আলোর ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছিল···আর অদূরে সুয়েজখালের স্তব্ধশীতল রেখা মরুরূপসীর শাড়ীর রুপালী একটা পাড়ের মত দেখাচ্ছিল।

মোহিত চুপ করে সীটের কুশনে হেলান দিয়ে বসেছিল, আমি ছিলুম ওরই পাশে। সারাদিন ঘোরার শ্রান্তিতে আমার শরীর অবশ হয়ে আস্‌ছিল; তাই আমি আমার শিথিল মাথাটি ওর কাঁধের উপর রেখেছিলুম। মোহিত তবু একটুও সাড়া দেয়নি'···সে যেমন স্তব্ধভাবে বাইরের আলোর দিকে তাকিয়ে ছিল তেমন ক'রেই তাকিয়ে রইল।

কতক্ষণ আমি সেভাবে ছিলুম জানিনা, তবে ক্লান্তিতে আমার চোখ যে মুদে আস্‌ছিল সেটা সত্যি।···সেই তন্দ্রা-স্বপ্ন থেকে আমি মুহূর্ত্তের জন্য জেগে উঠেছিলুম কার স্নেহ-অঙ্গুলীস্পর্শে···ক্ষণিকের জন্য চোখ মেলে তাকিয়ে দেখেছিলুম, মোহিত আমার মাথাটি স্নেহভরে চেপে ধরে আমার আধাসোনালী চুলগুলো নিয়ে খেলা করছে।...সুখের নিবিড় আবেশে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—সে ঘুম যখন ভাঙ্‌ল তখন গাড়ীর বেগ মন্দীভূত হয়ে আসছে, পোর্ট সেড্‌ ষ্টেশনে এসে গাড়ী থাম্‌বার উপক্রম করেছে।

ক্ষণিকের জন্য আমার মনে দুঃখ হয়েছিল এমন সোনার সুযোগটুকু এমনিধারা ঘুমে কাটিয়ে দিলুম বলে। তারপরই ভাব্‌লুম, দুঃখ করা আমার শোভা পায় না—যেটুকু পেয়েছি তার জন্যেই নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।···এও যদি আমার অদৃষ্টে না জুটত তাহ'লে অভিযোগ করবার সুযোগটুকুও পেতুম কি?

ষ্টীমারে উঠে ডেকের উপর যখন রাত্রির মত বিদায় নিলুম তখনও সে কিছু বললে না, শুধু আমার ডান হাতটি দু' হাতে একবার চেপে ধরে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাস্‌লে। তারপর তার ক্যাবিনের দিকে চলে গেল।

সারারাত আমার ঘুম হয়নি কাল। জাহাজ যখন ধীরে ধীরে আবার সাগরের বুকে পড়্‌বার জন্যে নড়্‌তে আরম্ভ করেছে তখনও আমি অন্ধকার ক্যাবিনের জানালা দিয়ে শুব্ধ অতল জলের দিকে তাকিয়ে আছি।···মিস্‌ হিল অঘোরে ঘুমুচ্ছিলেন, তাঁর সাথে আমার শেষবারের মত বোঝাপড়া হয়ে গেছে, তিনি শুধু ডাঙায় পা' দেবার অপেক্ষায় আছেন যে কখন এরোপ্লেনেরও সাথে পাল্লা দিয়ে লণ্ডনে পৌঁছে বাবার কাছে আমার স্বেচ্ছাচারিতা, অবাধ্যতা এবং অসভ্যতার কাহিনী বল্‌বেন।

ধীরে ধীরে পোর্ট সেডের আলোগুলো মিলিয়ে গেল—আমরা যে শুধু পথিক তা' তীব্রভাবে মনে করিয়ে দিলে আরেকবার। নির্জ্জন নিঃসঙ্গতার একখানি ভেলায় ভেসে যেন চলেছি, তীরে দেখ্‌তে পাচ্ছি লোকালয়ের আলো, আশে পাশে শুনতে পাচ্ছি জনতার কোলাহল, ক্ষণে ক্ষণে মাটির শুশ্রূষাও পাচ্ছি, কিন্তু কোনখানেই নিবিড়ভাবে বস্‌বার সুযোগ পেলুম না।

নির্জ্জন নিঃসঙ্গ ভেলায়ও সাথী জুটেছিল, তার সাথে পরিচয় হয়েছিল সমুদ্রেরই কল্লোলের সাথে, এরই দোলায় ঢেউয়ের মাঝখানে। এ বাঁধন শীগ্‌গীরই যাবে ছিঁড়ে—সমুদ্রের দোলানি থাম্‌বে না, তার বুকের উপর ঢেউএর খেলাও কম্‌বে না···কিন্তু তারই সুরে বাঁধা একটি পরিচয়, একটি সাথীত্ব বুদ্‌বুদের মত যাবে মিশে।

কাল নিদ্রাহীন চোখ নিয়ে সারারাত যখন ছাই-পাঁশ সব ভাব্‌ছিলুম তখন একবার মনে হয়েছিল মোহিতও আমারই মত নিদ্রাহীন চোখ নিয়ে বিছানায় বসে আছে কিনা। আমার মনে যে সব সুরের বাঁশী বেজে উঠ্‌ছে ওর মনে কি তা' একটুও সাড়া দিচ্ছে না?...কে জানে?

বুধবার, সকালবেলা। কাল বিকাল অবধি যখন মোহিত এল না তখন আমি ভাব্‌লুম আমাকেই খোঁজ নিতে হ'বে। একটুখানি আশঙ্কায় মনটাও কেঁপে উঠ্‌ল, কায়রোতে রোদে রোদে তেতে পুড়ে অসুখ হয় নি' ত?

সেকেণ্ড ক্লাস ডেকে যোশীর সাথে দেখা। বন্ধুর কথা জিজ্ঞেস্‌ করতেই বল্‌লে, সে নীচে ডেক্‌প্যাসেঞ্জারদের কোয়ার্টারে গিয়েছে।

ডেক্‌প্যাসেঞ্জার বলে এক শ্রেণীর যাত্রী আছে জান্‌তুম;

তাদের আস্তানা দেখবার সুযোগ আমার কখনও হয়নি। আজি কৌতূহল প্রকাশ করলুম।

যোশী আমাকে নিবৃত্ত করবার উদ্দেশ্যে বললে, সে বড্ড নোংরা জায়গা, মিস্ রজার্স···ফার্স্ট ক্লাস লাউঞ্জ এর পর সেখানে তোমার গা বমি বমি করবে।

—কিন্তু মোহিত ত সেখানে গিয়েছে?

—আমাদের কথা আলাদা, মিস্ রজার্স···আমরা সব কিছু দারিদ্র্য, মলিনতা এবং জীর্ণতায় অভ্যস্ত। তোমাদের সে শিক্ষা হয় নি', তুমি কষ্ট পাবে।

আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যোশী এবং মোহিত এরা দু'জনে অবসর পেলেই আমাকে আমার জন্ম, জীবন-প্রণালী এবং আভিজাত্য নিয়ে খোঁচা দেয়। অবশ্য মোহিত আমাকে আজকাল এ সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে না; তার মনের তীব্রতা যেন অনেকখানি শান্ত হয়ে এসেছে আমার সংসর্গে।

আমি বেশ কড়াসুরেই জবাব দিলুম, আমার কী শিক্ষা হয়েছে না হয়েছে সে নিয়ে আমি আলোচনা করতে যাবনা, যোশী, কিন্তু তোমার এটা মনে থাকা উচিত যে যুগে যুগে আমার দেশের দু'একটি ছেলেমেয়েও পৃথিবীর নানা প্রান্তে সব চেয়ে বড়ো রকমের দুঃখ, দারিদ্র্য এবং মলিনতা বরণ করে নিয়েছে।

সত্যের সাথে বিবাদ চলে না। যোশী লজ্জিত মুখে মাথা হেঁট করলে। আমি বললুম, আমায় পথটি দেখিয়ে দেবে কি?

যোশী আমার সাথে সিঁড়ি পর্য্যন্ত এগিয়ে এল।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে দেখি কোথাও কেউ নেই—শুধু নীলকুর্ত্তি-পরা জন কয়েক Florentine খালাসী কাজ করছে—এদিক্ ওদিকে দু'একটা কম্বল এবং ময়লা বিছানা আধগুটানো ভাবে প'ড়ে রয়েছে। পূর্ব্বদেশ থেকে আসার পর অবধি এসব জিনিষের তাৎপর্য্য বুঝতে আমার দেরী হয় না·· বুঝলুম এই হচ্ছে ডেক্‌প্যাসেঞ্জারদের আশ্রয়-ভূমি।

খানিকটা খুঁজে মোহিতের দেখা পেলুম ডেকটার সম্মুখ ভাগে। সে এবং কায়রো-ষ্টেশনে-দেখা আর একটি ভারতীয় ভদ্রলোক পাশাপাশি দুটো লোহার থামের উপর বসে গল্প করছে।

বোধ হয় তারা আমার সম্বন্ধেই গল্প করছিল, কারণ দেখলুম আমার পায়ের শব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকিয়ে তারা দু'জনেই ভয়ানকভাবে চম্‌কে উঠল···আর মোহিতের মুখে লজ্জার একটা রক্তিমাভ ছোপ কে যেন বসিয়ে দিলে।

আমি বললুম, তোমার খোঁজে কোথায় চলে এসেছি মোহিত দেখ···

মোহিত কী যেন বলতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে অপর ভদ্রলোকটি বললেন, অপরাধ খানিকটা আমারই···আমিই বাবুজীকে আট্‌কে রেখে দিয়েছি অনেকটা স্বার্থপরতার বশে···

বুঝলুম না, জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলুম।

ভদ্রলোকটি বললেন, দেখ্‌ছেন ত কেমন একাটি এখানে থাকতে হয়, তাই মোহিতের সঙ্গটুকু একেবারে একচেটে করে নিয়েছি।

বললুম, আমি আপনাদের গল্পে বাধা দিতে আসিনি, আপনারা গল্প করুন না, আমি একটু খানি দেখ্‌ছি জাহাজটা ঘুরে ঘুরে···

ব'লে আমি ডেকের এদিকে সরে এলুম। মনে ভয়ানক অভিমান হ'ল, মোহিত আমাকে দেখে একটুখানিও সরে এলনা, আমায় একটু সম্ভাষণও করলনা সে।···কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছিলুম এই সম্ভাষণ-না-করাটাই হচ্ছে আমাদের সম্বন্ধের মাধুর্য্য, এই অপূর্ণতাটুকুই হচ্ছে পূর্ণতার প্রতীক···

এদিক্ ওদিক খানিকক্ষণ পায়চারী করে সিঁড়িতে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় মোহিত ছুটে এল, বললে, তুমি নিশ্চয় এখনই চলে যাচ্ছ না?

আমি অভিমান-ভরা সুরে বললুম, চুপ করে ত আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

অনুতপ্ত হয়ে আমার হাতটি ধরে মোহিত বললে, রাগ করো না···তোমার সাথে অনেক কিছু গল্প করবার আছে···

একটি স্পর্শ আমার সব অভিমান-ব্যথা ধুয়ে মুছে নিয়ে গেল। ফিক্ করে হেসে বললুম, তোমার উপর কি রাগ করতে পারি মোহিত? সে যে নিজের উপরই রাগ করা হবে।

'সে আমার হাতটি ধবে সিঁড়ির কাছ থেকে টেনে নিয়ে বল্‌লে, এদিকে এস···

মন্ত্র-মুগ্ধার মত আমি তার অনুসরণ করলুম। ডেক্-প্যাসেঞ্জারদের আশ্রয়···আলোর স্তিমিত আভা অন্ধকারের সাথে মিশে স্থানটাকে যেন রহস্যময় ক'রে তুলছিল। মোহিত বল্‌লে, এতক্ষণ তোমার কথাই হচ্ছিল···

আমি চুপ করে রইলুম, এর পর কী বল্‌বে তারই প্রতীক্ষায়।

মোহিত বল্‌তে লাগ্‌লে, ওঁর নাম হচ্ছে কৃপালানি, সিন্ধ্ থেকে আস্‌ছেন···এই ডেকেরই একজন যাত্রী।···ভারী চমৎকার লোক—ওঁর সাথে পরিচয় হয়েছে মাত্র দু'দিন হ'ল, এরই মধ্যে ওঁর মাঝে মস্ত বড় একটি বন্ধুর প্রাণ খুঁজে পেয়েছি···

বল্‌লুম ওঁর চোখ দুটিতে আমি সেটা বুঝ্‌তে পেরেছি···

—আমি ওঁকে আমার কাহিনী বলছিলুম আর আসন্ন বিদায়ের দিনটির কথা আলোচনা কর্‌ছিলুম...

আমি আহতভাবে বল্‌লুম, সে কথা এখন আলোচনা করে কী হবে মোহিত? সে এখন থাক্···

মোহিত আর কিছু বল্‌লে না, স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অস্ফুটস্বরে বল্‌লে, একটি শিক্ষা আমার লাভ হয়েছে তোমার সাথে পরিচয়ে, শীলা···সেটা না বলে পার্‌ছি না...

—বলো···

—সহজ মানুষের সত্যটি অজ্ঞতা এবং সামাজিক বিভিন্নতাব কুয়াশায় ঢাকা পড়ে থাকে, তাই মানুষ মানুষকে অনেক সময় ভুল বোঝে, শীলা···

আমি অবাক্ হয়ে প্রশ্ন কর্‌লুম, এর তাৎপর্য্য...

মোহিত প্রথমে একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল, তারপর বল্‌লে, না, বল্‌ছিলুম এই যে তোমাকে আগে কী ভয়ানক ভাবে ভুল ভেবেছিলুম!

মোহিতের কথায় আমার সমস্ত হৃদয় মথিত ক'রে উঠ্‌ল একটা চাপাকান্নার হাসি। আমাদের সম্বন্ধটিকে সে দেখেছে শুধু বৈজ্ঞানিকের চোখে, এক অভিজ্ঞতার সোপান এই ধারণা নিয়ে।···মুখ্যভাবে আমার কাছে যা' অন্তর-নিংড়ানো বেদনা, সেটা ওর কাছে শুধু একটা ভুল-ভাঙানো বাণী; আমার কাছে যা' অনুভূতির কঙ্কণ, ওর কাছে তা' অভিজ্ঞতার সাঁকোয়া··

আমি কোন ক্রমে অশ্রুরোধ করতে করতে উপরে চলে এলুম। ওর কাছে থেকে ভালো ভাবে বিদায় নেবার অবসরটুকু পর্য্যন্ত আমার হ'ল না।

কাল রাত্রিতেও আমার ঘুম হয়নি'।

বুধবার, রাত দুপুর। আমি ভুলেই গিয়েছিলুম যে মোহিতের মনটিকে সাধারণ তুলাদণ্ডে মাপতে গেলে ওর প্রতি ভয়ানক একটা অবিচার করা হ'বে। কাল ওকে দেখ্‌ছিলুম নিতান্ত সঙ্কীর্ণ একটা পরিপ্রেক্ষিতের মধ্য দিয়ে... ওর মনের বিপুলতা এবং অনুভূতির অজস্র চঞ্চল ছায়া-লোকপাত আমার পর্য্যবেক্ষণের গণ্ডীব মধ্যেই আসেনি'।

মানুষকে ভালো ভাবে বুঝ্‌তে হ'লে নিজেকে তার অনুবেদনার সাথে নিবিড় ভাবে মিশিয়ে ফেল্‌বার চেষ্টা করা দরকার। প্রাণেব যোগ যতক্ষণ না হচ্ছে কল্পনা-শক্তির সাথে, ততক্ষণ একটা মানুষের মন সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত কখনই হ'তে পারে না।

সন্ধ্যার পর আমি নিথরভাবে বসে ছিলুম আমার ডেক্‌চেয়ারটির উপর, কালকের রাত্রিটির কথা মনে হয়ে আমার সব অশ্রু জমাট হয়ে বুকের উপর চেপে বসেছিল, এমন সময় মোহিত এসে মৃদুস্বরে বল্‌লে, তোমার সাথে একটা কথা আছে, শুনে যাও...

আমি অবাক্ হয়ে গেলুম—আবার হলো কী?

মোহিতের পেছনে পেছনে আমি সোজা চলে গেলুম স্পোর্ট্‌স্ ডেকে। তখন আমার সিসিলীর সম্মুখীন হচ্ছি... দূরে-পাহাড়ের উপর দু'একটা আলো স্তব্ধ নিশীথের প্রহরী স্বরূপ জেগে আছে।

কোন প্রকার ভূমিকা না করেই মোহিত আমাকে প্রশ্ন করে বস্‌ল, তুমি আমাকে ভালোবাস, শীলা?

এ কী প্রশ্ন!···এর জবাব কি কখনও দেওয়া যায়?

আমার নীরবতায় অস্থির এবং চঞ্চল হয়ে মোহিত বল্‌লে, আজ চুপ করে থাক্‌লে তোমার চল্‌বে না শীলা!...

আমি তোমার ঠোঁট দুটির মাঝ থেকে একটা উত্তর চাই।

আমি অস্ফুটস্বরে বললুম, তোমার কী মনে হয়, মোহিত?

আমার প্রশ্ন শেষ করতে পারলুম না। আমার মুখের উপর এসে পড়ল মোহিতের স্নেহ-উচ্ছ্বাস-ভরা উষ্ণ নিঃশ্বাস; আমার ঠোঁট দুটির উপর এল ওর ঠোঁটদুটির প্রেমনিবেদন··· আমাকে সে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরলে।

কতক্ষণ এই ভাবে দাঁড়িয়েছিলুম জানি না··সে যেন একটা স্বপ্নময় যুগ। আমার চক্ষুদুটি বন্ধ করে আমি তৃষিত মরুভূমির মত তার চুম্বন এবং আদর উপভোগ করছিলুম। দিগন্তে ফুটে উঠেছিল সিসিলীর লাইট-হাউসের আলো—মনের সব বন্ধন গিয়েছিল টুটে, ফুলের মঞ্জরীতে যেন ভরে উঠছিল সব গাছ।·· আমার সমস্ত হৃদয় মথিত করে জেগে উঠ্ছিল শুধু একটি প্রার্থনা: ওগো রূপদক্ষ, এ শুভ সুযোগ হারিয়ো না···অন্ধকারে আবরণ গিয়েছে খুলে, অবসাদ গিয়েছে দূরে·· তোমার তুলিতে আমাদের মনের আনন্দের গান ফুটিয়ে তোলো···

নীচে সাগরজলের উচ্ছ্বাস আমি শুনতে পাচ্ছিলুম। ঢেউগুলো বোধ হয় জাহাজের গায়ে এসে লাগ্‌ছিলো আর থেকে থেকে আমাদের জাহাজটি কেঁপে উঠছিল।

মোহিত ধীরে ধীরে আমাকে মুক্তি দিয়ে বললে, এই কটা দিনের স্মৃতি আমি কখ্‌খনও ভুলতে পারব না শীলা···

আমি বললুম ভুলবে কেন?···তোমার সাথে এই ত আমার শেষ দেখা নয়।

একটুখানি মলিন হাসি হেসে বললে, না···কিন্তু শেষের দিনত ঘনিয়ে আসছে····

প্রতিবাদ করতে পারতুম, বলতে পারতুম, এ যে আরম্ভ গো! এরই উপর তুমি যবনিকা কেন টেনে দিচ্ছ?··· তুমি আর আমি যাচ্ছি একই দেশে, সেখানে আমাদের দেখা-শোনার অবসরের অভাব হবে কেন?

কিন্তু কী-জানি-কেন মুখের মধ্য দিয়ে সে ভাষা আর বেরুল না। অশরীরী অদৃশ্য এক শক্তি যেন আমার কানে কানে বললে, এ যে সাগর দোলার ঢেউ···সাগরের বাইরে এ সম্বিৎ হারিয়ে ফেলবে, মাটির কোলাহলের মধ্যে এ কোথায় মিশিয়ে যাবে! ঢেউ আছাড় খাবে সৈকত ভূমিতে···ফুটে উঠবে শুধু ফেণা হয়ে, আর মিশিয়ে যাবে ওর সিক্ত গায়ে···

মোহিত বললে, তুমি কাল আমায় ঠিক বুঝ্‌তে পারনি', শীলা···

ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন ছিল না, মোহিতের স্পর্শ আজ আমার কাছে সবই স্বচ্ছ, সরল করে দিয়েছিল। তবু আমি ওর কথায় কোন বাধা দিলুম না।

বলতে লাগ্‌ল, ভুল-ভাঙাব কথা যে কাল বলেছিলুম সেটাই আমার বল্‌বার সবটুকু ছিল না।···আমার মনের পরিণতির দিকে তাকিয়ে আমি অবাক্ হয়ে গিয়েছিলুম— সেই বিস্ময়েরই একটুখানি কণা তোমাকে দিতে যাচ্ছিলুম...

আমি দু'হাতে তার মুখটি চেপে ধরে বললুম, বুঝেছি, আর বলতে হ'বে না···

সে আস্তে আস্তে আমার হাতদুটি সরিয়ে নিয়ে তার হাতদুটির মধ্যে রাখ্‌লে, বললে, জানো, সময় সময় আমার কী মনে হয়?

—কী?

—যে তুমি যাদু জানো!···কতবার আমি তোমার সান্নিধ্য এড়িয়ে চল্‌বার চেষ্টা করেছি, তোমার সাথে বেশী মেশামেশি করা উচিত নয় সে কথা মনকে বোঝাতে চেয়েছি, কিন্তু কী এক দুর্ব্বার আকর্ষণে আবার ফিরে এসেছি!

আমি একটুখানি তৃপ্তিভরা হাসি হাস্‌লুম। এযে আমার প্রতি ওর সম্ভ্রম নিবেদন। মেয়ের মন এ শুনলে আনন্দে ফুলে উঠ্‌বে বৈ কি!

সে বললে, তাই ভয় হয়, এ যাদুর মায়া যদি না কাটে তাহ'লে কী উপায় হবে!

আমি হেসে বললুম, ভয় নেই, তুমি যখন এখনই এ যাদুর মায়া কাটবার কথা ভাব্‌ছ তখন কাটতে আর দেরী হবে না!

আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলুম সেখানে বোধ হয় ঘণ্টা দুয়েকেরও বেশী হবে। কত কী অর্থহীন কথা যে

আমরা বক্লুম—তার না ছিল রীতি, না ছিল সঙ্গতি!... সৃষ্টির আদি কাল থেকেই বোধ হয় এম্নি হয়ে আস্ছে!

সাগর প্রবাহের প্রবাহিনীব কলধ্বনি রক্তের তালে তালে বাজ্ছিল। আমি যেন হয়ে গিয়েছিলুম শিশু—যা' কিছু সাধারণ যা' কিছু নগণ্য সবই দেখ্ছিলুম প্রবল ক'রে,···আমার ঔৎসুক্য হয়ে উঠেছিল অক্লান্ত, আনন্দ হয়ে উঠেছিল গভীর এবং অপূর্ব···

মোহিতের চিঠি— বুধবার রাত দুপুরে লেখা :

"ভাই শোভনলাল,

তোমাকে শেষ চিঠি লিখেছি আরব আর মিশরের মরুভূমির মাঝখানে বসে। এবার মরুভূমি ছাড়িয়ে ঠাণ্ডার দেশের দিকে চল্ছি, যদিও কাল সকালবেলা ভিসুভিয়স্এর সাথে সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা আছে!...আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে তবে নাকি জাহাজ থেকেই ওর মুখে ধোঁয়ার রেখা দেখা যাবে!

সে যাক্···তোমাকে একটি নতুন খবর দিচ্ছি··· যে বাঁশীর সুরের কথা তোমাকে ঈজিপ্ট থেকে লিখেছিলুম তাব স্পর্শ অবশেষে মিলেছে—খুবই অজান্তা ভাবে, মিশরের মরুভূমির মাঝে। তারপর আজ তার সাথে আমার সুরটি মেলানোও হয়ে গেছে, সাগর-ঢেউএর নৃত্যদোদুল ছন্দের সাথে মিশে গেছে বেশ!

তখনকার অনুভূতিটি হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের, ভাই!... এর আগে তোমাকে লিখেছিলুম অস্পষ্ট আঘাতের কথা, এখন লিখ্ছি পূর্ণ রিক্ততার বাণী। এ রিক্ততার শূন্যতা নেই, আছে অসামান্য গভীরতা আব অতলস্পর্শী স্তব্ধতা।

তুমি নিশ্চয়ই ভয়ানকভাবে উদগ্রীব হয়ে উঠেছ। অ্যাফ্রিকার জঙ্গল আর অ্যামেরিকার কন্দর ছেড়ে তোমার মনটি নিশ্চয় আমার চিঠির পেছনে লুকানো অর্থের দিকে ঝুঁকে পড়েছে!...ভাব্ছ এসব কবিত্ব-মেশানো কথার মানে কী?

মানে অবশ্য খুবই সোজা—আমি প্রেমে পড়েছি।

আমি কিন্তু কল্পনার চোখে দেখ্তে পাচ্ছি এইটুকু পড়েই তোমার মুখ হ'য়ে উঠ্ছে ভ্রূকুটি-কুটিল, তুমি আমাব ভবিষ্যতের কথা ভেবে হতাশ হয়ে পড়েছ!...আমার ভয়ানক আনন্দ হচ্ছে কিন্তু তোমার অবস্থাটি কল্পনা করে... কাছে যদি এখন তোমায় পেতুম!

সে যাক্—এখন আমার প্রিয়ার একটুখানি পরিচয় দেই, কী বল?

প্রিয়ার বয়স হবে উনিশ···কুড়ি পার হ'লে বুড়ী হবেন কিনা জানি না, কিন্তু আমার কাছে তিনি থাকবেন চির-যৌবনা উর্বশী। তাঁর সাহচর্য্যে আমার অন্তর রাগে-অনুরাগে বিচিত্র হয়ে ঠিক্‌রে পড়ে···প্রভাতে-সন্ধ্যায় দিক্-দিগন্তে গান বেজে ওঠে···সৃষ্টির লীলা তরঙ্গেব সাথে আমার অন্তর দুলতে থাকে।

তুমি নৃতত্ত্বের পুরোহিত, তাই প্রিয়ার জাতীয়তার পরিচয় তোমায় দেব না। শুধু তাঁর বাইরের দুএকটি অঙ্গ এবং অঙ্গাপুব বর্ণনা করব, যদি তুমি সেই ছবি থেকে আমার প্রিয়াকে চিনে নিতে পার তাহ'লে তোমায় বলব বাহাদুর···

প্রথমেই চোখ দুটির কথা বলি···স্তব্ধ-চঞ্চল নীল··· সাগর আর আকাশের রংএর সাথে মিশে আছে যেন··· অন্তর্গূঢ় রহস্যে ভরা আমার মানসী।

আর একটি জিনিষ আমার চোখে পড়েছে প্রথমেই, সেটি হচ্ছে একটি কালো তিল।···সত্যিকারের রাঙা-ঠোঁট দেখেছ কখনো?···আমার প্রিয়ার ঠোঁট সহজ-রক্তিম-রাগে রাঙা...বিলিতি কবি হ'লে বলতুম, চেরীফলেব মত। গালের আপেলের রং আর তারই উপর ঠোঁটের বাঁ-পাশে ছোট্ট একটি তিল, যেন সমস্ত বিশ্বের সৌন্দর্য্য মথিত করে একটুখানি এসেছে···

চুলের বর্ণনা চাও?···আধা-সোনালী···শাড়ীর ঘোম্‌টাতে যদি এর আব্রু হয় তাহ'লে বোধ হয় এর স্রোতে ছন্দের নাচ বয়ে চলে!

আবো লিখ্তে হবে কি?

এখন ইতিহাসের একটুখানি ছোঁয়াচ্ তোমায় দেই। ঘাত-প্রতিঘাত আরম্ভ যে হয়েছে সাগরের দোলা থেকে সে তুমি এর মধ্যে নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছে।···কেমন

করে সুরু হ'লো সেটা প্রশ্ন করো না, কারণ সুরের মধ্যে না ছিল আকস্মিকতা, না ছিল অসাধারণত্ব। সচরাচর যেমনি ভাবে পরিচয় হয়ে থাকে আমাদের পরিচয়ও সেই ভাবেই হয়েছে।

কিন্তু খুব সহজে আমরা ধরা দিই নি'। লুকোচুরী খেলা হয়েছে যথেষ্ট এবং তার অস্বাভাবিকতার কথা মনে হ'লে এখন আমার নিজেরই হাসি পায়।...অভিমান এবং বেদনা আমার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে তুলেছে অনেকবার, কিন্তু আজ সন্ধ্যার আঁধারে আমাদের সন্ধি হয়ে গেছে।

তুমি প্রশ্ন করবে, সে ত বুঝলুম, তখন হবে কী?—কী যে হবে সে আমিও জানি না। আর দুদিনের মধ্যেই সাগরের কাছ থেকে বিদায় নিতে হ'বে আমাদের এত দিনকার সহচর, সাথী এবং সাক্ষী থাকবে প'ড়ে··আমরা চলে যাব কে কোথায়! মনের স্পন্দন দোলার বিরামের সাথে সাথে থামবে কি না জানি না; যদি থামে তবে ভাবনা নেই—কিন্তু যদি না থামে?

একটা কথা তোমায় না বলে থাকতে পারছি না, শোভন···তুমি আমায় ছেলে মানুষ ভেবো না যেন!... দু'জোড়া ঠোঁটে যখন স্নেহের আলাপ সুরু হয় এবং তার সমাপ্তি হয় নিবিড় স্পর্শে, তখন শরীরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে ওঠে প্রাণমাতানো গান। সে গানের মূর্চ্ছনা যে কতখানি পাগল-করা তা' আমি চিঠিতে তোমায় বোঝাতে পারব না—তবে এটুকু বলতে পারি যে তখন নিত্য কালের আলোও হয়ে যায় আচ্ছন্ন আর বিশ্বের সকল বাণী সরে যায় দূরে!

এই যে চিঠি লিখছি এখন রাত ক'টা বেজেছে জানো?—রাত একটা। চোখের পাতায় ঘুম একটুও নেই—আমার শিরায় শিরায় রক্তের প্রবাহ যেন অস্বাভাবিক রকম দ্রুতগতিতে বইছে!

আমার চিঠি পড়ে তুমি কী মন্তব্য প্রকাশ করবে জানি না, তবে খানিকটা আঁচ করে নিচ্ছি। বলবে, আমার চিঠিটা হয়েছে একটা আলোর ঝিকিমিকি, এর কোন্ খানে রূপক কোন্ খানে শাদা কথা বুঝবার যো নেই···। কিন্তু এই আলো-ছায়ার মাঝখান দিয়ে যদি আমার চেনা মুখখানা বার করে নিতে তোমার কোন কষ্ট পেতে না হয় তাহ'লেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

একটা প্রস্তাব করব তোমায়?···তুমিও কেন চলে এস না! তুমি যে সেই কোন্ স্কলারশিপের জন্যে চেষ্টা করবে বলেছিলে তার কী হ'ল?···ভাই শোভন, আমি জোর করে বলছি, তোমার ষ্টাডির বদ্ধ হাওয়া থেকে যদি তুমি এক বারটি বেরিয়ে পড়তে—সাগরের বুকে পাড়ি দেবার জন্যে, তাহ'লে দেখতে এর ঢেউএর ফাঁকে ফাঁকে কত রামধনুর খেলা...আর তার বাণী আকাশ বাতাসের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে কত রূপে রূপে বিচিত্র হয়ে ওঠে!

অবশ্যি আমার বলা বৃথা; তুমি হচ্ছ অদ্বিতীয় Cynic, তুমি বলবে, সাগরের বুকে শুধু রামধনুর খেলাই মেলে না, টাইফুনের ভীষণ নৃত্যের উৎসও সেখানে।···সাগরের নাভীর মধ্যে তুমি দেখবে ধ্বংসের লীলা··বিক্ষিপ্ত কোলাহল·· সম্বরণহীন উচ্ছ্বাস···

তবু তোমায় বলছি, একবারটি তোমার অনাদিকালের খ্রী-বিসর্জ্জন দিয়ে পা বাড়িয়ে দাও···।

—তোমার মোহিত।"

*

* *

মোহিত শেষ রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল তার ক্যাবিনের ভিতর। হঠাৎ তার ঘুম ভাঙল চিদম্বরম্‌এর কলরবে। আলস্য-ভরা চোখ দুটি একবার খুলতেই পোর্টহোল দিয়ে তার মুখের উপর এক ঝলক আলো এসে পড়ল···একটু বিরক্ত হয়ে চোখ আবার বন্ধ করে সে জড়িত-কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, কী হয়েছে মিঃ চিদম্বরম্? এরকম চেঁচামেচি কেন?

সোৎসাহে চিদম্বরম্ জবাব দিলে, ভিসুভিয়স দেখা যাচ্ছে; মিঃ সেন··

ভিসুভিয়স!··মোহিত তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। উপরের বার্থ থেকে কোনক্রমে নেবে চোখে একটু জল দিয়ে সে উদ্ধশ্বাসে বেরিয়ে পড়ল ক্যাবিন থেকে।

ভিসুভিয়স দেখতে তার যতটা না আগ্রহ তার চেয়ে বেশী আগ্রহ ছিল তার শীলার সাথে ভোরবেলাটিতে দেখা করবার।···আগের দিন সন্ধ্যায় সে শীলার কাছে প্রতিশ্রুতি

করেছিল যে ভোরবেলাতে ভিসুভিয়সের ছবি যখন ফুটে উঠ্‌বে তখন সে শীলার কাছে থাকবে।

তড়্‌তড়্‌ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে সে ফাষ্ট ক্লাস স্পোর্টিশ্‌ ডেকে উঠে চলে গেল। সেখানে এক পাল ছেলে মেয়ে জড় হয়ে চেঁচামেচি কর্‌ছিল। মোহিত খুঁজ্‌ছিল শীলাকে, তার দৃষ্টি সারা ডেকময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

শীলাকে কিন্তু কোথাও দেখা গেল না। যে ছেলে-মেয়ের দল তাদের আনন্দ কলরবে ডেকটাকে মাতিয়ে তুল্‌ছিল তাদের একটিকে মোহিত বেশ ভালোভাবেই জান্‌ত—তাকে দেখেছিল শীলার সাথে অনেক সময়ই সে।···ইচ্ছা হল তাকে প্রশ্ন করে, শীলা কোথায়?···কিন্তু কী যেন এক লজ্জায় সে চুপ করে রইল।

ভিসুভিয়স দেখা যাচ্ছিল ধূসর একটা রেখার মত···তার শিখরটা মনে হচ্ছিল যেন কালো একটা মেঘের ঢেউ।···মোহিত কিন্তু ভিসুভিয়স্‌ দেখে খুব উৎসাহিত বোধ কর্‌ছিল না, তার মন ছিল একটি ছন্দ-ভরা সুরের প্রতীক্ষায়···

সুরের সাথে সাক্ষাৎ অবশেষে হ'ল। লজ্জারুণ মুখে শীলা এসে মৃদু হেসে বল্‌লে, ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, মোহিত, তাই দেরী হয়ে গেল··

—আমি যে তোমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি এখানে!

—সত্যি?

—সত্যি না ত' কি মিথ্যে বল্‌ছি?···এই যে ধূম-জ্যোতিঃতে গড়া পাহাড়ের রূপ-সৃষ্টি এও আমার কাছে নিতান্ত সাধারণ মনে হচ্ছিল তুমি আস্‌ছ না দেখে।

শীলা মোহিতের বাহুতে মৃদু তর্জ্জনীর আঘাত করে বল্‌লে, শেষ ক'দিনে তোমার মুখের ফোয়ারা ছুটে গেছে যে!

হেসে বল্‌লে, দীপ্‌ নিভ্‌বার আগে দপ্‌ করে জলে ওঠে শেষবারটির মত···কল্লোল শেষ হবার আগে ভাসিয়ে নিয়ে যায় পূর্ণমাত্রায়···

শীলা একটুখানি অন্যমনস্কভাবে বল্‌লে, সত্যি কি মোহিত আমাদের বিদায় নেবার সময় ঘনিয়ে আস্‌ছে?···আমি কিন্তু কিছুতেই সেটা কল্পনার মধ্যে আন্‌তে পারছিনা।

—কিন্তু যা' সত্য এবং অবশ্যম্ভাবী তাকে জোর করে এড়িয়ে ত কোন লাভ নেই।

শীলা একটুখানি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেল্‌লে।

মোহিত তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্‌লে, কিন্তু সে নিয়ে এখনই মন খারাপ করে দরকার কী, শীলা? যা হ'বার তা হবে—তাই নিয়ে এখনকার ভিসুভিয়স দেখাটা মাটি ক'রো না।

শীলা সচেতন হয়ে বল্‌লে, সত্যি, আমার বড্ড অন্যায় হয়ে যাচ্ছে, মোহিত। তোমার আজকের সকালবেলাটায় আমি বিষাদের ছায়া এনে দিলুম।

মোহিত যেন শীলার কথা শুনতেই পায়নি' এমনিভাবে বল্‌লে, বাস্তবিক···দূরথেকে ভিসুভিয়স্‌এর এমন শান্ত সমাহিত মূর্ত্তি দেখে কে মনে করবে যে এরই প্রতাপে দু'হাজার বছর আগে রোমান্‌ সভ্যতার কতকগুলো বিশিষ্ট আত্ম-প্রকাশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।···এর রুদ্র লেলিহান শিখার আবাহন কেউ শুনতে পায়নি' আকস্মিকতার প্রচণ্ডতায় সবাই হয়ে গিয়েছিল জড়, প্রবুদ্ধ··

শীলা বল্‌লে, নাম্‌বে'—গিয়ে একবারটি দেখে আসবে?

—নাঃ, আজ মাটির স্পর্শের কথাটি মনে হ'লে শিউরে উঠ্‌ছি। মনে হচ্ছে এই ত' আমাদের বিচ্ছেদের বিমান···সাগরদোলা আমাদের এনে দিয়েছিল নিবিড় ক'রে, এই মাটি এনে দেবে বিনাশের দুর্দ্দম বন্যা।...মাটিকে আমি আর ভালবাসতে পারবনা, শীলা।

শীলা বল্‌লে, তাইত' বল্‌ছি মোহিত, শেষ কটা ঘণ্টা সম্পূর্ণভাবে উপভোগ ক'রে নেই। পরিচয় ত শেষ হয় না কখনও, নব নব বিস্ময়ে নতুন অজানার ভেতর দিয়ে নিজে-দের জান্‌বার চেষ্টা করি।···আসবে?

মোহিত হেসে বল্‌লে, অর্থাৎ তুমি বল্‌তে চাও যে বিদায়ের মুহূর্ত্ত যখন আস্‌বে তখন তার আগেকার গভীর অনুভূতির আনন্দ আমাদের মনটিকে করে রাখ্‌বে আচ্ছন্ন, মোহগ্রস্ত—শেষ কথাটি বল্‌বার নিষ্ঠুরতাও যেন আমাদের চৈতন্যের দুয়ারে স্পষ্টভাবে ঘা' দিতে না পারে।

ঠিক হ'ল যে তারা দু'জনে নেপ্‌লস্‌এ নাম্‌বে। মোহিত শীলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কৃপালানির সাথে দেখা কর্‌তে গেল।

কৃপালানি সেকেণ্ডক্লাস ডেকে এসে যোশীর সাথে গল্প করছিলেন। মোহিত তাকে সম্ভাষণ করে বললে, আপনারা কি নেপ্‌লস্‌ দেখ্‌তে নাম্‌বেন, কৃপালানিজী?

কৃপালানি বললেন ভাব্‌ছি···আপনি যাচ্ছেন কি?

—হ্যাঁ, আজি যাবো···মিস্‌ রজার্স এর সাথে এই মাত্র সেটা ঠিক ক'রে এলুম।

কৃপালানি একটু মুচ্‌কে হেসে বললেন, তাহ'লে আমাকে খুঁজ্‌ছেন কেন বাবুজী?···গাইড্‌ভাবে?

মোহিত একটু লজ্জিত হয়ে বললে, না···আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি···

কৃপালানি বিস্মিত হয়ে বললেন, বিদায়? সে কী বাবুজী?···

মোহিতের নিজের অসতর্কতায় প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল। সে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে একটুখানি কৌতুকের সুরে বললে, বলাত যায় না, কৃপালানীজী! ভিসুভিয়স্‌ দেখতে গিয়ে যদি তার দগ্ধ-গলিত আগুনের মধ্যে পড়ে যাই তাহ'লে বিদায় নেবার অবসর আর নাও হতে পারে!

যোশী এতক্ষণ চুপকরে শুনছিল, সে বললে, তোমার দুরদর্শিতার বাহাদুরী আছে, মোহিত!···খবরটা পেলে কোথায়, জাহাজে Siesmographএ?

মোহিত বললে, জাহাজে নয় মনে···

কথার ধারাটা যেন চলছিল একটা হাসিমেশানো বিদায়-পালার মত। কৃপালানি একটু ব্যস্ত হয়ে বললেন, তোমাকে আমার বড্ড ভয় হয়, বাবুজী···কখন কী ক'বে বস!

মোহিত হেসে বললে, সত্যি!

—ঠাট্টার কথা নয়, বাবুজী...তুমি হচ্ছ ভয়ানকভাবে ভাবুক। তোমার মন ত ফটোগ্রাফের প্লেটের মত নয়, তাতে অদৃশ্য চিত্রকরের তুলির অনেক রংও এসে পড়ে। ভয়ের কথা এই যে এই রংগুলো আমাদের মত সাধারণ লোকের পরিধির মধ্যে আসে না।

মোহিত আশ্বাস দিয়ে বল্‌লে, তুমি ভেবো না, কৃপালানিজী! আমার মন তুমি যেমনটি বল্‌ছ তেমনটি যদি সত্যি সত্যি হয়ে থাকে তাহ'লে আমি অক্ষত শরীর নিয়ে ফিরে আস্‌ব।

ব'লে মোহিত তার ক্যাবিনের দিকে চলে গেল। কৃপালানী একটুখানি ঘাড় নেড়ে যোশীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, বাবুজী, এই জাহাজে তোমার বন্ধুটি আর ফিরবে না। পুরাণো ঘাটে পুরাণো মালমসলার মাঝখান থেকে সে কিছু দিনের জন্যে রেহাই চায়, তার মনটাকে ভাল করে পরখ ক'রে দেখবার জন্যে।

ক্যাবিনে গিয়ে মোহিত তার জিনিষ-পত্তর গুলো সব গুছিয়ে রাখলে। চিদম্বরম্‌ ছিল না, তাই সে নির্ব্বিবাদে এবং নিরুপদ্রবে তার কাজকর্ম্ম সেরে গুটিকয়েক জিনিষ নিয়ে ফার্ষ্ট ক্লাশ ড্রইং-রুমে হাজির হ'ল।

শীলা সেখানে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। মোহিত হেসে তাকে বললে, নেপল্‌স্‌এর ভবঘুরে গায়কদের mandoline বাজানো শুনেছি খুবই নাকি সুন্দর... গোধূলির আঁধারের সাথে তার ছায়া ঘুরে ঘুরে মরে, আলোর কিরণ রেখায় তা' ভাস্বর হয়ে ওঠে···

নেপল্‌স্‌ এ নেমে মোহিত বললে, আজ আর কোথাও ঘুরব না শীলা···ভিসুভিয়স্‌এর সামনে যাবার আমার একটুও ইচ্ছা নেই।

শীলা বিস্মিত সুরে প্রশ্ন করলে, কেন?

—দূর থেকে যা' দেখেছি তার গভীরতা নষ্ট হয়ে যাবে ওর সামনে গেলে। ওর ধ্বংস-লীলার কথা মনে হবে বারবার, ওর পেছনে যে সব-ছড়িয়ে-যাওয়া একটা অনুপম রহস্য আছে সেটার দ্বার যাবে খুলে।...সে আমি চাইনে, শীলা···

—কেন মোহিত?

—কেন, জানি না। আজ শুধু স্তব্ধভাবে প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত নিবিড় করে অনুভব করে নিতে চাই...বাইরের কোন প্রকার বাতাসকে আমার মানস-সরোবরে একটুও ঢেউ তুলতে দেব না আমি।

—তাহ'লে কোথায় যাবে?

—যেদিকে দু'চোখ যায়···

কথাটা বলা খুবই সহজ, কিন্তু বাস্তবের নগ্নতায় তার

মাধুর্য্য অনেকখানিই নষ্ট হয়ে যায়। শীলা কিন্তু কোনই প্রতিবাদ করলে না—সে স্থিরই করে এসেছিল আজ সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেবে মোহিতের কাছে...আত্ম-বিসর্জ্জনের যে সুখ তা' সে গভীর ভাবে উপভোগ করে নিবে নেপ্‌লস্‌এ—মোহিতের সাহচর্য্যে।

পথ-ঘাট মোহিত কিছুই চিনে না। দল ছাড়া এই দুটি তরুণ-তরুণী কী-কর্‌বে ঠিক কর্‌তে না পেরে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সমুদ্রের ধারে বিশাল promenade-এর পাশ দিয়ে। দূরে জাহাজের ছবি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছিল।

শীলা বল্‌লে, আমরা যে সহর ছেড়ে চলে আস্‌ছি মোহিত।

মোহিত জবাব দিলে, সহরের মাঝেই যে থাক্‌তে হবে তার কি কোন মানে আছে।

শীলা চুপ করে রইল।

মোহিত তখনও promenade ধরে হাঁটছে। শীলা একটু ক্লান্তি বোধ করছিল, সে আস্তে আস্তে মোহিতের বাঁ-বাহুর মধ্যে নিজের ডান হাতটি গলিয়ে দিলে।

এতক্ষণ মোহিতের যেন কোন খেয়ালই ছিল না, শীলার হাতের স্পর্শে সে একটুখানি সচকিত হয়ে বল্‌লে, তোমার ক্লান্তি বোধ হচ্ছে শীলা?

শীলা ঘাড় নাড়লে।

মোহিত বল্‌লে, আমার বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে, শীলা··· আর একটুখানি চলো, কোলাহল থেকে আরও দূরে চলে যাই, তারপর বস্‌ব কোথাও।

একটু পরে শীলা মৃদুস্বরে প্রশ্ন কর্‌লে, আমাদের ষ্টিমার ছাড়বে তিনটায় সেটা ভুলে যাওনি ত?

হেসে মোহিত উত্তর দিলে. ভুলতে চাইলেও ষ্টিমার কি তা ভুল্‌তে দিবে? তার বাঁশী বেজে উঠবে দৈত্যের হুঙ্কারের মত·· জানাবে, ওগো, এসো, আমার বিশাল ছায়ার মধ্যে আবার আশ্রয় নাও··

খানিকটা দূর গিয়ে মোহিত দাঁড়ালে···সমুদ্রের নীল রেখা সেখানে অর্দ্ধচন্দ্রাকার হয়ে দিগন্তে মিশে গেছে···ঢেউ-এর উদ্দাম উচ্ছ্বাস সেখানে নেই বল্‌লেই চলে, মাঝে মাঝে দুই একটা স্রোত মাটিতে এসে লাগছে, যেন লুব্ধ প্রেমিক এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রেয়সীকে লুকানো চুমু খাচ্ছে, আবার লজ্জারুণ মুখে সরে যাচ্ছে...

শীলা বল্‌লে, ভারী সুন্দর এখানকার জলটা না মোহিত?

মোহিত বল্‌লে, আমার কী মনে হচ্ছে জানো।

—কী?

—জীবন-পথের আশেপাশে সুধায় ভরা কত ফল পাতার আড়ালে ঢাকা থাকে, আমাদের চোখ নেই বলে আমরা তা এড়িয়ে যাই, উপবাসী ক্ষুধা নিয়ে ঘুরে বেড়াই অনিশ্চিতের পেছনে। তার ফল হয় এই যে শ্রান্তি এবং অবসাদে আমাদের মন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

—এখনও কি তুমি অনিশ্চিতের পেছনে ঘুরছ?

—না···কিন্তু সেই ব্যর্থ ঘোরাটির কথা বিশেষ করে মনে হচ্ছে আজ, যেহেতু অজানতে সহসা সুধার রস আমার মিলেছে।

শীলা নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

মোহিত তার বাঁ-বাহুতে আবদ্ধ শীলার ডান হাতটি নিজের হাতের দুটি মুঠোর মধ্যে নিয়ে ঠোঁটের কাছে এনে তাতে ছোট্ট একটি চুম্বন করে বল্‌লে, দেশ থেকে যখন বেরিয়েছিলুম তখন কি আমি স্বপ্নেও ভাবতে পার্‌তুম এম্‌নি অকস্মাৎ সাগর দোলার ঢেউএর সাথে সাথে আমার মনের ছন্দঃ প্রকাশিত হয়ে উঠবে সজীব একটি মূর্ত্তিতে, যে আমার স্বপ্ন-প্রিয়ার সাক্ষাৎ মিল্‌বে পৃথিবীর মাটির বাইরে?

শীলা অসহ্য পুলকে-ব্যথায় চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বল্‌লে, কিন্তু, মোহিত, মাটির সাথে যার সম্বন্ধ নেই তা'ত বুদ্‌বুদের মত সাগরের বুকেই মিশে যাবে! ঢেউত কখনও স্থির নয় সে-যে চিরচঞ্চল!

গভীর ভাবে খানিকক্ষণ চিন্তা করে মোহিত হঠাৎ বল্‌লে, শীলা, আজ আমার মাথার ঠিক নেই···কত কথাই যে মনে আস্‌ছে কী বল্‌ব! যদি অন্যায় কিছু ক'রে বা বলে বসি তাহ'লে আমার ক্ষমা করো!

এ আবার কী কথা?—গভীর বিস্ময়ে শীলা মোহিতের দিকে তাকালে। মোহিত তার ভীতত্রস্ত চাউনী দেখে

আশ্বাসের সুরে তাকে বললে, ভয় পাবার কিছু নেই···আমার খেয়ালগুলো শুধু তুমি আজকের দিনটির মত মাপ ক'রে নিয়ো।

খুব ধীরস্বরে শীলা বললে, কিন্তু তুমি আজ এতে অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ছ কেন?

—অস্থির হয়ে উঠ্‌ছি কি?

—কেন, তুমি নিজে কি সেটা বুঝ্‌তে পারছ না, মোহিত?

—হবে!···বলে মোহিত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। শীলা বললে, অমন ক'রে গম্ভীর হয়ে থেকোনা এখন।··· এই না তুমি বলছিলে আজকের সময়টুকুর প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত ভরে দিবে নিবিড় আনন্দের ছটায়?...আর এখুনি তোমার মুখ হয়ে আসছে বর্ষার থমথমে আকাশের মত।

মোহিত জবাব দিলে, সত্যি শীলা, আমার এমন গম্ভীর হয়ে থাকাটা উচিত হচ্ছে না!...ব'লে সে শীলাকে দু'বাহুতে জড়িয়ে ধরে তার রক্ত অধরে চুমু খেলে···তারপর হেসে বললে, এবার আর নালিশ করবে না ত?

শীলা কিন্তু সন্তুষ্ট হ'ল না, বললে, কিন্তু তোমার সব ভাবভঙ্গীর মাঝে কেমন একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করছি আজ।

এর কোন জবাব মোহিত দিতে পারলে না। কথাটা এড়িয়ে যাবার জন্যে বললে, চুপ করে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার মোটেই ভালো লাগ্‌ছে না, শীলা...এসো, ছায়ায় কোথাও বসি।

সমুদ্রের ধারেই পাহাড় উঠে গেছে আকাশের দিকে, স্তরে স্তরে। অঙ্গে তার সবুজ ঘাসের আঁচল···সোজা ঢালু পাহাড় নয়, তার মধ্যেও যেন ঢেউ খেলছে, সাগরের ঢেউএর সাথে পাল্লা দিয়ে। পাহাড়ে উঠে ছায়া সুশীতল একটি কোণ খুঁজে মোহিত বললে, এখানে বসা যাক্ এখন...

শীলা বসল। মোহিত আর কোন কথাটি না বলে তার কোলের উপর মাথাটি রেখে সটান শুয়ে পড়ল।

শীলা প্রথমে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কিছু না বলে গভীর স্নেহ ভরে মোহিতের মাথার কালো চুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে বললে, তুমি কিন্তু ভয়ানক খেয়ালী হয়ে উঠ্‌ছ আজ, মোহিত!

মোহিত তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে জবাব দিলে, হুঁ···

—হুঁ নয়, সত্যি···

মোহিত প্রশ্ন করলে, তুমি আমার খেয়ালীপনা ভালোবাস না, শীলা?

তার কথায় অভিমানের সুর। শীলা মোহিতের চুলগুলোর মধ্যে দ্রুতবেগে অঙ্গুলী চালনা করে বললে, ভালোবাসি বৈ কি...তোমার খেয়াল যে এ···

মোহিত চুপ করে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। খানিক পরে প্রশ্ন করলে, তোমাদের দেশে আকাশ বোধ হয় এমন নীল নয়, নয় কি শীলা?

শীলা বললে, না···শাদা কুয়াসা আর কালো ধোঁয়াই যে আকাশকে ছেয়ে রাখে সেখানে। সোনার আলো সেখানে যদি কখনও দেখা যায় তাহ'লে আনন্দের ফোয়ারা ছোটে সকলের প্রাণে।

মোহিত প্রশ্ন করলে, তোমার দেশে পৌঁছে তুমি সবই ভুলে যাবে শীলা, নয় কি?

একটুখানি ইতস্ততঃ ক'রে নত হয়ে মোহিতের কপালের উপর চুলের কাছটায় একটি চুমু খেয়ে শীলা বললে, ভুলতে পারতুম, মোহিত, যদি এর সাথে গভীর অনুবেদনার যোগ না থাকত!...তুমি একটা জিনিষ ভুলে যেয়োনা যে আমরা হচ্ছি মেয়ে, আমাদের অনুভূতির তন্ত্রীতে যদি একবারটি আঘাত লাগে তবে তার মূর্চ্ছনা সমস্ত চৈতন্যকে দেয় আচ্ছন্ন ক'রে···সে কি কখনও ভোলা যায়, মোহিত?

—কিন্তু দেশের মাটীতে পা' দিতেই ত সবাই তোমাকে ছেঁকে ধরবেন চারিদিক থেকে।···তখন কি আর সাগর দোলায় ঢেউখানির কথা তোমার মনে থাকবে শীলা?

গভীর ভাবে শীলা জবাব দিলে, তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন, মোহিত, সমুদ্র অন্তরে অন্তরে নিস্তব্ধ হয়েই আছে—শুধু উপরে উপরে ঢেউ উঠ্‌ছে, জোয়ার-ভাঁটা চলছে।···সমুদ্রের আসলরূপ দেখ্‌তে পাবে অভ্যন্তরে, যেখানে আছে এক রহস্যময় জগৎ··বাইরে ত' শুধু ফেনিল উচ্ছ্বাস মাত্র!

মোহিত শান্তভাবে শীলার কথাগুলি মনের মধ্যে গ্রহণ

করবার চেষ্টা করছিল। খানিক পরে বললে, আমার কিন্তু ভয় হয়, শীলা ··

বিস্মিত হয়ে শীলা প্রশ্ন করলে, ভয়? কেন গো?

—ভয় হয় এই ভেবে যে সমুদ্রের অন্তরের রহস্য বড় গভীর, অতলস্পর্শী। তোমার ভালোবাসা যদি সেরকম না হয়ে তার উপরকার ঢেউএর মত চঞ্চল এবং ক্ষণিক হ'ত তাহ'লে বোধ হয় ভালো হ'ত···

গভীর বিস্ময়ে শীলা বললে, এ কী বলছ তুমি, মোহিত?

—একটুখানি কেমন ঠেকছে, না?···আসল কথাটি হচ্ছে এই যে তোমার ভালোবাসার গভীরতা আমায় করে দিচ্ছে ত্রস্ত। আমার মন তাই বলছে উভয়ের মুক্তির জন্যে যত শীগ্‌গির বিদায়ের মুহূর্ত্ত চলে আসে ততই বোধ হয় হবে ভালো!

—কিন্তু তোমার অনুবেদনাও যদি আমারই মত গভীর হয়ে থাকে তাহ'লে বিচ্ছেদে ত সান্ত্বনা মিলবে না, মোহিত...

—মানি, কিন্তু এক্ষেত্রে বিচ্ছেদ ছাড়া উপায় কী শীলা?···যা' অবশ্যম্ভাবী তাকে উপেক্ষা করে ত কোন লাভ নেই! তাই বলছি, জোর করেও মনকে বিশ্বাস করাতে হ'বে যে এ সাগরদোলায় ঢেউ ছাড়া আর কিছুই নয়!···সাগর-অন্তঃপুরের নিস্তব্ধতার কথা ইচ্ছা করেই যাব ভুলে!

—পারবে?

—না পারলেও চেষ্টা করতে হবে, শীলা।···এবং সেই জন্যেই বিদায়টাকে করে তুলতে হবে অকস্মাৎ, যাতে চিন্তা করবার অবসরটুকু পর্য্যন্ত মন না পায়···ভাববার অবসর পেলেই মন যাবে ঢেউএর নীচেকার রহস্য আবিষ্কারের লোভে।

শীলা কিছু বললে না। মোহিতের মনের দ্বন্দ্ব সে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করছিল···বুঝতে তার কোনই কষ্ট হচ্ছিল না, কারণ তার মনের মধ্যেও যে সেই একই ছন্দে গাঁথা বিক্ষোভের প্রবাহিণী চলছিল। সে ধীরে ধীরে মোহিতের কপালটির উপর তার ডান হাতটি রাখলে।

মোহিত এই স্নেহস্পর্শ উপভোগ করতে করতে বললে; যদি আমাদের এমনি বিচিত্রভাবে দেখা না হ'ত তাহ'লে কোন ক্ষতি হত কি?

শীলা বললে, না···অনুভূতি না থাকলে অভাবের কথা যে উঠতেই পারেনা!

খানিকক্ষণ নীরব থেকে মোহিত বললে, জানো, এক একবার ব্রাউনিংএর মত আমার বলতে ইচ্ছা হয়, এই যে বেদনাপূর্ণ আনন্দের ছোঁয়াচটুকু পেয়েছি এই বা কম কি? এর দামও ত' নগণ্য নয়!···কিন্তু নিজের জীবনের ছন্দের সাথে ব্রাউনিংএর ফিলসফি মিলাতে গিয়ে দেখি, ব্রাউনিংএর মত দৃঢ়তা এবং বিশ্বাস আমার নেই!

সান্ত্বনামিশ্রিত ভাষায় শীলা বললে, সে অভাব শুধু তোমার একা নয়, মোহিত···বিশ্বজোড়া লোকের সম্বন্ধেই এই কথা খাটে।

অনেকক্ষণ মোহিত চুপ করে শীলার কোলে মাথা রেখে শুয়ে রইল। তারপর হঠাৎ উঠে শীলার মাথাটি নিজের বুকের উপর চেপে ধরে বললে, কেন যে তোমায় ভালোবেসেছি, শীলা, আমি নিজেই বুঝতে পারছিনা···আমার সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা ছিল তোমাকে ভালোলাগার বিরুদ্ধে, কিন্তু মনের খেলা এমনই বিচিত্র যে সে কোন বাঁধা আইন-কানুন মেনে চলেনা—সে চলে তার নিজের খুসীতে···খেয়াল মর্ত্তে···

দুপুর পড়ে আসছিল তখন। মোহিত মৃদুস্বরে বললে, খিদে পেয়েছে, শীলা, না?

শীলা একটুখানি হাসলে।

মোহিত বললে, কিন্তু আজ তোমায় উপোসী থাকতে হ'বে শীলা···এখান থেকে আমি এখন নড়ছিনা—আর এ জায়গায় বসে খাবার ত মিলবে না!

শীলা শুধু বললে, দরকার নেই কিছু···

মোহিত বললে, আচ্ছা, শীলা, যদি তোমার সাথে আর দেখা না হয় তাহ'লে তুমি আমার সম্বন্ধে যা' তা' ভাববে কি?

অবাক হয়ে শীলা বললে, তোমার মনের মধ্যে দুরন্ত একটা খেয়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে, মোহিত, আমার কাছে তুমি লুকোবার চেষ্টা ক'রো না!

ম্লানহাসি হেসে মোহিত বললে, খেয়াল কিছুই নেই, শীলা…যা' মনে আসছে তাই শুধু বলছি…

মোহিতের বুকে মুখ লুকিয়ে শীলা প্রশ্ন করলে, আমায় তুমি বলোনা কী প্ল্যান্ তোমার মনের মধ্যে তোলপাড় করছে এখন…

তেমনি হেসে মোহিত জবাব দিলে, প্লান থাকলে ত বল্‌ব, শীলা!…মনটা হয়ে উঠেছে ভবঘুরে, বাঁধন মানছে না, নিয়ম শুনছেনা, তাই মুখের ভাষার মধ্য দিয়ে যা-খুসী-তাই বলাচ্ছে।

ঘড়িতে দুটো যখন বাজ্‌ল তখন শীলা বললে, এবার ত উঠতে হ'বে মোহিত…জাহাজ ছাড়বে আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই।

মোহিত তার হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, হাঁ; এবার তোমায় ষ্টীমারে পৌছিয়ে দিতে হ'বে…

উঠ্‌ল। সাগরপারি ধরে আবার তারা হাঁটা সুরু করলে, নেপল্‌স্‌এর জনকোলাহলের অভিমুখে। পথে তারা শুনলে জাহাজের প্রথম বাঁশী বাজ্‌ল।

মোহিত বল্‌লে, বড্ড দেরী হয়ে গেছে, শীলা, জাহাজে পা' দেবার সাথে সাথেই চলা সুরু হবে কিন্তু…

—Miss করব না ত?

—না…ঠিক সময়ে আমরা গিয়ে পৌছিব।

জাহাজের কাছে যখন তারা গিয়ে পৌছ্‌ল তখন সিঁড়ি তুলে নেবার মাত্র মিনিট দশেক বাকী। শীলা আর মোহিত তাড়াতাড়ি উপরে উঠে চলে গেল।

যোশী আর কৃপালানি ফার্ষ্ট ক্লাশ ডেকের সামনেই দাঁড়িয়েছিল—এই যাত্রী-দুটির আগমন প্রতীক্ষায়। তাদের আসতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যোশী বল্‌লে, আমাদের যা' ভাবনা হয়েছিল; মিস্ রজার্স…ভাব্‌লুম আজ মোহিতের পাল্লায় পড়ে বুঝি ভিসুভিয়সের আগুনের চারদিকে বুঝি ঘুরেবেড়াতে আরম্ভ করেছ আলেয়ার মত!

শীলা বল্‌লে, আমরা ত ভিসুভিয়স্ দেখ্‌তে যাইনি', যোশী। আমরা ওইদিক দিয়ে হেঁটে চলে গিয়েছিলুম অনেক দূর—পাহাড়ের মধ্যে…

মোহিত এমন সময় "এই এখ্‌খুনি আস্‌ছি" ব'লে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

কৃপালানি বল্‌লেন, বাবুজী—মিঃ সেন—কোনরকম পাগ্‌লামি করেননি' ত?

রাঙা হয়ে শীলা জবাব দিলে, না…তবে আজ তাঁর মনটা খুবই চঞ্চল ব'লে মনে হচ্ছিল।

কথা বল্‌তে বল্‌তে তারা রেলিং থেকে সরে এসে দাঁড়ালে।

জাহাজের শেষ বাঁশী বাজ্‌বার সাথে সাথে সিঁড়ি উঠিয়ে নেওয়া হ'ল। ভিসুভিয়স্ এবং পম্পিয়াই দেখে প্রত্যাগত যাত্রীরা এখানে ওখানে জটলা করে খুব গভীর তর্ক এবং আলোচনা কর্‌বার চেষ্টা করছিল। একটি সুন্দরী তরুণীকে ঘিরে কয়েকটি যুবক ভীষণ উৎসাহের সহিত রোম্যান্ যুগের চিত্রকলা সম্বন্ধে মত-প্রকাশ কর্‌ছিল এবং রোম্যান্ যুগের মেয়েদের সৌন্দর্য্যজ্ঞানের চেয়ে তাদের সম্মুখের প্রতিমাটির বিচারবুদ্ধি অনেক বেশী তা' নানাভাবে ভঙ্গীতে বল্‌ছিল।

শীলা ভাব্‌ছিল মোহিত কোথায় গেল।…হঠাৎ তার চোখ পড়্‌ল তীরের দিকে। নেপ্‌ল্‌স্ বন্দরের জেটির উপর দাঁড়িয়ে মোহিত; মুখে প্রসন্ন একটি হাসি, শীলার দিকে তাকিয়ে রুমাল নাড়্‌ছে।

যোশী, কৃপালানি এবং শীলা যখন মোহিতের খেয়াল নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত তখন মোহিত সবার অজ্ঞাতে সরে পড়েছিল, এবং জাহাজ না-ছাড়া-পর্য্যন্ত সে জেটির ভীড়ের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, যাতে তাকে কেউ দেখ্‌তে না পায়।

শীলা অস্ফুট চীৎকার ক'রে যোশী আর কৃপালানির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বল্‌লে, দেখ, দেখ, মোহিত যে পড়ে রইল!

কৃপালানি আর যোশী দেখ্‌লে তারা তাকাতেই মোহিত দুটি হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে তাদের নমস্কার করলে। তারপর শীলার দিকে তাকিয়ে আবার রুমাল নাড়্‌লে।

একটি মুহূর্ত্তের জন্য শীলা কী যেন ভাব্‌লে। যোশী এবং কৃপালানির দিকে একবারটি তাকালে, তারপর নিজের রুমাল নিয়ে ঠোঁটে একবার স্পর্শ করে নাড়্‌লে।…তার সমস্ত অন্তর মথিত করে উঠ্‌ল একটা চাপাকান্নার সুর—তার

কানের কাছে বেজে উঠ্‌ল মোহিতের শেষ কথা ক'টি, মনটা হয়ে উঠেছে ভবঘুরে, বাঁধন মান্‌ছেনা, নিয়ম শুন্‌ছেনা, তাই মুখের ভাষার মধ্য দিয়ে যা-খুসী-তাই বলাচ্ছে···

মনে মনে সে বল্‌লে, তুমি তোমার মনকে শান্ত কর্‌বার পথ খুঁজে নিয়েছ, প্রার্থনা করি তুমি সফল হও।...যৌবনের প্রারম্ভে আমার মত তুচ্ছ একটা মেয়ের জন্যে তোমার জীবন, শিক্ষা, দীক্ষা বিসর্জ্জন দেবার বিরুদ্ধে যে তুমি যুঝ্‌ছ তার জন্যে তোমাকে আমার মনের শ্রদ্ধা ও প্রীতিজ্ঞাপন কর্‌ছি।

কৃপালানি আস্তে আস্তে শীলাকে প্রশ্ন কর্‌লেন, আপনি কিছুই জান্‌তেন না এ প্ল্যানের কথা?

শীলা কোনক্রমে অশ্রুরোধ ক'রে ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

কৃপালানি একটু অবাক্ হয়ে গেল।

জাহাজ তখন ধীরে ধীরে বন্দর ছাড়িয়ে উন্মুক্ত সাগরে এসে পড়্‌ছে। দূরে নেপ্‌লস্‌-এর জেটির ছবি তখনও দেখা যাচ্ছিল—মোহিতের প্রস্তরসম মূর্ত্তি তখনও দৃষ্টির বহির্ভূত হয়নি', তার হাতের রুমাল তখনও নড়্‌ছিল। রুমালের প্রত্যেকটি স্পন্দনের সাথে যেন মোহিতের গভীর অনুবেদনা ঝরে পড়্‌ছিল...যেন সে বল্‌ছিল, সমুদ্র অন্তরে অন্তরে নিস্তব্ধ এবং গম্ভীর হয়ে আছে এবং থাক্‌বেও, কিন্তু বাইরে তার ফেনিল উচ্ছ্বাস সে দৃঢ়ভাবে গোপন ক'রে রাখ্‌বে, কারণ সে পূর্ণতালাভ করেছে, অনুভূতির চরমসীমায় তার অন্তর যে পৌঁচেছে!

উন্মুক্ত সাগরের মধ্যে জাহাজ এসে পড়্‌তেই আবার সেই আগের মত দোলানির সুরু হ'ল। আরম্ভ হ'ল ঢেউএর সেই নিষ্ঠুর খেলা, যা' অনাদিকাল থেকে চল্‌ছে...এবং যা' অনাদিকাল ধরে মানুষের মন নিয়ে যা-খুসী-তাই কর্‌ছে!

শীলা ধীরে ধীরে রেলিং থেকে সরে দাঁড়াল। তার মুখ নীরব অশ্রুতে সজল।

(সমাপ্ত)

শ্রীনবগোপাল দাস

# বিদ্যালয়-সমাজ

শ্রীঅনাথনাথ বসু

(Corporation Teachers Training Collegeএ প্রদত্ত বক্তৃতা)

আজ আপনাদের একটি নূতন সমাজের কথা শুনাইব। আবহমানকাল হইতে আমাদের দেশে বিচিত্র জাতি ও ধর্ম্মের কল্যাণে নানা বিচিত্র সমাজের উদ্ভব হইয়াছে এবং তাহাদের কথা আপনারা অনেকেই শুনিয়াছেন। কিন্তু আমি যে সমাজের কথা বলিব সে সমাজ বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশের অতি অল্প লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার কারণ এই নহে যে ইহা আত্মগোপন করিয়া আছে; আমার আলোচ্য এই সমাজ গুপ্তসমিতি নহে বরং ইহা এতই সুপরিচিত ও সুব্যক্ত যে ইহাকে আমরা লক্ষ্যই করি না, ইহার সমাজরূপ আমাদের চোখে পড়ে না।

আমরা সকলেই শিক্ষাব্রতী, বিদ্যালয় লইয়া আমাদের কারবার। সুতরাং যেমন সাধারণ ব্যবসায়ে মাঝে মাঝে Stock অর্থাৎ সঞ্চিত পণ্যের হিসাব-নিকাশ করিলে ব্যবসায়ের প্রকৃত রূপটি চোখে পড়ে এবং কাজ বোঝা যায়, তেমনি আমাদের কারবারেরও হিসাব-নিকাশ করিলে আমাদের কাজ করা সহজতর হয়। সুতরাং বিদ্যালয়ের স্বরূপ, তাহার আদর্শ ইত্যাদি সম্বন্ধে মাঝে মাঝে আলোচনা করিলে লাভ ছাড়া ক্ষতি হয় না। অবশ্য এরূপ আলোচনায় ইতিহাস বা অঙ্ক বা অন্য কোন অধ্যাপনীয় বিষয় কেমন করিয়া ভাল করিয়া পড়ান যাইতে পারে তাহার কোন ইঙ্গিত মিলিবে না। এ কথাটী পূর্ব্বাহ্নেই বলিয়া রাখা ভাল তাহা হইলে ভবিষ্যতে কোনরূপ অনুতাপের কারণ ঘটিবে না। আমার আলোচনা মূলতঃ শিক্ষাদর্শন সম্বন্ধে, শিক্ষার ফিলজফি লইয়া।

আপনারা প্রশ্ন করিতে পারেন "ফিলজফি" লইয়া আলোচনার লাভ কি? যিনি কর্ম্মী তিনি বলিবেন কর্ম্মের ব্যস্ততার মধ্যে "ফিলজফি" লইয়া মাথা ঘামাইতে পারি এমন অবসর কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতেছি। আমি জানি 'ফিলজফি' কথাটাই অনেকের মনে ভয়ের সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু সে ভয়ের কোন কারণ নাই; আমি যদি বলি আমাদের সকলেরই একটা না একটা ফিলজফি আছে এবং আমরা সকলেই ছোট বড় ফিলজফার, দার্শনিক, তাহা হইলে অনেকেই হয়ত বিস্মিত হইবেন। কিন্তু কথাটা একান্তই সত্য সুতরাং বিস্ময় অকারণ।

একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় জীবনে চলিবার, জীবনকে দেখিবার সকলেরই একটী না একটী বিশেষ ভঙ্গী আছে; সকল কর্ম্মে ও চিন্তায় সেই ভঙ্গীর প্রভাব আছে। জীবনকে দেখিবার সেই বিশেষ রীতিকে, জীবনপথে চলিবার সেই বিশিষ্ট গতিচ্ছন্দকেই আমি 'ফিলজফি' আখ্যা দিয়াছি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা সুসংহত ও সহজ লক্ষ্য নহে। তাহা ছাড়া অনেক স্থলেই একই জীবনে একাধিক ভঙ্গী, একাধিক গতিচ্ছন্দ চোখে পড়ে। আমাদের জীবনের যত কিছু দুঃখ তাহার মূল এইখানেই। "সূত্রে মণিগণা ইব" যে ফিলজফি আমাদের জীবনের সকল কর্ম্ম ও চিন্তা একসূত্রে বিধৃত করিয়া রাখিবে তাহা না থাকায়, আমাদের জীবনে একটিমাত্র ফিলজফি কার্য্যকরী না হওয়ায় জীবনটায় জট পাকাইয়া যায়। আমরা এক ভাবি আর করি; এক পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ আর একটা পথ ধরিয়া বসি। সুতরাং জীবনযাত্রা ব্যাহত, ছন্দোহীন হইয়া পড়ে।

এত গেল সাধারণ জীবন সম্বন্ধে, এখন তাহা লইয়া আলোচনা করিবার অবকাশ নাই। কিন্তু যেমন জীবনকে

সফল করিয়া তুলিতে হইলে জীবন সম্বন্ধে একটা ফিলজফি, থাকা প্রয়োজন তেমনি শিক্ষাদান ব্যাপারকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে শিক্ষার একটা ফিলজফি থাকা একান্তই প্রয়োজন।

আমার মনে হয় আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ সব চেয়ে প্রয়োজন হইয়াছে একটা সুসংহত, সুসংবদ্ধ ফিলজফি। শিক্ষার সমস্ত বিশৃঙ্খলার মূলে রহিয়াছে এরূপ একটী ফিলজফির অভাব। তাহার জন্যই আজ যে শিক্ষা দিতেছে সে জানে না কেন সে শিক্ষা দেয়, যে শিক্ষা পাইতেছে সে বোঝে না যে কেন সে শিক্ষা লাভ করে। ফিলজফির বিশেষ কাজ জীবনের মূল্য নির্দ্ধারণ, হিসাব-নিকাশ, কেন বাঁচি, কেমন করিয়া বাঁচি এ সকল প্রশ্নের উত্তর ফিলজফি দেয় বা তাহার দেওয়া উচিত। তেমনি শিক্ষাব ফিলজফির উদ্দেশ্য শিক্ষাবিষয়ে এরূপ প্রশ্নের সুসংবদ্ধ উত্তর দান। কেন পড়াইব, কি পড়াইব, কেমন ভাবে পড়াইব এসকল প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার ফিলজফিই দিতে পারে। যদি সে ফিলজফির অভাব হয়, যদি আমাদের মনে শিক্ষা ব্যাপারের সমগ্র রূপটি না থাকে তাহা হইলেই পদে পদে বাধা আসে। কোন প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া সম্ভব হয় না। তখন নিজের মন হইতে প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া পরের উপর উত্তরের জন্য বরাত দিই। সত্য বলিতে হইলে আমাদের মধ্যে অনেককেই স্বীকার করিতে হয় যে অমুক বিষয়টী যে পড়াই তাহার একমাত্র যুক্তিযুক্ত কারণ কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ। "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম"; প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আবার অর্থকরী বিদ্যার যুক্তি চলে না। কিন্তু এমন করিয়া ত' কর্ত্তব্য শেষ হয় না; পরের কাছে জবাবদিহী না-ই করিতে হইল কিন্তু নিজের কাছে এ জবাবদিহী চলে না। ফলে মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া ওঠে, সকল কর্ম্ম, সকল চেষ্টা অর্থহীন, বোঝা হইয়া দাঁড়ায়; আনন্দ চলিয়া যায়। অবশ্য সুদীর্ঘদিনের অভ্যাসে মন পঙ্গু হইয়া যায়, যে গোপন প্রশ্ন একদিন মনের কোণে অলক্ষ্যে খোঁচা দিত অভ্যাসের দ্বারা তাহা জীর্ণ হইয়া যায়; তখন "সুখের চেয়ে স্বস্তি" ভাল এই নীতি পালন করিয়া অভ্যস্ত পথে সহজভাবে চলি। কিন্তু নিজের প্রতিও শিক্ষার্থীদের প্রতি কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণই থাকিয়া যায়।

শিক্ষকদের মোটামুটি দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় artist (শিল্পী) ও technician (কারিগর); একদল যাঁহারা শিক্ষা ব্যাপারটাকে আর্টরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, আর একদল যাঁহারা তাহাকে একটা বিশেষ techniqueএর অন্তর্গত করিয়াছেন। Artist ও technicianএর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। Technicianকে ঠিক শিল্পী বলা চলে না। তিনি শুধু শিল্পসাধনাকে বাহিরের বস্তুতে পরিণত করিয়া, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার বাহ্য কৌশলটি আয়ত্ত করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টার মধ্যে অন্তরের কোন প্রেরণা নাই; তাহার মধ্যে মূলতঃ অনুচিকীর্ষাই রহিয়াছে; তাঁহার কাজকে সৃষ্টি বলা চলে না। তাহার পিছনে কোন ফিলজফি নাই। কিন্তু যিনি আর্টিষ্ট তাঁহার প্রেরণা ভিতরের, তিনি যাহা করেন তাহা ভাল হউক্ মন্দ হউক সেটা সৃষ্টি-ব্যাপার। সে সৃষ্টির মধ্যে স্বাধীনতা আছে, আনন্দ আছে, পুরাতনের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নূতন কিছু করিবার প্রয়াস আছে। তাঁহার সৃষ্টির মূলে জীবনের একটি বিশেষ ফিলজফি আছে।

কারিগরের কাজ সহজ, শিল্পী হইতে গেলে অনেক ঝঞ্ঝাট। সুতরাং অনেকে কারিগরী করাটাইকে সুবিধা মনে করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে এরূপ কারিগর অনেক পাওয়া যাইবে। বোধ করি আমাদের মধ্যে অনেকেই সেই দলে পড়িব। কিন্তু কারিগরী করিলে বেতনটা সহজে যদিও মেলে কিন্তু আত্মপ্রসাদ, সৃজনরসাস্বাদন পাওয়া যায় না, মনের খোরাক জোটে না।

আজকাল শিক্ষকদের শিক্ষায় method of teaching অর্থাৎ অধ্যাপনা-প্রণালীর উপর জোর দেওয়া হইতেছে। এ যেন কেমন করিয়া হাতিয়ার চালাইতে হয় তাহারই শিক্ষা। সে শিক্ষার প্রয়োজন আছে স্বীকার করি কিন্তু তাহার চেয়েও প্রয়োজন হাতিয়ারের তত্ত্বানুসন্ধান করা; কাজের ফিলজফি খুঁজিয়া পাওয়া। হাতিয়ারও ভাল করিয়া আয়ত্তাধীন করিয়া লইতে হইলে তাহার তত্ত্ব জানিতে হয়। সে তত্ত্ব না জানিলে অসুবিধা এই হয় যে পারিপার্শ্বিক

অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য ঘটিলে সাধারণের বাহিরে একটু কিছু হইলে হাতিয়ার অচল হইয়া পড়ে। অবস্থার ইতরবিশেষে যন্ত্রচালনারও ইতর বিশেষ ঘটে; যে অন্ধভাবে যন্ত্রকেই চিনিয়াছে সে কেমন করিয়া নিপুণভাবে সে পার্থক্য বিচার করিতে পারিবে? তাহার জন্য প্রয়োজন যন্ত্র-তত্ত্বজ্ঞান।

Method শিক্ষা করা শিক্ষকতার ক্ষেত্রে কারিগরি করা। সেই কারিগরীর পিছনে তত্ত্ববোধ থাকা চাই, শিক্ষার ফিলজফি চাই। কেমন করিয়া কাজটা করিব তাহা জানিবার পূর্ব্বে, অন্ততঃ সঙ্গে সঙ্গেই, জানা চাই কেন কাজ করিব, কি উদ্দেশ্যে করিব। এই প্রশ্নগুলির উত্তর পাইলেই তখন কেমন করিয়া কাজটি সুসম্পন্ন করিব সে প্রশ্ন উঠিবে।

শিক্ষা ব্যাপারটাকে দুইদিক দিয়া দেখা চলে। এক, ব্যক্তির দৃষ্টি লইয়া; দুই, সমাজের দিক দিয়া। শিক্ষাতাত্ত্বিক-গণকেও এইভাবে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে; একদল, যাঁহারা শিক্ষাকে ব্যক্তিগত ব্যাপার রূপে ধরিয়া লইয়া সেই ভাবে বিচার করেন; আর একদল, যাঁহারা তাহাকে সামাজিক ব্যাপাররূপে ধরিয়া লইয়া আলোচনা করেন। যাঁহারা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী তাহারা বলেন শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সাধন। আবার যাঁহারা সমাজকে বড় করিয়া দেখিয়া বলেন, সমাজের সুচিরসঞ্চিত আধ্যাত্মিক সম্পদে অধিকার দান করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য; কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর-বিরোধী সত্তা নহে; সুতরাং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীকেও স্বীকার করিতে হয় যে ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সমাজ-নিরপেক্ষ নহে; এবং সমাজ-বাদীকেও স্বীকার করিতে হয় ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শিক্ষাপ্রণালী গঠন করিয়া তুলিতে হইবে। এক নিছক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ছাড়া আর সকলেই বোধ করি একথা অল্পবিস্তরভাবে স্বীকার করেন। সম্প্রতি আর একদল চরম সমাজবাদী বা রাষ্ট্রবাদী দেখা দিয়াছেন; তাঁহাদের মতে ব্যক্তির রাষ্ট্রাতিরিক্ত কোন পৃথক সত্তা নাই। আমাদের দেশে এখনও সে মত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই সুতরাং সে মতের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মতবাদটা কিছু আলোচনা করিতে চাহি, কারণ আমাদের জাতীয় জীবনে সেই মতবাদের প্রভাব নানা ভাবে রহিয়াছে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাব বেশীদিনকার নহে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে ইহার যে রূপ আমরা দেখিতেছি তাহার জন্ম য়ুরোপে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। ঐতিহাসিক হয়ত এই জন্মকাহিনী আরো পুরাতন বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন কিন্তু কার্য্যতঃ ইহা প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যনীতির অন্যতম প্রধান তত্ত্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতি। ডারইউন যখন বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অবলম্বন করিয়া যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন (Survival of the fittest) ও জীবন-সংগ্রাম (Struggle for existence) এই দুই নীতি ঘোষণা করিলেন প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতির জন্ম হইল তখন। ধীরে ধীরে সেই নীতি জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নহে সমাজবিজ্ঞানেও আপন প্রভাব বিস্তার করিল। নানা কারণে তখনকার য়ুরোপের অর্থনৈতিক আবহাওয়াও ছিল এই নীতির অনুকূল। তাহা ছাড়া এই সময়েই গণতন্ত্রবাদ প্রবল হইয়া দেখা দেয়। একদিক দিয়া গণতন্ত্রবাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতির বিরোধ রহিয়াছে। কিন্তু তথাপি প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতি য়ুরোপের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

গণতান্ত্রিক আদর্শের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতিও য়ুরোপ হইতে আমাদের দেশে আমদানি হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া যে শাসক-সম্প্রদায়ের স্পর্শে এই দুই নীতি আমাদের জাতীয়জীবনে আত্মপ্রকাশ করে তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নীতির পরিপোষণা করিতেন। সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতি সহজেই এদেশে সমাদর লাভ করিয়াছিল। আমরা আজকাল যে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক আবহাওয়ায় বাস করিতেছি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতি বলবান। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইহার কি ফল হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহার কি ফল হইয়াছিল তাহাই সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

আপনারা সকলেই শিক্ষার তিরস্কার ও পুরস্কারের ব্যবস্থার

সহিত পরিচিত আছেন; যে ছাত্র ভাল তাহাকে আমরা পুরস্কার দিই, যে ভাল নহে তাহাকে তিরস্কার করি। এই ভাবে শিক্ষায় আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছি। ইহা খুবই স্বাভাবিক; বাহিরের সমাজ যখন সেই নীতি অনুসরণ করিতেছে তখন শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাহার প্রভাব আসিয়া পৌছাইবে তাহাতে বিচিত্র কি? আমি অবশ্য বাছাই-এর অপক্ষপাতী নহি সংসারই ত বাছাই করিয়া লয়; জীবনে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন কিছু পরিমাণে হয়ই; কিন্তু সেই উদ্বর্ত্তনের ফলে যদি অপেক্ষাকৃত অযোগ্যের সমূহ ক্ষতি হয় তাহা হইলেই সমাজদেহ সেই নীতির দ্বারা কণ্টকিত হইয়া ওঠে।

চারিদিকে পুরস্কারবিতরণী সভার ঘটা দেখিয়া মনে হয় প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতি একান্ত উগ্রভাবেই শিক্ষার ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বৃত্তিপরীক্ষা প্রভৃতি অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যাপার দেখিলে সে ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। পুরস্কার দিবার সময় আমরা ভাবিয়া দেখি না যে এই ভাবে বহুতমের যে ক্ষতি করিতেছি তাহা পূরণ করিবার কোন আয়োজনই আমরা করি না। যে ভাগ্যবান পুরস্কার লাভ করেন তাহাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে গিয়া আমরা সুব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন ধিক্কারের দ্বারা অন্য বহু ছাত্রের প্রতি অবিচার করি। যে ক্ষুদ্র শক্তি অঙ্কুরিত হইবার সুযোগ খুঁজিতেছিল আমাদের অযত্নে ও অবহেলায় তাহা আপনার উপর বিশ্বাস হারাইয়া অকালেই অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। অথচ এরূপ অল্পশক্তি লইয় যাহারা জন্মগ্রহণ করে তাহারাই ত' সমাজের সংখ্যা-বহুল। যে শক্তিমান্ তাহার শক্তি কর্ম্মে নিয়োজিত করা যত বড় সমস্যা তাহার চেয়েও বড় সমস্যা সংখ্যাবহুল অল্পশক্তি জনসাধারণের সেই অল্প পরিমাণ শক্তি কি ভাবে কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া সফল করিয়া তুলিতে পারা যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি অস্বীকার করি না প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতি কিছু ফল দেয় কিন্তু সেটা যখন অসংযত উগ্র হইয়া দেখা দেয়, তখন সমাজের অকল্যাণ ঘটে। যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যনীতির উপর তাহার প্রতিষ্ঠা, তাহার পরিণতিও তাহাই। এককালে ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে, ব্যক্তি ও সমাজকে আমরা পরস্পর-বিরোধী সত্তা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং য়ুরোপের আদর্শে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকেই সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম। পাশ্চাত্য জীবনে তাহার উগ্রপ্রকাশের ফলে আমরা সেখানকার সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির যে রূপ দেখিতেছি তাহাতে মনে হয় কথাটা ভাবিয়া দেখিবার সময় হইয়াছে। আমেরিকায় Social planning বলিয়া একটি কথা আজকাল শোনা যাইতেছে; তাহার অর্থ করা যাইতে পারে সমাজ গঠন। সে দেশের মনীষীগণ বলিতেছেন একটা হিসাব করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া সমাজকে নূতন করিয়া পত্তন করিতে হইবে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মিথ্যা দাবী দ্বারা মুগ্ধ হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে সামাজিক ক্রমবিকাশের ধারাকে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না।

ইহা ত গেল এক পক্ষের কথা; অপর পক্ষের কথাও শোনা যাউক। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বলিবেন সংহত সমাজের ব্যক্তির প্রতি অবিচারের কথা ভুলিলে চলিবে না। অনেক সময়েই সামাজিক বিধিবিধান ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এই মতের মধ্যে কিছু পরিমাণ সত্য যে আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যেখানে সামাজিক বিধান ঐশী অধিকারের দাবী করিয়া বসে সেইখানেই দুঃখের সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে ইহার উদাহরণ না দিলেও চলিবে।

মোটের উপর আমরা দুইটী চরমপন্থার কোনটিই স্বীকার না করিয়া মধ্যপথ গ্রহণ করিব। আমরা বলিব ব্যক্তির প্রতিও আমাদের কর্ত্তব্য আছে সমাজের প্রতিও আমাদের কর্ত্তব্য আছে এবং এই উভয় কর্ত্তব্যের মধ্যে কোনটাকেই ফেলা যায় না।

আমার মনে হয় প্রাচীন ভারতে ব্যষ্টির ও সমষ্টির এই আপাত-প্রতীয়মান বিরোধ সমাধানের একটা চেষ্টা হইয়াছিল চতুরাশ্রম পরিকল্পনায়। সকলেই জানেন আপনার প্রতি ও সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের অধিকার ও যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার জন্য প্রথম আশ্রম নির্দ্দিষ্ট ছিল। পরবর্ত্তী আশ্রম পুরাপুরি সামাজিক কর্ত্তব্য পূর্ণ করিবার জন্য বীত হইত। তাহার পর ধীরে ধীরে ব্যক্তি আপনার

ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের কর্ম্মে আপনাকে নিয়োজিত করিত। শেষ আশ্রমে যতীধর্ম্মী ব্যক্তি সমাজের বাহিরে গিয়া পড়িত; সমাজের প্রতি তাহার কর্ত্তব্য তখন শেষ হইয়া গিয়াছে তখন তাহার চেষ্টা আত্মতত্ত্ব-অনুসন্ধান।

আমার মনে হয়-না ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র কোথাও এত সুন্দর ভাবে ব্যক্তির ও সমাজের মিলন বিধানের আয়োজন করা হইয়াছিল।

চতুরাশ্রমের কথা আমরা আজ ভুলিয়াছি; যে সমাজে তাহা প্রচলিত ছিল সে সমাজ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, সে যুগ, সে কাল চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার কথা লইয়া দুঃখ করিলে চলে না।

তবে যেমন করিয়াই হোক্ ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে মিলনসাধন করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আজ যুগসন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। একদিকে জীর্ণ বিধ্বস্ত-প্রায় প্রাচীন সমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িতে পড়িতে আপনার অধিকার আঁকড়াইয়া রহিয়াছে; সকলেই তাহার শাসন অস্বীকার করিতেছে কিন্তু তবুও বনিয়াদি ঘরের রিক্তবিত্ত বৃদ্ধের মত সমাজ তাহার প্রাচীন গৌরব ভুলিতে না পারিয়া আহত অভিমানে বৃথা আস্ফালন করিতেছে এবং শাসন জারি করিবার চেষ্টা করিতেছে, আর একদিকে ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচার চলিতেছে, সেখানে কোন সংযম নাই, কোন শৃঙ্খলা নাই, বহুর প্রতি কর্ত্তব্য স্বীকার ও পালন করিবার চেষ্টা নাই।

একথা বোধকরি আজ কেহই অস্বীকার করিবেন না যে এখন ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে সকল চেয়ে বড় সমস্যা ভাবী সমাজ গঠন। সে সমাজ কিরূপ হইবে, তাহাতে প্রাচীনের কতখানি থাকিবে, নূতন কি কি আনিতে হইবে সে সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সে সম্বন্ধে একটা কথা বলা যাইতে পারে যে সে সমাজ সকলের সহযোগিতায় বহুর কল্যাণে সার্থক হইবে; বহুকে বঞ্চিত করিয়া একের কল্যাণ সাধন সে সমাজের আদর্শ হইবে না। সে সমাজে ব্যষ্টির ও সমষ্টির মিলন সাধিত হইবে। ভাবী ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে আমার এই মতের সঙ্গে আশা করি কাহারও মতদ্বৈধ হইবে না।

যদি জাতীয় জীবনের এই আদর্শ স্বীকার করি তাহা হইলে সেই সঙ্গেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে আমাদের শিক্ষার আদর্শও এই আদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবে। শিক্ষার আদর্শকে সমাজ গঠনের আদর্শের পরিপোষক করিয়া তুলিতে হইবে। তাহার ফলে শিক্ষাপ্রণালীর কি রূপান্তর ঘটিবে তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে শিক্ষা ব্যাপারে সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে কি ভাবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয় তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করি।

যে বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিল তাহার অবস্থা আলোচনা করিলে সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধ ভাল করিয়া বোঝা যায়। বিদ্যালাভ করিলে উপার্জ্জনক্ষম হওয়া যায় এ কথাটার বিচার এ ক্ষেত্রে না করিলেও চলিবে। যে বিদ্যালাভ করিয়াছে শিক্ষা সমাপনান্তে সে কোন কোন্ অধিকার লাভ করিল সেটাই আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

প্রথমেই চোখে পড়ে অধীতবিদ্য ব্যক্তি সমাজে তাহার স্থান লাভ করে; এতদিন একহিসাবে সে কিছু পরিমাণে সমাজের বাহিরে ছিল, বিদ্যা লাভ করিয়া সে যেন নূতন করিয়া সমাজে প্রবেশ অধিকার পাইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ও তাহারই ভিতর দিয়া সমগ্র মানব-সমাজের সকল সম্পদের অধিকার লাভ করিল। পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থার সহিত মিলাইয়া চলিতে শিখিল; সামাজিক কর্ত্তব্য পূর্ণ করিবার যোগ্যতা ও দায়িত্ব লাভ করিল। তাহারই সঙ্গে সে শিখিল কেমন করিয়া তাহার নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ করিতে হয়; তাহার নিজের যে বিশেষত্ব আছে কেমন করিয়া তাহাকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়।

আমি অবশ্য আদর্শ শিক্ষাপ্রণালীর কথা ভাবিয়াই বলিতেছি। দেশে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত আছে তাহার দ্বারা হয়ত ইহার মধ্যে কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা আমার আলোচনার বিষয় নহে।

ক্ষুদ্র শিশু যে ভাবে শিক্ষা আরম্ভ করে তাহার মধ্যেও আমরা সমাজের ও ব্যক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাই। যে আবহাওয়ার মধ্যে সে জন্মলাভ করিয়াছে তাহারই সহিত বোঝাপড়া করা, তাহার সঙ্গে নিজেকে

খাপ খাওয়াইয়া লওয়াই তাহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য, তাহার শিক্ষা। কথা বলা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সকল চেষ্টার মধ্যে এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করা যায়। আপনার যে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে শিশু জন্মগ্রহণ করে তাহার পরিধি বিস্তার করাই যেন তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য। সেই ক্ষুদ্রতার গণ্ডী ছাড়াইয়া যেদিন সে বাহিরের জগতের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিতে পাইল সেইদিনই তাহার নবজীবনে দীক্ষা হইল।

শিক্ষা সামাজিক প্রক্রিয়া; সমাজকে বাদ দিয়া শিক্ষা চলে না। এসম্বন্ধে আমি প্রসিদ্ধ শিক্ষাতাত্ত্বিক John Deweyর মত উদ্ধৃত করিতে চাই। তিনি বলিতেছেন—

"All education proceeds by the participation of the individual in the social consciousness of the race. This process begins unconsciously almost at birth, and is continually shaping the individual's powers, saturating his consciousness, forming his habits, training his ideas, and arousing his feelings and emotions. Through this unconscious education the individual gradually comes to share in the intellectual and moral resources which humanity has succeeded in getting together. He becomes an inheritor of the funded capital of civilisation."

ইহার সারমর্ম্ম এই যে ব্যক্তির সামাজিক বোধে দীক্ষার সঙ্গেই শিক্ষার পত্তন হয়। শৈশবে অলক্ষ্যে এই দীক্ষার ক্রিয়া চলে, ক্রমে সেই ক্রিয়া যখন সুলক্ষ্য ও সুসংবদ্ধ ভাবে হয় তখনই সাধারণতঃ আমরা শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝি তাহা আরম্ভ হয়। ডিউই বলিতেছেন, বাল্যে সামাজিক বোধের সহিত ঘাতপ্রতিঘাতে অলক্ষ্যে শিশুর শক্তি গঠিত হয়, তাহার অভ্যাস নিরূপিত হয়, তাহার মন বিকশিত হইয়া ওঠে, মতামত গড়িয়া ওঠে, মনের ভাব, অনুভূতি ও বেদনাগুলির গতি নির্দ্দিষ্ট হয়। এই ভাবেই ধীরে ধীরে শিশু মানবসমাজের আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকার লাভ করে।

আমাদের দেশে শিক্ষা ও দীক্ষা এই দুইটি শব্দ প্রায়ই একত্রে ব্যবহৃত হয়। ইহার কারণ রহিয়াছে; শিক্ষা ও দিক্ষার সম্পর্ক অতি নিকট। দীক্ষার পূর্ব্বে রহিয়াছে শিক্ষা ও শিক্ষার অন্তে রহিয়াছে দীক্ষা। এককথায় বলিতে গেলে বলা যায় যে শিক্ষার উদ্দেশ্য জীবনে দীক্ষাদান; শিক্ষা না থাকিলে দীক্ষা হইতে পারে না।

এই দীক্ষা একদিকে যেমন ব্যক্তিগত হিসাবে পূর্ণতর জীবনে দীক্ষা আর একদিকে তেমনি সামাজিক জীবনে পূর্ণতর সার্থকতা লাভের দীক্ষা।

আমার এই কথা হইতে বোঝা যাইবে যে আমি ব্যক্তিত্বের বিকাশের পরিপন্থী শিক্ষার পক্ষপাতী নহে। কারণ, শিক্ষার যেমন একটা সামাজিক দিক আছে তেমনি ব্যক্তিগত দিকও আছে; তাহার মূল্য কম নহে। শিক্ষার আরম্ভ ত' ব্যক্তিকে, তাহার দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিগুলিকে লইয়া। এক হিসাবে সামাজিক অবস্থা সেই বৃত্তিগুলির বিকাশের সহায়ক মাত্র। তাহাকে শিশু বৃত্তিগুলির ও বুদ্ধির শান পাথর বলাও চলে; তাহার স্পর্শে আসিয়া সেগুলি তীক্ষ্ণ, কার্য্যক্ষম হইয়া ওঠে। তবে যেমন মাটিতে ক্ষুর শান দেওয়া চলে না তেমনি সামাজিক পারিপার্শ্বিক ব্যতীত শিক্ষা সার্থক হইয়া উঠিতে পারে না।

ব্যক্তিত্বের বিকাশের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ আমাদের দিতে হইবে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে কোনমতে খর্ব্ব করিলে চলিবে না। কি ভাবে শিশু তাহার নিজের গতিতে নিজের ছন্দে জীবনে চলিতে পারে সেই শিক্ষা দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য হইবে। তাহার জন্যে সকল প্রকার আয়োজন আমাদের করিতে হইবে। একথা ভুলিলে চলিবে না যে যে-ভাবী সমাজ আমরা গঠন করিতে চাইতেছি তাহার প্রত্যেক লোকটিকেই স্বাধীন চিন্তাশীল, স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে হইবে। যে চিরদিন পরের কথা শুনিয়া চলিতে অভ্যস্ত সে স্বাধীনতা রক্ষণ করিতে পারে না। ভাবী সমাজের একটি কাল্পনিক আদর্শ মনে রাখিয়া তাহারই ছাঁচে সকলকে গড়িয়া তোলা অন্যায়, অসম্ভব। কে জানে সে সমাজ

ঠিক কি রূপ ধারণ করিবে। বহতা নদীর মত সমাজ চিরদিনই গতি পরিবর্ত্তন করিয়া চলে। ইহাও প্রাণের লক্ষণ। মানুষের সব চেয়ে কঠিন কাজ এই পরিবর্ত্তনের সহিত তাল রাখিয়া চলা। এই চলার জন্য প্রয়োজন,—জাগ্রত, বলিষ্ঠ, চলিষ্ণু মন, স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি। বাহিরের বিধিনিষেধের দ্বারা যে মানুষ নিয়ত প্রতিপদে শাসিত হইতেছে তাহার পক্ষে স্বাধীনভাবে চিন্তা করা অসম্ভব। ভুল করিতে করিতেই মানুষ শেখে, ভুল করিতে যে মানুষ ভয় পায়, বুঝিতে হইবে তাহার মনে জড়তা আসিয়াছে। মনের সেই জড়তা ও ক্ষুদ্রতা দূর করিতে হইলে ব্যক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে দিতে হইবে। কি করিয়া বলিব যে আজ বিশ বৎসর পরে সমাজে বাস করিতে হইলে কোন গুণগুলির প্রয়োজন সুতরাং আজ হইতে তাহাদেরই অনুশীলন করিতে হইবে। সেদিন একটা বিশেষ অবস্থায় কোন বিশেষ ভাবে চলিতে হইবে তাহার বিচার আমি আজ কি করিয়া করিতে পারি। সে বিচার করিবে যে শিশু তাহাকে আজ আমি বড় জোর স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখাইতে পারি। আজকার সমাজের প্রশ্নগুলি সমাধান করিতে শিখাইয়া, আজকার সমাজের সহিত বোঝাপড়া করিতে শিখাইয়া ভাবী সমাজের সহিত বোঝাপড়ার ভার তাহারই উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে।

সুতরাং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের দাবী ও সমাজের দাবী এই উভয় দাবী মিটাইয়াই আমাদের শিক্ষাপ্রণালী গড়িয়া তুলিতে হইবে।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি সামাজিক আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিতে করিতেই শিক্ষার আরম্ভ হয়। এ সম্বন্ধে Dewey বলিয়াছেন—

"The only true education comes through the stimulation of the child's powers by the demand of the social situation in which he finds himself, Through these demands he is stimulated to act as a member of a unity to emerge from his original narrowness of action and feeling, and to conceive of himself from the standpoint of the welfare of the group to which he belongs."

একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যে পড়িলে শিশুর সহজাত শক্তিগুলি ক্রিয়াশীল হয়, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। Dewey'র মতে প্রকৃত শিক্ষা অন্য কোন ভাবে হয় না।

সুইস মনস্তাত্ত্বিক ( Jean Piaget ) শিশুমনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন শিশু আমিত্বের যে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করাই তাহার জীবনের সব চেয়ে বড় সমস্যা। সে সমস্যার সমাধান অনুকূল সামাজিক আবেষ্টনের সৃষ্টি।

আমাদের দেশেও কথা আছে "কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে।" নিজের জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখিব বাস্তবিকই আবেষ্টনের সহিত বোঝাপড়া করিয়া যে শিক্ষালাভ হয় অন্য কোন উপায়ে সে শিক্ষা পাওয়া যায় না।

সুতরাং শিক্ষার জন্য সব চেয়ে বড় প্রয়োজন হইতেছে অনুকূল আবেষ্টনের সৃষ্টি; যে আবেষ্টনের সহিত ঘাতপ্রতিঘাতে শিশুচিত্তের সমস্ত সুপ্ত শক্তি বিকশিত হইয়া উঠিবে, তাহার মন শিক্ষিত হইয়া উঠিবে। ইহার জন্য বিদ্যালয়-সমাজ সৃষ্টি করিতে হইবে। বিদ্যালয়কে আশ্রয় করিয়া যে সমাজ আমরা সৃষ্টি করিব তাহারই আবহাওয়ায়, তাহার সহিত ঘাতপ্রতিঘাতে প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইবে।

বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহার আর একটি কারণ আমাদের উদ্দেশ্য ভারতের ভাবী সমাজ পত্তন। সে ভাবী সমাজের অধিকার লাভ করিবার শিক্ষা আরম্ভ হইবে ক্ষুদ্রতর বিদ্যালয়-সমাজের অধিকার লাভ করিয়া। সেই ক্ষুদ্রতর বিদ্যালয় সমাজে চলিতে চলিতেই শিশু একদিন বৃহত্তর সমাজে চলিতে শিখিবে। যে সামাজিকতা-বোধ জাগ্রত করিতে পারিলে ভারতের সেই ভাবী সমাজ সকলের সহযোগিতায় বহুর কল্যাণে সার্থক হইয়া উঠিবে সেই সামাজিকতা-বোধের প্রথম জাগরণ ও পরীক্ষা আরম্ভ হইবে বিদ্যালয়-সমাজে।

কিন্তু বিদ্যালয়ে সমাজ সৃষ্টি করিবার কোন্ আয়োজন আমরা করিয়াছি? আজ বিদ্যালয় বলিতে, একটা নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যক্রম (Syllabus) এবং সেই পাঠ্যক্রম পালন করিবার জন্ম কতকগুলি ছাত্রছাত্রী ও কয়েকজন শিক্ষক ছাড়া আর কিছু বোঝায় না। বোধ করি একথার মধ্যেবিশেষ অত্যুক্তি নাই। বিদ্যালয়ের কোন জীবন নাই—আধ্যাত্মিক সত্তা নাই। পুঁথির উপব আজিকাব বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

আমি যে দেশে প্রচলিত প্রবচনের কথা বলিয়াছি তাহাতে ত পড়িয়া-শেখার কথাব উল্লেখ নাই। কিন্তু আমরা আজ জোব দিয়াছি সেই পড়ারই উপর। বিদ্যাকেই আমরা বড় করিয়া দেখিয়াছি।

কিন্তু বিদ্যা ত সাধ্য নহে, সাধন মাত্র। বিদ্যাদ্বারা জীবন সার্থক করিতে পারা যায় তাই বিদ্যার প্রয়োজন নতুবা নিছক বিদ্যা কোন কাজেই আসে না। বিদ্যাকে সমাজ ও জীবন হইতে পৃথক করিয়া দেখিলে বিদ্যা ও জীবনেব মধ্যে একটি সুগভীর ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। বিদ্যা ব্যর্থ হইয়া যায়। বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগেই বিদ্যার সার্থকতা।

প্রাচীন ভারতের বিদ্যালয়গুলি "আচার্য্যকুল" নামে পরিচিত হইত ও শিক্ষকগণ "আচার্য্য" নামে অভিহিত হইতেন। এই দুইটি শব্দের মধ্যে শিক্ষাতত্ত্বের দুইটি গভীর তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং সেই শব্দ দুইটি বিশ্লেষণ করা যাউক।

প্রথমে "আচার্য্য" কথাটা লই। শিক্ষক আচার্য্য, যিনি আচার শিক্ষা দেন, যিনি শিষ্যকে সত্য আচারে দীক্ষিত করেন। ইহার মধ্যে কোথাও "বিদ্যা" শব্দের উল্লেখ নাই। তবে কি মনে করিব সেখানে কোনরূপ বিদ্যাচর্চ্চা হইত না? সে ধারণা মোটেই সত্য নহে। উপনিষদাদি প্রাচীন গ্রন্থে শিষ্যের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির তালিকা পাওয়া যায়। তাহা পড়িলে মনে হয় সেখানে যথেষ্ট পরিমাণেই বিদ্যার চর্চ্চা ছিল। কিন্তু আচার্য্যগণ জীবনে বিদ্যার স্থান বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই "আচার" অর্থাৎ জীবনে চলিবার ছন্দকে বড় করিয়া দেখিয়া বিদ্যাকে গৌণ করিয়াছিলেন। "আচার" কথাটা অধুনা-প্রচলিত সঙ্কীর্ণ অর্থ ধরিলে চলিবে না। ইহার মূলগত অর্থ "চলা" অর্থাৎ গতিচ্ছন্দ।

বিদ্যার চেয়ে জীবন যে বড় সেই জন্যই তাঁহারা জীবনকে প্রাধান্য দিয়াছিলেন। বিদ্যা ত' উপলক্ষ্য, আচারই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানের লক্ষ্য আচারকে সংহত, সংস্কৃত ও সুন্দর করিয়া তুলিতে সাহায্য করা।

যেখানে আচারকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদান করা হয় সেটাকে বিদ্যালয় না বলিয়া আচার্য্যকুল বলিতে হয়।

"আচার্য্যকুল" শব্দের আর একটি গভীর তাৎপর্য্য রহিয়াছে; কুল বলিতে ক্ষুদ্র গোষ্ঠি বা সমাজ বোঝায়। প্রাচীন ভারতের আচার্য্যগণ জানিতেন সমাজে বাস করিয়াই সমাজ বাস করিতে শিক্ষালাভ করা যায়। আচার্য্যকুলকে তাঁহারা তাই ক্ষুদ্র অথচ সম্পূর্ণাঙ্গ সমাজে পরিণত করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালের তপোবনের যে চিত্র আমরা পুরাতন গ্রন্থগুলিতে পাই তাহা হইতে মনে হয় তপোবনস্থ সমাজ সম্পূর্ণাঙ্গ ছিল। সেখানে আচার্য্যগণ সপরিবারে বাস করিতেন; শিষ্যগণ সেখানে আসিয়া আচার্য্যের পরিবারে যোগ দিত এবং পারিবারিক ও সামাজিক সকল কর্ত্তব্যের অধিকার লাভ কবিত। তাহারা গাভীর পরিচর্য্যা করিত, কৃষিকার্য্যে গুরুর সহায়তা করিত আবার শাস্ত্রাধ্যয়ন করিত।

তপোবনের এই যে ছবি আমরা পাই তাহা সম্পূর্ণাঙ্গ একটি সমাজের ছবি।

আজ আমরা তপোবন রচনা করিতে পারিব না; কিন্তু সেখানে শিক্ষার আদর্শ প্রচলিত ছিল সে আদর্শ গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।

আপনারা মনে করিবেন না আমি বিদ্যালাভকে ছোট করিতেছি। আমার মতে বিদ্যালাভকে শিক্ষা প্রণালীতে তাহার ন্যায্য স্থান দিতে হইবে। একথা আজ বলা প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে যে বিদ্যাদান শিক্ষায়তনগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। বরং সেটা অন্য একটা কিছুর by-product অর্থাৎ গৌণফল স্বরূপ মনে করিলে বিদ্যাদান ও লাভ ব্যাপারটি সহজতর হয় এবং লব্ধবিদ্যা জীবনে কার্য্যকরী হইয়া উঠিতে পারে। আমার মতে আচার-অর্থাৎ জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের শিক্ষায়তনগুলি গড়িয়া তুলিতে হইবে।

অর্থাৎ বিদ্যালয়গুলির একটি আধ্যাত্মিক সত্তা সৃষ্টি করিতে হইবে।

যদি এমন ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় যেখানে ছেলেমেয়েরা আপনা হইতেই জীবনে চলিবার ছন্দ আরম্ভ করিতে পারিবে, আচার গঠন করিয়া তুলিতে পারিবে, নিজেকে সংযত ও শাসন করিতে শিখিবে, এবং সে শেখার মধ্যে আনন্দ লাভ করিবে, যেখানে পরস্পরের সহযোগিতায় ভাবী সমাজের নাগরিকতার অধিকার অর্জ্জন করিতে শিখিবে তবেই বিদ্যা ও জীবনের সমন্বয় ঘটিবে, জীবনে জ্ঞান, কর্ম্ম ও চিন্তার মিলন সাধিত হইবে। জীবনের প্রকৃত দীক্ষা মিলিবে।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয় অনুকূল সামাজিক আবেষ্টনের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে। পুঁথির নকল আবেষ্টনের মধ্যে সে শিক্ষা হইতে পারে না।

ইহার জন্য প্রয়োজন অনুকূল আবেষ্টনের অর্থাৎ বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া ক্ষুদ্র সমাজের। তাহাকেই আমি বিদ্যালয়-সমাজ আখ্যা দিয়াছি।

এইখানে Deweyর আর একটি মত উদ্ধৃত করিয়া দিই।

"The school is primarily a social institution. Education being a social process, the school is simply that form of community life in which all those agencies are concentrated that will be most effective in bringing the child to share in the inherited resources of the race, and to use his own powers for social ends."

অর্থাৎ শিক্ষাদান মূলতঃ সামাজিক প্রক্রিয়া এবং বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

শিশুকে তাহার অধিকার দান করিবার জন্য ও সমাজের সেবায় তাহার নিয়োজিত করিবার জন্য যে অনুষ্ঠানগুলি সকল চেয়ে কার্য্যকরী বিদ্যালয়ে তাহাদেরই সমাবেশ করিয়া ক্ষুদ্র সমাজ সৃষ্টি করা হইয়াছে।

এই সঙ্গে তিনি বলিতেছেন Education is a process of living and not a preparation for future living. অর্থাৎ শিক্ষালাভ জীবন-যাত্রার বিশেষ একটি প্রণালী মাত্র; ভাবী জীবনের জন্য তৈয়ারি হওয়াকে শিক্ষালাভ বলা চলে না।

তাঁহার এই উক্তিটির একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন; অনেকে মনে করেন ভাবীকালের জন্য তৈয়ারি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এক হিসাবে ইহা সত্য। কিন্তু যদি বলা যায় আজ ডাঙ্গায় বসিয়া হাত পা ছুঁড়িতে শিখিব তাহার কারণ এই শিক্ষার দ্বারা একদিন জলে সাঁতার কাটিতে পারিব তাহা হইলে কি ঠিক হয়? যে আজ জীবনধারণ করিতে শিখিল না সে ভবিষ্যতে কেমন করিয়া জীবনের-পথে চলিতে পারিবে? ভাবীকালের প্রয়োজন সাধনের জন্য সাঁতার কাটিতে শিখিতে হইলে আজই জলে নামা প্রয়োজন। তেমনি করিয়া ভাবীকালে সমাজে বাস করিতে শিখিতে হইলে আজই সমাজে প্রবেশ করিতে হইবে।

শিশুর সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের উপযোগী সেই সমাজকেই আমি বিদ্যালয়-সমাজ নামে অভিহিত করিয়াছি। সেখানে দীক্ষা লাভ করিয়াই শিশু ভাবী বৃহত্তর সমাজে দীক্ষা লাভ করিবে। বিদ্যালয়-সমাজ বাহিরের বৃহত্তর সমাজের ক্ষুদ্রতর, সংস্কৃত সংস্করণ। সংস্কৃত কারণ বাহিরে পরিণত বয়স্কের সমাজে যে সকল শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে সেগুলির সবটাই অপরিণত-চিত্ত শিশুর বিকাশের পক্ষে কল্যাণকর হয়। সুতরাং তাহার সমাজ পূর্ণভাবে বৃহত্তর সমাজের প্রতিচ্ছায়া নহে। তবে দুই সমাজের মধ্যে নাড়ির যোগ আছে। যে যোগ বিচ্ছিন্ন করিলে বিদ্যালয়-সমাজ প্রাণহীন হইয়া পড়িবে।

বিদ্যালয়-সমাজ সম্পূর্ণাঙ্গ; বিদ্যাচর্চ্চা সেখানে অন্য বহু শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্যতম। সেখানে উৎসব আছে, আনন্দের আয়োজন আছে, কর্ত্তব্যে দীক্ষা আছে, সৃষ্টি করিবার শিক্ষা আছে। জীর্ণ পুঁথির জীর্ণতর পত্রগুলি পরিপাক করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে।

সেই বিদ্যালয়-সমাজের নাগরিকতার অধিকার লাভ করিয়া শিশু জীবনকে অখণ্ড ভাবে দেখিতে ও বিকশিত করিতে শেখে। এবং শিক্ষার সাহায্যেই ভবিষ্যতে একদিন বৃহত্তর সমাজে প্রবেশ করিয়া সহজেই আপনার স্থান করিয়া লইতে পারে।

আমাদের শিক্ষায়তনগুলিতে আমরা কি সেই সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছি?

শ্রীঅনাথনাথ বসু

# অশরীরী

শ্রীসুবোধ বসু

## প্রথম দৃশ্য

একটা জীর্ণ অর্দ্ধভগ্ন ঘরের ওপর হইতে যবনিকা উঠিয়া গেল। দেওয়াল কালো হইয়া উঠিয়াছে, অধিকাংশ স্থানে আস্তর উঠিয়া প্রায় গহ্বরের সৃষ্টি করিয়াছে। চার কোণায় ঝুল ও মাকড়সার বাসা প্রায়ান্ধকারের মধ্যেও সম্পূর্ণ চোখ এড়াইতে পারে না।

একধারে অতি পুরাতন প্যাটার্ণের একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে তার দ্বারাই ঘরটা আংশিক আলোকিত। একটা তক্তপোষ পড়িয়া আছে,—তাতে একটা ছেঁড়া মাদুর দেখা যায়।

পট ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে একটা শঙ্খের শব্দ শোনা গেল। তারপরেই ধুনাচি হাতে একজন বর্ষিয়সী স্ত্রীলোক প্রবেশ করিলেন।

দেওয়ালে লক্ষ্মীর পট টাঙ্গানো ছিল, ঘরে ধুঁয়া দিয়া সেইখানে আসিয়া ধুনাচিটা নামাইয়া সে গলায় অাঁচল দিয়া অনেকক্ষণ প্রণাম করিল। এমন সময় বাহির হইতে মোটা গলায় 'ওগো শুনচো গো' বলিয়া আহ্বান শোনা গেল। গিন্নী তাড়াতাড়ি প্রণাম সাঙ্গ করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিরাট ভুঁড়িটিকে অনুসরণ করিয়া কর্ত্তা প্রবেশ করিলেন।

বেঁটে মোটা দেখিতে মানুষটা, এক গাল দাড়ি কামানো হয় নাই: এক জোড়া বড় গোঁপ চোখে পড়ে। হাত কাটা আধময়লা একটি পাঞ্জাবি গায়। কাপড় প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি, পায়ে বিবর্ণ তালিসংযুক্ত জুতা, এবং হাতে এই চেহারার সাথে অত্যন্ত বেমানান এক বেড়াইবার লাঠি।

### কর্ত্তা

[ প্রবেশ করিতে করিতে ] দেখো, এই বাড়িতে চিনি গুড় সাবধান করে যেন রাখা হয়। দেখ্‌তেই পাচ্ছ তো একটু পুরাতন বাড়ি, পিঁপ্‌ড়ের দৌরাত্ম্যি একটু বেশি হবে,—বুঝ্‌লে কি না। গুড়ের হাঁড়ি শিকের থেকে নীচে রেখেচ, কি আর নেই: আর গর্ত্ত ফাটল আছে, ব্যাটারা চেটেই অন্তর্দ্ধান হবে,—টিপে যে একটুকুনও বের করে রাখ্‌বে, সে—উপায় পর্য্যন্ত নেই। সাধে বলি—

### গিন্নী

তা তো বুঝ্‌লুম। কিন্তু এ কী বাড়ীতে নিয়ে এসেছ শুনি? একটু জোরে হাঁট্‌লে পরে দেয়াল ভেঙে আসে, জানালায় উই ধরেচে, মেজে শ্যাওলা,—এ কি বাড়ি বদ্‌লালুম না কবরে এলুম।

### কর্ত্তা

[ হাসিয়া ] হা হা হা গিন্নী, হাসালে, একদম হাসিয়ে মারলে। কথা শোন একবার, বাড়ি কিনা কবর হলো। কিন্তু [ লণ্ঠনটা উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছে আবিষ্কার করিয়া ] বলি, ওটা কি মশাল জ্বেলেচ, ও যে একদম দাউ দাউ করে জ্বলচে। না হয়, এনেছিই আজ এক বোতল কেরোসিন, তাই বলে এমনটা অপচয় করা কি—[ যাইয়া লণ্ঠন প্রায় নীবু নীবু করিয়া দিলেন ]

### গিন্নী

যাই হোক্ বাপু, এ-বাড়িতে আমি থাকচি না,—আলো নেই, হাওয়া নেই, দুয়ার ভেঙে পড়েছে, কড়ি-কাঠ যে কোন সময় মাথা ভেঙে পড়তে পারে, চার দিকে জঙ্গল আর গাছ, এর চেয়ে কুঁড়ে ঘরে গিয়া থাকাও ঢের ভালো।

### কর্ত্তা

হাসালে, হা হা হা, একদম হাসিয়ে দমবন্ধ করার জোগাড় করেচ। তা এ-বাড়ির একটু আধটু অসুবিধে আছে বৈকি,—তাছাড়া মাঝে মাঝে সাপকোপও নাকি দেখ যাবে,—দেখা যায় তো গেল, বয়ে গেল। কিন্তু দেখ্‌তে হবে, তে-তলা একটা বাড়ি কি রকম সস্তায় পাওয়া গেল। কিছু না হোক্, লোকের কাছে মান-মান্যি আছে, যা তা বাড়িতে বাস করতে পারিনে। অথচ একটু ভালো বাড়ি

হ'লে ব্যাটারা কশাইয়ের মত দাম হেঁকে বসবে। সেটা কি ন্যায়ের কথা হলো।

গিন্নী

তা এত বড় বাড়ি দিয়েই বা আমাদের কি হবে। গণ্তি তে তিনটী মাত্র মানুষ—এক তলার অর্দ্ধেকই আমাদের লাগ্বে না, তো দোতলা আর তে-তলা। সেই ভোরবেলা এসেছি, এর মধ্যে একবার উপরে উঠেও দেখলুম না।

কর্ত্তা

বলেইচি গিন্নী, মানমান্তি বজায় রাখ্তে হলে বাড়িটা একটু জাঁদরেল রকম করতে হয়,—নইলে লোকে অ-কথা কু-কথা বলে। অথচ টাকা গুণ্তে কি সে-সব লক্ষ্মীছাড়ারা আস্বে,—দেবার বেলায় কানাকড়িটা পর্য্যন্ত আমাকেই ঢাল্তে হবে। অথচ—[ থামিয়া একটু চিন্তা করিয়া ] দেখ গিন্নী, উপর তলায় না হয় আমরা নাই গেলুম।

গিন্নী

ওপরে ঠাকুরঘর শুধু থাক্বে,—শোবার জন্যই নীচেই ব্যবস্থা করবো, নইলে উপর-নীচ করা আমার দেহে সইবে না।

কর্ত্তা

ওটাও না হয় নীচেই রাখলে।

গিন্নী

না না সে ওপরেই ভালো হবে,—নিরিবিলিতেই ঠাকুর দেবতার নাম করা ভাল। কোনো হৈ-চৈ হবে না, কোনো বিঘ্ন নেই—

কর্ত্তা

[ বাধা দিয়া ] কিন্তু দেখ, ওপরে না গেলেই যে ভাল হয়, তোমার গিয়ে,—হ্যা,—উপরে যাওয়াটা, অর্থাৎ কিনা, নাই বা গেলে ওপরে বাপু...

গিন্নী

[ একটু উদ্বিগ্ন ভাবে ] কেন বলোতো

কর্ত্তা

[ থতমত খাইয়া ] না না, সে কিছু নয়,—অমনি আর কি। নানা জনে নানা কথা বল্বে, সব শালার কথাই কি বিশ্বেস করতে হবে, না বিশ্বাস করলে পারা যায়। গপ্প, একদম গেঁজা।

গিন্নী

[ শঙ্কিত হইয়া ] ব্যাপার কি বলো তো,—এর মধ্যে আবার বলাবলি আসে কি। বলি, একি অসুখে বাড়ি না কি?

কর্ত্তা

ও-সব বাজে কথায় কান দিয়ে লাভ কি গিন্নী। দেখ্তে হবে কেমন সস্তায় রাজপ্রাসাদের মত এক বাড়ি পেয়েছি। পঁচিশ টাকা গিন্নী, তাব এক আধ্লা বেশি নয়। অনেক খোঁজ খাজ করে তবে—

গিন্নী

লোকে কি বলে তাই বল,—তোমার কথার সারপ্যাচ আমি শুনতে চাইনে।

কর্ত্তা

একদম বাজে তাই কথা। ওসব কি বিশ্বাস করতে আছে। শুনলে শুধু শুধু ভয় পাবে, আর কিছু লাভ হবে না,—গাঁজা বুঝলে কিনা গিন্নী, একদম গাঁজা।

গিন্নী

চলো, শীগগির চলো।

কর্ত্তা

বাড়িটার, বুঝলে কিনা গিন্নী, এই তোমার যাকে বলে, একটু বদনাম আছে।

গিন্নী

বদনাম? কিসের বদনাম গো। চোর ডাকাত আছে নাকি আশে পাশে?

কর্ত্তা

আরে না না, সে-সব ভয় করতে হবে না গিন্নী,—হা হা হা, হাসালে গিন্নী, হাসিয়ে মারলে। চোরও নয়,

ডাকাতও নয়। লোকে বলে; তাই বলে সব কথা বিশ্বেস করতে হবে নাকি? নইলে ইট-কোঠার বাড়িতে আবার ভূত-প্রেত থাকে নাকি,—বাজে, একদম—

গিন্নী

[ সাতঙ্কে ] বলো কি গো। জেনে শুনে তুমি আমাদের ভূতের বাড়িতে নিয়ে এসেচ? মাগো, এ যে একেবারে সর্ব্বনেশে কাণ্ড!

কর্ত্তা

ঐতো মেয়েমানুষের দোষ,—একটা সামান্য ব্যাপারে অযথা ভয় পেয়ে গেলে। অথচ কি রকম সস্তায় যে বাড়িটা পাওয়া গেছে তার—

গিন্নী

[ বাধা দিয়া ] সস্তার নিকুচি করেছে। মাগো কি ভয়ঙ্কর কথা। মানুষ হয়ে ইচ্ছে করে [ চারিদিকে ভয়ার্ত্ত চাহিয়া ] ওদের সঙ্গে বাস করতে এসেচ। বলি প্রাণে মরলে টাকা কি চিতায় নিয়ে যাবে। ওগো, আমার পা কাঁপছে, হাত কাঁপছে, সমস্ত গা ছমছম করচে···

কর্ত্তা

মিছিমিছি বড় হাঙ্গামা বাধাও। ভূত আছে তো ওপরে আছে, তোমার কী করেচে। ওপরে না গেলেই হলো,—চেঁচিয়ে মেচিয়ে একটা হৈ হৈ কাণ্ড। একেবারে নির্দ্দোষ বাড়ি হ'লে, এর কত ভাড়া হ'তো জানো?

গিন্নী

[ তক্তপোষে বসিয়া পড়িয়া ] জান্‌তে চাইনে। বলি, টাকা টাকা করে কি জীবনটা দেবে শেষে?

কর্ত্তা

হাসালে গিন্নী, হা, হা, হা, একদম হাসিয়ে মারলে। [ গম্ভীর হইয়া ] কিন্তু টাকা কি একটা সোজা কথা না কি? সাত হাত মাটী খোঁড়, পাবে একটা আধলা? সারাদিন রোদ্দুরে ঘুরে এসো, গা বেয়ে ঘাম পড়্‌বে, পাই পয়সাটী পড়বে না। কী রকম মেহন্নতটা করে যে—[এমন সময় কোথা হইতে একটা সানুনাসিক সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া গেল ]

গিন্নী

[ সভয়ে ] ও কি?

কর্ত্তা

ও কিছু নয়, সন্ধ্যা হ'লে তেনারা একটু গানটান করে। ওদিকে না গেলেই হ'লো।

গিন্নী

মাগো তুমি বলো কি গো। আমার পা দুটী যে পেটের মধ্যে সিঁধিয়ে যাচ্চে।

কর্ত্তা

ভয় পেলেই ভয়। নইলে জানোতো গিন্নী, উপদ্রব না করলে সাপেও কামড়ায় না, ভূতই কি আর সৃষ্টিছাড়া হবে না কি। আর ওরা এক সময় মানুষই তো ছিল বুদ্ধিশুদ্ধি কি আর একটু নেই।

গিন্নী

[ ক্ষীণ আর্ত্তনাদ করিয়া ] ওগো কোথায় যাব গো। মেয়েটা আবার রান্না ঘরে আছে, পা কাঁপছে, ডেকে আন্‌বো কি করে···

কর্ত্তা

যাঃ, মেয়েমানষের কাণ্ড দেখ। একটা গোপনীয় কথা চুপে চুপে বল্লুম বলে, পাড়াশুদ্ধ সবাইকে ডেকে সেকথা জানাতে হবে। পণ্ডিতেরা এই জন্যই তো,—মিনি বুঝি রান্না করচে?

গিন্নী

মেয়েটাতো জানেনা কী জায়গায়—

কর্ত্তা

[ বাধা দিয়া ] বেশ করেচে। তুমি আবার এ সব কথা ওকে বল্‌তে যেয়ো না। দুজনেই ভয়ে মরলে খাওয়া দাওয়া হবে কি করে? [ একটু থামিয়া ] দেখো, মিনি রান্না কর্‌বার সময় তুমি একটু কাছে দাঁড়িয়ে থেকো তো, নইলে পরে—

গিন্নী

বেশ উপযুক্ত কথা হয়েচে। বাপ হয়ে তাকে তুমি ভূতের বাড়িতে এনে, এখন স্ত্রীকে দিয়ে তাকে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করচো।

কর্ত্তা

হাসালে গিন্নী, হা হা। আরে তা নয়। মেয়েটার আবার তরকারীতে বেশি করে তেল দেবার অভ্যেস আছে। একটু দেখে শুনে দিতে বলো। সরষের তেলের তো খরচ আছে, না অমনি আসে?

গিন্নী

মেয়েকে নিয়ে আজকেই আমি এ-বাড়ি ছাড়ব। কবর, এ যে একদম কবর!

কর্ত্তা

কিন্তু এ কথাটা ভেবে দেখ গিন্নী, টাকা আর কার জন্য জমাচ্চি, তোমাদের জন্যই তো। কিছু টাকা যদি সঞ্চয় না করতে পারি, তো মেয়েটার বিয়ে দিই কি করে বলোতো? যত কশাই জুটেচে,—মেয়ে নিয়ে খালাস দে না,—না তার এ-চাই ও-চাই গয়না চাই, আসবাব চাই, পণ চাই,—বুঝলে গিন্নী, যাকে বলে একদম লক্ষীছাড়া কাণ্ড। অথচ যদি না জমাই, তবে কোত্থেকে সে সব আসে শুনি?

গিন্নী

এদ্দিন যা জমালে তার কি হলো। তা দিয়ে যে এক গণ্ডা মেয়ের বিয়ে দেয়া যায়,—তোমার তো মোটে একটা।

কর্ত্তা

জমিয়েছি? হাসালে গিন্নী, হা হা। সে নগণ্যকে তুমি জমান বলো। চল্লিশ হাজারের কাণাকড়িটী বেশি নয়। আর জীবন বীমা কুড়ি হাজার,—আর তুমি অনায়াসে বল্লে কি না জমিয়েছি। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে বলে প্রাণধরে এ টাকাতে আমি হাত দিতে পারব না। তবে এইবার মেয়ের বিয়ের জন্য কিছু সঞ্চয় করতে হবে···

গিন্নী

এখন থেকে তুমি সুরু করবে? আশ্চর্য্য করলে। মেয়েকে যে আর ঘরে রাখা যায় না। বলি, মেয়ের দিকে তাকিয়ে কি দেখেচ?

কর্ত্তা

তা দেখতে একটু বাড়ন্ত বটে, বয়েস আর কি। [ প্রায় স্বগত ] কিন্তু শালারা কি বয়েস দেখ্‌বে দেখ্‌বে কতটা বেড়েছে। [ গিন্নীকে ] হ্যাঁ, দেখো গিন্নী, মেয়েটা বড় হৈ হৈ করে বেড়ে উঠ্‌চে। এইবার থেকে এক কাজ করো তো,—রাতের খাওয়া ওর বন্ধ করে দাও। বাড়াকে বাড়াও বন্ধ হবে, কিছু জমবে ও।

গিন্নী

বাঃ বেশ উপযুক্ত কথা হ'লো। এইবার থেকে মেয়েটাকে উপোস করিয়ে শেষ করে দিই, বিয়ে দিতে তোমার আর টাকা খরচা হবে না।

কর্ত্তা

কি যে বলো, গিন্নী। আমি কি তাই বলুম? একবেলা করে না খেলে কি আব লোকে মরে, একটু বাড় কমে শুধু। [ একটু থামিয়া ] তবে এই পর্য্যন্তই রইল,—আমাকে আবার আহ্নিকটা সারতে হবে। [ আশ্বাস দিয়া ] বুঝলে কিনা গিন্নী, ভুতটুত একটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়,—তবে একটু হুঁসিয়ার থেকো, দেখো যেন ক্লাটল-টাটলের থেকে সাপ-কোপ বেরিয়ে কামড়ে না দেয়।

গিন্নী

[ হতাশ ভাবে ] খুব আশ্বস্ত হলুম।

কর্ত্তা

[ গমনোদ্যত হইয়া ] আহ্নিকটা সেরে আসি। তুমি একটু রান্নাঘরে মিনির কাছে গিয়ে দাঁড়াও,—ভয়ও করবে না, তাছাড়া, দেখো রান্নাতে তেল-টেল যেন একটু হিসেব করে দেয়া হয়। [ চলিয়া যাইতে লাগিল ]

গিন্নী

এই আলোটা নিয়ে যাও, পাশের সব ঘর যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

কর্ত্তা

কোনো দরকার নেই,—সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। অন্ধকারে চলাফেরা করতে আমার মোটেই অসুবিধে হয় না। তার

চেয়ে যাবার সময় আলোটা নিবিয়ে যেয়ো,—শুধু শুধু কেরোসিন পোড়ে কেন?

[ প্রস্থান ]

[ গিন্নী ভীত শঙ্কিত ভাবে চারিদিক চাহিয়া আলোটা নিবাইতে অগ্রসর হইলেন। এমন সময় একটা চীৎকার শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার মেয়ে মিনি পড়ি-মরি করিয়া ছুটিয়া আসিল। গিন্নী প্রথমটা চমকাইয়া উঠিয়াছিলেন। ]

মিনি

[ ছুটিয়া আসিয়া স-চীৎকারে ] ও মাগো, গেলুম গো [ মাকে আসিয়া একদম জড়াইয়া ধরিল ]

গিন্নী

[ স-ত্রাসে ] কি কি, ব্যাপার কি? ওরে, হ'লো কি তোর?

মিনি

ভূত ভূত, একদম ভূত! ওরে বাবারে বাবা, জানালার কাছে এসে নাকী সুরে বল্লে, কী রাঁধ্‌চিস?

গিন্নী

[ আশ্বাস দিয়া ] দূর্, ও কিছু নয়, ছায়া দেখে ভয় পেয়েছিস মিনি।

মিনি

হঁ্যা, ছায়া বৈ কি। ছায়া বুঝি আমি আর চিনিনে মা। ছায়া বুঝি কথা বলে,—তুমি শুনেচ কোনদিন। কী বিষম কালো দেখতে! ওরে বাবাঃ, আমি আর যাচ্ছিনে রান্না ঘরে। মাছ ভাজা বসিয়েছিলুম,—এতক্ষণে ছাই হয়ে গেছে।

গিন্নী

থাক্‌ গে। কী বাড়িতে আমাদের নিয়ে এসেছে, বল্‌তো, তোর বাবা। এমন পোড়ো বাড়িতে ভূত পেত্নী থাকবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি।

মিনি

[ সঙ্কিত ভাবে ] শুনচো মা, শুনচো, কারা সব নাকী সুরে গান করচে [ নাকী সুরে গান শুনা গেল ] বাপ্‌রে, এ কোন রাজ্যে এলুম। মরণ-বাঁচন করে যখন তোমার কাছে ছুটে আস্‌চি, পেছন থেকে খিল্‌খিল্ করে হাস্‌তে লাগল।

গিন্নী

কি জানি, মিনি, তোর বাবা আমাদের বাড়ীতে না এনে শ্মশানে নিয়ে এল কেন।

মিনি

[ শুনিয়া সা-তঙ্কে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া ] শুনচো, শুনচো, তুমি, শব্দ যে ক্রমেই এগিয়ে আসচে! কী ব্যাপার মা? বাবা ফিরে আসেনি? [ মা ঘাড় নাড়িলেন ] তবে পালাও না, চলে এসো না বাবার কাছে। চীৎকার করে ডাকবো নাকি?

গিন্নী

[ সভয়ে ] মিনি, জেনে শুনে তোর বাবা আমাদের ভূতের বাড়ী নিয়ে এসেচে—পয়সা বাঁচাবার জন্য।

মিনি

বলো কি! বাবাকে নিয়ে যে আর পারা গেল না। দিন দিন কী যে হচ্চে,—একেবারে মরার ফন্দি করেছে যে, [ নাকীসুর নিকটতর হইল ] ওমা, এ যে এসে পড়েছে, ওগো এসো, পালিয়ে এসো।

[ গিন্নী লণ্ঠনটা তুলিয়া লইলেন। তারপর ভীত ভাবে একবার পিছন দিকে তাকাইয়া মা ও মেয়ে প্রায় ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেই অন্ধকার ঘরে তখন দুই ভূতের প্রবেশ। দুইটা বড় কালো ছায়ার মত। লাফাইতে লাফাইতে তারা উপস্থিত হইল। একটা ক্ষীণ আলোকে তাদের অস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। প্রবেশ করিয়াই তারা দুইটা বিড়াল ঝগড়া করিবার পূর্ব্বে যেমন অদ্ভুত শব্দ করে তেমনি করিতে সুরু করিল,—এবং শীঘ্রই বিড়ালের লড়াইয়ের মত তাদের মধ্যে ঝগড়া সুরু হইল,—ফ্যাচ ফুঃ, গরর্, হোঃ ইত্যাদি।

তারপর ঝগড়া করিতে করিতেই তাহারা প্রস্থান করিল।

একটু পরে পিতার হাত চাপিয়া ধরিয়া মিনির প্রবেশ। সঙ্গে গিন্নী। ]

কর্ত্তা

আঃ ছাড়, হাত ছাড় না। কি ভীতু মেয়েরে বাপু!

মিনি

ছাড়ব না, কিছুতেই ছাড়ব না। এক্ষুনি এখান থেকে তুমি চল, আর একটুও দেরী করতে পারবে না।

কর্ত্তা

এই দেখ, পাগলীর কথা শোন। এত খরচপত্তর করে জিনিষপত্তর আনানো হলো; গাড়ি-ভাড়া, মুটে খরচ এস্তার। এখন বললেই কি আর চট করে চলে যাওয়া যায়,— এসব ক্ষতি পূরণ করে কে।

মিনি

কিন্তু এ যে ভূতের বাড়ি। সারা বাড়িময় তারা যে নেচে বেড়াতে সুরু করেচে।

গিন্নী

কি সর্ব্বনেশে কাণ্ড আরম্ভ হয়েছে বলোতো।

কর্ত্তা

ঐ দেখো, মেয়ের জ্বালায় পারিনা, আবার এ-দিকে মাও সুরু করেছেন,—তবেই হয়েচে আর কি। কিন্তু আমার স্পষ্ট কথা বাপু,— এমন সস্তার বাড়ী ছেড়ে আমি কোথাও নড়চি না। ভূত আছে তো আছে,—একেবারে গা ঘেষাঘেষি হয় তো 'রাম' নাম উচ্চারণ করলেই ঠিক হয়ে যাবে। তার জন্য—

মিনি

[ নাকী সুরের সঙ্গীত শুনিয়া সভয়ে ] ঐ শোন।

কর্ত্তা

[ শুনিয়া ] তাতে আর এমন কি হয়েছে। নাকী সুর শুনেই ভয় পাচ্ছিস্ তো,—মনে করে নে যেন কলের গান শুনছিস্। এতে ক্ষেতিটা কি আমি বুঝতে— [এমন সময় আর একটা চীৎকার শোনা গেল ] কে, রামদীন ব্যাটা চ্যাঁচাচ্ছে না? ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে ব্যাটা বাড়ীর শান্তি ভঙ্গ করচে,— দেখাচ্ছি মজা [ প্রস্থানোদ্যত, এমন সময় ভয়-বিবর্ণ মুখে চীৎকার করিয়া রামদীনের প্রবেশ ]

রামদীন

ওরে বাপরে বাপ, রাম রাম রাম। জন্ নিয়ে বহুৎ বেঁচে এয়েচি…

মিনি

কি রে, রামদীন কী?

রামদীন

[ কাঁপিতে কাঁপিতে ] আরে খোকী মায়ী, একদম জিন। ওরে, বাপরে বাপ্ ঈয়া হাত ঈয়া জবান্ [ দেখাইয়া ] এত্না বড়া মুখ। ওরে বাপ্‌রে বাপ্, একদম ভূতরে বাপ্

কর্ত্তা

[ রাগিয়া ] ভূত! তোকে বলেচে ব্যাটা নেশাখোর!— ব্যাটার টিকি টান্তে দালানের মধ্যে ভূত এসেচে। গেঁজাখোর নচ্ছার জানি কোথাকার! যা যা কাজ কর্‌গে,— মাইনে নেবেন পাঁচ টাকা করে অথচ—

রামদীন

হাম ইধার আউর নাহি রহেঙ্গা বাবু। আগারি জান্, পিছারি খানা।

কর্ত্তা

হ্যা, পিছারি খানা। খানা না হ'লে, তোমাকেও ওদের দলে গিয়ে যে মিশ্‌তে হবে সেটা খেয়াল আছে?

রামদীন

বাবু, হাম আভি যাতা,—আউর এক মিনিট নাহি রহেঙ্গা [ প্রস্থানোদ্যত ]

গিন্নী

ওরে থাম রামদীন। আমাদের একলা ফেলে তুই চলে যাবি। আমরাও ত এ-বাড়ী ছাড়ব, আমাদের সঙ্গেই যাস্,—বুঝলি!

রামদীন

আরে আপ্ বাঁচেগা তো বাপ্‌কা নাম হোগা

[ প্রস্থানোদ্যত ]

কর্ত্তা

যা যা বেটা, ভাগ্। তোর মত কি সবাই কাপুরুষ। সস্তা দেখে বাড়ি পাওয়া গেছে, একটু অসুবিধেতেই সেখান থেকে পালাতে হবে।

[ এমন সময় আবার সানুনাসিক চীৎকার শোনা গেল। রামদীন একবার চমকাইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়া প্রাণপণে ছুটিয়া পলাইল ]

গেলো ত যাক্। তিনজন তো মোটে মানুষ, চাকরের কিই বা ঠেকা। তোমাদের প্ররোচনায় অপব্যয় করছিলাম বৈ তো নয়। পয়সা বেঁচে গেল। এ-পাড়ার ব্যাটারা যা ভীরু, আর কাউকে ইচ্ছে করলেও পাওয়া যাবে না। তিনজনের কাজ তোমরাই করে নিতে পারবে, কি বলো গিন্নী ?

গিন্নী

আমার আর বলাবলি কি; তোমার যা ইচ্ছে তাই তো হবে, তবে আর আমাকে জিজ্ঞেস করে অপমান করা কেন ?

কর্ত্তা

ঐ দেখ, সব তাতেই অভিমান করবে। কিন্তু অন্যায়টা কি হয়েছে তুই বলতো মিনি ? সস্তায় বাড়ি পেলে একটু অসুবিধে সহ্য যায়ই,—কেমন কিনা ? [ মেয়েদের নীরব দেখিয়া ] চল এবার খাওয়া দাওয়া সারা যাক্ গিয়ে। মিছিমিছি কেরোসিন পোড়ান কিছু নয়। নাও, চলো, আর দাঁড়িয়ে থেকোনা।'

[ কর্ত্তার সঙ্গে দুইটি ভীত নারীর প্রস্থান। একটা নাকী সুর শুনিয়া তারা কর্ত্তাকে জড়াইয়া ধরিয়া চলিল।

তখন সেই অন্ধকার ঘরে আবার সেই দুইটা ভূতের প্রবেশ। আগেকার মতই তারা অলৌকিক শব্দ করিল, এবং বিড়ালের লড়াইয়ের মত কলহ ও শব্দ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

অন্ধকার রঙ্গমঞ্চের উপর যবনিকা পড়িল। ]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ দোতালার একটা জীর্ণ কোঠা। আসবাব পত্রের মধ্যে দুইটা ভাঙ্গা চেয়ার, একটা খুব বড় আলমারী, দেওয়ালে দুইটা হরিণের শিঙ্। ঘরের জানলা দরজা সব বন্ধ আছে।

দুপুর বেলা, তবুও ঘরটা প্রায় অন্ধকার।

এমন সময় একটা নাকী সুরের চীৎকার শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে অমনি সুরে তার একটা প্রত্যুত্তর আসিল। শব্দ করিতে করিতে দুই দিক হইতে দুই ভূতের প্রবেশ। ভুশণ্ডী কালো দুইটাকে দেখিতে।

ঘরে প্রবেশ করিয়া তারা নিজেদের উপর হইতে কালো ঢাকনা খুলিয়া ফেলিল। ভিতর হইতে দুইটা সাধারণ মানুষ আত্মপ্রকাশ করিল,—একটা প্রৌঢ়, একজন যুবা।

তারা হাসিতে লাগিল ]

প্রৌঢ়

এত সাজ কাজ করলুম, কত রূপ ধারণ করা হ'লো, কিন্তু দেখ্‌চো তো, কিছুতেই কিছু নয়। গণ্ডার সাজলুম, দাঁতালো ভূত সাজলুম, ব্রহ্মদত্যি সাজলুম,—মেয়ে দুটো ভয়ে অস্থির, অথচ কিপ্টে ব্যাটার নড়ার নামটুকুও নেই,—কেমন কাণ্ডখানা হ'লো দেখতো শম্ভু !

শম্ভু

[ হতাশ হইয়া ] আর বলেন কেন,—কিপ্টে তো ঢের দেখেছি, এমন মরিয়া তো আর চোখে পড়েনি। ভূতকে পর্য্যন্ত ভয় করেনা,—এমন হ'লে আর কি ক'রে পারা যায়।

প্রৌঢ়

নাক টিপে চীৎকার করে করে, এই সাত সাতটা দিনে, নাকের দফারফা করে দিলুম, কিন্তু কোথায় কি। যতই আমরা মেহন্নতের এক শেষ হচ্চি, ব্যাটা ততই স্ত্রী কন্যাকে আরো অভয় দিচ্চে।

শম্ভু

ভদ্রলোক আমাদেরই পাড়ায় এক সময় বাস করিতেন। ভোরবেলা নাম নিলে হাঁড়ি ফাটতো শুনেছি, কিন্তু

ভূতকেও ভয় পাবেনা, এমন তো ভাবতে পারিনি। কাজকর্ম্মে বেজায় অসুবিধে ঘটাচ্ছে, নড়বার নামও নাই। কিন্তু কি ভাবচি জানেন, ভদ্রলোকের ঢের নাকি নগদ টাকা আছে, কিছু যদি আমাকে দিয়ে দেয়, তবে আর এসব অন্যায় বে-আইনী কাজের মধ্যে না ঢুকেই চলে...

## প্রৌঢ়

অন্যায় ? কাকে তুমি অন্যায় বলচো হে, ছোকরা। নোট জাল অন্যায়। যাকে শিষ্য করতে যাচ্ছি সে-ও যদি পুলিশের বাড়া হয়ে দাঁড়ায় তবে যাই কোথায় ? কি হে, তোমার মতলব কি ?

## শম্ভু

শিখব,—এই রকম একটা লাভের ব্যবসা সুবিধে পেলে কে আর না শেখে।

## প্রৌঢ়

মনে থাকে যেন। বি-এস্ সি পাশ করে চাকরীর জন্য ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে, নিতান্ত দয়াপরবশ হয়েই একটা লাভজনক ব্যবসায় টেনে নিলুম। নিমকহারামী করবে, তবে এখানে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব।

## শম্ভু

[ শিহরিয়া উঠিয়া তারপর ] আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাকে ওস্তাদ মেনে নিইচি, কোনমতেই আর পথ-ভ্রষ্ট হবো না। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে, ওই ভদ্রলোককে নিয়ে,—একটু নিরিবিলিতে কাজ করতে দেবেনা।

## প্রৌঢ়

[ ঠাণ্ডা হইয়া ] সেইটেই তো একটা মহাসমস্যা শম্ভু। আর কিছু নয়, শুধু মশালের মধ্যে ধূনা ছিটিয়ে, একটু নাকী সুরে কাওয়ালী ভেজে, এ-বাড়িটাকে সমস্ত পাড়ার কাছে আতঙ্কের বস্তু করে তুললাম, অথচ কোথা থেকে একটা ভুইফোঁড় এসে জুটল, বহুরূপী বিদ্যে উজাড় করে ফেললুম, একটুও তার হুঁস নেই।

## শম্ভু

আপনার কথামত মিনিকে তো বিস্তর ভয় দেখালুম—অথচ,—

## ওস্তাদ

মিনি ? মিনি কে ?

## শম্ভু

ওর মেয়ে। আমাদের পাড়ায়ই থাকত কিনা,—নামটা বেশ মনে আছে। কিন্তু ওকে ভয় দেখালে আর কি হবে,—বাপ কিছুতেই যাবে না। মিছিমিছি মেয়েটাকে এখন আর ভয় দেখাতে মায়া হয়। কেমন সুন্দর দেখতে মেয়েটী দেখেছেন তো,—অথচ কেপ্‌টা পয়সা ব্যয় হবে বলে মেয়ের বিয়েই দেবেনা ; মেয়েটা—

## ওস্তাদ

যাক্ যাক্ মেয়ের সম্বন্ধে ভাববার দরকার নেই। বাপটাই হাঙ্গামা বাঁধাল।

## শম্ভু

কিন্তু বলুন তো, মিনি নামটা সত্যি ভালো নয় ? একদম চমৎকার।

## ওস্তাদ

দেখো, ও-সব ব্যবসার মধ্যে আসে না। অবান্তর কথা আমি পছন্দ করিনে। কথা হচ্ছে, ওদের যেমন করেই হোক তাড়াতে হবে।

## শম্ভু

যদি থাকেই বা, এমন তো আর বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা নেই। ওরা ত ওপরে কক্ষনো আসে না, নীচে না হয় রইলই বা, তাতে আমাদের—

## ওস্তাদ

তোমার মুণ্ডু ! ওহে, বাপু, এ-ব্যবসা অত সোজা নয়। একটু মাথা ঘামাতে হয়। এরা থাক্‌লেই লোকজনের আসা যাওয়া হবে। কয়দিন পরেই ভয় আর থাকবে না।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও এমন একটা সব রকমের সুবিধের যায়গা ছাড়তে হবে। [ শম্ভুকে ] দেখো, কারুর মেয়ে টেয়ের দিকে নজর দিয়ো না। তার মানেই ব্যবসা পণ্ড, এবং হাতে শেকল।

শম্ভু

বুঝ্‌তে পারছি,—ওদের যেমন করেই হোক তাড়াতে হবে।

ওস্তাদ

ঠিক। [ থামিয়া ] দেখ, আমাকে এখনই সহরে বেরুতে হবে। কিছু কাগজ টাগজ, ছাঁচ গড়বার জন্য কিছু লোহা, জল-ছাপ তুলবার নতুন কিছু যন্ত্রপাতি ক্যামেরা, এসব সংগ্রহ করে আন্‌তে হবে। আসতে হয়তো দেরি হ'তে পারে,—আজ এমন কি নাও ফিরতে পারি। বেশ সাবধান হ'য়ে থেকো, হাবার মতন আবার ধরা পড়ে যেয়ো না।

শম্ভু

আজ্ঞে, সে ভাবনা করতে হবেনা। এক্ষুনি আমি তেতলার অন্ধকোঠায় গিয়ে লুকোবো। কেউটে ভূতের সাজের রিহার্সালটা দিয়ে দেখি,—ভয় পাওয়াবার মতন হয় কি না।

ওস্তাদ

তবে-আমি চল্লুম।

[ কালো আবরণ গায়ে পরিয়া প্রস্থান করিল ]
পাশের দুয়ার দিয়া অকস্মাৎ মিনি আসিয়া ঢুকিল। শম্ভু চমকিয়া কালো আবরণ গায়ে দিবার প্রচেষ্টা করিল, কিন্তু তখন দেরি হইয়া গেছে।

মিনি

আপনি কে? কী চান্ আমাদের বাড়িতে?

শম্ভু

আমি ভূত।

মিনি

কেমন ভূত, আমি তা জানি। এই বুঝি আপনার বাড়ি থেকে সন্ন্যেসী হয়ে বেরিয়ে যাওয়া।

শম্ভু

তুমি আমাকে চেন না কি?

মিনি

[ ব্যঙ্গ করিয়া ] জীবিত কালে আপনাকে একটু একটু চিন্‌তুম বৈ কি? বাড়ির কাছাকাছিই ছিলেন কি না। তখন আপনার নাম ছিল, শম্ভু। এখন কি?

শম্ভু

ভূত।

মিনি

জিজ্ঞেস করতে পারি, এখানে ভূত সেজে কী করচেন?

শম্ভু

তপস্যা। দেখ, তপস্যা করতে একটু নির্জ্জন যায়গার দরকার হয় কিনা, তাই এইটাকেই পছন্দ করলুম। লোকালয়ের আবিলা এসে যাতে তপস্যায় ব্যাঘাত না জন্মায়, তার জন্য একটু আগুন টাগুন দেখাতে হয়, নাকী সুরও বের করতে হয়।

মিনি

তপস্যা করে এর মধ্যে কতখানা জাল নোট তৈরি করা হয়েচে?

শম্ভু

কোথায় দাঁড়িয়েছিলে তুমি? আড়িপাতা একটা অন্যায় কাজ, তা তুমি জান?

মিনি

ন্যায় কাজের মধ্যে নোটজাল করাই যে প্রথম তা আমি জানতুম না। [ একটু দম লইয়া ] ছিঃ আপনি না ভদ্রলোকের ছেলে, আপনার এই কাজ। কোথাথেকে এই

জালিয়াতের সঙ্গে আপনি জুটলেন? আপনার মা আপনার জন্ম কেমন করে কেঁদে দিন কাটাচ্চে আপনি জানেন না,—আমি জানি। [ শম্ভু অধোবদন ] তবে? [ প্রশ্নের জন্ম মিনি অপেক্ষা করিল ]

শম্ভু

[ দুই সেকেণ্ড পরে ] আমিও জানি, মিনি। কতটা হতাশ হয়ে যে আমি এ পথে পা বাড়িয়েছি তুমি তা জানো না। আমার বাড়ির দারিদ্র্য আমার বুকে কাঁটা ফুটিয়েছে, ক্ষুধার জালায় আমি ছটফট করেচি, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমায় খাবার জোগাড় করে দিতে পারেনি। মানুষ যে-মুহূর্ত্তে বিবেক হারিয়ে ফেলে, সেই মুহূর্ত্তে আমি অন্যায় প্রবঞ্চনার পথে পা বাড়িয়েছি।

মিনি

[ ক্ষণকাল চুপ থাকিয়া ] বদ্‌লান,—এবার বদ্‌লিয়ে ফেলুন জীবনটাকে। এখনো সময় আছে।

শম্ভু

তুমি কিন্তু একথা কাউকেও বলে দিয়োনা মিনি।

মিনি

প্রতিজ্ঞা করুন এ-পথ ছেড়ে দেবেন।

শম্ভু

দেব [ একটুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল ]

মিনি

ভূতবাবু?

শম্ভু

বলো।

মিনি

ভূত থাকৃতে থাকৃতে আর একটা কাজ আপনাকে সারতে হবে। আমার বাবার একটু বেশি [ দ্বিধা করিয়া ] কেপ্‌পনী রোগ আছে, জানেন তো। সেই দোষটাকে একটু শুধ্‌রে দিতে হবে।

শম্ভু

কেমন করে? ভূতের তো চিকিৎসা শাস্ত্র জানা নেই।

মিনি

[ ঈষৎ হাসিয়া ] এ-সব অসুখের একটু ভৌতিক চিকিৎসাই দরকার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,—কেমন করে কি করতে হবে, আমি বলে দেব 'খন।

শম্ভু

বেশ। কিন্তু আমি যা করেছি, এরজন্য তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারবে তো মিনি?

মিনি

আমার ক্ষমা করায় আর না করায়, আপনার কি এসে গেল। তবে আমি নিশ্চয়ই—[ এমন সময় প্রায় ঘরের কাছে গিন্নীর গলা শোনা গেল। 'মিনি কোথায় গেলি মা।' শম্ভু চট্‌ করিয়া কালো পোষাক পরিয়া লইল, এবং পরক্ষণে প্রস্থান করিল। সঙ্গে সঙ্গে গিন্নীর প্রবেশ ]

গিন্নী

[ কাতর ভাবে ] মিনি, কোথায় গেলি মা। [ আবিষ্কার করিয়া ] তুই, এখানে? এইমাত্র ভূতটা ঘর থেকে চট্‌ করে বেরিয়ে গেল না? ওরে, তোকে কি আট্‌কে রেখেছিল,—সারারাত্তি খুঁজে আমি হয়রাণ। [ সাতঙ্কে ] কি মিনি, কথা বলছিস্‌ না যে,—বেঁচে আছিস্‌ তো?

মিনি

[ হাসিয়া উঠিয়া ] একদম বেঁচে আছি মা, কোনও ভয় নাই তোমার। আর তোমার ভূতকে ভয় করতে হবে না,—এ সত্যিকারের ভূত নয়। এ আমাদের ও-পাড়ার শম্ভু দা

গিন্নী

কে শম্ভু রে? মিত্তির বাড়ির,—শশি মিত্তিরের ছেলে? সে যে সন্ন্যেসী হয়ে বেরিয়ে গেছল। জলপানি পাওয়া ছেলে গরীব মা বাপকে ছেড়ে—

মিনি

হাঁ, সন্ন্যেসী না, আরো কিছু। ভূত সেজে এখানে বাস করচে, কি সব করচে, আর ভয় দেখিয়ে লোককে বাড়ির ত্রি-সীমানায় আস্‌তে দিচ্ছিল না।

গিন্নী

বলিস্ কি রে, বিশ্বেস হয়না যে। এমন জলপানি পাওয়া সুন্দর দেখ্‌তে ছেলে সন্ন্যেসী হ'লে দুঃখ রাখার যে আর ঠাঁই হয় না।

মিনি

না চমৎকার ছেলে, সন্ন্যেসীর চেয়ে ঢের ভালো কাজ করছিল সে।

গিন্নী

ডাক না তাকে একবার, তাকে দেখি। ডেকে জিজ্ঞেস পত্তর করি। ভূত সাজবার তার কি প্রয়োজন হ'লো কে জানে।

মিনি

কিন্তু মা, ওকে দিয়ে বাবার কেপ্‌টামোটা একটু কমিয়ে নেবার মতলব করেচি। দাঁড়াও,—একে একে তোমাকে সব বল্‌বো। বেশ একটা সুবিধে হয়েছে কিন্তু। দাঁড়াও, তার আগে শম্ভুদাকে তোমার কাছে ডেকে দিচ্চি। [ দরজার কাছে আগাইয়া গিয়া ] শম্ভু দা, ও—শম্ভুদা। মা তোমাকে ডাক্‌চেন, শুনে যাও তো। লজ্জা করে আর লাভ নেই, আমি সব বলে দিয়েছি।

[ মিনি অপেক্ষা করিল। ধীরে যবনিকা পতন। ]

## তৃতীয় দৃশ্য

প্রথম দৃশ্যের সেই ঘর। তবে ঘরের চেহারা একটু ফিরিয়াছে,—বিছানাটা একটু ভাল হইয়াছে। দেয়ালে দু-একটা ছবি আবির্ভূত হইয়াছে।

সময়, সন্ধ্যা-প্রায়।

একটা মাদুরের উপর বসিয়া গিন্নী মিনির চুল-বাধা প্রায় সমাপ্ত করিয়া আনিয়াছেন।

গিন্নী

[ চুল ঠিক করিয়া দিতে দিতে ] তোর শম্ভুদাকে খাবার দিয়ে এসেছিলি তো ?

মিনি

এসেচি, এসেচি, কতবার আর বলব বলোতো। তবে ভূতের মুখে মানুষের খাওয়া তেমন রোচেনা বোধ হয়। এবার থেকে ভূতের উপযুক্ত খাবার তৈরি করে দিও,—দিয়ে আসব।

গিন্নী

ঐ ষণ্ডাগোছের লোকটাও ওর কাছে আছে নাকি ? ওটা একটা সত্যিকারের আস্ত ভূতের মতন।

মিনি

ও এক হপ্তার জন্য বাইরে গেছে,—এর মধ্যে আর ফিরবে না। ভূত দেখেই ভয় পাওয়া যায়, কিন্তু আস্ত মানুষকে দেখলেও যে আঁতকিয়ে উঠ্‌তে হয়, এই প্রথম জানলুম।

[ চুল বাধা সমাপ্ত হইল ]

এমন সময় বাহির হইতে কর্তার গলা শুনিতে পাওয়া গেল। 'বলি শুনচো, শুনচো, ও মিনির মা'। বলিতে বলিতে কর্তা প্রবেশ করিলেন।

কর্ত্তা

নাও, নিয়ে এসেচি, দু দোটই নিয়ে এসেচি। আধখানা চাকরের কাজ নয়,—তা একখানাই হোক, না দু-দুটা। কী যে মুস্কিলে পড়েছি—

গিন্নী

তা না আনলেই হ'তো,—এত ঠেকাটা কিসের

কর্ত্তা

তোমার কি গিন্নী, তুমি তো ফস্ করে বলে বসলে, ঠেকাটা কিসের। এদিকে রাত দুপুরে এসে, আমাকে শাসিয়ে যাবে, ভুঁড়ি ফাটাবার ভয় দেখাবে, ঘাড় মটকে রক্ত খেতে চাইবে, ঈয়া ঈয়া মুলোর মত দাঁত বের করে ভেঙ্‌চি দিয়ে যাবে,—তার কি ?

গিন্নী

হ্যাঁ, ও-সব করেন না, যত নাই কথা।

কর্ত্তা

তুমি তার বুঝবে কি গিন্নী। মুখের উপর সেই বিদ্‌ঘুটে মুখটা এনে যদি একদিন শুধু তোমায় 'ফ্যাচ' করে যেত তবেই টেরটা পেতে। আমি বলেই না হয়, সয়ে টয়ে থাকি,—বেশি জিনিষ পত্তর আনতে হুকুম করলে, কিম্বা বেশি টাকা খরচা করতে বল্‌লে কাকুতি মিনতি করে কিছুটা কম করিয়ে নিই।

গিন্নী

কিসের খরচা করার হুকুম গো?

কর্ত্তা

আরে, এ যে কদিন ধরে রাজ্যের পয়সার মাছ আনচি, সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে ফলমূল কিনে নিয়ে আসচি, তোমাদের জন্ত তাঁতের মিহি শাড়ি কিনে টাকা জলে ফেলচি, এই সব আর কি জন্ত। বলি, সাধ ক'রে কি লোকে টাকা পোড়ায়। [থামিয়া] দুপুর রাত্তির হ'লেই এসে উপস্থিত হবেন। দূর থেকে হাত লম্বা করে নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে আমার কাঁচা ঘুমটা ভেঙে—বুঝলে কিনা গিন্নী, মুখ-ভেঙ্‌চি দিয়ে শাসাতে থাক্‌বে,—বাঁড়িব জন্ত এটা আনিস, ওটা আনিস। একবার কাণ্ডটা দেখতো গিন্নী,—ব্যবহারটা একবার দেখ।

গিন্নী

ওরা হয়তো, কেউ নিজের আত্মাকে কষ্ট দেবে, তা দেখতে পারেনা। তাই তোমাকে জিনিষ কিনিয়ে কাটিয়ে খাওয়াচ্ছে।

কর্ত্তা

খাওয়াচ্ছে তো রাজা কবচে,—পয়সাটা দিচ্চে কে শুনি? পয়সা খরচা করে আত্মার সুখ? আত্মাটা যে একেবারে জলে খাক্‌ হয়ে গেল। অথচ—বুঝলি মিনি,—যা একখানা মুখের ভেঙ্‌চি, আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জোগাড়। কথা অবহেলা করি, আর এদিকে একদিন পট্‌ করে ঘাড়টা মট্‌কে দিক্‌।

মিনি

না বাবা, সে—ভালো নয়। আগে প্রাণ, তারপরতো টাকা। ঠাকুর দেবতাকে যেমন, তেমনি ভূতপ্রেতকেও মেনে চলা বুদ্ধিমানের কাজ।

কর্ত্তা

কিন্তু এদিকে যে ফতুর হ'য়ে গেলাম, সেটার খোঁজ করে কে? [গিন্নীকে] এইবার আর ওই শালার বাড়ি না বদ্‌লালে চল্‌ছে না গিন্নী। তার মানে—বুঝ্‌লে কিনা—

গিন্নী

না না, সে—উচিত হবে না; এমন সস্তায় তে-তলা বাড়ি কোথায় আর পাওয়া যাবে বলোতো?

কর্ত্তা

নইলে আর এদ্দিন ছিলুম কেন,—সে-কথা কি আমাকে শেখাতে হবে। তবে রোজ রাত্তিরে যদি এমনতর সুনিদ্রের ব্যাঘাত হয়, ভূতপ্রেত এসে মুখ খিঁচিয়ে শাসাতে থাকে, থাবা উঁচিয়ে ভয় দেখায়, তবে আর শান্তি থাকে কোথায়।

গিন্নী

কিন্তু ভাড়া কি রকম সস্তা, সেটা দেখ্‌তে হবে তো…

কর্ত্তা

কোথায় সস্তা হলো,—সে—কথা কি আর আমি না হিসেব করেই বলচি। ভূত ব্যাটার কথামত যেমন সব জিনিষ-পত্র আনতে হচ্চে,—তাতে বুঝেচ,—গড়পড়তা তোমার বেশিই পড়্‌চে গিয়ে। এই যে দুটো চাকর আনতে হলো, আমার পিণ্ডি দেবার জন্তে—

মিনি

ছিঃ, কী যে বলো বাবা—

কর্ত্তা

বলি কি সাধে বলি,—কি প্রয়োজন ছিল চাকরের। অথচ জুলুম দেখোনা একবার,—শাসিয়ে গেছেন, দু-দুটো লোক আনতে হবে, রান্নার জন্য একটা, অন্য কাজের জন্য আলাদা আরেকটা—যেন আমি দিল্লীর বাদশা হ'য়ে গেছি। পরশু বলে গিছ্‌ল, কাল গরিমসী করে,—বুঝলে কিনা গিন্নী,—আব আনা হয়নি। তাইতে রাত্তিরে ঘাড় মটকাবার ভয় দেখিয়ে গেল।

মিনি

কি রকম মুখটা বাবা?

কর্ত্তা

বীভৎস। চোখ মিটমিট করে দেখি,—তাইতেই দমবন্ধ হয়ে আসার জোগাড়,—ভালো করে চেয়ে কি দেখবার জো আছে। চোখ বুজেই হাঁ না করে ব্যাটার জুলুমে রাজী হয়ে যাই,—চোখ বুজেই একটু কাকুতি টাকুতি করি। [থামিয়া] কী রকম অন্যায়টা দেখতো,—ওদের আমরা সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। ওপরের দুটো তালাতো একদম ছেড়ে দিইচি। অথচ দেখতো, কী রকম আমাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করচে,—ওঁটা কিঁনে এঁনো, সেঁটা আঁনা চাঁই, আঁজ নিঁজের জঁন্য ভাঁলো জাঁমা নাঁ কিঁনলে ঘাঁড় মঁটকাবো।

মিনি

সত্যি, এমন লক্ষ্মীছাড়া হয় ভূতগুলো!

কর্ত্তা

যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। ভূতের সঙ্গে এক সাথে বাস করা,—বুঝলে কিনা গিন্নী,—মানুষের পোষায় না। ওদের আচার ব্যবহারই আলাদা রকমের। কী রকম জুলুমটা বেড়ে চলেছে, শোনো, গিন্নি—কাল রাত্তিরে এসে বলে, মেঁয়েকে শীঁগ্‌গির কঁরে বিঁয়ে দেঁ। দেখতো কাণ্ড। আমার মেয়েকে [এই সময় মিনি প্রস্থান করিল] আমি এখন বিয়ে দিই, কি পরে বিয়ে দিই, বিয়ে দিই কি একেবারে না-ই দিই, তাতে তুই,—ভূত,—তোর কি?

গিন্নী

কথাটা একদম অন্যায্য বলেনি,—মেয়েটাকে আর কতকাল আইবুড় রাখ্‌বে?

কর্ত্তা

তুমি তো ভূতের সঙ্গেই সায় দিলে, অথচ আমি পাত্র পাই কোথায়। শালারা তো এক কুড়ি টাকা চেয়ে বস্‌বে'খন—

গিন্নী

ওগো, বলি শম্ভুর কথা তোমার মনে আছে,—ঐ যে শশি মিত্তিরের ছেলে? জলপানি পেয়েছিল

কর্ত্তা

হ্যাঁ, তার কি?

গিন্নী

তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে?

কর্ত্তা

হাঃ, হা-ঘরে বাপ-মা, পয়সা দেখেনি কোনও দিন, জলপানি পাওয়া ছেলের দোহাই দিয়ে ছিনে জোঁকের মত টেনে ধরবে। ও—সবের মধ্যে আমি নেই। শম্ভুটম্ভু বাদ দাও। ও সুবিধের ছেলে নয়।

গিন্নী

না গো, সে—আজ কালকার ছেলে, একটা পয়সাও নেবে না।

কর্ত্তা

[সহর্ষে] নেবেনা? পয়সা চায় না? তবে—বুঝলে কিনা গিন্নী,—তোমার ইচ্ছে—মত করতে পার। আমার খুব বেশি রকম মত আছে। বেশ সুবিধে মতন ছেলে পাওয়া গেছে,—দেখো, যেন আবার ফসকে না যায়।

গিন্নী

সে আমি করবো খন।

কর্ত্তা

খরচান্ত হ'য়ে গেলাম,—মেয়ের বিয়ে তো নাহক কম করে চল্লিশ পঞ্চাশটা টাকা খরচ হ'য়ে যাবে। আর দু-দুটো চাকর রাখতে হলো—মাস মাস দশবারোটা টাকা মাইনে ন. দেবায় ন ব্রাহ্মণায় গেল। দেখ্‌বে চলো গিন্নী, কি রকম বণ্ডাগোছের দুই ব্যাটা,—ভাত, যা সাবাড় করবে। তবে রক্ষে ভূতটুতের কথা কিছু শোনে নেই। চল, চল, ওদেব বাইরে দাঁড় করিয়ে এসেচি,—ভূতে যদি ভেঙ্‌চি দিয়ে যায়, তবেই ব্যাটারা পালাবে।

[ দুজনের প্রস্থান ]

অন্য দুয়ার দিয়া কালো ঢাক্‌নাটা উঠাইতে উঠাইতে শম্ভুর প্রবেশ। তারপরেই মিনি উপস্থিত হইল।

মিনি

তুমি কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি করছ, শম্ভুদা ?

শম্ভু

কেমন ?

মিনি

আমার বাবাকে তুমি খোঁচা দেবার কে। বুড়ো মানুষ,—অন্ধকারে যদি মাথায় লাগিয়ে দিতে...

শম্ভু

চোখ বুজে কি দিয়েছিলুম,—দেখে শুনেই দিয়েচি,—কোথায় লাগলে ব্যথা পেতে পারে আমার কি আর জ্ঞান নেই না কি ?

মিনি

আচ্ছা, তাই যেন হ'লো, কিন্তু আমাকে বিয়ে দেওয়াবার কথা তোমাকে কে বলতে বলেছিল। সেটা বুঝি নিজের বুদ্ধি খরচ করে বলা হয়েচে ?

শম্ভু

দেখতো, কেমন চমৎকার মাথা খাটিয়ে বলে দিলুম।

মিনি

হয়েছে, হয়েছে। অত দয়া করতে হবে না।

শম্ভু

বলো কি ? উচিত কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না ? তোমার এখন বিয়ে হওয়া দরকার,—বুঝলে, আমার ক্রমশঃই মনে হচ্চে, তোমার এইবার বিয়ে হওয়া দরকার !

মিনি

দেখ, ভাল হবে না, শম্ভুদা। দরকার হলে, তোমারই।

শম্ভু

হ্যাঁ, আমারও। তোমারও। তোমার সাথে আমার।

মিনি

ভূত কোথাকার! [ বিরক্তির অভিনয় করিল ] আমি চল্লুম। কী অসভ্যরে বাবা!

[ প্রস্থানোদ্যত ]

শম্ভু

শোন না মিনি। তুমি ভূতের পেত্নী হবে ?

[ জিব—ভেঙ্‌চাইয়া মিনির প্রস্থান ]

[ ডাকিয়া ] ওগো পেত্নী গো [ গিন্নীর প্রবেশ। শম্ভু জিব কাটিল ] মাসিমা !

গিন্নী

এই যে শম্ভু !

শম্ভু

মাসিমা, আমি মিনিকে বিয়ে করবো। [ গিন্নী একটু অবাক্ হলেন। একটু অপেক্ষা করিয়া শম্ভু আবার বলিল ] বলুন, মাসিমা আমার সঙ্গে কি আপনারা বিয়ে দেবেন ?

গিন্নী

কিন্তু তোমার বাপ মার মত—

শম্ভু

হবেই।

গিন্নী

কিন্তু মিনির বাবা কি রকম হিসেবী জানতো। পয়সা কড়ি হয়তো কিছুই—

শম্ভু

[ শেষ করিতে না দিয়া ] তার দরকার নেই। একটু মাত্র দরকার নেই। নিজের উপার্জ্জনের পয়সা ছাড়া, আর কোনও পয়সার ওপর আমার আর লোভ নেই।

গিন্নী

[ ভাবিয়া ] কিন্তু শুধু তোমার কথাই তো নয়, তোমার মা বাবা আছেন, তাদের কথা ভাবতে হবে, আর শুধু তাও নয়, আমার মেয়ের বিয়েতে যদি আমি উপযুক্ত রকম যৌতুক না দিই, তবে লোকেই বা কি বল্‌বে, আর আমিই বা কি বলে নিজেকে বোঝাব। সে যে আমার পক্ষে কত বড় দুঃখের কথা হবে তুমি তা বোঝ না ?

শম্ভু

ওঃ

গিন্নী

শুধু এক উপায় আছে।

শম্ভু

কি ?

গিন্নী

যেমন করে অনেকটা ওঁকে শোধ্‌রান গেছে, তেমনি করে এটাও হয়তো সংগ্রহ হ'তে পারে। ভূতের ভয় যে একেবারে নেই, তা নয়।

শম্ভু

[ লজ্জিত ভাবে ] ছিঃ, কী কাণ্ড করতে হচ্ছে বলুন,— শুধু মিনি না ছোড়বান্দা বলে। কিন্তু নিজের জন্য এমন করে যৌতুক সংগ্রহ করতে আমার লজ্জা—

গিন্নী

কিছু নয়, কিছু নয়, লজ্জার কিছু নয়। উনি ঐ ধরণেরই মানুষ,—প্রাণংরে কাউকে পয়সা কড়ি দিতে পারেন না, এমন কি নিজের মেয়েকেও নয়। ওঁর কাছে একটু কৌশল করা কিছু দোষের হবেনা।

শম্ভু

কিন্তু টাকা কি করে আদায় করি, টাকা তো আর সঙ্গে থাকেনা। টাকা এনে দিতে বল্‌লে বাড়ি ছেড়ে পালাবেন,—আর ফিরবেন না।

গিন্নী

সঙ্গেও থাকে বৈকি,—তুমি কি সব কথা জান! ব্যাঙ্ক ফেল পড়্‌তে পারে ভয়ে, স্থানে স্থানে ওঁর কত গর্ত্ত ঠিক আছে,—বেশির ভাগ টাকাই তাতে গোপন করা। শত বল্‌লেও শুনবেন না। তাছাড়া হাজার চারেক টাকা সব সময়ই ওঁর কোমরে বাঁধা থাকে,—সব সময়, দিন রাত্তির, চব্বিশ ঘণ্টা। বাদ বাকী যা আছে, তা কুড়ি পঁচিশটা ব্যাঙ্কের মধ্যে ছড়ান, যাতে ফেল পড়লেও এক সঙ্গে বেশি টাকা মারা না যায়।

শম্ভু

ওঃ, তাই নাকি ?

গিন্নী

আরো কত কাণ্ড আছে, মিনির বাবার। তা, যাক্‌, আজ রাত্রে তুমি অন্তত হাজার তিনেক আদায় করে নিয়ে এসো।

শম্ভু

কী একটা হাসির ব্যাপার হচ্ছে বলুন তো। আদত একটা ঠক্‌ হ'য়ে উঠেচি। [ শুনিয়া ] ঐ বুঝি, উনি আস্‌ছেন। আমি এই বেলা চম্পট দিই।

[ প্রস্থান ]

অন্য দুয়ার দিয়া কর্ত্তা প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

কর্ত্তা

[ বলিতে বলিতে প্রবেশ ] বুঝলে গিন্নী, দু-দুটো ব্যাটা চাকর জুটেচে। সর্ব্বস্ব খেয়ে ফেল্‌বে। ডালের সাথে ভাতের মাড় মিশাতে বলে দিয়ো দিকিনি।

[ যবনিকা পড়িল ]

## চতুর্থ দৃশ্য

গভীর রাত্রি। পট উঠিলে দেখা গেল অন্ধকারে একটা তক্তপোষে কে একজন ঘুমাইতেছে। দেওয়ালে ভূত তাড়াইবার জন্য একটা নামাবলী টাঙানো আছে। ঘরের একটা জানালাও খোলা নাই। একটা অতি ক্ষীণালোকে শুধুমাত্র তক্তপোষটা যা হোক কিছু দেখা যায়।

প্যাঁচার চীৎকার শোনা গেল।

একটা সানুনাসিক স্বর শোনা গেল, তারপর সেই অন্ধকার ঘরে বিকট এক সাজ করিয়া ভূতের প্রবেশ।

ঘরে ঢুকিয়া ভূত তিন চারবার তক্তপোষ প্রদক্ষিণ করিল, কি অদ্ভুত ভীতিকর সব অলৌকিক শব্দ করিল। গাল টিপিয়া 'ব্রুম্' 'ব্রুম্' আওয়াজ বাহির করিল।

দেওয়াল হইতে টিকটিকি পাড়িয়া মুখে পুরিবার অভিনয় করিয়া সে দরজার কাছে—তক্তপোষ হইতে দূরে,—যাইয়া দাঁড়াইল।

ভূত নাকী সুরে কথা বলিবে।

ভূত

[ নাকী সুরে ] চিঁ হি হি হি, হো হো হো হো হো, বুম্ বুম্, বুম্। [ একটু চুপ ]

ভূত

[ নাকী সুরে ] ঘুমুচ্ছিস্ বুঝি? [ একটু অপেক্ষা করিয়া ] মুপ্‌খু মানব, রাতে ঘুমুস্! জাগ জাগ! বুম, বুবুম্ বুম!

ভূত

পঙ্ পঙ্ ব্রুম্ ভুঃ হি হি হি হা হা। [ নাকী সুরে ] অসময়ে ঘুমুচ্ছিস্ কেনরে,—দুপুর রাত্তিরে ঘুমুস্, আলসে কোথাকার! [ তবুও ঘুমন্ত কর্তার সাড়া নাই ] খঃ ক্ষঃ, ভুম্ [ খুব লম্বা একটা লাঠি দিয়া কর্তার ভুঁড়িতে এক খোঁচা দিল। ] ওঠ, ওঠ বলছি…

[ কর্তা 'ভুঁড়িতে কে খোঁচাচ্ছে রে?' বলিয়া ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু ভূতের ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখিয়া নিমেষ মধ্যে শুইয়া চক্ষু বুজিয়া নাক ডাকাইতে সুরু করিল ]

কর্তা

[ শুইয়া চক্ষু বুজিয়া ] আমি জেগে নেই, ঘুমিয়ে পড়েছি আবার। আমার ভুঁড়ির খোঁচা আমি টের পাইনি। [ জোরে নাক ডাকাইতে লাগিল ]

ভূত

[ নাকী সুরে ]

দাঁড়া তবে মজা দেখাচ্ছি! আহা, কতদিন যে মনিষ্যির ঘাড় মটকাইনি,—তাজা রক্ত সুস্বাদু, বড় সুস্বাদু!

কর্তা

[ নিজে নিজেই ] বলে কিরে! আঁা, মতলবটা যে ভালো নয়। [ জোরে ] আমি ঘুমুইনি, আমি জেগেই আছি দেবতা [ ভয়ে তার গলা কাঁপিতেছে ]

ভূত

[ সানুনাসিক ] আমি দেবতা নই,—ও—নচ্ছারদের নাম করিসনে আমার কাছে। আমি ভূত। বুম্ বুকুম্, বুবুবুম্, ক্ষঃ, ফোঁস্ হা হা হি হি হি।

কর্তা

[ চোখ বুজিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া শুইয়া ] আবার কেন হুজুর,—কথামত চাকর তো এনে হাজির করেচি,—এইবারটী দুর্বলকে ক্ষেমা দিন!

ভূত

বড় ক্ষিধে পেয়েচে,—মানুষের মুণ্ডুটা আবার কোথায় রাখলুম; এই যে পেয়েছি [ একটা নর-কঙ্কাল বাহির করিয়া আনিল ]

কর্তা

[ উঁকি দিয়া একটু দেখিয়া ] সেরে-ছে রে!

ভূত

শোন্!

কর্তা

[ চক্ষু বুজিয়াই ] আজ্ঞে করুন!

ভূত

চাঁদা চাই…বুম্, ব্রুম, ববম্… চাঁদা চাই!

কর্তা

চাঁদা? কিসের চাঁদা হুজুর?

ভূত

হা হা হা হা হি হি হি হি। অমাবস্যাব দিন আমাদের মহোৎসব হবে,...চাঁদা চাই, টাকা দে, টাকা [ নরমুণ্ডে কামড় দেবার অভিনয় করিল ]

কর্ত্তা

[ সাতঙ্কে ] টাকা? হুজুর আমি টাকা পাব কোথায়? কপর্দ্দক আমার নেই,—দিন আনি দিন খাই—

ভূত

চালাকি হবেনা। আহা, কত দিন যে মনিষ্যির ঘাড় মটকাইনি,—তাজা রক্ত সুস্বাদু, বড় সুস্বাদু, হা হা হা। টাকা চাই, শীগগির দে···

কর্ত্তা

হুজুর, আমি বুড়ো, মানুষ! আমি গিয়ে, আপনার টাকা পাব কোথায়?

ভূত

[ বিকট অট্টহাসি করিয়া উঠিল ] দিবিনে, তবে, লক্ষীছাড়া দিবিনে। [ দাঁত কড়মড় করিয়া ] হা হা হা হা হি হি হি হি, সুস্বাদু, বড় সুস্বাদু···

কর্ত্তা

দোহাই হুজুর, আমায় প্রাণে মারবেন না। এই বল্লুম, দেবো, দেবো টাকা, বুকের রক্ত জল করেই দেব। বেশ, দেব বল্লুম, কালই এনে দেব।

ভূত

ববম্, ফোঁঃ, ভূত ভুতুম! আজ, আজই চাই। কাল্‌কের নাম করে পালিয়ে যেতে চাস্—ঘাড় মটকাবো তো,—তাজা রক্ত, হা হা হা হা হা—

কর্ত্তা

কিন্তু হুজুব, এখন আমি কোথায় পাই?

ভূত

কোমরের টাকার থলিটা বের করে দে [ দেওয়াল হইতে টিকটিকি ধরিয়া মুখে পুরিবার অভিনয় ]

কর্ত্তা

[ প্রায় স্বগত ] সেরেছে,—তাও টের পেয়েছে। ওবে বাবা, এযে সত্যি, ভূতের অজানা কিছু নাই [ জোরে ] হুজুব আমি গবীব মানুষ,—আমি চারগণ্ডা পয়সার বেশি দিতে পারব না কিন্তু,—তিনদিন আমাব বাজার খরচা বন্ধ রাখতে হবে···

ভূত

[ নরমুণ্ডটা নীচে ফেলিয়া তাহা দিয়া গেণ্ডুয়া খেলিয়া ] হা হা হি। সব চাই, সব—

কর্ত্তা

[ বিশ্বাস না করিয়া ] মানে?

ভূত

থলিটা আমার হাতে দে,—দেরি করিসনি, দে দে, বের করে দে,—চিহি হি হি ক্রম্ ক্রম্—

কর্ত্তা

সর্ব্বনাশ, এ বলে কি? থলেতে যে তিনতিন হাজার টাকা! অ্যাঁ,—কি কাণ্ড। এর চাইতে আমার মরা ভাল,—নাঃ,—প্রাণধরে এ-টাকা আমি দিতে পারব না। ভূত বাবু,—মার, একদম মেরে ফেল, ঘাড় মটকাও, দেহে প্রাণ থাক্‌তে এ-টাকা আমি ছাড়তে পারব না···

ভূত

হা হা হা হা হা খাবো খাবো খাবো হা হা হা হা হা
[ ভূতের মুখ দিয়া অকস্মাৎ আগুন বাহির হইতে লাগিল ]
[ দেখিয়া কর্ত্তার দম বন্ধ হইয়া আসিবার জোগাড় ]

কর্ত্তা

ওরে বাবা, যাই কোথা। এত বল্লুম, একটু যে দয়া হ'লো না। শেষে দেখি পৈত্রিক প্রাণটায় ঠাণ্ডা ক'রে দেবে! [ কোমর হইতে থলি খুলিয়া ] নেও, নেও, নিয়ে যাও, সর্ব্বস্ব নিয়ে যাও। ওরে, কী কুক্ষণে এই ভূতের সঙ্গে বাস করতে এসেছিলাম,—আমার সর্ব্বনাশ করে ছেড়ে দিলে—

ভূতের মুখ হইতে তখন তেমনি আগুন বাহির হইতেছে ]

প্রাণে মেরো না হুজুর ,নেও নেও, নিয়ে যাও, এক নয়, দুই নয়, ;একশো নয়, দুশো নয়, তিনতিন হাজার টাকা, ওরে আমি পাগল হয়ে যাব।

[ ভূত এমন সময় ভীষণ হুঙ্কার করিয়া উঠিল ]

নেও, নেও, আমার কলজে ছিঁড়ে নিয়ে যাও

[ বাঁ হাতে চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া ডান হাতে ছুঁড়িয়া দিল ]

ভূত আসিয়া সেই উঠাইয়া লইল। বাঁ হাতে মড়ার মাথাটা নাড়াইয়া সে দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

## কর্ত্তা

[ লাফাইয়া উঠিয়া ] মরি তো মরি, একবার ঝাপ্‌টে ধরি।

ভূতকে যাইয়া ঝাপ্‌টাইয়া ধরিল। কর্ত্তা বলিতে লাগিল,—এতগুলি টাকা গেলে আমার জীবন থেকেই আর কোন্ লাভ। ভূত প্রাণপণে তাকে ছাড়াইতে চায়। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর ভূত ছাড়া পাইয়া চো—চো চম্পট দিল।

## কর্ত্তা

[ আর্ত্তনাদ করিয়া ] গেল, নিয়ে গেল, সর্ব্বস্ব নিয়ে গেল। [ চীৎকার করিয়া ] গিন্নী, ও গিন্নী, ওঠ, ছুটে এসো। ভূতে আমাকে সাবাড় করে গেল।...

[ ছুটিয়া গিন্নী ও মিনির প্রবেশ ]

## গিন্নী

কি কি কি হয়েছে,—অমন করে চেঁচাচ্ছ কেন?

## কর্ত্তা

চেঁচাচ্ছি, সাধে চেঁচাচ্ছি,—সর্ব্বস্ব অপহরণ করল। গলায় পা দিয়ে কাণাকড়িটি পর্য্যন্ত নিয়ে গেল। ওরে আমাকে পথে বসিয়ে গেল রে, ওরে আমার—

## গিন্নী

কি নিল, কে নিল, কিছু বলচ না যে—কেবলই চেঁচিয়ে মরচ

## কর্ত্তা

গিন্নী, তোমার কথা আগে শুনিনি, অন্যায় করেচি, ঘোরতর অপরাধ করেচি। নইলে ভূতের সঙ্গে মানুষের থাকা কি কোনদিনই উচিত। বলবো কি গিন্নী, ব্যাটা ঘাড় মটকাবার ভয় দেখিয়ে, আমার তিন তিন হাজার টাকা লুঠ করে নিয়ে গেল। আমি আর ভাল নেই,—ক্রমেই পাগল হ'য়ে যাচ্ছি,—মগজ্ আমার জট্ পাকিয়ে যাচ্ছে,—ওগো, আমি পথে বস্‌লাম গো!

## গিন্নী

বলেছিলাম, এই ভূতুড়ে বাড়ীতে থেকে কাজ নেই,—কি সর্ব্বনাশের কথা গো। সত্যি সত্যি যদি ঘাড়টাড়ের ওপর অত্যাচার করত তবেই—

## কর্ত্তা

আরে দুত্তোর ঘাড়ের ওপর অত্যাচার! আমার যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে গেল,—তো ঘাড় থাকা আর না থাকা। ওরে মা, আমি কি করি, আমি যাই কোথা। পুলিশে যাব, তারও জোগাড় নেই,—ভূত ধরতে আর কোন্ পুলিশ আস্‌বে। [ সহসা থামিয়া ] চল গিন্নী যাবো, যাবো। লক্ষ্মীছাড়াদের ঘাঁটিতেই গিয়ে হানা দেবো,—মিনি তুই লণ্ঠন ধর, গিন্নী তুমি আঁশ বটি নিয়ে এসো,—

[ প্রভাতের আলো দেখা দিল ]

ঐ যে ভোর হয়ে এসেচে,—চল গিন্নী, শীগ্‌গির চলো আর দেরি নয়,—অন্ধকার থাক্‌তে থাক্‌তে ধরা যাক্ গিয়ে।

[ কর্ত্তা ও গিন্নীর প্রস্থান ]

এমন সময় অন্য দুয়ার দিয়ে শম্ভু প্রবেশ করিল।

## মিনি

কী তোমরা আরম্ভ করেছ বলোতো,—বুড়ো লোকটাকে মেরে ফেল্‌বে না কি?

## শম্ভু

আর নয়,—এইবার সমাপ্ত মিনি। আমার ভূত-লীলা এইবার সম্বরণ করবো।

## মিনি

শুনে আশ্বস্ত হলুম...

শম্ভু

তোমার জন্যই তো,—অর্থাৎ মানে, বুঝলে কিনা,—তোমার জন্যই ওটা করতে হ'লো।

মিনি

আমার জন্য ?

শম্ভু

হ্যাঁ গো। তোমাকে বিয়ে দিতে টাকা লাগ্‌বে-যে!

মিনি

যথেষ্ট ধন্যবাদ, আমার জন্য মাথা-ব্যথা করবার তোমার কোন দরকার ছিলনা।

শম্ভু

মিনি ?

মিনি

কি।

শম্ভু

আমাকে পছন্দ হয় ?

মিনি

ভূত কোথাকার!

শম্ভু

ও-সব চালাকি চল্‌বে না। এত হাঙ্গামা করলুম,—এখন করতেই হবে।

মিনি

[ দরজার দিক অগ্রসর হইয়া ] কী অসভ্য রে! আমি কখ্‌খনো আর তোমার সঙ্গে কথা বলবনা। চল্লুম আমি!

শম্ভু

রাগলে তোমায় চমৎকার দেখায় মিনি।

মিনি

[ রাগের অভিনয় করিয়া ] ভূত! [ দরজার কাছে আগাইয়া গেছে ]

শম্ভু

[ হাসিয়া ] পেত্নী!

[ কিল দেখাইয়া মিনি তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল। শম্ভু আগাইয়া গিয়াছিল। এমন সময় বাহিরে কর্তার গলা শোনা গেল। 'লক্ষ্মীছাড়ারা মহোৎসব করবেন,—যাকে বলে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ!' শুনিয়া শম্ভু ত্রস্ত-ভাবে চম্পট দিল। ও-দিক দিয়া ঝাঁপটি উদ্যত করিয়া কর্তার প্রবেশ ]

কর্তা

[ রঙ্গমঞ্চের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে ] ভূত তো ভূত, ভূতের বাপ আমার টাকা নিয়ে হজম করতে পারবে না। কোথায় যাবে বাপু, পেট টিপে, টাকা বের করব আমি। প্রাণ যায় যাক্‌, কিন্তু টাকা,—ও-সব হচ্ছে না···আমি তোমার নাক কাট্‌ব, কান কাট্‌ব, চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাব।

যবনিকা

শ্রীসুবোধ বসু

# জেনারেল ক্ল্যদ মার্টিন

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, পি আর এস

সাধারণ ভাগ্যান্বেষী সৈনিকগণ হইতে অনেক বিষয়ে ক্ল্যদ মার্টিনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তিনি প্রথম যুগের একজন বিখ্যাত ফরাসী ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। প্রথমজীবনে স্বদেশের সেনাবিভাগে প্রবেশ করিয়া ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলেও তিনি পরে সমরু ও মাদেকের মত ইংরাজ কোম্পানীর কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মত তিনি প্রথম সুযোগেই অন্যত্র ভাগ্যান্বেষণে পলায়ন করেন নাই। একবার বশ্যতা স্বীকার করিবার পর শপথ ভঙ্গ করিয়া পলায়ন করা হেয়তম বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া তিনি মনে করিতেন। মার্টিনের অবশিষ্ট জীবন ইংরাজের কর্ম্মে অতিবাহিত হয়। কালক্রমে তিনি কোম্পানীর সেনাবিভাগে 'মেজর-জেনারেল' পদে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখনকার দিনে ইংরাজ সেনাবিভাগে বিদেশী সৈনিকের অপ্রতুল ছিলনা, কিন্তু খুব অল্পলোকের অদৃষ্টে এ সৌভাগ্যলাভ ঘটিয়াছিল।* মার্টিন নিজ জাতীয়ত্ব কখন বিসর্জ্জন দেন নাই। তিনি মনে প্রাণে বরাবর ফরাসীই ছিলেন। ইংরাজ নাগরিকত্ব গ্রহণ করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে অনেকবার অনুরোধ করিলেও তিনি সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই। নিজের উইলে তিনি স্পষ্টভাবেই লিখিয়াছিলেন যে তিনি ক্যাথলিক খৃষ্ট-ধর্ম্মবিশ্বাসী ফরাসী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই ভাবেই মরিতে চাহেন; ইহা ভিন্ন অপর কিছু তাঁহার কাম্য নাই।

সুবিপুল অর্থ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইলেও সহকর্ম্মীগণের মত মার্টিন পরিণত বয়সে তাহা লইয়া বিশ্রামসুখ উপভোগের জন্য স্বদেশে ফিরিয়া যান নাই। সঞ্চিত অর্থরাশির অধিকাংশ তিনি বিভিন্ন সৎকার্য্যে, প্রধানতঃ খৃষ্টান বালক-বালিকাগণের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনোদ্দেশ্যে দান করিয়াছিলেন। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"—মার্টিনের দেহান্তের আজ শতাধিকবর্ষ পরেও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-নিকেতন-সমূহ, রুগ্ন, আর্ত্তের জন্য তাঁহার দানভাণ্ডারগুলি তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ জগতে বিঘোষিত করিতেছে। ভাগ্যান্বেষীদিগের মধ্যে অনেকে হয়ত মার্টিন অপেক্ষা অধিক অর্থার্জ্জন করিয়াছিল, কিন্তু আজ কে-ই বা তাহাদের চিনে?

ফ্রান্সদেশের লিয়ঁনগরে ফ্ল্যরীমার্টিনের পিপানির্ম্মাণের কারখানা ছিল। কেহ কেহ তাঁহাকে রেশম ব্যবসায়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সে কথা কিন্তু সত্য নহে। ক্ল্যদ ফ্ল্যরীর দ্বিতীয় পুত্র। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। মাত্র নয়মাস বয়ক্রমকালে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয় এবং তাহার অনতিকাল পরেই ফ্ল্যরী পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন। ক্ল্যদের বিমাতা জিয়ানমেরি মার্টিনেট তিনটী পুত্র ও দুইটি কন্যার জননী হইয়াছিলেন। অনুমান ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ফ্ল্যরীর মৃত্যু হইয়াছিল।

বাল্যকালে ক্ল্যদ স্থানীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার গণিত ও বিজ্ঞানে সবিশেষ অনুরাগ দেখা গিয়াছিল। উত্তরকালে এই দুই বিদ্যাই তাঁহার যথেষ্ট প্রয়োজনে লাগিয়াছিল। তখন ভারতবর্ষে ফরাসীদের খুব প্রভাব। ডুপ্লের চেষ্টায় ফরাসী নামে একটা শ্রদ্ধাভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে তখন ইংরাজ ও ফরাসীতে দ্বিতীয় কর্ণাটিক সমর (১৭৫১—৫৪) নামে

* ইংরাজদিগের Regiment of de Meuron নামক সুইজরলণ্ড-দেশীয় একদল ভৃতিভুক সৈন্য ছিল। উহাদের অধিনায়ক কাউন্ট চার্লস ডানিয়েল এবং কাউন্ট পীয়ের ফ্রেডারিক ডি মিউরণ নামক ভ্রাতৃদ্বয় উভয়েই ঐ পদলাভ করিয়াছিলেন। Martin নামটীর প্রকৃত ফরাসী উচ্চারণ মার্ত্যাঁ হইলেও বর্ত্তমান প্রবন্ধ মধ্যে উক্ত নামের ইংরাজী উচ্চারণ প্রদত্ত হইল।

পরিচিত বিষম যুদ্ধ চলিতেছিল। হায়দ্রাবাদ ও আর্কট-দরবারে ডুপ্লের ফরাসী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতে এই যুদ্ধের উদ্ভব সে কথা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রে অবগত আছেন। যুদ্ধ-নিরত সৈনিকগণের হস্তে আশাতীত অর্থাগম হইতেছিল। এই সকল কাহিনী শ্রবণ-গোচর হওয়াতে ফ্রান্সদেশের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলকার মনে ভারতবর্ষের নামে এক মাদকতার সৃষ্টি হইয়াছিল। দেখিয়া শুনিয়া ক্ল্যদ এবং তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা লুইয়ের প্রাচ্যদেশে ভাগ্য-পরীক্ষার যাইতে বাসনা জন্মিল এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া উভয়ে একদিন গোপনে ভারতবর্ষে গমনোদ্যত এক রেজিমেন্টে নাম লিখাইল। এ সংবাদে জিয়ান্ মেরী একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। তাঁহার ভর্ৎসনা, অনুরোধ উপরোধে লুইয়ের আর যাওয়া হইল না। ক্ল্যদ কিন্তু কাহারও বারণ মানিলেন না। ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৭৫১ সালে তাঁহার রেজিমেন্ট L'orient বন্দর হইতে যাত্রা করিয়া পর বৎসর মার্চ্চ মাসে যথাকালে পন্দিচেরীতে আসিয়া উপনীত হইল।

এদেশে উভয় কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ সমরে মাতিলেও আশ্চর্য্যের বিষয় দ্বিতীয় কর্ণাটিক যুদ্ধকালে ইউরোপে উভয় জাতির মধ্যে শান্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু শীঘ্রই আবার বিখ্যাত সপ্তবর্ষব্যাপী সমর। (Seven Years War; 1756—1763) বাধিলে ইংরাজ ও ফরাসীরা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বলপরীক্ষায় লিপ্ত হইল। ভারতবর্ষে সংঘটিত যুদ্ধ তৃতীয় কর্ণাটিক সমর নামে অভিহিত। মার্টিন, মাদেক জাঁতিল, ডুগেল, রাসেল, গার্দ্দে, আলেনপ্রমুখ উত্তরকালে সুপ্রসিদ্ধ ভাগ্যান্বেষী সৈনিকগণ প্রথমজীবনে ফরাসী সেনাদলে থাকাকালে লিপ্ত ছিলেন। উহাঁদের কাহিনীপ্রসঙ্গে ঐ সকল যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ প্রায়ই করিতে হইবে। সেজন্য এখানে কর্ণাটিকের সমরত্রয় সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। কি ত্রুটী বিচ্যুতির জন্য করায়ত্ত-প্রায় ভারতবর্ষের আধিপত্য ফরাসীগণ হারাইল, কিরূপে ইংরাজরা প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট লব্ধ বিদ্যার বলে তাহাদের নির্জ্জিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহাও জানা আবশ্যক।

মোগলশক্তির পতনজনিত বিশৃঙ্খলার সুযোগে এদেশে নিজেদের প্রাধান্য বদ্ধমূল করার পরিকল্পনা সুবিখ্যাত ফরাসী মনীষি ডুপ্লের আবিষ্কৃত। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে War of the Austrian Succession উপলক্ষ্যে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ বাধিলে তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে উহাদের বিতাড়িত করিতে সচেষ্ট হইলেন। পর বৎসর ইংরাজ এডমিরাল বস্কাওয়েন নৌবহর লইয়া বঙ্গোপসাগরে দেখা দিলে ডুপ্লে প্রমাদ গণিয়া কর্ণাটিক প্রদেশের নবাব আনওয়ার উদ্দীনের শরণ লইলেন। মান্দ্রাজ ও পন্দিচেরী উভয় নগরই তাঁহার রাজ্যমধ্যে অবস্থিত ছিল। নবাব ইংরাজদিগকে তাঁহার রাজ্যমধ্যে সমরানল প্রজ্জলিত করিতে নিষেধ করিলে বস্কাওয়েন নিজ রণপোতমালা লইয়া ফিরিয়া গেলেন। ইহার কিছুকাল পরে মরিশস দ্বীপের শাসনকর্ত্তা এডমিরাল লাবোর্দ্দোনে ফরাসী নৌবহরসহ করমণ্ডল উপকূলে আসিয়া দেখা দিলেন। তখন ডুপ্লের আর নবাবের নিরপেক্ষতার কথা স্মরণ রহিল না। লাবোর্দ্দোনে শত্রুকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ মাহিবন্দরের উদ্ধারসাধন করিলেন এবং ইংরাজ সেনাধ্যক্ষ লর্ড পেটনকে পরাজিত করিয়া মান্দ্রাজ অবরোধে প্রবৃত্ত হইলেন। সপ্তাহকাল অবরোধের পর ইংরাজরা তিনমাস পরে তাঁহারা ৪৪ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দিলে মান্দ্রাজ ফিরিয়া পাইবেন এবম্বিধ সর্ত্তে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। ডুপ্লে কিন্তু এ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি লাবোর্দ্দোনেকে জানাইলেন যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত এডমিরালের ইংরাজদিগকে ঐ প্রকার সর্ত্ত দিবার ক্ষমতা নাই। ইহাতে লাবোর্দ্দোনের ক্রোধের অবধি রহিল না। নিজের কথার কোন মূল্য থাকে না দেখিয়া তিনি আপনাকে অবমানিত বিবেচনা করিলেন এবং ডুপ্লেকে জানাইলেন যে রাজকীয় নৌবহরের অধ্যক্ষরূপে তিনি গভর্ণরের অধস্তন কর্ম্মচারী নহেন, ইচ্ছামত ব্যবস্থা করিবার অধিকার তাঁহার আছে। ইংরাজদিগের পরম সৌভাগ্য-বশতঃ ইঁহারা দুইজনে এই সময় আত্মকলহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। নতুবা তাঁহাদের রক্ষা পাইবার আর কোন আশা ছিল না।

এদিকে ফরাসীরা তাঁহার নিষেধ না মানিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করায় আনওয়ারউদ্দীন বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

এ সংবাদে দুপ্লে তাঁহাকে জানাইলেন যে লাবোর্দোনের নিকট হইতে মান্দ্রাজ পাইতে যাহা কিছু বিলম্ব; উহা পাইবামাত্র তিনি নবাবকে তাহা সমর্পণ করিবেন এবং ঐজন্যই ফরাসীরা ইংরাজদিগের নিকট হইতে মান্দ্রাজ অধিকার করিয়াছে। অতঃপর দুপ্লে লাবোর্দোনের নিকট হইতে মান্দ্রাজ লাভে সচেষ্ট হইলেন এবং স্বদেশে কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলেন যে অর্থ-বিনিময়ে মান্দ্রাজ ইংরাজদের প্রত্যর্পণ করিলে ফরাসীদের ঘোর স্বার্থহানি হইবে। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দুপ্লের করে মান্দ্রাজ প্রদান করিতে আদিষ্ট হইয়া লাবোর্দোনে অতঃপর নিজ নৌবহর লইয়া মরিশসদ্বীপে ফিরিয়া গেলেন। *

মান্দ্রাজ হাতে পাইয়াও দুপ্লে নবাবকে তাহা দিলেন না। তিনি তথাকার ইংরাজদিগকে বন্দীদশায় পন্দিচেরী প্রেরণ করিলেন এবং তাহাদের যাবতীয় সম্পত্তি রাজকোষ-জাত করিয়া লইলেন। আনওয়ারউদ্দীন মান্দ্রাজ অধিকার করিবার জন্য নিজ পুত্র মহফুজ খাঁর নেতৃত্বে দশসহস্র সৈন্য পাঠাইলেন। কিন্তু মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গ ও দেশীয় শিক্ষিত সিপাহী সেনা লইয়া Paradis এবং Espresmenil নামক ফরাসী সেনানায়কদ্বয় মৈলাপুর বা সান্ থোমের যুদ্ধে উহাদের বিতাড়িত করিলেন। এই ঘটনায় সমগ্র দেশে চাঞ্চল্যের স্রোত বহিল,—পাশ্চাত্য সমরপদ্ধতির উৎকর্ষ সম্বন্ধে লোকের চক্ষু ফুটিল,—ফরাসীদের নামে সর্ব্বত্র শ্রদ্ধাভীতির সঞ্চার হইল। অতঃপর দুপ্লে ফোর্ট সেণ্টডেভিড অধিকারে সচেষ্ট হইলেন। মান্দ্রাজের পতনের পর ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এই স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না। ইতোমধ্যে তাঁহার চক্রান্তে নবাব ইংরাজদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ফরাসীদের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন। সম্মিলিত সেনাদল একযোগে দুর্গ আক্রমণ করিল। কিন্তু ইংরাজগণ অসমসাহসে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে মেজর লরেন্স ও বস্কাওয়েন ইংলণ্ড হইতে সাহায্যকারী সৈন্যদলও রণপোতমালা লইয়া উপনীত হইলেন। তখন আর জয়াশা নাই দেখিয়া শত্রুপক্ষ পশ্চাৎপদ হইল। অপ্রকৃতিস্থমতি নবাব পুনরায় পক্ষ পরিবর্ত্তন করিলেন। এবার ইংরাজদিগের পালা, তাঁহারা মহোৎসাহে পন্দিচেরী আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু জলে স্থলে দুইমাসকাল নগর অবরোধ করিয়াও তাঁহারা উহা অধিকার করিতে পারিলেন না, বরং তাঁহাদের সেনানায়ক লরেন্স শত্রু করে ধৃত হইলেন। দুপ্লে মহোৎসাহে চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে ইংরাজরা পরাজিত হইয়াছে। ইহার কিছুকাল পরে ইউরোপে শান্তি স্থাপিত হইবার সংবাদ (আ-লা-শাপেলের সন্ধি—অক্টোবর ১৭৪৮) এদেশে আসিয়া পৌছিলে যুদ্ধ নিবৃত্তি হইল। ইংরাজরা মান্দ্রাজ ফিরিয়া পাইলেন। ফরাসী গভর্ণমেণ্টের দুপ্লের ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও মান্দ্রাজ প্রত্যর্পণ করা নিতান্ত অনুচিত হইয়াছিল।

চিরশত্রু এই দুই জাতি কিন্তু দীর্ঘকাল এদেশে শান্তিতে অতিবাহিত করিতে পারিল না। অচিরেই আবার তাহারা যুদ্ধে মাতিল। আনওয়ারউদ্দীন নিজ সুবিধামত পক্ষ পরিবর্ত্তন করায় দুপ্লে তাঁহার প্রতি জাত-ক্রোধ হইয়াছিলেন। দেশীয় নৃপতিবৃন্দের আত্মকলহে হস্তক্ষেপ করিয়া নিজ মনোনীত ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার নামে সমগ্র দেশে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা এ বিদ্যাটী দুপ্লেরই আবিষ্কৃত। চাঁদ সাহেব নামক পূর্ব্বতন এক আর্কটের নবাবের জামাতা ফরাসীদের নিকট আনওয়ারউদ্দীনের বিরুদ্ধে সাহায্যকামী হইলে দুপ্লে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বৃদ্ধ নিজাম-উল-মুলকের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নাসিরজঙ্গ তৎকালে তাঁহার সন্নিকটে ছিলেন।

---

*সেখানে আসিয়া লাবোর্দোনে দেখিলেন ইতোমধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বীর চেষ্টায় তিনি পদচ্যুত হইয়াছেন এবং নূতন এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তখন রাজদরবারে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি এক ওলন্দাজ পোতারোহণে ইউরোপ যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে ইংরাজ হস্তে ধৃত হইয়া ইংলণ্ডে নীত হইবার পর তিনি বর্ত্তমান যুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করিবার অঙ্গীকার করিয়া স্বদেশ গমন করিলেন। মরিশসদ্বীপের শাসনকর্ত্তা অবস্থায় কুশাসনের অভিযোগে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল। তিন বৎসর পরে তাঁহার বিচার আরম্ভ হইল এবং বিচারের ফলে তিনি নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইলেও বাস্তিলের কঠোরতায় এবং মনঃকষ্টে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল এবং মুক্তিলাভের অল্পকাল পরেই তিনি মানবলীলা-সম্বরণ করিলেন।

রাজকোষ হস্তগত করিয়া তিনি নিজেকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আসফ খাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র গাজিউদ্দীন হাইদর দিল্লী দরবারে উজীর ছিলেন। তিনি মোগল দরবার ছাড়িয়া নিজামপদের প্রার্থী হইলেন না। কিন্তু মৃত নিজামের এক প্রিয় দৌহিত্র মজঃফরজঙ্গ মাতুলের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। চাঁদসাহেব ও ডুপ্লে তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিলেন। আম্বুরের যুদ্ধে (২৩।৭।১৭৪৯) আনওয়ারউদ্দীন পরাজিত ও নিহত এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহফুজ খাঁ শত্রুকরে বন্দী হইলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ আলি কোনমতে ত্রিচিনপল্লীতে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। চাঁদসাহেবকে ও মজঃফরজঙ্গকে ডুপ্লে কালবিলম্ব ব্যতিরিকে ঐ স্থান অধিকার করিতে বলিলেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা তঞ্জোর যাত্রা করিলেন, উদ্দেশ্য উক্ত হিন্দুরাজ্য হইতে নিজেদের অর্থাভাব বিদূরিত করা। তঞ্জোরাধিপতি প্রতাপসিংহের উহাঁদের বাধা দিবার সামর্থ্য ছিল না। তিনি নগদ বার লক্ষ টাকা এবং ৫৮ লক্ষ টাকার হুণ্ডি প্রদান করিয়া অব্যাহতি পাইলেন। ইতোমধ্যে নাসিরজঙ্গ কর্ণাটিক প্রদেশের রাজধানী আর্কট অধিকারে যাত্রা করিয়াছিলেন। এ সংবাদে চাঁদসাহেবের, মজঃফরজঙ্গের এবং একটি ফরাসী সেনাদল তাঁহাকে বাধাদানে অগ্রসর হইল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হইল না। ডুপ্লের সহিত মনোমালিন্য থাকায় ফরাসী সেনানায়ক ও সৈনিকগণ কর্ত্তব্য পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করায় নাসিরজঙ্গের পক্ষে আর্কট অধিকার সম্ভব হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

# ঝড় ও একটি পাখী

## শ্রীবিমল মিত্র

যদি কখনও এমন হয় : ইচ্ছামতীব তীরে ডিঙার ভিতর শুইয়া মাঝরাত্রে যদি তোমাদের হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যায়—আকাশ ভরা অন্ধকার—নিস্তরঙ্গ নদীব জল যদি আচম্‌কা কুল্ কুল্ শব্দ করিয়া ওঠে, ছোট বাতায়নে অদূরের বাঁশঝাড় আর ধানক্ষেতেব বাতাস আসিয়া সব ওলট্ পালট্ করিয়া দেয়—স্মৃতি, বিস্মৃতি, লাভ, ক্ষতি সব যদি সেই বাতাসে একাকার হইয়া যায়—নবম বালিশের ওপর দুটি চোখের পাতা অকাবণে ভারি হইয়া ওঠে···আর সেই নিশীথ রাত্রে—নির্নিরীক্ষ অন্ধকারে দূরে—অনেক দূরে বাঁশঝাড়ের ছোট একটি ফাঁক দিয়া একটি তারা উঁকি মারিতে থাকে—উঁকি মারিয়া দুষ্টু মেয়ের মত হাত নাড়িয়া 'আয়' 'আয়' বলিয়া ডাকে, অথবা মাথার উপর একটি পাখী কুক্ কুক্ করিয়া ডাকিতে ডাকিতে গিয়া দিগন্ত সীমায় মিলাইয়া যায়—তখন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মনে করিও :—ও আর কিছু নয়; ওই তারাটি, ওই পাখিটি—ওই দিগন্ত জোড়া অন্ধকার,—এই আকাশ বাতাস—ওই প্রত্যক্ষ বাস্তবতাব পিছনে একটি পরম রহস্য লুকাইয়া রহিয়াছে—বহুদিন পূর্ব্বের ভুলিয়া যাওয়া রহস্য—একটি ঝড়ের রাত্রি আর একটি পাখীর রহস্য······

মাইল দু'তিনের মধ্যে লোকের বসতি নাই; মেঠো পথ দিয়া জমিদারের পাল্কী চলিয়াছে; দু'জন বেহারার হুঙ্কার হাওয়ায় কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে; গাছপালা বন জঙ্গল সব ভীষণ শব্দ করিয়া দুলিতেছে।···

ফাঁক দিয়া নিখিলেশ বাহিরে চাহিয়া দেখিল : আকাশে বৃষ্টির বিরাম নাই।

মাঠ ঘাট কাদায় কাদা—বেহারাদের পা আর চলেনা; ক'দিন ধরিয়া বৃষ্টি হইতেছে, ধানক্ষেতে এতখানি করিয়া জল জমিয়াছে—বিলে জল থৈ থৈ করিতেছে—সময় বুঝিয়াই দুর্য্যোগ নাবিয়াছে।

মাঠের পর মাঠ—এদিকটা ঢালু বেশি;—জলও এদিকে জমিয়াছে অধিক। কোন রকমে ঠেলিতে ঠেলিতে বেহারারা চলিয়াছে; চাকর তাহারা—হাঁ হুঁ করিবাব ক্ষমতা নাই চলিয়াছে তো চলিয়াছেই!

এমনি কবিয়া তিন ক্রোশ পথ চলিয়া তবে ইচ্ছামতী নদীর খেয়াঘাট; সেইখান হইতে খেয়াপার হইয়া আবার একমাইল পথ, তারপর শিবনিবাস ইষ্টিশান। শিবনিবাসে গাড়ী ছাড়িবে রাত্রি দশটায়, সেই ট্রেন সহরে পৌঁছিবে কাল সকাল বেলা। রাত্রিটা কাটিবে ট্রেনে; সারা রাত ট্রেনের দোলায় নিখিলেশের ঘুমটা মন্দ হইবে না। ট্রেনের দোলায় নিখিলেশের ঘুম হয় ভালো। কিন্তু—তাহার মনে হইল—গাড়ী যদি খালি থাকে তবেই তো···

একবার ট্রেনের কামরায় নিখিলেশের সহযাত্রী ছিল একটি বাঙালী দম্পতি; মেয়েটির বয়স বেশি—কিন্তু রাত্রে তাহা ধরা যায় নাই; সারারাত্রি সেই অন্ধকার কামরার ভিতর মেয়েটির সান্নিধ্য এতটা ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছিল, যে নিখিলেশ কিছুতেই ঘুমাইতে পারে নাই।···মেয়েটির ঘুম বড় তরল, ঘুমের মধ্যে বার বার কী যেন কথা বলিতেছিল—চমকিয়া উঠিতেছিল—এপাশ ওপাশ করিতেছিল; নিখিলেশ সারারাত্রি অস্পষ্ট অন্ধকারে জাগিয়া কেবল তাহাই দেখিয়াছে—

ভোরবেলা নিখিলেশ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; সকাল বেলার ঘুম, গাড়ী একটু দুলিয়া উঠিতেই ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া নিখিলেশ দেখে, আলো হইয়া চারদিক বেশ ফর্সা হইয়া গিয়াছে, পাশেব বার্থে মেয়েটি তখন জাগিয়া উঠিয়াছে, জাগিয়া উঠিয়া অলসভাবে বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে···দেখিয়াই

নিখিলেশের যেন কেমন বীতস্পৃহা আসিয়া গিয়াছিল। রাত্রে যাহাকে সে অপরূপ সুন্দরী দেখিয়াছে—দিনের বেলার আলোকে তাহার রূপের দৈন্য ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

তারপর সেদিন যতক্ষণ মেয়েটি গাড়ীতে ছিল, নিখিলেশ একবারও তাহার দিকে ফিরিয়া তাকায় নাই।

কাছাকাছি কোথায় যেন একটা বাজ পড়িল। ভীষণ শব্দে গাছের পাতাগুলি এক সঙ্গে কাঁপিয়া উঠিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল: বৃষ্টি যেন আরো জোরে পড়িতেছে। কখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে! পথের দু'পাশে খাদকাটা —তাহারই ভিতর ব্যাং ডাকিতেছে; অবিশ্রাম ঝম্‌ঝম্ শব্দ; কানে তালা ধরিয়া যায়।

এই বৃষ্টিতে সব চেয়ে নিখিলেশের ভাল লাগে: সামনে বসিয়া গল্প করিবে লাবণ্য। গান নয়—খেলা কিছু নয়—কেবল গল্প; লাবণ্যর ঘরে বসিয়া গল্প করিতে নিখিলেশের এত ভাল লাগে!

লাবণ্য বলে—এত মদ খেতে কে শেখালে তোমায়?

নিখিলেশ কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিত। মদ খাওয়া আবার শিখিতে হয় না কি!

মদ খাওয়া তাহাদের বংশগত অভ্যাস—বংশানুক্রমিক প্রথা; সাতপুরুষ হইতে তাহাই চলিয়া আসিতেছে; ঠাকুর্দ্দা মদ খাইতে খাইতে লক্ষ টাকার নোট কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেন, বাবা মদ খাইয়া মা'কে সত্য সত্য হত্যা করিয়াছিল।

সকলের চূড়ান্ত করিয়াছে নিখিলেশ।

তাই নিখিলেশ বুদ্ধি করিয়া ভাল ছেলের মত শেষ পর্য্যন্ত বিবাহই করে নাই। কিন্তু মদ তা' বলিয়া তো আর সত্য সত্যই ছাড়া যায়না। মদ যে তাহাদের বংশানুক্রমিক নেশা।

কাল সকালেই নিখিলেশ লাবণ্যর কাছে পৌঁছিতে পারিবে। এই যে মাঝে মাঝে তাগাদার জন্য তাহাকে জমিদারীতে আসিতে হয় এ নিখিলেশের ভাল লাগেনা। নায়েব তেমন সুযোগ্য নয়—নহিলে কোন জমিদার বছরের মধ্যে দু'তিন বার করিয়া দেশে আসে? বছরের পর বছর টাকা আসিবে আর সহরে বসিয়া জমিদার আমোদ ফূর্ত্তি করিবে, এই তো সচরাচর রীতি, ঠাকুর্দ্দার আমল হইতে তাহাদের বংশে এই রীতিই চলিয়া আসিয়াছে এতদিন। কষ্ট করিয়া যদি নিজেকে তাগাদা দিয়াই টাকা আদায় হয় তো জমিদারীতে সুখ কোথায়? নিখিলেশের পরিবার নাই—আত্মীয় নাই—স্বজন নাই—তাহার ভাবনা কী? বয়স তাহার হইয়াছে—বিবাহ করিলে এতদিনে ছেলে-মেয়েতে ঘর ভরিয়া যাইত—কিন্তু সে ঝঞ্ঝাট যখন তাহার নাই, তখন কাহার তোয়াক্কা সে রাখে!

লাবণ্যর ঘরে বিছানার সামনে মস্ত বড় আয়নাতে নিখিলেশের চেহারাটা রোজই নজরে পড়ে। দশ বছর আগেও নজরে পড়িত এখনও পড়ে; কিন্তু এখন নজরের তফাৎ হইয়াছে অনেকটা। কপালের ওপর নিখিলেশের তিনটি স্পষ্ট তীক্ষ্ণ ভাঁজ পড়িয়াছে, মাংস একটু করিয়া ঝুলিয়া আসিতেছে, রোজই ধরা পড়ে: বয়স বাড়িতেছে! বয়স বাড়িতেছে! কিন্তু তাহাতে আক্ষেপ করিবার কী আছে?

প্রথমে আসিয়াছিল ললিতা, ললিতার পর আসিয়াছিল কামিনী—কামিনী গেল, আসিল মালতী, তারপর আসিয়াছিল সুলতা—তারপর কত মেয়ে মানুষ তাহার জীবনে আসিল গেল—চাঁপা, উমা, সরযূ—বন্যার মত—সকলকে আজ আর তাহার মনেও পড়ে না; শেষ ঠেকিয়াছে এই লাবণ্যতে।

মেয়েমানুষ নিখিলেশের কাছে পুরাণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু মোহ যায় নাই। আজও পথচারিণী দেখিলে নিখিলেশ তাহার ঘোমটার ভিতর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পাঠাইয়া দেয়। পূর্ব্ব-পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা তাহার রক্তে শিকড় গাড়িয়াছে, স্বেচ্ছাচারিতা তাহাদের বংশগত অভ্যাস, মদ তাহাদের জন্মগত নেশা—মেয়েমানুষ-প্রীতি তাহাদের মজ্জাগত প্রবৃত্তি।

বৃষ্টির তেজ বাড়িয়াছে; নিখিলেশের একবার শুধু মনে হইল: আজ পথে বাহির না হইলে ভাল হইত। কিন্তু, কী যে নেশা, লাবণ্য কাছে না থাকিলে তাহার যেন দিন কাটিতে চায়না।

আকাশের গায়ে চকমক করিয়া বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতেছে; রাস্তার উপর বড় বড় গাছ আড় হইয়া পড়িয়া

আছে। হঠাৎ পাল্কীটা যেন একক্ষাৎ হইয়া ভীষণ দুলিয়া উঠিল। দুলিয়া উঠিতেই কোনের দিকের দু'টি বোতল কাৎ হইয়া পড়িয়া গেল।

নিখিলেশ রীতিমত চমকিয়া উঠিয়াছে।...

ভিতর হইতে নিখিলেশ বলিল—গোবিন্দ—

হাত জোড় করিয়া গোবিন্দ দরজার-ফাঁকে আসিয়া দাঁড়াইল।

—পাল্কী এমন নড়ে কেন রে?

গোবিন্দ বিনীত স্বরে জানাইল—বিশে বেহারা পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

গলার স্বর কিছুমাত্র না নাবাইয়া নিখিলেশ বলিল—পা ভেঙে যায়নি তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ভেঙেছে—বসে' পড়েছে—

গোবিন্দ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল; নিখিলেশ তাড়া দিয়া বলিল—পা ভেঙেছে তো কৃতার্থ করেছে আমায়, ওসব শুনছিনে, রাত দশটায় গাড়ী আমার পাওয়া চাই—বুঝলি—বুঝলি তো?

গোবিন্দ ঘাড় নাড়িয়া বুঝিয়াছে বলিয়া চলিয়া গেল।

যে-কেহ পা-ই ভাঙুক, আর মরিয়াই যাক্—ঠাকুর্দ্দার আমল হইতে তাহাদের বংশের কেহ সে-সব কথায় কান পাতে নাই। পূর্ব্ব পুরুষের আমল হইতে তাহারা স্বেচ্ছাচারী; বনিয়াদী বংশ তাহাদের—মদ তাহাদের নেশা, মেয়েমানুষ তাহাদের ক্রীতদাসী—নিখিলেশ তাহাদেরই বংশধর—সুতরাং দশটার ট্রেন তাহার পাওয়া চাই-ই—পাওয়া-ই চাই।

উপরে গাছের ডাল পালায় আকাশ ঢাকা; নীচে অন্ধকার দিয়া পাল্কী চলিতেছে, এই বৃষ্টির মধ্যে নিখিলেশের আর একদিনের কথা মনে পড়িল:

নিখিলেশ তখন ছোট সেদিনও এমনি উপর্ব্বরণ বৃষ্টি;... ইচ্ছামতীর পাড় ভাঙিয়া নৌকা চলাচল বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে; পথ ঘাট ধ্বসিয়া গিয়াছে—কয়দিন ধরিয়া এই অবস্থা; যাহাদের ঘর বাড়ী অক্ষত অবস্থায় আছে তাহারা ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে; ধানক্ষেত ভাসিয়া গিয়াছে শস্য নষ্ট হইয়াছে, বসিয়া থাকা ছাড়া আর কিছু কাজ নাই; আর যাহাদের ঘর-বাড়ী ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহারা দাঁড়াইয়াছে গাছতলায়;—ঠিক এমনি দুর্য্যোগের কয়েকদিন আগে বাবার সঙ্গে তাহারা দেশে আসিয়াছে...হঠাৎ হুলস্থুল কাণ্ড!...

ওই দুর্য্যোগের মধ্যে সারা বাড়ীতে যেন কী সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। চাকরবাকর সকলেরই মুখ যেন গম্ভীর—একখানি কালো জলভরা মেঘ যেন সারা আকাশটি এখনি গ্রাস করিয়া ফেলিবে।

কিন্তু বিপদ আর কিছু নয়—মদ ফুরাইয়া গিয়াছে। বিপদ বলিয়া বিপদ—সেরা বিপদ; এমন বিপদের তুলনা হয়না। যাতায়াতের পথ বন্ধ নানা অসুবিধার দরুণ সময়মত মদ আনাইতে পারা যায় নাই। কিন্তু তা' বলিয়া এমন অপরাধের ক্ষমা নাই, তাহাদের বংশে কেহ কখনও কাহাকে ক্ষমা করে নাই—বনিয়াদি বংশ তাহাদের—তাহারা জন্মগত স্বেচ্ছাচারী—ক্ষমা কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা তাহারা জানে না।

শেষ পর্য্যন্ত সত্য সত্যই সে অপরাধের ক্ষমা হয় নাই। নিখিলেশের আজো মনে আছে সেই দিনের পর হইতে বুড়া সরকারকে আর দেখা যায় নাই। পরে শুনিয়াছিল কালি সর্দ্দারের খাঁড়ার ঘায়ে তাহার ধড় হইতে মুণ্ড পৃথক হইয়া গিয়াছিল!

সে সব অনেকদিনের কথা। সেই বংশের ছেলে নিখিলেশ, রক্ত দেখিয়া তাহারা ভয় পায় না, ঝড় বৃষ্টি দেখিয়া তাহারা পিছায় না, তাহারা যাহা করিবে ভাবে তাহাই করে—তাহারা জাত-স্বেচ্ছাচারী।

পাল্কী সমান তালে চলিতেছে। মাঠ-বন-বাদাড়। নিখিলেশ ফাঁক দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল। দূরের গাছপালা কিছু আর দেখা যায় না। রাত গভীর হইয়া উঠিয়াছে। রাস্তার দু'পাশের খাদের জলে প্রবল স্রোত। এক একবার বাতাসের ঝাপ্‌টা আসে, গাছপালা সব দুলাইয়া দিয়া যায়; সোঁ সোঁ শব্দে কান ঝালাপালা হইয়া আসে। পৃথিবী যেন মৃত্যুর সহিত শক্তি-পরীক্ষা চালাইয়াছে। মেঘে মেঘে ভীষণ শব্দ—বিদ্যুৎ চমকিবার সঙ্গে সঙ্গে পাল্কীর ভিতরটা আলো হইয়া উঠিতেছে।

খেয়াঘাটে নৌকা থাকিতে বলা হইয়াছে।…নৌকা থাকিবে বৈকি! নিশ্চয়ই থাকিবে। জমিদারের কথা অমান্য করিবার শাস্তির কথা এ অঞ্চলে সবাই জানে। খেয়া নৌকা নিশ্চয়ই থাকিবে—থাকিবে নিশ্চয়ই—সেজন্য বিশেষ ভাবনা তাহার নাই। নিমাই মাঝি নিখিলেশের বাবাকে চিনিত—এখন তাহাকেও চেনে; মাথা হারাইবার ইচ্ছা যদি না থাকে, তাহা হইলে বুড়া এতক্ষণ নৌকা লইয়া ঘাটেই বসিয়া আছে—এবং যতক্ষণ না নিখিলেশ ঘাটে গিয়া পৌঁছায় ততক্ষণ বসিয়া থাকিবে, নিখিলেশ বাজি রাখিয়া বলিতে পারে—সন্ধ্যা হইতেই সে ঘাটে বসিয়া বসিয়া ভিজিতেছে; বৃদ্ধ বয়সে বসিয়া বসিয়া ভেজা অবশ্য কষ্টকর—তা' হোক,—কাহাকেও কষ্ট দিতে তাহাদের বংশে কেহ কখনও পেছপাও হয় নাই, জমিদার হইয়া জন্মিয়াছে পরকে তাহারা কষ্ট দিবে—পরে তাহাদের জন্য কষ্ট করিবে; তাহারা আজন্ম স্বেচ্ছাচারী পরের কষ্ট লইয়া তাহাদের মাথা ঘামানোর অভ্যাস নাই!

অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিয়াছে…

নদীর ধার ধার দিয়া রাস্তা; এদিকের পাড় ভাঙিতে সুরু হইয়াছে; প্রবল বেগে জলের স্রোত বহিতেছে মনে হইল; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছপালা লইয়া ভীষণ শব্দে পাড়ের মাটি ধ্বসিয়া পড়ে; সঙ্গে সঙ্গে পায়ের নীচের মাটি ভূমিকম্পের মত থর থর করিয়া কাঁপিয়া ওঠে; জায়গায় জায়গায় পথ পর্য্যন্ত ভাঙিয়াছে;…এই অন্ধকারে যদি আর একবার বেহারাদের পা পিছলাইয়া যায়—তবে হয়ত একেবারে অতল সমাধি!

অতল সমাধি! কথাটা ভাবিতেই নিখিলেশের কেমন যেন অপরিসীম আনন্দ হইল। জলের তলায় মানুষ যখন ডুবিয়া যায়, তখন কেমন লাগে কে জানে! নিখিলেশের হঠাৎ একটা উদ্ভট খেয়াল হইল: আচ্ছা, যদি একটা লোককে যদি জোর করিয়া জলে ডুবাইয়া রাখা যায়—লোকটা যতক্ষণ হাত পা ছুড়িবে, চীৎকার করিতে চেষ্টা করিবে, ততক্ষণ তাহাকে ডুবাইয়া রাখিয়া তারপর মুমূর্ষু হইবার ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তে তুলিয়া আনিয়া বাঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেই ঠিক জানা যাইবে অতল সমাধি কাহাকে বলে! মৃত্যুর পূর্ব্বে কেমন করিয়া হৃদযন্ত্র ক্রমশঃ স্থির হইতে স্থিরতর হইয়া আসে—কেমন করিয়া অসহ্য যন্ত্রণা—বায়ুহীন বিপুল বারিরাশি তিলে তিলে মৃত্যু আনিয়া দেয়—সমস্ত খুঁটিনাটি।

অবশ্য এখনি এ খেয়াল নিখিলেশ চরিতার্থ করিবে না; কিন্তু ইচ্ছা করিলেই করিতে পারে; পারে তো! করিতে পারে এই মুহূর্ত্তে, এই দণ্ডে; একজনকে নয়—দু'জনকে নয়—যতজন বেহারা আছে ততজনকে!—সকলকে! তাহারা জাত-স্বেচ্ছাচারী! বহু পূর্ব্ব-পুরুষের আমল হইতে তাহারা অত্যাচারী—শুধু একটিবার মাত্র হুকুমের অপেক্ষা—নিখিলেশ মনে মনে পৈশাচিক হাসি হাসিয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে ঘাট আসিয়া গেল। প্রচণ্ড শব্দ করিয়া পাড় ভাঙিতেছে; নদীর জল ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

বেহারারা পাল্কী নাবাইয়া মাঝিকে ডাকিতে গেল।

কিন্তু এমন বিস্ময়ের কথা কেহ কখনও শোনে নাই!… মাঝি নাই—খেয়া নৌকাও নাই। ভয়ে বেহারাদের দেহ কাট হইয়া গেল।

কথাটা শুনিয়া নিখিলেশের স্বেচ্ছাচারী রক্ত গরম হইয়া উঠিল। বৃষ্টিতে ভিজিবার ভয়ে নৌকাটিকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়া ঘরে গিয়া শুইয়াছে—আরাম করিয়া ঘুমাইতেছে—! আচ্ছা, আরাম কেমন করিয়া করিতে হয় নিখিলেশ দেখাইবে।

আজ যাওয়া না-হয় না-ই হইল। আজ রাত্রিটা এখানে কোথাও থাকিয়া কাল সকালে নিমাইকে টাট্‌কা টাট্‌কা শাস্তি না দিলে আর চলিতেছে না। দেশে না আসাতে লোকের স্পর্দ্ধা অসীমে উঠিয়াছে।…এর একটা বিহিত করিতেই হইবে। নিখিলেশ দাঁতে দাঁত চাপিল।

বৃষ্টি আরো জোরে পড়িতে সুরু করিয়াছে। পাড় ভাঙিবার শব্দে কান পাতা দায়; রাত্রি খুব গভীর হইয়াছে। স্পর্শসহ অন্ধকার। দুর্নিবার দুর্য্যোগ পৃথিবীকে বিবশ করিয়া দিয়াছে; এই মানুষ-পরিত্যক্ত নির্জ্জন ভূমিতে কয়েকজন বেহারা কেবল সঙ্গী; আর কেহ নাই—আর কেহ নাই কোথাও। সারা পৃথিবীর মধ্যে পরম প্রবলপ্রতাপান্বিত

জমিদার বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী প্রলয়লীলার কেন্দ্রস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে...মাথার উপর বজ্রবর্ষী তমাচ্ছন্ন আকাশ —পায়ের তলায় প্রকম্পমান ভূমিতল !

নিখিলেশের মনে হইল : এক হুকুমে সকলকে স্তব্ধ করিয়া দেয়। আকাশ, ঝড়, বৃষ্টি, বুঝুক যাহাকে জব্দ করিতে এত চেষ্টা তাহাদের—সে আর কেহ নয়—স্বেচ্ছাচারী জমিদার যাহার পিতামহ মদ খাইয়া লক্ষ টাকার নোট ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন—যাহার পিতা নিজের স্ত্রীকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই—যাহাদের বংশে ভয় বলিয়া কেহ কিছু জানে না—মেয়েমানুষ যাহাদের ক্রীতদাসী—বংশ-পরম্পরায় যাহার স্বেচ্ছাচারী—

খেয়াঘাটের কাছাকাছি নিমাইয়ের ছোট ঘরখানি রহিয়াছে ; ছেলেমেয়ে তাহার কাছাকাছি কোন এক গ্রামে থাকে ; শুধু দিনের বেলা রোদ বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত এই ঘরটির সৃষ্টি... ; বেহারারা কুটীরের কাছে পাকী লইয়া গেল।

আস্তে আস্তে নিখিলেশ দরজা ঠেলিল—কাঠের ভাঙা দরজা—হুড়কোর বন্দোবস্ত নাই—একটু ঠেলিতেই দরজা খুলিয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতর আলো নাই ; তবু অস্পষ্ট দেখা যায় একখানি বিছানা পাতা ; ওখানে একটি মানুষ বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারে ; নিখিলেশ এখানেই রাত্রিটা থাকিতে পারিবে ; তারপর সকালে উঠিয়া নিখিলেশ যা' করিবে—তা' কাল সকলেই দেখিবে—সকলের সামনেই সে দেখাইবে !

নিখিলেশ জামা খুলিতে লাগিল।

শুইবার আগে নিখিলেশকে আর একবার কথা বলিতে হইল :

—ও গোবিন্দ, পাল্কীর ভেতর বোতল দু'টো আছে দিয়ে যা'—আর দেখ, তোরা যেখানে হোক রাতটা কাটিয়ে দিগে, রাত্তিরে আমি এখানেই থাকবো, কাল ঘুম ভাঙবার আগে আবার আসিস্—যা' এখন—

বাঁশের মাচার উপর পাতলা বিছানা। নিখিলেশের পূর্ব্বপুরুষের কেহ যাহা করে নাই নিখিলেশ আজ তাহাই করিল। ঘুম আসিতে দেরি হইবার কথা নয়, কিন্তু তবু দেরি হইতে লাগিল। অন্ধকার আকাশের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া থাকা ; পিঠে বিছানা যেন ফুটিতেছে ··

বাহিরে বিপুল গর্জ্জন ; এক একবার প্রচণ্ড শব্দ হইতেছে, আর ঘর বিছানা মাটি সব কাঁপিয়া উঠিতেছে। তা' কাঁপুক—নিখিলেশ ভাবিতেছে নিমাইএর কথা। স্পর্দ্ধার একটা সীমানা রাখিয়া লোকে চলে ! যাহাই হোক্ —বৃষ্টির প্রকোপ হইতে যে প্রাণ বাঁচাইবার জন্ত সে পলাইয়া গিয়াছে আজ, কাল তাহা সে কোথায় রাখিবে নিখিলেশ শুধু দু'চোখ দিয়া তাহাই দেখিবে। শুধু দেখিবে নয় ; গ্রামে-দেশে জমিদারীতে যত লোক সকলকেই দেখাইবে।

আজ রাত্রিটা শুধু কোনও রকমে কাটিলে হয় !

অন্ধকার—অন্ধকার—স্পষ্ট প্রত্যক্ষ অন্ধকার ! অন্ধকারের নীরব অট্টহাসি নিখিলেশকে যেন পাগল করিয়া তুলিল। অন্ধকার প্রেতমূর্ত্তি ধরিয়া তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এত অন্ধকার নিখিলেশ জীবনে আর দেখে নাই !

বাহিরে তেমনি গর্জ্জন—পৃথিবী কাঁপিতেছে—আকাশ দুলিতেছে ; নিখিলেশের মনে হইল—তা' হোক্, তবু ওইখানে প্রাণ আছে ! শুধু ভাঙিয়া চলা—শুধু ধ্বংস করা —নির্জ্জীবতা নয়, জড়তা নয়, প্রাণ ভরিয়া কেবল মৃত্যু-ক্ষুধা পরিতৃপ্তি করা ; এই অন্ধকার আবহাওয়ার মধ্যে যেন নিখিলেশের শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে।

আকাশ যেখানে উন্মুক্ত, বিধাতা যেখানে দিশিহীন, জীবন যেখানে সহস্রায়ু—মৃত্যুর আত্মীয়তা যেখানে নিবিড় নিখিলেশ সেখানে গিয়া তৃণখণ্ডটি হইয়াও বাঁচিতে চায়।—যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত্ত নূতন—প্রতিটি জিনিষ অনাস্বাদিতপূর্ব্ব — প্রতিটি ঘটনা অভূতপূর্ব্ব !

আজ হঠাৎ কী হইল কে বলিবে—তাহার মনে হইতেছে : এই অন্ধকার—এই ঘর, এই দেহ, এই সব কিছু অত্যন্ত পুরাতন হইয়া গিয়াছে—অত্যন্ত পুরাতন ! এত পুরাতন যে তাহা লইয়া তাহার জীবনধারণ চলে না। প্রতি মুহূর্ত্তের নিশ্বাস-গ্রহণে এই বাতাস বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে—প্রতি দিবসের পথ চলায় এই মাটি পঙ্কিল হইয়া পড়িয়াছে—প্রতি মানবের পাপে এই পৃথিবী কলঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে ! বর্ত্তমানে জীবনে অনিশ্চয়তা নাই, দৈনন্দিন জীবন-যাপনে

রহস্য-স্পর্শ নাই—সহস্রের প্রাত্যহিকতায় মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা নাই; কেবল বিধিবদ্ধ প্রণালীতে দেহ ভাসাইয়া চলা—শুধু নিয়মাধীন অভ্যাস মত নিশ্বাস গ্রহণ ও নিশ্বাস ত্যাগ!··

অন্ধকারের ভিতর কাহারা তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঘোমটা তুলিতেই দেখা গেল রূপসী নারীর দল—পরিচিত নারী-মুখের শ্রেণী।

প্রথমেই ললিতা, ললিতার পর কামিনী, আসিল মালতী, তারপর স্থলতা—তারপর বন্যার মত আসিল উমা চাঁপা সরযূর দল—সকলকে নিখিলেশ ভাল করিয়া চিনিতেও পারিল না—শেষকালে আসিল লাবণ্য।···

নিখিলেশ দুই চোখ বন্ধ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—চলিয়া যাও তোমরা—তোমাদের চাইনা আমি—তোমরা সব পুরাতন—তোমরা পুরাতন, আমরা পুরাতন—পৃথিবী পুরাতন, আকাশ, বাতাস সব পুরাতন—আমরা নূতন করিয়া বাঁচিতে চাই—আমরা নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিব—

তাহারা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

হঠাৎ নিখিলেশের একটা জিনিষের কথা মনে পড়িল। এতক্ষণ ভুলিয়াই গিয়াছিল বোতল দুটি পাশেই ছিল—তাহাদেরই একটা তুলিয়া লইয়া নিখিলেশ নিজের মুখের উপর উপুড় করিয়া দিল; তারপর চাদর দিয়া আগাগোড়া শরীর ঢাকা দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

নিবিড় শান্তি নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দ—এবার যতই অন্ধকার আসুক—আর ভয় নাই। এবার সে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারিবে-সে ঘুম ভাঙিবে একেবারে কাল সকালে।

রাত্রি তখন কত ঠিক নাই—

ধীরে ধীরে গোধূলির অস্পষ্ট আবির্ভাবের মত নিখিলেশ জাগিয়া উঠিল। তাহার হাত নড়িল না, পা নড়িল না—চোখের দুটি পাতা কেবল যেন অস্পষ্ট সন্দেহে একটু দুলিয়া উঠিল মাত্র। দুলিয়া উঠিতেই নিখিলেশের মনে হইল: কে যেন তাহার ঘরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। অন্য সময় হইলে হয়ত সে চীৎকার করিয়া উঠিত—কিন্তু নেশার ঘোর তখনও ভাল করিয়া কাটে নাই! মিটিমিটি চোখ তুলিয়া সে শুধু অন্ধকারে ছায়ামূর্ত্তিটিকে দেখিতে লাগিল।

কিন্তু বিস্ময়ের উপর বিস্ময়!

নিখিলেশ বুঝিতে পারিয়াছে: যে ঘরে ঢুকিয়াছে, সে পুরুষ নয়। শুধু তাহাই নয়—ঘরে ঢুকিয়াই মেয়েটি একান্ত নিঃসঙ্কোচে তাহার বিছানার কাছে আসিয়াছে—

এবার নিখিলেশ সত্য সত্যই মেয়েটির সান্নিধ্যের তাপ সারাদেহে অনুভব করিল। মেয়েটি নিখিলেশের দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিতে লাগিল—বাবা—ও বাবা—

গাছে উঠিয়া একটি ডাল ধরিয়া নাড়া দিলে যেমন সব কয়টি ফল ঝর ঝর করিয়া পড়িয়া যায়, নিখিলেশের মনে হইল: মেয়েটির ডাকে যেন তাহার অস্থি, মাংস, রক্ত, মেদ, মজ্জা যাহা কিছু দেহের পদার্থ সব যেন এক সঙ্গে শিথিল হইয়া গেছে; সমস্ত অবশ; মৃত, জড়বৎ একখানি দেহ লইয়া নিখিলেশ সেইখানে, সেই মাচার উপর চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

মেয়েটি আবার ডাকিল—ও বাবা ওঠ—শুনছো—ঘরে চল—

মেয়েটির দৈহিক সম্পূর্ণতা নিখিলেশের দৃষ্টিকে লজ্জা দিতে লাগিল। এত কাছাকাছি—এত আত্মীয়তা—ভিজা কাপড়ের গন্ধ আসিতেছে—

স্পর্শাতুর দুটিবাহু দিয়া নিখিলেশ উহাকে এখনি, এই মুহূর্ত্তে কলঙ্কিত করিয়া দিতে পারে—নিষ্পেষিত করিয়া দিতে পারে—পারে তো?—যেমন করিয়াছে আরো কত অসংখ্য বার—

মেয়েটি এবার তাহাকে স্পর্শ করিয়া ঠেলিতেছে; কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল—ও বাবা ওঠ—এই দেখ আমি শৈলী, ওঠ—শুনছো—ও বাবা—ঘরে চল না—

মেয়েটির বয়স হইয়াছে; এত বয়স হইয়াছে যে এ বয়সে এই রাত্রে অন্য পুরুষের সঙ্গে একঘরে কাটাইলে বদনাম কিনিতে হয়। হাত নাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কাচের চুড়িগুলি বাজিতেছে; তা' বাজুক, কিন্তু এমন একটি অভাবনীয় ঘটনা নিখিলেশ সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া উপভোগ করিতে লাগিল।···এমন ঘটনা সচরাচর ঘটে না; মেয়েটিকে সে

জন্মে দেখে নাই—আজন্ম অপরিচিতা—শৈলী তাহার নাম—এই দুর্য্যোগের রাত্রে পাশের কোন গ্রাম হইতে ভিজিতে ভিজিতে তাহার বাবাকে ঘরে লইয়া যাইতে আসিয়াছে।

যুবতী মেয়েটি···অন্ধকার নির্জ্জন ঘর···গ্রামের প্রান্ত সীমা···একটি অতি ক্ষুদ্র ঘরে কেবল সে আর, তাহারই একান্ত কাছে ওই যুবতী মেয়েটি। যুবতী মেয়েটি তাহাকে স্পর্শ করিয়া আছে; নিটোল দু'টি হাতের নিকট স্পর্শ; এত নিকট স্পর্শ যে মাদকতা আসাই স্বাভাবিক অন্ততঃ অন্য সময় হইলে তাহাই হইত—কিন্তু আজন্ম স্বেচ্ছাচারী নিখিলেশের আজ এ কী হইল···তাহার অন্তরের অশান্ত কামনাটি আজ ওই বহিঃপ্রকৃতির অশ্রান্ত গর্জ্জন—নদীর উন্মাদ কলকল্লোল, অন্ধকারের বীভৎস বিরূপতায় অপরূপভাবে ভাষান্তরিত না হইয়া, একান্ত বাধ্য শিশুটির মত ধমক খাইয়াই কখন যেন কোথায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; দুর্দ্ধর্ষ সাপ যেন মন্ত্রে অবশ হইয়া মাথা নিচু করিয়া পড়িয়া আছে।

নিখিলেশ দুইবাহু দিয়া এখনি সমস্ত ব্যবধান ঘুচাইতে পারে··কিন্তু কি জানি কেন তাহার আবার মনে হইতেছে—এ-পৃথিবীর সবটাই যেন এখনও পুরাতন হইয়া যায় নাই এখনো কিছু বাকী আছে; এখনও অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটে; এখনও অনাস্বাদিতপূর্ব্ব জিনিষের অস্তিত্ব আছে; প্রতি মানুষের নিশ্বাস গ্রহণে বাতাস এখনও সব বিষাক্ত হয় নাই, প্রতি দিবসের পথ-চলায় সমস্ত মাটি এখনও পঙ্কিল হয় নাই; প্রতি মানবের পাপে এখনও সমস্ত পৃথিবী কলঙ্কিত হয় নাই; এই বর্ত্তমান জীবনেই অনিশ্চয়তা আছে, দৈনন্দিন জীবন-যাপনে রহস্য আছে, সহস্রের প্রাত্যহিকতায় মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা আছে; কেবল বিধিবদ্ধ প্রণালীতে দেহ ভাসাইয়া চলা নয়···শুধু নিয়মাধীন অভ্যাসমত নিশ্বাস গ্রহণ ও নিশ্বাস ত্যাগ নয়···

অত কাছে পাইয়াও নিখিলেশ কিছুই করিল না। শুধু চুপ করিয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাস যেন বন্ধ হইয়াছে; নিখিলেশ আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছে এ তাহার কী হইল! সারাদেশ জয় করিয়া আসিয়া যেন নিজের দেশে আসিয়াই পরাজয়! তৎক্ষণাৎ তাহার মনে হইল: পরাজয় নয়—এ তাহার পরম লাভ। মানুষকে আজ নিখিলেশ শ্রদ্ধা করিতে পারে—নারী আজ তাহার কাছে পূজা পাইতে পারে; কোথাকার কে একটী মেয়ে আসিয়া তাহাকে এমন কী দিয়া বশীভূত করিল?···ললিতা কামিনী মালতীর দল তাহাকে যাহা দিতে পারে নাই—এ মেয়েটি কেমন করিয়া এমন অনায়াসে তাহা এক নিমেষে তাহাকে দিয়া ফেলিয়াছে; মেয়েটির কথাগুলি ভারি মিষ্টি; নিখিলেশ কান পাতিয়া আবার শুনিল—ও বাবা ঘরে চল—ওঠ—পাড় ভাঙ্‌ছে শুনতে পাচ্ছ না?···

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইতেছে—এতদিন যেন সে মৃত্যুর গহ্বরে সমাহিত ছিল। এখন আবার সে বাঁচিয়া উঠিতেছে; পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া সে আবার বাঁচিয়া উঠিতেছে; বাঁচিয়া উঠিয়া যাহা কিছু সে দেখিতেছে শুনিতেছে সব নূতন। প্রথম জন্মগ্রহণের মত নূতন! সমস্ত অত্যন্ত নূতন! এই নূতন পদে আজ যে তাহাকে অধিষ্ঠিত করিল তাহাকে অপমান করিবার স্পর্দ্ধা নিখিলেশের নাই! ·· বিগত-চেতন এক প্রাণীকে যে প্রাণ দিয়াছে, সে অবধ্য!

কিন্তু তবু নিখিলেশ ভাবিয়া পাইল না—এক পরম প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারীর আজ এ কী অনপনেয় কলঙ্ক!···অভাবনীয় অবনতি! শেষ বংশধর হইয়া আজ সে চির-প্রসিদ্ধ জমিদার বংশের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের মুখের উপর নিজের হাতে সে কী পঙ্কিল কালিমা লেপন করিতেছে! লজ্জায় নিখিলেশ মুখ লাল করিয়া ফেলিল—

কিন্তু লজ্জাই হোক আর যাহাই হোক—নিখিলেশ উহাকে অপমান করিতে পারিবে না। সে-ও যে সন্তানের পিতা হইতে পারে—সে-ও যে পিতৃত্ব হইতে নিজেকে এতদিন বঞ্চিত করিয়া কেবল নিজেকে ঠকাইয়াছে—এই পরম সত্য যে তাহাকে প্রথম জানাইয়াছে সে ওই মেয়েটি—ওই যুবতী মেয়েটি।

নিখিলেশের বড় ইচ্ছা হইল: মেয়েটিকে নিজের মেয়ের মত করিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়—আদর করিয়া দু'টি কথা বলে! আজ নিখিলেশের মেয়ে থাকিলে তো ঠিক অত বড়টি হইত—ওমনি করিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাহাকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতে আসিত—তখন আর নিখিলেশ এমন

করিয়া চোবের মত চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিতনা—ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া মেয়ের সঙ্গে ঘরে গিয়া শুইত—তিরস্কার করিয়া বলিত—দূর পাগলী মেয়ে, এই অন্ধকারে বৃষ্টিতে বুঝি ঘর থেকে বেরোতে আছে—একরত্তি ভয় নেই তোর ?

মেয়েটি এখনও জানিতে পারে নাই যাহাকে সে ঠেলিতেছে সে তাহার বাবা নয়—সে তাহাদেরই গ্রামের স্বেচ্ছাচারী জমিদার। যদি জানিতেই পারে তাহা হইলে এখনি হয়ত ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে ! নিখিলেশ যদি হাজার সান্ত্বনা দেয়—হাজার স্নেহ করিয়া কথা বলে—হাজার তাহাকে আপন মেয়ের মত আদর করিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়—তবু মেয়েটি হয়ত তাহাকে আর 'বাবা' বলিয়া ডাকিবে না। তাহার চেয়ে এই ভাল মেয়েটি প্রাণ ভরিয়া ডাকুক—আর সে চুপ করিয়া তাহাই শুনিবে ; নিতান্ত অনিশ্চিত একটি ঘটনায় যাহা সে লাভ করিয়াছে, নেহাৎ হেলা করিয়া তাহা সে হারাইবে না।

বাহিরে ততক্ষণ সমানতালে গর্জ্জন চলিতেছে ; অন্ধকার ঘরের মধ্যে শুইয়া নিখিলেশ ভুলিয়াই গিয়াছে যে, ধ্বংস-লীলার কেন্দ্রে বসিয়া সে মৃত্যুরই প্রতীক্ষা করিতেছে ! মাটি কাঁপিবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের জিনিষপত্র কট্ কট্ ঝন্ ঝন্ শব্দ করিয়া নড়িয়া উঠিতেছে—তা' দুলুক—নড়ুক—পৃথিবীতে প্রলয় হইয়া যাক্, নিখিলেশের অন্তরে আজ যে দ্বন্দ্ব, যে সমস্যা তাহা তুলনাহীন।

নিখিলেশের মনে হইতেছে : বহুযুগ পূর্ব্বে সে যেন গল্পের নায়কের মত একদিন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল ; সে কী ঘুম—কত দিন, মাস, বৎসর আসিয়াছে, গিয়াছে ; ঝড় বৃষ্টি দুর্ভিক্ষ, বন্যা, আসিল চলিয়া গেল, মহা ঘুম তাহার তবু ভাঙে নাই—যুগের পর যুগ—অন্তহীন দীর্ঘ নিশ্চেতনা তাহাকে অসাড় করিয়া রাখিয়াছিল ; আলোহীন গুহার ভিতর কীটাণুকীট জীবাণুদল তাহাকে ঘেরিয়া অহর্নিশ বীভৎস উৎসব জুড়িয়া দিয়াছিল ; তারপর বহুযুগ ধরিয়া মানুষের দল আসিয়া পৃথিবীকে কলঙ্কিত করিয়া—পঙ্কিল করিয়া দিয়া চলিয়া গেল ;—শেষে একদিন প্রভাত হইল—নূতনতম পৃথিবীর প্রথম সূর্য্যোদয়—প্রথম জাগরণের পূর্ব্বে কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে—ও বাবা—বাবা—ওঠো—ওঠো—

অত্যন্ত নূতন—অশ্রুতপূর্ব্ব স্বর !

নিখিলেশের চেতনা আসিতে দেরি নাই আর—নূতন জন্ম—নূতন সৃষ্টি—নূতন পৃথিবী, নিখিলেশ আজ আবার নূতন করিয়া দিগ্বিজয় যাত্রা সুরু করিবে। মানুষ তাহাদের দাসত্ব করিবে না—মানুষ হইবে বন্ধু—নারী তাহাদের ক্রীতদাসী নয়—নারী হইবে দেবী। এত বড় স্বেচ্ছাচারীকে যে-নারী মনুষ্যত্ব শিখাইয়াছে সে অসামান্যা। সন্ধ্যার অন্ধকারের পায়ের তলায় সূর্য্যাস্তের শেষ প্রণামটির মত নিখিলেশ মেয়েটির কাছে মাথা নত করিতেছে···

আজ নিখিলেশের একটি প্রখর সত্য মনে পড়িতেছে : তাহারও এতদিনে একটি সংসার হইতে পারিত—পরমা রূপসী একটি গৃহিণী ! ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনীর মধ্যে সে গড়িয়া তুলিত স্বর্গ ; সুপরিমিত সাধ তাহাদের—মনে তাহাদের পূর্ণিমার চাঁদের কল্পনা—চোখে নীল সমুদ্রের স্বপ্ন ; প্রাণে অশেষ-চলার উৎসাহ ; এমন একটি সংসার রচিবার অধিকার তাহার ছিল ··

সকাল বেলার তাজা ফুলের মত একটি ছেলে·· ফোগ্‌লা দাঁত বাহির করিয়া কত কী অবোধ্য কথা বলে, কোলে তুলিয়া চুমু খাইলে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ওঠে··· ঝাঁকড়া-চুল একটি মেয়ে, টানাটানা বাঁকা চোখ, সে-চোখের চাহনিতে চপল ঊর্ম্মির রহস্য—এতটুকু বকিলে বা রাগ দেখাইলে অভিমান করিয়া ঠোঁট্ ফুলাইয়া সে কী কান্নার ঘটা, কাঁদিলেই চোখ দিয়া মুক্তা ঝরিয়া পড়ে ; এমন একটি সংসার গড়িবার অধিকার তাহার ছিল। সে অধিকার আজ আর তাহার নাই—আজ তাহার বয়স বাড়িয়াছে !

বয়স যে বাড়িয়াছে তাহার প্রমাণ সে লাবণ্যর ঘরে আয়নাতে কতবারই তো পাইয়াছে ! তাহারও একটি ছেলে হইত—একটি মেয়ে হইত তাহারও—তাহারও সংসার গড়িবার অধিকার ছিল—ছিল তো ? ভাবিতে ভাবিতে কখন অজ্ঞাতসারে চোখ দিয়া তাহার টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িয়াছে—

মেয়েটি এবার বিছানার পাশ হইতে সরিয়া যাইতেছে; নিখিলেশের আশঙ্কা হইল—হয়ত ঘর ছাড়িয়া এইবার চলিয়া যাইবে। সরিয়া গিয়া মেয়েটি দরজা খুলিল; খুলিতেই জলো হাওয়া, ঝড়ের ঝাপ্‌টা আসিয়া মেয়েটির শাড়ী চুল বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল—কিন্তু সে মুহূর্ত্ত মাত্র—কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মেয়েটি তৎক্ষণাৎ বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে; মেয়েটির অস্পষ্ট মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়াছে···ঘরের বাতাস সেই বেদনায় যেন নিখিলেশের হইয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নিখিলেশের সমস্ত অন্তরাত্মা যেন শিথিল অবশ হইয়া গিয়াছে; তাহার মনে হইল: সে এখন ইচ্ছা করিলেই উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না, মাত্র জিহ্বা এবং ওষ্ঠের সঞ্চালনেই সে কথা বলিতে পারিবে না। হয়ত মেয়েটি এখনও বেশি দূরে চলিয়া যায় নাই—এখনো দৌড়িয়া গেলে ধরিয়া আনা যায়;··ধরিয়া আনিয়া নিখিলেশ তাহার সমস্ত বিগত বৎসরের কাহিনী শুনাইবে—তাহার স্বেচ্ছাচারিতার কথা—তাহার অপমৃত্যুর কথা—সমস্ত সমস্ত—কিছু বাদ দিবেনা সে...নূতন করিয়া আবার সে জন্মগ্রহণ করিবে···

কিন্তু কিছুই হইল না—নিখিলেশ না পারিল উঠিতে—না পারিল তাহাকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে; জীবনে আর কখনও হয়ত মেয়েটির সঙ্গে তাহার দেখা হইবে না; ··এই শেষ···কিন্তু যে-পথ দিয়া ও চলিয়া গেল—সে পথে তাহার আবির্ভাবের অম্লান পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে; একটি অভূতপূর্ব্ব ঘটনার আকস্মিকতা তাহার জীবনে অক্ষয় হইয়া বাঁচিয়া রহিল।

অনেকদিন আগের একটি ঘটনা নিখিলেশের মনে পড়িল:

নিখিলেশ তখন খুব ছোট; একদিন এমনি এক ঝড়ের ভিতর কেমন করিয়া হয়ত ভয় পাইয়া একটা বিচিত্র রঙিন্ পাখী তাহাদেরই একটা ঘরের মধ্যে আসিয়া ঢুকিয়াছিল।

রঙিন্ পাখী...লাল বুক, পাখা সবুজ রঙের, নিখিলেশ বায়না ধরিয়াছিল: পাখীটি তাহার চাই!

জমিদারের একমাত্র ছেলে, যাহা সে চাহিয়াছে তাহাই পাইয়াছে। নানা চেষ্টা হইল পাখী ধরিবার, কিন্তু আকাশ-বিহারী পাখী কেমন করিয়া কোন অদৃশ্য ফাঁক দিয়া উড়িয়া গেল—সে-পাখী তাহাদের খাজনা দেয় না—সে স্বাধীন, সূর্য্যের আলোর মত স্বাধীন—সে কাহারও হুকুম মানিয়া চলে না।···

তারপর নিখিলেশের সে কি কান্না—পাখীটি তাহার চাই-ই! সে-পাখীটি আর পাওয়া গেল না বটে—কিন্তু ঠিক সেই রকম দেখিয়া একটি পাখী কিনিয়া আনা হইল। নূতন দাঁড়—নূতন পাখী—পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু নিখিলেশের আবদার তবু থামে নাই। ঝড়ের দিনের সেই—কেবল সেই উড়িয়া-আসা পাখীটিই তাহার চাই।

তারপর একদিন রাগ করিয়া নিখিলেশ কেনা পাখীটির পায়ের শিকল খুলিয়া দিল—পাখীটি উড়িয়া গিয়া নিকটের একটা বাড়ির চালে গিয়া বসিল—তারপর ভাল করিয়া চারিদিক নজর করিয়া লইয়া উড়িতে উড়িতে দিগন্ত-সীমানায় লীন হইয়া গেল; ঝড়ের দিনের সেই—কেবল সেই উড়িয়া-আসা নির্দ্দিষ্ট পাখীটিই তাহার চাই।

আজও নিখিলেশের মনে হইল—এখন আর কেহ আসিলে তাহার চলিবে না; ললিতা নয়, কামিনী নয়, মালতী নয়, কেহ নয়; কেবল ওই মেয়েটিই তাহার চাই, 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া যে তাহাকে ডাকিয়া সাড়া না পাইয়া এই এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে অদৃশ্য হইয়া গেল।

নিখিলেশের চোখে ঘুম নাই; আজ রাত্রের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত যেন তাহার চোখের সম্মুখে ঊর্দ্ধে সঙীন খাড়া করিয়া চলিয়া যাইতেছে প্রত্যেকটি স্পষ্ট—প্রত্যেকটি পৃথক!... এমন করিয়া সে আর কখনও উৎকণ্ঠিত চিত্তে মুহূর্ত্ত যাপন করে নাই—দিন-যাপনের চেয়ে মুহূর্ত্ত যাপন যেন আজ তাহার কাছে দীর্ঘতর বলিয়া মনে হইতেছে! এক দীর্ঘমুহূর্ত্ত জীবনে সচরাচর আসে না। সারা রাত্রির মধ্যে নিখিলেশের চোখে ঘুম আসিবে না; তাহার ঘুম, তাহার শান্তি তাহার সব কিছু মেয়েটির সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে!···

কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল···

হঠাৎ একবার কিসের শব্দ হইল। দরজা ঠেলিয়া কে আবার যেন ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। নিখিলেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইল—এবার সেই মেয়েটি আবার আসিয়াছে—সেই মেয়েটিই, এবার আর অন্ধকারে নয়, আঁচলের আড়ালে আনিয়াছে প্রদীপ।

প্রদীপের আলোয় নিখিলেশ স্পষ্ট দেখিল মেয়েটির মুখ—বৃষ্টিতে ভেজা একখানি মুখ—অন্ধকারে যেমন মুখের সে কল্পনা করিয়াছিল, ঠিক তেমনটি—কোনও তফাৎ নাই!

মেয়েটি বিছানার কাছে আসিতেছে···

আসিতেছে···

আসিয়া পড়িল...

সত্য সত্যই আর শুইয়া থাকা চলেনা; এখনি ধরা পড়িতে হইবে।

মেয়েটি নিকটে আসিতেই নিখিলেশ গায়ের চাদর খুলিয়া এক পলকে মেয়েটির সামনে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে···ওধারে

একটি মেয়ে আর, এধারে নিখিলেশ—মাঝখানে অল্পায়ু স্তিমিত একটি মাটির প্রদীপ···

অন্ধকার আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে একটি মাত্র শুকতারা···

এক সঙ্গে যেন পৃথিবীর সমস্ত কলরব স্তব্ধ হইয়া গেল—একটি অনুচ্চারিত সঙ্কেতে যেন আকাশের সব কয়টি তারা দপ্ করিয়া নিভিয়া গেল; একটি অদৃশ্য ইঙ্গিতে যেন মুহূর্তগুলি সব অচল হইয়া স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া গিয়াছে!

পলকে কী যে হইয়া গেল, হয়ত মেয়েটি ভয় পাইয়াছে—থর থর করিয়া দেহ কাঁপিয়া উঠিয়াছে—পা কাঁপিয়াছে—বুক কাঁপিয়াছে—হাত কাঁপিয়াছে—কাঁপিবার সঙ্গে সঙ্গে একটি নীরব অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া প্রদীপটি হাত হইতে তাহার পড়িয়া গেল;—পড়িয়া গিয়া শিখাটি বার কয়েক দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল তারপর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া নিভিয়া গেল।

কিন্তু নিখিলেশ ভাবিতেছে প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে ভালই হইয়াছে! ও নিভিয়া যাক্—অন্ধকারে এত স্পষ্ট করিয়া আর সে নিজেকে কখনও দেখে নাই! এত স্পষ্ট—নিস্তরঙ্গ দীঘীর জলে যেন তা'র প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে!

পৃথিবীর কাছে যদি এতদিন কিছু সে করিয়া থাকে—তবে সে করিয়াছে কেবল অপরাধ! জীবনকে স্নেহ করে নাই—মানুষকে ভালবাসে নাই—অন্তরাত্মাকে তৃপ্তি দেয় নাই—বাতাসে ফুঁ দিয়া কেবল সাবানের ফানুস তৈরি করিয়া উড়াইয়া সময় নষ্ট করিয়াছে! মুহূর্ত্ত, দিন, মাস, বৎসর সব যেন তাহার অপব্যয়—জীবনটাই তাহার একটি বিরাট অমিতব্যয়িতা! অপরিমিত খেয়াল-খেলায় তাহার গত-জীবন শুধু সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একটি দীর্ঘতম দিনের পূর্ণচ্ছেদ! আজ আবার সে নূতন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল; নূতন তাহার দৃষ্টি ফুটিয়াছে··· নূতন করিয়া হাঁটিতে শিখিবে··· নূতন করিয়া কথা ফুটিবে···

মাঝখানে প্রদীপটি নিভিয়া গিয়াছে; ওধারে বিগত-বুদ্ধি মেয়েটি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া···আর এপাশে পাষাণ মূর্ত্তির মত পলকহারা চোখে নিখিলেশ ভাবিতেছে—প্রদীপ নিভিয়া গেছে—নিভুক না—নিভুক না—

ঠিক এই সময় অত্যন্ত কাছাকাছি একটা প্রচণ্ড শব্দ হইল; সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরের মাটি চলমান বাষ্পযানের মত দুলিয়া উঠিয়াছে, ঘরের স্থির জড় জিনিষগুলি স্থানান্তরিত হইয়া গেল—আসন্ন বিপদের ইঙ্গিতে নিখিলেশ দুইবাহু বাড়াইয়া মেয়েটিকে ধরিতে গেল, কিন্তু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া গেল। মাটি আরো জোরে দুলিয়াছে—সেই দোলায়মান মাটি হঠাৎ ঘর-বাড়ী সমস্ত লইয়া নদীর গর্ভে গিয়া পড়িল—আর সঙ্গে সঙ্গে পড়িল নিখিলেশ—আর পড়িল একটি মেয়ে!···

তারপরে বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে; ইচ্ছামতীর এখন সে তেজ নাই। লাজুক ভীরু বালিকার মত লজ্জা-মন্থর তাহার গতি-প্রবাহ! পাশেই একটা মস্ত রেলের পুল উঠিয়াছে; লোকে এখন খেয়াঘাটটিকে 'পুলের ঘাট' বলে; এখন তাহার চারিদিকে শান্ত-সমাহিত নিবিড় প্রশান্তি। এখন আর সে ঘাট খেয়া নৌকায় পার হইতে হয়না। পুলের একপাশে রেলিং দেওয়া একটি পায়ে-চলা পথ রেল কোম্পানী গড়িয়া দিয়াছে। তবু এখনও নদীপথে বড় বড় নৌকা যাতায়াত করে; জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে এ অঞ্চলের আম কাঁঠাল নৌকা করিয়া সহরে চালান্ যায়; পাটের বড় বড় বোট্ দাঁড় ফেলিয়া চলে, লগি ঠেলিয়া ডোঙা যায়, গুণ টানিতে টানিতে কতদূর দেশ দেশান্তরের বেপারীদের নৌকা যায়—

যদি কখনও এ অঞ্চলের কেহ ওই পথ দিয়া যায়—আর যদি এমন হয়—ডিঙার ভিতর শুইয়া মাঝ রাত্রে তাহাদের ঘুম ভাঙিয়া যায়—আকাশভরা অন্ধকার—নিস্তরঙ্গ নদীর জলে আচমকা কুল কুল শব্দ করিয়া ওঠে—ছোট বাতায়নে অদূরের বাঁশঝাড় আর ধানক্ষেতের বাতাস আসিয়া সব ওলট্ পালোট্ করিয়া দেয়—স্মৃতি, বিস্মৃতি, লাভ, ক্ষতি, সব যদি তাহাদের একাকার হইয়া যায়—নরম বালিশের ওপর দুটি চোখের পাতা অকারণে ভারি হইয়া ওঠে—আর সেই নিশীথ রাত্রে নির্নিমীক্ষ অন্ধকারে দূরে—অনেক দূরে বাঁশঝাড়ের ছোট একটি ফাঁক দিয়া একটি ছোট তারা উঁকি মারিতে থাকে—উঁকি মারিয়া দুষ্টু মেয়ের মত 'আয়' 'আয়' বলিয়া তাহাদের ডাকে—অথবা তাহাদের মাথার উপর দিয়া যদি একটি অদৃশ্য অশরীরী পাখী কুক্ কুক্ করিয়া ডাকিতে ডাকিতে দিগন্ত সীমায় মিলাইয়া যায়, তখন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে, তাহারা মনে করে: ও আর কিছু নয়—ওই তারাটি, ওই পাখীটি, ওই অন্ধকার—ওই আকাশ, বাতাস, ওই প্রত্যক্ষ বাস্তবতার পিছনে একটি পরম রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে···বহুদিন আগের ভুলিয়া যাওয়া রহস্য... এক ঝড়ের রাত্রি ও একটি পাখীর রহস্য···

সমাপ্ত

শ্রীবিমল মিত্র

# মানুষ ও পশু

শ্রীসুশীলকুমার দেব

বাঙ্‌লা ভাষায় পশু, জন্তু বা জানোয়ার কোনো শব্দই রেস্‌পেক্টেবল্ নয়। "পশু কোথাকার!"—এ হলো গালাগাল। "জানোয়ার" যখন বলি তখন কোনো জীবকে সম্মান কবি না। রাক্ষস এবং বানবেরা রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের ও কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে যেমন তাদের কীর্ত্তিকলাপের জন্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে—যদিও কোনো কোনো ঐতিহাসিকের কাছে নেহাৎ অন্ত্যজ মানুষ (!) বলেই তারা গ্রাহ্য শুধু, এর বেশী নয়—তেমনি "জন্তু" শব্দটা যদিও ব্যাপকার্থে সৃষ্ট জীব মাত্রেরই নাম হিসেবে কখন্-সখন্ ধরে নেওয়া যায় এবং সংস্কৃত ভাষায় মানুষ অর্থেও মধ্যে মধ্যে ব্যবহৃত হয়, তবু সঙ্কীর্ণ অর্থে অর্থাৎ পশু-অর্থে শব্দটিব সম্মান-হানি ঘট্‌বেই। এব কাবণ বোধ করি এই যে, সংস্কাব-প্রভাবিত ভারতীয় চিত্তে পশু-কুলের প্রতি সম্মান-নিবেদনের পক্ষে কোনো শাস্ত্র-বচন নেই।

এখানে একটা আপত্তি তোলার অবকাশ আছে। আপত্তিকারী বোল্‌বেন—কেন, আমরা কি গোরুকে তেত্রিশ কোন দেব-দেবীর আধার-ভূতা বলে পূজো করি না?—সম্মান তো ছাই। আমবা কি অশ্বমেধ হেন সুবৃহৎ যজ্ঞে ঘোড়ার অসাধারণ সেবা-পূজো করিনি এককালে? আমরা কি পূজো-পার্ব্বণে ছাগ-মেষ-মহিষ-পারাবতাদি পশুর বলির ব্যবস্থা করে তাদের আধ্যাত্মিক মুক্তির বিধান করিনি?…

…থামো, থামো পণ্ডিত! বিলক্ষণ হয়েছে। পূজো করেছো, একশোবার হাজার বাব কবেছো। কে বলে যে করোনি? তবে কি জানো?—সম্মান করোনি। দেবতাকে যেমন পূজো দিয়ে-দিয়ে তাঁকে আমাদের সমস্ত আধিভৌতিক সহজ কার্য্যকলাপ থেকে ডিস্‌মিস্ করেছো, বেচারা দেবতা শেষে ঠাকুরঘরে মন্দিরের কোণে আশ্রয় পেয়েছে, এও তেমনি। স্বর্গের দেবতাকে হাতের কাছে পাওনি এই যা রক্ষা; তা না হলে পূজোর-চোটে দেবতা-মেধ যজ্ঞ কর্‌তে তোমরা মহা-দেবতার পূজো চালাতে।

সত্যি নয় কি? ধর গৃহ-পালিত পশুব কথা। এই বাঙ্গালীর গোরু: ঘাস-খড়-খইল খেতে দিতে পাবো—ভালো; না পারো ক্ষতি নেই। কিন্তু দু'বেলা ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে গোরুব মঙ্গলারতি ও সন্ধ্যারতিটি কর্‌তে যেন ভুল না হয়। ফল কি হয়েছে?—ভারতের গোরু পৃথিবীর মধ্যে গোরুর দলে হীনতম দীনতম।

টোয়েন্‌টিয়েথ্ সেঞ্চুরীতে ধূপ-ধূনোর বদলে বুদ্ধির পূজো চালাও। গোরুর পূজো করা হবে তখনই যখন গোরুর ভালো প্রজনন কর্‌তে শিখ্‌ব। সৌজাত্য বিদ্যা গো-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর্‌লে গো-মাতার সত্যিকার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হবে। তখন হবে আসল পূজো। না-না, পূজো নয়—সম্মান। 'পূজো' শব্দটি সেকেলে, তার সঙ্গে ঐ ধূপ-দীপ প্রভৃতি অনেকানেক কুসংস্কার জড়িয়ে আছে। সুতরাং মডার্ণ্ শব্দ ব্যবহার করো—সম্মান।

একটি দৃষ্টান্ত নাও—কুকুর। সংস্কৃত প্রবচনে আছে: শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা স কিং নাশ্নাত্যুপানহম্—মানে, রাজা করে দিলেও কুকুর কুকুব, যেই সেই। অখাদ্যটি খাবেই। সত্যিই তো বাঙ্‌লা দেশে ক'টা বাঙালী কুকুব অখাদ্য না খায়?

আচ্ছা, বাঙালী কুকুর কোন্ জাতি, কি গোত্র তার? কোন্ বাঙালী না উত্তর দেবেন—কুকুরের আবার জাতি গোত্র! এই তো সম্মানের নমুনা।

অথচ কুকুরের ইতিহাস মস্ত ইতিহাস। ভারতবর্ষ থেকেই একদিন কুকুব য়ুরোপে চালান হয়ে কুকুর বংশে এক নতুন বংশের সৃষ্টি করেছিল। ভারতবর্ষের নেক্‌ড়ে বাঘের বংশে একদা শেয়ালের সঙ্গে সংমিশ্রণে কুকুরের জন্ম হয়। তারপর সেই প্রাচীন প্রস্তর-যুগে ভারতীয় যাযাবরেরা সুইজারল্যাণ্ডের হ্রদের তীরে গিয়ে বসবাস সুরু করলে—সঙ্গে তাদের এই কুকুব। য়ুরোপীয় নেক্‌ড়ের বংশজ কুকুরের সঙ্গে হলো এই ভারতীয় কুকুরের মিশ্রণ। এর ফলে কতো নতুন কুকুর গোত্রের সৃষ্টি হয়েছে। 'সৃষ্টি হয়েছে' বল্লে ইতিবৃত্তে ভ্রান্তি ঘটে: সৃষ্টি করা হয়েছে—ইচ্ছা করে সখ করে, বিদ্যা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে। এই প্রজনিত গোত্রদের মধ্যে এক নেক্‌ড়ে গোত্র-ভুক্ত যে-সব বিভিন্ন-জাতি কুকুরেরা আছে তাদের মধ্যে কোথায় বা এস্‌কিমো কুকুর আর কোথায় বা আমাদের ভারতীয় তথা বঙ্গীয় হতচ্ছাড়া গৃহহীন স্বামিহীন কুকুরেরা। এস্‌কিমো কুকুর হাইট্ বয়েল্ ষ্টাইল-এ বরফের ওপর দিয়ে স্লেজ-গাড়ী টেনে

নিয়ে যাচ্ছে। গলাবন্ধ পেটিতে ঘণ্টা বাঁধা—শব্দ হচ্ছে টুং-টাং-টুং। আর সম-গোত্রীয় বঙ্গীয় কুকুরটী জিভ্ বের করে অনাহারে-অর্দ্ধাহারে অস্থানে-কুস্থানে খ্যাক্-খ্যাক্ করে বেড়াচ্ছেন: সাধে তার নাম হয়েছে "দেশী কুত্তা"। জগতের কুকুর-জাতির মধ্যে এরা অচ্ছুৎ—পতিতা।

ভারতবর্ষের কাছেই তো জাপান। কুকুর কতোখানি সম্মানের আসনে উঠেছে সেখানে। জাপানী স্পেনিয়েল্—ছোট ছোট কুকুর, কোনো কাজেই লাগেনা। ব্লাড্-হাউণ্ডের মতো মানুষ-চোর শীকার করেনা বটে কিন্তু দেখ্তে ভারি চমৎকার—মানুষের সখের ও ভব্যতার একটি বিশেষ উপকরণ: জাপানী মেয়ে-মানুষের হাতের ছাতাগুলো যেমন কাজে লাগেনা কিন্তু নয়নাভিরাম, তেমনি। এই স্পেনিয়েল্ জাপানীদের সু-প্রজননের দ্বারা বেড়ে উঠেছে।

সুজাত কুকুর ও সুজাতা কুকুরী যে য়ুরোপে ও আমেরিকায় পথে পথে অখাদ্য খেয়ে বেড়ায় না, সেটা হচ্ছে তাদের কাউন্টি কাউন্সিল্ মিউনিসিপালিটি বা কর্পোরেশনের আইনের জোরে। কুকুর পথে পথে খামোখা বেড়িয়ে বেড়াবার জন্যে নয়। তাও যদি আমাদের "দেশী কুত্তা" বৈরাগী হয়ে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে শেষাশেষি ঝোড়-জঙ্গলে পাহাড়-পর্ব্বতে গিয়ে আশ্রয় নিত: তাহলে অন্ততআমরা তলোয়ার-বন্দুক-হীন আইন-উদাসী বাঙালীরা দুর্গন্ধ, ছোঁয়াচে রোগ, কুদৃশ্য প্রভৃতির দুর্ভোগ থেকে রেহাই পেয়ে যেতুম।

কুকুর হচ্ছে রীতিমতো পালিত জন্তু। যেমন ঘরে তেমন বাইরেও—মোটরকারে ট্রেনে জাহাজে পয়দল ভ্রমণে কুকুর তার স্বামি-স্বামিনীর আন্তরে সঙ্গী। বিদেশী কুকুরেরা আজ এরোপ্লেন্ অবধি চড়ে বেড়াচ্ছে; আর তাদের ভারতীয় দোসর অসভ্যের মতো কান মুষড়ে লেজ গুটিয়ে খালি খ্যাক্ খ্যাক্ করছে। আমাদের কুকুরদের এমনি কপাল যে, এই ঘৃণ্য জীবনের ওপর আবার মাথায় পড়ে তাঁদের মেথরের মুগুর, মরীয়া হয়ে আসে তাদের জন্যে যতো ভীষণ মড়ক। তবু যদি দু'একজন বাঙালী-টুর্গেনিভ্ এদের মৌন বেদনাকে সাহিত্যে ব্যক্ত করে "নির্ব্বাক্ জীব"-দের প্রতি কর্ত্তব্যের ঋণ কিছুমাত্রও পরিশোধ কর্‌তেন!

তবু যাহোক, ঘোড়ার অদৃষ্ট ভালো। যুদ্ধ-বিগ্রহে কুচ্-কাওয়াজ করে ঘোড়া 'বড়োমানুষ' হয়ে গেছে। বিলুপ্ত ভারতীয় যুদ্ধ-প্রথার চতুরঙ্গক সেনার মধ্যে অশ্ব সর্ব্বাগ্রগণ্য না হলেও প্রধান। প্রতাপসিংহের চৈতক ইতিহাসের বাহন বিশেষ। পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে ঘোড়ায় করে নিয়ে পালিয়েছিলেন। অশ্বমেধের ঘোড়ার পিছু-পিছু খিদমদগারী করে অর্জ্জুন প্রাচীন কামরূপের নাগা-কন্যা উলুপীর ভার্য্যাত্বে বীতস্পৃহ হয়ে শেষে মণিপুরী সুন্দরী চিত্রাঙ্গদার পাণি-পীড়ন করলেন।

নব-প্রস্তর যুগে বন্য ঘোড়া প্রথম গৃহপালিত হলো। ঘোড়ার মাংস ও দুধ খাওয়ার রেওয়াজ তখন। (গত জার্ম্মান্ যুদ্ধে ঘোড়ার মাংসটা মধুর অভাবে গুড়ের মতন বেশ চলে গেছে।) তারপর ঘোড়া হলো ভারবাহী পশু—গর্দ্দভের সামিল। তারো পরে দেখা যায়, রথে তার যোজনা হলো। পুরাকালের মিশরে আসীরিয়ায় গ্রীসে রোমে এবং অস্মদ্দেশে অশ্ব হলেন রথাশ্ব। শকুন্তলা কাব্যই হতনা যদি দুষ্মন্তরাজা—পদ্মবনে ঐরাবতবৎ—কণ্ব মুনির তপোবনে অশ্ব-রথে গিয়ে উপস্থিত না হতেন।

ঘোড়ার মধ্যে বর্ণশ্রেষ্ঠ আরবী ঘোড়া—একেবারে বিশ্ব-বিশ্রুত। অথচ এই আরবী ঘোড়ার পূর্ব্ব-পুরুষেরা ছিল প্লিওসিন্ যুগের ভারতবর্ষের আবাসিক। আমাদের দেশী ঘোড়ার এখন দুর্দ্দিন হলোই বা!

ইংরেজেরা ঘোড়াকে তার শ্রেষ্ঠ বৃত্তি শিখিয়ে দিলেন—রেস্-এর দৌড়। এই দৌড়ের জন্যে ঘোড়ার বংশোন্নতির দরকার হয়ে পড়্‌ল। কারণ উন্নত ঘোড়ায় রেস্ খেলা হয় উত্তম। তাই প্রথম জেম্‌স্-এর রাজত্বকাল থেকে রাণীএন্-এর সময় অবধি আরবী বার্‌বী তুর্কী প্রভৃতি অভিজাত-বংশীয় ঘোড়া ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়ে ব্রিটনীয় ঘোড়ার সঙ্গে তাদের রক্ত-সম্বন্ধ পাতিয়ে দেওয়া হলো। ফলে ঘোড়ার হলো বংশ-সমৃদ্ধি। সঙ্গে সঙ্গে যেমন লর্ড্ ডার্বি একদিকে রেসের সুত্রপাত করলেন, তেমনি দেখ্‌তে দেখ্‌তে "আইরীস্ সুইপ্ ষ্টেক্" "কেলকাটা সুইপ্ ষ্টেক্" প্রভৃতি রেসের দৌড় ও দৌড়ের ওপর বাজি রাখা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নানাদেশে চল্‌তি হয়ে গেল। ১৯৩২ ইংরেজীতে ডার্বি রেসে প্রথম স্থান দখল করে টম্ অয়াল্‌স্ যখন তার নিজের ঘোড়া "এপ্রিল্ দি ফিফ্‌থ্"-এর কেরামতি প্রতিপন্ন কর্‌লেন তখন তাঁর গৌরব কতো! তিনি নিজেই বল্লেন যে, ইংলণ্ডের "সুখীতম ব্যক্তি" তিনি। বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল্ তাঁর Conquest of Happiness নামক ইদানীন্তন লিখিত পুস্তকে সুখ-বিজয়ের যে-যে পথ উল্লেখ করেছেন তাতে ঘোড়-দৌড়ের নাম করেননি—এ বড়ো আশ্চর্য্য কথা। যাক্, ঘোড়ার প্রতিপালক হিসাবে ও বহু রেসে নিজের ঘোড়াদের বাহাদুরী দেখিয়ে আগাখাঁ মহোদয় ইংলণ্ডে প্রভূত অর্থ, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেছেন।

অতঃপর মেষের কথা। পালিত পশুদের মধ্যে মেষের কদর অধুনা ভারতে তেমন না হলেও এককালে যে সাতিশয় ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। হিন্দু-স্থানের আর্য্যরা যখন পশ্চিমে সিন্ধু-সৌবীর থেকে আরম্ভ করে পূর্ব্বে লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) পর্য্যন্ত বসতি স্থাপন করেননি, অর্থাৎ বসবাসের সঙ্গে-সঙ্গে আর্য্যাবর্ত্তে চাষ-আবাদ করার আগে থেকে যখন তারা যাযাবর-বৃত্তি অবলম্বন করে মেষাদি পশু নিয়ে ঘুরে

বেড়াতেন, তখন উক্ত পশু তাদের একটি প্রধান আশ্রয় ছিল।

কিন্তু এশিয়া থেকেই মেষ প্রথম য়ুরোপে গেছে কিনা সে-বিষয়ে এখন নিশ্চিতরূপে কিছু বলা শক্ত। তবে য়ুরোপে এবং ভারতে যে মেষের চাষ একই উদ্দেশ্যে হয়নি তা তো সুস্পষ্ট দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। য়ুরোপে মেষের চাষ উলের জন্যে, আমাদের বোধ করি বলির দ্বারা আত্ম-তুষ্টি ও দেব-তুষ্টির জন্যে।

য়ুরোপে মেষ শব্দ উচ্চারণ করতেই বাইবেলের উল্লেখ মতো কেউ যীশুখৃষ্টের উপদেশ স্মরণ করে শান্তিপ্রিয় হবার কথা ভাবে না। প্রথমেই মনে পড়ে যায় 'উল'। এই উলের ব্যবসা করে য়ুরোপে ফ্লেমিংরা মধ্যযুগে সেরা বণিক বলে বিখ্যাত হয়েছিল। উলের ব্যবসায়ীর টাকার ওপর নির্ভর করে কোনো-কোনো মধ্যযুগের ইংরেজ নরপতি বৈদেশিক যুদ্ধের ব্যয়ভার নির্বাহ করতে পেরেছিলেন। শীত-প্রধান দেশে উলের চাষ বেশী হবে তাতে আশ্চর্য্য কি? য়ুরোপে মহিলাদের fur coat অত্যন্ত আদরের জিনিষ এবং নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী। এই fur-এর মধ্যে Astrakhan নামীয় যেটি আছে তার খুব দাম। তাই ফ্যাসন্-রাজ্যের নায়িকা-মহলে এর চাহিদা ও কাট্‌তি দেদার। এই furটি কিন্তু য়ুরোপীয় মেষ জোগাতে অক্ষম। এ হচ্ছে বোখারা ও পারস্যদেশীয় মেষের গাত্রাবরণী থেকে প্রস্তুত। পারস্যের বস্ত্র-শিল্পী অন্য প্রয়োজনে এই একই জিনিষ কাজে লাগালেন মহার্ঘ সুদৃশ্য কার্পেট তৈরী করতে। কার্পেট ঘরের দেয়ালে ঘরের মেঝেয় সাজিয়ে ঘরকে সুচারু করে তুললেন। এতে যেন মেষের নবজন্ম ঘটে গেল। পাশ্চাত্য দেশে যাকে নিয়ে চলে ব্যবসা প্রতীচ্যে তাকে নিয়েই শিল্প কলার প্রকর্ষ। সভ্যতার বিস্তারে মেষের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে রইল।

আমরা ভারতীয়রা পাঞ্জাব ও হিমালয় অঞ্চলে মেষ-যুদ্ধ অদ্যাবধি বজায় রেখেছি—স্পেনে যেমন আজও ষণ্ড-যুদ্ধ প্রচলিত আছে। দুটো মেষ পরস্পরের মাথায় এম্‌নি জোরে বেপরোয়া মর্জ্জি নিয়ে গুঁতোগুঁতি করতে পারে যে বলতে ইচ্ছে হয়: 'মেষবৎ দুর্ব্বল', 'মেষ হেন শান্ত' ইত্যাদি কথাগুলি মনুষ্য-ভাষা থেকে স্রেফ্ বিসর্জ্জন দিয়ে ভাষার মিথ্যাবাদিতা অবিলম্বে ঘুচিয়ে দেওয়া উচিত।

তিব্বতে কোনো পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে শ্রাদ্ধোপলক্ষে মেষের মধ্যস্থতায় মৃত ব্যক্তির আত্মার আবির্ভাব কল্পনা করে "ডুডুং" নামে যে ধর্ম্ম-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাতে মেষকে মদ্যাদি নানা পানীয় ও আহার্য্য খাইয়ে স্বর্গত আত্মার শোকে কাঁদাকাটি করা একটি প্রথা। যে মেষ বিগত জনের সঙ্গে নবাগত জনের আত্মীয়ভাব যোগাযোগ বিধান করতে সমর্থ সে তো আমাদের প্রিয়—সে তো আমাদের আত্মীয়।

তারপর, মেষের লোম থেকে ভারতবর্ষ যা করতে পারেনি ছাগলেরলোম থেকে সেইটি পুরোপুরি পুষিয়ে নিয়েছে। কাশ্মিরী ছাগল একেবারে ডঙ্কামারা। কাশ্মিরী শাল বলে যে বস্তুটি বয়ন-শিল্পে বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠতা লাভ করেছে তা ছাগলের গায়ের অধঃলোম ( Under fur ) থেকে তৈরী। এই শাল বিদেশে রপ্তানি করে কত লোক লক্ষপতি কোটিপতি হয়েছে; আবার কত রাণী-মহারাণী রাজা-রাজড়া এই শাল গায়ে দিয়ে প্রসাধনে একেবারে বাজিগুরী হিট্ দিয়েছেন ভেবে আনন্দ-রসে টইটুম্বুর হয়েছেন—তার সংখ্যা কে রাখে!

ছাগল ধরাধামে এম্‌নিতরো কীর্ত্তি রাখ্‌বে বৈকি। বিম্বিসার রাজার বলি-প্রাঙ্গণে যেদিন স্বয়ং বুদ্ধদেব ছাগ-শিশুর প্রাণ-বিনিময়ে নিজের অমূল্য জীবন যূপকাষ্ঠে বিসর্জ্জন দিতে অগ্রগামী হয়েছিলেন সেদিনই বোঝা গেছে ছাগল যে-কে-সে জীব নয়। কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি। তার কীর্ত্তি-কাহিনীর জন্যে 'পরশুরাম' আধুনিক কালে তাকে "লম্বকর্ণ" উপাধি দিয়ে বিভূষিত করেছেন। উপাধির অপেক্ষা না রেখেই কিন্তু ছাগল আজ সুপ্রসিদ্ধ। তৃতীয় রাউণ্ড্ টেব্‌ল্ কন্‌ফারেন্স্ উপলক্ষে ইংলণ্ডে থাকার সময় যে ছাগী মহাত্মা গান্ধীর দুধ জোগাত—মহাত্মাজীর সঙ্গে একদিন সাক্ষাতের অবকাশে সে ছায়া-চিত্রের ফিল্মে অবলীলাক্রমে তার স্থান করে নিয়েছে। ফিল্মের ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় দিন।

কিন্তু হাতীর মতো কীর্ত্তি বুঝি ছাগলেরও নেই। 'হস্তি-মূর্খ' কথাটা শব্দের অপপ্রয়োগ। হাতীর গুণপনা আলোচনা করলে কথাটা যে নিতান্ত খেলো এই ধারণাই মনে প্রবল হতে থাকে। এককালে এদেশে যুদ্ধে জয় মানেই ছিল হাতীর সাহায্যে কিস্তি মাৎ করা। জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে যদি বর্ণ-বিভাগ করতে হয় তাহলে বোলব হাতী ক্ষত্রিয়—যোদ্ধা। আগেকার যুদ্ধ-কৌশলও এখন নেই, হাতীর সম্মানও লোপ পেতে বসেছে। তে হি নো দিবসা গতাঃ। আশ্চর্য্য হতে হয়, হাতী অন্যান্য অনেক শীর্ণকায় বন্যপশুর চাইতে অধিক দ্রুতগামী। গহন বনে তার বাস, নিয়ত যুদ্ধ-বিগ্রহ তার পেশা। মানুষ যে হাতীকে পোষ মানিয়েছে সে বড়ো সোজা কথা নয়। কথায় বলে 'হাতী পোষা!' পোষ মানানো যদিও সোজা কিন্তু হাতী বর্ম্মার জঙ্গল থেকে ধরে আনা অতীব কঠিন। 'হাতী-খেদা' করা বিস্তর বিপৎসঙ্কুল। কিন্তু বিপৎ যেখানে নেই বীরত্ব সেখানে প্রকট হতে পারে না। তাইতো

পশুশালায় হাতীকে বন্দী করে ক্ষত্রিয় রাজা গর্ব্বিত হন; হাতীকে তাঁর সিংহাসনের বাহন করে রাজা স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

অধুনা যে মাড়োয়ারী বাঙালীর ইকনমিক্‌স্‌কে একচেটে করে রেখেছে—জাপানী সওদাগররাও নেক্-টু-নেক্ প্রতিযোগিতা করে যাকে বঙ্গীয় বণিক-রাষ্ট্র থেকে গদিচ্যুত করতে পারছে না, সেই মাড়োয়ারীর টাকার সিন্দুকের অধিপতি হচ্ছেন গজানন। এই লক্ষ্মীমন্ত দেবতাটি মাড়োয়ারীর চোখে শুধু সম্পদের প্রতীক নন, সৌন্দর্য্যেরও প্রতীক বটেন—গৃহস্থের চোখে দুগ্ধবতী গাভী যেমন সুন্দর, বুভুক্ষুর কাছে যেমন পাকা বোম্বাই আম অতীব নয়ন মনোমুগ্ধকর।

তবে, কিবা ব্যবসায়ী কিবা শিল্পী সকলের চোখেই সুন্দর গজ-দন্ত। 'গজ-দন্ত-পীত' কথাটা নেহাৎ কবিত্বপূর্ণ। এ হেন রত্ন যে রমণীর ললনা-কুলে তিনি রত্ন-বিশেষা—রূপদক্ষেরা এরকমই বলে থাকেন। রত্ন-রাজির মধ্যে আবার গজ-মোতি। গজ-মোতির অবস্থান হাতির মস্তিষ্কেই হোক্ অথবা হাতীর দাঁতের গোড়াতেই হোক্ সর্ব্বত্রই এ-রত্ন মূল্যবান্—মহামূল্যবান্।

রূপদক্ষেরা বল্‌বেন, গৃহপালিত পশু পক্ষীর মধ্যে বিচার করলে কপোত-কপোতী এবং হংস-হংসীর মতো নয়নানন্দকর জীব আর নেই। এদেরকে নানাবিধ অলঙ্কারে সাজিয়ে চিত্রকরেরা প্রসাধন-সুখ লাভ করেন। (অবশ্য পশুদের মধ্যে দরশাবী হাতীও যে মণ্ডন-শিল্পের আশ্রয় স্বরূপ সেটাও মনে রাখা কর্ত্তব্য।) কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্—যাদের আকৃতি মধুর তাদের কীই-না ভূষণ হয়ে থাকে। কপোত-দম্পতি সুখে নীড় রচনা করে গার্হস্থ্য জীবনের দৃষ্টান্ত যেমনটি দেখায় তেমনটি নাকি দুর্লভ। এরা প্রেমের আদর্শ—য়ুরোপে যেমন ভাভ্ পাখী, আমাদের পুরাতন সাহিত্যে যেমন চখা ও চখী। তবে এরা যে শুধু দুর্ব্বল সৌন্দর্য্য ও কোমল ভাব-বিলাসের প্রতীক তা নয়। গত মহাযুদ্ধে কপোত-ব্যূহ সংবাদ-বহের কায়দা-কানুন অভ্যাস করে চাই-কি বেতার-বার্ত্তার কাজ কুলিয়ে দিয়েছে। সাহসিকা দূতী হওয়ার জন্যে হংসীরও অনুরূপ অল্প-বিস্তর সুখ্যাতি আছে—নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানে রাজহংসীর দৌত্য।

শুধু তাই নয়। পশু-প্রশস্তি যথাযথ করে গেছেন বৈজ্ঞানিক ডারুইন্। যেদিন তিনি তাঁর Descent of Man ও Origin of Species প্রকাশ করেন সেদিন আলোচিত সমগ্র জীব-বিদ্যার সম্মিলিত জ্ঞান একাগ্র হয়ে মানব-সমাজে প্রচার করলে যে, পশু ও মানুষ পূর্ব্ব ও উত্তর পুরুষ হিসেবে পৌর্ব্বাপর্য্য সম্পর্কে আত্মীয়। ফলে, মানবের আত্মা মনুষ বংশধরত্বের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তিলাভ করে সহসা হনু-রাজত্বের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করলে—সমগ্র পশুত্বের মধ্যে মানবাত্মা আপনাকে বিরাটরূপে অনুভব করে দ্বিজত্বে উপনীত হলো।

লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার এখানে একটা উল্লেখ করা যেতে পারে।

অগণ্য পশু নিয়ে পরীক্ষা করার ফলে ডারুইন অবশেষে তাঁর একদা অতি-প্রিয় "হ্যামলেট" নাটকের উপভোগেও বিরক্ত হয়ে পড়্‌লেন বলে কথিত হয়েছে। আবার অন্যদিকে মাইকেলেঞ্জেলো পশুকুলের মুখছবি পরীক্ষা করে করে এতোখানি উৎসাহিত হয়ে উঠ্‌লেন যে, মানুষের মুখ আঁক্‌বার সময় তিনি প্রথম অনুরূপ একটি পশুমুখ এঁকে তারপর সেই পশু-মুখের স্কেচ্ থেকে আসল মানুষের মুখটি ব্যক্ত করতে লাগ্‌লেন। তাঁর মত ছিল: মানুষের মুখগুলিকে বিশেষ বিশেষ পশু-মুখের ব্যঞ্জনাস্বরূপ মেনে নেওয়া উচিত। মানুষমুখ আঁক্‌বার আগে তিনি একবার এটা-ওটা-সেটা নানাধরণের পশুমুখের কোন্‌টার সঙ্গে সেটি তুলনীয় তাই দেখে নিতেন। ডারুইন্ তাঁর পশু-মানসিকতাকে জীব-বিদ্যার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কারের হেতু করে তুল্লেন; আর এঞ্জেলো তাঁর পশুমানসিকতাকে কলা-সরস্বতীর চিত্ত-বিনোদনে বিনিয়োগ করে জীব-বিজ্ঞানকে বিসর্জ্জন দিলেন। যাক্ সে কথা। মূল কথা হচ্ছে, একই পশুমানসিকতা ডারুইন্‌কে বৈজ্ঞানিক এবং এঞ্জেলোকে চিত্রকর ও ভাস্কর রূপে জগতে পরিচয় করিয়ে দিলে।

পশুর অবদান অপরিসীম। যেমন জীব-বিদ্যার ক্ষেত্রে তেমনি দেহতত্ত্বে: মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে হাত-পা-নাক-চোখ-কান-ফুসফুস-উদর প্রভৃতি দেহের সর্ব্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্ম্মণ্যতার যে কার্য্য-কারণ সম্পর্ক রয়েছে তা প্রতিপন্ন করতে ডাক্তার গল্ ব্যাঙ্ প্রভৃতি নানা জন্তুর 'পরে অস্ত্রোপচার করলেন—তবেই Phrenology নামে দেহ-বিজ্ঞানের একটী প্রধান শাখা সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। ফরাসী দেশে তথা য়ুরোপে monkey gland মানুষের শরীরে নিবিষ্ট করে জীবন দশ-পনেরো কুড়ি বছর বাড়িয়ে দেওয়া সহজ বলে স্বীকৃত হচ্ছে। এতে বানরের যে জীবনী শক্তির হ্রাস হচ্ছে তা নয়, জীবনহানিও ঘটছে। কত ভেক্, কত শশক, কত ইঁদুর, কত বানর, যে বৈজ্ঞানিক সত্যাবিষ্কারের হেতু হয়ে অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করেছে, করছে ও করবে তার সংখ্যা নির্দ্দেশ অসম্ভব।

মনোবিজ্ঞানে মনোবিৎ প্রমাণ করলেন: পশুরা কেবল যে সহজাত জ্ঞানের অধীন সে কথা মিথ্যা, মানুষের ন্যায় যুগপৎ বুদ্ধিও তাদের সচল। থর্ণডাইক্, লয়েড্ মর্‌গান্

প্রভৃতি জীবতত্ত্বজ্ঞ ও ম্যাক্‌ডুগাল্ প্রভৃতি মনোবিৎ-বৃন্দ এই সিদ্ধান্তে পৌছবার আগে অগণিত পশুর পরীক্ষণ ও গবেষণা দ্বারাই তাঁদের মন্তব্য স্থির করেছেন। আমেরিক ডক্টর অয়াটসন্ ইঁদুরের ব্যবহার পরিবীক্ষণপূর্ব্বক এই তত্ত্বে পৌছেছেন যে, আমবা যাকে "মন" বলে আখ্যা দিয়েছি, সেটা নাকি নিতান্তই ভুঁয়ো—তার কোনো অস্তিত্বই নেই। এত বড়ো একটা তথ্য বেচারা ইঁদুর কিছুই জান্‌তে পারলে না।

বিজ্ঞানের ন্যায় কাব্যেও জীব-জন্তু উপেক্ষিত নয়। বিদ্যাপতির 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' গানে ও রবীন্দ্র নাথের 'শ্রাবণ সন্ধ্যা' প্রবন্ধে বর্ষালু মানব-চিত্তের ব্যাকুলভাব কাঁপুনিকে দাদুরীর ডাক চিরকালের-জন্তে সরব সরস করে বেথেছে। এ কী কম। ধর্ম্মশাস্ত্রেও পশু-কুলের সম্মান অব্যাহত। প্রাচীন গ্রীসিয় ও হিন্দু অসংখ্য দেব-দেবীর বাহনরূপে নানা পশু-শ্রেণী য়ুরোপে ও এশিয়ায় যথোচিত সম্মাননা লাভের অধিকারী বলে গণ্য। এও কিছু কম নয়। তারপর নৃ-বিৎ হাউইটের মতে ৪০০ "টোটেম" নামের মধ্যে প্রায় ৩৬০টী নামই পাওয়া যায় পশুর। অনুন্নত অর্দ্ধ-সভ্য বা অসভ্য জাতিদের মধ্যে অসংখ্য মানব-গোষ্ঠী নানা পশুর সঙ্গে অভিন্নাত্মক আধ্যাত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করছে। এই পশু-কেন্দ্রিক গোষ্ঠী-বিভাগ ও ধর্ম্ম-চর্চ্চা সভ্যতার নিম্নতম স্তরের নৃ-রাজ্যে অবাধে তাঁদের অধিপত্য বিস্তার করে আছে।

সভ্য মানুষের সংস্পর্শে এসে পশু-জাতি সবিশেষ উন্নত হয়েছে কি ধ্বংসের পথে অবনতির পথে চলেছে তার সঠিক পরিমাপ করার সময় হয়ত এখনো সুদূর ভবিষ্যতেই থেকে গেছে। কিন্তু পশুর সংশ্রবে মানুষ যে ক্রমেই বিজ্ঞানের রাজ্যে সত্যকে, জীবন-যাত্রার পথে শুভকে ও শিল্পকলার সাধনায় সুন্দরকে প্রতিদিন তিল তিল করে অঙ্গীকার ও অধিকার করে আসছে, তার ভুরি ভুরি প্রমাণ আমাদের চতুর্দ্দিকে বেড়েই চলেছে।

সেই দিন—যেদিন আমরা পশু ছিলুম, ক্রম-বিকাশের মই-এ চড়ে মনুষ্যত্বের উচ্চ ভূমিতে যেদিন পা বাড়াইনি, সেদিন গেছে বড়ো দুর্য্যোগ। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্তে আমরা জীবন-সংগ্রামে একে অন্তের প্রতি হিংস্র আচরণ করেছি। হিংসাই ছিল রীতি। তারপর একদিন সহস্র সহস্র পশু যোনি ভ্রমণ করে বোধিসত্ত্ব গৌতম মানব-দেহে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের উপলব্ধি করে দেখ্‌লেন : মানুষ ও মানুষে এবং মানুষেতর জীবে কল্যাণের যোগ-সূত্র স্থাপিত হতে পারে : সে সূত্র শান্তি ও মৈত্রী, মুদিতা ও করুণার প্রেম-সূত্র। আত্মরক্ষা যদি পশু-প্রকৃতির first principle হয়, তবে মানব প্রকৃতির first principle আত্মত্যাগ—আত্মপরতার পরিবর্ত্তে পরার্থপরতা। আত্মপরতায় যদি ক্ষুদ্রতা পরার্থ-পরতায় তবে মহত্ত্ব; হিংসায় ঈর্ষা অহিংসায় প্রেম।

এমনকি পশু জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শান্তি মৈত্রী সুখ আত্মত্যাগ বহুধা চিহ্নিত হয়ে আছে দেখে কবি হুইটম্যান্ পাশবতার জয়গান করে বলেছেন :—

I think I could turn and live with animals, they are so
placid and self contained,
I stand and look at them long and long.
They do not sweat and whine about their condition,
They do not lie awake in the dark and weep for their sins,
They do not make me sick discussing their duty to God,
Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania
of owning things,
Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands
of years ago,
Not one is respectable or unhappy over the whole earth.

সুশীলকুমার দেব

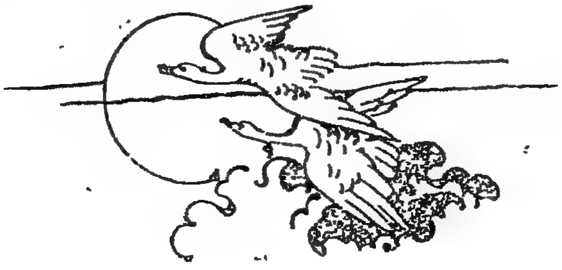

# একাডেমি অফ্ ফাইন আর্টসের ভবিষ্যৎ

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

গত ১৫ই আগষ্ট ১৯৩৩ সালে কলিকাতার Indian Museum গৃহে স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে "একাডেমি অফ্ ফাইন্ আর্ট্‌স্" প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং এই নবজাত প্রতিষ্ঠানটির বয়ক্রম এক বৎসর পূর্ণ হতে চল্‌ল। গোত্র হিসাবে এ প্রতিষ্ঠানটি স্বল্পজীবী গুল্মশ্রেণীর নয়, এর গোত্র দীর্ঘায়ুষ্মান্ বনস্পতির,—নানা শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে সুদূর-বিস্তৃত ভবিষ্যতে এর প্রসারের সম্ভাবনা। লণ্ডনের 'রয়াল একাডেমি অফ্ আর্ট্‌স্' জন্মলাভ করে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে; ১৬৬ বৎসর পরে আজও পূর্ণবেগে তার যৌবন কাল চলেছে, এবং এ যৌবনকাল যে আরও বহু বহু ১৬৬ বৎসর অতিক্রম করে যাবে না তার কোনো আশঙ্কা বর্ত্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। লণ্ডনের 'রয়াল একাডেমি' এবং কলিকাতার 'একাডেমি অফ ফাইন্ আর্ট্‌স্' একই গোত্রের বস্তু। সুতরাং জন্মদিবসের মাত্র এক বৎসরের মধ্যে 'একাডেমি অফ ফাইন্ আর্ট্‌সের' ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো প্রকার সুনিশ্চিত মন্তব্য প্রকাশ করতে যাওয়া নিরাপদ হবে না। কিন্তু এই এক বৎসরের মধ্যেই এর ক্রিয়াশীলতার একটি দৃষ্টান্ত এমন বিস্ময়কররূপে এবং বৃহদায়তনে প্রকাশ পেয়েছে যে এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন থাকাও উচিত নয়। যে কয়টি কর্ত্তব্য সাধনের অভিপ্রায় নিয়ে একাডেমি গঠিত হয়েচে তার একটি হচ্ছে প্রতিবৎসরে কলিকাতায় একটি করে ললিত-কলার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত করা। প্রতিষ্ঠাপনের মাত্র চার মাস পরে একাডেমি তাঁদের প্রদর্শনী-অনুষ্ঠানের কর্ত্তব্যটি পালন করেন। এই যৎপরোনাস্তি অল্প সময়ের উদ্যোগে যে প্রদর্শনীটি গ'ড়ে উঠেছিল, তার রূপ এবং আয়তন দেখে সকলের মনে বিস্ময় আনন্দকে পরাভূত করেছিল।

নটীর পূজা
শ্রীনন্দলাল বসু

ফটো সোসাইটি
কর্ত্তৃক ছায়াচিত্র

কিন্তু এমন কোনো কোনো ব্যক্তি, যাঁরা তাঁদের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্যে বহু প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব, প্রসার এবং বিলয় পর্য্যবেক্ষণ করবার সুযোগ লাভ করেছেন, তাঁদের মনে বৃহৎ ব্যাপারের এই বিরাট সূত্রপাত দেখে বিস্ময় এবং আনন্দের সহিত একটু উদ্বেগও যে দেখা দেয় নি, তা নয়। উদ্বেগ আর কিছুর জন্য নয়, উদ্বোধনের উদ্দীপনার একটা সঙ্গত অংশ নিত্যদিনের

সাধারণ কর্ত্তব্য-পালনের মধ্যে থাকবে কি-না, তাই ভেবে। পার্ব্বত্য নদীতে আষাঢ় মাসের বৃষ্টির দিনে যে ঢল নামে তার জলোচ্ছ্বাস দেখে নদীর জল-সম্পদ বিবেচনা করলে চল্‌বে না। বৈশাখ মাসের শীর্ণ নদীর রিক্ততায় কাজ চল্‌বে কি-না সে কথাও ভাবতে হবে।

আরম্ভের সমারোহ যে সর্ব্বত্র নিরর্থক এবং অনিষ্টকর এমন কথা বলিনে, কিন্তু বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া বলে যে একটি আপ্ত বাক্য বহুদিন থেকে প্রচলিত আছে সেই কথা বলবারই চেষ্টা করছি। পরিচালকের শক্তি এবং অধ্যবসায়ের যে অংশটি নিত্য এবং ধ্রুব,—অর্থাৎ যেটুকু শক্তি এবং অধ্যবসায় সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান থাক্‌বে, তার দ্বারা যদি পরিচালনা সম্ভবপর হয় তবেই ভালো, নচেৎ জমার চেয়ে খরচ বেশী হলে হিসাবের ক্ষেত্রে যে বিভ্রাট উপস্থিত হয় তাই হবে।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কিন্তু সে দুশ্চিন্তার কারণ নেই বলেই মনে হয়। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে, জমার দিকে শক্তি একটুও অপচিত হয় নি, উপচিতই হয়েছে। একাডে[illegible] সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অতুল বসুর সহিত [illegible] আলোচনায় বোঝা গেল যে, আগামী ডিসেম্বর [illegible]র সময়ে একাডেমির দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনীর জ[illegible]তোভাবে প্রস্তুত ত হচ্ছেনই, উপরোক্ত একাডেমির [illegible] উদ্দেশ্য এবং কর্ত্তব্যগুলি যাতে অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করা যায় তদ্বিষয়েও তাঁদের [illegible] এবং আগ্রহের অভাব নেই।

প্রদর্শনী কক্ষের একটি কোণ
একেবারে দক্ষিণ দিকে Sir Edward Burne Jones-এর Music ছবিটি দেখা যাচ্ছে

একাডেমি ও [illegible]কাডেমির প্রথম [illegible]শীলতা—গত [illegible] মাসের [illegible] প্রদর্শ- [illegible] যাঁরা এ[illegible]খবর রা[illegible]রা জানে[illegible]-ডেমি[illegible] ব্যাপারে[illegible] গভর্ণর[illegible] স্যর জন[illegible]সন হ'তে[illegible] ক'রে ভা[illegible] বহু রাজা মহা[illegible] জমিদার, [illegible] শিল্পী, শিল্পর[illegible] ব্যক্তির সহানু[illegible] এবং সহায়ত[illegible] অভাব না থাকলেও একাডেমির সভাপতি মহারাজা বাহাদুর স্যর্ প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুল বসুর অপরিসীম পরিশ্রম উৎসাহ অর্থব্যয় ব্যতিরেকে এমন একটি বৃহৎ ব্যাপার গ'ড়ে তোলা কখনই সম্ভবপর হ'ত না।

প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের অন্তর্গত সমস্ত শিল্প-গোষ্ঠীগুলিকে এক চন্দ্রাতপের তলে মিলিত ক'রে একটি নিখিলভারত শিল্প পরিষদ গঠিত করবার কল্পনা একটি বৃহৎ কল্পনা, এবং সেই কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করবার সাহসকে দুঃসাহস বল্‌লেও বোধহয় নিতান্ত অসঙ্গত উক্তি করা হবেনা। মহারাজ বাহাদুরের ঐকান্তিক সহানুভূতি এবং বদান্যতা এবং শ্রীযুক্ত অতুল বসুর সমুদার গঠন-প্রতিভা এবং কর্ম্মনিষ্ঠা এ বিষয়ে মণিকাঞ্চনের যোগের মত কার্য্যকরী হয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণ ক'রে পরস্পর-বিরোধী শিল্পসঙ্ঘ ও শিল্পগোষ্ঠী গুলিকে সম্বোধন ক'রে শ্রীযুক্ত অতুল বসুকে বল্‌তে হয়েছিল, "এস, এস, তোমরা সকলে আমাদের সার্ব্বজনীন

The One I missed
শ্রীঅতুলবসু

ফটো সোসাইটি কর্তৃক ছায়াচিত্র

আমরা ত্রয়ী (We are three)
শ্রীঅতুল বসু

ফটো সোসাইটি কর্তৃক ছায়াচিত্র
মহারাজা বাহাদুর স্যর্ প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের সদয় অনুমতি ক্রমে

চন্দ্রাতপের তলে। এখানে ভেদ নেই বিরোধ নেই, দ্বন্দ্ব নেই কলহ নেই। এখানে সকলেরই সমান আসন, সকলেরই সমান আদর।" অতুল বসুর আন্তরিকতা এবং সহৃদয়তা সকলকে স্পর্শ করেছিল, এবং তাঁর ভদ্রতার প্রতি আস্থাবান হ'য়ে সকলেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছেন। ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বৈরিতার সর্প যে একেবারে ফণা তোলেনি তা নয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দংশন করতে সক্ষম হয়নি।

Royal Academy ইংলণ্ডের যেরূপ গৌরবের বস্তু, আমাদের Academy of Fine Arts-কে দাঁড় করাতে পারলে এ-ও ভারতবর্ষের সেইরূপ গৌরবের সামগ্রী হবে। কিন্তু এই সদ্যোজাত প্রতিষ্ঠান-শিশুটি অন্নবস্ত্রের দৈন্যে যাতে পঙ্গু না হ'য়ে যায় তার জন্য গভর্মেণ্ট হ'তে আরম্ভ ক'রে দেশের রাজা মহারাজা এবং সর্ব্বসাধারণের একান্ত সহানুভূতি এবং আনুকূল্যের প্রয়োজন। সকল প্রকার বাৎসরিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অর্থের একটি পাকা ব্যবস্থা না থাক্‌লে এরূপ একটি ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা অসম্ভব। মহারাজা বাহাদুর এবং অতুলবাবুর প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটি চিরকাল চল্‌বে এরূপ প্রত্যাশা করা অন্যায়। ইংলণ্ডের রয়াল অ্যাকাডেমির বিষয়ে Sir Joshua Reynolds যে কার্য্য করেছিলেন, ভারত শিল্প পরিষদের বিষয়ে এঁরা দুজন ঠিক সেই কার্য্যই করেছেন। এঁদের দ্বারা পরিষদটি প্রসূত হয়েছে, কিন্তু পরিষদকে পালিত করবার কর্ত্তব্য শুধু এঁদের নয়। একটি মাত্র ব্যক্তি একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান প্রসব করতে পারেন, কিন্তু সে প্রতিষ্ঠানের অভিভাবকত্ব এবং লালন-পালনের ভার সমষ্টির উপর ন্যস্ত না হ'লে বিপদ। একাডেমির Executive Committee, Working Committee প্রভৃতি অবশ্য গঠিত হয়েছে, কিন্তু পরিচালনার জন্য উপযুক্ত অর্থের ব্যবস্থা না থাক্‌লে কমিটির দ্বারা কোনো কার্য্য সম্পন্ন হ'তে পারেনা। সুতরাং এ পর্য্যন্ত যদি না হ'য়ে থাকে তা হ'লে অবিলম্বে একাডেমির একটি যথোপযুক্ত অর্থভাণ্ডার স্থাপিত হওয়া উচিত। এ অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করতে হবে (১) Government Grant (২) Corporation Grant (৩) দেশের রাজা মহারাজাদের নিকট হ'তে এককালীন প্রাপ্ত চাঁদায় গঠিত

অলঙ্কার
শ্রীললিতমোহন সেন

ঘটো সোসাইটি কর্ত্তৃক ছায়াচিত্র

গঙ্গাস্নানের পর
শ্রীসতীশ সিংহ

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক ছায়াচিত্র
পাতিয়ালা মহারাজাধিরাজের সদয় অনুমতিক্রমে

(১) প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য শিল্পধারা নির্ব্বিশেষে যে সকল বিভিন্ন কলাসঙ্ঘ বর্ত্তমান আছে সে-গুলিকে একটি বিশ্বশিল্পচেতনা-উদ্বুদ্ধ সার্ব্বজনীন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মিলিত করা।

(২) প্রতিবৎসর একটি সাম্বৎসরিক শিল্প-প্রদর্শনীর দ্বারা পুরস্কার বিতরণাদির সাহায্যে শিল্পীগণের মধ্যে শিল্প-প্রেরণা বর্দ্ধিত করা। সে হিসাবে গত প্রদর্শনী বিশেষ ভাবে সফলতা লাভ করেছিল। ইতিপূর্ব্বে আর কোনও প্রদর্শনীতে দেশের রাজামহারাজাগণ কর্ত্তৃক এত অধিক সংখ্যক পুরস্কার প্রদত্ত হয় নি।

(৩) দরিদ্র নিরালম্ব শিল্পীগণকে সাহায্য করা।

Reserve Fund (৪) দেশের ধনীব্যক্তিদের নিকট হ'তে প্রাপ্ত বার্ষিক চাঁদা প্রভৃতির দ্বারা। এ অর্থ-ভাণ্ডারের আয় এরূপ হওয়া উচিত যদ্দারা একাডেমির বার্ষিক ব্যয়ের বজেট্ অনায়াসে নির্ব্বাহ হ'তে পারে। আমরা সঠিক জানিনা একাডেমির অর্থভাণ্ডারের ব্যবস্থা উপযুক্ত-ভাবে হয়েচে কি-না। আশা করি কমিটি সে বিষয়ে উদাসীন নেই।

প্রধানতঃ যে সকল উদ্দেশ্য নিয়ে একাডেমি স্থাপিত হয়েচে সে-গুলি সংক্ষেপে এইরূপ বলা যেতে পারে।

বিশ্রাম
শ্রীসতীশ সিংহ

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক ছায়াচিত্র

(৪) সকল শ্রেণীর শিল্পীগণের জন্য একটি মিলনী (club) স্থাপিত করা।

(৫) সাধারণ এবং সর্ব্বতোভাবে শিল্প ও শিল্পীগণের মঙ্গল সাধন করা।

আমরা যতদূর অবগত আছি, উপরোক্ত কর্ত্তব্যগুলির মধ্যে অন্ততঃ দ্বিতীয়টি একাডেমি পালন করতে আরম্ভ করেছেন, এবং আগামী সেপ্টেম্বর মাসে বিলাতে India Society of London-এর উদ্যোগে আধুনিক ভারতীয় শিল্প বিষয়ে যে প্রদর্শনী হবে তা'তে বাঙ্গলা এবং অন্যান্য প্রদেশের শিল্পীদের শিল্পসামগ্রী নির্ব্বাচিত এবং প্রেরণ ক'রে একাডেমির পঞ্চম সংখ্যক কর্ত্তব্যের পালন বিষয়েও সচেষ্ট হয়েছেন।

চারণ (The Ballad Singer)
ভি, এ, মোলি

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক
ছায়াচিত্র
পাতিয়ালা মহারাজাধিরাজের সদয়
অনুমতিক্রমে

ইংলণ্ডের National Art Gallery (Tate Gallery) প্রভৃতির অনুকরণে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজধানী দিল্লীতে একটি ভারতীয় National Art Gallery প্রতিষ্ঠার চিন্তা দেশের শিল্পরসিক ব্যক্তিদের মনে কিছুদিন থেকে জেগেছে। এ চিন্তা এখনো অবশ্য বায়বীয় নভোমণ্ডলের রাজ্যেই বিচরণ করছে; জল-স্থলের সুনির্দ্দিষ্ট রাজ্যে ঠিক অবতরণ করেনি। কিন্তু করা উচিত, এবং অচিরকালেরই মধ্যে কোনো দিন হয়ত করবে।

কোনো জাতির শিল্প সৃষ্টি যখন ঔৎকর্ষ্যে এবং সংখ্যায় বেড়ে ওঠে, তখন সে-গুলির মধ্য থেকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট নমুনাগুলিকে সংগ্রহ ক'রে সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য কলাভবনে স্থাপন এবং রক্ষণ না করলে জাতির স্বরূপকে খর্ব্ব করবার প্রত্যবায় হয়। সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি ললিতকলার অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে জাতির মানসতা, চিন্তাভঙ্গী, পরিকর্ষ (culture) প্রভৃতি পরিব্যক্ত হয়। একজন বিদেশীর নিকট কোনো জাতির পরিচয় সে জাতির সাহিত্য এবং শিল্প। সুতরাং কলাভবন স্থাপনার দ্বারা শিল্প সামগ্রী সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করলে জাতীয় স্বরূপ খর্ব্ব করবার প্রত্যবায় হবে তাতে সন্দেহ কি? ইয়োরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে কোনো জাতির মধ্যে যখনই এই সত্যের প্রকৃত উপলব্ধি হয়েছে তখনই সেই জাতির প্রচেষ্টায় Art Gallery দেখা দিয়েছে।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অনুরূপ প্রচেষ্টা যাতে ধীরে ধীরে সুদীর্ঘকাল ধ'রে ধূমায়িত না হয়ে এক দিক থেকে একটা প্রেরণা লাভ ক'রে হঠাৎ খানিকটা জ্বলে উঠ্‌তে পারে সে জন্য একাডেমি অফ্‌ ফাইন্‌ আর্ট্‌স্‌ একটা কৌশল অবলম্বন করতে উদ্যত হয়েচেন বলে আমরা সংবাদ পেয়েছি। ভবিষ্যতের কল্পিত দিল্লী কলাভবনের যে ইমারৎ প্রস্তুত হবে তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নক্সা যে শিল্পী অঙ্কিত করে দেবেন তাঁকে একাডেমি কর্ত্তৃক একটি সুবর্ণপদকযুক্ত অর্থ পুরস্কার প্রদত্ত হবে। এবং সেই নক্সাটি আগামী ডিসেম্বর মাসের প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হবে।

বিদায় ব্যথা
শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

পাকশালা
শ্রীঅজিতকৃষ্ণ গুপ্ত

এ কথা অবশ্য বলা বাহুল্য যে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট নক্সাটি একাডেমির বিবেচনায় ঔৎকর্ষ্যের যথোচিত স্তরে উপনীত হলে তবে গৃহীত এবং পুরস্কৃত হবে। ঈপ্সীত দিল্লী কলাভবনের অজাত Building Committee এ নক্সাটি ইচ্ছামত গ্রহণ করতেও পারেন, না করতেও পারেন। তবে চাবুক দেখ্‌লে ঘোড়া ক্রয় করবার প্রবৃত্তিটা একটু তাড়না লাভ করতে পারে, একাডেমি মানব-মনের এই নিগূঢ় তত্ত্বটির সুযোগ গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েচেন। প্রতিযোগিতায় প্রবেশেচ্ছু শিল্পীগণ এ বিষয়ে সঠিক সংবাদাদির জন্য একাডেমির কার্য্যালয় মিউজিয়াম গৃহে আবেদন করতে পারেন।

আমরা বলি, এ সব কলা-কৌশলের অপেক্ষা না করে একটি National Art Gallery স্থাপনার জন্য অবিলম্বে লেগে পড়া যাক্‌। কার্য্যের সূত্রপাতই হচ্চে কার্য্যের অর্দ্ধেক শেষ করে ফেলা। অনিশ্চিত ভবিষ্যতে যেদিন সুযোগ বিরাট মূর্ত্তিতে দেখা দেবে, উদার আনুকূল্যে

রাজকোষ যেদিন উন্মুক্ত হবে, সেদিন একেবারে বৃহৎ আকারে একটি জাতীয় কলাভবন প্রতিষ্ঠিত করব,—দিল্লী যদি সেই সুবর্ণ দিবসের অপেক্ষায় থাকে ত থাক্, ইত্যবসরে বাঙলা দেশে আমরা একটি Bengal National Art Gallery-র ভিত্তি স্থাপন করি। সে ভিত্তির উপর এক দিন যে-সৌধ শেষ হবে তার কল্পনা খুব বিরাট করেই করব, কিন্তু তার সূচনা ছোট করে করলে কোন ক্ষতি নেই।

ক্ষুদ্র থেকে বৃহতের দিকে গতিই হচ্ছে জীবনের লক্ষণ। Tate Gallery-র বিপুল সংগ্রহ ছাড়া লণ্ডনের National Gallery-র বর্ত্তমান সংগ্রহ প্রায় ১৭৫০টি ছবি। কিন্তু এ ছবিগুলির একটিও সামান্য ছবি নয়, প্রায় সবগুলিই চিত্রশিল্পের চরম নিদর্শনের বস্তু। নিম্নোদ্ধৃত লেখা থেকে National Gallery-র চিত্র-সম্পদের মূল্য কতকটা অনুমান করা যাবে। "The Gallery is unexcelled in the uniformly high quality of its pictures, and the number of masterpieces it possesses. Nowhere outside Italy is the Italian School so admirably represented, nor outside Holland, the Dutch School; while the collections of Flemish, Spanish, German and French work, though small, are very choice. The group of English paintings is without an equal. Among the most famous paintings in the gallery are those by Duccio, Masaccio, Piero della Francesca (here represented by an unrivalled group), Leonardo da Vinci ("Madonna of the Rocks"), Michelangelo (notably "the Entombment"), Raphael (including the famous "Anisidei Madonna"), Correggio, Mantegna, Giovanni Bellini, Titian, Tintoretto, Jan Van Eyck ("John Arnolfini and His Wife"), Rubens, Rembrandt, De Hooch, Ruisdael, Velasquez,

তিব্বতীয় ভিক্ষুক
শ্রীসারদাচরণ উকিল

Holbein, Reynolds, Constable and Turner." এই হ'ল অতি-সমৃদ্ধ ন্যাশনাল গ্যালারির বর্ত্তমান অবস্থা যা জগতের সমস্ত শিল্পরসপিপাসুগণের শ্রদ্ধা এবং আনন্দ সঞ্জাত করতে সমর্থ হয়েচে; কিন্তু ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জে, জে, অ্যাঙ্গারষ্টীনের চিত্র সংগ্রহ থেকে মাত্র ৩৮খানি চিত্র ক্রয় ক'রে এর সূত্রপাত হয়! এত বড় বিশাল বারিধির উৎস গোমুখীর এই শীর্ণ ধারায়।

ঠাকুমার আদুরে
শ্রীরাসবিহারী দত্ত

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক ছায়াচিত্র
শ্রীযুক্ত বি, সি, সেন, আই, সি, এস, মহাশয়ের সদয় অনুমতিক্রমে

অতএব, বাঙ্গলা দেশ দরিদ্রের দেশ, এ দেশে এত বড় বড় রাজামহারাজা নেই যাঁদের আনুকূল্যে কলাভবনের মত একটা ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলা যেতে পারবে, এই সকল অলীক দুশ্চিন্তা মনে মনে পোষণ ক'রে পশ্চাদ্‌পদ হবার কোনো কারণ নেই। বাঙ্গলা দেশ আর কিছুর দেশ না হোক শিল্পকলার দেশ। এখানকার অধিবাসিগণের নিত্যকার জীবন-যাপনের সঙ্গে শিল্প ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত হয়ে আছে। দেবমন্দিরের গাত্র থেকে আরম্ভ করে নবজাত শিশুর কাঁথাটি পর্য্যন্ত কোনো জিনিসই শিল্প-সুষমার প্রলেপ থেকে এখানে বঞ্চিত নয়। তা ছাড়া, অন্য অনেক বিষয়ে সম্প্রতি নেতৃত্ব হারালেও শিল্প বিষয়ে বাঙ্গলা দেশ এখনো ভারতবর্ষের নেতৃত্ব অধিকার ক'রে আছে। ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গলার শিল্পী-সন্তানেরা এখনো অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত। সমুদ্র পারের বহু দূরবর্ত্তী দেশ সমূহে ভারতবর্ষের Bengal School-এর শিল্প খ্যাতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ করছে। সুতরাং অধিকারের দিক থেকে বিচার করলে বাঙ্গলা দেশের Na-

বাচখেলা
শ্রীঅসিতকুমার রায়

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক ছায়াচিত্র

tional Galleryর দাবী ভারতবর্ষের আর অন্য কোনো প্রদেশেরই চেয়ে কম নয়। তা ছাড়া, ভারতবর্ষের মত সুবৃহৎ দেশে একাধিক কলাভবন থাকাই উচিত। সুতরাং যথা সময়ে দিল্লীর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবার পক্ষেও কোনো বাধা নেই।

আমার মনে হয়, বাঙ্গলা দেশের বিদ্যোৎসাহী ললিত-কলানুরাগী জনপ্রিয় পৃষ্ঠপোষক মহারাজ বাহাদুর স্যর প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর যদি হাল ধ'রে বসেন, এবং প্রতিভান্বিত কর্ম্মী শ্রীযুক্ত অতুল বসু তাঁর জনকয়েক সহকর্ম্মী নিয়ে দাঁড়ে ব'সে যান, তা হ'লে সফলতার কূলে অবতীর্ণ হওয়া খুব কঠিন হবে না। তাঁরা অগ্রণী হ'লে দেশের ধনী এবং কর্ম্মী সম্প্রদায় নিশ্চয় তৎপর হবেন।

সরলতা (Innocence)
জি, এস, হলদঙ্কর

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক
ছায়াচিত্র

বাঙ্গলার দৈন্য এবং অভাবের আজকাল পরিসীমা নেই। বাঙ্গলার উপর থেকে রাজানুগ্রহ অপসৃত হওয়ার পর বহু জিনিসই বাঙ্গলার বাহিরে চলে গিয়েছে,—কেবল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল একেবারে অনড় বলে এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী নিয়ে টাগ্ অভ্ ওয়ারে আমরা উপস্থিত জিতে গিয়েছি তাই এ দুটি জিনিস এখনো বাঙ্গলায় অবস্থান করছে। দিল্লীর পুষ্টি সাধন করবার জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা বর্ত্তমান আছে। বাঙ্গলার কিন্তু কেউ নেই। বাঙ্গলার জাতি-প্রদেশগুলি এখন বাঙ্গলার দুর্দ্দিনে বাঙ্গলার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, সুতরাং দিল্লীর পুষ্টি-সাধনের জন্য বাঙ্গলার অথবা বাঙ্গালী শিল্পীর তৎপর হবার এমন কোনো প্রয়োজন নেই।

কথাটা হয়ত শুনতে খারাপ লাগ্ল। কিন্তু বস্তুতঃ কথাটা কেন খারাপ নয়, সে কথা প্রমাণ করতে হ'লে এমন অনেক কথা বলবার প্রয়োজন হবে যা শুনতে আরো খারাপ লাগ্বে। প্রাদেশিকতা সঙ্কীর্ণ বস্তু, এবং বিশ্বজনীনতা উদার সামগ্রী, সেকথা মানি,—কিন্তু দেহধারণের এই সুকঠোর প্রতিযোগিতার বাজারে যে ব্যক্তি বিশ্বজনীনতা ক'রে বেড়ায় সে বুদ্ধিমান নয়। একথা উর্দ্ধতম লীগ্ অভ্ নেশন্স্ থেকে আরম্ভ ক'রে নিম্নতম গৃহ-পলিটিক্স্ পর্য্যন্ত সমস্ত সঙ্ঘযৌথ ব্যাপারে খাটে। লীগ অভ্ নেশন্সের যখন বৈঠক বসে তখন বোঝা যায় লীগ্ মানে আত্মরক্ষা; দেখা যায় বিভিন্ন নেশনগুলি নিজ নিজ বেদনায় হস্তার্পণ ক'রে উদ্‌গ্রীব হয়ে ব'সে আছে; অর্থটা,—তোমার সুবিধায় ভাগ বসিয়ে আমার অসুবিধা দূর হোক। যে ভদ্র, যে ভালো মানুষ, বিশ্বজনীনতায় যার প্রাণ হিল্লোলিত, সে নিজ সম্পদের ভাগ অপরকে দিয়ে

আসে; যে তোখড়, চতুর সে অপরের বোঝা পিঠে ঝুলিয়ে নিজ গৃহে প্রবেশ করে। সুতরাং বিশ্বজনীনতা অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য এখন স্থগিত থাক্।

বাঙ্গলায় Art Gallery স্থাপনের পক্ষে হয়ত কেহ কেহ আপত্তি করতে পারেন যে, বাঙ্গলায় যখন কলিকাতা গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের সংলগ্ন একটি চিত্রসংগ্রহ এবং শান্তি-নিকেতনে বিশ্বভারতী কলা-ভবন রয়েছে তখন আবার একটি নূতন Art Gallery না ক'রে ঐ দুটি শিল্পভবনেরই উন্নতিসাধন করা যেতে পারে। এ কথার বিস্তারিত উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করিনে, কারণ, ঐ দুটি কলাভবনই দুটি শিক্ষায়তনের সহিত সংলগ্ন, সুতরাং ঐ দুটি শিক্ষায়তনের ধারা এবং

আবর্জ্জনার গাড়ি
শ্রীগোবর্দ্ধন আশ

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক ছায়াচিত্র

হাটের দিন (Market Place)
শ্রীতারকনাথ বসু

সেণ্ট পল্‌স কেথিড্রাল—কলিকাতা
মিসেস্ কে, বিশপ

ফটো সোসাইটি কর্তৃক
ছায়াচিত্র

উত্থান-পতনের সহিত আবদ্ধ। একটি স্বতন্ত্র সার্ব্বজনীন এবং সহজে সাধারণের অধিগম্য শিল্পাগারের অভাব ঐ ছুটি শিল্পভবনের দ্বারা কখনই পূর্ণ হ'তে পারে না।

Academyর নাম সম্বন্ধে আমার সামান্য একটু বক্তব্য আছে। নামটি Academy of Fine Arts, Calcuttaর পরিবর্ত্তে Calcutta Academy of Fine Arts হ'লে ভাল হ'ত। তাহ'লে অচিরকালের মধ্যে নামটি সংক্ষিপ্ত হয়ে Calcutta Academyতে দাঁড়াত। এবং Calcutta Acamyde ব'লে অভিহিত হ'লে পৃথিবীর যে-কোনো স্থানের লোকই অবিলম্বে Academyর গোত্র পরিচয় বুঝ্‌তে পারত। Academy of Fine Arts বল্‌লে একাডেমিটি যে কলিকাতার সম্পদ তা ভারতবর্ষের বাইরের কোনো লোকই বিনা পরিচয়ে বুঝ্‌তে পারবে না।

একাডেমির প্রধানতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য শিল্পধারা নির্ব্বিশেষে যত বিভিন্ন শিল্প-সংহতি আছে তন্মধ্যে কোনোটিকেই অস্বীকার না করা, এবং বাৎসরিক কলা-প্রদর্শনীতে সকল প্রকার শিল্পের প্রবেশ-পথ অব্যাহত রাখা। এই কথাটাই হয়ত দৃঢ়ভাবে মহারাজ বাহাদুর স্যর প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর প্রদর্শনীর উদ্বোধনকালে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলির মধ্যে বলেছেন—"We want to break away from

নির্ব্বাক গীতি
শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ

old stereotyped traditions and this is a task which the Academy has undertaken."

কিন্তু, to break away from old stereotyped traditions কথার অর্থ যদি এই হয় যে, বিভিন্ন শিল্প-সংহতির (schools) শিল্প-ধারার যে বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলির প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে একটি বিরাট অঙ্গনে সবগুলিকে মিলিত অর্থাৎ মিশ্রিত করা, তা হ'লে তর্ক উঠ্‌তে পারে। শিল্পবস্তুর বিষয়ে সর্ব্বধারাসমন্বয় ব্যাপারটা

ছয়টি মুখমণ্ডল
শ্রীঅবনী সেন

বেদে
শ্রীগোবর্দ্ধন আশ

পাতিয়ালা মহারাজাধিরাজের সদয়
অনুমতিক্রমে

মিঃ পারসি ব্রাউন
শ্রীরসময় ভট্টাচার্য্য

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক ছায়াচিত্র
শ্রীযুক্ত পারসি ব্রাউনের সদয় অনুমতিক্রমে

এবং টেক্‌নিক্ মানেই আর্ট। একজন প্রতিভান্বিত শিল্পী নূতন নির্ম্মাণ-কৌশল উদ্ভাবন করে, অপেক্ষাকৃত নিম্ন প্রতিভার শিল্পীগণ সেই নির্ম্মাণ-কৌশলকে অনুকরণ করতে আরম্ভ করে। এইরূপে ক্রমশঃ একটি নূতন শিল্প-সংহতির (school-এর) সৃষ্টি হয়। সুতরাং একটি শিল্প-সংহতির ধারাকে ভেঙ্গে দেওয়া মানে একটি বিশিষ্ট শিল্প-প্রণালীর বিলয় সাধন করা। কাজে কাজেই প্রচলিত সমস্ত শিল্প-সংহতির ধারা এবং পারম্পর্য্য নষ্ট ক'রে একটি মিশ্রিত ধারার সৃষ্টি করলে শিল্পজাত বস্তুর বৈচিত্র্য নষ্ট করা হবে। Western School-এর বটিচেলি অথবা রেমব্রাঁর চিত্রের শক্তি এবং গভীরতা আমাদের মনোহরণ করে, এবং Far Eastern School-এর কিওনাগা অথবা মাতাবির চিত্রের লঘু সূক্ষ্মতাও আমাদিগকে কম আনন্দ দেয় না। কিন্তু এই বহু-বিভিন্ন দুটি শিল্পধারাকে ভগ্ন ক'রে উভয়ের মিশ্রণে একটি নূতন শিল্পধারা সৃষ্টি করলে দুটি বিশিষ্ট শিল্প ধারাই হারাতে হবে এবং নূতন সৃষ্টি যেটি হবে সেটি হয়ত' হবে—'না রাম, না রহিম'।

মঙ্গলজনক নয়—কারণ বৈচিত্র্য শিল্প-বস্তুর প্রাণ। একই উপাদানে কিন্তু বিভিন্ন প্রস্তুত-প্রণালী-তে গঠিত বস্তুর মধ্যে বৈচিত্র্য আসে প্রস্তুত-প্রণালীর বিভিন্নতার জন্য। এই প্রস্তুত-প্রণালীই technique,

গর্দ্দভ
শ্রীঅবনী সেন

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক ছায়াচিত্র

কিন্তু তাই ব'লে এমন কথাও আমি বলিনে যে, দুটি বিভিন্ন শিল্প-ধারার মিশ্রণে একটি উৎকৃষ্ট শিল্পবস্তুর সৃষ্টি হ'তে পারে না। পারে নিশ্চয়, কিন্তু সে মিশ্রণ রাসায়নিক compound হওয়া চাই,

mixture হ'লে চল্‌বে না। তার মধ্যে মিলনের সুসমঞ্জসতা, সুতরাং শিল্পরসের আনন্দ, যেন থাকে। অর্থাৎ, সৃষ্টি যেন হয়। গত ডিসেম্বর মাসের প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত যে ছবিগুলির প্রতিলিপি বর্ত্তমান প্রবন্ধে মুদ্রিত হ'ল সে ছবিগুলির সংক্ষিপ্ত জাতি-নির্ণয় ক'রে দেখলে আমার একথা সপ্রমাণ হবে।

১নং চিত্রখানি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের 'নটীর পূজা।' এ ছবিতে ভারতীয় পদ্ধতির সহিত Far Eastern Method (জাপান, চীন প্রভৃতি দেশের পদ্ধতি) মিশ্রিত আছে ব'লে মনে হয়। ৩নং ছবি শ্রীযুক্ত অতুল বসুর "The One I Missed" ইয়োরোপীয়ন ফ্রেঞ্চ পদ্ধতিতে অঙ্কিত। ৪নং চিত্রে (We Are Three) শ্রীযুক্ত অতুলবাবু Dutch এবং French যুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। ৫নং চিত্র শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেনের "অলঙ্কার" আধুনিক ইয়োরোপীয়ান Matt Oil-painting School-এর দ্বারা প্রভাবিত। ৬নং চিত্র "স্নানের পর" শ্রীযুক্ত সতীশ সিংহের ইয়োরোপীয়ান পদ্ধতির নমুনা। ৭নং "বিশ্রাম" চিত্রে

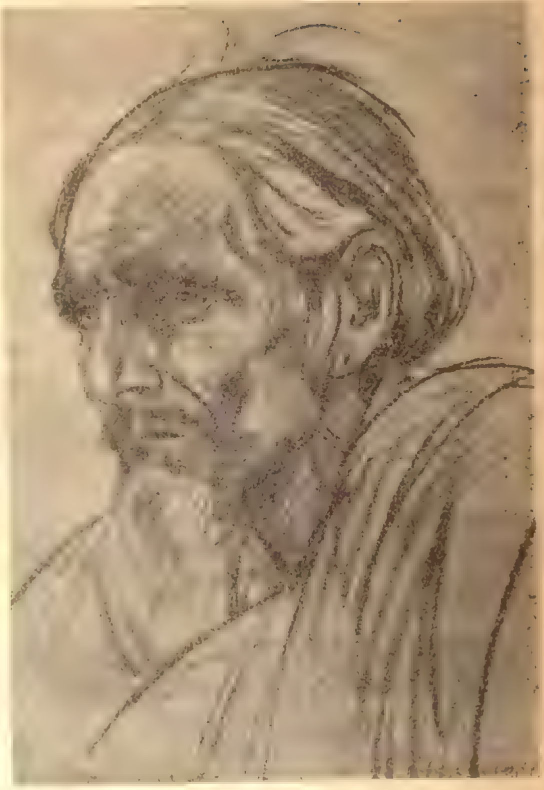

মুখমণ্ডল
শ্রীঅবনী সেন

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক
ছায়াচিত্র

শ্রীযুক্ত সতীশ সিংহ ইয়োরোপীয়ান ফ্রেঞ্চ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। শ্রীযুক্ত ভি, জ্, মোলির ৮নং চিত্র "চারণ" ইতালীয় পদ্ধতির নিদর্শন। ৯নং চিত্র শ্রীযুক্ত অজিতকৃষ্ণ গুপ্তের "বিদায় ব্যথায়" ভারতীয় পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে—কিন্তু বঙ্গদেশীয় পদ্ধতি নয়। ১০নং চিত্র শ্রীযুক্ত অজিতকৃষ্ণ গুপ্তর "পাকশালা" বঙ্গদেশীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত। ১১নং চিত্র শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিলের "তিব্বতীয় ভিক্ষুক" প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের মিশ্র পদ্ধতি। ১২নং চিত্র শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দত্তের "ঠাকুরমার আদুরে" Dutch পদ্ধতিতে অঙ্কিত। শ্রীযুক্ত অসিতকুমার রায়ের ১৩নং চিত্র "বাঘখেলায়" জাপানীয় প্রভাব পরিস্ফুট। ১৪নং চিত্র শ্রীযুক্ত জি, এস, হলদঙ্করের "সরলতা" ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত। শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন আশের ১৫নং চিত্র "স্যাভেঞ্জার গাড়ি" সাধারণ ইয়োরোপীয় ভঙ্গীতে অঙ্কিত। ১৬নং চিত্র শ্রীযুক্ত তারকনাথ বসুর "হাটের দিন" ভারতীয় বিভিন্ন পদ্ধতিতে অঙ্কিত। ১৭নং চিত্র মিসেস কে, বিশপের "কলিকাতা কেথিড্রালে" ইয়োরোপীয় পদ্ধতির সহিত জাপানীয় প্রভাব

মুখমণ্ডল
শ্রীগোবর্দ্ধন আশ

ফটো সোসাইটি কর্ত্তৃক
ছায়াচিত্র

মিশ্রিত। ১৮ নং চিত্র শ্রীযুক্ত সতীশ সিংহের "বিনা কথার গান" ডচ্ এবং ইংলিশ্ স্কুলের নমুনা। শ্রীযুক্ত অবনী সেনের ১৯নং চিত্র "ছয়টি মুখমণ্ডল" ফ্রেঞ্চ এবং বৃটিশ পদ্ধতিতে অঙ্কিত। ২০নং চিত্র শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন আশের "বেদে" ভারতীয় এবং ফ্রেঞ্চ পদ্ধতির মিশ্রণ। ২১নং চিত্র শ্রীযুক্ত রসময় ভট্টাচার্য্যের "মিঃ পর্সি ব্রাউন্" বৃটিশ পদ্ধতির নিদর্শন। ২২নং চিত্র শ্রীযুক্ত অবনী সেনের "গর্দ্দভ" ইয়োরোপীয়ান্ পদ্ধতিতে অঙ্কিত। ২৩নং চিত্র শ্রীযুক্ত অবনী সেনের "বৃদ্ধের মুখমণ্ডল" বৃটিশ পদ্ধতির নিদর্শন। ২৪নং চিত্র শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন আশের "বৃদ্ধের মুখমণ্ডল" ফ্রেঞ্চ স্কুলের নিদর্শন।

সুতরাং উপরোক্ত তালিকা থেকে এবং গত প্রদর্শনীর চিত্র নির্ব্বাচনের পদ্ধতি থেকে এ কথা স্পষ্টই মনে হয় যে, "to break away from old stereotyped tradition" অর্থে মহারাজা বাহাদুর এই কথাই বল্‌তে চেয়েছিলেন যে, আমরা পুরাতন ঐতিহ্যের গোঁড়ামি ভেঙ্গে এসে সকল সংহতির শিল্পকলা বরণ করব।

নবজাত একাডেমির কথা সর্ব্বসাধারণের মনে নূতন ক'রে জাগিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে বর্ষ পূর্ণ হবার কিছু পূর্ব্বেই আমরা এ প্রবন্ধে গত প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত কয়েকটি চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত করলাম। এবার এ সংখ্যায় প্রকাশিত "হাটের দিন" নামক রঙিন ছবিটিও গত প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। তা ছাড়া, গত ফাল্গুনের বিচিত্রায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহের রঙিন ছবি "কুটীর পুঞ্জ", গত চৈত্রে প্রকাশিত Capt. F. C. W. Fosebery কর্ত্তৃক অঙ্কিত রঙিন ছবি "Surrey Hills" ও গত বৈশাখে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অজিতকৃষ্ণ গুপ্ত অঙ্কিত "পাকশালা"—একাডেমির প্রদর্শনী হ'তেই পাওয়া গিয়েছিল।

এই সমস্ত ছবিগুলি বিচিত্রায় প্রকাশিত করবার অনুমতি সংগ্রহ ক'রে দেবার জন্যে আমরা শ্রীযুক্ত অতুল বসু মহাশয়ের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

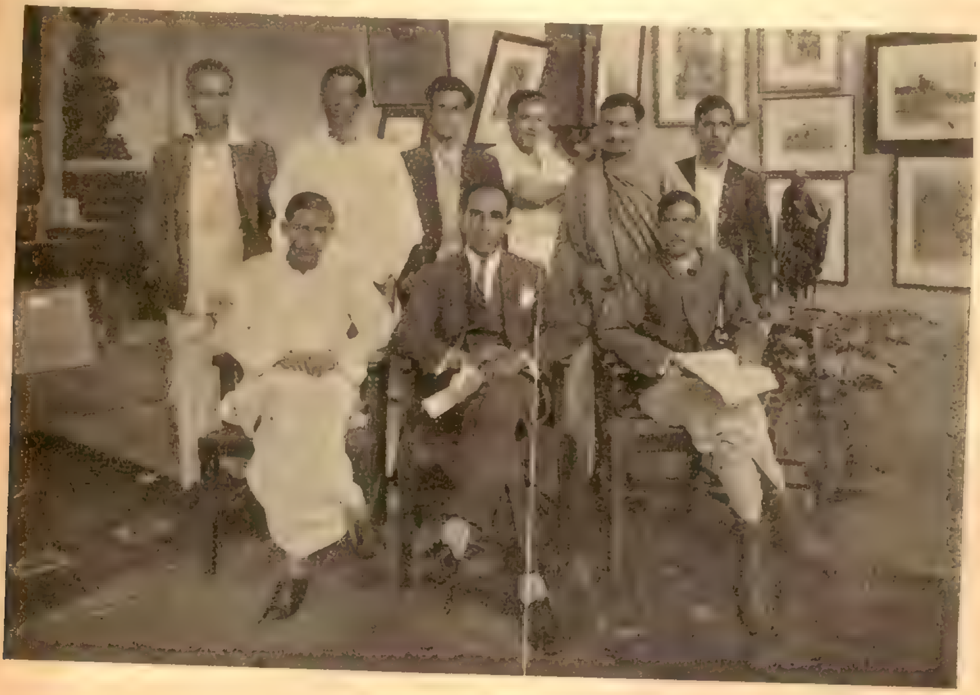

সহযোগী সম্পাদক ও তাঁহার সহকর্ম্মীবৃন্দ

দাঁড়াইয়া (বাম হইতে) (১) শ্রীযুক্ত অবনী সেন (২) শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন আশ (৩) শ্রীযুক্ত বিমল দে (৪) শ্রীযুক্ত জহর সেন (৫) শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় (৬) শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত

বসিয়া (বাম হইতে)—(১) শ্রীযুক্ত এস, এন্, দে (২) শ্রীযুক্ত অতুল বসু (সহযোগী সম্পাদক) (৩) শ্রীযুক্ত অমিয় বসু

# বর্ষা-মঙ্গল

## বিরহ-বিলাস

আজি তুমি কাছে নাই। বুঝি তাই নবমেঘে নভতল মলিন মেদুর ;
দেয়া ডাকে বহি' রহি' ; কেয়াবনে বায়ুমুখে কাঁদি' ফেরে কুসুম-কেশর ;
বিজুরী-চমকে ভাসে স্মরণেব অন্তহীন কূলে—আরেক শাওন-স্মৃতি
মধুমিলনের। অতীত তিথি সে মোর, তবু তারে ঘিরি' মানস-মধুপ
ফিরে মাধুকরী করি'। আজো তো-বাদল-বেলা, সে-শাওন বাজায় নূপুর;
মাটির সোঁদাল গন্ধ, মুহুমুহু দামিনী-ঝলক্, উন্মাদিনী সে-প্রকৃতি,—
সেই তো সকলি আছে ; তুমি শুধু কাছে নাই মোর। তোমার স্মৃতির ধুপ
জ্বলে মোর মানসগহনতলে,—আন্দোলিয়া তোলে বুকে অশ্রুর সায়র।

তবু এ মিনতি মোর,—আজি কাছে আসিয়ো না ; এ দুঃসহ বিরহ-উৎসবে
তোমারে চাহি না, প্রিয় ! আজিকার রিক্ততায় ব্যথাপাংশু অধীর অধরে
নামুক্ করুণ ক্লান্তি শ্রান্ত শ্রাবণের মত ; নিদ্রাহীন নয়নে ও নভে
অবিরাম ঘনাক্ কুহেলি-ঘোব ; আত্মা আর্ত্তনাদ করি' করুক কামনা
তব দেহপরশ মদির ;—তবু তুমি আসিয়ো না কাছে। এ ব্যথা-বাসরে
প্রিয় ! আজি মোর অশ্রুপূত বিরহ-বিলাস !—অভিনব প্রেম-উপাসনা !

শ্রীনীলিমা দাস

## অভিমানিনী

বেলা কি আজ অমনি কেটে যাবে ?
আনত মুখে রইলে ও কি ভাবে ?
নয়ন কোল একটু যেন ফোলা,
খোঁপাটি কেন এলানো আধখোলা,
অধরে কই চোরা সে হাসিদোলা,
চাপা নিশ্বাসে উরস কেন কাঁপে ?
নভনীলিমা মেদুর ঘনমেঘে,
যূথী অধিরা, বাদল ঝরে বেগে।
তোমারো কেশে কোথায় পরিমল,
বেণে কোথায় নবনীরদ-দল,
কাজলে কেন আঁকোনি আঁখিতল,
বাণীর পূজা কই সে বীণারবে ?
খনে খেলিছে কপালে কালোরেখা,
সমুখে ও কী, আধেক লিপিলেখা !
গৃহের দশা দেখো ভূতল ত্যেজে'
জলের ছাঁটে ভিজিবা যায় মেঝে,
তোমারে আজি বুঝানো দায় সে-যে,
—বিফল হবে কী ফল তুমি পাবে ?

শ্রীসুধীবচন্দ্র কর

# ভাঙন

## শ্রীকুড়নচন্দ্র সাহা

কালো মুখের উপর বসন্তের দাগগুলি ঘোরালো ভাবে চ'খে পড়ে। দূর হইতে মনে হয়, কবে বুঝি অগ্নিদেবের ভর হইয়াছিল। কাশফুলের মত শাদা চুল,—ছোট করিয়া ছাঁটা। মাঝখানে ঈষৎ-দীর্ঘ একটা টিকি আছে। শুনা যায়, আশ্বিনের বড় ঝড়ে যেবার গাছপালা ঘর বাড়ী ভূমিসাৎ হয়,—সেইবার আমকুশি গ্রামে তাঁর আবির্ভাব! আসিয়াছিলেন,—গুটিকয়েক হোমিওপ্যাথি শিশি লইয়া ডাক্তারি করিতে। মাটিতে রস ছিল, আর গ্রামে ফেরার সুযোগ হয় নাই। ইদানীং বছর দশেক ব্যবসাটি ছাড়িয়া দিয়াছেন। বসিয়াই থাকেন, ডান পাটা বাতে মাঝে মাঝে কন্‌কন্ করিয়া উঠিলে লাঠি ধরিয়া বারান্দার উপর ধীরে ধীরে পা চালান। চ'খের দৃষ্টি প্রখর। বয়সের গুণে একবার ছানি পড়ে,—তোলার পর দিব্যদৃষ্টি পাইয়াছেন। ছেলেদের পুরস্কার-বিতরণী-সভায় ষোল পাতার সুদীর্ঘ রিপোর্টটি সকলের সম্মুখে ফর্ ফর্ করিয়া পড়িয়া যান। স্থান-কাল ভুলিয়া ছেলেরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসে—বয়স্কদের কর্ণমূল আরক্ত হয়। কিন্তু দোষটা অম্বুধরের নিজের নয়, দোষ তাঁর বার্দ্ধক্যের,—কিছুদিন আগে সবগুলি দাঁতই বৃদ্ধের নির্ম্মূল হইয়াছিল!

অম্বুধর সেক্রেটারি! ইস্কুলটি যাঁদের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত,—তাঁদের কেউ আজ জীবিত নাই। মাইনর এখন উচ্চ-ইংরাজিতে পরিণত! খড়ের আট্‌চালার স্থানে পাকা ইমারত খাড়া হইয়াছে। সম্মুখের খোলা মাঠের একধারে অনেকটা জায়গা অন্ধকার করিয়া যে বুড়া তেঁতুল গাছটি দাঁড়াইয়াছিল, সেটা আর দেখা যায়না! ছেলেরা সকাল সন্ধ্যায় খেলা করে। অম্বুধর অটল,—যুবাবয়সে একদিন যে পদটি তিনি পাইয়াছিলেন,—বার্দ্ধক্যে সেটি প্রাণপণে আঁক্‌ড়িয়া আছেন।

গ্রামের বনেদি জমিদার রতনবাবুর এককালে প্রতাপ ছিল। এখন প্রতাপ নাই—মর্য্যাদা আছে। কিছুদিন আগে অম্বুধরের বার্দ্ধক্য সম্বন্ধে তিনি কাহার কাছে নাকি কি বলিয়াছিলেন,—কথাটা চাপা থাকে নাই। অম্বুধর সরাসরি রতনবাবুর কক্ষে আসিয়া দেখা দিলেন। পুরা অর্দ্ধঘণ্টা উচ্ছ্বাসের পর স্পষ্ট করিয়া বলিলেন,—এই ক'টা দিন যা দেরী, তারপর যা'কে ইচ্ছে ক'রো রতন,—চ'খ খুলেও আর দেখ্‌তে আস্‌ব না। ভূষণ কিন্তু চিনেছিল বুড়োকে··· শুনবে সে কথা?—বলিয়াই সুরু করিলেন,—তোমরা তখন হ'য়েচ কি হওনি, একবার কিড্‌নী সাহেব এলেন ইস্কুল দেখ্‌তে। হেডমাষ্টার কিড্‌নীকে সঙ্গে করে ক্লাশে ঢুক্‌লেন! বিকাশ ইংরাজী পড়াচ্ছিলেন। সাহেবকে দেখে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠ্‌লেন না, যেমন পড়াচ্ছিলেন তেমনি নির্বিকার পড়াতে লাগ্‌লেন। সাহেব রাগে গর্ গর্ করতে করতে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে এলেন। হেড্‌মাষ্টারকে বল্‌লেন, তোমার ইস্কুলের 'এড্' যাতে ওঠে, তাই আমি করচি। হেড্‌মাষ্টার নিরুপায়, বুঝাতে গেলেন, সাহেব কি আর তাই শুনেন। খচ্ খচ্ ক'রে 'ভিজিটার্‌স্ বুকে' এক পাতা লিখে ফেল্‌লেন। দেখ্‌লাম, ইস্কুলটা ত যায়; গুটি গুটি কাছে এসে বল্‌লাম,—ইস্কুল আমাদের উঠুক সা'ব দুঃখ নেই, একবার দয়া ক'রে আমার বাড়ীতে যদি,···সাহেব আমার 'ড্রইং রুমে' দেখা দিলেন। ঘরে ছিল গাছ পাকা মর্ত্তমান,—এঁয়া মোটা আর কাঁচা সোনার রঙ্। এক ছড়া টেবিলে এনে দিতেই সাহেবের চ'খ দুটি উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল। খেয়ে শুধুলেন,—এ কলা এখানকার, বল্‌লাম, হ্যাঁ সাব, আমার বাগানের, মর্জ্জি হ'লে,···আপনার বাসায় আমি···; সাহেব আমাকে ঠিকানা দিয়ে ফের ইস্কুলে এলেন! বইএর যে পাতাটা লিখেছিলেন,—সেটা ছিঁড়ে লিখ্‌লেন :—

The school is nicely managed. The teachers are active and painstaking and

have a keen eye on the boys. The secretary is a loving gentleman. He spares no pains to turn the school into an ideal one.

কি বল্‌ব, পরের বছর 'এড্‌' হ'ল দেড়শ'। বুড়ো না থাক্‌লে কি হ'ত একবার ভাব দেখি বাবাজি।—অম্বুধর হাসিতে লাগিলেন।

রতনবাবু অপ্রতিভ কণ্ঠে বলিলেন,—না না, আপনার যোগ্যতা সম্বন্ধে কারুর সন্দেহ আছে, না থাক্‌তে পারে!

ঘটনাটা বছর দশেকের।

মেহেদি গাছের বেড়ার পাশ দিয়া রাস্তা। ছোট্ট বারান্দা হইতে ঘাড় তুলিলেই ইস্কুলটা চ'খে পড়ে। বেড়া না থাকিলে ইস্কুল আর বারান্দা এক! মাঝে হাত কয়েক ব্যবধান মাত্র!

পুরাণো ইজি চেয়ারটার গা ঢালিয়া দিয়া অম্বুধর কুড়্‌ কুড়্‌ করিয়া গড়গড়া টানেন। বিকালের দিকে সমাগমটা একটু বেশি। প্রথমে আসেন, বিধুবাবু,—তা'র পর রোহিণী পাঠক—আরও দুজন ছোক্‌রা ডাক্তার। সকলের শেষে আসেন হেড্‌মাষ্টার ত্রিলোচন রায়। লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া গাঢ় একটি নমস্কার দিয়া ত্রিলোচন বারান্দায় উঠিতেই অম্বুধর বলেন,—এস আজ যে এত দেরি তোমার?

—হ্যাঁ, একটু হ'য়ে গেল,—বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে একটি সলজ্জ মৃদু হাসিয়া পাশের বেতের চেয়ারটায় তিনি টুপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়েন।

রোহিণী পাঠক আর বিধুবাবু বসেন পাশাপাশি। ডানহাতের দুটি আঙুল দিয়া পাঠকের ঘাড়টা একটু টিপিয়া দিয়া বিধুবাবু ইঙ্গিত করেন,—দেখলে,

—হুঁ, রোজই ত দেখ্‌চি, এ ত আর,...কথাটা শেষ না হইতেই পাঠক মধ্যপথে থামিয়া যান। হেড্‌মাষ্টার চ'খ ফিরাইয়া একদৃষ্টে তাঁহারই দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইয়া আছেন।

ত্রিলোচনের সম্বন্ধে এই ইঙ্গিতটার একটা হেতু আছে। বছর তিনেক পূর্ব্বে এই লোকটির কোন পাত্তা ছিলনা। শুনা যায়, পশ্চিমের একটি ইস্কুলে তিনি হেড্‌মাষ্টারি করিতেন। ছেলেদের সঙ্গে কি একটা বিষয় লইয়া তাঁর গোলমাল হয়। ব্যাপারটা গুরুতর। অবস্থা বুঝিয়া ত্রিলোচন চাকরি ছাড়িয়া রাতারাতি গৃহে ফেরেন। বিধুবাবু রোহিণী পাঠক ও আরও দুই চারি জন ব্যাপারটা লইয়া দিনকয়েক জল্পনা করেন,—কিন্তু ফল হয় নাই...এক অম্বুধরের জন্যই তিনি এত বড় চাকরিটায় বাহাল হইয়া গেলেন।

গড়গড়ার নলে গোটাকয়েক টান দিয়া অম্বুধর খাড়া হইয়া বসিলেন। কানের কাছে কিছুক্ষণ হইতে একটি মশক গুঞ্জন করিতেছিল। অম্বুধর সজোরে একটি তালি দিয়া বলিলেন,—দেখেচ ব্যাটার গুন্‌গুনানি...

কিন্তু মশক-প্রবর নিহত হইল না! একটু উড়িয়া আসিয়া চক্রাকারে তাঁহার মাথার উপর কীর্ত্তন সুরু করিল। ত্রিলোচন সন্তর্পণে উঠিয়া আসিয়া একটি তালি দিলেন। আঘাত অমোঘ!

—রক্ত কি রকম খেয়েচে, দেখুন দেখি একবার,—হাতটা ত্রিলোচন সবারই দিকে ফিরাইলেন।

বিধুবাবুর গুম্ফের পাশে হাসি ফুটিল। রোহিণী পাঠক সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, একটু কাশিতে কাশিতে বলিলেন,—পাঁজিতে এবার উৎপাতটাও লিখ্‌চে বেশি! ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আর কি...

বিধুবাবু গম্ভীর কণ্ঠে সাড়া দিলেন,—দেশ উজাড় হবে।

অম্বুধর হাসিয়া বলিলেন,—আশ্চর্য্য কিছু নয়, তবে সেবারের মত আর হবেনা বিধু।

সবাই উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন। অম্বুধর বলিলেন,—তোমরা তখন হ'য়েচ কি হওনি, আশ্বিনে ম্যালেরিয়া এল। ছেলেবুড়ো বাদ নেই। আমকুশিতে ডাক্তার তখন দু'জন,—আমি আর হরেকেষ্ট। হরেকেষ্টর হাত যশ ছিলনা,—কাজেই যত ডাক আমারই। সকালে একটু জল খেয়ে বেরিয়ে যেতাম। আর ফিরতাম দুটোয়,—পকেটে টাকা ধর্‌ত না। বাড়ি ফিরেও টেবিলের উপর দেখ্‌তাম—টাকার গোছা,....গোণার সময় নেই। সার সার রুগী, হা পিত্যেশ হ'য়ে বসে আছে। শিশিতে কুইনাইন দিয়ে কি কুল আছে, 'ফিল্‌টার ওয়াটারে' কাজ সার্‌তাম। দশ দিনের দিন রুগী সেরে উঠে বক্‌শিস্‌ দিয়ে যেত।

রোহিণী পাঠক বাধা দিলেন,—ওটা হাতের গুণ!

অম্বুধর গদগদ কণ্ঠে বলিলেন,—বল্‌চি কি তবে! তারপর একবার বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—ইস্কুলের পাকা বনিয়াদ হ'ল সেইবার কিনা! দু'শো টাকা দিয়েছিলাম পকেট থেকে, জান্‌ত ভূষণ!

ছোকরা ডাক্তার দু'জন পরস্পরের দিকে তাকাইয়া কিছুক্ষণ মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিলেন।

মজলিস্‌টা জমে ভাল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কমিটির এখনও কাহারও দেখা নাই। তিন কলিকা তামাক পোড়াইয়া অম্বুধর চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কয়েক দিন হইতে একজন নূতন শিক্ষকের নিয়োগ সম্বন্ধে কথা চলিতেছে,—কথাটার মীমাংসা হয় নাই। না হওয়ার কারণ, হেড্‌মাষ্টার ত্রিলোচনের ইহাতে ঘোর আপত্তি। তাঁহার মতে, ইস্কুলের ব্যয় বৃদ্ধি না করিয়া আয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। গতবৎসর পার্শ্ববর্ত্তী ডুগ্‌ডুগির নূতন ইস্কুলে তিনটি ছেলে 'ট্রান্সফার' লইয়াছে, আরও কয়েকজন লইবে বলিয়া গুজব। নূতন শিক্ষক পরে নিযুক্ত হইলেও ক্ষতি নাই।

অম্বুধর বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতেছেন,—হঠাৎ কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিলেন।

—অন্ধকারে যে বসে আছ একা, ব্যথাটা আজ বেড়েচে বুঝি!

ব্যথাটা আর কিছুর নয়, বাতের! খবরটা গৃহিণী ন্যূনকল্পে দিনে তিনবার করিয়া জিজ্ঞাসা করেন।

অম্বুধর উত্তর দিলেন,—হুঁ একটু যেন,···

—জ্যাম্বকটা একটু মালিস কোরো খাওয়ার পর, এখন একবার ওঠ দিকি।

পিছন ফিরিয়া অম্বুধর দেখিলেন,—গৃহিণী একেবারে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন,—হাতে লণ্ঠনের আলো,··· চশমার পুরু দুখানি কাঁচ জল্‌ জল্‌ করিয়া জ্বলিতেছে।

—হ'ল কি বলত।

—আগে ওঠই না, বল্‌ছি পরে।

লাঠি হাতে অম্বুধর ঠুক্‌ ঠুক্‌ করিয়া গৃহিণীর সহিত একেবারে অন্দরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আলো-অন্ধকারে রকের উপর কে একজন দাঁড়াইয়া আছে, মনে হইল। কাছে একটু সরিয়া আসিতেই লোকটি গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—আজ্ঞে আমি নীলমণি!

—নীলু, কি মনে ক'রে?

আজ্ঞে,—কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া নীলমণি অম্বুধর গৃহিণীর মুখের দিকে তাকাইল। গৃহিণী মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন,—বলিলেন—বুঝ্‌তে পারনি এখনও, অজয়ের জন্যে ধরেচে ক'দিন থেকে! আমি বলি, হাত ত ওঁর একার নয়, যে হ'য়ে যাবে, তবে একবার চেষ্টা চরিত্তি ক'রে···তুমি কি বল!

গৃহিণী এই অবধি বলিয়া অম্বুধরের মুখের দিকে তাকাইলেন। অম্বুধর নিশ্চুপ,—কথাটা যেন বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

—অজয় গো অজয়, নীলুর ছেলে। আরও একবার দরখাস্ত ক'রেছিল মাষ্টারির জন্যে, তখন ত খালি ছিলনা; তুমি বল্‌লে পরে দেখ্‌ব তার আর কি,···মনে নেই তোমার?—গৃহিণী একবার কটাক্ষ করিলেন।

অম্বুধর একটু একটু করিয়া ঘরের ভিতর পায়চারি করিতে লাগিলেন। নীলমণি লোকটি পরিচিত। বহুদিন এই ইস্কুলে 'পিওনে'র কার্য্য করিয়া গত বার সে কাজ হইতে অবসর লইয়াছে। পরীক্ষার সময় প্রতিবার সে ছেলেদের সুবিধা করিয়া দিয়া তাহাদের নিকট হইতে কিছু কিছু উপরি পাইত! কয়েক বার সে ধরাও পড়ে,—একমাত্র গৃহিণীর কৃপায় বেচারা রক্ষা পাইয়াছে।

অম্বুধর গম্ভীর কণ্ঠে শুধাইলেন,—চাকরি খালি আছে, কে বল্‌লে তোমাকে?

নীলমণি উত্তর দিল,—আজ্ঞে শুন্‌চি ক'দিন থেকে!···

গৃহিণী তাড়াতাড়ি আলোটা নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন,—না শুনেই বুঝি নীলমণি এসেচে তোমার কাছে; আর তুমি ত নিজেই আমাকে বল্‌লে কাল;—তারপর একটু থামিয়া বলিলেন,—আপত্তি আছে নাকি, আজকাল ত ওসব বিচার দেখিনে বাপু,···ভাল ছেলে, পরীক্ষায় বৃত্তি পেল, পড়্‌তে পার্‌লনা এই যা,...বছর তিনেক পাশ করেচে না নীলু!

—আজ্ঞে তাই,⋯ভুলুবাবু সেই বার,—নীলমণি কথাটা উচ্চারণ করিতে গিয়া থামিয়া গেল! গৃহিণীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল,—তিনি বসিয়া পড়িলেন।

—কি হ'ল মা,

—কিছু নয়!

কিন্তু নীলমণির বুঝিতে দেরি হইল না। তিন বৎসর পূর্ব্বে গৃহিণীর একমাত্র অঞ্চলের নিধি চলিয়া গেছেন। নামটা এ সময়ে মুখে আনিয়া নীলমণি ভাল করে নাই।

অম্বুধর বলিলেন,—আচ্ছা এখন এস নীলু।

গৃহিণী ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিলেন,—আস্‌বে, কিন্তু চাকরিটা অজয়কে দেওয়া চাই। আহা আমার ভুলুর সঙ্গে ভাব কি কম ছিল, কাল একবার অজয়কে পাঠিয়ে দিও নীলমণি!

অম্বুধর কিছু উচ্চারণ করিলেন না। নীলমণি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল!

অপরাহ্ণে দিবানিদ্রা শেষ করিয়া অম্বুধর সেদিন বাগানে ঢুকিলেন। বাগানটা বৈঠকখানা হইতে একটু দূরে। চারিদিকে কাঁটাতারের বেড়া,—মধ্যে আম লিচু কাঁটাল গাছের সারি। দক্ষিণ দিকে দু'টি কাগ্‌জি নেবুর গাছে থোকা থোকা নেবু ধরিয়াছে। বছর কয়েক আগে অম্বুধরের একবার অরুচি হয়। চারা দুইটি কোথা হইতে কিনিয়া আনিয়া সযত্নে রোপণ করেন।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। শীতের সূর্য্যরশ্মি ইস্কুলের পীতাভ দেয়ালের উপর পড়িয়া চিক্ চিক্ করিতেছে। ছেলেদের কলরবটা এখান হইতে স্পষ্ট শোনা যায়। মধ্যে মধ্যে অম্বুধর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কি চাহিয়া দেখেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে একটি ছেলেকে তিনি বাগানের ভিতর দেখিয়াছিলেন,—ছেলেটি তাঁর চ'খের উপর দিয়া পট্ পট্ করিয়া গোটাকয়েক নেবু ছিঁড়িয়া লইয়া অদৃশ্য হইল। শক্ত সমর্থ হইলে অম্বুধর নিশ্চয়ই পিছন লইতেন,—কিন্তু নিরুপায়। একটু পরে ইস্কুলে আসিয়া স্বহস্তে প্রত্যেক ছেলের পকেট খুঁজিয়া ক্ষুণ্ণ মনে অম্বুধর গৃহে ফিরিলেন।

ইস্কুলের পশ্চিমের ঘরে ছোটদের ক্লাশ বসিয়াছে। অম্বুধর দেখিলেন, বোর্ডের উপর একটি চিত্র আঁকাইয়া অজয় ছেলেদের বিদ্যাদান করিতেছে। পৃথিবী গোলাকার,—সমুদ্রে ভাসমান জাহাজের দিকে দৃক্‌পাত করিলে,—তাহা কিরূপে বুঝা যায়,—এই বিষয়টি অজয় বার বার করিয়া বুঝাইতেছে।

একটি শুক্‌না কাঁটাল পাতার উপর পা পড়িতেই মচ্ করিয়া শব্দ হইল। অম্বুধর চম্‌কিয়া উঠিলেন।

—কি করুচেন ওখানে? অম্বুধর দেখিলেন হেড্‌মাষ্টার ত্রিলোচনবাবু তাঁহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

—বাগানটা দেখ্‌তে এসেচি,⋯কটা বাজল তোমার ঘড়িতে?

ত্রিলোচন দাঁড়াইয়াছিলেন ইস্কুল ঘরের আঙিনায়। কাঁটাতারের বেড়ার দিকে আগাইতে আগাইতে হাতঘড়ি দেখিয়া বলিলেন,—আজ্ঞে চারটে দশ।

—বেলা গিয়েচে দেখ্‌চি, ছুটি হ'তে আর দশমিনিট, কি বল।

—হ্যাঁ মিনিট দশেক, বাঃ, নেবুগাছ দুটো বেশ ধরেচে দেখ্‌চি—বলিয়া সপ্রশংস দৃষ্টিতে ত্রিলোচন গাছ দুটির পানে তাকাইয়া রহিলেন।

অম্বুধর একটু সরিয়া আসিয়া বলিলেন,—বর্ষায় দুটো কলম বাঁধ্‌ব ঠিক করেচি, কেমন হ'বে বল দিকি!

—খাসা হবে, বসিয়ে দেবেন দু জায়গায়, মাটি বা সারালো,⋯কিছু দেখ্‌তে হবেনা! হুঁ, আসুন ত একটু কাছে, আসুন তাড়াতাড়ি, শুন্‌তে পাচ্চেন—পাচ্চেন বোধ হয়!

অম্বুধর ত্রিলোচনের মুখের দিকে তাকাইলেন।

—আপনাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বুঝেচেন,⋯খুব 'ক্লেভার' কিনা!

অম্বুধরের চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত হইল। বলিলেন,—অজয়ের কথা বল্‌চ,—জোরে জোরে পড়াচ্চে বুঝি!

ত্রিলোচন ভঙ্গী করিয়া বলিলেন,—আপনি না থাক্‌লে কিন্তু গলার স্বর কেউ শুন্‌তে পেতনা! খাঁটি লোক আর কাকে বলে!

অম্বুধর বুঝিলেন অন্যরূপ! শিক্ষকরা যে এত যত্ন করিয়া পড়ান,—সে ত তাঁহারই জন্য। যোগ্যতা না থাকিলে, অজয়

মাষ্টার হয়ত তাঁর সাড়া পাইয়াও চেয়ারে বসিয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইত। মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—অজয় ত অজয়, কৈলাস মুখুয্যের নাম শুনেচ ত,...সত্তর বছরের বুড়ো। আমাকে দেখে বুড়ো ঠক্ ঠকিয়ে কাঁপ্‌ত। একদিন হ'য়েচে কি, ঘাঁতি মেরে ক্লাশের নীচে এসে দাঁড়িয়েচি, ঘুমে বুড়োর চ'খ দুটো এঁটে আসচে। হঠাৎ দেখি বুড়ো তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে বল্‌চে,···করচিস্ কিরে গণ্‌শা, খুব চালাকি শিখেচ বাবা,···ভাব্‌চ বুঝি, বুড়ো ঢুলচে; কৈলাস মুখুয্যের চ'খে ধুলো দিতে এসেচ তুমি, ভালয় ভালয় একবার 'নীলডাউন' হও দেখি। 'নীলডাউন' কেউ হ'ল কিনা জানিনে, কৈলাসের গলা কিন্তু সপ্তমে উঠ্‌ল,···সে কি পড়ানো,·· ঘরের ভিত অবধি কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল;—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই অম্বুধর হাসিতে লাগিলেন।

ত্রিলোচনও হাসিতে যোগ দিলেন,—কিন্তু আসল ব্যাপারটা আজ চাপা পড়িয়া গেল।

ত্রিলোচনের মাসতুতো ভাইএর নাম কিশোরীশরণ। ছেলেটি ফিট্‌ফাট্‌···কেতাদুরস্ত। স্বগ্রামে 'ডিফেন্সপার্টি'তে যোগ দিয়া একবার একটি ছিঁচ্‌কে চোর ধরিয়া সরকার হইতে নাকি দশটাকা বক্‌শিস্ পায়। একদিন আসিয়া দাদার কাছে পরিচয় দিল,—আমি সব কাজ কর্‌তে পারি দাদা,...জুতো শেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ।···

ত্রিলোচন গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন,—তবে তোমার ভাব্‌না কি, আমার এখানে না থাক্‌লেও দিব্যি তোমার চ'লে যাবে।

কিশোরীশরণ নিরুত্তর, তাঁহার হইয়া যিনি কথা বলিলেন,—তিনি গৃহিণী কনকচাঁপা।

—ভাই কি তোমার একটা বই দুটো, বলি এত যে জমাচ্চ, দুমুটো জোটেনা ওর, হ্যাঁগা।

ত্রিলোচন আপত্তি করার সুযোগ দেখিলেন না,—কিশোরীশরণ টিকিয়া গেল।

মাস তিন-চার পর,—

দ্বিপ্রহরে অম্বুধর বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন,—টেবিলে জ্যাম্বাকের একটি কৌটা।

বাতের ব্যথাটা চড়িয়া উঠিলে অম্বুধর কৌটাটি আলমারি হইতে বাহির করেন। বসিয়া বসিয়া মালিস করিয়া কৌটাটি যথাস্থানে রাখিয়া দেন। আজ এখনও তুলিয়া রাখেন নাই।

—এস, তোমার কথাই ভাব্‌ছিলাম এতক্ষণ।

নিঃশব্দে ত্রিলোচন ঘরের ভিতর ঢুকিলেন। টেবিলের দিকে তাকাইয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন—আজ আবার কি ?···

—হ্যাঁ, বেড়ে গেল হঠাৎ। সকালে ছিলাম ভালই, কিন্তু দুপুরে,...উ-হুঁ-হুঁ, আবার চিড়্ ধর্‌ল ত্রিলোচন, উহুঁহুঁ ;—মুখটা বিকৃত করিয়া অম্বুধর ঘরের একদিক হইতে আর একদিকে আসিয়া থামিয়া গেলেন।

ক্ষিপ্রগতিতে ত্রিলোচন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—নড়্‌বেন না, চুপ ক'রে একটু দাঁড়ান দেখি ;—বলিয়া টেবিলের জ্যাম্বাকের কৌটাটি খুলিয়া খানিকটা অম্বুধরের ডান পায়ের হাঁটুর উপর ঘষিতে লাগিলেন।

—আরাম পাচ্চেন,

—উহুঁ-হুঁ।

—এবার,

—উহুঁ-হুঁ।

ত্রিলোচন প্রাণপণে ডলিতে লাগিলেন।

পথের উপর তপ্ত বাতাস বহিতেছিল। একটা ঘূর্ণি হাওয়ার সঙ্গে কয়েকটা শুক্‌না পাতা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। অম্বুধর বলিলেন,—দোরটা বন্ধ ক'রে এসে ব'স দেখি।

ত্রিলোচন উঠিয়া আসিয়া দরজা বন্ধ করিলেন,—তাঁর কপাল দিয়া দর্ দর্ করিয়া ঘাম ঝরিতেছে।

—তা'রপর এদিকের খবর কি বলত ?—অম্বুধর শুধাইলেন।

—আজ্ঞে কালপরশু আরও জনদশেক,···

—বল কি, অম্বুধরের ললাটের রেখাগুলি কুঞ্চিত হইল,—ট্রান্‌স্‌ফার নিচ্চে দশজন···বল কি ত্রিলোচন ?

—আজ্ঞে দেখ্‌তেই পাবেন ?

আমকুশির বহু পুরাতন ইস্কুলে ভাঙন ধরিয়াছে,—অম্বুধর একটি নিঃশ্বাস ফেলিলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন,—উপায় নেই ত্রিলোচন ?

—আজ্ঞে দেখ্‌চি কই, তবে একটা কথা দিনকয়েক

আগে কানে এসেচে, যদি তাই হয়,…কথাটা বড় মুশ্‌কিলের কিন্তু……

—কি কথা ত্রিলোচন,—

কথাটা অতঃপর ত্রিলোচন যাহা ব্যক্ত করিলেন, সংক্ষেপে এই ;—

আমকুশির পুরাতন ইস্কুলে এতদিন যাঁহারা পড়িয়া আসিতেছেন, তাঁহারা ধনীর ছেলে। সকলেই উচ্চবর্ণ। ধনে মানে কেহই তাঁহারা হীন নন। যাঁহারা তাঁদের শিক্ষকতা করিতেছেন, তাঁহারাও অভিজাত ও উচ্চবর্ণ। কিন্তু, আজ এই সনাতন-রীতির ব্যতিক্রম। অজয় মাষ্টার —হীনবর্ণজাত মৎস্যজীবির পুত্র,—বিশেষ তাঁহার পিতা একদিন এই ইস্কুলে একটি নিকৃষ্টতম চাকুরি করিয়া দিনাতিপাত করিয়াছে, এমতে—

—কথাটা কি সত্যি ত্রিলোচন?—অম্বুধর জিজ্ঞাসা করিলেন।

—ঠিক কিনা জেনে দেখুন, আমি ত নিজের কানে শুনেচি,—একটু হাসিয়া বলিলেন,—কেন বিশ্বাস হয় না আপনার ?

হয় না আবার, তবে অজয় আসার আগেও, গোটা-তিনেক সরেছিল কেমন না ?

ত্রিলোচন হাসিয়া বলিলেন,—তারা যে 'প্রমোশান্' পায়নি, মনে নেই আপনার ?

—ওঃ, হাঁ হাঁ প্রমোশান্ পায়নি বাছাধনবা—অম্বুধর নিরাপদের হাসি হাসিলেন। তা'রপর চেয়ার হইতে উঠিয়া ঘরের এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়া ত্রিলোচনের দিকে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—ঠিক ধরেচ ত্রিলোচন, আমি ভাবি আরও কিছু হবে বা !

ত্রিলোচন একটি গভীর হাসি হাসিলেন !

সপ্তাহ কাটিল না ! দ্বিপ্রহরে অজয় একদিন বিবর্ণমুখে ইস্কুল হইতে ঘরে ফিরিল। প্রকাশ, ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য কমিটি আপাততঃ তাহাকে অবসর দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

কিন্তু আসল ব্যাপারটি একদিন সত্যসত্যই প্রকাশ হইল। মাস-দুই পরে একটি নূতন ছোকরা ইস্কুলে যাতায়াত করিতে লাগিল, ছেলেটির নাম কিশোরীশরণ! ইনি ত্রিলোচনের…

শ্রীকুড়নচন্দ্র সাহা

## বাদল্ বেলা

নীল্ নীলিমা ধুসর শাড়ী জড়িয়ে করে জল্পনা,
বাদল নূপুর শিঞ্জনেতে জাগ্‌লো কবির কল্পনা।
এম্‌নি সে এক মেঘ্‌লা দিনে অমর কবি নির্জ্জনে
গেয়েছিলেন গান বিরহে বরষা-দেয়া-গর্জ্জনে।
কাঁদ্‌ছে মেয়ে বর্‌ষা-মেদুর্—বিরহিনীর কান্না সে,
আঁখির বারি হারিয়ে দেছে মুক্তা হীরা পান্নাকে।
শ্যামল্ ধরা তাথই ত'থই নাচ্‌ছে যেন নর্ত্তকী,
কাঁপ্‌ছে লাজে বাদল্-ভেজা আঁখির চারুবর্ম্ম কী ?
সব্ বিরহী কুর্চ্চি ফুলে পাঠায় বুঝি অর্চ্চনা,
মেঘ্‌দূতেরা প্রিয়ার দ্বারে করছে তারি বর্ণনা।
তুষার-গিরি-শিখর হ'তে সবুজ্ রঙা শষ্পতে
পাত্র ভ'রে আন্‌লো সুধা বর্ষা করুণ বাষ্পতে।
ইন্দ্র বুঝি পারিজাতের ঝরায় করি চুর্ণিত,
ধরায় তারা নাম্‌ছে হ'য়ে বিশ্বপথে ঘূর্ণিত ॥

শ্রীগোপালচন্দ্র বটব্যাল

# পত্রদূতী

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য

মেজ বৌদি' তোমার বল রাখ্‌লে কোথায়
সেই চিঠিব তোড়া ;—
মিছে গম্ভীরতায় আর লাভ কি হবে
যদি নয়ন কোণে হাসি ফুটেই র'বে,
ঢেকে রাখ্‌তে যাওয়া
মানে লজ্জা পাওয়া,
বাজে ঠাট্টা ওসব বুঝি ক'রতে মানা,
আর লুকিয়ে কি কাজ বল, সব ত জানা,
মেজ দাদার চিঠি দেখে চিন্‌তে পারি
খামে হোক্ না মোড়া ;
মেজ বৌদি' তোমার বল রাখ্‌লে কোথায়
সেই চিঠিব তোড়া।

ভাবো তুমিই সজাগ আর আম্‌রা ঘুমাই
সবে চক্ষু বুজি,'
যেন কেবল তুমিই শুধু বুদ্ধিমতী
আর আম্‌রা সবাই মিলে মূর্খ অতি ;
দূর বিদেশ থেকে
দাদা পত্র লেখে,
তা'তে লজ্জা কিসের, অত ছল বা কেন,
ওমা আকাশ থেকে মেয়ে পড়্‌লো যেন,
খামে পত্র এলে বল দুষ্টু মেয়ে
খুসী হওনা বুঝি ?—
ভাবো তুমিই সজাগ আর আম্‌রা ঘুমাই
সবে চক্ষু বুজি'।

রোজ ডাকের সময় এলে তাকাও কেন
ওই পথের পানে,
দূর বিদেশ থেকে কা'রো আস্‌লে চিঠি
চেয়ে 'পিয়ন্' পানে হয় উজল দিঠি,
নির্‌ নিমেষ আঁখি
দেয় কেবল ফাঁকি,
বেণু বনের মত বুকে কাঁপন জাগে,
শেষে দীর্ঘনিশ্বাস চেপে রাখন্‌ লাগে
রোজ পত্র পেতে শুধু-মিথ্যা আশা
সে ত সবাই জানে ;
তবে ডাকের সময় এলে তাকাও কেন
শুধু পথের পানে।

ভাই মনের খুসী শুধু বাহির দিয়েই
কভু যায় না ঢাকা,
আর লুকিয়ে কি লাভ, আয় বদল করি,
দেনা ঠাকুরজামাই কিযে লিখ্‌ল পড়ি,
দূর প্রবাস থেকে
প্রেম সুবাস মেখে
নিয়ে গোপন কথা, দিবা স্বপন যত
আসে প্রিয়ের চিঠি প্রিয়া-মনের মত,
ঠিক দুদিন পরেই চিঠি পাওনা যদি
ঠেকে জীবন ফাঁকা ;—
বিনা পত্রদূতী বল্‌ কেমন ক'রেই
যায় একলা থাকা।

## মালগুঞ্জ্‌—দাদ্‌রা

আসিও প্রিয় ছায়া-ঘন বাদলে।
কেতকী-রেণু নিও মেখে আঁচলে॥
বেদনা মম তারি বুকে—
রাখিবা যাব স্মৃতি সুখে;
শুধায়ো তারে যত কথা বিরলে॥

তোমারি তরে আঁখি-বারি ঝরিবে,
মুকুর রচি' বন-পথে রহিবে।
আমারি ছবি সে-মুকুরে—
হেরিও আসি' বন-পুরে;
সে রবে আঁকা বেদনারি কাজলে॥

কথা :—অজয় ভট্টাচার্য্য এম্, এ

সুর—হিমাংশুকুমার দত্ত, সুরসাগর

স্বরলিপি—জগৎ ঘটক

II । । মগা । গা মা -া I মগা -জ্ঞরা -সরমা । জ্ঞা -া -জ্ঞরসা I
• • আ সি ও • প্রি • • • • • • য় • • •

I সা সরা -সজ্ঞা । -রসা ণ্ধ্া ণ্া I সা গা -মা । মা -গপা -মগমা I
ছা য়া • • • • • ঘ ন বা দ • লে • • • • •

I -া -া গমা । -ধপা মগা মা I মজ্ঞরা -সরা -মপধা । জ্ঞা -া -জ্ঞরসা I
• • আ • • • সি ও প্রি • • • • • • • য় • • •

I সা সরা -সজ্ঞা । -রসা ণ্ধ্া ণ্া I সা গা -মা । মা -গপা -মগমা I
ছা য়া • • • • • ঘ ন বা দ • লে • • • • •

I । । গসা । গা মা -ধা I পধা -পণা -ণণধপা । মা -া -া I
• • কে ত কী • রে • • • • • • • ণু • •

I । । মধা । ধা ণধা -ণপা I পধা -পণা -ণণধপা । মা -া মা I
০ ০ কে ত কী০ ০০ রে০ ০০ ০০০০ পু ০ নি

I মমা -র্সা -ণা । -া ণা ণা I ধপা -ণা -ধপা । পগপমা গা -া I
ও০ ০ ০ ০ মে খে আঁ০ ০ ০০ চ০০ লে ০

I -গমা -পপমা -গমা । -গা -জ্ঞা -রসা । সা সরা -সজ্ঞা । -রসা ণ্ধ্‌া ণ্‌া I
০০ ০০০ ০০ ০ ০ ০০ ছা য়া০ ০০ ০০ ঘ ন

I সা গা -মা । মা -গপা -মগমা II
বা দ ০ লে ০০ ০০০

II মা মা মমা । -ধণর্সা র্সা র্সা I র্সা র্সা নর্সা । -র্গর্রা নর্সা -নর্সা I
যে ম না০ ০০০ ম ম তা রি বু ০০ কে ০০

I র্সনা -র্রর্সা -ণা । ণা ণা ণা I ণধা -র্সণা -ধা । -পা -া -া I
য়া০ ০০ ০ খি য়া খা ব০ ০০ ০ ০ ০ ০

I পধণা -পধা -ণা । -র্রর্সা র্সধা র্সা I র্সণা -া -ধপা । -পধা -পণা -ধপা I
সু০০ ০০ ০ ০০ তি সু খে ০ ০০ ০০ ০০ ০০

I -মগমা -া { ধা । ধা ণধা -ণা I পধা -পণা -ধপা । মগমা -া (-া I
০০০ ০ { ও ধা রো০ ০ তা০ ০০ ০০ রে০ ০ (০

I । । মগা । পমা পগা -া I পসগা -মধা -পণা । -ধপা গ্মা -া I
০ ০ ও০ ধা০ রো ০ তা০ ০০ ০০ ০০ রে ০

I -র্মর্সা -ণা)} মা । মমা -র্সা -ণা I -া ণা ণা I
০ ০)} য ও০ ০ ০ ০ ক থা

I ধপা -ণা -ধপা । পগপমা গা -া I -গমা -পপমা -গমা । -গা -জ্ঞা -রসা I
বি০ ০ ০০ র০০ লে ০ ০০ ০০০ ০০ ০ ০ ০০

I সা সরা -সজ্ঞা । -রসা ণ্ধ্‌া ণ্‌া I সা গা -মা । মা -গপা -মগমা II
ছা য়া০ ০০ ০০ ঘ ন বা দ ০ লে ০০ ০০০

II া া গা । সা রা সন্‌া I -স্‌া ধ্‌া -ণ্‌া । সা গা -া I
০ ০ তো মা রি ত ০ রে ০ আঁ খি ০

I গা -সা গা । -মা পা গা I মা -া -া । -া -া -া I
বা ০ রি ০ ঝ রি বে ০ ০ ০ ০ ০

I া া মা । ধা মা মধা I পধা -ণা -া । -া র্সা র্রা I
০ ০ মু কু র র চি ০ ০ ০ ব ন

I র্সধা -া -ণধপা । মগমা -া পধা I পধা -া -ণধপা । মগমা -া -া I
প ০ ০০০ থে০ ০ র০ হি ০ ০০০ বে০ ০ ০

I মা মা মমা । -ধণর্সা র্সা র্সা I র্সা র্সা নর্সা । -র্গর্রা নর্সা -নর্সা I
আ মা রি০ ০০০ ছ বি সে মু কু ০০ রে ০০

I র্সনা -র্রর্সা -ণা । ণা ণা ণা I ণধা -র্সণা -ধা । -পা -া -া I
হে০ ০০ ০ রি ও আ সি০ ০০ ০ ০ ০ ০

I পধণা -পধা -ণা । -র্রর্সা র্সধা র্সা I ধণা -া -ধপা । -পধা -পণা -ধপা I
ব০০ ০০ ০ ০০ ন পু রে ০ ০০ ০০ ০০ ০০

I -মগমা -া { ধা । ধা ণধা -ণা I পধা -পণা -ধপা । মগমা -া ( -া I
০০০ ০ { সে র বে০ ০ আঁ০ ০০ ০০ কা০ ০ ( ০

I া া মগা । পমা পগা -া I পসগা -মধা -পণা । -ধপা পমা -া I
০ ০ সে০ র০ বে ০ আঁ০ ০০ ০০ ০০ কা ০

I -নর্সা -ণা ) } মা । মমা -র্সা -ণা I -া ণা ণা I
০ ০ ) } বে দ০ ০ ০ ০ না রি

I ধপা -ণা -ধপা । পগপমা গা -া I -গমা -পপমা -গমা । -গা -জ্ঞা -রসা I
কা০ ০ ০০ জ০০ লে ০ ০০ ০০০ ০০ ০ ০ ০০

I সা সরা -সজ্ঞা । -রসা পধ্‌া ণ্‌া I সা গা -মা । মা -গপা -মগমা II II
ছা য়া০ ০০ ০০ য ন বা দ ০ লে ০০ ০০০

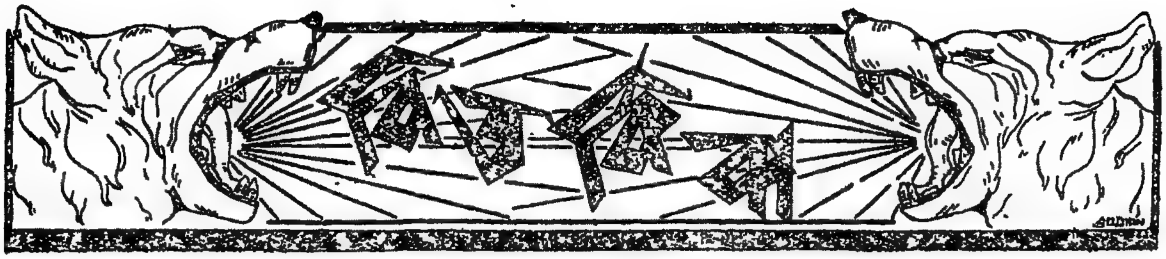

## ১। ছন্দের গঠন সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন

### শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, এম-এ

ঐ তোমার দৃষ্টিখানি যে মধুর বার্ত্তা আনি'
উঠত্ গো মোর বুকে বেজে,
তোমার ঐ হৃদয় জুড়ে যে প্রেম সদাই স্ফুরে,
হায় প্রিয়ে, আজকে কোথা সে যে ?
যে-জীবন একটু আগে আমার স্পর্শ মাগে
এখন সে কি মিথ্যা হ'য়ে গেল ?
যে বাহুর মাল্যখানি গলায় পরালে, রাণী,
এখন কেন তাও খুলে ফেল ?
বেদনায় হায়রে আজি হৃদয়ের তন্ত্রীরাজি
ক্ষণে ক্ষণে উঠ্‌ছে কেঁপে কেঁপে,
যেথা চাই দিকে দিকে দেখি শুধু হায় আজিকে
ব্যথায় যেন বিশ্ব যায় ছেপে।
তোমার আর আমার মাঝে সুগম্ভীর সুরে বাজে
বিদায়ের সকরুণ গীতি,
দু'দিনের তরেই বুঝি ব্যর্থতার সঙ্গে যুঝি'
যায় রে নিভে মানবের প্রীতি।

আবার তোমার ঐ দৃষ্টিখানি প্রিয়ে
রাখ মোর মুখে,
তোমার ঐ চিত্তখানি মোর চিত্তে দিয়ে
বুক রাখ বুকে।
তোমার ঐ চেতনাখানি নিত্য রাখ জেলে
স্নিগ্ধ অনিমিখ,
তোমার সে পরশসুধা দাও পুনঃ ঢেলে
পূর্ণ কর দিক্।

তথ্য হিসেবে এ উক্তিগুলো মিথ্যে। কাব্য হিসেবে এ রচনাটি মূল্যহীন। এ পংক্তিগুলো রচনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ছন্দের গঠন-তত্ত্ব নিয়ে পরীক্ষা করা এবং ছন্দো-রসিকদের অভিমত জানা। উক্ত রচনাটিতে ছন্দোগত কোনো দোষ আছে কিনা এবং যদি থাকে তবে তাকে দোষ বলা যাবে কেন, বিচিত্রার পাঠকরা যদি এ প্রশ্নের আলোচনা করেন তা'হলে অনুগৃহীত হব।

## ২। "বাঙ্গালা—বাঙ্গলা—বাঙলা—বাংগলা, না বাংলা ?

### শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, এম্-এ

"বাঙ্গালা" বানানের এই স্বেচ্ছাচারিতার যুগে 'বিচিত্রা'র একজন পাঠকের যে এ-সম্বন্ধে প্রকৃত সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্তি হয়েছে তা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হ'তে হয়। যে প্রশ্ন তিনি উত্থাপন ক'রেছেন নিতান্ত সহজভাবে অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করে তা'র জবাব দেওয়া সহজ হবেনা। আলোচনাটি ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) মূলক। অতএব এ সমস্ত ব্যাপারে যাঁরা গভীর ভাবে আলোচনা করে থাকেন তাঁদের বহুশ্রমলব্ধ বিচার ফল উপস্থাপিত ক'লে সাধারণের কাছে বিষয়টা নিতান্তই নীরস বলে মনে হবে। তবু যতদূর সম্ভব সহজ ক'রে প্রশ্নটার জবাব দেওয়া যাক্।

'বঙ্গ' দেশ সম্পর্কিত ভাষা ব'লে 'বঙ্গ' শব্দের সহিত

'আল' প্রত্যয় যুক্ত হ'য়েছে। তা' থেকে 'বঙ্গাল' শব্দের সৃষ্টি হ'ল। এই শব্দটাকে একটু জোর দিয়ে উচ্চারণ করবার জন্যে ইহার শেষে স্বার্থে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হ'য়ে শব্দটা দাঁড়াল, 'বঙ্গালা'। মধ্যযুগের মুসলমান-সাহিত্যে অর্থাৎ আরবী, পারসীতে এর এমনি বানান চল্‌তি ছিল। তারপর বাঙ্গালা উচ্চারণের ধ্বনি-সামঞ্জস্যের রীতি অনুসারে (Law of Assimilation) 'বঙ্গালা' শব্দটি 'বাঙ্গালা'য় পরিণত হ'ল। তা' থেকে সাধুভাষায় 'বাঙ্গালা'ই চলে আস্‌ছে। এবং সাধু এবং শুদ্ধ বাংলায় এর এই বানান আজও চলা উচিত। 'বাঙ্গালা' ভাষা, কিম্বা 'বাঙ্গালা' দেশ এ' দুয়ে কোন তফাৎ হবার কারণ নেই।

খাঁটি 'তদ্ভব' অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ যেমন স্থানকালভেদে উচ্চারণের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন কথ্য প্রাদেশিকতার সৃষ্টি করে, 'বাঙ্গালা' শব্দটিও এর আদি উদ্ভব কাল থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন রূপ-পরিগ্রহ ক'রে আস্‌ছে। বানান সবগুলোই যে উচ্চারণমূলক তা' বলা যায় না। তা' হ'লে ব্যাপারটাকে একটু ক্ষমার চক্ষে দেখা যেত। কারণ আজকাল উচ্চারণমূলক বানানের দিকে লোকের একটা ঝোঁক পড়েছে। 'বাঙ্গালা'র পর এর আর যতগুলো বানান চল্‌তি আছে সবগুলোই মূল 'বাঙ্গালা'র পরবর্ত্তী ধ্বনিবিকৃতি মাত্র। (Necessary phonetic change) যেমন :—

'বাঙ্গলা' উচ্চারণ হয় 'বাঙ্গ্‌লা'। আদিস্বর দীর্ঘ থাকায় পরবর্ত্তী বর্ণের স্বর লোপ পেয়েছে এবং ধ্বনিতত্ত্বের স্বাভাবিক নিয়মের এতে কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। তারপর,

'বাঙলা',—'ঙ' কিম্বা 'ঞ' অনুনাসিকের বাঙ্গালায় কোন স্বাধীন উচ্চারণ নেই। 'ঞ'র স্বাধীন মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথিকারেরা তাকে বানানে ব্যবহার ক'রেছেন। কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালা বানান থেকে তা' লুপ্ত হ'য়ে গেছে। 'ঙ'র প্রাচীন বানানে বিশেষ স্থান না থাকলেও আধুনিকতার আওতায় প'ড়ে তার নবজন্ম পরিগ্রহ হয়েছে। সেই জন্যই 'রঙ্‌মহল', 'রঙ্‌খেলা' ইত্যাদি। 'ঙ' কিম্বা 'ঞ'র উচ্চারণ তত্তৎবর্গের ব্যঞ্জনের যুক্ত-উচ্চারণ সাপেক্ষ। যথা, 'বাঙ্গালা'র 'ব+আ+ঙ্‌+গ+ল+আ' এই স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণগুলো আছে। 'ক' বর্গের 'গ'র সঙ্গে কবর্গেরই অনুনাসিক 'ঙ' যুক্ত হ'য়েছে। অতএব 'বাঙলা' লিখে যদি 'গ' কেই লুপ্ত ক'রে দিই তা' হ'লে 'ঙ্‌' কে বাঁচিয়ে রাখার কোন যুক্তিই থাকতে পারেনা। অতএব 'বাঙলা' বানানটি ভ্রমাত্মক।

এবার 'বাংগলা'র কথা বলব। অবশ্য এরকম বানান বাঙ্গালায় খুব সচরাচর চোখে পড়ে না। তবে এ' বানানটি 'বাঙ্গালা'র উচ্চারণগত রূপান্তর মাত্র। তারপর 'বাংলা' সম্বন্ধে বল্‌তে হয়। এ' বানানটি চলিত বাঙ্গালায় (Standard Colloquial) বিশেষ প্রচলিত। অনুস্বার অনুচ্চারণটি 'ঙ' অর্থাৎ 'ঙ'+'গ'র উচ্চারণগত স্বাভাবিক রূপ-বিকৃতি। যেমন 'হংস', 'সিংহ'। এ সমস্ত অনুনাসিকের মধ্যে 'গ'র উচ্চারণ সংশ্রব আছে। অতএব চল্‌তি বাঙ্গালায় 'বাংলা' নিতান্ত ভ্রমাত্মক বলা যেতে পারেনা।

অতএব এই মীমাংসায় পৌছান গেল যে, সাধুভাষায় (Literary Dialect) 'বাঙ্গালা'ই একমাত্র ব্যবহার্য্য কিন্তু চল্‌তি বাঙ্গালায় (Standard Colloquial) 'বাংলা' লিখ্‌লেও ভুল হ'বে না। কিন্তু তাই ব'লে এছাড়া এর উপর অন্য কোন উপদ্রব সহ্য হবে না।

## ২ ক। বাঙ্গালা—বাঙ্গলা—বাঙলা—বাংগলা, না বাংলা?

### শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

আষাঢ়ের 'বিচিত্রায়' কথা উঠিয়াছে, 'বাঙ্গালা' 'বাঙ্গলা' 'বাঙলা' 'বাংলা' প্রভৃতির মধ্যে কোনটি শুদ্ধ?

আজকালকার সাময়িক পত্র সমূহে সচরাচর উপরোক্ত চারিটি শব্দেরই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তবে 'বাঙলা'র ব্যবহার একটু কম; 'বাংগলা' এই কথার ব্যবহার কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

সাধারণতঃ 'বাংলা' ব্যবহৃত হয় ভাষা বা সাহিত্য সম্পর্কে; এবং 'বাঙ্গালা' ও বাঙ্গলা দেশ ও জাতি সম্পর্কে

অবশ্য বিপরীত ব্যবহারও দেখা যায়। আষাঢ় মাসের 'বিচিত্রাতেই' দেখিতে পাই, 'নানাকথা' প্রসঙ্গে ( পৃঃ ৮৪৩—প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন ) একই অনুচ্ছেদে বিভিন্ন পংক্তিতে কথাটিকে বিভিন্নরূপে বানান করা হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে শুদ্ধ হইতেছে 'বাঙ্গলা'। 'বাঙ্গালা' এই কথার মাঝের আকারটি একেবারে অতিরিক্ত। তারপর 'বাংলা' ও 'বাঙলা' এই শব্দ দুইটি সম্পূর্ণ ভুল। কেন না আসল ও মূলগত কথাটি হইতেছে 'বঙ্গ';—বং বা বঙ নহে। 'বঙ্গ' হইতেই 'বাঙ্গলা' এই শব্দের উৎপত্তি।

আজকালকার সাময়িক পত্রের লেখকগণই 'বাঙ্গলা'র এবম্বিধ রূপান্তর ঘটাইয়াছেন। এই ভাবে যদৃচ্ছা বানান লিখিয়া শব্দটিকে বিকৃত করার তাৎপর্য্য বা সার্থকতা কোথায়?

## ২খ। বাঙ্গালা—বাঙ্গলা—বাঙলা—বাংগলা, না বাংলা?

### শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীকানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায় 'বাঙ্গালা' শব্দের বানানের যে সমস্যা উত্থাপন করেছেন তার সমাধান একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

( ১ )

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশ্ন হচ্ছে শব্দটী বাঙ্গালা—বাঙ্গলা—বাঙলা—বাংগলা—না বাংলা?

শব্দগুলির উৎপত্তি অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় এগুলি একটী মূল শব্দ "বঙ্গ" হইতে উৎপন্ন এবং এই বঙ্গ শব্দের বানান সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ উঠিতে পারে না, কারণ শব্দটী অতি প্রাচীন। বেদ হইতে মহাভারত পর্য্যন্ত বঙ্গ শব্দটী বিশেষ সুপরিচিত। মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় ক্ষত্রিয়রাজ বলির পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে পাঁচটী ক্ষেত্রজ তনয় উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চ পুত্রের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও তাঁহাদের নামানুসারে এক একটী দেশ বিখ্যাত (মহাভারত আদি ১০৪।৫০) মহাভারতকার ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই শব্দটীর ইতিহাস মহাভারতের আরও পূর্ব্বে পাওয়া যায় কারণ ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে (২।১।১) বঙ্গ শব্দের নাম পাই এবং ইহাতেই বঙ্গ শব্দ হইতে বঙ্গা শব্দের উল্লেখ আছে। ভাষ্যকারেরা এই বঙ্গ শব্দের অর্থ বঙ্গবাসিগণ বলিয়া স্থির করেন। টীকাকার সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ও তাঁহার ত্রয়ী টীকায় "বঙ্গা"—বঙ্গদেশীয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেশ ও ভাষা অর্থে বঙ্গ বা বঙ্গা শব্দের উত্তর আল প্রত্যয় করিয়া বঙ্গাল শব্দের উৎপত্তি।

আবুল ফজলকৃত আইন-ই-আকবরী নামক মুসলমান ইতিহাসে "বঙ্গাল" শব্দের একটী ব্যুৎপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে প্রাচীনকালে এই জনপদ (বাঙ্গলাদেশ) বঙ্গ নামে উল্লিখিত হইত। বঙ্গের পূর্ব্বতন হিন্দুরাজগণ পর্ব্বতপাদমূলস্থ নিম্নভূমিতে মৃত্তিকার বাঁধ বা আল দিতেন। বাঙ্গালার বহুস্থানে উক্ত রাজন্যবর্গের বিনির্ম্মিত ঐরূপ বহুশত আল বিদ্যমান দেখিয়া আলযুক্ত বঙ্গ অর্থে "বঙ্গাল" নামকরণ হইয়াছে। ( বিশ্বকোষ :৮৮ )

এই বঙ্গাল শব্দের উল্লেখ বহু প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। যথা—

১। বাঙ্গালা দেশ অর্থে খৃঃ ১১শ শতকে উৎকীর্ণ রাজেন্দ্র চোলের শিলালিপিতে এই শব্দের "বঙ্গাল" নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়।

২। সুপ্রসিদ্ধ কবি হাফিজের ( ১৩৫০ খৃঃ ) কবিতায় 'বঙ্গাল' শব্দের দ্বারা বাঙ্গালার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

যাহা হউক বঙ্গাল শব্দের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমরা এখন নিঃসন্দেহ হইতে পারি। এই বঙ্গাল শব্দে ফারসী প্রত্যয় অহ বা আ যোগে দেশের ফারসী নাম বঙ্গালাহ, বঙ্গালা শব্দের উৎপত্তি ( ১৩৪৫ খৃঃ—ইবন বতুতা, বঙ্গালা বা বঙ্গালা রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তারপর মধ্যযুগের বঙ্গভাষায় "বাঙ্গালা" রূপ প্রবর্ত্তিত হয়। এবং অধুনা এই বাঙ্গালা শব্দটী সাধুভাষায় চলতি হইয়াছে ( ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা—ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় )

উপরিধৃত প্রমাণাদির বলে বঙ্গ শব্দ এবং তজ্জাত বাঙ্গালা শব্দ যে কত প্রাচীন, এবং ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া ইহা যে বতদূর শুদ্ধ তাহার পরিচয় আর বোধ করি আবশ্যক হইবে না, এবং ইহা হইতে আমরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশ অর্থে "বাঙ্গালা" শব্দ সাধুভাষায় ব্যবহার করিতে পারি।

(২)

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে বাঙ্গলা শব্দের বানান লইয়া। ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে মধ্যযুগের বঙ্গভাষায় বাঙ্গালা শব্দ হইতে আধুনিক বাঙ্‌লা ও বাঙ্‌লা শব্দের উৎপত্তি। বাঙ্গলা শব্দের আদ্যক্ষরে স্বরাঘাত বলিষ্ঠ হওয়ায় মধ্যবর্ত্তী অক্ষরে স্বরাঘাত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ফলে অক্ষর নিহিত স্বরধ্বনি আকারের লোপ হইয়া বাঙ্গালা শব্দ হইতে বাঙ্‌লা শব্দ দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু বিজয়রত্ন মহাশয় বলেন খৃঃ পূঃ সপ্তম শতকেও বঙ্গ ও বাঙ্গালা এই দুই শব্দের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। খৃঃ পূঃ সপ্তম শতকে বঙ্গদেশবাসী এক অতি সাহসসম্পন্ন বীর যুবক সুদূর আনাম রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল লাক-লম্ (Lucklom)। উক্ত লাকলম্ এবং তাঁহার অনুচরবর্গ ভারতবর্ষের যে প্রদেশের অধিবাসী তাহার নাম ছিল বঙ্‌লঙ্ (Bonglong) উক্ত বঙ্গলঙ্ শব্দ হইতে "বাঙ্গালা" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। আনাম দেশীয় প্রাচীন ব্যাকরণাদিতে "লা" নামক একটী অনার্য্য ব্যবহৃত প্রত্যয় ছিল। বঙ্গগণ অর্থাৎ ঐ বঙ্গদেশীয়গণ নাগবংশীয় সুতরাং অনার্য্য ছিলেন তাই খুব সম্ভব ঐ বঙ্গ শব্দে 'লা' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া বাঙ্‌লা এবং পরে বাঙ্গালা শব্দ গঠিত হয়। সুতরাং কেবল বঙ্, বা বঙ্গ শব্দ নহে বাঙ্গলা শব্দও অতি প্রাচীন এবং খৃষ্টপূর্ব্ব সাতশত শতকেও ঐ শব্দের অস্তিত্ব পাওয়া যাইতেছে। (ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বসুমতী ১৩৪০)

(৩)

তৃতীয়তঃ বাঙলা শব্দের বানান লইয়া দেখা যায় "ঙ্গ" এর উচ্চারণ দুই প্রকার—১। ঙগ ২। গ; এবং ঙগ হইতে গ এর লোপে মাত্র ঙর অবস্থান হইয়া বাঙলা হইয়াছে। বাঙ্গলা > বাঙ্‌লা > বাঙ্‌লা। বাঙ্গালা কেবল সাধুভাষায়, বাঙ্‌লা সাধু ও চলতি ভাষায় এবং বাঙলা কেবল চলতি ভাষায় চলে। এই তিনটী বানান সম্বন্ধে কোনও কথা উঠিতে পারে না। (Re :—সুনীতি চট্টো)

(৪)

চতুর্থতঃ "বাংগলা" শব্দের বানান আলোচনা করিলে দেখা যায় যে এই শব্দটী বঙ্গভাষার অন্তর্গত নহে। ইহা আমাদের বাঙ্গালা শব্দের হিন্দিরূপ কাজেই ইহা আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তারপর প্রশ্ন উঠিতেছে বাংলা শব্দ লইয়া। বাংলা শব্দটী শ্রদ্ধেয় সুনীতিবাবুর মতে অশুদ্ধ কারণ প্রাদেশিক দোষে পূর্ব্বোক্ত বাঙলা শব্দের ঙ স্থলে ং আসিয়া আমাদের বাঙলাকে বাংলায় দাঁড় করাইয়াছে। এস্থলে ইহাকে সাহিত্যের মধ্যে স্থান দেওয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ থাকিতে পারে।

(৫)

যাহা হউক "বঙ্গ" শব্দজাত এই কয়টী শব্দের উৎপত্তি এবং ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করিয়া দেখা যায় যে বাঙগলা এবং বাংলা শব্দ দুইটী অনায়াসে বাদ দেওয়া চলে। তারপর বাঙ্গালা, বাঙ্‌লা ও বাঙলা এই তিনটী শব্দের মধ্য হইতে আমাদের ব্যবহারের জন্য কোনটী গ্রহণ করা যাইতে পারে এইটাই হইতেছে এখন প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে প্রথমতঃ শব্দটী এমন হওয়া চাই যে বঙ্গজাতি, ভাষা ও দেশ একই এই তিনটী বুঝাইতে উহা সক্ষম হয়। এই দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে বাঙ্গালা শব্দের স্থান সর্ব্ব উচ্চে কারণ বাঙ্গালা দেশ, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতি বলিতে উক্ত শব্দটীর ব্যবহার চলে তাছাড়া ইহা সাধুভাষার অনুমোদিত। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে এইটুকু বলা চলে যে ব্যবহারে ইহা একটু শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে এবং লিখন পক্ষেও বিশেষ জটিল বলিয়া মনে হয়। এই হিসাবে বাঙ্‌লা শব্দ স্থান পাইতে পারে না; কারণ বাঙ্গালা জাতি বুঝাইতে "ঙ্গ" এ আকার আনিতে হয় এবং তাহাতে বাঙ্গালা শব্দ আসিয়া পড়ে। বাঙলা শব্দটী সর্ব্ব দিক দিয়া যুক্তিসঙ্গত। প্রথমতঃ ইহা ব্যাকরণশুদ্ধ অথচ শ্রুতিকটু নহে এবং লিখন ব্যাপারে তত জটিলতা আসেনা; তাছাড়া বাঙ্গালী জাতি অর্থে ব্যবহারে শব্দের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটেনা। ডাঃ সুনীতিবাবু ত উহাকে চলতি ভাষায় চালাইয়া লইয়াছেন। আমার মনে হয় উহাকে সাধুভাষায় চালাইয়া লইলে বঙ্গজাতি, দেশ ও ভাষা শব্দের বানান-সমস্যা হইতে রেহাই পাওয়া যায়।

## ৩। বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক

### শ্রীজ্যোৎস্নাময় সরকার

গত কয়েক মাস ধরে বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক কি? এবং কি হওয়া দরকার তাই নিয়ে বিচিত্রা—'বিতর্কিকা' তে অনেকে অনেক আলোচনা করেছেন এবং সবাই নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। রাজবন্দীদের বিচিত্রা পড়বার অনুমতি আছে। আমরাও আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত articles গুলো পড়ে' আলোচনা করেছি, নিজেদের ভেতর।

গত চৈত্রের সংখ্যায় যে ৩ জন ভদ্রলোক 'বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক' সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন তাঁ'দের মন্তব্য সম্বন্ধেই আজ লিখব। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে আলোচনা করেছেন—সেটা আমরা চৈত্রের সংখ্যা হাতে পাবার বহুপূর্ব্বেই ভেবে রেখেছিলাম। তিনি যে দুই রকম পোষাকের কথা suggest করেছেন।

যথা—(১) উৎসবের বেশ—ধুতি (মালকোঁচা), পাঞ্জাবী এবং চাদর।

(২) পরিশ্রম-সাধ্য কাজের উপযোগী বেশ—আটহাত ধুতি এবং নিমা।

১ নং সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে ধুতি আমরা সুদূর অতীত থেকেই ব্যবহার করে আস্‌ছি—এটা আমাদের নিজস্ব পোষাক।

পাঞ্জাবী সম্বন্ধে আমার বলবার এই যে, মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে বোধ হয় বাঙ্গলা দেশে পাঞ্জাবীর প্রচলন ছিল না। এমন কি এক শতাব্দীর পূর্ব্বেও আমাদের দেশের লোক সাদা পাড় ধুতি, কাঁধে চাদর, গলায় পৈতা এবং পান চিবাইতে চিবাইতেই বোধ হয় সান্ধ্য ভ্রমণে কিংবা মজলিসে বাহির হ'তেন।

যাক্ মুসলমানদের কাছ থেকেই ধার করে হোক কিংবা যেখান থেকেই হোক যখন একবার চল্ হয়ে গেছে তখন এটা থাক। শ্রদ্ধেয় গাঙ্গুলি মহাশয় (শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) অনাবশ্যক বলে চাদর বাতিল করতে বলেছেন—আমার মতে চাদরকে বাতিল করলে চলবে না। এ বিষয়ে আমি শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মৌলিক মহাশয়ের সঙ্গে একমত। তিনি এ বিষয়ে চৈত্রের সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

২নং সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে প্রত্যেক জাতিরই—বিশেষতঃ martial race দের war time এর জন্য এক রকম পোষাক ব্যবহার করেন এবং অন্য সময় নিজেদের জাতীয় পোষাক পরিধান করেন। যেমন ইংরাজরা খাঁকি হাফ্‌প্যেন্ট, হাফ্‌সার্ট, বুট, পটি ইত্যাদি war time এ ব্যবহার করেন। কারণ এ সমস্তগুলির combination এ প্রত্যেকের ভেতর একটা martial spirit জেগে ওঠে। এ সম্বন্ধে প্রত্যেক সুসভ্য দেশেই আলোচনা হচ্ছে। কেউ বলছে খাঁকি রং না হয়ে লাল রং হোক, কেউ বলছে কালো, সাদা ইত্যাদি। আমাদের দেশেও war time এর জন্য এক রকম পোষাক ছিল যদিও সেটা ধুতির ভিতরই সীমাবদ্ধ। এখনও আমাদের দেশের নমঃশূদ্র ইত্যাদি শ্রেণীর লাঠিয়ালেরা লাঠি খেলিবার সময় সেই রকম ভাবে কাপড় পরিয়া নেয়। সুতরাং শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে ৮ হাত ধুতি এবং নিমার কোনও দরকার হয় না।

প্রত্যেক সভ্য জাতিই যেমন তাহাদের জাতীয় পোষাক পরে মনে আনন্দ পায় আমার ধারণা বাঙ্গালীও সেই রকম ধুতি, পাঞ্জাবী এবং চাঁদর ব্যবহার করে উৎসবে কি ভ্রমণে আনন্দ এবং তৃপ্তি পায়। সুতরাং এই পোষাক বাদ দিয়ে নূতন কিছু চালাতে গেলেই সেখানে গলদ আসবে এবং সেটা বেশীদিন স্থায়ী হবে না।

আর পরিশ্রম-সাধ্য কাজের উপযোগী এবং war time এর পোষাক যাহা ছিল এবং এখনও যাহা নমঃশূদ্র লাঠিয়ালদের ভেতর প্রচলিত আছে সেটাই থাক। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস মহাশয় তাঁহার 'ব্রতচারী' সঙ্ঘের নৃত্যের সময় যে ভাবে ধুতির ব্যবহার করেন সেটাও আমরা গ্রহণ করতে পারি। সর্ব্বশেষে শিরস্ত্রাণ সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে শিরস্ত্রাণ কি স্বাস্থ্যের জন্য কি উৎসবের পোষাক হিসাবে কিছুতেই আমাদের আবশ্যক হয়না সুতরাং এ বিষয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না।

## ৪। নামের পদবী

### শ্রীমতী নির্ম্মাল্য রায়

মহিলাদের নামের পদবী ও সম্বোধনের রীতি নিয়ে এক সমস্যা উঠেছে। মীমাংসা হয়তো সহজে হ'বে না, তবুও এ নিয়ে বিতর্কিকাতে যে আলোচনা হচ্ছে তার থেকে একটা সুরাহা হ'তেও পারে। অন্ততঃ এ আলোচনায় লোকের মতামত জেনে তার থেকে একটা বেছে নিয়ে প্রয়োগ করলে সেটা সমাজে চলে যেতেও পারে। চামার, চণ্ডাল, মুচি, মেথরের বদলে আমরা যেমন সহজে হরিজন মেনে নিয়েছি এতেই প্রমাণ হয় যে অন্যান্য সম্বোধনে নূতন কিছু চালিয়ে নেওয়াও খুব অসম্ভব হবেনা। রবিবাবুর মত দেশ-পূজ্য কেউ এ বিষয়ে কিছু নির্দ্দেশ দিলে সেটা বোধ হয় অনেকেই মেনে নেবেন। তাঁর এবং শরৎবাবুর উপন্যাসে সবাই আগ্রহ করে পড়েন, তাঁরা যদি তাঁদের উপন্যাসে সম্বোধন নিয়ে কিছু চালাতে পারেন তবে হয়তো সেটা সমাজে চালিত হয়ে যাবে।

আষাঢ় সংখ্যার বিতর্কিকাতে শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ অপরিচিতাদের "মা" বলে সম্বোধন করবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এটা একটু অস্বাভাবিক ও অসম্ভব হয়ে পড়ে। দেশের ছেলেরা এটা মেনেও নেবেন না। লেখক নিজেই আশঙ্কা করেছেন যে "আধুনিক যুবকেরা অপরিচিতা-দের "মা" বলে সম্বোধন করতে রাজী হবেন, মনে হয়না।"

তাঁহার আশঙ্কা ভিত্তিহীন নয় কিন্তু শুধু আধুনিক কেন কোন যুগের যুবকেরাই প্রায় সমবয়স্ক অথবা বয়সে কিছু ছোট মেয়েদের "মা" বলতে রাজী হন নাই, হ'বেনও না।"

এ কথা অস্বীকার করা যায়না যে যুবকমাত্রেরই অপরিচিতা নারী দর্শনে মাতৃভাব মনে জেগে ওঠে না। সম্বোধনের রীতির জন্য সম্পর্ক নিয়ে এতটা হস্তক্ষেপ করা ঠিক হ'বে না। লেখক বলেছেন "তাঁরা হয়তো বলবেন যেখানে মাতৃভাব মনে জাগে না সেখানে "মা" বলে ডাকা যেতে পারে কেমন করে? অপরিচিতা তরুণীর প্রতি আধুনিক যুবকের কি ভাব জাগতে পারে সে বিষয়ে আমি যখন কিছুই জানিনা তখন কি বলে সম্বোধন করলে যে তাঁদের মনোমত হ'বে তাও আমি বলতে অপারগ।"

"এখনও শাড়ীর আঁচল বা এলোখোঁপা দেখলে আমাদের মধ্যে অনেকেই একটু চঞ্চল হবে ওঠেন।··· এখনও আমাদের ইচ্ছা হয় মেয়েদের সামনে এমন ব্যবহার করতে যাতে তাদের চোখে আমাদের ভাল লাগে।" লেখকের এ দুটী উক্তির মধ্যে সবিশেষ সামঞ্জস্য নেই। যাই হোক্ তাঁর উদ্দেশ্য যে সাধু সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই এবং তিনি যে মেয়েদের গভীর শ্রদ্ধাসূচক সম্বোধন করতে চান তাতে আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আমার যতদূর মনে হয় "মা" সম্বোধন চলবে না। আমার ধারণা "মা"র চেয়ে বন্ধু ও ভগিনী সম্পর্কই মেয়েদের সঙ্গে থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু বন্ধু ও বোন অথবা ভগিনী বলে ডাকা একটু কেমন যেন ঠেকে। অর্থাৎ ডাকবার পক্ষে তেমন সহজ নয়। ইংরেজীতে বোনকে Sister ও হিন্দীতে বন্ধুকে দোস্ত বলে ডাকা যায়। এ কথা দুটো বেশ মিষ্টিও। বাংলাতে এ ধরণের কোন শব্দ চল করা যায় না? আরও একটী কথা আমার মনে হল সেটী "শ্রীমতী"। শ্রীমতী বলে কি কাউকে ডাকা যায় না? মাতৃ সম্বোধনে শ্রদ্ধা আছে মানি কিন্তু এতেই কি অশ্রদ্ধার লেশমাত্র চিহ্ন আছে? কখনই নয়। শ্রদ্ধা আছে, উপরন্তু বেশ একটু শ্রীও আছে।

পরিচিতা, অল্পপরিচিতাদের Miss Sen, Mrs Bose ইত্যাদি ব্যবহার করা কি খুব দোষাবহ। হ'লই বা ইংরেজী এটাতো বেশ চলে যাচ্ছে। টেবল্, চেয়ার, ফাউন্টেন পেন প্রভৃতি ইংরেজী শব্দ যখন সবাই নির্ব্বিবাদে ব্যবহার করেছেন তখন এটার বেলায় এত দ্বিধা কেন? অবশ্য যদিও উপরোক্ত শব্দগুলো এখন বাংলা ভাষার মধ্যেই ঢুকে গেছে তবুও আমরা যদি এখন 'চেয়ার' না বলে কেদারা, ফাউন্টেন পেন না বলে ঝরণা কলম বলি তবে সেটা চলিত হ'তে পারে কিন্তু যেখানে আমাদের নিজেদের ভাষায় সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না অথচ বিদেশী ভাষার কোন সুন্দর চলিত শব্দ আছে সেখানে সেটা ব্যবহার কর্ত্তে দোষ আছে কি! আমাদের দেশে আগের কালে অনাত্মীয়া মেয়েদের সঙ্গে বিশেষ আলাপ করবার রীতি ছিলনা কাজেই মাতৃ-ভাষায় সম্বোধন খুঁজে পাওয়া শক্ত। কিন্তু আমার মতে তাঁদের নাম ধরে দেবী বলা যেতে পারে যেমন অমিতা দেবী, আশা দেবী। অথবা শ্রীমতী সেন ও শ্রীমতী মলিনাও বলা যায়। নাম ধরে দেবী বল্‌লেই বোধ হয় সব চেয়ে ভাল হয়।

নামের পদবী নিয়ে সমস্যাই বড় শক্ত। এ বিষয়ে মীমাংসা বোধ হয় হবেনা। সুজাতা ঘোষ বিয়ের পর হলেন সুজাতা গুহ। তখন তাকে নিয়ে একটু গোলমাল তো হ'বেই। কিন্তু এ নিয়ে আর কি করা যায়? প্রথম থেকে বরাবর নামের পদবী উঠিয়ে যদি দেবী ব্যবহার করা হয় যথা প্রতিভা দেবী তাহ'লেও বড় গোলযোগ হবে। যেহেতু স্কুল কলেজে এক ক্লাসে ও পরিচিত মহলে বহু প্রতিভা থাকতে পারেন। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী বলতে আমরা এখন ঔপন্যাসিকা অনুরূপা দেবীকেই বুঝি কিন্তু তিনি যদি প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকা না হ'তেন অথবা একাধিক উপন্যাস লেখিকা অনুরূপা দেবী থাকতেন তবে আমরা বিভ্রাটে পড়তাম। আর দেশের বেশীর ভাগ মেয়েই খ্যাতি বিহীন, নিতান্ত সাধারণ। তাদের যদি পদবী না থাকে তবে একই নামধারিণী মেয়েদের বিভিন্নতা আমরা কি দিয়ে বুঝব। সম্বোধন ও চিঠি লিখবার সময় দেবী ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু সাধারণ ভাবে অন্যত্র এটা ব্যবহার করলে আমাদের গোলযোগ হবেই। তখন নামের পদবী চাই-ই। আর সুনীতি ঘোষ বিয়ের পর সুনীতি রায় হবেন এও সত্য। জটিলতা যে তখন বাধবে তা-ও ধ্রুব কিন্তু এর কোন প্রতীকার বোধ হয় নেই। আর এ শুধু আমাদের দেশ নয় সব দেশেই, নর নারীর তুল্যাধিকার যে দেশে মেনে নেওয়া হয়েছে সেই পাশ্চাত্যেও Miss Walker বিয়ের পর তাঁর স্বামীর পদবী অনুসারে হ'বেন Mrs Jackson, আমাদের দেশে তো কথাই নেই।

## ৪ ক। নামের পদবী

( ভ্রম সংশোধন )

গত আষাঢ়ের বিচিত্রায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'নামের পদবী' প্রবন্ধে ৮৩১ পৃষ্ঠায় "Anukana Mazumdar Nee Basu" স্থলে Anukana Mazumdar Miss Basu" ছাপা হয়েছে। এই ভ্রমপ্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।

বিঃ সঃ

# "বুকের বীণা"র কবি

## শ্রীঅবনীনাথ রায়

"বুকের বীণার" কবির নাম আজ বাংলা সাহিত্যে সকলেরই পরিচিত। সংখ্যায় এত অল্প কবিতা লিখে আর কোন লেখক বা লেখিকা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। তার প্রধান কারণ হচ্চে এই যে তাঁর কবিতার মধ্যে এমন কিছু আকর্ষণ আছে যা পাঠক-মাত্রকেই কাছে টানে। তাঁর কবিতা পড়ে আমার ধারণা হয়েচে যে অপরাজিতা দেবীর কবিতার আকর্ষণ হচ্চে সাধারণ এবং স্বাভাবিক বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন এবং তার সহজ এবং অনাড়ম্বর ব্যাখ্যান। তাঁর কবিতা পড়তে সুরু করলে কবিতা পড়্‌চি ব'লে মনেই হয়না—মনে হয় যেন দু'টি লোকের কথাবার্ত্তা চলেচে তাই শুনচি। ফলে পাঠকের মন বিন্দুমাত্রও শ্রান্তি অনুভব করেনা—এই প্রসাদগুণ সর্ব্বপ্রকারের মানুষের মনকে স্পর্শ করতে সমর্থ। হয়েচেও তাই—তাঁর কবিতা সর্ব্বজনপ্রিয় হয়েচে এবং "বুকের বীণা"র তৃতীয় সংস্করণ বেরুতে পেরেচে। আমরা জানি আমাদের বাংলা সাহিত্যে কবিতার বই কি রকম বিক্রি হয়—তার উপর ৫৩ পৃষ্ঠার কবিতার বইয়ের দেড় টাকা দাম এবং তারই তৃতীয় সংস্করণ হওয়া জনপ্রিয়তার সুস্পষ্ট নিদর্শন।

সম্প্রতি তাঁর "আঙিনার ফুল" ব'লে আর একখানি বই প্রকাশিত হয়েচে। তার গোড়ায় লেখিকা একটু ভূমিকা দিয়ে বলেচেন :—

"রবির আলোয় চন্দ্র কিরণে
ফোটে কত শত রঙীন ফুল ;—
আমি আঁধারের, আমাকে খুঁজিয়া
রসিক জনেরা কোরোনা ভুল।"

এই সম্পর্কে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। অনেকদিন থেকেই সাধারণ পাঠক পাঠিকার মনে একটা ধারণা ছিল যে অপরাজিতা দেবী ব'লে বাস্তবিক কোন লেখিকা নেই—ও-লেখাগুলি হচ্চে রাধারাণী দেবীরই লেখা—ছদ্ম নামে। কেননা অপরাজিতা দেবীর লেখাগুলি সাধারণত সম্পাদকেরা রাধারাণী দেবীর হাত থেকেই পেতেন। রাধারাণী দেবীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিতেন, অপরাজিতা শিলংএ থাকেন। সরকারী কার্য্য উপলক্ষে গত বছর আমি একবার শিলং-এ যাই এবং তিন মাসের উপর সেখানে থাকি। মনে করেছিলুম রাধারাণী দেবীকে ধরে ফেলার এই এক সুবর্ণ সুযোগ—সুতরাং তাঁর কাছে অপরাজিতা দেবীর ঠিকানা চেয়ে পাঠাই। প্রত্যুত্তরে তিনি জানান যে ঠিকানা জানাতে অপরাজিতা দেবীর কঠিন নিষেধ আছে, তবে তিনি শিলংয়ের কোন্ অংশে থাকেন তার একটা সামান্য ইঙ্গিত তিনি আমাকে গোপনে জানান। শিলংএ এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল যাঁর নাম হচ্চে শিলংয়ের গেজেট অর্থাৎ, শিলংয়ের সকলের বাড়ীর খবরই তাঁর নখদর্পণে। আমি অপরাজিতা দেবীর নাম এবং যে পাড়ায় তিনি থাকেন তার নাম দিয়ে তাঁকে খুঁজে বার করতে এই গেজেটের শরণাপন্ন হলুম। বলা বাহুল্য তিনি কোন সাহায্যই করতে পারলেন না—অপরাজিতা দেবী ব'লে কোন কবি বা লেখিকা শিলংএ থাকেন এ খবরই তিনি জানেন না। অন্যান্য বন্ধু বান্ধবেরাও কোন হদিশ দিতে পারলেন না। তারপর যখন আমি শিলং ছেড়ে আসি তার একদিন আগে সার্ভেয়ার জেনারেলের আপিসের এক ভদ্রলোক খবর দিলেন যে তিনি অপরাজিতা দেবীকে চেনেন এবং সেদিনও আপিস যাওয়ার পথে তাঁকে তিনি দেখেচেন। দুঃখের বিষয় সময় ছিল না বলে এ উক্তির যাথার্থ্য আমি আর যাচাই করতে পারিনি কিন্তু ভূমিকার শেষের দু'টি লাইন যে একটুও অতিরঞ্জিত নয় এ বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিতে পারি।

অপরাজিতা দেবীর বলার কথা এখনো ফুরোয়নি এই আমার বিশ্বাস—সেজন্য আশা করি তাঁর পরবর্ত্তী লেখার বিষয়-বৈচিত্র্যের একটু লীলা দেখ্‌তে পাব।

# বাঙ্গলা সাহিত্যে একশত ভালো বই

## ( আলোচনা )

**১। অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্-এ**

আমাদের 'বিচিত্রা'য় বাঙ্গলা সাহিত্যে একশত ভাল বইয়ের যে একটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। এইরূপ একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে হইলে কয়েকটি গোড়ার কথা মনে রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ নির্ব্বাচিত পুস্তকগুলি সাহিত্যগুণবিশিষ্ট হওয়া চাই। এখন, সাহিত্য কি সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়াও একথা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে লেখকের নিজস্ব বিশিষ্ট অনুভূতি বা মনোভাব বর্জ্জিত প্রাণী-তত্ত্ব বা ( দেশের, সমাজের বা সাহিত্যবিশেষের ) ইতিহাস সাহিত্য-পদবাচ্য হইতে পারে না। সুতরাং, পোকামাকড়, জীবজন্তু, রামায়ণের সমাজ, বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, সংবাদ পত্রে সেকালের কথা, সম-সাময়িক ভারত, বঙ্গের মহিলা কবি প্রভৃতি পুস্তক সাহিত্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। কাজেই, উক্ত তালিকায় এই সকল গ্রন্থের স্থান নাই। বইগুলি ভাল কি মন্দ সে প্রশ্নই এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন সাহিত্যেও যে ভাল বই আছে সে কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। শুধু কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস ব্যতীত প্রাগ্‌বৃটিশযুগের কি আর কোন কবিই এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবার উপযুক্ত নহেন? আমাদের বিরাট বৈষ্ণব ও শাক্ত সাহিত্য কি সমস্তই বাজে হইয়া গেল? চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, লোচন দাস, কবি-কঙ্কণ, ভারতচন্দ্র—ইঁহারা আমাদের সাহিত্যে কি উল্লেখযোগ্য কিছুই দিয়া যান নাই? তবুও, যে মায়া বলে তাঁহারা এতদিন টিঁকিয়া আছেন সেই মায়া বলেই তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের আকাশে ধ্রুবতারা রূপে চিরকাল বিরাজ করিবেন। আর বোধ হয় অর্দ্ধশত বৎসর যাইতে না যাইতে তালিকায় উল্লিখিত অন্ততঃ অর্দ্ধশত পুস্তক কোন্ বিস্মৃতির অতল গহ্বরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে তাহার কেহ খোঁজও রাখিবে না।

তৃতীয়তঃ, লেখক একদিকে যেমন প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি ঘোরতর অবিচার করিয়াছেন, তেমনই অতি আধুনিক লেখকদের প্রতি অত্যধিক পক্ষপাতিতা দেখাইয়া তাঁহার অন্যায়ের মাত্রা বিশেষ ভাবে বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। কালের কষ্টিপাথরে যাঁহারা সোনা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা হইয়া গেলেন মেকী, আর যে সকল শিশু-সাহিত্যিকদের অনেকেই দু'দিন বাদে নিশ্চিহ্ন হইয়া মরিয়া যাইবে তাহাদের কপালে দেওয়া হইল অমরত্বের টীকা! অশ্লীলতার কথা আমি তুলিতেছি না। কারণ সাহিত্যের দোষ গুণ বিচারে তাহা আমি সম্পূর্ণ অবান্তর বলিয়া মনে করি। প্রাচীন কি আধুনিক কোন সাহিত্যই অশ্লীলতাবর্জ্জিত নহে। কিন্তু এই সকল তথাকথিত 'তরুণ' সাহিত্যিক শুধুই ফ্রয়েড্ ও হ্যাভেলক্ এলিসের প্যারডি করিয়াছেন, কি সত্যই অনবদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন মহাকাল তাহার বিচার করিবেন। সেজন্য এখনও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত উক্ত তালিকায় আরও কয়েকটি অমার্জ্জনীয় ত্রুটি আছে। কাব্যসাহিত্য হইতে যতীন্দ্রমোহন বাগচী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও কুমুদরঞ্জন মল্লিক নির্ব্বাসিত হইয়াছে বঙ্গভারতীর কাব্যভাণ্ডারে ইঁহাদের অবদান তুচ্ছ নহে অন্ততঃ জসীম উদ্‌দীন বা বুদ্ধদেববাবুর চেয়ে কম নহে কিন্তু ইহাপেক্ষা আরও বেশী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গ' সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ভূদেব মুখোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ, শিশিরকুমার ঘোষ ( অমিয় নিমাই চরিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ( বাল্মীকির জয় ) অজিত চক্রবর্ত্তী, নলিনীকা গুপ্ত ( সাহিত্যিকা ), দীনেন্দ্রকুমার রায় ( পল্লীচিত্র

এবং অতুলনীয় ছোট গল্প লেখক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের স্থান নাই। ইহাদের প্রত্যেকেই বঙ্গ সাহিত্যের এক একটি দিক আলোকিত করিয়াছেন। ইঁহাদের ছাঁটিয়া দিলে আমাদের গদ্য সাহিত্যের থাকে কি? যিনি আমাদের এই সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মর্য্যাদা বুঝিতে অক্ষম তাঁহার ভাল বইয়ের তালিকা প্রস্তুত করার বৃথা প্রয়াস কেন? ব্যাপারটা সত্যই হাস্যকর হইয়া উঠে যখন দেখি তাঁহার অপরিসীম আত্মবিশ্বাস। তাঁহার সন্দেহ মাত্র নাই যে "এই তালিকা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সম্পূর্ণ দোষ বর্জ্জিত ও ভ্রমলেশ-হীন।" দুঃখের বিষয় আমরা তাঁহার নিজের দেওয়া এত বড় সার্টিফিকেট মানিয়া লইতে পারিলাম না।

## ২। শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেনের "বাংলা-সাহিত্যে একশত ভালো বই"এর তালিকা যে বাংলাসাহিত্য-জগতে এক অভিনব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সে সমস্যা সমাধানের জন্য আষাঢ়ের 'বিচিত্রা'য় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস আবার 'একশত ভালো বই'য়ের তালিকা প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন,—"এই তালিকা যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সম্পূর্ণ দোষবর্জ্জিত ও ভ্রমলেশহীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

বাংলা ভাষার অসংখ্য ভালো বই আছে। তা'র ভেতর থেকে বাছাই করে' একশত খানার নাম প্রকাশ করা একেবারেই অসম্ভব। সেন মশাই এবং দাস মশাই দু'জনেই পক্ষপাতিত্ব করেছেন। সেন মশাইয়ের তরুণ সাহিত্যিকের প্রতি ঔদাসীন্য এবং দাস মশাইয়ের তরুণ-প্রীতি পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রীযুক্ত দাস যদি একশত ভালো উপন্যাস, একশত ভালো কাব্য, একশত ভালো জীবনী ইত্যাদি পৃথক পৃথক বিষয়ের এক একটি পৃথক তালিকা রচনা করতেন, তাহ'লে বোধ হয় বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের ওপর এরূপ অবিচার করা হ'ত না তাঁর; আর সাধারণেরও যথেষ্ট উপকার সাধিত হ'ত তা'তে। আমরা বারান্তরে ঐরূপ তালিকা প্রকাশের বাসনা রাখি।

নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ এবং গ্রন্থকারগণকে যে দাসমশাই তাঁর ভালো বইয়ের তালিকা থেকে নির্ব্বাসিত করেছেন এটা খুব দুঃখের ও আশ্চর্য্যের বিষয়। তারপর আবার তাঁ'র তালিকায় কি মুসলমান গ্রন্থকারগণের একেবারেই প্রবেশ নিষেধ?

অক্ষয়কুমার মৈত্র—সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম
অতুল গুপ্ত—শিক্ষা ও সভ্যতা, কাব্য-জিজ্ঞাসা
অবিনাশ দাস—পলাশবন
অরবিন্দ ঘোষ—কর্ম্মযোগী, গীতার ভূমিকা, ভারতের নবজন্ম
অশ্বিনীকুমার দত্ত—ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, প্রেম
আকরাম খাঁ—মোস্তাফা চরিত
ইন্দিরা দেবী—স্পর্শমণি
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস
উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস
উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়—ঊনপঞ্চাশী, নির্ব্বাসিতের আত্মকথা
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—মধ্যযুগে বাংলা
কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত—রাজপুত কাহিনী, হিন্দু-সমাজ-বিজ্ঞান
কান্তিচন্দ্র ঘোষ—রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম
কুমুদরঞ্জন মল্লিক—অজয়, উজানী
কুমুদিনী বসু—শিখের বলিদান
গণেশ মুখোপাধ্যায়—জীবনী সংগ্রহ
গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী—স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দী
গোলাম মোস্তাফা—রক্তরাগ
গোকুল নাগ—পথিক
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—উদ্ভ্রান্ত প্রেম
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর
চিত্তরঞ্জন দাশ—দেশের কথা, কাব্যের কথা
দীনেন্দ্রকুমার রায়—পল্লীচিত্র, পল্লী বৈচিত্র্য
দুর্গাচরণ রক্ষিত—ভারত প্রদক্ষিণ
দুর্গাদাস লাহিড়ী—পৃথিবীর ইতিহাস
নগেন্দ্রকুমার বসু—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস
নগেন্দ্রনাথ সোম—মধু-স্মৃতি
নলিনীকান্ত গুপ্ত—শিক্ষা ও দীক্ষা, রূপ ও রস, সাহিত্যিকা, ভাবী-সমাজ, বাংলার প্রাণ

নলিনীকিশোর গুহ—বাংলায় বিপ্লব বাদ, ভারতের দাবী, পথ ও পাথেয়
নিখিলনাথ রায়—ইতিকথা, কবিকথা
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—ভারত পরিচয়, ভারতের জাতীয় আন্দোলন
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী—বিজিতা, ব্রতচারিণী
প্যারীমোহন সেনগুপ্ত—মেঘদূত
বরকৎ উল্লাহ—পারস্য প্রতিভা
বিশ্বপতি চৌধুরী—কাব্যে রবীন্দ্রনাথ
বন্দে আলি মিয়া—ময়নামতীর চর
ভূদেব মুখোপাধ্যায়—পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস
মোজাম্মেল হক—শাহনামা
মানকুমারী বসু—শুভসাধনা, কাব্য কুসুমাঞ্জলি
মীর মশারফ হোসেন—বিষাদ-সিন্ধু
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—মরীচিকা, কাব্য পরিমিতি
যতীন্দ্রমোহন বাগচি—নাগকেশর, জাগরণী
যতীন্দ্রমোহন সিংহ—ধ্রুবতারা, উড়িষ্যার চিত্র
যদুনাথ সরকার—শিবাজী
রজনীকান্ত গুপ্ত—সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, আর্য্যকীর্ত্তি
রবীন্দ্রনাথ মৈত্র—থার্ড ক্লাশ
রামপ্রাণ গুপ্ত—প্রাচীন রাজমালা
রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য—বাঙ্গালীর বল
রাজনারায়ণ বসু—একাল সেকাল
রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ—শঙ্কর ও রামানুজ
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—জিজ্ঞাসা, চরিতকথা, জগৎকথা, বিচিত্র জগৎ, নানাকথা
ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায়—ফোয়ারা, পাগলা ঝোরা, সাহারা, প্রেমের কথা
শরৎকুমার রায়—অশ্বিনীকুমার, বৌদ্ধভারত
শচীশ চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিম জীবনী
শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ
শিশিরকুমার ঘোষ—অমিয় নিমাই চরিত
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—বৌদ্ধধর্ম্ম
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—বিবেকানন্দ চরিত
সুভাষচন্দ্র বসু—তরুণের স্বপ্ন, নূতনের সন্ধান
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—কীর্ত্তিলতা
হরিসাধন মুখোপাধ্যায়—রামপ্রসাদ, কলিকাতা, একালের ও সেকালের
হরিহর শেঠ—পুরাতনী
হারাণচন্দ্র রক্ষিত—বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—বেদান্ত পরিচয়, গীতায় ঈশ্বরবাদ
হেমেন্দ্রকুমার রায়—ঝড়ের যাত্রী, ওমর খৈয়াম
হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—দেশবন্ধু স্মৃতি, গিরিশ প্রতিভা
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—প্রতাপাদিত্য, নরনারায়ণ

বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" এবং রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'গীতাঞ্জলী' প্রভৃতি পুস্তকগুলিও কি দাসমশায়ের অপরিচিত?

---

**ওপারের ঢেউ**—শ্রীকমলকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত। পৃঃ ১৮০। দাম দুই টাকা।

**পদ্মা**—শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। পৃঃ ৫৫। দাম এক টাকা।

**সুরা ও শোণিত**—শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। পৃঃ ৫০। দাম এক টাকা।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের খবর যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা জানেন গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যেন কবিতার বন্যা লাগিয়াছে। বাংলাদেশ পলি মাটীর দেশ, তাই প্রতি বৎসরেই এ দেশের কোন না কোন এক অংশ বিপুল বন্যায় বিধ্বস্ত হইতেছে। এ-হেন পলি মাটীর দেশের সাহিত্য যে কাব্য-বন্যায় বিধ্বস্ত হইবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? তবে আশা ও আনন্দের কথা এই যে মাঝে মাঝে ইহাদের মধ্যে দুই একখানা কাব্যগ্রন্থ সাহিত্যক্ষেত্রে বেশ একটা গভীর স্তর লাগাইয়া যায়।

এই যে রাশি রাশি কাব্য-গ্রন্থ বাহির হইতেছে, কিন্তু ভালো কবিতার বই বাহির হয় কয়খানা? স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই তো কবিতা লিখিবার সাধ যায়, কিন্তু দেশে প্রকৃত সত্যিকারের কবি আছে কয়জন? কয়জনের লেখার মধ্যে সত্যিকারের প্রাণের স্পর্শ দেখিতে পাওয়া যায়? শেষ পর্য্যন্ত আর কয়জনেই বা নিখুঁত কাব্যরস পরিবেশন করিতে পারিবে? বিরুদ্ধ প্রতিকূল সমালোচনায় কিছু যায় আসে না? বিরুদ্ধ সমালোচকের দল যায় ক্ষয় হইয়া, সত্যিকারের কবিতা কিন্তু চিরদিন অমর অক্ষয় ও অপরিম্লান হইয়া থাকে। ব্লাকউড-ম্যাগাজিন কোয়ার্টার্লি রিভিউ তো তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বাণে একদিন কীট্‌সকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিল। বাইরণের অটুট বিশ্বাস বেচারী কীট্‌স্ তো সেইজন্যই অকালে প্রাণত্যাগ করিল। কিন্তু আজ তাঁহার Endymion পড়িয়া, Eve of St. Agnes পড়িয়া কে না মুগ্ধ হয়? তারপর ধরুন টেনিসনের কথা। তরুণ কবি যখন তাঁহার Lotus-Eaters, Œnone, Dream of Fair Women, প্রভৃতি অপূর্ব্ব সুন্দর কবিতাগুলি পুস্তকাকারে বাহির করিলেন, তখন Blackwood Magazine তাঁহাকে কি ঠাট্টাই না করিয়াছিল। "Tennyson is an owl. All that he wants is to be shot, stuffed and stuck in a glass-case, to be made immortal in a museum." (Blackwood Magazine Vol. XXXI.) অথচ সে-সব কবিতার কি music, কি sensuousness! কীট্‌স্ ও স্পেন্সারও সে-সব লেখার কাছে স্তিমিতাভ হইয়া যায়। তারপর ধরুন Swinburne এর কথা। তাঁহার 'Atalanta in Calydon' ও Poems and Ballads-এর মত কাব্যগ্রন্থ আর হইবে না। কিন্তু কি নিন্দাটাই না তাঁহাকে শুনিতে হইয়াছিল। এত গাল বোধ করি আর কোন কবিই খান নাই। সমালোচকের দল একবাক্যে তাঁহাকে "a threatening terror, an outcast, an abomination" বলিয়া গায়ের ঝাল মিটাইয়াছিল। Ruskin তাঁহার নাম দিয়াছিলেন "the demoniac youth", Whitman বলিতেন, "Isn't he the damnedest simulacrum?" Browning তাঁহার কবিতা পড়িয়া বলিতেন, "a fuzz and froth of words," Carlyle বলিতেন "the miaulings of a delirious cat." এমন কি যে টেনিসন কাহারও সাতেও থাকিতেন না, পাঁচেও

থাকিতেন না, তিনিও নিন্দা করিতে ছাড়িতেন না—"a reed blown by many winds." যে Thomas Hardyর "Tess of the d'Urbervilles" পড়িয়া আমরা মুগ্ধ অবাক হইয়া যাই, Tess এর দুঃখের কাহিনী পড়িতে পড়িতে বুক ফাটিয়া যায়, সেই Tessকেও একদিন সকলেই 'harlot' নামে অভিহিত করিয়াছিল। তাই বলিতেছি বিরুদ্ধ প্রতিকূল সমালোচনায় কিছু যায় আসে না।

আজকাল বাংলা কবিতা পড়িয়া এত দুঃখও হয়! ও-দেশের কবিতার সঙ্গে তুলনা করিলে দেখি, আমরা কোথায়? কত বহু পশ্চাতেই না আমরা পড়িয়া আছি। আমাদের কবিতার বিষয়-বস্তু শুধু আকাশের মেঘ, বাগানের ফুল, আর নদীর তীরের বুড়ো বট গাছ, আর না হয় অত্যগ্র উদগ্র উচ্ছ্বাস!

"ওপারের ঢেউ" বইখানির রচয়িতা হুগলী কলেজের অধ্যাপক শ্রীকমলকৃষ্ণ ঘোষ। ইহাতে আছে শুধু ইংরাজী কবিতার জোলো মিন্‌মিনে অনুবাদ। তাও কবিতাগুলি এক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত Lahiri Select Poems ও Intermediate Poetical Selections হইতে গৃহীত। তাহার বাহিরে আর লেখকের দৃষ্টি যায় নাই। অর্থাৎ আমাদের সেই আবাল্য-পরিচিত Abou Ben Adhem, Cuckoo, Daffodils, The Hour of Prayer প্রভৃতি কবিতার বিশেষত্বহীন অনুবাদ। লেখকের প্রয়াস ও উদ্যম প্রশংসনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু পড়িতে পড়িতে মনে হয় এ কি পদ্য না গদ্য? এক এক সময়ে মনে হয় যেন যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পদ্যপাঠ পড়িতেছি। বইএর মধ্যে এমন একটিও কবিতা দেখিলাম না যাহার প্রশংসা করা যায়। তবে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছাত্র ও ছাত্রীদের অনুবাদ হিসাবে প্রয়োজনীয় হইতে পারে।

তারপর ক্ষেত্রমোহন বাবুর "পদ্মা" বইখানি। নিতান্ত ছেলেমানুষী সব লেখা। নমুনা দিতেছি:—

"তরুণ বুকে বাসক-শয়ন পাতনু আবার দুলালি,
আয় নেচে আয়, তালে তালে ইমন্, খেয়াল, ভূপালি।"

ইহার মানে যে কি, তা একমাত্র দেবতারাই জানেন। "শেষ" কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের "পূরবী"র "শেষ" কবিতার হুবহু নকল। এ-রকম করিয়া আর কয়দিন চলিবে?

তারপর পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের "সুরা ও শোণিত"। তিনখানি বইএর মধ্যে এই বইখানি যা একটু ভালো লাগিয়াছে। লেখকের কল্পনাশক্তি আছে যথেষ্ট, ভাষার উপর দখলও আছে জোরালো। তবে উচ্ছ্বাসগুলি অনেক জায়গায় নিতান্ত অর্থহীন হইয়া উঠিয়াছে।

"পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম" হীন মিথ্যা বাণী,
কাহারে বলিব আজ শ্রদ্ধায় আহ্বানি!
কারে দিব ভক্তি উপচার
মর্ম্ম-ছেঁড়া মহা তপস্যার।

শুধু কথা ও প্রলাপের সমারোহ। তবে চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে ইনি কবি হইতে পারিবেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস।

**হীরা জহরত**—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম্-এ প্রণীত। মূল্য বার আনা। প্রকাশক, বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিঃ। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

শিশু-সাহিত্যের খ্যাতনামা রচয়িতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়ের এই নূতন শিশুপাঠ্য বইটি এবার শারদীয়া পূজার বাজারে বালকবালিকাদের পক্ষে আকর্ষণের বস্তু হবে। কবিতা, কাহিনী এবং চিত্রের সমাবেশে কি ক'রে শিশু-চিত্ত জয় করতে হয় সে কৌশল জ্ঞানেন্দ্রবাবু আয়ত্ত করেছেন। এ বইখানিতেও তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বইখানির প্রচ্ছদপট চিত্তাকর্ষক এবং ছাপা ঝরঝরে।

**মেঘদূত**—পণ্ডিত শ্রীযামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য অনূদিত। মূল্য তিন টাকা মাত্র। প্রকাশক—প্রবাসী কার্য্যালয়, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

মেঘদূতের এ অনুবাদটি পাঠ ক'রে সত্যই তৃপ্ত হলাম। কিছুকাল পূর্ব্বে পর্য্যন্ত লেখক অথবা অনুবাদকের নামের পূর্ব্বে পণ্ডিত কথাটি সংযুক্ত দেখ্‌লে মনের মধ্যে একটু ত্রাসের সঞ্চার হ'ত। মনে হত, অনুপ্রাসাদি অলঙ্কারে শৃঙ্খলিত সংস্কৃতশব্দবহুল ভাষা-কারাগার থেকে অর্থ বেচারীকে মুক্ত ক'রে মূর্ত্তি নির্দ্ধারণ সহজ হবে না। সে ত্রাস বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম এবং সম্পূর্ণভাবে মোচন করেন

পরলোকগত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। মহামহোপাধ্যায়ের ঝর্‌ঝরে প্রাঞ্জল লালিত্যময় বাঙ্গলা প'ড়ে পণ্ডিতের বাঙ্গলা যে সব সময়েই পণ্ডিতী বাঙ্গলা না হ'তে পাবে তা দেখে আশ্বস্ত হয়েছিলাম। পণ্ডিত যামিনীকান্তের বাঙ্গলার মধ্যেও সেই গুণ বর্ত্তমান। ভাষা প্রাঞ্জল অর্থপূর্ণ। ফাঁড়া কিন্তু অতি অল্পর জন্যই কেটে গিয়েছে। পণ্ডিত মশায় আরম্ভ করেছিলেন এইভাবে—

ভর্ত্তা-শাপে বিগত-মহিমা কান্ত-ভুলা কোন যক্ষ
বর্ষ-ব্যাপী বিরহ ভুগিতে চিত্রকূটাশ্রমেতে
থাকে,—যাহার জনক-তনয়া গাহনে পুণ্য বারি।
স্নিগ্ধচ্ছায়া তরুগণ যথা সর্ব্বদা শ্রান্তিহারী॥

কিন্তু সুখের বিষয়, মন্দাক্রান্তার এই "প্রেতমূর্ত্তি" নিরীক্ষণ ক'রে পণ্ডিতমশায় অবিলম্বে সজীব বাঙ্গলা ছন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তার ফলে অনুবাদটি এই মনোমুগ্ধকর রূপ পরিগ্রহ করে—

আপন কর্ম্মে উদাসীন কোন যক্ষ প্রভুর শাপে
বর্ষের তরে মহিমা হারাযে কান্তা-বিরহ-তাপে
আশ্রয় নিলা রামগিরি-শিরে, পুণ্য যাহার জল—
জানকীর স্নানে, স্নিগ্ধশীতল ছায়াপাদপের তল॥

যে ভাষায় হ্রস্ব দীর্ঘ অক্ষরের লঘু গুরু ধ্বনি নেই, দীর্ঘ যেখানে তার দীর্ঘতা থেকে মুক্ত হয়ে হ্রস্বের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেছে, সেখানে সংস্কৃতছন্দের আশ্রয় গ্রহণ করলে হাস্যাস্পদ হ'তে হয়। একমাত্র হাস্যরসাত্মক কাব্যেই তা সফল হ'তে পারে। যথা দ্বিজেন্দ্রলালের—

জানো না কি কদাচন মূঢ়
কর্ণবিমর্দ্দন মর্ম্ম কি গূঢ়।
যদি বল সেটা শ্যালী ভিন্ন
অপরে করে নাক আদর চিহ্ন,
কিন্তু যদি তা অন্যে খন্যে
সাহেব টানে, হয় মধুর বিকল্পে॥

তৃতীয় ছত্রে "সেটা"র দীর্ঘ প্লুত উচ্চারণ যে-কোনো serious বাঙ্গলা কবিতায় এখনো বহুকাল পর্য্যন্ত অচল হয়ে থাকবে।

বইখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সুন্দর; এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সুদীর্ঘ মূল্যবান ভূমিকায়, এবং শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিজয়বর্গীয়, শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দে প্রভৃতির মনোহর চিত্রে সমৃদ্ধ। সুতরাং বইখানি রসজ্ঞ পাঠকের চিত্তহরণ করবে তা'তে সন্দেহ নেই।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

# দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

## দেশের নূতন অবস্থা ও কর্ম্মীদল

সকল সময়ে অশান্তি ও বিক্ষোভের তীব্রতা ও প্রকৃতি সমান না থাকিলেও লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর হইতে কংগ্রেস কর্ত্তৃক আইন-অমান্ত-আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, এই কয়েক বৎসর ধরিয়া দেশ অনেকটা একই প্রকার অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। ভারতবাসীদের রাষ্ট্রনীতিক আশা আকাঙ্ক্ষা এবং সরকারের মনোভাব ও নীতির মধ্যে বিরোধের ফলে যে সংঘর্ষের উদ্ভব হইয়াছিল, কংগ্রেসের বর্ত্তমান সংকল্পে তাহার অবসান ঘটিল। ইহাতে দেশে শান্তি এবং স্থিরতার অবস্থা কতকটা ফিরিয়া আসিলেও, সাধারণ ভাবে কংগ্রেসের সমর্থক সকল ব্যক্তিরই এবং বিশেষ করিয়া কর্ম্মীদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য কিছুমাত্র না কমিয়া অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কারণ, স্বাধীনতা অংশত বা পূর্ণত লাভ হয় নাই, দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা কিছুমাত্র দূরীভূত হয় নাই, বরং রাষ্ট্রিক অবস্থা শ্বেতপত্র ও সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের ফলে জটিলতর হইয়াছে। সেদিন দেশের মধ্যে যে উন্মাদনা দেখা গিয়াছিল, তাহার পশ্চাতে যে শুধুমাত্র সংঘর্ষের উত্তেজনা ছিল না, তাহা যে প্রকৃত দেশহিতৈষিণা হইতে, দেশকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করিবার ইচ্ছা হইতে, অগণিত দেশের লোকের সংখ্যাতীত দুঃখ দূর করিবার আকাঙ্ক্ষা হইতে, তাহাদিগকে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, অসম্মান, বঞ্চনা, শোষণ, মানসিক ও শারীরিক জড়ত্ব, সামাজিক চেতনার অভাব ও সংঘবদ্ধ জীবনের অক্ষমতা হইতে মুক্ত করিবার দুর্নিবার প্রেরণা হইতে এবং ভারতবর্ষকে বিশ্বসভায় গৌরবে এবং মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, অপেক্ষাকৃত অনাড়ম্বর, শান্ত, উত্তেজনাহীন কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া তাহা প্রমাণ করিবার দিন আসিয়াছে। আইন-অমান্ত-আন্দোলনে যত লোকে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই যে এই প্রকার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা সম্ভব হইতে পারে না; সাময়িক উন্মাদনায় অনেকেই আকৃষ্ট হইয়া থাকিবেন। কিন্তু, যাঁহারা এই আন্দোলনে সমগ্রদেশের, দেশের কোনও অংশের, বিভাগের, জেলার, অথবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অংশের কিংবা কোন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ দলের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, যাঁহারা অপরের কাছে ও নিজেদের অন্তরের কাছে, স্বদেশপ্রেমিক ও স্বদেশসেবক বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, বর্ত্তমান কর্ত্তব্যকে গ্রহণ করিবার বর্দ্ধিত দায়িত্ব তাঁহাদের উপর পড়িয়াছে। বর্দ্ধিত এইজন্য বলিলাম যে, বাহিরের উত্তেজনা না থাকায়, কর্ম্মীদিগকে প্রধানত নিজেদের অন্তরের মূলধনের উপরই নির্ভর করিতে হইবে; অপেক্ষাকৃত অনাড়ম্বর ভাবে দীর্ঘকাল নীরস ও কষ্টসাধ্য কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে; সংঘর্ষমূলক কর্ম্মে যত লোক পাওয়া যায়, ইহাতে কখনই ততলোক পাওয়া যাইবে না, এবং ইঁহাদের সকলের বোঝাই, বর্ত্তমানের কর্ম্মীমণ্ডলীকে বহন করিতে হইবে। কিন্তু, এই অসুবিধার সকলগুলি অপেক্ষাও গুরুতর সমস্যা বর্ত্তমানের কর্ম্মীদের সম্মুখে রহিয়াছে। এতদিন বিরোধ চলিয়াছিল সরকারের সহিত, কাজেই যাঁহারা ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা

অধিকাংশ—দেশের লোকের নিকট হইতে শুধু সমর্থন নহে, শ্রদ্ধা, প্রশংসা এবং পূজা পাইয়াছিলেন ; ত্যাগে, আত্মোৎসর্গে এবং বিপদবরণে তাঁহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার পক্ষে ইহা যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। বর্ত্তমানে তাঁহাদিগকে এই সংগ্রাম, দেশেরই কোন কোন শ্রেণীর—এবং অনেক সময় কর্ম্মীদের নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে চালাইতে হইবে। ইহাতে লোকের বিরুদ্ধতা পাইবার, স্বার্থহানি ঘটিবার, পূর্ব্ব প্রশংসা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবে এবং এই বাধা অতিক্রম করা সহজ হইবে না। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কর্ম্মীদের পক্ষেই এসকল কথা সত্য হইলেও, বাঙ্গালী কর্ম্মীদেরই আত্মপরীক্ষা করিবার, কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবার, এবং কর্ত্তব্যানুসরণ সম্বন্ধে দৃঢ়সংকল্প হইবার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বাঙ্গালী ছেলেদের মধ্যে অবশ্য স্বদেশ-প্রেমিকতা, কোনও মহৎ কাজে উদ্বুদ্ধ হইবার ক্ষমতা, সাহসিকতা এবং ত্যাগের ও দুঃখ বরণের ক্ষমতা অন্য কোন প্রদেশের যুবকদের অপেক্ষা কম নহে।

কিন্তু, কোনও কষ্টসাধ্য অনাড়ম্বর কার্য্যে দীর্ঘকাল লাগিয়া থাকিবার ক্ষমতা আমাদের অধিকাংশ লোকের নাই। এই অধ্যবসায়ের অভাব বাঙ্গালীদের পক্ষে জাতীয় দৈন্য বলা যাইতে পারে। মস্তিষ্কের ক্ষমতা, চরিত্রের সাধুতা, সেবার ইচ্ছা প্রভৃতি বহু মহৎ গুণ এই একটি জিনিসের অভাবে বহুলোকের জীবনেই ব্যর্থ হইয়া যায়।

বর্ত্তমানে কর্ম্মীদিগকে যে প্রকার কার্য্য করিতে হইবে, তাহাতে তাঁহাদের, অভ্যস্ত আবহাওয়া ও সঙ্গীদের নিকট হইতে দূরে থাকিয়া, আশু ফললাভের আশা বর্জ্জিত হইয়া এবং অজ্ঞ, অনুন্নত ও অপরিচ্ছন্ন লোক ও পল্লীর জলা-জঙ্গল, মশা-মাছি এবং নানাপ্রকার ব্যাধি ও দুঃখের মধ্যে থাকিয়া কার্য্য করিবার প্রয়োজন হইবে। ইহাতে তাঁহাদের শক্তি ও দেশপ্রেমের প্রকৃত পরীক্ষা হইবে ; এবং যে স্বদেশ এতদিন অনেকের পক্ষে কল্পনার অস্পষ্ট বস্তু ছিল, তাহার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিবার সাধনা হইবে।

বাঙ্গালী কর্ম্মীদের অতিরিক্ত অসুবিধার আরও একটি কারণ এই হইবে যে ইঁহারা প্রধানত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক হইবেন ; অর্থাৎ ইঁহাদের অধিকাংশ জমিদার, তালুকদার, গাঁতিদার প্রভৃতি কোনও না কোনও ভূম্যধিকারী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইঁহাদের ও কৃষকদের মধ্যে স্বার্থের স্থায়ী বিরুদ্ধতা সৃষ্টি হইয়াছে।

তাহার ফলে একদিকে যেমন কর্ম্মীদের নিজেদের জাগতিক স্বার্থের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হইবে, অন্যদিকে তেমনই যাহাদের মধ্যে কার্য্য করিতে হইবে, তাহাদের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে। দেশের আর্থিক ব্যবস্থার ও দেশের বিভিন্নশ্রেণীর লোকের স্বার্থের এই আভ্যন্তরীণ বৈষম্যের হাত হইতে ইচ্ছা করিলেই কর্ম্মীরা মুক্তি পাইতে পারিবেন না।

এই সকল বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেই নিজেদের শক্তি ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারিলেই মাত্র বাঙ্গালী কর্ম্মীরা বাংলার সম্মানরক্ষা করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন।

## নিরুপদ্রব প্রতিরোধ ব্যর্থ হইল কেন

নিরুপদ্রব প্রতিরোধের সাহায্যে স্বরাজ লাভের গত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে ; ইহা যে, আমাদের শাসকবৃন্দের অন্তর স্পর্শ করিতে পারে নাই, ইহা মহাত্মার নিজের উক্তি। শাসক-বৃন্দের অন্তর স্পর্শ করিতে পারে নাই বলিয়াই, ইহা তাঁহাদের নীতির অথবা আমাদের প্রতি তাঁহাদের মনোভাবের কোনও পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে নাই ; যদিও আমাদের মধ্যে রাজনীতিক চেতনা জাগ্রত করিয়া এবং আমাদের জাতীয় দুঃখ দুর্দ্দশা সম্বন্ধে মনের অসাড়তা নষ্ট করিয়া, ইহা আমাদের জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধতর ও সিদ্ধিকে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী করিয়াছে।

এই আন্দোলনে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন, সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে তাঁহাদের আন্তরিকতাহীনতাকে মহাত্মা এই বিফলতার জন্য দায়ী করিয়াছেন। কিন্তু, অন্যদিক দিয়াও কোনো রাষ্ট্রনীতিক আন্দোলনের সহিত সমগ্র দেশের লোকের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিলে, তাহার সাফল্য লাভ যে সম্ভব নহে, সম্ভবতঃ মহাত্মা গান্ধী এই কথাটা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়াই, তাঁহার সমগ্র শক্তি হরিজন আন্দোলনে নিয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে কেহ কেহ এরূপ কথা মনে করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্র হইতে তিনি

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িতেছেন। কিন্তু, ইহাকে অধিকতর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক প্রয়াস বলা যাইতে পারে। কংগ্রেসের বর্ত্তমান গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতি দেখিয়া একথা মনে করা অন্যায় নহে যে, অন্যান্য কংগ্রেস নেতারাও কথাটাকে এই দিক দিয়া দেখিয়াছেন।

## গত আন্দোলন দেশকে কি দিয়াছে

গত আন্দোলন দেশকে কি দিয়াছে, একথা অনেকের মনে উদিত হইতে পারে। দেশের বহুলোক যে নির্য্যাতন, দুঃখ এবং ক্ষতি সহ্য করিয়াছে, তাহার ফলে দেশের লাভ যে কতটা হইয়াছে, তাহা সঠিক নির্ণয় করিবার সময় এখনও আসে নাই। তবে, এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য অন্য প্রকার থাকিলেও ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় লাভ এই হইয়াছে যে, এই আন্দোলনই আমাদিগকে ভালভাবে বুঝাইয়াছে যে, দেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যবিধান না হইলে, দেশের বহু কোটি লোক অনুন্নত ও অবজ্ঞাত থাকিলে, আমাদের রাষ্ট্রিক প্রগতি সম্ভব নহে। ইহার এই উত্তর পাওয়া যাইতে পারে যে, এই সহজ কথাটা অতিশয় সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারা যাইত; ইহার জন্য আমাদের এতটা কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করিবার প্রয়োজন ছিলনা। প্রয়োজন যে ছিল, তাহার সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ এই যে, ইহার পূর্ব্বে একথাটা আমরা প্রকৃতপক্ষে এমন ভাবে বুঝিতে পারি নাই, অথবা বুঝিয়া থাকিলেও তাহাকে যথোচিত গুরুত্ব দিতে পারি নাই।

দেশের সর্ব্বশ্রেণীর উন্নয়নের ও তাহাদের সহিত সহযোগিতার কথা মুখে বলিলেও অথবা বুদ্ধি দিয়া বুঝিলেও আমাদের অনেকের মনে এইরূপ একটি অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে, এই সকল লোককে বাদ দিয়াও শুধুমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোকদের চেষ্টাতেই আমাদের অভীষ্টসিদ্ধ হইতে পারে। বর্ত্তমান আন্দোলনই আমাদের অনেকের মন হইতে সে ধারণা দূর করিয়াছে।

তদ্ব্যতীত, এই আন্দোলন আমাদের মধ্যে যে উদ্যম ও কর্ম্মের প্রেরণা আনিয়া দিয়াছে, নূতন কল্পনা ও নূতন সঙ্কল্পের যে সাহস আনিয়া দিয়াছে, ইহার মধ্য দিয়া আমরা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলাম বলিয়াই, অপরের ন্যায়সঙ্গত অধিকার সম্বন্ধে আমাদের মনে ইহা যে সচেতনতা আনিয়া দিয়াছে, আমাদের বহুসংখ্যক দেশবাসীর উপর আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহাই আমাদিগকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দিবেনা।

## কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ম্মপদ্ধতি ও তরুণদল

কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ম্মপদ্ধতিতে সম্ভবত তরুণ কংগ্রেস-কর্ম্মীরা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। চাঞ্চল্যপ্রিয়তা তরুণদের পক্ষে স্বাভাবিক। কংগ্রেসের মৃদু ও শান্ত কর্ম্মপদ্ধতি তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট ও খুসী করিতে পারিবে কিনা, সন্দেহ। পাঞ্জাব ইয়ং কংগ্রেসপার্টি, তাঁহাদের এক বিবৃতিতে রাষ্ট্রিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রনীতিক কর্ম্মপদ্ধতি দাবী করিয়াছেন এবং একটু উপহাসের সুরে বলিয়াছেন যে, আজ যদি কংগ্রেস অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কার্য্য গ্রহণ করে, তাহা হইলে, আগামী কাল ইহা বিধবাবিবাহ প্রদান, অবরোধপ্রথা দূরীকরণ, বাল্যবিবাহ নিবারণ এবং সমাজসংস্কারমূলক এইরূপ অন্যান্য কার্য্য গ্রহণ করিতে পারে।

কংগ্রেসের সমগ্র কর্ম্মতালিকার মধ্যে তাঁহারা একমাত্র কৃষক ও শ্রমিকদিগের সংগঠন কার্য্যটিই প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছেন, কারণ তাঁহাদের মতে (এবং আরও অনেকের মতে) কংগ্রেস এতদিন মাত্র একটি বিশেষ শ্রেণীর সহায়তায় কার্য্য চালাইতেছিলেন এবং জনসাধারণের সহযোগিতা পাইবার জন্য যথোপযুক্ত চেষ্টা করেন নাই।

পাঞ্জাবের তরুণ কংগ্রেস কর্ম্মীদের মতের অনুরূপ মত অন্যান্য স্থানের তরুণ কর্ম্মীরাও সম্ভবত পোষণ করিয়া থাকেন। আমাদের তরুণদলের রাষ্ট্রিক চিন্তা, ইউরোপের একটা বিশেষ রাষ্ট্রিক আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হইতেছে এবং সেই কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করিবার, তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার, তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ করিবার চেষ্টাকে আমাদের রাষ্ট্রিক প্রগতির পক্ষে তাঁহারা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেছেন।

আমাদের কৃষক এবং শ্রমিকেরাই দেশের অধিকাংশ লোক, তাহাদিগের সহযোগিতা ব্যতীত দেশের মুক্তি কখনই

সম্ভব হইবে না। যদিও বা মুক্তিলাভ সম্ভব হয়, তাহা হইলেও, দেশের অধিকাংশ লোকের যাহাতে কোনও স্থান নাই, তাহা নিরর্থক হইবে।

কিন্তু, এই শ্রমিক এবং কৃষকদিগকে কি ভাবে সংঘবদ্ধ করা যাইবে। নানাকারণের সমবায়ে দেশের শিক্ষিত ও চিন্তাশীল সম্প্রদায় ও দেশের জনসাধারণের মধ্যে যে ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার ফলে ইঁহাদের বাক্যে বা কার্য্যে জনসাধারণ সহসা বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। এই সকল লোকের সেবার দ্বারা, নানা উপায়ে তাহাদের উন্নতির আন্তরিক চেষ্টার দ্বারা, তাহাদের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে হইবে। ইহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে বলিলেই ইহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইবে না।

ইহা ব্যতীত কোনও রাজনীতিক উদ্দেশ্যে ইহাদিগকে আদৌ সঙ্ঘবদ্ধ করা সম্ভব কিনা, তাহাও সন্দেহের বিষয়। যে দুঃখ, অপমান, অবিচার এবং বঞ্চনা মানুষের মনে সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র অসন্তোষ জাগায়, তাহা দূর করিবার জন্য লোককে বদ্ধপরিকর করা যাইতে পারে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যে দুঃখ, তাহা হইতেছে রাজনীতিক অধিকার না পাইবার, রাজনীতিক অধিকার না থাকার জন্য আর্থিক দুর্গতি ভোগ করিবার এবং আশানুরূপ ও উপযুক্ততানুরূপ মর্য্যাদা না পাইবার দুঃখ। কাজেই এই সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে দেশের রাষ্ট্রিক উন্নতির জন্য সংকল্পবদ্ধ হওয়া এবং সেজন্য চেষ্টা করা খুবই স্বাভাবিক। রাজনীতিক অধিকার না থাকার জন্য যে আর্থিক দুঃখ, তাহা অবশ্য অন্য সকলকেও সমানই ভোগ করিতে হয়; কিন্তু, যে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটে নাই, তাহাদের একথা বুঝিবার মত বুদ্ধির উন্মেষ হয় নাই যে তাহাদের দারিদ্র্যের মূলে দেশের পরাধীনতা রহিয়াছে। তাহাদের দারিদ্র্যের প্রত্যক্ষ কারণ তাহারা দেখিতে পায় জমিদার ও মহাজনের শোষণ। ইঁহারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক। ইহাতে এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপর ইহারা বিশেষরূপে বিদ্বিষ্ট হইয়া আছে। ইহার পরই, মানুষের আত্মসম্মানের উপর আঘাত তাহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলে। হিন্দু সমাজের ভিতর জন্মগত উচ্চ নীচ জাতি ভেদ আমাদের আভিজাত্যের অত্যন্ত পীড়াদায়ক আস্ফালন, আমাদের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রায় এই সকল লোককে আঘাত করিবার সহস্র প্রকার ব্যবস্থা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কৃষক ও শ্রমিকদের মনে বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করিয়াছে। কাজেই, এই সকল শ্রেণীর মধ্যে প্রথম যে জাগরণ আসিয়াছে, তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আকারে আসিয়াছে।

কৃষক ও শ্রমিকদের মনে রাষ্ট্রনীতিক চেতনা আনিতে হইলে, প্রথমে তাহাদের সর্ব্বপ্রধান দুঃখ দূর করিতে হইবে; অর্থাৎ তাহাদের দারিদ্র্যের দুঃখ, অসম্মানের দুঃখ, অস্পৃশ্যতার দুঃখ দূর করিতে হইবে। তাহাদের অনেক দুঃখের মূল যে রাজনৈতিক; একথা বুঝিবার জন্য কিছু পরিমাণ শিক্ষা তাহাদিগকে দিতে হইবে এবং সর্ব্বোপরি যাহারা তাহাদিগকে এতদিন নানাভাবে পীড়ন করিয়া আসিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, তাহাদের কতকগুলি লোক নিজেদের স্বার্থের বিপক্ষে দাঁড়াইয়া তাহাদের দুঃখ মোচনের জন্য যে প্রকৃতপক্ষে ইচ্ছুক হইয়াছে, দীর্ঘদিনব্যাপী অকপট সেবার দ্বারাই মাত্র তাহাদের মনে এ বিশ্বাস উৎপাদন সম্ভব হইতে পারে। তাহারা যখন বুঝিতে পারিবে যে, শিক্ষিত সম্প্রদায় ও তাহাদের স্বার্থ অভিন্ন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের শোষক ও শোষিতের সম্বন্ধ নহে, দেশের কাহারও কাছে কোনও বঞ্চনা এবং অসম্মান নাই, আরও সম্মান ও পূর্ণতর অধিকার পাইতে হইলে, রাষ্ট্রিক প্রগতি অপরিহার্য্য, তখনই মাত্র তাহারা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকের দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে, দেশকে নিজের মনে করিতে পারে এবং তাহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে পারে। ইহার জন্য যে দীর্ঘকাল-ব্যাপী চেষ্টার প্রয়োজন তাহা না করিয়া, যদি আমরা অসহিষ্ণু হইয়া পড়ি, তাহা হইলে তাহার দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধ হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত।

এই উদ্দেশ্যে কাজ করিতে হইলে, কৃষক ও শ্রমিকদের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দুর্দ্দশার কাজে কর্ম্মীদিগকে মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে। তাহাদিগকে ঋণমুক্ত করিবার, তাহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল করিবার, স্বাস্থ্যের উন্নতি করিবার, সামাজিক মর্য্যাদা বাড়াইবার ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ম্মতালিকানুসারে

কাজ করিতে পারিলে, এই কাজ অনেকটা অগ্রসর হইবে এবং জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করিবার কথা তখনই মাত্র উঠিতে পারিবে। এই দিক দিয়া দেখিলে, কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতিকে সমাজ-সংস্কারমূলক দেখিতে হইলেও, প্রকৃতপক্ষে পূর্ণমাত্রায় রাজনীতিমূলক বলা যাইতে পারে।

## পাঞ্জাবের তরুণ কংগ্রেস দল

পাঞ্জাব ইয়ং কংগ্রেস পার্টির একটি বিবৃতির বিষয় অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে। পাঞ্জাবের গণজীবনকে সর্ব্বপ্রকার কলুষ ও পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত করিয়া তাহাতে নূতন প্রাণ সঞ্চারের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া এই দলটি গঠিত হইয়াছে।

সমাজে এবং ধর্ম্মে যে গোঁড়ামি, ধর্ম্মান্ধতা, এবং অসহিষ্ণুতা একাধিপত্য করিতেছে, আর্থিক এবং রাষ্ট্রিক জীবনে যে লুব্ধতা, স্বার্থপরতা এবং অসততা প্রভুত্ব করিতেছে, সে সকল সম্পূর্ণ ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত এই দলটি, তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে ক্ষান্ত হইবে না। অগ্রগতির পদক্ষেপ যাহাতে মৃদু হইয়া না যায়, জীবনী-শক্তির প্রাচুর্য্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, এইজন্য ইঁহারা ৪০এর ঊর্দ্ধ বয়স্ক কাহাকেও এই দলে গ্রহণ করিবেন না।

ইঁহারা কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িক দলাদলির মধ্যে যাইবেন না এবং ভারতীয় রাষ্ট্রের স্বরূপ কি হইবে তাহা লইয়া মারামারি করিয়া শক্তিক্ষয় করিবেন না। ইঁহাদের রাষ্ট্রিক আদর্শ অবশ্য কংগ্রেসেরই অনুরূপ এবং ইঁহারা কংগ্রেসের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আমাদের স্থানীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানগুলি আমরা যোগ্যতা ও সাধুতার সহিত চালাইতে পারিনা বলিয়া আমাদের যে অখ্যাতি আছে, তাহা দূর করিবার জন্যও ইঁহারা প্রাণপণ করিবেন!

বাংলাদেশেও সমাজে ও ধর্ম্মে গোঁড়ামি, ধর্ম্মান্ধতা ও অসহিষ্ণুতা আছে, এখানকার আর্থিক ও রাষ্ট্রিক জীবনও সর্ব্বপ্রকার অন্যায় হইতে মুক্ত নহে। স্থানীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানগুলিকেও যে আমরা অনিন্দনীয় যোগ্যতা অথবা সন্দেহাতীত সাধুতার সহিত চালাইতে পারিতেছি, এমন নহে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক মনোভাববিশিষ্ট যুবকেরা পাঞ্জাবের যুবকদের ন্যায় সংঘবদ্ধ হইয়া অনুরূপ আদর্শের জন্য চেষ্টা করিতে পারেন। তাঁহাদের এই প্রকার কার্য্যে দেশের মধ্যে যেমন নূতন প্রাণশক্তির সঞ্চার হইবে তেমনই নিজেদের শক্তির অনুরূপ কর্ম্মক্ষেত্র পাইলে, যুবকদের কোনও হিংসাত্মক মতবাদ অথবা কোনও গুপ্ত কর্ম্মপন্থার প্রভাবাধীন হইবার সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে।

সর্ব্বোপরি, বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক এবং অরাজনৈতিক গণজীবনের সর্ব্বত্র, যে স্বার্থান্ধ এবং হীন দলাদলি বাঙ্গালীর লজ্জার কারণ এবং উন্নতির অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে এমন একদল যুবকের সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন হইয়াছে, যাহারা সত্যকথা বলিবার, উচিত কাজ করিবার, প্রভুত্বের মোহ তুচ্ছ করিবার, কোনও লোকের অর্থ, প্রতিপত্তি, অথবা ক্ষমতার অন্যায় প্রভাব হইতে দূরে থাকিবার শক্তি রাখে এবং আমাদের গণজীবনকে বর্ত্তমানের দুর্গতি হইতে মুক্ত করিতে পারে।

## যশোর মিউনিসিপালিটির মহিলা সদস্য

গত মার্চ্চে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভোটারগণের নিকট হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ভোট পাইয়া শ্রীযুক্তা আমেনা খাতুন যশোর মিউনিসিপালিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হন। কলিকাতার বাহিরে ইনিই সর্ব্বপ্রথম নির্ব্বাচিত মিউনিসিপাল মহিলা সদস্য। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে যশোহর মিউনিসিপালিটির মনোনীত সদস্যদের মধ্যেও একজন মহিলা আছেন। আমাদের গণজীবনেও মহিলাদের করিবার মত কার্য্য এবং উপযুক্ত স্থান আছে। কিন্তু, অন্তঃপুরের বাহিরে সাধারণ ভাবে নারীদের গতিবিধি না থাকায় এখনও গণজীবনে তাঁহারা তাঁহাদের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই; এই জন্য যাঁহারা প্রথমে এই কার্য্যে অগ্রণী হইতেছেন এবং যাঁহারা তাহাতে সহায়তা করিতেছেন, উভয়পক্ষই বিশেষ প্রশংসা এবং সম্মান পাইবার যোগ্য।

## পুর্ণিয়ায় মহিলা কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট

শ্রীযুক্তা সত্যবতী রায় (পরলোকগত গোকুলকৃষ্ণ রায়ের বিধবা পত্নী) পুর্ণিয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হইয়াছেন। কংগ্রেসের মধ্য দিয়া মেয়েরা দেশ সেবার কার্য্যে যথেষ্ট আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন এবং উচ্চতম হইতে আরম্ভ করিয়া বড়, মাঝারি, ছোট সর্ব্বপ্রকার সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন। শান্তির সময়ে গঠনমূলক কার্য্যে তাঁহাদের অংশ গ্রহণ এবং সম্মান প্রাপ্তি বিশেষ আনন্দের কথা। নাম দেখিয়া মনে হইল, শ্রীযুক্তা সত্যবতী রায় বাঙ্গালী। অনুমান সত্য হইলে, বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী মহিলার এই জনপ্রিয়তার প্রমাণে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব।

## ইহাই তোমাদের মাতৃভূমি

অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান নেতা সার হেন্‌রি গিড্‌নি ব্যাঙ্গালোরের ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান বল্‌ড্‌উইন স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন :—

"ভারতবর্ষের মাটীতেই তোমাদের বহুসংখ্যক পিতৃপুরুষের অস্থি সমাহিত আছে; এখানেই তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং এখানেই তাঁহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে, অতএব ভারতবর্ষের জন্য তোমরা গৌরব অনুভব কর, ইহাই তোমাদের মাতৃভূমি।···যদি এখানে তোমরা তোমাদের উচিত প্রাপ্য চাও, তবে ভারতবর্ষকে নিজের বলিয়া স্বীকার করিতে কখনও লজ্জিত হইও না।

ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস অপেক্ষা, তাহার বর্ত্তমান ইতিহাস হইতেই অধিক শিখিতে হইবে; ভারতবর্ষ তোমাদের নিকট হইতে যাহা প্রত্যাশা করে, সেদিকে তোমাদের মনোযোগ দিতে হইবে। **এই দেশের ভাষা শিখিয়াই মাত্র তোমরা এই দেশবাসীদের অন্তঃকরণের অধিকতর সন্নিকটে আসিতে পারিবে।**

অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানেরা তাঁহাদের পাশ্চাত্যের দিকটা সম্বন্ধে বড় বেশী সচেতন হওয়ায়, নিজেদের ভারতীয় জাতির অংশ বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই অথবা ভারতবর্ষের গৌরবে গৌরব বোধ করিতে পারেন নাই। কিন্তু, কোনও জাতিই তাহার ভিন্নদেশীয় রক্তের গৌরবে, নিজেদের বাসভূমির প্রভাব ও স্বার্থকে অস্বীকার করিতে পারে না এবং প্রতিবেশীদের সংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজেদের স্বার্থও অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না, অথবা গৌরব ও উন্নতির অধিকারী হইতে পারে না। এই ভাবে পৃথক থাকিবার চেষ্টা করিলে যে ক্ষতি হয়, তাহা শুধুমাত্র এই সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সমগ্র দেশের স্বার্থও ইহাতে নানাভাবে ক্ষুণ্ণ হয়।

ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এক সম্প্রদায়ের বহির্দেশিক প্রীতি, তাঁহাদের নিজ সম্প্রদায় এবং ভারতবর্ষের পক্ষে সমস্যা ও ক্ষতির কারণ হইয়া রহিয়াছে।

অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম বলিয়া, তাঁহাদের বহির্দেশিক প্রীতি দেশের পক্ষে এখনও ততটা সমস্যার কারণ হইয়া উঠিতে পারে নাই, যদিও ইহা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা লাভের পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় হইয়াছে।

মানুষে মানুষে মিলনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাধা হইতেছে, ভাষার বাধা। কোনও দেশে বাস করিয়া, সেই দেশের ভাষা গ্রহণ না করিলে, অন্ততঃ শিক্ষা না করিলে, দেশের লোকের সহিত কখনও পূর্ণ ঐক্য স্থাপিত হয় না, তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগের সহিতও সঠিক পরিচয় ঘটেনা। এদেশবাসী অন্যান্য লোকেদের নিজেদের অপেক্ষা ছোট মনে করেন বলিয়াই, তাহাদের ভাষা শিখিবার প্রয়োজনীয়তা ইঁহারা এতদিন উপলব্ধি করেন নাই।

ভাষার সীমানা সব দেশেই ভৌগোলিক; একই দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভাষা এই দেশের বিশেষ সমস্যা।

## দি ইণ্ডিয়ান একাডেমি অব সায়েন্সেস্‌

গত জানুয়ারি মাসের ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের অধিবেশনে 'দি ইণ্ডিয়ান একাডেমি অব সায়েন্সেস্‌' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার প্রস্তাব ধার্য্য হয়। ঐ প্রতিষ্ঠানের গঠন কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত

ভারতের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি যথেষ্ট তৎপরতা ও উপযুক্ত সতর্কতার সহিত কাজ চালাইতেছেন।

কিন্তু, ১লা এপ্রিল তারিখে বাঙ্গালোরে "জয়েণ্ট কনফারেন্সেস্ অব সায়েন্টিফিক অরগ্যানিজেসন্স অব সাউথ ইণ্ডিয়া"র অধিবেশনে সার সি-ভি-রামন প্রমুখ কতিপয় বৈজ্ঞানিক পূর্ব্বোক্ত কমিটিকে আক্রমণ করেন। তাঁহাদের বক্তৃতার যে সারাংশ খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে "কলিকাতা" ও কলিকাতার "বৈজ্ঞানিকগণে"র বিরুদ্ধে যথেষ্ট উষ্মা প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহাদের উষ্মার কারণ সম্ভবত পাছে কলিকাতা উক্ত একাডেমির কেন্দ্র হইয়া পড়ে—এই ভয়। রামন প্রমুখ ব্যক্তিগণের হীন আক্রমণের প্রতিবাদ করিয়া, ডাঃ মেঘনাদ সাহা ও ডাঃ আখারকর, (ইণ্ডিয়ান সায়েন্স একাডেমির সেক্রেটারিদ্বয়) যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতেই রামন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের এই আক্রমণের পিছনে যে মনোভাব ছিল, তাহা ভালভাবেই উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ডাঃ সাহা বলিয়াছেন, ডাঃ রামন ও উপরিউক্ত কমিটির সভ্য ছিলেন এবং তিনি ইচ্ছা করিলেই নিজের প্রস্তাবসমূহ কমিটিতে উথাপিত করিতে পারিতেন এবং কমিটির কার্য্যাবলীও প্রভাবিত করিতে পারিতেন। পরিতাপের বিষয়, ডাঃ সাহা ও ডাঃ আখারকরের বিবৃতির পরও ডাঃ রামন দমেন নাই। "একাডেমি"র বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য সমান ভাবে চালাইতেছেন।

## "রামন"-একাডেমি

ভারতের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ ডাঃ রামনের এই মনোভাবের প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও তিনি নিজেই 'ইণ্ডিয়ান একাডেমি অব সায়েন্স' নামে বাঙ্গালোরে গত জুন মাসে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। আমরা উহাকে "রামন একাডেমি" বলিব। 'রামন একাডেমি'র প্রথম সভায় বক্তৃতা করিবার সময় ডাঃ রামন, কেন যে স্বতন্ত্র একাডেমি স্থাপন করিলেন, তাহার কারণ প্রদর্শন ছলে, বাঙ্গালোর যে ভারতের কেন্দ্র তাহা সপ্রমাণ করিবার যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন—যদিও একবৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা ভারতের জ্ঞানকেন্দ্র বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। অবশ্য ডাঃ রামন ইঁহার উত্তরে বলিতে পারেন যে, একবৎসর পরে তাঁহার এবিষয়ক জ্ঞান যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে। ডাঃ রামনের স্বতন্ত্র একাডেমি প্রতিষ্ঠার আর একটা কারণ, পূর্ব্বোক্ত একাডেমির কেন্দ্রস্থল কলিকাতা হইলে, 'এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'এর সহিত ইহার সংযোগ স্থাপিত হইবে। যে কলিকাতা ও এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের প্রশংসা কিছুদিন পূর্ব্বে ডাঃ রামন পঞ্চমুখে করিয়াও শেষ করিতে পারেন নাই, তাহাদের বিরুদ্ধে ডাঃ রামনের এবম্প্রকার বিরাগ সঞ্চারের কারণ খুব অস্পষ্ট নহে।

প্রথমতঃ ডাঃ রামন যখন কলিকাতা ও এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের প্রশংসা করেন, তখন তিনি নিজেই কলিকাতায় ছিলেন এবং নিজেকেই হয়ত কলিকাতাস্থ বর্ত্তমান ও ভবিষ্য সমস্ত বৈজ্ঞানিক সভার কর্ণধার হইবার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করিতেন। দ্বিতীয়তঃ রামন একাডেমি ভারতের বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে এবং বাঙ্গালোরে ইহার কেন্দ্র স্থাপিত হইলে, ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অব সায়ান্সের সহিত ইহার সংযোগ স্থাপিত হইবে এবং যেহেতু তিনি ১৫ বৎসরের জন্য উক্ত ইন্‌ষ্টিটিউটের ডিরেক্টরের পদে আসীন, সেই হেতু একাডেমির সমস্ত কর্ত্তৃত্ব তাঁহার হস্তে আসিয়া পড়িবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ডাঃ রামন যে সাধু উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া রামন একাডেমি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সকলের মনঃপূত হইতেছে না। সুতরাং অধিকাংশ বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক তাঁহার একাডেমির সভ্যপদ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন।

## ডাঃ রামনের বাঙ্গালী প্রীতি

আধুনিক ভারতের মানসিক বিকাশে বাঙ্গালীদের অপ্রাদেশিক সেবা ও দান প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করিলেও, বর্ত্তমান ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই বাঙ্গালী বহিষ্কার আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বঙ্গেতর প্রদেশ সমূহে বাঙ্গালীরা যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে

নিজেদের জন্য বিশেষ কোনও সুবিধা রাখার চেষ্টা করেন নাই। ভিন্নপ্রদেশের কথা বাদ দিলেও, বাঙ্গালীরা নিজ প্রদেশে প্রধানতঃ নিজেদের চেষ্টায়, অর্থে ও পরিশ্রমে, জ্ঞানলাভের সহায়তার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালীতে অবাঙ্গালীতে কোনও প্রভেদ রাখেন নাই। উপযুক্ত ভারতীয় মাত্রেই যাহাতে এ সকল প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত স্থান পাইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়াছিলেন। তাঁহারা কোনও দিনই ভাবেন নাই যে, এই সকল পবিত্র শিক্ষায়তনে সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, ভারতের বৃহত্তর স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিয়া প্রাদেশিকতার নীচতাই একদিন শিক্ষিত ভারতীয় কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে।

নিজ প্রদেশে অবস্থিত বলিয়া ডাঃ সরকারের সায়েন্স এসোসিয়েসনে যখন স্বভাবতই বাঙ্গালীর প্রাধান্য ছিল, এবং যখন সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নামক একজন বাঙ্গালীই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ছিলেন, তখনও উপযুক্ত বোধে একজন অজ্ঞাতনামা মাদ্রাজী যুবককে এই সকল প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদ দিতে বাঙ্গালীরা কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। কিন্তু, এই মাদ্রাজী যুবক নিজপদের ও নিয়োগকর্ত্তাদের ন্যস্ত বিশ্বাসের সুযোগ লইয়া সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতাকে প্রশ্রয় দিতে দ্বিধা করেন নাই। শীঘ্রই এসোসিয়েসনের দ্বার বাঙ্গালীদের পক্ষে প্রায় রুদ্ধ হইল। মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে উপযুক্ত অনুপযুক্ত ব্যক্তিরা আসিয়া এসোসিয়েসনে ভিড় করিলেন। যখন বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে রামনকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অন্যায়ের প্রতিবাদ সাধারণের পক্ষ হইতে হইতে লাগিল, তখন রামনের কোনও কোনও শিষ্য বলিতে চাহিয়াছিলেন, উপযুক্ত বাঙ্গালীর অভাবেই রামন বাঙ্গালীদের সুযোগ দিতে পারেন নাই। কিন্তু এ অভিযোগ যে সর্ব্বৈব মিথ্যা তাহা বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী অধ্যাপকদের অধীনে এই আমলে বাঙ্গালী যুবকেরা যেরূপ কৃতিত্বের সহিত বিজ্ঞানানুশীলনে ব্যাপৃত ছিলেন তাহার দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। রামনের প্রাদেশিকতার আর একটি পরিচয় তিনি নিজেই দিয়াছেন। কুণ্ঠাহীন চিত্তে তিনি বলিয়াছেন, তিনি মাহিনা পাইয়াছেন একস্থান হইতে এবং কার্য্য করিয়াছেন অন্য স্থানে। অর্থাৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মাসিক সাড়ে বারশত মুদ্রা গণিয়া লইয়া, নিজের শক্তি সামর্থ্যের সবটুকুই ব্যয় করিয়াছেন সায়েন্স এসোসিয়েসনে। আরও মজার কথা, সায়েন্স এসোসিয়েসনে গবেষণা করিবার জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহু মূল্যবান যন্ত্রপাতি লইয়া গিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ডাঃ রামন ইচ্ছা করিলে সহজেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের গবেষণাকার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। না করিবার সম্ভাবিত কারণের একটি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্য্য করিলে, হয়ত এসোসিয়েসন তাঁহার হাতছাড়া হইয়া যাইত। দ্বিতীয় কারণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা চালাইলে, তাহার সুবিধা মাদ্রাজীদের অপেক্ষা বাঙ্গালীরাই অধিক পাইতেন। সুখের বিষয়, এসোসিয়েসনের গত সাধারণ সভায় কতিপয় ব্যক্তির চেষ্টায় এসোসিয়েসন হইতে ডাঃ রামনের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও মাদ্রাজী কর্ত্তৃত্ব অপসারিত হইয়া, ভারতীয় কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহাতে উপযুক্ত ব্যক্তিমাত্রেই এসোসিয়েসনে গবেষণা চালাইতে পারেন, সেদিকে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি থাকিলে, সকলের সন্তোষের বিষয় হইবে।

ইহার পরও ডাঃ রামন অভিযোগ করিয়াছেন যে, বাঙ্গালীরা তাঁহাকে দেখিতে পারেন না। সত্য হইলেও কি ইহা বিশেষ দোষের?

## মহাত্মার প্রাণনাশের চেষ্টা

পুণায় মহাত্মার প্রাণনাশের চেষ্টা হইয়াছিল এবং অন্য নানাস্থানেও তাঁহার উপর ছোটখাট বলপ্রয়োগের চেষ্টা হইয়াছে। মহাত্মার উদ্দেশ্য যে অনেকটা সাফল্যের দিকে যাইতেছে এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত আন্দোলন যে অনেকটা শক্তিসঞ্চয় করিতেছে, ইহা তাহারই প্রমাণ। যাঁহারা অস্পৃশ্যতা দূরীভূত করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা ইহাতে উল্লসিত হইতে পারেন।

## বাংলা ও আসামে বন্যা

পূর্ব্ববাংলা ও আসামের বহুবিস্তৃত অঞ্চল বন্যাপ্লাবিত হইয়াছে এবং তাহাতে এই সকল স্থানের সমস্ত শস্য নাশ, বহু পশুর প্রাণনাশ এবং সংখ্যাতীত লোকের সম্পত্তি নাশ ঘটিয়াছে। বহুলোক—শিশু, বালকবালিকা ও নারী মৃত্যুমুখেও পতিত হইয়াছেন। আসামও বলিতে গেলে বাংলারই অংশ। বাঙ্গালীর সেবার শক্তির ও আত্মরক্ষার শক্তির পরীক্ষার এই নূতন আহ্বানে সাড়া দিতে, কষ্টসহিষ্ণু সেবাপরায়ণ যুবকেরা এবং সাহায্যক্ষম গৃহস্থেরা পশ্চাৎপদ হইবেন না বলিয়া আশা করি।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

[ মধুপর্ক নামে একটি নূতন বিভাগ আরম্ভ হ'ল। এ বিভাগটি মধুপর্কেরই মত পাঁচ রকম বস্তুর সংমিশ্রণে রচিত হবে। শ্রীযুক্ত আশীষ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ এ বিভাগের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেছেন। মধুপর্কের নির্দ্দিষ্ট কোনও রূপ এঁরা এখনও নির্দ্ধারণ করেন নি। কারণ সজীব পদার্থের স্বধর্ম্ম এই যে তা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, অতএব গোড়া থেকেই তাকে ধরাবাঁধা কাঠামোয় বেঁধে ফেলা মানেই তাকে ছোট করা। কেবল মাত্র সুনির্দ্দিষ্ট বস্তুকে সম্বল করে নয়, সকল দিক দিয়েই এঁরা মধুপর্ককে শ্রী দান করবেন। এঁদের যত্নে ও পরিশ্রমে বিভাগটি যে উত্তরোত্তর চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠ্‌বে সে বিষয়ে সংশয় নেই।

বিঃ সঃ ]

## বিচিত্র মোটরকার

স্যার ডেনিস্‌ বার্নি বিখ্যাত এরোপ্লেন R-100এর নির্ম্মাতা, পাশের ছবির অদ্ভুত মোটরখানি তাঁরই তৈরী। এর

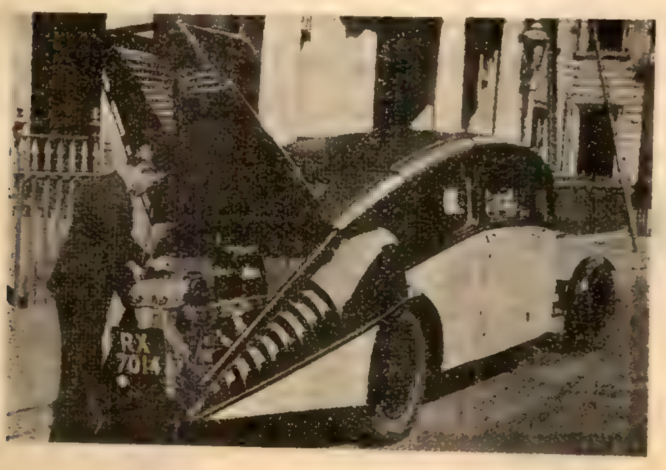


মোটরকারের পিছনের এঞ্জিন খুলিয়া দেখান হইতেছে

গঠনপ্রণালী R-100এর ধরণের এবং সেইজন্যই বাতাসের বাধা অতিক্রম করা এর পক্ষে অনায়াসসাধ্য এবং বিস্ময়ের বিষয় এই যে অন্য গাড়ীর তুলনায় এর পেট্রোলের খরচও প্রায় অর্দ্ধেক। এই গাড়ীর অবয়বের গঠনকার্য্যে যে বৈজ্ঞানিক কৌশল অবলম্বন করা হ'য়েছে, তারই ফলে গতিবৃদ্ধির সময় গাড়ীর চাকা ভূমি স্পর্শ করে না বল্‌লেই একরকম চলে,—অর্থাৎ সেই অবস্থায় এর চাকার টায়ারের ঘর্ষণজনিত অপচয় নেই। গাড়ীর গতি যদি কখনও ঘণ্টায় ১৮০ মাইল হয়, তাহ'লে সেই অবস্থায় এ প্রকৃতই ভূপৃষ্ঠের মায়া কাটিয়ে খানিকটা উঁচু দিয়েই দৌড়ে চল্‌বে। এই বিচিত্র গাড়ীর আরও একটা লক্ষ্য কর্‌বার বিষয় হচ্ছে এই যে এর এঞ্জিন বসানো আছে পিছনদিকে, সাম্‌নে নয়।

## অতিকায় বৈদ্যুতিক বাতি

সাধারণতঃ পঞ্চাশটি বাড়ীতে যে পরিমাণ আলো জ্বলে, এই ৫০,০০০ ওয়াট আলো হ'তেও সেই পরিমাণ কিরণ বিনির্গত হয়। এর তিন পাউণ্ড ওজনের আঁশগুলোতে

যত তার আছে, তাতে ১২৫,৬৯৫টা পঁচিশ ওয়াট ম্যাজ্‌দা বাল্‌ব তৈরী হ'তে পারে। ঘরে আলো জেলে আত্মহত্যা

৫০,০০০ ওয়াট্‌ বাতি

কর্‌বার জন্য এর সৃষ্টি নয়, এর ব্যবহার হচ্ছে সবাক চিত্র তোলায়।

## পাঁচ বছরে দেড় হাজার মাইল

উত্তর আমেরিকার এস্কিমোদের অশন ও বসন যোগাড় হয় ক্যারিবু (caribou) নামধারী হরিণ থেকে। সনাতন কাল থেকেই এই নিয়ম চলে আসছে কিন্তু সভ্য জাতির দৌলতে বন্দুক আর গুলি বারুদ পেয়ে এস্কিমোরা যে-ভাবে ক্যারিবু বংশ ধ্বংস করতে আরম্ভ করছে তাতে করে' আশঙ্কা হয় যে অনতিবিলম্বেই তারা একেবারে লোপ পাবে।

তখন এস্কিমোরা খাবে কি? এই চিন্তা ক্যানাডার রাজ-সরকারকে ভাবিয়ে তুলেছে। এস্কিমোদের বংশ খুব বিশাল নয়, সমস্ত পৃথিবীতে মোট এস্কিমোর সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের বেশী নয়। সুতরাং খাদ্যের অভাবে তারাও যাতে দেখতে দেখতে লুপ্ত না হয়ে যায় এজন্য ক্যানাডার গভর্ণমেণ্ট চেষ্টার ত্রুটি করবেন না।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উত্তর আমেরিকায় ক্যারিবু ছাড়া অন্য হরিণ ছিল না। সেই সময় কয়েকজন পণ্ডিত সাইবেরিয়া থেকে কয়েকটি বল্‌গা হরিণ বা Reindeer এনে এ্যালাস্কায় ছেড়ে দেন। তারপর থেকে ক্রমশঃ তাদের বংশবৃদ্ধি হয়ে এখন তারা সংখ্যায় অগণিত হয়ে উঠেছে।

ক্যানাডার রাজশক্তির বাসনা যে এ্যালাস্কা থেকে একদল বল্‌গা হরিণ উত্তর ক্যানাডায় এনে ছেড়ে দেবেন। ক্যারিবুর পরিবর্ত্তে এস্কিমোরা বল্‌গা হরিণের মাংস খাবে ও চর্ম্মাবরণে শরীর রক্ষা করবে।

লোমেন কর্পোরেশন নামে একটি কোম্পানী এ্যালাস্কা থেকে উত্তর ক্যানাডা—এই ১৫০০ মাইল পথে ৩০০০ বল্‌গা হরিণ তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার গ্রহণ করেছেন। তাঁরা প্রথমে ভেবেছিলেন যে বছর দু'একের মধ্যেই সব কাজ শেষ হয়ে যাবে কিন্তু প্রায় ৫ বছরেও তাঁদের ১৫০০ মাইল পথ চলা শেষ হল না।

উত্তর আমেরিকার তুষারাচ্ছন্ন গিরিবর্ত্মের মাঝখান দিয়ে তিন হাজার বুনো হরিণ তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া নিতান্ত সহজসাধ্য নয়। বল্‌গা হরিণ সহজে ঘরছাড়া হতে চায় না। সময়ে সময়ে যখন দল বেঁধে সব বাধা ভেঙ্গে তারা আবার এ্যালাস্কার দিকে দৌড় দেয় তখন লোমেন

ক্যানাডার পথে

কর্পোরেশনের লোকগুলি কি ভীষণ বিপদে পড়ে সহজেই অনুমেয়। এর উপর আবার প্রবল তুষারপাতে ও তুষার ঝটিকায় সময়ে সময়ে পথচলা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

গত বছর ডিসেম্বর মাসে হরিণেরা যতদূর পর্য্যন্ত এসেছিল, আজও তারা ঠিক সেইখানেই আছে। বাকী তু'শ মাইল পথ এতদিনেও তারা চলতে পারেনি। বসন্তের শেষভাগে হরিণীরা সন্তান প্রসব করে কাজেই শিশু হরিণগুলি দীর্ঘ পথ চলতে সক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

লোমেন কর্পোরেশনের লোকগুলিকে সকল সময়েই অতি সতর্ক থাকতে হয়। লোলজিহ্ব হিংস্র নেকড়ের পাল দিবারাত্র হরিণদের আক্রমণ করবার সুযোগ খোঁজে; খরস্রোতা তুষার নদীগুলির জলে পড়ে' সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হয়ে বহু হরিণ ভেসে যায়, প্রবল তুষারঝটিকায় শাবকগুলি চাপা পড়ে—এ সব বিপদ থেকে তাদের রক্ষা করে লোমেন কর্পোরেশনের লোকেরা।

এই বছরেই বোধহয় এই দীর্ঘ পথ চলা শেষ হবে। এতদিন পর্য্যন্ত এই কাজের জন্য ক্যানাডার রাজসরকার ৬ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন এবং আরও কত যে খরচ হবে সে কথা এখন ঠিক করে বলা চলে না।

## ট্রেণের বায়ু শীতল করা

কোন কোন বড় সহরে এ্যামেরিকার ব্যালটিমোর এ্যাণ্ড ওহিয়ো রেলরোড রাত্রিকালে তাদের ট্রেণের ভিতরকার বায়ু শীতল রাখ্‌বার জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করে' থাকে।

—মোটরকারে কতকগুলো বরফ রাখা হয় এবং ওই মোটরকার সংলগ্ন একখানা বড় পাখার সাহায্যে বরফের উপর দিয়ে বাইরের বাতাস আকর্ষণ করে' ট্রেণের জানালা দিয়ে ঘুমোবার গাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়,—ট্রেণের ভিতরকার উত্তপ্ত বায়ু উপরের ছিদ্রপথে বেরিয়ে যায়।

ট্রেণের বায়ু মোটরের সাহায্যে শীতল করা হইতেছে

## দুর্দ্দম প্রেম

নবীন প্রেমিক তাঁর প্রণয়িনীকে চিঠি লিখেছেন—"তুমি আমার নয়নের তারা, আমার হৃদয়ের কৌস্তভ, আমার জীবন, যৌবন, সর্ব্বস্ব। তোমার জন্য আমি আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি, তুঙ্গগিরি লঙ্ঘন করতে পারি, তুষানলে জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারি।"

"পুঃ—যদি বৃষ্টি না হয়, কাল তোমাদের বাড়ী যাবো।"

## নকল চলবে না

নটী—ম্যানেজার বাবু, এবার থেকে থিয়েটারে খাবারের দৃশ্যে নকল খাবার দিলে চলবে না। আজকের তৃতীয় অঙ্কে সে কথাটা মনে রাখবেন।

ম্যানেজার বাবু—তা না হয় রাখবো। কিন্তু আজকের পঞ্চমাঙ্কে যে বিষপাত্রের ব্যবস্থা আছে তাতেও কি নকল চলবে না?

## পাজী ছেলে নয়, মাষ্টার মশাই

একজন বিদ্যালয়-পরিদর্শক একদিন এক বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে গিয়ে পাশের একটি ক্লাশে অত্যন্ত গোলমাল হচ্ছে শুনে অতিশয় অসন্তুষ্ট হ'লেন। অবশেষে কোলাহল যখন উদ্দাম হ'য়ে উঠ্‌ল তখন তিনি আর সইতে না পেরে, সেই ক্লাশে প্রবেশ করে' যে অপেক্ষাকৃত একটু বেশী বয়সের ছেলেটি সব চেয়ে বেশী গোলমাল করছিল, তার ঘাড় ধরে' হিড়্‌হিড় করে' টেনে এনে প্রধান শিক্ষকের ঘরে একখানা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন, উত্তেজিত

ভাবে তাকে সম্বোধন করে' বল্‌লেন, "এখানে চুপ করে' বোসো, নড়েছ কি ঠ্যাং খোঁড়া করে' দিয়েছি,—আসুন তোমাদের হেড মাষ্টার ক্লাশ থেকে, তারপর কর্‌ছি এর বিহিত—"

তিনি রুমালে মুখ মুছলেন।

দরজার সাম্‌নে ঝোলানো পর্দা সরিয়ে ছোট্ট একটি মুণ্ডুর সামান্য একটুখানি অংশ দেখা গেল।

ইন্‌স্পেক্টর চীৎকার করে' উঠ্‌লেন, "কে রে?"

ছোট মুণ্ডুর মালিকের ভীত কণ্ঠ থেকে অস্পষ্ট আওয়াজ এল "স্যার, আপনি আমাদের মাষ্টার মশাইকে ধরে' এনেছেন।

## জবাব দিতে পার্‌তে

"বাবা, পিচের রাস্তা কি করে' করে বাবা? আচ্ছা বাবা, রেডিয়ো কি করে' ফিট করে বাবা?"

"দেখ খোকা, এই নিয়ে তুমি আজ আমাকে হাজারটা প্রশ্ন করেছ। আমায় একটু শান্তিতে থাকতে দাও।—তোমার মতন বয়সে আমি যদি আমার বাবাকে এম্‌নিধারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌তাম, তবে আমার বরাতে কি ঘট্‌ত?

"তাহ'লে তুমি আমার কথার অন্ততঃ দু'একটারও জবাব দিতে পার্‌তে!"

## আপনিই পেলেন

পথের মাঝখান দিয়ে পুরোহিত ঠাকুর চলেছেন, টিকিতে ফুল বাঁধা আছে, হাতে আছে নৈবেদ্যের চালকলা। রাস্তার ধারে কয়েকটি ছোট ছেলে প্রচুর পরিমাণে চীৎকার করে কলহ কর্‌ছে,—পুরোহিত বল্‌লেন, "কি হয়েছে, তোমরা ঝগড়া কর্‌ছ কেন?"

সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছেলেটি বল্‌লে "এই কুকুরটার জন্য ঠাকুর মশাই।" আমরা ঠিক করেছি সবচেয়ে বড় মিথ্যেকথা যে বল্‌তে পার্‌বে, কুকুরটা তাকেই পুরস্কার দেওয়া হবে অথচ সবাই বল্‌ছে যে তার মিথ্যেকথা সবচেয়ে বড়—

পুরোহিত শিউরে উঠ্‌লেন, "ছিঃ, ছিঃ, মিথ্যেকথা বলা নিয়ে আবার পুরস্কার। তোমাদের মতন বয়সে মিথ্যে-কথা যে কাকে বলে আমি ত তাই জানতুম না—"

ক্ষুদ্র বাহিনীটি সমস্বরে বল্‌লে "ঠাকুর মশাই, শেষ অবধি কুকুরটা আপনিই পেলেন।"

## অসহায় ভগবান

রবিবার দিনের সকাল,—খোকা আর তার বাবাতে কথা হচ্ছে।

"বাবা ভগবান সব কর্‌তে পারেন?"

"পারেন বৈকি।"

"মস্ত বড় পাহাড় তৈরী কর্‌তে পারেন?"

"নিশ্চয় পারেন।"

"আচ্ছা খুব বড়, ভীষণ বড় পাহাড়?"

"হ্যাঁ, ভগবান তাও তৈরী কর্‌তে পারেন।"

"আচ্ছা বাবা, ভগবান সে পাহাড় তুল্‌তে পারেন?"

"খুব, খুব—"

"আচ্ছা, ভগবান এতবড় পাহাড় তৈরী কর্‌তে পারেন, যা তিনি নিজেই তুল্‌তে পারেন না?"

খোকার বাবার মুখ গম্ভীর হ'ল, ক্রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বল্‌লেন, খোকা, আমার অফিসের বেলা হ'য়ে যাচ্ছে, এখন আমায় বিরক্ত কোরো না যাও।"

এরকম অবস্থায় খোকার বাবার অফিসের বেলা অবশ্য হ'তে পারে—কিন্তু আমাদের পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে কেউ কি অনুগ্রহ করে' সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে এই অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধার কর্‌তে পারেন না?

## ভালো ত!

মানুষে ও পশুতে এরূপ কোলাকুলি সকলের পক্ষে নিরাপদ নয়

শ্রীআশীষ গুপ্ত

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

# পাহাড়িয়া চিঠি

শ্রীহেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণীয়া শ্রীমতী শৈলজা দেবী ও শ্রীমণিকা সেনগুপ্ত
কল্যাণীয়াসু

বুড়ীগঙ্গার পাড়················বাংলা দেশ !

ভাবছি বসে শৈলশিরে বাজ্‌ছে মনে গভীর ব্যথা,
তোমরা যে আজ গেছ ভুলেই গ্রাম্যগীতি কবির কথা,—
অনেক দিনই হয়নি দেখা, অঝোর-ঝরা বাদল রাতে
কি যে চিঠি লিখ্‌ব তোদের ভাব্‌ছি বসে সজল প্রাতে।
শিলং সহর নয়কো মন্দ ফুল বাগিচার ঝোপে ঝাড়ে
শ্যামল ছায়ার নেইকো অভাব সরল বনের উভয় ধারে,
ঘুমন্ত এই রাজ্যে বসি ভাব্‌ছি আমি কেউ কি জাগি
অনুরাগের গোপন মায়ায় ডাক্‌ছে মোরে দরশ মাগি',....
কাজল আঁখির সজল পরশ জাগিয়ে তোলে মেঘের পরে
কোন অজানার আকুল চাওয়া দেয় গো ব্যথা হর্ষ ভরে ;
আকাশ ভুবন উজল-করা দূর বনানীর শ্যামল শোভা
নিতুই নূতন রঙিন আভা ধ্যানীর চোখে দিব্য লোভা !
নিবিড় ছায়া, গহন মায়া ডাক্‌ছে মোরে অনামিকা
নিত্য মোরে জাগায় ঘুমে সবুজ স্বপন কর্‌ছে ফিকা,
কমলানেবুর দেশ যে বলে পাইনিকো হায় চিহ্নটি তার
ঘুরে ফিরে বনবাদাড়ে আনন্দ মোর অসীম অপার !
কুয়াশারি ওড়না মুখে দেখন-হাসি বাস্‌ছি ভালো
ঐ যে এলো মেঘের রাশি, ওই যে দূরে রোদের আলো !
নাম্‌ল গগন ভুবন ভরে' কোন্ বিরহীর অশ্রুসজল
হয়ত মোদের কিংবা কারো জীবনে আজ বইছে বাদল !
একটু সবুর কোরতে হবে অন্ততঃ এই মাসেক খানিক
তারপরেতে ফিরবে ঘরে ঘরছাড়া ওই সোনার মাণিক !

শিলং সহর নয়কো নূতন বল্‌তে পারি কি আর আছে,
স্বপন দেশের স্বপন কথাই বল্‌ব কত তোদের কাছে।
মশামাছির নেইকো বালাই, নেইকো কাকের যন্ত্রণাটি
বনে বনে চল্‌ছে নিতুই চড়ুই পাখীর মন্ত্রণাটি,
নাইকো "পাথার" ভনভনানি, ঘামাচি আর গাত্রজ্বালা
নাইকো আপদ বোল্‌তা ভ্রমর আরসুলা ব্যাঙ্‌. বংশীওলা !
অদ্ভুত হায় এই দেশেরি ছাগল পাঁঠার শুভ্র দেহ
বরফগলা ঝর্ণাতলে এদের বুঝি অমল গেহ,
পাহাড়ী সব জোয়ান মেয়ে খাট্‌ছে তারাই পেটের দায়ে
পুরুষ ঝিমায় মদ্যপানে নাচে ধিধিঙ্‌ আদুল গায়ে,
"পুঞ্জি" হতে গুঞ্জরণে পুঞ্জে পুঞ্জে আস্‌ছে তারা
উৎরাই পথ চল্‌ছে সবে নাইকো ভয় পকেট মারা।
"মামা-মামীর-দেশ" যে ব'লে শুন্‌ছি কাণে দেখ্‌ছি বেশ,
মেয়েরা সব বেড়ায় ঘুরে সোণার পরীর স্বপন বেশ !
ব্যবসা করে হাটবাজারে গুরুগিরির অন্ত নাই
গৃহিণী ও সব্যসাচী, বিদ্যালয়ে নাই কামাই ;
চ্যাপ্‌টা নাকে সুরমা চোখে চেয়েই থাকে অপ্‌সরী
পান খেয়ে আর গান গেয়ে যায় কোন অতীতের সুখ স্মরি,
আর কি লিখি ; এইখানে শেষ, কেমন "টিটু" জগন্নাথ,
গান লিখে আর গল্প শুনে কাট্‌ছে মোদের গভীর রাত,
নিদ্রা এসে পরশ দিয়ে ভোলায় আমার সকল ব্যথা'
নিতুই ভোরে শুন্‌ছি শুধুই সরল বনের মৌন কথা।

হেম

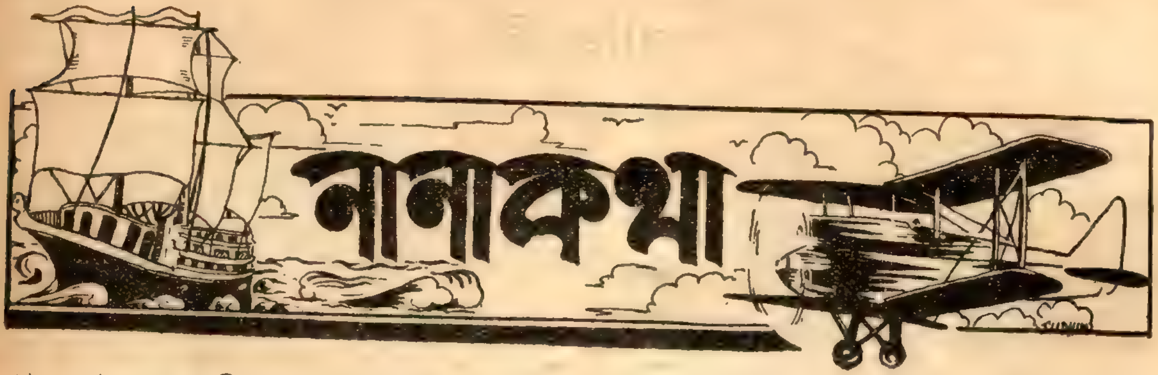


## পরলোকগত কবিরাজ শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি

বিগত ৩রা জুলাই মঙ্গলবার রাত্রি দশটার সময় কবিরাজ-শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় কয়েকদিনের অসুখ ভোগ করার পর পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৭০ বৎসর বয়স হয়েছিল। বাচস্পতি মহাশয়ের মৃত্যুতে শুধু আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রেরই সমূহ ক্ষতি হ'ল না, বঙ্গদেশের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান তাঁর সহায়তা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল। এ ক্ষতি কত দীর্ঘকালের পর পূরণ হবে তা বলা অসম্ভব।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বাচস্পতি মহাশয়ের প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি এবং রোগনির্ণয়ে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ইহার সহিত সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার সুযোগ যুক্ত হওয়ায় তিনি ভারতবর্ষের বৈদ্যচিকিৎসকগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন।

সংস্কৃত ভাষায় বাচস্পতি মহাশয়ের অপরিমেয় পাণ্ডিত্য ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের তিনি অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন। নিখিল ভারত আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলনের তিনি একাধিকবার সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন এবং ১৩৪০ সালে কলিকাতায় নিখিল-বঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ মহাসভার নেতৃত্ব করেছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রচার এবং উন্নতিকল্পে তিনি অকাতরে তাঁর শক্তি এবং অর্থ নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ এবং তৎসংযুক্ত দাতব্য চিকিৎসালয় বহুকাল তাঁর কীর্ত্তিকে কৃতজ্ঞ দেশবাসীর অন্তরে জাগরিত রাখ্‌বে। তিনি তাঁর উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ এই বৈদ্যশাস্ত্রপীঠকে দান করেন। শুধু ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই তাঁর দানশীলতা নিবদ্ধ ছিল না, পরন্তু বহু নিরন্ন দরিদ্র ব্যক্তিকে তিনি নিয়মিত অর্থসাহায্য করতেন। বহু ছাত্র এবং শিষ্যকে আশ্রয় এবং বিদ্যাদান ক'রে জীবনের পথে প্রবর্ত্তিত ক'রে দিয়ে গেছেন।

বাচস্পতি মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয় কলিকাতার একজন খ্যাতনামা কবিরাজ। আমরা আশা এবং প্রার্থনা করি তিনি অচিরে সর্ব্বোতভাবে তাঁর স্বনামধন্য পিতৃদেবের উচ্চ আসন অধিকার করতে সমর্থ হবেন। তাঁকে এবং বাচস্পতি মহাশয়ের শোকসন্তপ্তা কন্যা-গণকে আমরা আমাদের ঐকান্তিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

## জলধর-সম্বর্দ্ধনা

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, ভারতবর্ষ-সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনার জন্য যে পরিচালক-সমিতি গঠিত হ'য়েছে তাঁদের অনুরোধক্রমে তৃতীয় অধিবেশনের বিবরণ 'বিচিত্রা'র পাঠকবর্গের গোচর করা গেল। স্থির হ'য়েছে যে—

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কিংবা সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী,—এই তিনজনের একজন মূল সভার পৌরোহিত্য করবেন।

২। অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত ১১ই, ১২ই ও ১৩ই আগষ্ট এই তিন দিন উৎসব। প্রথমদিন অভিনন্দন ও মাঙ্গলিক, দ্বিতীয় দিন সাহিত্য-সম্মেলন, ও তৃতীয় দিন সঙ্গীতাদি।

৩। দেশবাসী কর্ত্তৃক এই প্রবীণ সাহিত্যিককে তাঁর পঞ্চসপ্ততিতম জন্মতিথিতে একটা "অর্থপূর্ণ থলি" উপহার দেওয়া হ'বে।

এই সম্বর্দ্ধনা যা'তে সাফল্য-মণ্ডিত হয় সেজন্য সহায়তা করবার জন্য আমরা দেশের সাহিত্যিকবৃন্দকে আহ্বান করি।

## বেঙ্গল মিল ওনার্স এসোসিয়েশন

আমরা শুনে সুখী হ'লাম যে, যে-ক'টি মুষ্টিমেয় বস্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে আছে, তাঁরা সকলে মিলে "বঙ্গীয় কল-ওয়ালা সমিতি" বা Bengal Mill-owners' Association নাম দিয়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে একটি সমিতি গঠিত করে তুলেছেন। উদ্দেশ্য, বাংলাদেশে বস্ত্রশিল্পের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন করে বাংলার বস্ত্রের বাজার সম্পূর্ণরূপে বাঙালীর করায়ত্তে আনয়ন করা। এই সাধু সঙ্কল্প যদি কার্য্যে পরিণত করা যায়,—তবে একদিন বাংলাদেশ বস্ত্রসম্বন্ধে স্ব-সম্পূর্ণ হ'তে পারবে,—এবং তার ফলে কাপড়ের কলগুলিতে বহু বেকারের অন্নের সংস্থান হ'তে পারবে। বাংলাদেশে এমন একটি সমিতির প্রয়োজন ছিল,—এর সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন কলের মালিকদের মধ্যে মৈত্রী ও সদ্ভাব স্থাপিত হ'তে পারবে,—অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা থেকে দেশের বস্ত্রশিল্প রক্ষা পাবে,—এবং দেশের মধ্যে বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে জ্ঞানপ্রচারের সহায়তা হ'বে। আমরা এই নূতন সমিতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

## মধুচক্র বার্ষিকী

রাঁচির সহরতলী হিন্দুপল্লীতে "মধুচক্র" নামে একটি রবীন্দ্র-সাহিত্য-সেবা প্রতিষ্ঠান আছে,—সেখানে রবীন্দ্র-সাহিত্যের কেমন আলোচনা হয়,—তার একটু আভাস পাঠকবর্গকে দেওয়ার জন্য "মধুচক্রে"র তৃতীয় বার্ষিক উৎসবের একটি বিবরণ এইখানে প্রকাশ করা গেল।

"রাঁচির সহরতলী হিন্দুপল্লীতে স্থানীয় রবীন্দ্র-সাহিত্য-সেবা প্রতিষ্ঠান "মধুচক্রের" তৃতীয় বার্ষিক উৎসব গত ২৩শে বৈশাখ রবিবার শ্রীযুক্ত নীরদকুমার রায় মহাশয়ের নেতৃত্বে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার চৌধুরী সময়োচিত প্রার্থনা করেন। তারপর মধুচক্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবনীশ্বর দাসগুপ্ত মহাশয় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে অভ্যর্থনা করিয়া এবং মধুচক্রের বিগত বর্ষের কার্য্যাবলী বর্ণনা করিয়া একটি বক্তৃতা করেন।

মধুচক্রের সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার চৌধুরী মহাশয় এই উপলক্ষে 'রবীন্দ্র কাব্যে অনন্তের অনুভূতি' শীর্ষক একটি হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের নানা বয়সের নানা কবিতা ও রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়া ইহাই দেখান হয় যে 'সীমার ভিতরেই অসীমের বীজ নিহিত এবং তাহাই একদিন সহজ সরলভাবে সীমাকে অতিক্রম করিয়া অসীমের সহিত মিলিত হয়; জীবনকে যখন আমরা বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে দেখি তখন আমরা ইহা ঠিক বুঝিতে পারি না; কিন্তু যখন অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে ইহার যোগসূত্র বুঝিতে পারি তখনই ইহা উপলব্ধি করিয়া জীবনকে ধন্য করিয়া তুলিতে পারা সম্ভব হয়।'

শ্রীযুক্ত প্রভাতরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ

অনাথা বিধবার
সম্বল, দুঃস্থের সংস্থান, বিপদে সম্পদ, অভাবে বন্ধু।
মাসিক ।৵০ হইতে ২৲ চাঁদায় ৫০০৲ জীবন বীমা। অনূঢ়া কন্যার বিবাহের ও বিধবার জন্যে মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা।
দি স্যাঙ্গুইন ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ ৯৮।৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
কমিশনে বা বেতনে এজেন্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যক।

বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের ছুটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে মোহিত করেন; তৎপরে উৎসব সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত নীরদকুমার রায় মহাশয় তাঁহার উচ্চচিন্তা গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণটি পাঠ করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে ইহা প্রতিপাদন করেন যে জগতে কবিই প্রকৃত সত্যদর্শী; বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে যে আনন্দ অনুস্যূত রহিয়াছে, সেই কল্যাণময় নির্ম্মল আনন্দের বিচিত্র রসানুভূতি হইতেই কাব্য ও সাহিত্যের সৃষ্টি; এই রসানুভূতি মানুষকে শ্রেয়ের পথে চলিতেই সাহায্য করে; যাহা ক্ষণস্থায়ী স্থূল বিলাস হইতে উদ্ভূত তাহা রসের বিকার মাত্র এবং পরিত্যাজ্য।

এই উৎসব উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটী প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হইয়াছিল, বিষয় ছিল 'রবীন্দ্র সাহিত্যে মানব প্রেম'। প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধটি সভায় পঠিত হয়। শ্রীমান দেবপ্রসাদ সেন প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করেন।"

## হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

আমরা শুনে সুখী হ'লাম যে গত ৩০শে এপ্রিল যে বৎসর শেষ হোলো,—সেই বৎসরে "হিন্দুস্থানে" নূতন জীবন বীমার কাজ হ'য়েছে দু'কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার। গত বৎসরে হ'য়েছিল,—দু'কোটি টাকার। ব্যবসা বাণিজ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বেশি কাজ করা সহজ কথা নয়। আমরা "হিন্দুস্থানের" কর্ত্তৃপক্ষকে এর জন্য অভিনন্দিত করি।

## কলিকাতার নূতন মেয়র

কলিকাতা কর্পোরেশনের গণ্ডগোল মেটাতে আমরা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়েছি। শেষ পর্য্যন্ত মেয়র নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন "হিন্দুস্থানের"ই অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার। তাঁকে আমরা আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। এত বড় প্রতিষ্ঠান "হিন্দুস্থান"ই তাঁর যোগ্যতার জীবন্ত সাক্ষী। এখানে তিনি পঁচিশ বছর আগে সামান্য কেরাণী হিসাবে প্রবেশ করেছিলেন;—আজ তিনি তার কর্ণধার। কর্পোরেশনের কার্য্যাবলীও যে তাঁর দ্বারা সুদক্ষ-ভাবেই পরিচালিত হ'বে,—সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।

## ফরাসী সরকার কর্ত্তৃক বাঙালীর সম্মান

চন্দন নগরের শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ ও শ্রীযুক্ত সাধুচরণ মুখোপাধ্যায় ফরাসী সরকার কর্ত্তৃক "Chevalier de la légion d' honneur" উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন জেনে আমরা পরম আনন্দিত হ'লাম। এই উপাধি ইংরাজ সরকারের নাইট্‌হুড (Knighthood) উপাধির অনুরূপ। ফরাসী সরকার এই উপাধি যোগ্যপাত্রেই অর্পণ করেছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ, ও শ্রীযুক্ত সাধুচরণ মুখোপাধ্যায়কে আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

## মোহামাডান স্পোর্টিং ক্লাব

এবার কলিকাতা ফুটবল লীগের প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে—মোহামাডান্ স্পোর্টিং ক্লাব। ইতিপূর্ব্বে অন্য কোনো ভারতীয় ক্লাব এমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি,—এমন কি মোহনবাগানও নয়। খেলাধূলার জগতে মোহামাডান স্পোর্টিং ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন। আমরা তাঁদের আমাদের সাদর অভিবাদন জ্ঞাপন করি।

## মাইকেল মৃত্যু-বার্ষিকী

গত ২৯শে জুন প্রাতে খিদিরপুর মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরীর সভ্যগণ লোয়ার সারকুলার রোড সমাধিক্ষেত্রে সমবেত হ'য়ে কবি ও কবিপত্নীর সমাধিস্তম্ভ পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন ও বেলা আড়াইটের সময় কলিকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে নিম্নলিখিতভাবে সঙ্গীতাদির অনুষ্ঠান করেন।

(১) গান:—কুমারী ইন্দিরা, পুষ্পরাণী, জয়াবতী ও শ্রীশিবশঙ্কর দাস।
(২) আবৃত্তি:—শ্রীসুধীরকুমার বসু মল্লিক, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
(৩) বক্তৃতা:—শ্রীশিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র।

Edited by Upendranath Ganguly, Printed by Saratchandra Mukherjee at The Sreekrishna Printing Works 259 Upper Chitpore Road, and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.

বিচিত্রা
ভাদ্র, ১৩৪১

কলাপী

শিল্পী
পরলোকগতা প্রকৃতি দেবী

বিচিত্রা

অষ্টম বর্ষ, ১ম খণ্ড | ভাদ্র, ১৩৪১ | ২য় সংখ্যা

# যাত্রাশেষে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিজন রাতে যদি রে তোর
সাহস থাকে
দিনশেষের দোসর যে জন
মিল্‌বে তাকে।
ঘনায় যবে আঁধার ছেয়ে
অভয় মনে থাকিস্ চেয়ে
আস্‌বে দ্বারে আলোর দূতী
নীবব ডাকে॥

যখন ঘরে আসনখানি
শূন্য হবে
দূরেব পথে পায়ের ধ্বনি
শুনবি তবে।
কাটল প্রহর যাদের আশায়
তারা যখন ফিরবে বাসায়
সাহানাগান বাজবে তখন
ভিড়ের ফাঁকে॥

অনেক চাওয়া ফিরলি চেয়ে
আশায় ভুলি,
আজ যদি তোর শূন্য হোলো
ভিক্ষা ঝুলি
চমক তবে লাগুক্ তোরে,
অধরা ধন দিক্ সে ভরে
গোপন বঁধু, দেখ্‌তে কভু
পাস নি যাকে॥

অভিসারের পথ বেড়ে যায়
চলিস্ যত,
পথের মাঝে মায়ার ছায়া
অনেক মতো।
বসবি যবে ক্লান্তিভরে
আঁচল পেতে ধূলার পরে
হঠাৎ পাশে আস্‌বে সে যে
পথের বাঁকে॥
এবার তবে করিস্ সারা
কাঙালপনা,
সমস্তদিন কাণাকড়ির
হিসাবগণা।
শান্ত হলে মিল্‌বে চাবি,
অন্তরেতে দেখতে পাবি
সবার শেষে তার পরে যে
অশেষ থাকে॥
দূর বাঁশিতে যে-সুর বাজে
তাহার সাথে
মিলিয়ে নিয়ে বাজাস্ বাঁশি
বিদায় রাতে।
সহজমনে যাত্রা শেষে
যাস্‌রে চলে সহজ হেসে,
দিস্‌নে ধরা অবসাদের
জটিল পাকে॥

শান্তিনিকেতন
২৪ শ্রাবণ
১৩৪১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# বিপ্রদাস

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাটীর কাছাকাছি আসিতেই দেখা গেল দ্বিজদাস প্রায় রাজসূয় যজ্ঞের ব্যাপার করিয়াছে। সম্মুখের মাঠে সারি সারি চালা ঘর—কতক তৈরি হইয়াছে কতক হইতেছে—ইতিমধ্যেই আহূত ও অনাহূতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, এখনো কত লোক যে আসিবে তাহার নির্দ্দেশ পাওয়া কঠিন।

বিপ্রদাসকে দেখিয়া মা চমকিয়া গেলেন,—এ কি দেহ হয়েছে বাবা, একেবারে যে আধখানা হয়ে গেছিস্!

বিপ্রদাস পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, আর ভয় নেই মা, এবার সেরে উঠতে দেরি হবে না।

—কিন্তু কলকাতায় ফিরে যেতেও আর দেবো না তা' যত কাজই তোর থাক। এখন থেকে নিজের চোখে-চোখে রাখবো।

বিপ্রদাস হাসি-মুখে চুপ করিয়া রহিল।

বন্দনা তাঁহাকে প্রণাম করিলে দয়াময়ী আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, এসো মা এসো—বেঁচে থাকো।

কিন্তু কণ্ঠস্বরে তাঁহার উৎসাহ ছিল না, বুঝা গেল এ শুধু সাধারণ শিষ্টাচার, তার বেশি নয়। তাহাকে আসার নিমন্ত্রণ করা হয় নাই সে স্বেচ্ছায় আসিয়াছে মা এইটুকুই জানিলেন। তিনি মৈত্রেয়ীর কথা পাড়িলেন। মেয়েটির গুণের সীমা নাই, দয়াময়ীর দুঃখ এই যে এক-মুখে তাহার ফর্দ্দ রচিয়া দাখিল করা সম্ভবপর নয়। বলিলেন, বাপ শেখায়নি এমন বিষয় নেই, মেয়েটা জানেনা এমন কাজ নেই। বৌমার শরীরটা তেমন ভালো যাচ্চে না,—তাই ও একাই সমস্ত ভার যেন মাথায় তুলে নিয়েছে। ভাগ্যে ওকে আনা হয়েছিল বিপিন নইলে কি যে হতো আমার ভাবলে ভয় করে।

বিপ্রদাস বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, বলো কি মা!

দয়াময়ী কহিলেন, সত্যি বাবা। মেয়েটার কাজকর্ম্ম দেখে মনে হয় কর্ত্তা যে বোঝা আমার ঘাড়ে ফেলে রেখে চলে গেছেন তার আর ভাবনা নেই। বৌমা ওকে সঙ্গী পেলে সকল ভার স্বচ্ছন্দে বইতে

পারবেন কোথাও ত্রুটি ঘট্‌বে না। এ বছর ত আর হলো না, কিন্তু বেঁচে যদি থাকি আসচে বারে নিশ্চিন্ত মনে কৈলাস দর্শনে আমি যাবোই যাবো।

বিপ্রদাস নীরব হইয়া রহিল। দয়াময়ীর কথা হয় ত মিথ্যা নয়, মৈত্রেয়ী হয় ত এমনি প্রশংসার যোগ্য কিন্তু যশোগানেরও মাত্রা আছে, স্থান কাল আছে। তাঁহার লক্ষ্য যা-ই হোক, উপলক্ষ্যটাও কিন্তু চাপা রহিল না। একটা অকরুণ অসহিষ্ণু ক্ষুদ্রতা তাঁহার সুপরিচিত মর্য্যাদায় গিয়া যেন রূঢ় আঘাত করিল। হঠাৎ ছেলের মুখের পানে চাহিয়া দয়াময়ী নিজের এই ভুলটাই বুঝিতে পারিলেন কিন্তু তখনি কি করিয়া যে প্রতীকার করিবেন তাহাও খুঁজিয়া পাইলেন না। দ্বিজদাস কাজের ভীড়ে অন্যত্র আবদ্ধ ছিল খবর পাইয়া আসিয়া পৌঁছিল।

বিপ্রদাস কহিল, কি ভীষণ কাণ্ড করেছিস দ্বিজু, সামলাবি কি করে?

দ্বিজদাস বলিল, ভার ত আপনি নিজে নেননি দাদা, দিয়েছেন আমার ওপর। আপনার ভয়টা কিসের?

বন্দনা ইহার জবাব দিল, বলিল, ওঁর ভাব্‌না খরচের সব টাকাটা যদি প্রজাদের ঘাড়ে উসুল না হয় তো তবিলে হাত পড়বে। এতে ভয় হবে না দ্বিজুবাবু?

সকলেই হাসিয়া উঠিল, এবং এই রহস্যটুকুর মধ্য দিয়া মায়ের মনোভারটা যেন কমিয়া গেল, স্মিতমুখে কৃত্রিম কণ্ঠস্বরে বলিলেন, ওকে জ্বালাতন করতে তুমিও কি ঠিক তোমার বোনের মতোই হলে বন্দনা। ও আমার পরম ধার্ম্মিক ছেলে, সবাই মিলে ওকে মিথ্যে খোঁটা দিলে আমার সয় না।

বন্দনা কহিল, খোঁটা মিথ্যে হ'লে গায়ে লাগে না মা, তাতে রাগ করা উচিত নয়।

মা বলিলেন, রাগ ত ও করে না,—ও শুনে হাসে।

বন্দনা বলিল, তারও কারণ আছে মা। মুখুয্যে মশাই জানেন পেটে খেলে পিঠে সইতে হয়, রাগারাগি করা মূর্খতা। ঠিক না মুখুয্যে মশাই?

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, ঠিক বই কি। মূর্খের কথায় রাগারাগি করা নিষেধ, শাস্ত্রে তার অন্য ব্যবস্থা আছে।

বন্দনা কহিল, মেজদি কিন্তু আমার চেয়ে মুখ্যু মুখুয্যে মশাই। বোধ হয় আপনার শাস্ত্রের এই ব্যবস্থার জোরেই সবাই আপনাকে এত ভক্তি করে। এই বলিয়া সে হাসিয়া মুখ ফিরাইল। দ্বিজদাস হাসি চাপিতে অন্যত্র চাহিয়া রহিল এবং দয়াময়ী নিজেও হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, বন্দনা মেয়েটা বড় দুষ্টু, ওর সঙ্গে কারো কথায় পারবার যো নেই।

একটু থামিয়া একটু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, কিন্তু দেখো মা, কর্ত্তাদের আমলে প্রজাদের ওপর এ-রকম যে একেবারেই হতোনা তা বলিনে, কিন্তু তোমাকেত বলেছি বিপিন আমার পরম ধার্ম্মিক ছেলে, যা অন্যায়, যা ওর যথার্থ প্রাপ্য নয় সে ও কিছুতে নিতে পারেনা। কিন্তু ভয় আমার দ্বিজুকে। ও পারে।

বিপ্রদাস প্রতিবাদ করিয়া বলিল, এ তোমার অন্যায় কথা মা। দ্বিজু করবে প্রজা পীড়ন! প্রজার পক্ষ নিয়ে ও আমাদের বিরুদ্ধেই একবার তাদের খাজনা দিতে নিষেধ করেছিল সে কথা কি তোমার মনে নেই?

মা বলিলেন, মনে আছে বলেই ত বলচি। যে ন্যায্য দেনা দিতে বারণ করে, অন্যায় আদায় সে-ই পারে বিপিন, অপরে পারেনা। দয়া-মায়া ওর আছে,—একটু বেশি পরিমাণেই আছে মানি,—কিন্তু তবু দেখতে পাবি একদিন, ওর হাতেই প্রজারা দুঃখ পাবে ঢের বেশি।

—না মা, পাবেনা তুমি দেখো।

দয়াময়ী কহিলেন, ভরসা কেবল তুই আছিস বলে। নইলে এমন কেউ চাই যে ওকে ঠিক পথে চালিয়ে যেতে পারবে। নইলে ও নিজেও একদিন ডুববে পরকেও ডোবাবে।

দ্বিজদাস এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল এবার কথা কহিল, বলিল, তোমার শেষের কথাটা ঠিক হলোনা মা। নিজে ডুব্‌বো সে হয় ত একদিন সত্যি হবে কিন্তু পরকে ডোবাবোনা এ তুমি নিশ্চয় জেনো।

মা বলিলেন, এর এটাও সুখের নয় দ্বিজু, ওটাও আনন্দের নয়। আসলে তোকে চালাবার একজন লোক থাকা চাই।

দ্বিজদাস কহিল, এই কথাটাই স্পষ্ট করে বলো যে সকলের ভাব্‌না ঘুচুক। আমাকে চালাবার কেউ একজন দরকার। কিন্তু সে যোগাড় ত তুমি প্রায় ক'রে এনেছো মা।

মা বলিলেন, যদি সত্যিই করে এনে থাকি সে তোর ভাগ্যি বলে জানিস।

তর্ক-বিতর্কের মূল তাৎপর্য্যটা এবার সকলের কাছেই সুস্পষ্ট হইয়া পড়িল।

মা বলিতে লাগিলেন, এতবড় যে কাণ্ড ক'রে তুল্‌লি কারো কথা শুনলিনে, বল্‌লি দাদার হুকুম। কিন্তু দাদা কি বলেছিল অশ্বমেধ করতে? এখন সামলায় কে বল্‌তো? ভাগ্যে মৈত্রেয়ী এসেছিল সেই ত শুধু ভরসা।

দ্বিজদাস বলিল, কাজটা আগে হয়ে যাক্ মা, তারপরে যাকে খুসি সনন্দ দিও আমি আপত্তি করবোনা কিন্তু এখনি তার তাড়াতাড়ি কি!

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, তখন সনন্দ সই করবে কে দ্বিজুবাবু, তৃতীয়-পক্ষ নয়তো?

দ্বিজদাস কহিল, না, তৃতীয় পক্ষর সাধ্য কি! আজও মহাপরাক্রান্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ যে তেমনিই বিদ্যমান। বলিতে দুজনেই হাসিয়া ফেলিল।

বিপ্রদাস ও মা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন কিন্তু অর্থ বুঝিলেন না।

অন্নদা আসিয়া বলিল, বন্দনা দিদি, বড়বাবুর ওষুধগুলো যে কাল গুছিয়ে তুললে সেই কাগজের বাক্সটা ত দেখতে পাচ্চিনে,—হারালো নাতো?

—না, হারায়নি অন্নুদি, কলকাতার বাড়ীতেই রয়ে গেছে।

দয়াময়ী ভয় পাইয়া বলিলেন, উপায় কি হবে বন্দনা, এত বড় ভুল হয়ে গেল!

বন্দনা কহিল, ভুল হয়নি মা, আসবার সময়ে সেগুলো ইচ্ছে করেই ফেলে এলুম।

—ইচ্ছে করে ফেলে এলে? তার মানে?

বন্দনা বলিল, ভাবলুম, ওষুধ অনেক খেয়েছেন আর না। তখন মা কাছে ছিলেন না তাই ওষুধের দরকার হয়েছিল, এখন বিনা ওষুধেই সেরে উঠবেন একটুও দেরি হবে না।

কথাগুলি দয়াময়ীর অত্যন্ত ভালো লাগিল, তথাপি বলিলেন, কিন্তু ভালো করোনি মা। পাড়াগাঁ যায়গা, ডাক্তার বদ্যি তেমন মেলেনা, দরকার হলে—

অন্নদা বলিল, দরকার আর হবেনা মা। হলে উনি নিশ্চয় আনতেন, কখনো ফেলে আসতেন না। বন্দনা দিদি ডাক্তার বদ্যির চেয়েও বেশি জানে।

দয়াময়ী প্রশংসমান চক্ষে নীরবে চাহিয়া রহিলেন, বন্দনা কহিল, অনুদির বাড়িয়ে বলা স্বভাব মা, নইলে সত্যিই আমি কিছু জানিনে। যা একটু শিখেচি সে শুধু মুখুয্যে মশায়ের সেবা করে।

অন্নদা বলিল, সে-যে কি সেবা মা সে শুধু আমি জানি। হঠাৎ একদিন কি বিপদেই পড়ে গেলুম। বাড়ীতে কেউ নেই, বাসুর অসুখের তার পেয়ে দ্বিজু চলে এসেছে এখানে, দত্তমশাই গেছেন ঢাকায়, বিপিনের হলো জ্বর। প্রথম দুটোদিন কোনমতে কাটলো কিন্তু তার পরের দিন জ্বর গেল ভয়ানক বেড়ে। ডাক্তার ডেকে পাঠালুম, সে ওষুধ দিলে কিন্তু ভয় দেখালে চতুর্গুণ। মুখ্যু মেয়েমানুষ, কি যে করি, তোমাদেরও খবর দিতে পারিনে, বিপিন করলে মানা,—আকুল হয়ে ছুটে গেলুম বন্দনার কাছে, ওঁর মাসির বাড়ীতে। কেঁদে বললুম দিদি, রাগ করে থেকোনা এসো। তোমার মুখুয্যে মশায়ের বড় অসুখ। বন্দনা দিদি যেমন ছিলেন তেমনি এসে আমার গাড়ীতে উঠলেন, মাসিকে বলবারও সময় পেলেন না। বাড়ী এসে বিপিনের ভার নিলেন। দিনে-রাতে একটি ঘণ্টাও সে ক'টাদিন উনি জিরোতে পাননি। কেবল ওষুধ খাওয়ানোই ত নয়, সকালে পুজোর সাজ থেকে আরম্ভ ক'রে রাত্তিরে মশারি ফেলে শুইয়ে আসা পর্য্যন্ত যা-কিছু সমস্ত। এখন বন্দনা দিদি যদি ওষুধ দিতে আর না চায় মা, অন্যথা করে কাজ নেই, ওতেই বিপিন সুস্থ হ'য়ে উঠবে।

বিপ্রদাস তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, সত্যিই সুস্থ হয়ে উঠবো মা, তোমরা ওকে আর বাধা দিওনা, ওর সুবুদ্ধি হোক আমাকে ওষুধ গেলানো বন্ধ করুক। আমি কায়-মনে আশীর্ব্বাদ করবো বন্দনা রাজ-রাণী হোক্।

দয়াময়ী নীরবে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া যেন স্নেহ ও মমতা উছলিয়া পড়িতে লাগিল।

ঝি আসিয়া কহিল, মা, বউদিদি বলচেন কলকাতা থেকে যে-সব জিনিস-পত্র এখন এলো কোন্ ঘরে তুলবেন?

দয়াময়ী জবাব দিবার পূর্ব্বেই বন্দনা বলিল, মা, আমি আপনার ম্লেচ্ছ-মেয়ে ব'লে আপনার এতবড় কাজে কি কোন ভারই পাবোনা, কেবল চুপ করে ব'সে থাকবো? এমন কত জিনিস ত আছে যা আমি ছুঁলেও ছোঁয়া যায়না।

দয়াময়ী তাহার হাত ধরিয়া একেবারে বুকের কাছে টানিয়া আনিলেন, আঁচল হইতে একটা চাবির গোছা খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, চুপ করে তোমাকে বসে থাকতেই বা দেবো কেন মা? এই দিলুম তোমাকে আমার আপন ভাঁড়ারের চাবি যা বউ-মা ছাড়া আর কাউকে দিতে পারিনে। আজ থেকে এভার রইলো তোমার।

কি আছে মা এ ভাঁড়ারে?

এ চাবির গুচ্ছ অত্যন্ত পরিচিত, দ্বিজদাস কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, আছে যা ছোঁয়া-ছুঁয়ির নাগালের বাইরে। আছে সোনা-রূপো টাকাকড়ি, চেলি গরদের জোড়। যা অতিবড় ধার্ম্মিক ব্যক্তিরও মাথায় তুলে নিতে আপত্তি হবেনা তুমি ছুঁলেও।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, কি করতে হবে মা আমাকে?

দয়াময়ী বলিলেন, অধ্যাপক বিদায়, অতিথি-অভ্যাগতদের সম্মান রক্ষা, আত্মীয় স্বজনগণেব পাথেয়র ব্যবস্থা,—আর ঐ সঙ্গে রাখবে এই ছেলেটাকে একটু কড়া শাসনে। এই বলিয়া তিনি দ্বিজদাসকে দেখাইয়া কহিলেন, আমি হিসেব বুঝিনে বলে ও ঠকিয়ে যে আমাকে কত টাকা নিয়ে অপব্যয় করচে তার ঠিকানা নেই মা। এইটি তোমাকে বন্ধ করতে হবে।

দ্বিজদাস বলিল, দাদার সামনে এমন কথা তুমি বোলোনা মা। উনি ভাববেন সত্যিই বা। খরচের খাতায় রীতিমত ব্যয়ের হিসেব লেখা হচ্চে, মিলিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে।

দয়াময়ী বলিলেন, মেলাবো কোন্‌টা? ব্যয়ের হিসেব লেখা হচ্চে মানি, কিন্তু অপব্যয়ের হিসেব কে লিখচে বল্‌তো? আমি সেই কথাই বন্দনাকে জানাচ্ছিলুম।

বন্দনা বলিল, জেনেই বা কি করবো মা? ওঁর টাকা উনি অপব্যয় করলে আমি আটকাবো কি করে?

দয়াময়ী কহিলেন, সে আমি জানিনে মা। তুমি ভার নিতে চেয়েছিলে আমি ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। কিন্তু একটা কথা বলি বন্দনা, তোমাকেও একদিন সংসার করতে হবে, তখন অপব্যয় বাঁচানোর দায় এসে যদি হাতে ঠেকে জানিনে বললেইত জবাব-দিহি হবেনা।

বন্দনা দ্বিজদাসের প্রতি চাহিয়া কহিল, শুনলেন ত মায়ের হুকুম।

দ্বিজদাস কহিল, শুনলুম বই কি। কিন্তু দাদা দিয়েছেন আমার ওপর খরচ করার ভার আর মা দিলেন তোমাকে খরচ না-করার ভার। সুতরাং খণ্ড-যুদ্ধ বাধবেই, তখন দোষ দিলে চলবে না।

বন্দনা মাথা নাড়িয়া স্মিতমুখে বলিল, দোষ দেবার দরকার হবেনা দ্বিজুবাবু, ঝগড়া আমাদের হবেনা। আপনার টাকা নিয়ে আপনার সঙ্গেই মক-ফাইট সুরু করবার ছেলেমানুষি আমার গেছে। বাঙ্‌লা দেশে এসে সে শিক্ষা আমার হয়েছে। ঝগড়ার আগে মায়ের দেওয়া ভার মার হাতেই ফিরিয়ে দিয়ে আমি সরে যাবো।

দয়াময়ী ঠিক না বুঝিলেও বুঝিলেন এ অভিমান স্বাভাবিক। ব্যথিতকণ্ঠে কহিলেন, ভার আমি ফিরে নেবোনা মা, তোমাকেই এ বইতে হবে। কিন্তু এখানে আর নয় ভেতরে চলো, তোমার কাজ তোমাকে আমি বুঝিয়ে দিইগে। এই বলিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেলেন।

সেদিন বন্দনা এ বাড়ীতে ঘণ্টা কয়েকমাত্র ছিল, কোথায় কি আছে দেখিবার সুযোগ পায় নাই, আজ দেখিল মহলের পরে মহলের যেন শেষ নাই। আশ্রিত আত্মীয়ের সংখ্যা কম নয়, বউ-ঝি নাতি-পুতি লইয়া প্রত্যেকের এক-একটি সংসার। ও দিকটায় আছে কাছারি বাড়ী ও তাহার আনুষঙ্গিক যাবতীয় ব্যবস্থা কিন্তু এ অংশে আছে ঠাকুর বাড়ী, রান্না বাড়ী, দয়াময়ীর বিরাট গোশালা এবং উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত

বাগান ও পুষ্করিণী। দ্বিতলের পূবের ঘরগুলো দয়াময়ীর, তাহারই একটার সম্মুখে বন্দনাকে আনিয়া তিনি বলিলেন, মা, এই ঘরটি তোমার, এরই সব ভার রইলো তোমার ওপর।

ওধারের বারান্দায় বসিয়া সতী ও মৈত্রেয়ী কি কতকগুলা দ্রব্য মনঃসংযোগে পরীক্ষা করিতেছিল দয়াময়ীর কণ্ঠস্বরে মুখ তুলিয়া চাহিল, এবং বন্দনাকে দেখিতে পাইয়া দুজনেই কাজ ফেলিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সে যে সত্যই আসিবে এ প্রত্যাশা কেহ করে নাই। দিদির পায়ের ধুলা লইয়া বন্দনা মৈত্রেয়ীকে নমস্কার করিল। মা বলিলেন আমার এই ম্লেচ্ছ মেয়েটিও কোন-একটা কাজের ভার চায় বৌমা, চুপ করে বসে থাকতে ও নারাজ। তোমাদের দিয়েছি নানা কাজ, ওকে দিলুম আমার এই ভাঁড়ারের চাবি।

মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিল, এ ভাঁড়ারে কি আছে মা?

আছে এমন সব জিনিস যা ম্লেচ্ছ-মেয়েতে ছুঁলেও ছোঁয়া যায় না। এই বলিয়া দয়াময়ী সকৌতুকে হাসিয়া বন্দনাকে দিয়া ঘর খুলাইয়া সকলে ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মেঝের উপর থরে থরে সাজানো রূপার বাসন,—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মর্য্যাদা দিতে হইবে। কলিকাতা হইতে ভাঙাইয়া টাকা সিকি প্রভৃতি আনানো হইয়াছে, থলিগুলা স্তূপাকার করিয়া একস্থানে রাখা; গরদ প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্র সকল বস্তাবন্দি হইয়া এখনো পড়িয়া, খুলিয়া দেখার অবসর ঘটে নাই,—এ সকল ব্যতীত দয়াময়ীর আলমারি সিন্দুকও এই ঘরে। হাত দিয়া দেখাইয়া হাসিয়া বলিলেন, বন্দনা ওর মধ্যেই রয়েছে আমার যথা সর্ব্বস্ব, আর ওর পরেই দ্বিজুর আছে সবচেয়ে লোভ। ওইখানেই পাহারা দিতে হবে মা তোমাকে সবচেয়ে বেশি। আমার মতো তোমাকেও যেন ফাঁকি দিতে ও না পারে।

বন্দনার বিপন্ন মুখের পানে চাহিয়া সতী ভগিনীর হইয়া বলিল, এত বড় কাজের ভার দেওয়া কি ওকে চলবে মা? অনেক টাকা কড়ির ব্যাপার—তাহার কথাটা শেষ হইবার পুর্ব্বেই দয়াময়ী বলিলেন, অনেক টাকা-কড়ির ব্যাপার বলেই ওর হাতে চাবি দিলুম বৌমা। নইলে দ্বিজু আমাকে দেউলে করে দেবে।

—কিন্তু ও যে বাইরে থেকে এসেছে মা?

সতীর এ কথাটাও শেষ হইল না, দয়াময়ী হাসিয়া বলিলেন, বাইরে থেকে একদিন তুমিও এসেছিলে, আর তারও অনেক আগে এমনি বাইরে থেকেই আমাকেও আসতে হয়েছিল। ওটা আপত্তি নয় বৌমা। কিন্তু আর আমার সময় নেই আমি চল্লুম। এই বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

বন্দনা বলিল, তোমাদের বাড়ীতে এসে এ-কি জালে জড়িয়ে পড়লুম মেজদি। আমি যে নিশ্বাস ফেলবার সময় পাবো না।

তাই তো মনে হচ্চে বলিয়া সতী শুধু একটু হাসিল।

(ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্র

---

# শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সামাজিক তথ্য

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম-এ

বিগত কয়েক বৎসরের 'চণ্ডীদাস' চর্চায় এটুকু স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ঐ নামে একাধিক কবি বাঙ্গালায় ছিলেন, এবং যিনি বড়ু-চণ্ডীদাস তিনি তাঁহার তথা-কথিত 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন' প্রাক্ চৈতন্য যুগে রচনা করিয়াছিলেন। বড়ু-চণ্ডীদাসের প্রকৃত নামটা কয়েকটি পদের ভনিতায় প্রকাশ পাইয়াছে,—অনন্ত। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের নাম কি? সে নাম প্রাপ্ত খণ্ডিত পুঁথিতে পাওয়া যায় নাই। যে কারণে গ্রন্থের সম্পাদক বসন্ত বাবু উহার 'কৃষ্ণ-কীর্ত্তন' নাম দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করি: "বহুদিন যাবৎ চণ্ডীদাস-বিরচিত কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র অস্তিত্ব মাত্র শুনিয়া আসিতেছিলাম।.. আমাদের ধারণা, আলোচ্য পুঁথিই 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' এবং সেই হেতু উহার অনুরূপ নাম নির্দ্দেশ করা হইল।" (সম্পাদকীয় বক্তব্য, পৃঃ ১০)। বলা বাহুল্য, একাধিক চণ্ডীদাস জানিলে আর এ 'হেতু' তেমন টেঁকে না। ৺রমণী-মোহন মল্লিক মহাশয়ের সম্পাদিত 'চণ্ডীদাস'এর ভূমিকায় (পৃঃ ২১, দ্বিতীয় সং) পাই, "উইলসন (Wilson) সাহেব কৃত 'উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস উভয়ে মিলিত হইয়া 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' প্রণয়ন করেন........" ইত্যাদি। তাহা হইলে, যে কৃষ্ণকীর্ত্তনের অস্তিত্বের কথা শুনা যায়, তাহা একা কোনও 'চণ্ডীদাস' এর রচনা নয়। কিন্তু আবার, কোনও চণ্ডীদাসই কৃষ্ণকীর্ত্তন রচনায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, উইলসন সাহেব এমন কথা বলেন নাই। তাঁহার গ্রন্থে 'বিদ্যাপতি ও গোবিন্দ দাস' এর রচিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের উল্লেখ আছে (১) বাঙ্গালীবিদ্যাপতির (২) সহিত একত্র হইয়া কবিরাজ রামচন্দ্র দাসের ভ্রাতা গোবিন্দ দাস নামধারী প্রসিদ্ধ (বাঙ্গালী) পদ-কর্ত্তার কোনও গ্রন্থ প্রণয়ন করা অসম্ভব নয়। 'গোবিন্দদাস ও চণ্ডীদাসের' কৃষ্ণকীর্ত্তন, ইহাও প্রমাণ থাকিলে মানিতে কষ্ট হইত না, কারণ সেস্থলে 'চণ্ডীদাস' দাঁড়াইতেন 'দীন চণ্ডীদাস',—নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। কিন্তু অনন্ত-নামা বড়ু চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্ত্তন', ইহা স্বীকার করিতে মন চায়না, একান্ত প্রমাণাভাব। কে জানে, হয়ত প্রকৃত 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' একদিন বাহির হইতে পারে, হয়ত তখন দেখা যাইবে, উইলসন সাহেবের উক্তিই ঠিক। যদি সে দিন আসে, তবে যেমন বিভ্রাট তেমন লজ্জা। তৎপূর্ব্বে বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের নাম সোজাসুজি 'কৃষ্ণমঙ্গলে' পরিণত হইলে, এ সকল আশঙ্কা থাকে না।

কিন্তু যতদিন পরিবর্ত্তন সাধিত না হয়, ততদিন 'কৃষ্ণ-কীর্ত্তন' নাম চলিবেই। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি ধরিয়া অনেক গবেষণা বাঙ্গালা মাসিক ও ত্রৈমাসিকের পৃষ্ঠা ভরিয়াছে। অসীম ধৈর্য্যশালী না হইলে সে সকল পড়িয়া উঠা দুষ্কর, কিন্তু লক্ষণ শুভ। মায়ের পদে অঞ্জলি। তথাপি দেখিতেছি, এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে এখনও বহু বিষয় অনালোচিত রহিয়া গিয়াছে। এমন না হইলে গ্রন্থখানিকে অপূর্ব্ব জ্ঞান করিতে বাধিত। বর্ত্তমানে যে বিষয়টা আলোচ্য, তাহা কৃষ্ণকীর্ত্তনে সামাজিক তথ্য। কবির যুগের সামাজিক ইতিহাস জানিবার আর দ্বিতীয় অবলম্বন নাই। এ কারণে আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্বও স্বীকার করিতে হয়। কৃষ্ণকীর্ত্তনের কথাবস্তুর অল্পাংশই পুরাণ হইতে গৃহীত, এবং অধিকাংশ ভাগ কবির স্বকপোলকল্পিত। কিছুটা হয়ত তাঁহার দেশে প্রচলিত রাধা কৃষ্ণের কাহিনী হইতে লব্ধ। যাহা হউক, কৃষ্ণলীলা গ্রন্থের উপজীব্য হইলেও, কবি অপৌরাণিক অংশে নিজের যুগের ও দেশের

(১) H. H. Wilson's 'Religious Sects of the Hindus,' Works, Vol., I. p. 168.

(২) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৭, পৃঃ ৪০-৫৪, ৫৯-৬০ দ্রষ্টব্য।

সমাজ-চিত্রের কিছু কিছু আভাস দিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি অবশ্য কাব্যের খাতিরে স্থানে স্থানে অত্যুক্তি করিয়াছেন, স্থানে স্থানে অলীক ও কাল্পনিক কথার অবতারণা করিয়াছেন, অলৌকিকও করিয়াছেন। এ সকল বাদ দিয়াও, গ্রন্থে কবির সমাজের কতকগুলি ঠিকানা খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে অভিনবত্ব বড় বেশী নাই। থাকিতেও পারেনা। কারণ, কবির যুগ এমন কিছু অকস্মাৎ উড়িয়া আসে নাই। সে যুগে বাঙ্গালায় সামাজিক জীবনের ধারা যেরূপ ছিল, তাহা অনেকটা তদবস্থায় পূর্ব্বেও ছিল, পরেও আমূল পরিবর্ত্তিত হয় নাই। পূর্ব্বের জ্ঞান যৎকিঞ্চিৎ। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের সমাজের রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার, বেশ-ভূষা ইত্যাদির সন্ধান প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে কিছু কিছু মিলে। তাহার সহিত তুলনায় কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের সামাজিক তথ্যগুলি যেন অনেকটা জানা-জানা মনে হইবে। কিন্তু তাহাতে হানি হয় নাই।

সামাজিক জীবনের আদর্শ কি ছিল, তাহা কবি নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তিতে বিপরীতার্থে প্রকাশ করিয়াছেন: "কনিষ্ঠে লংঘিব জেষ্ঠ হআঁ দুঠ (দুষ্ট) মনে। প্রবল হৈআঁ সূদ্রেঁ লংঘিব ব্রাহ্মণে॥ পুত্রেঁ বাপ লংঘিব শিষ্য গুরুজনে। পুণ্য লংঘিব জনে হআঁ পাপ মনে॥ সেবকেঁ লংঘিব প্রভু নারী নিজ পতি। আপনা মজায়িব ব্রত লঘিংআঁ সতী॥ শরণ জনের লোকেঁ লংঘিব পরাণ। দাতাএঁ লংঘিব আপনেয়ি দিআঁ দান॥ সব বিপরীত হৈব রাধা তোহ্মার কাজে।" (পৃঃ ১৭৩)। সমাজ এই আদর্শ-চ্যুত হইলেও ফলে পৃথিবী অত্যধিক পাপভারাক্রান্ত হইলে, "ব্রহ্মা বেদ হরিবেক ইন্দ্র হরিব পাণী। সজন (সজ্জন) সমাজেঁ হরিব সত্যবাণী॥ কপিলা হরিব ক্ষীর সস্ত বসুমতী। ঋষি তপ হরিবেক পণ্ডিত সুমতী॥" (পৃঃ ঐ)। অন্যত্র পাই, "যতন করিআঁ বেদ কহিলেন্ত বিধী। পাপ করিলেঁ কোণ কাজে নাহিঁ সিধী" (সিদ্ধি)॥ (পৃঃ ৩৬৯)। তাহা হইলে, কবির যুগের না হউক, কবির নিজের ধারণা, বিধি (ব্রহ্মা) বেদ রচনা করিয়াছেন, এবং তাহাতে পাপ-পুণ্যের ফলাফল নির্দ্ধারিত করা আছে। পাপী ব্যক্তি কোনও মহৎ-কার্য্যের অনুষ্ঠাতা হইতে পারেনা, "আসুর মারিআঁ খণ্ডিবোঁ পৃথিবীর ভার। পাপ করিলেঁ সে ত নহিব আহ্মার॥" (পৃঃ ঐ)। পাপ করিলে কি হয়? "হএ নরকের ফল" (পৃঃ ৩৬৪)। আর "পুণ্য কইলেঁ স্বগ্‌গ জাইএ" (পৃঃ ঐ)। সে স্বর্গ এমন স্থান যেখানে "নানা উপভোগ পাইএ" (পৃঃ ঐ)।

কৃষ্ণভক্তজনের অন্তিমে মুক্তি কিংবা সুরপুরে স্থিতি (পৃঃ ১২৩)। তাঁহাকে স্মরণ করিলেও পাপ বিমোচন হয়,—"যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে" (পৃঃ ১৯১)। দেশে শ্রীরামচন্দ্রের পূজা প্রচলিত ছিল, শুভকার্য্য সম্পাদনের পূর্ব্বে তাঁহার বন্দনা করা হইত, "বন্দিআঁ সব দেবগণে, বড়ায়ি শ্রীরামচরণে" (পৃঃ ১৫)। মনস্কাম পূর্ণ হইবার আশায় নারী চণ্ডীরও পূজা করিত; বড়াই রাধাকে বলিতেছেন, "বড় যতন করিআঁ, চণ্ডীয়ে পূজা মানিআঁ, তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে" (পৃঃ ৩৪১)।

শুভকার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে শুভ তিথি, বার, ক্ষণ বিচার করার প্রথা ছিল (পৃঃ ১৫)। অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার বাঞ্ছায় লোকে গিয়া কুশক্ষেত্রে বিধিমত দান-ধ্যান করিত, পুষ্কর-তীর্থে স্নান করিত, কেদার-ক্ষেত্রে মহাদেবের শির স্পর্শ করিয়া অর্চ্চনা করিত, এবং বদরিকাশ্রমে ও বটেশ্বরে তপস্যা করিত (পৃঃ ২১৫)। সুতীর্থে স্নান ও তপ করিলেও—ঈপ্সিত ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করিত, বিশেষতঃ নারী পুরুষের প্রেমলাভে সমর্থ হয় এরূপ বিশ্বাস ছিল, "কে না সুতীথে স্নান কৈলা ধন্য নারী। যা লআঁ সুখরিত ভুঁজয়ে মুরারী" (পৃঃ ৩৮৭); "কে না সুতীথে তপ কৈল ভাগ্যমতী। যে (যে?) নারী কাহ্নের সঙ্গে করে সুরতী" (পৃঃ ২১৫)।

ভৈরব-পত্তনে, অর্থাৎ কোনও শিবক্ষেত্রে গিয়া গড়াগড়ি করিয়া (পৃঃ ৭৬), বা বারাণসী গমন করিয়া (পৃঃ ২৮২) লোকে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিত। গলায় কলসী বাঁধিয়া গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া ("গঙ্গাজলে পৈস গলে কলসী বান্ধিআঁ" পৃঃ ৭৬), নিজের গায়ের মাংস কাটিয়া সাগর-সঙ্গমে মকর প্রভৃতিকে খাওয়াইয়া ("সাগর সঙ্গমে গিআঁ, গাএর মাঁস কাটিআঁ, আপনা মগর ভোজ দিআঁ" পৃঃ ৩৩৩), অথবা

বারাণসী, গোদাবরী, সাগর-সঙ্গম প্রভৃতি স্থানে গিয়া তনুত্যাগ করিয়া ( "যাইবোঁ বারাণসী কিবা গোদাবরী, করিবোঁ তনু তেআগে, সাগব সঙ্গমে তনু তেআগিবোঁ" পৃঃ ২৮৯ ), তবে অঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হইত। মনের দুঃখ অসহ বোধ হইলেও কখনও কখনও লোকে অনলকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া ( "আনল শবণ কিবা করিবোঁ" পৃঃ ২৮৯ ; কিবা মরোঁ আনলে পুড়িআঁ" পৃঃ ৩১৫ ; আনল কুণ্ডত কিবা তনু তেআগিবোঁ" পৃঃ ৩১৮ ), বিষ খাইয়া ( "কাহ্নত লাগিআঁ কিবা বিষ খাইআঁ মরিবোঁ" পৃঃ ৩১৮ ), গলায় পাথর বাঁধিয়া জলাশয়ে প্রবেশ করিয়া ( গলাত পাথর বান্ধি দহে পইসওঁ" পৃঃ ৩১৫ )—ইত্যাদি প্রকারে আত্মহত্যা করিত। অন্ততঃ, আত্মহত্যাব এই সকল পন্থাগুলি লোকের সাধারণতঃ জানা ছিল।

সংসার-বিরক্ত নারী মস্তক মুণ্ডন করিয়া যোগিনী সাজিয়া দেশান্তরী হইয়া নানাস্থানে ও তীর্থে পরিভ্রমণ করিত ( "মাথা মুণ্ডিআঁ, যোগিনী হআঁ, বেড়ায়িবোঁ নানাদেশে" পৃঃ ৩৫০ ; "মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর, যোগিনী রূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তব" পৃঃ ৩৩৬ ; "যোগিনী রূপে মো দেশান্তব লইবোঁ পৃঃ ৩১৮ )। পুরুষের পক্ষে দেখিতেছি, তাহারা ব্রহ্ম চিন্তা করিত, অথবা 'যোগ-ধেআন' করিত।

জন্মান্তর, কর্ম্মফল, অদৃষ্ট প্রভৃতিতে কবির যুগের বাঙ্গালীর প্রগাঢ় আস্থা ছিল, কারণ এসকল বিষয়ে কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহা সাধারণের দেখিয়া ও শুনিয়া। কবি পুনঃপুনঃ "সব মোব করমেব ফল" "পুরুব জনমে কৈল করমেব ফলে" ইত্যাদি—উক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার লেখায় পাই, পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ-পুণ্যের বিচারে ইহকালের ভাগ্যলিপি প্রস্তুত হয়, এবং বিধাতা পুরুষ 'সাঠিহারে' অর্থাৎ জন্মেব ষষ্ঠ রাত্রে ( ষষ্ঠীপূজার রাত্রিতে ) এই ভাগ্যলিপি প্রস্তুত করেন। জন্মান্তরে গুরু ও ব্রাহ্মণকে দুঃখ দিলে বিধাতা সাঠিহারে অনেক দুঃখ লিখিয়া দেন ( অনন্ত জরমেঁ গুরু ব্রাহ্মণেবেঁ দিলোঁ নানা দুঃখভারে। তে কারণে বিধি দুখগণ লেখিল সাঠিহারে" পৃঃ ৩৮ ), এবং নারী খণ্ডব্রত করিলে ( অঙ্গহীন ব্রত করিলে ) ইহজন্মে তাহার দুঃখের অবধি থাকেনা, কোনও মনোরথই পূর্ণ হয়না ( "করলোঁ খণ্ডব্রত, তার অবমত, তৈঁবা দুখিনী মোএঁ। ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ, না ছাড়ে নান্দের পোএ" পৃঃ ৩৮ ; কিবা পুরুব জরমে খণ্ডব্রত কইল আহ্মে, তার ফলেঁ কাহ্নাঞিঁ হারায়িলোঁ", পৃঃ ৩৩৩ ; "পুরুব জরমে কিবা খণ্ডব্রত কৈল। তে কারণে মোর মনোরথ না পুরিল" পৃঃ ৩৯৪ )।

মন্ত্রে-তন্ত্রেও লোকের গভীব বিশ্বাস দেখা যায়। সংজ্ঞাহীনা রাধিকাকে কৃষ্ণের 'ধেআন করিআঁ' ঝাড়িবার ( পৃঃ ২৮৯ ) ও কৃষ্ণকে 'নিন্দা-( নিদ্রা ) উলী' মন্ত্রে রাধার নিদ্রিত করিবার ( পৃঃ ৩১০ ) প্রচেষ্টা ইহার জলন্ত প্রমাণ।

কবি নিজের যুগের যে সংস্কারগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বিদিত হউক অবিদিত হউক, উল্লেখযোগ্য। সাপের মাথায় খঞ্জন দেখিলে দ্রষ্টা রাজপদ পায় ( পৃঃ ৭১ )। জলপূর্ণ ঘটে 'মঙ্গল' চিহ্ন দেখিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবার আশা থাকে ( পৃঃ ৩০৭ )। নাম রাখিবার সময় কেহ হাঁচি দিলে, বা টিকটিকির পতন হইলে ( জিঠি ), বা অন্য কোনও রূপ বাধা উপস্থিত হইলে, সে সন্তানের দুর্ভাগ্য ("কালিনী মাত্র মোর নাম থুইল রাধা। হাছি জিঠী কেহো তাত না দিল বিরোধা" পৃঃ ৯৬ )। যাত্রাকালে হাঁচি, জিঠি ও উঝট ( চরণাগ্রে আঘাত ) বিঘ্নাদিব পূর্ব্বসূচনা ( "কোণ আসুভ খনে পাঅ বাঢ়ায়িলোঁ। হাঁছী জিঠী আয়র উঝট না মানিলোঁ" পৃঃ ৩১৮ )। নাবীর বা সখিজনের শূন্যকলসী লইয়া অগ্রে গমন, বামেব শৃগালের দক্ষিণে প্রস্থান, পথে শাকুন-শাস্ত্রে-অভিজ্ঞ-ব্যক্তি ( সগুণী ) দর্শন, হস্তে নরকপাল ধারণ করিয়া যোগিনীর ভিক্ষা প্রার্থনা, স্কন্ধে ভাণ্ড লইয়া তৈলকারের গমন, শুষ্ক ডালে উপবিষ্ট কাকের শব্দ—ইত্যাদিও অশুভ লক্ষণ। ভাদ্রমাসের ( শুক্লা ) চতুর্থী রাত্রিতে জলের মধ্যে হরিতালী চন্দ্র ( নষ্টচন্দ্র ) দেখিলে, পূর্ণ কলসীতে হাত ভরিলে, গুরুর আসনে গিয়া বসিলে, ভূমিতে জলের আখর কাটিলে ও খণ্ডবিচনীর ( সন্দেশ-বিক্রয়কারিণীর ) পা গায়ে লাগিলে মিথ্যা অপবাদ বা কলঙ্ক রটে ( হরিতালী চন্দ্র দেখিলোঁ ভাদ্র মাসে। হাথ ভরিলোঁ কিবা পুরিণ কলসে॥ ভূমিত আখর কিবা লিখিলোঁ জলে। মিছ) দোষে বন্ধন আহ্মার তার ফলে" পৃঃ ২৮৫ ; "ভাদর

মাসের তিথি চতুর্থীর রাতী। জল মাঝেঁ দেখিলোঁ মো কি নিশাপতী॥ পূর্ণ কলসে কিবা ভরিলোঁ হাথে। তে কারণে বাঁশী চুরী দোষসি জগন্নাথে॥......শুক্লর আসনে কিবা চাপিআঁ বসিলোঁ। জলের আথর কিবা ভূমিত লেখিলোঁ॥ খণ্ড বিচনীর কিবা পাঅ তুলী লৈলোঁ গাএ। তে কারণে কাহ্নাঞিঁ বাঁশী চুরী দোষাএ" পৃঃ ৩২১)।

সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে সংস্কার থাকে। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের অন্যান্য বহু পুস্তকে নানা সংস্কারের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি কৃষ্ণকীর্ত্তন-ধৃত কোনও কোনওগুলির সহিত এক, বা প্রায় এক। কিন্তু একত্র এতগুলি বিবিধ সংস্কারের সমাবেশ, বোধ করি, অন্য কোনও বাঙ্গালা গ্রন্থে দেখা যায়না, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও নয়।

সমাজে এক-ঘরে হইয়া থাকার ভয়টা খুবই ছিল। রাধিকার শ্বাশুড়ী রাধিকাকে হাটে পাঠান না,—প্রতিবেশিনী—গোয়ালিনীগণ রুষ্ট হইয়া আসিয়া শ্বাশুড়ীকে জানাইল, "আপণ আপণ বহু (বৌ) হাটক পাঠায়িব। তোহ্মার ঘরত অন্নপাণি না খাইব"। মাত্র এই কথা কয়টি শুনিয়াই "ডরে আইহনের মাত্র। প্রণাম করিআঁ বুইল তা সন্ধার পাত্র। কালি হৈতেঁ যাইবে রাধা মথুরা নগর" পৃঃ ২০২।

নারীহত্যা করা সমাজে অতীব নিন্দনীয় ও গর্হিত ছিল এবং সর্ব্বাপেক্ষা পাপজনক বলিয়া গণ্য হইত; "শতেক ব্রহ্মবধ নহে যার তুল" (পৃঃ ২৮৪); "শতেক ব্রাহ্মণ আর মারিলেঁ গোকুল। যে পাপ সেহো নহে তিবী বধ তুল" (পৃঃ ২৮২)। স্ত্রী-হত্যার সপ্তপুরুষ পর্য্যন্ত নাকি অধঃপতিত হইল (পৃঃ ২৮৪); লোকে ঘৃণায় তাহাকে ছুঁইত না, "তিবীবধিআ কাহ্নাঞিঁ ল, কাহ্নাঞিঁ মোরে নাহিঁ ছো, মোরে নাহিঁ ছো কাহ্নাঞি..." পৃঃ ২৮২। এমন কি, স্ত্রীলোককে বলপূর্ব্বক বাঁধিয়া রাখিলেও নাকি 'হৈব জাতী নাশ' (পৃঃ ২২১)। স্ত্রীলোকগণ সময়ে সময়ে এই সকল সম্মান ও সুযোগের কিছু কিছু অসদ্ব্যবহার করিতে ছাড়িত না, স্ত্রীহত্যাজনিত পাপের ভয় দেখাইয়া তাহারা পুরুষকে নিজেদের ইচ্ছানুবর্ত্তী হইতে বাধ্য করিত, "তিরী বধ দিবোঁ মোত্র তোহ্মাতে উপরে, ঝাঁপ দিআঁ যমুনার জলে" পৃঃ ১৫২; "এহা জাণী গদাধর, একবার দয়া কর, নহে তিরী বধ দিবোঁ মো তোহ্মারে" পৃঃ ৩৬৮।

কবির যুগে বার বৎসরের কিশোরী 'নব-যুবতী,' (পৃঃ ৬০-৬১), অন্যত্র 'ভর-যুবতী', পৃঃ ১০৯। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণের আধুনিক বা বঙ্গীয় সংস্করণেও রাধা বার বৎসরেই 'স্থির-যৌবনা' (শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১২৬.৯; প্রকৃতি খণ্ড, ৩৫।৫৭—৫৮)। বড়ু-চণ্ডীদাস রাধিকার দেহের উচ্চতা মাপিয়াছেন আট হাত, "আহুঠ হাথ কলেবর তোর" পৃঃ ৫৫। সম্পাদক মহাশয় বলেন, "প্রচলিত প্রবাদ, দ্বাপর যুগে মানব-দেহের পরিমাণ ৭ হাত ছিল। 'হাথ' শব্দে পাণিতল (১০ অঙ্গুলি) ধরিলে রাধার দেহের উচ্চতা ৩।০ হাতের কিছু কম হয়।" (ভাষাটীকা, পৃঃ ৪৮৮)। কিন্তু সন্দেহ গেলনা। একে কবির কৃষ্ণ দ্বাপরের নয়, কলির অবতার (পৃঃ ৩৫৭), তদুপরি 'ভর-যুবতী'র দেহ সাড়ে তিন হাতের কম করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। এই 'হাথ' অর্থ বিঘৎ বা বিতস্তি অনুমান করি। তাহা হইলে, সাড়ে তিন হাতের একটু বেশীই হয়।

কবি রাধিকার বিবিধ অঙ্গে বিবিধ অলঙ্কার দিয়াছেন। মাথায় সর্ব্বত্র 'মুকুট' পৃঃ ৩৮, ১৩৩, ১৩৪। গলায় অধিকাংশ স্থলেই 'সাতেসরী (সপ্তকণ্ঠী) হার', পৃঃ ২৮ ৩৮, ৭৩, ৮৮, ১২৪, ১৩৩, ১৩৪, ১৪৮, ১৫৫, ১৫৮ ২৬৩, কোথাও কোথাও 'গজমুতী হার', পৃঃ ৩৮১, ৯০; এক-স্থানে 'গুণিআ' (সুত-হার), পৃঃ ১৩৪; অপর এক-স্থানে 'উল পুষ্পের হার,' পৃঃ ৩৬১। রাধিকার কর্ণে 'কুণ্ডল', পৃঃ ৫৫, ৫৭, ৬০, ৬৮, ৭৮, ৯০, ১৩৪, ৩৪১; ইহা 'রতনে উজল', পৃঃ ৯০,; একস্থানে 'হিরাধর (হীরক-খচিত) কড়ী', পৃঃ ১১২। হস্তের অলঙ্কার যথা:—'আজদ ভুজযুগলে' পৃঃ ৩৮১; 'বাহুর বলয়া', পৃঃ ৬২, ৮৮, ১১২, ১৫৫, ১৬৩, ৩৯২; 'রতনে জড়িত দুই বাহু শঙ্খ', পৃঃ ২৮৭; 'হাতের বাহুঠী', পৃঃ ১৩৪, ১৪৪; 'কনক কঙ্কণ', পৃঃ ১৩৪ অথবা 'রতন কঙ্কণ', পৃঃ ৩৮১; 'কেয়ুর', পৃঃ ১৩৭; এবং 'বলয়া', পৃঃ ১৩৭, ১৪২। একস্থানে পাই "কনক যুথিকা মালা বাহু যুগলে", পৃঃ ৩০, কিন্তু ইহার অর্থ অনুধাবন করিতে পারিতেছি না। অপর এক স্থলে,

"বাহুতে কনক চুড়ী, মুকুতা রতনে জড়ী, রতন কঙ্কণ কর-মূলে" পৃঃ ৩৮১ ; ইহাতে—স্পষ্ট বুঝি, 'চুড়ি' তখন বাহুর বা উপর হস্তের অলঙ্কার ছিল। রাধিকার হস্তাঙ্গুলিতে 'আঙ্গুঠী', পৃঃ ১৩৪, নামান্তর 'মুদড়ী', পৃঃ ২১৭। কটিতে 'কনক কিঙ্কিণী', পৃঃ ১৩৪, ২৯২, ৩৮১। চরণে 'কনক মঞ্জ তোর', পৃঃ ৩৮১, ও নুপুর', পৃঃ ৬২, ৬৯, ১৩৪, ১৪৩, ২৮৭, ২৯২; এবং পদাঙ্গুলিতে 'পাসলী', পৃঃ ১৩৪, ৩৮১।

অলঙ্কার ব্যতীতও রাধিকার প্রসাধন কবি অল্প-বিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন। প্রায় সর্ব্বত্রই 'শিসতে (সিঁথাতে) সিন্দুর', কেবল একস্থানে ললাটে,—'সিন্দুর সুর ললাটে', পৃঃ ৬১। নতুবা ললাটে (কুঙ্কুম-চন্দনাদি দ্বারা রচিত) 'তিলক' পৃঃ ৪৩, ৬৮, ৮৮, ২১৪। নয়নে কাজল, পৃঃ ১২, ৮৮, ৩৪৭। মুখে এক প্রকার মুখ-রঞ্জন, "কর্পূর কস্তুরী যোগে, আতর তাম্বুল রাগে, গন্ধরাংগে রচিল বদনে", পৃঃ ৩০৪। খোঁপা পুষ্পমাল্য বিভূষিত। সে মালা নানাফুলের, দোলঙ্গ, পৃঃ ৭৯, ২১৯; খদির, পৃঃ ১৬৩; নাঙ্গ, পৃঃ ১৩১, ২১৯; মালতী, পৃঃ ১৩১, ২১৯; গুলাল, পৃঃ ২১৯; চাঁপা, পৃঃ ৮৭, ২৭১, ৩৮১; কানড়, পৃঃ ৮৮ ইত্যাদি। রাধিকার বসন হয় নেতের না হয় পাটের, তবে পাটের কাপড়ে নেতের (রেশমী) আঁচল ও দুই পাশ বা পাড় মাণিকে খচিত, এরূপ সাড়ীও কবির জানা ছিল (পৃঃ ২৮৭)। রাধা 'কাঞ্চুলী' (কাঁচুলি) পরিয়াছেন, পৃঃ ২৮, ৩৫ ইত্যাদি; সে কাঞ্চুলী 'বিচিত্র'ও বটে, পৃঃ ৬১, কিন্তু—কবি কাঞ্চুলির আর বিশদ বর্ণনা দেন নাই, অর্থাৎ এমন কথা বলেন নাই যে তাহাতে 'পূর্ণরাস' বা শৃঙ্গার-রসাত্মক চিত্র অঙ্কিত ছিল। এরূপ কাঁচুলি চৈতন্যও চৈতন্য-পরযুগের প্রবর্ত্তন। শুধু কাঁচুলি নয়, উড়নী, বস্ত্রাঞ্চল প্রভৃতিও এই বিশেষত্ব হইতে বাদ পড়ে নাই। ধর্ম্মমঙ্গল সাহিত্য হইতে এইরূপ কাঁচুলির মাহাত্ম্য কিছু কিছু ধরিয়া দেখি। রূপরাম নয়ানী-বারুইয়ের কাঁচুলি বর্ণনায় বলেন, "কাঁচলিব সম্মুখেতে (১) পূর্ণরাস লেখা……… কেহ বা আনন্দ করে কৃষ্ণে কোলে করি।" ঘনরাম দেবীর (চণ্ডীর) কাঁচুলি সম্বন্ধে বলেন, "হৈমকান্তি কৃষ্ণলীলা কাঁচলি লিখন……কুচগিরি বেষ্টিত লিখিত পূর্ণরাস……হরি-মহোৎসব হইল লিখন কাঁচলি" এবং ইহা নাকি "দেখিতে দেখিতে দেবীর বাড়ে বড় প্রেম।" (২) মাণিক গাঙ্গুলি প্রদত্ত রঞ্জাবতীর কাঁচুলির বিবরণ আরও বিষম" (৩) বীভৎস রস্ত অঙ্গে ধারণ করার ফল সম্বন্ধে মাণিক গাঙ্গুলিও বলেন, "রঞ্জাক রতিকে ইচ্ছা হইল তা দেখে। বরকান্তে বলে শয্যা বিরচিতে ডেকে।" বড়ু চণ্ডীদাসের কালে এরূপ অশ্লীল কাঁচুলি ব্যবহার প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়না, কারণ থাকিলে তাঁহার স্রষ্টা কবি উহার অল্প-স্বল্প বিবরণ দিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

কৃষ্ণকে কবি রাধিকার প্রায় অনুরূপ অলঙ্কার দিয়াছেন। তাঁহার কর্ণে 'রতন কুণ্ডল', পৃঃ ৩৪৬, তাহা আবার হীরায় জড়িত, "হিরাএঁ জড়িত রতন কুণ্ডল", পৃঃ ২৬৯। হস্তে 'আজদ যুগল', 'রতন কঙ্কণ', 'কেয়ুর' পৃঃ ২৬৯, ও' বলয়া' পৃঃ ৩০২। এক স্থানে উল্লেখ মাত্র আছে, "বনমালা আভরণ তাহা তোক দিবোঁ", পৃঃ ৩২৪, কিন্তু কৃষ্ণের প্রসাধন বর্ণনায় কবি সর্ব্বত্র 'বনমালা' ভুলিয়াছেন। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার গলায় গজমতি হার, "গিএ শোভে গজমুতী" পৃঃ ৩৪৬। পায়ে নূপুর, "চরণে নূপুর রুণুঝুণু বাজে রাত্রে" পৃঃ ৩৩৯, এবং উপরন্তু 'মগর খাড়ু' পৃঃ ৩০২, ৩৪৬, যাহা রাধিকারও দেখিতেছি না। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে এই 'মগর-খাড়ু'র অভাব নাই, নারী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণের কটিতে কিঙ্কিণী, পৃঃ ২৪২, ২৬৯। তাঁহার 'ঘাঘর' ও তাহারও অর্থ কিঙ্কিণী। বন্দ্যঘটীর জয়ানন্দ তাঁহার 'চৈতন্য-মঙ্গলে' চৈতন্যদেবের কটিতে কিঙ্কিণী দিয়াছেন। (৪) খুঁজিলে পুরুষের কিঙ্কিণীর দৃষ্টান্ত আরও পাওয়া যাইতে পারে। অতএব, কৃষ্ণকীর্ত্তন দেখিয়া "সে কালে পুরুষেরাও যে কিঙ্কিণী পরিত, তাহা

(১) বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, প্রথম খণ্ড, ১৯১৪, পৃঃ ৩৮৩

(২) বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ২০৩-২০৪

(৩) সাহিত্য পরিষৎ সং পৃঃ ৩৩

(৪) সাহিত্য পরিষৎ সং, পৃঃ ১৯, ৪১

বোধ হয় আর কোথাও পাওয়া যায় না" ( ১ ) এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয়।

বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণের 'মাথে ঘোড়াচুলা'। 'বিজয়-গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণে'ও দেখি, "পরম সুন্দর লখাইর দীর্ঘ মাথার চুল"। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণের মস্তকে খোঁপার বদলে জটা, পৃঃ ৩৪৬, এবং তাহাতেই কুসুমের মালা, পৃঃ ২৬৯, ২৯৫। তাঁহার দেহও 'চন্দনে চর্চ্চিত' পৃঃ ৩৪৬, ২৬৯,৩৩৯। তা ছাড়া, 'কাজলে উজ্জল নয়ন যুগল' পৃঃ ২৬৯, এবং 'চন্দন তিলকেঁ শোভিত ললাট', পৃঃ ২৬৯,৫। কেবল মাথায় মুকুট, সিঁথিতে সিন্দুর ও পায়ে পাসলীর অভাব।

কৃষ্ণের বসনও নাকি চিত্রে অঙ্কিত, "আতি চিত্র বসন পহ্নিআঁ" পৃঃ ২৯২। পুরুষের চিত্রিত বসনের উদাহরণ, বোধ করি, বিরল। কবি একস্থানে কৃষ্ণের বস্ত্রের পরিমাণ দিয়াছেন ষোল হাত, "ছের ষোল হাথ মোর পাটোল" পৃঃ ২৪২। কবির হাত বিষৎ, পূর্ব্বে দেখিয়াছি। নতুবা বিস্ময়ের কারণ ছিল বৈ কি।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে সোনা হীরা, মণি, মাণিক, মুক্তা, রত্ন, গজমতি প্রভৃতির উল্লেখ এত বেশী যে লোকের অবস্থা যথেষ্ট স্বচ্ছল না হইলে কবির পক্ষে উহা সম্ভব হইত না। এমন কি গোয়ালিনী রাধা দধি বিক্রয় করিতে যাইতেছেন যে, তাহাও সোনার চুপড়ী' ও 'রূপার বড়ী' ( পৃঃ ১৪৩ ) লইয়া; খাট-পালঙ্ক অত বিরাট বস্তু, তাহাও সুবর্ণে মণ্ডিত ( পৃঃ ৩০০ ) করার কথা আছে। হয় ত এ সকলের খানিকটা বা অনেকটা কবির কবিত্ব বা গ্রাম্যতার নিদর্শন, কিন্তু যেখানে দৈন্য ও অনাটন, সে দেশের গ্রাম্য কবিরও হীরা গজমুক্তা প্রভৃতি কল্পনায় আসে না। কবি রাজ-সভায় থাকিলে অনুরূপ ভাবা চলিত, কিন্তু তিনি ছিলেন কোনও গ্রামে বা নগরে এক বাসলী-মন্দিরের 'বড়ু'। এত হীরা মুক্তার ছড়াছড়ি পরবর্ত্তী সাহিত্যে মিলে না।

কবির যুগে বঙ্গ-ললনা অবলায় পরিণত হয় নাই, কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে এ কথাটা অতি স্পষ্ট। প্রয়োজন বুঝিলে তাহারা পুরুষকে 'মাগুকিলে' কিলাইতে, বা ধরিয়া বাঁধিতে, কসুর করিত না। পথে ঘাটে আত্মরক্ষা করিতে তাহারা বিলক্ষণ জানিত ও পারিত। মুটে-মজুর ডাকিবার জন্য পুরুষের দরকার হইত না। তবে কিনা, কবির রাধায় শিষ্টতা ও সংযমের অভাবও যথেষ্ট। জয়দেবের রাধা কত শান্ত, কত নরম, কেমন তাঁহার আত্মসংযম!

বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ দেখিয়া তৎকালীন পুরুষ-চরিত্র অনুমান করা কঠিন। কৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণ অধম কবির সৃষ্টি, এমন কথা নয়; কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনের কবি কৃষ্ণ-চরিত্রের উত্তম দিকগুলি দেখান নাই। তাঁহার কৃষ্ণে দেব-ভাবের সম্যক্ অভাব রহিয়াছে। কৃষ্ণ এক গ্রাম্য, দুঃশীল যুবক, পরের বালিকা-বধূর সহিত পথে-ঘাটে প্রেম করিয়া বেড়াইতেছেন। বুদ্ধিটা যেমন স্থূল, দুঃসাহসও তেমনই প্রবল। ভণ্ডামিও কম নয়। ক্রোধ হইলে তিনি প্রেমিকাকে বধ করিতে উদ্যত হন, আবার স্ত্রীলোকের তর্জ্জনে ভয়ে জড়সড় হইয়া উঠেন। মিথ্যা কহিতেও পটু। তাঁহার প্রণয় ভিক্ষার রীতিও অদ্ভুত; ঐশ্বর্য্য ও ভীতি প্রদর্শন ত আছেই, তা ছাড়া পড়ুন —"ষোল শত গোপী গেলা যমুনার ঘাটে। তা দেখিআঁ কাহ্নাঞি পাতিল নাটে॥ খনে করতাল খনে বাজাএ মৃদঙ্গ। তা দেখি রাধিকার সখিগণে রঙ্গ॥ আর যত বাদ্যগণ আছের কাহ্নাঞি। পতি ( প্রতি ) দিনে নানা ছান্দে বাএ সেই ঠাই॥" পৃঃ ২৯৩। এ হেন মস্করামি দেখিয়া কোনও নারীই ভোলে না, কবিও বলেন, "তা দেখিআঁ না ভুলিলী আইহনের রাণী।" 'বংশীখণ্ডে' কবি কৃষ্ণকে এতদপেক্ষাও সং সাজাইয়াছেন। একটা তুচ্ছ বাঁশী অপহৃত হইলে কৃষ্ণ যে কাণ্ডটা করিলেন; যেরূপ কান্নাকাটি, হা-হুতাশ, খোঁজাখুজি,—শেষ পর্য্যন্ত উত্তম বসন-পরিধান ত্যাগ, শরীর দুর্ব্বল ইত্যাদি—এ সকল সং ব্যতীত আর কাহার কর্ম্ম হইতে পারে?

প্রেমিক প্রেমিকা ব্যতীত চুম্বন করিয়া ভালবাসা জানাইবার রীতি ছিল। বড়াই রাধিকাকে "অতি নেহেঁ ( স্নেহে ) করিআঁ চুম্বনে। ঘন ঘন কৈলে আলিঙ্গনে" পৃঃ ১৫, "চুম্বন করিল রাধা সখির বদনে" পৃঃ ৮২। তৃণ দাঁতে করিয়া বিনয় বা মিনতি প্রকাশ করা হইত, "দাঁতে তৃণ করি কাহ্নাঞি", পৃঃ ২৩৩; "দশনেতে এটা একটা তৃণ করি বলোঁ। মো তোহ্মারে", পৃঃ ১৫৭। হয়ত তখন

( ১ ) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৪, পৃঃ ২৪৭

এটা একটা কথার কথায় দাঁড়াইয়াছিল, সত্যকারের তৃণ কেহ মুখে দিত না। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা কি করিতেন ? যাহাই করুন, রীতিটা ঐ সম্প্রদায়ের নিজস্ব নয়। মাটি ছুঁইয়া, দুই কানে হাত দিয়া, এবং শিরে হাত দিয়া শপথ জানাইবার পদ্ধতি ছিল, "ভুমি ছুঁইআঁ হাতে পরসওঁ দুই কানে, এ ভোঁহো কাহাঞি ভোত না বৈল গেআনে" পৃঃ ১০৩ ; "দুধ দিআঁ সত্য বলোঁ শিরে দেওঁ হাথ", পৃঃ ৩৭০। শপথ করিবার সময়ে লোকে চন্দ্র, সূর্য্য, পবন, বরুণ প্রভৃতিকে সাক্ষী রাখিত, "বাত বরুণ সুরুজে মাখি, এ বধ দিবোঁ তোহ্মারে এ"; পৃঃ ১৫০ ; "চান্দ সুরুজ বাত বরুণা সাখী। যে তোর বাঁশী নিল সে থাউ তুমি আখী", পৃঃ ৩২২।

সাধারণ বেচা-কেনা, লেন-দেন কড়ির দ্বারা নির্ব্বাহ হইত। কবি 'কার্ষাপণ' 'তঙ্কা' প্রভৃতির উল্লেখ করেন নাই। হাটে পণ্য বিক্রয়কারী বা কারিণীগণকে একটা শুল্ক (হাটদান) দিতে হইত। লোকের গমনাগমনের সুবিধার জন্য নদীতে, বর্ষাকালে বিশেষ করিয়া, খেয়া নৌকার বন্দোবস্ত থাকিত। বিক্রেতাগণকে খেয়াঘাটে (কুতাঘাটে) এই নৌকা ব্যবহারের জন্য, কোন কোন জিনিসের নিমিত্ত একটা শুল্ক দিতে হইত। এই যে সব শুল্ক, তাহাও কড়ির দ্বারা আদায় হইত। কবির কথায় মনে হয়, রাজ-কোষে অর্থাভাব না ঘটিলে, উহা অনেক সময় মোটেই আদায় করা হইত না। ঘাটে শুল্ক-সংগ্রাহকদিগকে রাজ-সকাশে গিয়া ঘাট ইজারা লইবার অনুমতি-পত্র লইতে হইত। এক একজন ব্যক্তি একাধিক বা অনেকগুলি ঘাট ইজারা লইতে পারিত। তাহাদের "মহাদানী" বলিত। তাহাদের নিকটে একটা 'পঞ্জি' থাকিত, বোধ হয়, সেটা রাজ-দরবার হইতে প্রদত্ত হইত। এই পঞ্জিতে শুল্কসংগ্রাহকের নাম, শুল্কযোগ্য বস্তুর (দান বথুর) বর্ণনা, ও কোন বস্তুর উপর কি পরিমাণ শুল্ক ধার্য্য হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করা থাকিত। শুল্কসংগ্রাহকদিগের নিকটে একখণ্ড খড়ি থাকিত, তদ্দারা তাহারা মাটিতে লেখা পাড়িয়া শুল্কের হিসাবটা করিয়া লইত। যাহারা এই লেখার হিসাব বুঝিত, তাহাদের তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ দেওয়া হইত। এই সুযোগ সম্ভবতঃ অধিকার-গত। পথ-ঘাট তেমন নিরাপদ ছিল না, 'বাটোয়ার' প্রভৃতির ভয় ছিল। বলা বাহুল্য, তাহারা সুবিধা পাইলেই পথে-বিপথে লোকের নিকট জোর বা প্রবঞ্চনা করিয়া যাহা পাইত, তাহা আদায় করিয়া লইত।

কবি পুরুষের দুই প্রকার খেলার নাম করিয়াছেন, (১) গেণ্ডুআ (গেণ্ডু, কন্দুক, কাঠের বল), পৃঃ ৩০৪, ও (২) চাঁচরী, পৃঃ ৭৯। সম্পাদক মহাশয় চাঁচরীর অর্থ ধরিয়াছেন, "দোলপর্ব্বে অনুষ্ঠিত অগ্ন্যুৎসব"। কিন্তু "পএর মগড় খাড়ু মাথে ঘোড়াচুলে, চাঁচরী খেলাওঁ মোএ যমুনার কূলে", এই বর্ণনা হইতে মনে হয়না, ইহা কোনও সময়-বিশেষের উৎসব। ইহা বার-মেসে কোনও খেলা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র ব্যতীত, বেজ্জ (বৈদ্য), আচারিজ্জ (আচার্য্য বা ব্যবস্থাপক দৈবজ্ঞ), সগুনী (শাকুন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ), বণিজার (বণিক), ঝালিয়া (ঐন্দ্রজালিক), গরুড়ী (বিষ-বৈদ্য), বাদিয়া (সাপুড়ে), নাপিত, কুম্ভকার, তেলী, কাণ্ডারী (মাঝি) প্রভৃতি বৃত্তিগত জাতির উল্লেখ আছে। সাধারণ ভিখারীর এবং খাপড় বা নবকপাল হস্তে যোগিনীর ভিক্ষা করার কথাও আছে।

কবির যুগে মুসলমান রাজা অস্ত্র-আইন প্রবর্ত্তন করেন নাই, কাজেই কবি নির্ভয়ে তাঁহার কৃষ্ণলীলাত্মক কাব্যে শর, ধনু, কামান, ত্রিশূল, কৃপাণ, টাকার, নালিক-যন্ত্র, ঢাল (আড়ন) প্রভৃতি অস্ত্রের উল্লেখ করিতে পারিয়াছেন।

কবি গণক দ্বারা রাধা-কৃষ্ণের নামকরণ করান নাই। বরঞ্চ রাধা বলেন, "কালিনী মাএ মোর নাম থুইল রাধা"। পরবর্ত্তী কালে গণক ঠাকুর এই কার্য্যটির ভার লইয়াছিলেন, অনেক সময় দেখা যায়। যথা, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে, "গণক আসিয়া নাম থুইল কালকেতু। গণকেরে দিল দান পরামায়ু হেতু॥" (১) ঈশান নাগরের 'অদ্বৈত-প্রকাশে', "যথাকালে কুবের জ্যোতিবি আনাইলা। কমলাক্ষ নাম তান বাছিয়া রাখিলা॥"(২) মাণিক গাঙ্গুলির 'ধর্ম্মমঙ্গলে',

(১) অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সং, পৃঃ ১১৭

(২) প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ৮

"গ্রহবিপ্রে ডেক্যা থুল লুহিচন্দ্র নাম।"(১) এমন কি, কৃত্তিবাসী রামায়ণেও, "চলিলেন দশরথ পরম কৌতুক। তিন ঘরে দেখিলেন চারি পুত্র মুখ॥ তিন দণ্ড বেলা হৈল গণকের মেলা। খড়িতে গণিয়া চাহে শুভক্ষণ বেলা॥"(২) ইত্যাদি।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আরও দুই এক বিষয়ে তুলনীয়। বড়ু চণ্ডীদাস নারীকে (রাধাকে) অবগুণ্ঠন দেন নাই। তাঁহার কাব্যে রাধা ও অপরাপর নারীগণ দল বাঁধিয়া দিবালোকে রাজপথে হাসাহাসি করিয়া 'মঙ্গল' গান গাহিতে গাহিতে চলিতেছেন, "চিত্তের হরিষে সব গীত গাএ," পৃঃ ২০৮; "আগিতে হববিত মণে গাহিতে মঙ্গল", পৃঃ ১৪৪। এরূপ দৃষ্টান্ত অবশ্য পরযুগের সাহিত্যেও প্রচুর মিলে, কিন্তু সে যুগে সমাজে, অন্ততঃ উচ্চশ্রেণীর ভিতরে, ঘোমটা বেশ আসিয়া পড়িয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাসের কালেও দেশে ঘোমটা চলিত কিনা সন্দেহজনক। কৃত্তিবাস কিন্তু রাবণবধের পর সীতাকে চারিদিক আচ্ছাদিত চতুর্দ্দোলে চড়াইয়া রাম-সম্ভাষণে নিয়াছেন, "রাম সম্ভাষণে সীতা চতুর্দ্দোলে চড়ে···নেতের বসনে দোলা ল'য়েছেন বেড়ে।"(৩) বড়ু চণ্ডীদাস রাধাকে নাসিকার কোনও অলঙ্কার দেন নাই, কৃত্তিবাস সীতাকে 'বেসর' দিয়াছেন "নাকেতে বেশর দিল মুক্তা সহকারে।"(৪) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে নাসার গজমুক্তা, এবং সম্ভবতঃ নোলকেরও, উল্লেখ আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে ইরাণ দেশ হইতে এদেশে নাসিকার অলঙ্কার আরম্ভ হইয়াছে, এই মতবাদ(৫) পুরাণখানিকে ষোড়শ শতাব্দীতে টানিয়া আনিবার অন্যতম যুক্তি হইয়াছে(৬)। কিন্তু কৃত্তিবাস কিছুতেই পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে আসিতে পারেন না। কৃত্তিবাসের বয়স কত? মনে হইতেছে, বিক্রমপুর আদাবাড়ীতে দনুজ-মাধব দশরথ-দেবের তাম্রশাসন(৭) আবিষ্কৃত হইয়া এ প্রশ্নের মীমাংসা অনেকটা সুসাধ্য করিয়াছে। কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণীতে যে বেদানুজ মহারাজার পাত্র তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা ছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে, তিনি ছিলেন বঙ্গের (পূর্ব্ব-বঙ্গের) মহারাজা। তাম্র-শাসনের দনুজ-মাধবও ঠিক সেই স্থানেরই অধীশ্বর। কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণ একেবারে ভুয়া ও কৃত্রিম না হইলে, এই 'বেদানুজ' ও 'দনুজ-মাধবের' অভিন্নতায় আপাতদৃষ্টিতে বিশেষ সন্দেহের কারণ দেখিতেছিনা। দনুজ-মাধব খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে জীবিত ছিলেন, এরূপ অনুমানের হেতু আছে। নরসিংহ ওঝা হইতে কৃত্তিবাস চারিপুরুষ অধস্তন, এবং সাধারণ গণনায়, এক শতাব্দীতে চারি পুরুষ। তাহা হইলে, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত কৃত্তিবাসের সময়। অতএব উক্ত মতবাদের দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইতেছে। যদি গণক দ্বারা নামকরণ, নাসিকার অলঙ্কার, আবরু প্রভৃতি দেখিয়া বড়ু চণ্ডীদাসের বয়স নির্দ্ধারণ করিতে হয়, তবে তাঁহাকে কৃত্তিবাসের পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করিতে হয়। কিন্তু কৃত্তিবাস বঙ্গীয় আদি ভাষা-কবির যে আসনে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তথা হইতে তাঁহাকে স্থানচ্যুত করা যায় কি? ইহা অসমসাহসের কার্য্য ভাবিলে, উভয়কে প্রায় সমসাময়িক মানিতে হয়, এবং স্থানের ভিন্নতায় উভয়ের বিবরণের ভিন্নতা স্বীকার করিতে হয়। আর যদি বড়ু চণ্ডীদাসকে কৃত্তিবাসের পরে অনুমান করার প্রয়োজন হয়, তবে সে ক্ষেত্রেও সহজ উপায় আছে, কৃত্তিবাসী রামায়ণে ওগুলি প্রক্ষিপ্ত।

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

(১) পৃঃ ২২
(২) ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের সং, ১৩০৩, পৃঃ ৩৩
(৩) লঙ্কাকাণ্ড, ঐ, পৃঃ ৪৮১
(৪) ঐ, আদিকাণ্ড, পৃঃ ৯৭
(৫) প্রবাসী, ১৩৩৪, পৃঃ ৭১৩-৭১৮
(৬) ভারতবর্ষ, ১৩৩৭, পৃঃ ৯৭
(৭) ভারতবর্ষ, ১৩৩২, পৌষ পৃঃ ৭৮-৮১

# ঘরহারা পরবাসী

**জসীম উদ্দীন**

ভেবেছিনু আমি আর কোনখানে বাঁধিবনা পুন ঘর,
আর কোনখানে খুঁজিতে যাবনা আর কোন অন্তর।
তোমাদের দেশে দুদিন ঘুরিয়া চ'লে যাব পরবাসী,
সাথে নিয়ে যাব নিজহাতে গড়া আমাব ব্যথাব বাঁশী।
বাতাসে বাতাসে কুড়ায়ে ফিরিব অজানা ফুলের ঘ্রাণ,
ছায়ায় ছায়ায় আঁচল বিছায়ে শুনিব পাখীর গান।
নদী তীরে তীরে বালুর আখরে লিখিয়া বুকের ব্যথা,
পড়িয়া পড়িয়া মুছিয়া ফেলিব শেষ হতে সব কথা।
দূর বন-পথে গোধূলি নামিবে, ধূসর গগন পথে
সোনার বরণী দাঁড়াবে আসিয়া কনক মেঘের রথে।
চরণের তলে সাঁঝ-কমলিনী মেলিয়া গোপন দল,
উদাসী বাতাসে হেলাবে দোলাবে বঙিন নদীর জল।
আসিবে আঁধার বন-পথ বেয়ে, তাহারি আঁচল ছায়
ঝিল্লীর তানে ঘুম পাড়াইব মোর যত বেদনায়।
কে তোমরা ভাই, ডাক দিলে মোরে ঘর-হারা পরবাসী
কেন ভাই সম আপনার হয়ে কাছে এলে ভালবাসি।

তোমরা আজিও ফুলের জগতে ফিরিতেছ হেসে খেলে,
বুঝিতে শেখনি পরাণ সঁপিলে পরাণেরে নাহি মেলে।
তোমাদের চোখে আজো রাঙা আলো, আড়ালে অন্ধকার
চিরবিস্মৃত সীমাহীন রাতি, খোঁজ নাহি জান তার।
অনন্ত তৃষা কাঁদিছে পরাণে, শকতি নাহিক হায়,
বাহুর বাঁধন বড়ই শিথিল কারে নাহি ধরা যায়।
চঞ্চল বেদে চলিয়াছে পথে বাজায়ে বিষের বাঁশী,
বনের হরিণ কাঁদে পথে পথে ঘবহারা পরবাসী।

হেথায় শুধুই লবণ সাগর, নাহি তৃষ্ণার বারি,
তৃষিত মানুষ সমুখে হেরিছে মরীচিকা সারি সারি।
কোথায় তৃপ্তি, কোথা সান্ত্বনা, কোথায় মরূদ্যান!
চিরপথহারা কাঁদে বেদুইন, কাঁদে তার বুনো প্রাণ।
সাত সাগরের তৃষা আছে যার বিন্দুরে লইবার,
কৃপণ বিধাতা এ জগতে হায় ক্ষমতা দেয়নি তার।

অনেক ভুলিয়া অনেক শিখেছি তাই পুন ভুল ক'রে
ক্ষণিকের বাসা বাঁধিতে চাহিনি আর কাবো খেলাঘরে।
তবু কেন মোরে ডাক দিলে ভাই, কাঁদে মোর ভিরু হিয়া!
হয়ত আবার ভুল ক'রে যাব মন দিয়া মন নিয়া।
হয়ত আবার ভুল করে ভাই, বলিয়া ফেলিব হায়
তোমাদের তরে আছে আছে ঠাঁই মোর অন্তর ছায়।
হায়রে মিথ্যা! ঠাঁই কোথা পাব এতটুকু অন্তর,
শিশির ফোটার ভার সহিবারে ভেঙে যায় যন্তর।
মহাকাল নটী চ'লেছে নাচিয়া গাঁথিয়া ভুলের মালা,
সন্ধ্যা আসিছে, উষসী আসিছে, ভরিয়া রঙের ডালা।
আজ যাহা দেখি কাল তাহা নাই, সময় স্রোতের ধারা
ঘটনার পর ঘটনা লইয়া ছুটিয়াছে গতি-হারা।
কোনখানে কারো চিহ্ন রহেনা, এই দুর্ব্বল মন
স্মৃতির শ্মশানে চিতা সাজাইয়া করিতেছে ক্রন্দন।

জসীম উদ্দীন

# অভিজ্ঞান

## উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১০

বেলা তখন আটটা। স্নান এবং কিছু জলযোগ সমাপন করে সন্ধ্যা আমিনার ঘরে ব'সে ছিল। একদল কৌতূহলী বালক-বালিকা দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে প্রত্যূষের এই সহসা-আবির্ভূত অপরিচিত অতিথিটিকে নিবিষ্টভাবে পর্য্যবেক্ষণ করছিল। অতিথির নাম হামিদা এবং সে আমিনার বাপের বাড়ির দিক দিয়ে তার একজন দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়া, সে-কথা সহজেই জানা গিয়েছিল; কিন্তু এ গৃহের সহিত তার কি সম্পর্ক, কি জন্যে এখানে সে এসেছে, কতদিন এখানে অবস্থান করবে, এই সব অবশ্য-জ্ঞাতব্য তথ্যের কিছুই জানা যাচ্ছিল না। এ জন্য তাদের মনে ঔৎসুক্যের অন্ত ছিল না, কিন্তু আমিনাকে জিজ্ঞাসা করলে সে ধমক দেয়, বলে, ও আমার বহিন্, সব দিন এখানে থাকবে। যা, এখন পালাঃ।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কি ক'রে একটু আলাপ আরম্ভ করবে সন্ধ্যা মনে মনে তাই জল্পনা করছিল এমন সময় সেখানে আমিনা উপস্থিত হওয়ায় ছেলের দল দুদ্দাড় ক'রে স'রে পড়ল। আমিনা ঘরে প্রবেশ করল, এবং তার পিছনে পিছনে প্রবেশ করল তার দেবর নাসীর,—দীর্ঘ সুগঠিত দেহ কান্তিমান যুবক।

সহাস্যমুখে আমিনা বললে,—"ভাই হামিদা, এটি আমার দেওর নাসীরউদ্দীন, যার কথা সেদিন তোমাকে বলছিলাম।"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে উঠে একবার নাসীরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে যুক্তকরে তাকে নমস্কার করল।

তাড়াতাড়ি সম্মুখে এগিয়ে এসে সন্ধ্যাকে প্রত্যভিবাদন ক'রে স্মিতমুখে নাসীর বললে, "আপনার বহুৎ মেহেরবাণি যে, আমাদের বাড়ি পায়ের ধুলো দিয়েছেন। সত্যিই আমাদের এ সৌভাগ্যের কথা!"

মাস দুই পূর্ব্বে হ'লে একজন অপরিচিত যুবকের মুখ থেকে উচ্চারিত এই ভদ্রতার বাক্যের উত্তরে সন্ধ্যা হয়ত' একটি কথাও বলতে পারত না, আরক্তমুখে নতনেত্রে দাঁড়িয়ে থাকত; কিন্তু জীবনধারার নিদারুণ বিপর্য্যয়ের কাছে তালিম নিয়ে নিয়ে তার প্রকৃতিও অনেকটা পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেছে; বললে, "সৌভাগ্যের কথা আমারই বলতে হবে। আপনারা ত' আমাকে আশ্রয় দান করেছেন!"

সন্ধ্যার কথা শুনে নাসীরের মুখে মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল, অল্প একটু মাথা নেড়ে বললে, "আশ্রয়দানের কথা আমরা জানিনে, সে আপনার বন্ধু বলতে পারেন, কিন্তু আপনি দয়া ক'রে আসায় সত্যিই আমরা খুসী হয়েচি।"

আমিনা হাসিমুখে বললে, "আশ্রয় পাওয়ার কথাটা একেবারে বাজে মেজ মিঞা। আচ্ছা, আশ্রয় পেয়ে সেই দিনই যদি আশ্রয় ভেঙে কলকাতায় পালাবার জন্যে কেউ ব্যস্ত হয়ে ওঠে ত' সে কি-রকম আশ্রয় পাওয়া তা তুমিই বিচার কর!"

নাসীর হাসতে হাসতে বললে। "না, তাকে কিছুতেই আশ্রয় পাওয়া বলা যায় না।"

এক মুহূর্ত্তের জন্য নাসীরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু কলকাতায় যদি যেতে পাই ত' সে আপনাদের দয়াতেই যাব। কলকাতার আশ্রয়ও ত' আপনাদেরই আশ্রয় হবে।"

শুনে আমিনা খিলখিল্ ক'রে হেসে উঠ্ল; বললে, "এ ঠিক কি রকম কথা হ'ল জানো হামিদা?—একটা খাঁচার পাখী যদি বলে, দয়া ক'রে যদি খাঁচার দোরটা খুলে দেন ত' দেশান্তরে উড়ে যাই,—দেশান্তরের আশ্রয় ত' আপনাদেরই আশ্রয় হবে!—অনেকটা সেই রকম!"

আমিনার উপমার যৌক্তিকতায় খুসী হয়ে নাসীর মৃদু

মৃদু হাস্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু আশঙ্কায় সন্ধ্যার মুখ শুকিয়ে উঠ্‌ল। শ্বশুর কিম্বা পিতৃগৃহের আশ্রয় অবিলম্বে ফিরে পাবার জন্য তার মনে এমন একটা দুর্ব্বার উত্তেজনা জেগে উঠেছে যে, তার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট পরিহাসের মিথ্যা কথাও যেন সে বরদাস্ত করতে পারে না। মহবুবের গৃহে প্রথম দিকে যখন পরিত্রাণের বিশেষ কোনো সম্ভাবনা ছিল না, তখন উত্তেজনাও এতটা ছিল না; কিন্তু সম্ভাবনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের চাঞ্চল্য বহুগুণিত পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। দুস্তর সাগরের প্রায় সবটাই পেরিয়ে এসে এখন অতি অল্পের জন্য মন ধৈর্য্য মান্‌ছে না, মনে হচ্ছে তরী ভেড়বার পূর্ব্বেই তীরে লাফিয়ে পড়ি।

সন্ধ্যার মুখে চিন্তার কুজ্ঝটিকা লক্ষ্য ক'রে আমিনা তার মনের উদ্বেগ বুঝ্‌তে পারলে। বললে, "ভয় নেই তোমার হামিদা, খাঁচার দোর ত' খুলে দোবোই, তা' ছাড়া দেশান্তরে তোমার সত্যিকার আশ্রয়ে তোমাকে রেখে আস্‌ব। এখন একটু ধৈর্য্য ধ'রে মেজ মিঞার সঙ্গে গল্প-টল্প কর, আমি ততক্ষণে একটু-কিছু মুখে দিয়ে আসি।"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যা ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; বললে, "তুমি এখনো কিছু খাওনি ভাই আমিনা?—যাও, যাও, আর দেরি কোরো না।"

"এই এখনি এলুম,—বেশী দেরি হবে না।" ব'লে আমিনা লঘু ক্ষিপ্রপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমিনা যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ তাকে মধ্যস্থ ক'রে সন্ধ্যা এবং নাসীরের মধ্যে এক-আধটা কথাবার্ত্তা চল্‌ছিল, কিন্তু সে চ'লে যাওয়ার পর এই সদ্যপরিচিত দুটি তরুণ তরুণীর পক্ষে কথাবার্ত্তা চালানো কঠিন হ'য়ে উঠ্‌ল। নবপরিচয়ের সঙ্কোচ কথোপকথনের মধ্য দিয়েই তরল হ'য়ে ভেসে চ'লে যায়, নীরবতা তার পথে বাধা সৃষ্টি ক'রে তাকে বাড়িয়ে তোলে। সুতরাং একটা মামুলী কথোপকথনের সূত্রপাত ক'রে নাসীর এই অস্বস্তিকর মৌনের অবসান করবার চেষ্টা করলে। বললে, "কাল রাত্রে গরুর গাড়িতে আস্‌তে আপনার খুবই কষ্ট হয়ে থাকবে।"

সন্ধ্যা মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে বললে, "মোটেই না, আমি খুবই আরামে এসেছিলাম। কষ্ট হয়েছিল আপনার দাদার; তিনি প্রায় সমস্ত রাতই গাড়ির পিছনে পিছনে হেঁটে এসেছিলেন।"

সন্ধ্যার কথা শুনে নাসীর হাস্‌তে লাগ্‌ল; বললে, "আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, এটুকু পথ হাঁটতে, বিশেষত রাত্রে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় হাঁটতে, আমাদের কোনো কষ্টই হয় না। গাড়ি-পাল্কী জেনানাদের জন্যেই ব্যবহার হয়। আমরা পুরুষেরা গাড়ির আগে পিছে ত' চলি-ই, আবার সময়ে সময়ে গাড়ির উপরে উঠে গরুর ল্যাজ্‌ মল্‌তে মল্‌তেও চলি।" ব'লে উচ্চস্বরে হেসে উঠ্‌ল। তারপর ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে বললে, "আপনারা বড়মানুষ, জুড়ি গাড়ি মোটরকার চড়া অভ্যেস,—গরুর গাড়ি চড়তে নিশ্চয়ই আপনাদের কষ্ট হয়।"

শুনে সন্ধ্যা অবরুদ্ধ বেদনায় দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করলে। হায় রে! কোথায় বা জুড়ি গাড়ি, আর কোথায়ই বা মোটরকার! সে-সব ত' একরকম ভুলেই গেছে। সম্পদে-সম্মানে নন্দিত তার পূর্ব্বেকার সহজ সুন্দর জীবন, সে ত এখন অতীতের স্মৃতি! যে কলুষিত গ্লানিকর অস্তিত্বের মধ্যে তার দেহ-মন পলে পলে গলিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল, গরুর গাড়ি ক'রে তা থেকে দূরে পলায়ন, সে ত' একটা অচিন্তিত সৌভাগ্যের কথা! আমিনা যদি তার হাতে-পায়ে দড়ি বেঁধে বন-বাদাড় কাঁটা-কাঁকরের মধ্য দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আস্‌ত তা হলেও দুঃখ ছিল না। মুখে তার কাতরতার ছায়া ঘনিয়ে এল; দুঃখার্ত্ত কণ্ঠে বললে, "আমি বড়মানুষ নই,—অতি দুর্ভাগিনী!"

সন্ধ্যার কথা শুনে এবং আকৃতির আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখে নাসীর অবধানন-ভরে ব্যগ্র হ'য়ে উঠ্‌ল। গভীর ঔৎসুক্যের সহিত সে বল্‌ল, "কিন্তু আপনি বড়লোকের মেয়ে, বড়ঘরের বউ, এ কথা ত' আমি ভাবীর মুখে শুনেছি।"

"শুধু সেই কথাই শুনেছেন, না আরও কিছু শুনেছেন?"

"আর বিশেষ-কিছু শুনিনি, তবে আপনার বিষয়ে সব কথা আমাকে পরে বল্‌বেন বলেছেন।"

সন্ধ্যা বললে, "যখন সব কথা শুন্‌বেন তখন বুঝ্‌তে পারবেন আমি তখন পরিহাস করছিলামনা,—সত্যিই আমি আপনাদের আশ্রিত, আপনাদের শরণাগত।" একটু

চুপ ক'রে থেকে কতকটা যেন আপন মনে অন্যমনস্কভাবে বল্‌লে, "যে গোরুর গাড়ি ক'রে আমিনা আমাকে উদ্ধার ক'রে আন্‌লে সে গোরুর গাড়ি ত' চিরদিনের জন্যে আমার পক্ষে পুষ্পকরথ হ'য়ে রইল।" কথাটা ব'লে ফেলে নাসীরের দিকে চেয়ে হাস্‌তে গিয়ে অকস্মাৎ ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেল্‌লে। ঠিক যেন সূর্য্যকিরণের মধ্যে শরৎকালের অতর্কিত লঘুমেঘের বর্ষণ-লীলা!

নিজের এই আকস্মিক বিচলতার অভিনয়ে অপ্রতিভ হ'য়ে সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছে পুনরায় একবার নাসীরের দিকে চেয়ে দৃষ্টি নত করলে।

নাসীর দুঃখিত স্বরে বল্‌লে, "আমি বড়ই অন্যায় করেছি এ সব কথা তুলে। আমি আগে জান্‌তাম না—"

নাসীরকে আর অধিক কথা বলবার অবসর না দিয়ে সন্ধ্যা বল্‌লে, "আপনি তো কোনো কথাই তোলেন নি। এ কথা আপনিই ওঠে,—আমার জীবনে উপস্থিত এর চেয়ে বড় কোনো কথাই আর নেই,—সুখেরও নয়, দুঃখেরও নয়।"

কী সে এমন কথা যার চেয়ে এই সুন্দরী তরুণী নারীর উপস্থিত আর কোনো কথাই বড় নেই, তা শুনতে ইচ্ছে করে; কী সে এমন বিপদ যা থেকে তাকে উদ্ধার ক'রে আমিনা এ বাড়ীতে নিয়ে আসার ফলে সামান্য গোরুর গাড়ি পুষ্পক-রথ হ'য়ে রইল, তা জানবার আগ্রহও মনে কম নয়; কিন্তু যে প্রসঙ্গের অবতারণা মাত্রেই এক পশলা চোখের জলের বর্ষণ হ'য়ে যায় সে প্রসঙ্গ নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করতে সহৃদয়তায় বাধে। পিছনদিকের বাগানে বহুক্ষণ থেকে একটা কাঠ-ঠোক্‌রা পাখী সমানে শব্দ ক'রে চলেছিল, সেই একটানা শব্দের মদিরতায় নিজের কল্পনাবৃত্তিকে নিমজ্জিত ক'রে নাসীর তার সম্মুখে উপবিষ্ট এই অপরূপ রূপসী নারীর রহস্যাবৃত জীবনের সুখদুঃখের সমস্যা অনুমাননে প্রবৃত্ত হ'ল। কোথা থেকে সে এসেছে, কোথায় সে যাবে, কি তার অভিপ্রায়, কিছুই সে আমিনার কাছ থেকে জান্‌তে পারেনি, শুধু এইটুকু মাত্র জেনেছে যে, সে তাদের গৃহে ক্ষণস্থায়ী অতিথি এবং জাতিতে হিন্দু। বিবাহিত কি অবিবাহিত, সে কথা জিজ্ঞাসা করবারও অবকাশ হয় নি। চোখে দেখে ঠাহর করবার কয়েকবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাও ঠিক বোঝা যায় না। সীমন্তের প্রান্তভাগে রক্তাভ দাগটুকু সিঁদুরের, কি সিঁদুরের নয়, তাও যেন একটা রহস্য! এ যেন ঠিক রূপকথার অলৌকিক ব্যাপার! রূপকথার নায়িকার মতো সোনার কাঠির স্পর্শে হঠাৎ এক-সময়ে আবির্ভূত হয়েচে, আবার রূপার কাঠির স্পর্শে হঠাৎ কখন অদৃশ্য হবে! রূপকথা নয় ত কি? দবিপুরের মতো অজ পাড়াগাঁ জায়গায় তাদের বাড়িতে এমন একটি অভিজাত বংশের রূপসী মেয়ে, রূপকথার পরীর মতোই বিস্ময়ের বস্তু!

"নাসীর মিঞা!"

সহসা নিদ্রোত্থিতের মতো চকিত হ'য়ে নাসীর বল্‌লে, "জী আজ্ঞে!"

"আপনি ত' কলকাতায় পড়েন?"

"জী।"

"এখন আপনি এখানে রয়েচেন, কলেজ কি বন্ধ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের একটা পরব পড়েছে, সেই জন্য কলেজ পাঁচ দিন বন্ধ।"

"কবে আপনি কলকাতায় ফিরবেন?"

মনে মনে একটু চিন্তা ক'রে নাসীর বল্‌লে, "দিন তিনেক পরে।"

নাসীরের কথা শুনে সন্ধ্যার মুখে চিন্তার রেখা দেখা দিলে; বল্‌লে, "আজ তবে আমাকে কে কলকাতায় নিয়ে যাবে? বোধ হয় আপনার দাদা?"

"তা'ত বলতে পারলাম না। আপনার যাওয়ার কোনো কথাই আমি শুনিনি।"

উৎকণ্ঠিত মুখে সন্ধ্যা বল্‌লে, "কিন্তু আজ আমাকে কলকাতা যেতেই হবে। আপনি যদি দয়া ক'রে সে বিষয়ে ব্যবস্থা করবার জন্যে আপনার বাবাকে একটু অনুরোধ করেন!"

নাসীর বল্‌লে, "আপনি আদেশ করলে নিশ্চয়ই করব, কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন হবে না, সে বিষয়ে আপনার সমস্ত ব্যবস্থা বৌদিদি, আমার ভাবী, করবেন। বাবার কাছে তাঁর কথার চেয়ে বেশি জোর আর কারো কথার নেই, আমারও নয় দাদারও নয়। কিন্তু আজই আপনার কলকাতায় যেতে হবে? দু-চার দিন পরে গেলে হোত না?

দিন তিনেক পরে আমিও ত' আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।"

মৃদু মৃদু মাথা নাড়তে নাড়তে সন্ধ্যা বললে, "আজ আমাকে যেতেই হবে। সব কথা শুনলে আপনি বুঝ্‌তে পারবেন যে, আজ আমার না গেলেই নয়।" একটু অপেক্ষা ক'রে নাসীরের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, এখান থেকে রেল ষ্টেসন কত দূরে?"

নাসীর বললে, "বেশি নয়, মাইল চারেক।"

"যেতে কতক্ষণ সময় লাগে?"

"তাও বেশি নয়, ঘণ্টা দেড়েক।"

"ষ্টেশনের নাম কি?"

"গালুডি।"

"গালুডি!" সন্ধ্যার মুখ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল। অবশেষে একটা পরিচিত জায়গার কাছাকাছি উপনীত হয়েচে তা হ'লে! বছর চারেক আগে মাসখানেকের জন্যে গালুডিতে সে তার মাসির বাড়ি বেড়াতে আসে। স্ত্রীর ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তার মেসোমশাই গালুডিতে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন।

নাসীর বললে, "গালুডি তা হ'লে আপনি জানেন?"

"হ্যাঁ, জানি। পাশেই বোধ হয় জামসেদপুর?"

"ঠিক পাশেই নয়; গোটা দুই ষ্টেশন পরে। জামসেদপুর গেছেন না কি কখনো?"

"হ্যাঁ, গেছি।"

"আত্মীয় কেউ সেখানে আছেন?"

গালুডিতে অবস্থানকালে লোহার কারখানা দেখ্‌বার জন্যে সন্ধ্যারা একবার জামসেদপুর গিয়েছিল। সেখানে তার মাসিমার বড় জামাই কারখানায় বড় চাকরী করেন। তিনিই আগ্রহ ক'রে সকলকে নিয়ে গিয়ে চার পাঁচ দিন নিজের গৃহে রেখেছিলেন। তাঁর কথা মনে ক'রে সন্ধ্যা বললে, "হ্যাঁ, আছেন। আমার মাসিমার জামাই সেখানে চাকরি করেন।" বিবাহের সময়ে পীরনগরে পরিচিত সুধারাণীর স্বামীও জামসেদপুরে চাকরী করে এ কথা সে শুনেছিল। কিন্তু সুধারাণীর স্বামীর নাম তার মনে পড়ল না; হয় ত কখনো শোনেইনি।

নাসীর বললে, "বোনের বাড়ির এত কাছাকাছি যখন এসেছেন তখন কলকাতা যাওয়ার আগে একবার জামসেদপুরে গিয়ে দেখাটা ক'রে এলে ভাল হোত না? না গেলে, পরে শুনলে তিনি হয় ত দুঃখ করতে পারেন।"

এ কথার উত্তর দেওয়ার সময় হ'ল না, মহীউদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে আমিনা সহাস্যমুখে ঘরে প্রবেশ ক'রে বললে; "বেশি দেরী হয়েচে কি সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বললে, "একটুও না, খুব শীগগির এসেছ।"

মহীউদ্দিন বললেন, "বোসো মা, বোসো। তুমিও ব'সে পড় বউ মা, এখন অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা করবার দরকার হবে।" তারপর নাসীরের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "নাসীর, তুমি গিয়ে ইয়াসিনকে ডেকে নিয়ে এস,—পরামর্শের মধ্যে আমাদের সকলেরই থাকা দরকার।"

ইয়াসিন উপস্থিত হ'লে অবিলম্বে কথাটার আলোচনা আরম্ভ হ'য়ে গেল।

সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা পুত্রদের কাছে বিবৃত ক'রে মহীউদ্দিন সন্ধ্যাকে বললেন, "এ কথাতে কোনো ভুল নেই মা যে, যতশীঘ্র সম্ভব তোমার এখান থেকে চ'লে যাওয়া দরকার, তাতে তোমার পক্ষেও মঙ্গল আমাদের পক্ষেও মঙ্গল। কিন্তু গোয়েন্দা-পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে কলকাতায় তোমাকে নিয়ে যাওয়া যে খুব সহজ হবে তা আমার মনে হয় না, কারণ কলকাতার দিকে, বিশেষত হাওড়া ষ্টেশনে; তারা ওৎপেতে ব'সে আছেই। এ কথা তারা খুবই জানে যে এ-সব ব্যাপারের বদমাইশেরা শেষ পর্য্যন্ত কলকাতায় গিয়ে আশ্রয় নেয়; আর ধরা পড়বার ভয়ে টাট্‌কা-টাট্‌কি যায় না, দু-চার মাস পরেই গিয়ে থাকে। তোমাকে নিয়ে আমার ছেলেরা যদি ধরা পড়ে তা হ'লে বৌমার ভাইদের ধরা পড়তেও বিলম্ব হবে না—আর তা হ'লে তার চোট্‌টা শেষ পর্য্যন্ত বউমার ওপরই গিয়ে পড়বে তা বুঝ্‌তেই পারছ। শুনেছি বউমার খাতিরে তুমি তাঁর ভাইদের এইটুকু ক্ষমা করেছ যে, তাদের আর অনিষ্ট কামনা করনা। এ কথা সত্যি কি মা?"

ঘাড় নেড়ে সন্ধ্যা তার সম্মতি জানালে; বললে, "সত্যি।"

মহীউদ্দিন বল্‌লেন, "ভালো কথা। ক্ষমার উপর কোনো শিকায়েৎ চলে না, বিশেষত যেখানে ক্ষমা একটা উপকারের প্রত্যুপকার। তা হ'লে কাছাকাছি কোনো জায়গায় যদি তোমার এমন কোনো আত্মীয় স্বজনের বাস থাকে যেখানে রাতারাতি তোমাকে রেখে আসা যেতে পারে তা হ'লে গফুর-মহবুবের সঙ্গে নেতুড়টা কেটে যায়। তারপর সেখান থেকে তুমি অনায়াসে কাউকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় চ'লে যেতে পারো। এমন কেউ আছেন কি মা? তা যদি থাকেন ত' আজই তোমাকে সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করি।"

নাসীর উৎসুকনেত্রে সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করলে। সন্ধ্যাও একবার নাসীরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "আছেন। জামসেদপুরে আমার এক ভগ্নীপতি আছেন, টাটা আয়রন্ ওয়ার্কসে চাকরি করেন।"

মহীউদ্দিন উৎফুল্ল হয়ে বল্‌লেন, "আল্লা! তা হ'লে ত সুবিধেই হয়েচে। নাম কি মা, তাঁর?"

"প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।"

"ঠিকানা কি জানো?"

একটু মনে মনে চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বল্‌লে, "বোধ হয় নর্দার্‌ন্ টাউন্।"

"তা হ'লে বড় চাকরি করেন?"

"হ্যাঁ, বড় চাকরিই করেন।"

"সেখানে তোমার যেতে কোনো আপত্তি নেই ত মা? তা যদি না থাকে ত আজ রাত্রেই তোমাকে জামসেদপুরে পাঠিয়ে দিই। কলকাতা পৌছতে তা'তে তোমার একটা দিন বিলম্ব হয়ে যাবে। কিন্তু উপায় কি?"

সন্ধ্যা সকৃতজ্ঞনেত্রে মহীউদ্দিনের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আমার পক্ষে আর কিছুই হ'তে পারে না। কি ব'লে আপনাকে যে আমি—" সে আর অধিক কিছুই বল্‌তে পারলে না, অশ্রুতে চক্ষু আচ্ছন্ন হয়ে এল, কণ্ঠস্বর গেল জড়িয়ে।

মহীউদ্দিন স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্‌লেন, "কিছুই তোমাকে বল্‌তে হবে না মা, আমি সব বুঝ্‌তে পাচ্ছি। অনেক কষ্ট পেয়েছ তুমি, এবার খোদা তোমার মঙ্গল করুন।"

তারপর কি ক'রে সন্ধ্যাকে জামসেদপুরে পাঠানো হবে তার আলোচনা হ'য়ে গেল। স্থির হ'ল বেলা আড়াইটার গাড়িতে ইয়াসিন্ জামসেদপুর গিয়ে প্রথমে সন্ধ্যার ভগ্নীপতির গৃহের সন্ধান ক'রে রাখবে, তারপর কাসেম নামে তাদের একজন পরিচিত এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তির ট্যাক্সি নিয়ে রাত্রি চারটার সময়ে ষ্টেশনে অপেক্ষা করবে। রাত্রি তিনটার গাড়িতে গালুডি থেকে সন্ধ্যা ও নাসীর রওনা হ'য়ে জামসেদপুর পৌছলে ইয়াসিন সন্ধ্যাকে নামিয়ে নিয়ে প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহে পৌঁছে দেবে। নাসীর সেই গাড়িতেই চক্রধরপুর চ'লে গিয়ে দিন দুই তিন তার এক মাসীর বাড়িতে অবস্থান করবে, এবং ইয়াসিন মধ্যাহ্নের গাড়িতে দবীপুর ফিরে আস্‌বে।

মহীউদ্দিন আমিনাকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন, "তা'হলে বউমা, রাত বারোটার সময়ে তোমার বন্ধুকে নাসীরের সঙ্গে রওনা ক'রে দিয়ো। তার আগে যেটুকু সময় হাতে আছে গরিবের ঘরে যতটুকু সম্ভব তাঁর খাতির-যত্ন কর।" তারপর হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন, "যে সর্ত্তে তোমার বন্ধুকে মুক্তি দিচ্ছ বউমা, সে সর্ত্ত কিন্তু তুমি ভুলে নিয়ো। খাঁচার দরোজা যখন খুলে দিচ্ছ তখন পাখীর পায়ে আর জিঞ্জির বেঁধে রেখোনা।"

সহাস্যমুখে মৃদুকণ্ঠে আমিনা বল্‌লে, "আপনার যখন হুকুম আব্বা, তখন তাই হবে।"

"হুকুম নয় বেটি, অনুরোধ।" তারপর সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে মহীউদ্দিন বল্‌লেন, "খোদার কৃপায় সে প্রয়োজন যেন না হয়, কিন্তু যদিই হয়, তা হ'লে কিছুমাত্র সঙ্কোচ না ক'রে তুমি ফিরে এসো মা। যখনি তুমি আস্‌বে তখনি বউমার এ বাড়ির দরোজা তোমার জন্যে খোলা পাবে—এ জেনে রেখো।"

শুনে সন্ধ্যার চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল; বল্‌লে, "তা আমি জানি আব্বা।"

মহীউদ্দিন কম্পিতকণ্ঠে বল্‌লেন, "আরো একটা কথা ব'লে রাখি। বি-এ পাশ করলেই আমি নাসীরের সাদি দোবো। তোমার কাছে নেওতা যাবে, জামাইকে সঙ্গে নিয়ে আমার একটি মেয়ের মত তখন তোমাকে আস্‌তে হবে।"

সন্ধ্যার গৌরবর্ণ মুখে লজ্জার একটা গোলাপী আভা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌ল; মৃদুকণ্ঠে বল্‌লে, "নিশ্চয় আস্‌ব।"

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

# শ্যামাপ্রসাদ প্রশস্তি

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্তরে-গূঢ় বন্দনা-গীতি
ছিল যা প্রকাশ-হীনা,
উদাত্ত সুরে জাগায় তাহারে
মিলিত প্রাণের বীণা।
মানুষেরা খোঁজে মনীষি-সঙ্গ,
উদয়-প্রভাতে তার
নন্দিত-মনে গুণ-গুঞ্জনে
নতশির সবাকার।
বসিয়াছ আজি যে রাজ-আসন
করিয়া অলঙ্কৃত
যুগে যুগে তাহা শ্রদ্ধার স্রক্-
চন্দনে মণ্ডিত।
সুরু হলো তব শুভ তপস্যা
হে বীর, শক্তিধর,
নব জীবনের বিজয়োৎসবে
হইলে অগ্রসর।
নিলে গুরু-ব্রত, যাহা জন-হিত,
যাহা চির-সুখকর,
তরুণ-গণের জ্ঞানের পরিধি
কর' গো বৃহত্তর।
যোগাও ক্ষুধিত-মনের অন্ন,
যেন সে জন্মগত
অধিকার-বোধে বঞ্চিত হ'য়ে
না থাকে বোবার মত।
ডাকিছে তোমারে কীর্ত্তির দূত,
কর্ম্মের রথ এসে
করে আহ্বান, উড়িছে নিশান
উষালোক-উন্মেষে।

কালের পুণ্য-পুঁথির পাতায়
উজ্জ্বল কর' নাম,
নবীন বয়সে, নব-পৌরুষে,
এস' মনো-অভিরাম;
এস নির্ম্মল দীপ্ত বিবেকে
গৌরব পদবীতে;
এস অনিন্দ্য-সুন্দর হ'য়ে
সহানুভূতির শ্রীতে।
সত্য-মন্ত্রে যাত্রা-পথের
বিঘ্ন কর' গো দূর,
আকাশে বাতাসে ভাসে উল্লাসে
স্বস্তি-বাচন-সুর।
শোন' জনতার আত্মার কথা
স্ফুরিত বারম্বার,
সমুদ্র যেন মূর্ত্তি ধরিয়া
গরজিছে অনিবার।
আদরে রচিত বরণের মালা
কণ্ঠে পরায়ে দিতে
যাচি অনুমতি, হে উদার-মতি,
কত আশা জাগে চিতে।
বঙ্গবাণীর মণি-মন্দির-
স্বপ্ন-দ্রষ্টা যিনি,
অর্জিত যাঁহার কীর্ত্তি-কলাপ,
তাঁরই পদরেখা চিনি'
তাঁহারি মতন হও মহাজন,
পূরাও দেশের সাধ,—
প্রসন্ন তব ভাগ্য-দেবতা,
পেয়েছ আশীর্ব্বাদ।

# জেনারেল ক্ল্যদ মার্টিন

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ, পি-আর-এস, বি-এল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শীঘ্রই কিন্তু দুপ্লের চক্রান্তে নাসিরজঙ্গের সেনাদল মধ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। তাঁহার সামন্ত নবাব ও আমীরগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। দুপ্লে একদল ফরাসী সৈন্য সহ আবার চাঁদসাহেবকে যুদ্ধে পাঠাইলেন। বিখ্যাত ফরাসীসেনাপতি কাউন্ট চার্লস জোসেফ দি বুসী মহম্মদ আলির সৈন্যদলের হস্ত হইতে গিঞ্জি বা জিঞ্জির সুদৃঢ় দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। মসলিপত্তন বন্দরও ফরাসীরা হস্তগত করিল। ইহার অনতিকাল পরে নাসিরজঙ্গ যুদ্ধে পরাজিত এবং বিশ্বাসঘাতক কুর্ণুলের নবাব কর্ত্তৃক নিহত হইলেন (ডিসেম্বর ১৭৫০)। তখন সদ্যকারামুক্ত মজঃফরজঙ্গকে হায়দ্রাবাদে লইয়া গিয়া বুসী মহাসমারোহে মসনদে বসাইলেন। কৃতজ্ঞতার মূল্যস্বরূপ তিনি ফরাসীদিগকে ২০ লক্ষ টাকা নগদ এবং মসলিপত্তন জনপদ প্রদান করিলেন। চাঁদসাহেবও তাঁহাদিগকে পন্দিচেরীর নিকটে ৮১ খানি গ্রাম দিয়াছিলেন। দুপ্লের যশের আর সীমা রহিল না।

কিন্তু অনতিকালমধ্যেই মজঃফরজঙ্গ এক খণ্ডযুদ্ধে নিহত হইলেন (ফেব্রুয়ারী ১৭৫১)। তখন দুপ্লে নিজাম-উল-মুল্কের অন্যতম পুত্র সালাবৎজঙ্গকে নিজাম পদে বসাইলেন। ফরাসী সৈনিকগণের বেয়নেট সাহায্যে রক্ষিত সিংহাসনে উপবেশন করিয়া তিনি সর্ব্বতোভাবে তাহাদের আশ্রিত হইয়া রহিলেন। আর্কট, মাদুরা এবং ত্রিচিনপল্লী এই তিনটী প্রদেশ তিনি দুপ্লেকে জীবদ্দশায় নিজের স্বত্বে এবং তাঁহার দেহান্তের পর ফরাসীসরকারকে সাহায্যের মূল্যস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। মহম্মদ আলির তখন নিতান্ত চরম অবস্থা; তাঁহার সবই গিয়াছিল,—তিনি ত্রিচিনপল্লীতে শত্রুসেনা কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া কোনমতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মিত্রগণের তাঁহাকে উদ্ধার করিবার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। ক্রমে হতাশ হইয়া পড়িয়া তিনি শত্রুকরে আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন এমন সময়ে বিখ্যাত রবার্ট ক্লাইভের বুদ্ধিকৌশলে ও পরাক্রমে সকল দিক রক্ষা পাইল;—দুপ্লের সকল প্রযত্ন ব্যর্থ হইয়া গেল।

ক্লাইভ কর্ত্তৃপক্ষকে বুঝাইলেন যে ত্রিচিনপল্লীতে সৈন্য পাঠাইয়া অবরোধকারীদের বিতাড়িত করা সম্ভব নহে। তিনি বলিলেন যে মহম্মদ আলিকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় হইল চাঁদসাহেবের রাজধানী আর্কট নগর অধিকার করা। রাজধানী অরক্ষিত রাখিয়া তিনি সমস্ত সৈন্য লইয়া ত্রিচিনপল্লী অবরোধে ব্যাপৃত আছেন, এই সুযোগে আর্কট অধিকার করিয়া বসিলে নিশ্চয়ই তাহার উদ্ধার জন্য চাঁদসাহেব সৈন্য পাঠাইবেন। তখন ত্রিচিনপল্লীতে অবরোধকারীদের সংখ্যা হ্রাস হইলে মহম্মদ আলির উপর চাপ কম পড়িবে। কর্ত্তৃপক্ষ এ প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া ঐ কার্য্যভার তাঁহাকেই প্রদান করিলেন। সামান্যমাত্র সেনাসম্বলে ক্লাইভ চাঁদসাহেবের পুত্র রাজাসাহেবের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে ৫০ দিন ধরিয়া মহা বীরত্বের সহিত আর্কট রক্ষা করিলেন। ইহাতে চারিদিকে ইংরাজদিগের যশ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তৎপূর্ব্বে সকলে ফরাসীদের যুদ্ধে অজেয় মনে করিত, কিন্তু আর্কটে এ বিশ্বাস শিথিল হইল। ইংরাজেরা ইতিপূর্ব্বে অর্থবিনিময়ে মুরারীরাও ঘোরপোড়ে নামক একজন মারাঠা সর্দ্দারের সাহায্য ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা যুদ্ধ করিতে জানেনা এই

ধারণাতে তিনি এতদিন তাহাদের সাহায্যে আসিতে তৎপর হন নাই। এবার তিনি এবং মহিশুরী সেনাপতি নন্দিরাজ উভয়েই সসৈন্যে ত্রিচিনপল্লীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। তঞ্জোরাধিপতি নিজ সেনাধ্যক্ষ মঙ্কোজী বা মাণিকজীর নেতৃত্বে পাঁচ হাজার সৈন্য পাঠাইলেন। পদ্মকোটার তাণ্ডিমানও সদলবলে আসিয়া দেখা দিলেন। তখন ক্লাইভ আর্কট হইতে বাহির হইয়া কাবেরীপকের যুদ্ধে (২৮।২।১৭৫২) আবার ফরাসী ও তাহাদের মিত্রদিগকে পরাজিত করিলেন। ইহার পর যুদ্ধের স্রোত ফিরিল। ইংরাজরা মহম্মদ আলির উদ্ধারকল্পে অগ্রসর হইলেন। ঘোর যুদ্ধের পর ত্রিচিনপল্লী তাঁহাদের হস্তগত হইল। চাঁদসাহেব এবং ফরাসীসেনাপতি জ্যাক ফ্রাঁসোয়া ল শ্রীরঙ্গমের উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত মন্দিরমধ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। অবস্থার ফেরে তাঁহারাই এবার আক্রান্ত মধ্যে পরিগণিত হইলেন। তাঁহাদের সাহায্য জন্য দুপ্লে d'Auteuil নামক যে সেনাপতিকে পাঠাইয়াছিলেন তিনি কর্ণেল ডালটনের নিকট উটাটুরে ( ৩।৫।১৭৫২ ) এবং ক্লাইভের হস্তে ভোলকোণ্ডার যুদ্ধে ( ২৯শে মে ) পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন আর তাঁহাদের রক্ষা পাইবার কোন আশা রহিল না। ৩রা জুন তারিখে তাঁহারাও আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। চাঁদসাহেবকে লইয়া মিত্রগণের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইয়াছিল, সকলেই তাঁহাকে আয়ত্তে পাইতে চাহিয়াছিল। সকল সমস্যা সমাধানের সহজ উপায় বলিয়া তখন মঙ্কোজী তাঁহার প্রাণবধ করিলেন। লরেন্স এবং ক্লাইভকেও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলিয়া অনেকে মনে করেন না। বস্তুতঃ তাঁহারা যে চাঁদসাহেবের অদৃষ্টে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখাইয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। *

অতঃপর মহম্মদ আলিকে আর্কটে লইয়া গিয়া ইংরাজরা মহাসমারোহে নবাব পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহারা দেখিলেন যে দুপ্লের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের মিত্র মহম্মদ আলিই তাঁহাদের প্রকৃত শত্রু। ইতিপূর্ব্বে মহীশুরী-দের সাহায্যলাভ কালে তিনি তাহাদের মূল্যস্বরূপ ত্রিচিনপল্লী প্রদেশ দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হইবার পর প্রতিশ্রুতিপালনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। মহিশুরীরা অঙ্গীকৃত মূল্য দাবী করিলে তিনি স্পষ্টভাবেই ত্রিচিনপল্লী প্রদানে অস্বীকার করিলেন। ইংরাজরা উভয়পক্ষে মিটমাটের চেষ্টা করিলে তাহাতে নন্দিরাজের ক্রোধ-বৃদ্ধি হওয়া ভিন্ন আর কোন ফল হইল না। প্রতাপসিংহ, তাণ্ডিমান, মুরারীরাও সকলেই রণশ্রান্ত হইয়াছিলেন, নবাবের আচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহারা সকলে একে একে নিজ নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এত বিপদেও দুপ্লে হতাশ হন নাই। চাঁদসাহেবের পতনের পর তিনি নূতন একজন নবাব প্রতিষ্ঠিত করিয়া নবোদ্যমে শত্রুদের বাধাদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহাদের মধ্যে মনোমালিন্য দর্শনে তাঁহার উল্লাসের অবধি রহিল না। তাঁহার চেষ্টায় নবাব ও ইংরাজদের পূর্ব্বতন মিত্রগণ ফরাসীপক্ষ অবলম্বন করিল। আরও এক বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল। তাহার দীর্ঘ বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। কর্ণাটকে ইংরাজদের ক্রীড়া-পুতুল নামসর্ব্বস্ব নবাব হইলেও দাক্ষিণাত্যে ফরাসীরাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া রহিল। বুসীর সেনাদলের সাহায্যে রক্ষিত সিংহাসনে বসিয়া নিজাম সালাবৎজঙ্গ সর্ব্বতোভাবে তাহাদের অনুগত হইয়া চলিতে থাকিলেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি সৈন্যগণের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ বুসীকে উত্তর-সরকার প্রদেশ জায়গীর দিয়াছিলেন। তখনকার দিনে উত্তরসরকার বা সংক্ষেপে শুধু সরকার বলিতে বঙ্গোপসাগরের পশ্চিমতটবর্ত্তী বর্ত্তমান মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তরপূর্ব্বাঞ্চল বুঝাইত। সরকারগুলি ছিল সংখ্যায় পাঁচটী,—চিকাকোল, রাজমহেন্দ্রি, এলোর, কোণ্ডপল্লী এবং গুন্টুর।

ভারতবর্ষে তাঁহাদের কর্ম্মচারীগণের যুদ্ধবিবাদ দর্শনে এবং বাণিজ্য ও অর্থনাশে ইউরোপে উভয় কোম্পানীর কর্ত্তারা বিষম বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বারম্বার উঁহাদের বিবাদ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বাণিজ্য-ব্যাপারে

* প্রায় এই সময়ে গাজিউদ্দিন দীর্ঘকাল পরে পৈতৃক পদলাভে সচেষ্ট হইয়া পেশবার সহিত দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেজন্য দুপ্লেকে বিশেষ বিব্রত হইতে হয় নাই। আওরঙ্গাবাদে আসিয়া তিনি বিমাতা সালাবৎজননী-প্রদত্ত বিষাক্ত খাদ্য-ভোজনে গতাসু হইলে মারাঠারা নিজামের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

মনোনিবেশ করিবার আদেশ দিতেছিলেন। ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ কিন্তু উক্ত আদেশের সঙ্গে তাঁহাদের কর্ম্মচারী-বৃন্দকে প্রয়োজনমত সৈন্য এবং অর্থ জোগাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। পক্ষান্তরে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ ডুপ্লের প্রতি বিষম অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এ দেশের আধিপত্য-লাভে কোন ইচ্ছা ছিল না। লণ্ডনে এক বৈঠকে উভয় কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিলেন যে উভয়েই নিজ নিজ যুদ্ধরত গভর্ণরকে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিয়া নূতন ব্যক্তিকে সন্ধিস্থাপনোদ্দেশ্যে পাঠাইবেন। তদনুসারে ফরাসীরা চার্লস রবার্ট গদেহু নামক এক ব্যক্তিকে ডুপ্লের পদে গভর্ণর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। আবশ্যক হইলে ডুপ্লেকে ধৃত করিবার ক্ষমতাও ইঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল এবং সে ক্ষমতা কতকটা অনাবশ্যক কঠোরতার সহিত ইনি ব্যবহার করিয়াছিলেন। ঠিক যে সময় আবার সাফল্য-লাভের সম্ভাবনা ডুপ্লের সম্মুখে দেখা দিয়াছিল সেই সময় গদেহু আসিয়া (২।৮।১৭৫৪) তাঁহার হস্ত হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। ইংরাজ কোম্পানী নূতন গভর্ণর পাঠাইলেন না। ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ কোনমতে যুদ্ধাবসানের জন্য এত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে তাঁহারা ইহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। ১১ই অক্টোবর তারিখে "মাদ্রাস কনভেনসন" অনুসারে উভয়পক্ষে সাময়িক ভাবে যুদ্ধ নিবৃত্তি হইল। অনন্তর গদেহু ইংরাজ গভর্ণর সণ্ডার্সের সহিত সন্ধি সর্ত্তের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সমসাময়িক সকল ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহাদের পক্ষে থাকায় এবং অপর পক্ষে এ দেশে একেবারে নবাগত ব্যক্তি থাকায় ইংরাজেরা যে যথেষ্ট লাভবান হইয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। পর দিবস ১২ই অক্টোবর তারিখে ডুপ্লে চির-জীবনের মত তাঁহার সাধনার ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। ২৬শে ডিসেম্বর উভয়পক্ষে স্থায়ীভাবে সন্ধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এক মুহূর্ত্তে ডুপ্লের সকল কার্য্য ব্যর্থ হইয়া গেল। এত আয়াসে, এত পরিশ্রমে, বহু অর্থ ও লোকক্ষয় করিয়া ফরাসীরা যাহা কিছু লাভ করিয়াছিল সবই পরিত্যক্ত হইল। ইংরাজেরা যাহা চাহিতেছিল সবই পাইল। জেমস্ মিল সত্যই বলিয়াছেন যে শান্তিপ্রিয়তার জন্য অতি অল্পসংখ্যক জাতি এ ধরণের গুরুতর ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছে।* ফলতঃ এই সন্ধি ইংরাজদিগের পক্ষে পরম সুবিধার কারণ হইয়াছিল, যেহেতু চাঁদসাহেবের স্থান দখল করিবার মত ফরাসীদিগের পক্ষে কেহ রহিল না; কিন্তু নামসর্ব্বস্ব নবাব মহম্মদ আলিকে পাইয়া ইংরাজরা একাধারে একটি মুরুব্বি ও ক্রীড়াপুতুল হাতে পাইলেন এবং তাঁহার প্রজাপুঞ্জের উপর তাঁহার আধিপত্য-রক্ষার অজুহাতে তাঁহারা, যখনই পুনরায় তাহা ঘটুক না কেন, ফরাসীদের সহিত আসন্ন সমরের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ম্যালিসনের মতে ডুপ্লেকে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিবার পরিবর্ত্তে যদি ফরাসী গভর্ণমেণ্ট এক রেজিমেণ্ট সৈন্য পাঠাইয়া দিতেন তবে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিবার প্রয়োজন হইত।

ফ্রান্সে ফিরিয়া গিয়া ডুপ্লে সকলকার নিকট বিষম অসদ্ব্যবহার পাইয়াছিলেন। তিনি যেন ঘোর অর্থগৃধ্নু, নিম্নশ্রেণীর এক ভাগ্যান্বেষী জীব, শুধু নিজের খেয়াল পরিতৃপ্তির জন্য যুদ্ধে মাতিয়াছিলেন কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহারে সেই ধরণের ভাব প্রকাশ পাইল। তিনি যে ভারতবর্ষে ফরাসী-জাতির প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, নিজ স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া কিছু করেন নাই, সে কথা কেহ মনে রাখিল না। কোম্পানীর তহবিলে যথেষ্ট অর্থ না থাকায় তিনি নিজ ধনসম্পত্তি যাহা কিছু ছিল সবই অকাতরে ব্যয় করিয়াছিলেন এবং প্রচুর অর্থ গভর্ণমেণ্টের নামে ঋণ-গ্রহণও করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ টাকা কোম্পানী তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে অসম্মত হইলেন। রাজসরকারও এ বিষয়ে তাঁহাকে কোন সাহায্য করিলেন না। ঘোর অভাব অনটনের মধ্যে ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসন-কর্ত্তৃবৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি স্বদেশপ্রাণ এই মনীষির মৃত্যু হইয়াছিল।

ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছিল তাহার প্রথম সর্ত্ত ছিল যে অতঃপর উভয় কোম্পানী ভারতবর্ষে

---

* "All these brilliant advantages were now cordially resigned by M. Godehu and it will certainly be allowed that few nations have ever made, to the love of peace, sacrifices relatively more important."

Mill—"History of Brit. India"; Bk. IV. Ch. II p. 144.

রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা অথবা এতদ্দেশীয় রাষ্ট্রগুলির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কার্য্য হইতে বিরত থাকিবেন। সর্ত্তমত বাধ্য না হইলেও প্রতিদ্বন্দ্বীগণের অপেক্ষা অধিকতর সুবিধাভোগে অনিচ্ছুক ফরাসী কোম্পানী ইংরাজদিগের প্রতি নিজেদের শুভেচ্ছা দেখাইবার জন্য যুদ্ধকালে লব্ধ চারিটী জেলার আধিপত্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে "সন্ধিপত্রের কালি সম্পূর্ণ-রূপে শুষ্ক হইবার পূর্ব্বেই" ইংরাজরা আবার সমরে মাতিলেন; তাহাও আবার করমণ্ডলতটে দেবীকোটা নামক ক্ষুদ্র একটি স্থানের লোভে।* তাঞ্জোররাজ প্রতাপসিংহ দীর্ঘকাল হইতে সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। অপরাপর সকলের মত ইংরাজরাও তাঁহাকে বরাবরই রাজা বলিয়া মানিয়া আসিতেছিলেন। তাহা সত্ত্বেও এই সময় সাহজী নামক জনৈক তাঞ্জোর-রাজবংশীয় ব্যক্তি স্বয়ং রাজা হইবার অভিপ্রায়ে ইংরাজদিগকে যখন জানাইল যে তাহাকে সাহায্য করিলে মূল্য স্বরূপ দেবীকোটা প্রদেশ সে তাঁহাদের প্রদান করিবে তখন লাভের আশায় মান্দ্রাজ কর্ত্তৃপক্ষের আর উল্লাসের অবধি রহিল না। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা তাঞ্জোরে এক অভিযান পাঠাইলেন। ফরাসীরা সন্ধিপত্রের দোহাই মানিল, নিজেদের নজির দেখাইল, কিন্তু সকলই বৃথা হইল।† ইংরাজদের তাঞ্জোর অধিকারের চেষ্টা কিন্তু সফল হয় নাই, তাঁহাদের সৈন্যদল ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে বাধ্য হইল। তখন সাহজীকে প্রতাপসিংহের দয়ার উপর পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত আশু সন্ধি-স্থাপনে ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের বিন্দুমাত্র বাধিল না। বিগত সমরের ব্যয় বাবদ মহম্মদ আলির নিকট হইতে ইংরাজদের অনেক অর্থ প্রাপ্য হইয়াছিল। তাহা পরিশোধ করিতে বলিলে নবাব জানাইলেন যে মাদুরা, তিনেভেলী ও ভেলোরের ফৌজদারগণের নিকট হইতে তাঁহার অনেক কালের রাজস্ব বাকী পড়িয়া আছে। ঐ টাকা-সংগ্রহ কার্য্যে মিত্রগণ সাহায্য না করিলে তাঁহার পক্ষে তাঁহাদিগকে অর্থদান করা সম্ভব নহে। ইংরাজরা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া মাদুরা ও ভেলোরে সৈন্য পাঠাইলেন। পরে সুবেদার ইউসুফ খাঁ প্রসঙ্গে সে বিবরণ দেওয়া হইবে। এখন বুসীর উত্তর-সরকারপ্রদেশে অভিযানের কথা বলা যাউক। ঐ জনপদ নিজাম তাঁহাকে সেনাদলের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ জায়গীর দিয়াছিলেন সে কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তথাকার অবাধ্য জমিদারগণ ইংরাজদিগের ষড়যন্ত্রে রাজস্ব প্রদান করা বন্ধ করিয়াছিল; সেজন্য উহাদিগকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বুসী সসৈন্যে সরকার প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। ইংরাজদিগের মাদুরা ও ভেলোর অভিযান এবং বুসীর অভিযান যে এক ধরণের ব্যাপার নহে তাহা বিশেষ করিয়া প্রমাণ করা অনাবশ্যক।

বিজয়নগরাধিপতি গজপতি বিজয়রামরাজ ফরাসীদের মিত্র ছিলেন। ববিলির রাজার সহিত তাঁহার ঘোর শত্রুতা ছিল। বুসী উত্তর-সরকারে আগমন করিলে তিনি সসৈন্যে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। অনন্তর উভয়ের সেনাদল একযোগে ববিলিদুর্গ আক্রমণ করিল। রাজা প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। তুমুল যুদ্ধের পর আর কোন আশা নাই দেখিয়া দুর্গরক্ষীগণ প্রথমে নিজেদের স্ত্রী-পুত্রপরিজনবর্গকে সংহার করিল ও পরে সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুর সহিত ভীষণ সংঘর্ষের পর সকলে নিহত হইল; এক প্রাণীও শত্রুকরে আত্মসমর্পণ করিল না। তখন রক্তরঞ্জিত শূন্য দুর্গে ফরাসীসেনা প্রবেশ করিল। বুসীর ববিলি অধিকার তাৎকালীন ইতিহাসের অন্যতম প্রধান ঘটনা।* এই ঘটনার কয়েকদিন পরে ববিলিরাজের দুইজন বিশ্বস্ত অনুচর রাত্রিযোগে গোপনে নিজ শিবির মধ্যে সুপ্তিমগ্ন বিজয়রামের প্রাণসংহার করিল। তাঁহার পুত্র নবীন ভূপতি আনন্দ-

---

* "The English were the first to draw the sword, and from no higher inducement than the promise of a trifling settlement on the Coromandal coast." Mill's "History of British India;" Bk. IV, Ch. II, p. 92.

† "The promise of booty dazzled them and they agreed. The French expostulated and appealed to the terms of the treaty and to their surrender of the four districts as a pledge of their desire of peace, but all in vain."

Torrens—"Our Empire in Asia." p. 21.

* ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ববিলির তদানীন্তন ভূস্বামী স্বীয় পূর্ব্বপুরুষের উদ্দেশে এক স্মারকস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাতে লিখিত আছে;—"The then Raja Ranga Rao after fighting eight hours first put to death the women and children in the Fort and then fighting fell like another Leonidas with all his gallant band,"

রাজের নিকট কথাপ্রসঙ্গে বুসী একদিন বিজয়রামের প্রতি নিন্দাসূচক কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। পিতৃনিন্দা শুনিয়া আনন্দরাজ বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তখন ফরাসীদিগের বিরুদ্ধাচরণ করা তাঁহার সাধ্যের বাহিরে ছিল বলিয়া তিনি মনের ভাব মনে রাখিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর বুসী উড়িষ্যার প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র সরকারপ্রদেশ অধিকার করিয়া রাজস্বসংগ্রহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে ইউরোপে আবার ইংরাজ ও ফরাসীতে যুদ্ধ বাধিয়াছিল। এবার ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কাউণ্ট লালী নামক একজন সুনিপুণ যোদ্ধাকে ভারতবর্ষে তাঁহাদের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া বহু সৈন্সসহ পাঠাইয়াছিলেন। নৌবহরের অধিনায়ক হইয়া তাঁহার সহিত প্রেরিত হইলেন কাউণ্ট দি আশে নামক নিতান্ত ভীরু-প্রকৃতির একজন অযোগ্য এডমিরাল। এরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদে তাঁহাকে পাঠান কর্ত্তৃপক্ষের উচিত হয় নাই। লালী আসলে আইরিশ জাতীয় ছিলেন। তাঁহার পিতা সার জেরার্ড ও'লালী ষ্টুয়ার্ট বংশের পতনের পর জন্মভূমির মায়া কাটাইয়া ফ্রান্সে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। তথায় তিনি এক সম্ভ্রান্ত ফরাসী মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পুত্র টমাস আর্থার লালী মাতামহ-বংশের সুপ্রচুর ধনসম্পত্তির এবং কাউণ্ট দি টলেণ্ডাল পদবীর অধিকারী হইয়াছিলেন।

লালী সাহসী, বীর, সুদক্ষ যোদ্ধা হইলেও এক মহাদোষে তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছিল। তিনি নিতান্ত দাম্ভিক ও সন্দিগ্ধপ্রকৃতি ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল এদেশে সমাগত কর্ম্মচারীগণ সকলেই অসাধু ও অবৈধ উপায়ে অর্থার্জ্জনে তৎপর। অধস্তন ব্যক্তিবৃন্দের প্রতি তাঁহার সহানুভূতির বড় অভাব ছিল; তিনি সকলকার সহিত অত্যন্ত কঠোর আচরণ করিতেন। শীঘ্রই তিনি সকলকার ঘোর অপ্রিয় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া অফিসর ও সৈনিকগণ অনেক সময় নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইত; দলে দলে সৈনিকগণ স্বেচ্ছায় শত্রু হস্তে আত্মসমর্পণ করিত। এ দেশের রীতিনীতি আচারপদ্ধতি সম্বন্ধে লালীর কোন জ্ঞান ছিল না। সে বিষয়ে দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের অধিবাসী ডুপ্লের তাঁহার অপেক্ষা অনেক বিষয়ে সুবিধা ছিল। দ্রাবিড় দেশের অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ লালীর অসহ্য বোধ হইত। এ সকল বিষয়ে দেশীয়গণের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া তিনি চলিতে পারিতেন না। ফলে ফরাসীরা ভারতবর্ষীয়গণের, বিশেষতঃ হিন্দুদিগের, সহানুভূতি শীঘ্রই হারাইল।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলমাসে লালী পন্দিচেরীতে আসিয়া পঁহুছিলেন এবং কালবিলম্বব্যতিরেকে ইংরাজদিগকে বিতাড়িত করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় লালী সসৈন্যে এদেশে আসিতেছেন একথা দীর্ঘ অষ্টাদশ মাস পূর্ব্ব হইতে জানা থাকিলেও পন্দিচেরীর কর্ত্তৃপক্ষ এযাবৎ যুদ্ধের কোন আবশ্যকীয় আয়োজন করিয়া রাখেন নাই। লালী দেখিলেন রাজকোষে অর্থ নাই, সৈন্যদলের রসদ নাই, কামান ও মালপত্র বহনোপযোগী ভারবাহী পশু নাই। ইহাতেও লালী দমিলেন না; তিনি পন্দিচেরীর দেশীয় অধিবাসীদিগকে বেগার ধরিয়া কামান টানিতে বাধ্য করিলেন। ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্র, আদি-দ্রাবিড় ও মুসলমানের সহিত ঐ ধরণের হীন কর্ম্ম করিতে বা অশুচি দ্রব্য স্পর্শ করিতে বাধ্য হওয়া যে কত বড় অপমানজনক ব্যাপার সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণা ছিল না। যাহা হউক এইরূপে তিনি ইংরাজদিগের ফোর্ট সেণ্ট ডেভিড অধিকার করিলেন। উক্ত দুর্গের পতনের পর ইংরাজরা বুঝিলেন যে অতঃপর লালী মান্দ্রাজ অবরোধে প্রবৃত্ত হইবেন। লালীরও তাহাই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আবশ্যকমত অর্থাভাবে তাঁহাকে নিতান্ত বিব্রত হইতে হইয়াছিল। পন্দিচেরীর গভর্ণর তাঁহাকে স্পষ্টই জানাইলেন যে তাঁহাদের নিকট কিছুই নাই। লালী ফ্রান্স হইতে যে অর্থ আনিয়াছিলেন তাহা ইতোমধ্যেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। এদেশে কোথাও হইতে অর্থলাভের সম্ভাবনা ছিল না। তাঞ্জোরাধিপতি প্রতাপসিংহ ইতিপূর্ব্বে চাঁদসাহেবকে ৫৮ লক্ষ টাকার যে হুণ্ডি দিয়েছিলেন তাহা ফরাসীদের নিকট ছিল। তদ্ভিন্ন ফোর্ট সেণ্ট ডেভিড অধিকারকালে তথায় বন্দীভাবে রক্ষিত পূর্ব্বোক্ত সাহুজী লালীর হস্তে পড়িয়া ছিল। লালী প্রতাপসিংহকে জানাইলেন যে শীঘ্র তিনি হুণ্ডি পরিশোধ না করিলে তিনি তাঁহার স্থলে সাহুজীকে

সিংহাসনে বসাইবেন।" কিন্তু প্রতাপসিংহ তাঁহার আদেশ পালনে কোন আগ্রহ দেখাইলেন না। তখন লালী সসৈন্যে তাঞ্জোর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহার তাঞ্জোর অধিকারের চেষ্টা সফল হইল না। অতঃপর লালী ইতস্ততঃ দুই একটি দুর্গ অধিকার, কোন কোন প্রদেশ হইতে রাজস্ব-সংগ্রহ, দুই একটি হিন্দু দেবমন্দির দখল, নিজ তহবিল হইতে অর্থদান ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে কিছু অর্থসংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়া মান্দ্রাজ অবরোধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। ফরাসী সেনাদলে এই সময় অর্থ ও রসদের অভাবে সৈন্যগণ দীর্ঘকাল বেতন ও উপযুক্ত খাদ্য না পাইয়া বিষম অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। কথিত আছে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের জন্য লালী সমরপরিষদের আহ্বান করিলে কোন কোন সেনানী স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, পন্দিচেরীতে অর্দ্ধাশনে শুখাইয়া মরা অপেক্ষা মান্দ্রাজ অবরোধে শত্রুনিক্ষিপ্ত গোলাগুলিতে প্রাণ দেওয়া অনেক ভাল। এই সকল নানা কারণে লালীর মান্দ্রাজ অবরোধ করিতে ছয় মাসেরও অধিক বিলম্ব হইয়া গেল। সুতরাং ইংরাজরা আত্মরক্ষার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইবার যথেষ্ট অবকাশ পাইয়াছিলেন। তাঁহারা অন্যান্য অপর সকল স্থান হইতে নিজেদের সৈন্য অপসারিত করিয়া মান্দ্রাজ মধ্যে আনয়ন করিলেন এবং ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ দুর্গও অবরোধ সহনোপযোগী করিয়া তুলিলেন। সুধু ত্রিচিনপল্লী ও চিঙ্গলপুটে এক একদল সৈন্য রাখা হইল। প্রথমোক্ত স্থানটী রক্ষা না করিলে সমগ্র দক্ষিণ প্রদেশ হস্তচ্যুত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। অবরোধকারী শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্ভাগ অকস্মাৎ আক্রমণ, তাহাদের রসদাদি লুণ্ঠন ও অধিকৃত জনপদ-মধ্যে অভিযানাদি দ্বারা তাহাদের বিব্রত রাখিবার জন্য দ্বিতীয় স্থানটীতে সৈন্য রাখা হইয়াছিল।

অতঃপর লালী মান্দ্রাজ অভিযানের জন্য বুসীকে নিজাম রাজ্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্য্যটী সমীচীন হয় নাই। বুসী জানাইলেন তিনি হায়দ্রাবাদ পরিত্যাগ করিবামাত্র তথায় ফরাসী আধিপত্য চিরতরে বিনষ্ট হইবে। কিন্তু লালী কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না। বুসীর প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদে দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্র ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। আনন্দরাজ এই সুযোগে বুসীকৃত তাঁহার পিতৃনিন্দার প্রতিশোধ লইবেন স্থির করিলেন। পলাশীর যুদ্ধের ফলে তখন বঙ্গদেশের আধিপত্য ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছিল। আনন্দরাজ কলিকাতায় ক্লাইভের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে যথা কালে তাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য পাইলে তিনি উত্তর-সরকার হইতে ফরাসীদের বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইবেন (আগষ্ট ১৭৫৮)। বঙ্গদেশ হইতে ঐ প্রদেশে অভিযান পাঠাইলে মান্দ্রাজ অবরোধোদ্যত লালী তাঁহার সেনাদলের কতকাংশ তথায় প্রেরণ করিতে বাধ্য হইবেন এবং তাহা হইলে অবরুদ্ধ ইংরাজগণের উপর চাপ কতকটা কম হইবে একথা বুঝিয়া ক্লাইভ তাঁহার কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্যের মতের বিরুদ্ধে বিজয়নগরাধিপতির প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত কর্ণেল ফোর্ডকে একদল সৈন্যসহ তাঁহার সাহায্যে পাঠাইয়া দিলেন। ইংরাজদের আগমনের পূর্ব্বেই আনন্দরাজ ফরাসীদের নিকট হইতে বিজাগাপত্তন অধিকার করিয়া-ছিলেন। ফোর্ড আসিয়া পৌছিলে তিনি উহা তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন (২০।১০।১৭৫৮)। বিজাগাপত্তন পূর্ব্বে ইংরাজদেরই ছিল, পূর্ব্ব বৎসর বুসী উহা দখল করিয়াছিলেন। অনন্তর উভয়ে রাজমহেন্দ্রি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উক্ত স্থান হইতে ৪০ মাইল দূরে কণ্ডোর নামক স্থানে ফরাসী সেনাপতি মার্কুইস দি কঁফ্লাঁ (Conflans) তাঁহাদের বাধা দিবার জন্য সুরক্ষিতভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। চারিদিন ধরিয়া উভয় পক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া রহিল। পঞ্চমদিনে (৭।১২।১৭৫৮) তুমুল যুদ্ধের পর ফরাসীরা পরাজিত হইয়া মসলিপত্তন অভিমুখে পলায়ন করিল। যুদ্ধের পর আনন্দরাজের সহিত মনোমালিন্যের সৃষ্টি হওয়ায় ফোর্ডের পলাতকগণের অনুসরণে বিলম্ব হইয়াছিল। ৩রা মার্চ্চ তারিখে তিনি অগ্রসর হইয়া আসিয়া মসলিপত্তন অবরোধে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রায় এই সময়েই লালীর মান্দ্রাজ অধিকারের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। তিনি নগর অধিকার করিলেও দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না। ইংরাজরা মহাবীরত্বের সহিত আত্মরক্ষা

করিতে লাগিলেন। নয় সপ্তাহ পরে এডমিরাল সার জর্জ্জ পোকক আসিয়া দেখা দিলেন। তখন আর জয়াশা নাই দেখিয়া লালী অবরোধ উঠাইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন ( ১৭।২।১৭৫৯ )।

তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুনয়সত্ত্বেও বুসী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়াতে নিজাম ফরাসীদিগের প্রতি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। কঁফ্লাঁ তাঁহাকে সাহায্যার্থে আহ্বান করিলেও মিত্রগণের জন্য ইংরাজদের সহিত সমরে লিপ্ত হইতে তাঁহার কোন ইচ্ছা বা সাহস ছিল না। যাহারা বিজয়লাভ করিবে তিনি তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিবেন স্থির করিয়া সালাবৎজঙ্গ এ যাবৎ উদাসীন দর্শকবৎ নির্লিপ্ত ছিলেন। এমন সময় কঁফ্লাঁ তাহাকে জানাইলেন যে ফরাসী নৌবহর সৈন্য লইয়া আসিতেছে। ইহাতে নিজামের কতকটা সাহস হইল। ইংরাজেরা যে সময় মসলিপত্তন অবরোধ করেন প্রায় সেই সময়েই সালাবৎজঙ্গ অনুজ বসালৎ জঙ্গের সহিত ৩৫০০০ সৈন্য লইয়া বেজওয়াড়া পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। কিন্তু কাউণ্ট আশে মসলিপত্তন সমীপে আসিয়া দেখা দিলেও বিপক্ষের রণপোতমালার আক্রমণাশঙ্কায় সৈন্য নামাইতে সাহস না করিয়াই ফিরিয়া গেলেন। ইহাতে ভীত নিজাম অগ্রগমনে নিবৃত্ত হইলেন। কঁফ্লাঁর রক্ষার আর কোন আশা রহিল না, তিনি শত্রু-করে আত্মসমর্পণে বাধ্য হইলেন (৮।৪।১৭৫৯)। কণ্ডোর ও মসলিপত্তনের পরাজয় ফরাসীদের পক্ষে বিষম ক্ষতিকারক হইয়াছিল। ইংরাজদিগের উত্তরসরকারে প্রবেশ করার জন্য লালীকে মান্দ্রাজ অবরোধে ব্যাপৃত নিজ বাহিনী হইতে সৈন্যদল বিচ্যুত করিয়া পাঠাইতে হইয়াছিল। মান্দ্রাজ রক্ষার তাহাই অন্যতম কারণ। মসলিপত্তনের পতনের ফলে উক্ত স্থানের উভয়পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। আর সরকার প্রদেশ রক্ষা করিবার চেষ্টা বৃথা বুঝিয়া ফরাসীরা তাহার উত্তরে অবস্থিত গঞ্জাম প্রভৃতি তাহাদের অধিকৃত স্থানসমূহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সালাবৎজঙ্গও এবার ফরাসীদের পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজদিগের পক্ষাবলম্বন করিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিজাম আলি ইতিপূর্ব্বে ইংরাজদিগের প্ররোচনায় তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে রাজধানীতে বিদ্রোহ-ধ্বজা উত্তোলন করিয়াছিলেন। ফরাসীদিগের নিকট হইতে আর সাহায্য প্রাপ্তির আশা ছিল না। নিজাম আলির বিদ্রোহদমন জন্য সালাবৎজঙ্গ ইংরাজদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। এই সন্ধির ফলে (১৪।৫।১৭৫৯) তিনি উত্তর-সরকার প্রদেশ ইনামরূপে সনন্দ সহ ইংরাজদিগকে প্রদান করিলেন এবং ফরাসীদিগের সহিত ভবিষ্যতে কোন সম্বন্ধ রাখিবেন না প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইহার পরিবর্ত্তে তিনি কিছুই, এমন কি আপদকালে সাহায্য প্রাপ্তির আভাস পর্য্যন্ত, তাঁহাদের নিকট হইতে পান নাই। হায়দ্রাবাদে ফিরিয়া আসিয়া সালাবৎজঙ্গ দেখিলেন যে অতঃপর বর্দ্ধিত-প্রভাব নিজাম আলিকে আর না মানিয়া উপায় নাই। বসালৎজঙ্গ এ যাবৎ তাঁহার দেওয়ান ছিলেন। অতঃপর নিজাম তাঁহাকে নিজ জায়গীর মধ্যে নির্ব্বাসিত করিয়া উক্তপদ নিজাম আলিকে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। শীঘ্রই সকল প্রকৃত ক্ষমতা নিজাম আলির হস্তগত হইল। দরবারে সকল প্রভাব-প্রতিপত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া এবং অদূর ভবিষ্যতে বুসীর সাহায্যচ্যুত আত্মরক্ষায় অসমর্থ সালাবৎজঙ্গকে বিতাড়িত করিয়া স্বয়ং সুবেদার পদে আরোহণ করা নিজাম আলির পক্ষে কিছুমাত্র আয়াসসাধ্য কার্য্য হইবে না বুঝিতে পারিয়া সময় থাকিতে বসালৎজঙ্গ ফরাসীদের সাহায্যে একটী স্বাধীন রাজ্য-স্থাপনে যত্নবান হইলেন। গুণ্টুর এবং আদোনি প্রদেশ তাঁহার জায়গীর ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী কড়াপা জেলা ও উত্তরসরকার প্রদেশ অধিকারে তিনি সচেষ্ট হইলেন। বসালৎজঙ্গ কড়াপায় প্রবেশ করিলে বুসী আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ইহাতে নিজাম আলির বড় ভয় হইল। বুসী আবার সালাবৎজঙ্গের নিকট যদি ফিরিয়া আসেন তবে তাঁহার মনের আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে বুঝিয়া তিনি বসালৎজঙ্গকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন এবং তাঁহাকে জানাইলেন নিজ জায়গীরমধ্যে তিনি ফিরিয়া গেলে উহার আয়তন যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত করা হইবে। বসালৎজঙ্গের আকাঙ্ক্ষা সফল হয় নাই। ইংরাজেরা পন্দিচেরী আক্রমণে অগ্রসর হওয়ায় লালী বুসীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পরে উত্তর-সরকার ও কর্ণাটক প্রদেশে ইংরাজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তথায় রাজ্যস্থাপন তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিজাম আলি দক্ষিণ-কড়াপা প্রদেশ তাঁহাকে জীবদ্দশায় নিজ জায়গীরের সহিত ভোগ করিতে দিয়াছিলেন। নিজাম আলির রাজ্যলাভের পর* হায়দ্রাবাদের ব্যাপারে বসালৎজঙ্গের আর কোন সংস্রব ছিল না। নিজ জায়গীরে একদল ফরাসী সেনা সাহায্যে অর্দ্ধ-স্বাধীনভাবে দীর্ঘকাল রাজ্যসুখ উপভোগ করিয়া ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। আদোনি সহরে তাঁহার সমাধিসৌধ অবস্থিত আছে। তাঁহার কর্ম্মাধীন ফরাসীসৈনিকগণের কথা স্বতন্ত্র এক প্রবন্ধে বলা যাইবে। ( ক্রমশঃ )

* ১৮ই জুলাই ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে সালাবৎজঙ্গকে কারারুদ্ধ করিয়া নিজাম আলি নিজে নিজাম পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

# শ্যামলা

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

১

অনেক পেয়ে ভুলব তোমায়, তুমি নও তেমন
তোমার আছে একটি মায়া, আমারো এক মন।
খুঁজলে দেখো এই নিখিলে
দেখতে ভালো অনেক মিলে
না দেখিতেও পায় যারে মন, তুমি আমার সেই,
কেমন তুমি, কথা দিয়ে বলার কিছু নেই॥

২

কুহকী ঐ কালো আঁখি ভাবতে ভালো লাগে,—
আপন মনে মগ্ন সে কোন্ গভীর অনুরাগে!
কালো তোমায় বলে লোকে
—দেখুক তারা আমার চোখে,
কালো কেশের রাশে কেমন খোঁপাটি জম্‌কালো,
আঁখির তারায় রাখলে তোমায় মানায় বুঝি ভালো॥

৩

বাহিরের ঐ কোমল কালো শ্যামল আবরণে
চাও কি অমল হিয়াখানি রাখ্‌তে সংগোপনে?
আড়াল ক'রে বুকের মণি
পারে কি গো রাখতে খনি,
বুঝি,—মনে গোপন আছে আভিজাতিক পণ,—
সবাই তোমায় দেখ্‌বে,—কেবল বুঝবে দু-একজন॥

৪

ঈষৎ বাঁকা ভাঁজ পড়েছে সমুখ মেখলায়
টুটিতে চায় তরুণ কটি চলিতে পায় পায়।
মনে মনে সন্দেহ নেই
রূপটি খোলে ঐ ধরণেই—
ললাট পারে প'ড়ে আছে একটি মোটা সীঁথি
সাজ কিছু নাই, আছে সাজের অপরূপ এক রীতি॥

৫

সবার চেয়ে কাছের তুমি সব চেয়ে রও দূরে,
দু-চোখ ভ'রে দেখ্‌তে যাব,—মুখখানি যায় ঘুরে'।
পথে পথে আস্‌তে যেতে
কান কি তুমি রাখো পেতে,
ঘন বনের ছায়ায় ঘেরা অতল কালো দীঘি,
(যেন) তীরে তারি মৌনে ফিরো চকিত মায়ামৃগী॥

৬

কবি হোলে ছন্দ গেঁথে নিতেম চলার ছাঁদে
নিতেম হাতের ডোলটি যখন আঁচল ফিরাও কাঁধে।
চিবুকটুকুর চিকণ রেখা
তুলির টানেই যায় যে লেখা,
বাণী আমায় বিমুখ, নচেৎ সুর মিলায়ে সেধে
তোমার মুখের কথা নিতেম বীণার তারে বেঁধে॥

৭

বলব না তো ভেবেছিলেম,—হাসি রইল বাকি,
মনের থেকে বাইরে তারে কেমন ক'রে রাখি!
আধেক ঝলে দশন সারি
অধর কাঁপে সঙ্গে তারি,
চাপা পুলক উছ্‌লে খানিক পড়ে কপোল কূলে
আষাঢ় মেঘে চাঁদের খেলা দেখি সকল ভুলে॥

৮

এমনি লাজে নম্রমুখী, লজ্জাবতী লতা,
মাঝে মাঝে কী ছল ছলো,' কইনি তো সেই কথা!
মুখের পানে চেয়ে সোজা
কেন হাসো যায় না বোঝা,
আমিও যে তোমায় খুঁজি, তাই কি তুমি জানো?
সত্যি তুমি কী দুষ্টু গো,—মন দিয়ে মন টানো॥

৯

অনেক কিছু দেয় অনেকে সব কি সবার তরে!
সকল সময় সকল কিছুই মনেও নাহি ধরে!
আমি যখন যেমনটি চাই
তোমায় তখন লাগে যে তাই,
সবার চেয়ে তোমারি দান একটি গুণে ভারী,
—তুমি আমায় যা দিয়েছ দেয়নি কোনো নারী।

১০

তাই তো ভাবি,—তুমি আমার আর-জনমের প্রিয়া,
এই যা এলে, এলে কেবল ছাপ্‌টুকু তার নিয়া।
রূপের চেয়ে রসে বড়ো
সেই তুমি যে কেমনতরো
স্পষ্ট ক'রে আরো কি চাও পূর্ণ পরিচয়?—
হৃদয় দিয়ে দেখো' হৃদয়,—বুঝ্‌বে সমুদয়॥

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

# অনুতাপে দহে

শ্রীমীনা দাশগুপ্ত

লোকে যখন অশ্রদ্ধা করিয়া বলে পাগল—তখন আমার স্মরণে জাগে এক পাগলের কথা,—কল্পনায় অবিশ্বাস্য—শ্রবণে অতিরঞ্জিত এমনি বেদনা-সুন্দর পাগল সে।

কার্য্যোপলক্ষে সে সময় আরা যাইতে হইয়াছিল। পাটনা হইতে নিকটে অনতিক্ষুদ্র সহর। বেহার অঞ্চল যেরূপ হয় এদেশেও সেইরূপ, যেমন ধূলি তেমনি বুলি—শান্ত শ্রী বাংলার সঙ্গে কণামাত্র মিল নাই। তবু শোণ নদীর প্রসাদাৎ জায়গাটী বেহারের অন্যান্য স্থান হইতে কিঞ্চিৎ সুজলা সুফলা।

এই তো দেশ, এখানে আমাদের বাসের জন্য যে বাড়ি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহার পাশেই সুরম্য অট্টালিকাবাসী প্রাচীন ধনী পরিবারের মধ্যে এক পাগলের অবস্থিতি শুনিয়া অভয় পাওয়া সত্ত্বেও মনে হইল, এ যে সোনায় সোহাগা,—আত্মীয়স্বজন ছেড়ে কিনা পাগলের প্রতিবেশী। কিন্তু পাগল সত্যই নিরুপদ্রব, এমন কি আমরা তাহার অস্তিত্বও জানিতে পারিতাম না, যদি না গভীর নিশীথে কাহারো আকুল ক্রন্দনে স্বেদাক্ত কলেবরে জাগিয়া উঠিতাম। বুকফাটা সেই আর্ত্তনাদে সেই মুহূর্ত্তে শুধু এবাড়ি ছাড়িবার বাসনা মনে জাগিত। রাত্রিশেষে সে আকুল কণ্ঠ যখন আপনার হৃদয়ের ধনকে খুঁজিয়া অবশেষে ক্লান্ত হইয়া মিলাইয়া আসিত, তখন কোন ফাঁকে নিদ্রা আবার চোখ জুড়িয়া বসিত; তার পর ফুলগন্ধসমাকুল প্রত্যূষের স্নিগ্ধ-মধুর বায়ুতে পাগলের সে ক্রন্দন একটা দুঃস্বপ্নের স্মৃতির মতই মনে পড়িত। ক্রমে সে কান্নায়ও অভ্যস্ত হইলাম; অবসর সময়ে পাগলের দর্শনাভিলাষেও ঘুরিয়াছি তখন। আর কি বা করা যায় এখানে দর্শনীয় তো মোটে দেড়খানা। সিপাহীবিদ্রোহের স্মৃতি-জড়িত বিপন্ন ইংরেজদের আশ্রয়-স্থল বলিয়া বিখ্যাত আরা হাউস একদিন দেখা হইল। বিদ্রোহীদল পরিবেষ্টিত ক্ষুধাতৃষ্ণা-কাতর বহু লোক এই সঙ্কীর্ণ স্থানে প্রাণভয়ে দিনের পর দিন কাটাইয়াছে। জলাভাবে ক্লিষ্টতার চিহ্ন-স্বরূপ সঙ্গীন দিয়া খোঁড়া একটী কূপ তাহাদের ভয়াবহ যন্ত্রণার সাক্ষ্য দিতে বহুকাল জাগিয়াছিল, কিন্তু সর্পসঙ্কুল হওয়ায় পরে তাহা বন্ধ করা হয়।

ইহা ভিন্ন 'লক' বা শোণ নদীকে বাঁধ দিয়া যে স্থান হইতে নহর কাটিয়া সমস্ত সহরকে জলময় করা হইয়াছে, বাঁধ খোলা অবস্থায় যাহা ছোটখাটো জলপ্রপাত বলিয়া মনে হয় সেখানে বেড়াইতে যাইতাম কখনো। কিন্তু আমার সারাদিনের কৌতূহল জুড়িয়া জাগিত ঐ পাগল, রাত্রিতে যে এত অস্থির অশান্ত প্রভাতে তাহার সাড়াই পাওয়া যায় না—কাষ ফেলিয়া ছুটিয়া যাই বাতায়নে, তাহাকেই দেখিতে। পাগলের দেখা পাই বা না পাই প্রথমেই চোখে পড়ে প্রাচীরবিলম্বিত এক সুদর্শন কিশোরের নানা আকারের তৈলচিত্র। সে ছবি এতই স্পষ্ট মনে হয় চিত্রের মধ্য হইতে হাস্য-প্রতিভাত উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতে আমার দিকেই চাহিয়া আছে। প্রশস্ত কক্ষ, রুদ্ধদ্বার হইলেও চারিদিকের বাতায়ন পথে দিনের আলোর অবাধগতি। সারাদিন তাই চোখে পড়ে এক ম্লান মূর্ত্তি চিত্রের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু সে ছায়া এতই চঞ্চল একটু ক্ষণ দেখিতে না দেখিতে মুহূর্ত্তে অন্যত্র সরিয়া দাঁড়ায়, সারাদিনে তাহাকে স্থিরভাবে মাত্র একটিবার দেখিতে পাই,—সে বেলা আটটায়। রুদ্ধ গৃহের দ্বার তখন খোলে। শ্বেতশ্মশ্রুসমাচ্ছন্ন সৌম্যকান্তি এক বৃদ্ধ তখন কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়ান, প্রতি পদক্ষেপও তাঁহার আভিজাত্যের পরিচায়ক, শুভ্র কেশে বেশে রূপ যেন আরো মহিমামণ্ডিত কিন্তু সমস্ত মিলিয়াও তাহার বিষাদ-গম্ভীর মুখের ম্লান ছায়া লুকাইতে পারেনা। অপরিবর্ত্তনীয়

মুখচ্ছবি লইয়া প্রত্যহ এই সময়ে তিনি স্বহস্তে পাগলের পরিচর্য্যা করিয়া যান। ভৃত্যেরা নানাবিধ দ্রব্য-সম্ভার লইয়া নীরবে কক্ষমধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় তখন। প্রসাধন শেষে পাগলীকে আহার করাইতে কি সস্নেহ চেষ্টা! আড়াল হইতে দেখিয়া মনে হয় এরূপ স্নেহ-সদয় স্বামী হইলে পাগল হইয়াও সুখ। কতকাল হইতে—হয়ত বা যুগাতীত হইতে চলিল—সেবাপরায়ণ স্বামীর ক্লান্তি নাই, বিরক্তি নাই। পাগলীও ইহার হস্তে আপনাকে নিঃশব্দ নির্ভরে ছাড়িয়া দেয়। বিকৃত মস্তিষ্কে স্বামীকে চিনিতে পারে কি? কিম্বা প্রাণস্পর্শী স্নেহে পাগলেরও হৃদয় ছুঁইয়া যায়? শান্ত প্রভাত তাই পাগলের শান্তিতে কাটে—তারপর অপরাহ্ণ হইতেই সে আবার অস্থির হইয়া ওঠে। রজনীর ভয়াবহ স্মৃতি বুঝি তখন হইতে তাহার মনে ছায়া বিস্তার করিতে থাকে। অনিবার্য্য সেই অশান্ত চঞ্চলতায় তখন কেহ আর তাহাকে দেখিতে আসে না। একমাত্র আমি সে সময় তাহার দর্শক! এইরূপে একদিন চোখের পরিচয় ঘটিয়া গেল পাগলীর সঙ্গে। সেদিন আমার তিন বছরের কন্যাসহ জানালায় দাঁড়াইয়াছিলাম ক্ষণ পরে দেখি পাগলীও আসিয়া তাহার বাতায়নে দাঁড়াইয়াছে। এত কাছে আর কখনো তাহাকে দেখি নাই। দুই বাড়ির মাঝখানে অল্পই ব্যবধান। পাগলের রূপ যে দেখিবার মত হয় সেদিন দেখিলাম। যৌবনের উচ্ছল রূপ-তরঙ্গ সে যদি বা পার হইয়া থাকে তবু কোন নিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় চিত্রিত সুন্দর মূর্ত্তি। বস্ত্রহীন অনাবৃত দেহ, না হইলে কে বলিত পাগল! তৈলসিক্ত কেশ পরিপাটি করিয়া টানিয়া বাঁধা—পাগলের রুক্ষচুলের পরিচয় তাহাতে নাই। সিঁথিতে সিঁদুরের রেখাটি পর্য্যন্ত সযত্নে আঁকিতে ভুল হয় নাই। সম্ভ্রান্ত পরিবারের আদরিনী গৃহিণী—স্বামী তাহার নিদর্শন প্রসাধনেই রাখিতে চান। কেবল চোখের নীচের কালি মুছিয়া দিতেই বুঝি তাঁহার শক্তিতে কুলায় না—সে কালি এত নিবিড় করিয়া ঢালা যে কাজল বলিয়া ভুল করিবার আগেই মনে পড়ে নিদ্রাবিহীন নিশীথের ভীতিদায়ক অস্থিরতার পরিণাম। অপলক নেত্রে তাহাকে দেখিতেছিলাম। হঠাৎ আমার মেয়ে হাসি হাসি মুখে বলিয়া, উঠিল "—মাইজী কাপড়া না পিন্‌হলা?"—এতটুকু মেয়ে, মানুষের আচরণ সম্বন্ধে এ বয়সেই তাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে; পাগলীর কটি-বিলম্বিত মোটা ঘাগরা তাহার নজরে পড়িতেছে না, জানালার উপরে তাহার অনাবৃত বক্ষদেশ দেখিয়া তার আপন ভাষায় (যে ভাষা সে ঝি চাকরের কাছে শিখিয়াছে) বলিল, মা কাপড় পরেন নাই। মেয়ের হাসি দেখিয়া আমিও হাসিয়াছিলাম (শুনিয়াছি পাগলীর পরিধেয় বস্ত্রের উপর যত আক্রোশ; সম্ভব হইলে অত মোটা ঘাগরা ছিঁড়িতে তাহার বিলম্ব হয় না) বোধহয় অমনি পাগল চকিতে সরিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে শুনিলাম:

'যদি সরম লাগে চোখে চাহিব না—'

এক লাইন মাত্র, কিন্তু কি সুকণ্ঠ—অতীতের গীতচর্চ্চার পরিচয় সুমিষ্ট সুরের রেশ—শ্রবণে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগে।

ইহার পরে পাগলের মুখে আরো কত গান শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার আশায় উন্মুখ হইয়া ছুটিয়া গিয়াছি, অমনি গান থামিয়া গিয়াছে। মনে পড়ে একদিন জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সন্ধ্যায় পাগলের মুখে—চাঁদ আজ তুই যাস্‌নিরে—শুনিয়া আমার চোখে জল আসিয়াছিল। এমন করুণ ভাবময় গান পাগলের কণ্ঠে—আহা কেন যে পাগল রইল!

আবার অন্যের গানেও পাগল চঞ্চল হইয়া উঠিত; একদিন কাজী নজরুলের একটা গানেই বোধ হয় সুর-সংযোগের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই পাগলীর কাতর অনুনয় শুনিলাম, "গাওনা সে গানটা সেই যে আগুন জ্বালা—আগুন জ্বালা।" মনে পড়িয়া গেল এমনি একদিন সন্ধ্যায় দীপ জ্বালিতে দেখিয়া পাগলী এইরূপ কাতর-কণ্ঠে দেশলাই চাহিয়াছিল। সে সময় আমার চাকর বলিয়াছিল, "মাইজী, ওর ছেলে কিনা আগুনে পুড়ে মারা গেছে তাই দেশলাই চাইছে।" সে দিনের কাতরতায় আজিও পাগলী জানালায় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আমার হঠাৎ যেন মতিচ্ছন্ন হইল তখন, তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম—আর সেই মুহূর্ত্ত হইতে পাগলের কিছুক্ষণ উন্মত্ত দাপাদাপির পর সেদিন অপরাহ্ণেই রাত্রির কান্না সুরু হইল। অজানিতে তাহার বেদনার স্থানে আঘাত করিয়াছি—অনুশোচনায় আমিও ক্লিষ্ট হইয়াছিলাম সেদিন।

পাগলের প্রতি সহানুভূতি কখন আকর্ষণে পরিণত হইয়াছিল। তাহার তুচ্ছতম সংবাদ জানিতেও উৎসুক হইতাম।

পশ্চিমের গরমে গৃহবাসী নরনারীকেও বৈশাখের দাবদগ্ধা ধরণীর ন্যায় সন্ধ্যার স্নিগ্ধ পরশের আশায় ঘর ছাড়িতে হয়। সেই অপরাহ্নে আমাদের প্রতিবেশী বৃদ্ধ তাঁর বাড়ির সম্মুখের উদ্যানে পায়চারী করিতে নামিয়া আসিতেন। যখন হাস্নুহানার দল আপনার সৌরভে পথচারী লোককে বিহ্বল করার আয়োজনে স্ফোটনোন্মুখ, গুচ্ছাবনত রক্তকরবীরঞ্জিত শাখা কৃষ্ণচূড়ার রক্ত রং-এ পরাজয় মানিয়া নুইয়া পড়িতে চায়—সেই সময়ে বৃদ্ধ বাহিরে আসিয়া বারেক থমকিয়া দাঁড়ান। হৃদয়-ভার বহনে ক্লান্ত মানুষ দিনান্তে একবার বুঝি নিজেকে মুক্তি দিতে ধরণীর স্নেহ-শ্যামল স্পর্শের জন্য লালায়িত হইয়া ওঠে। বৃদ্ধের এই নিঃসঙ্গ ভ্রমণে সঙ্গী হইতে সাধ হইত। ক্রমে আলাপও হইয়া গেল। মাঝে মাঝে তখন স্বামির সহিত আমিও জুটিতাম সেখানে। সম্পর্ক পাতাইতেও আমার বিলম্ব হয় নাই। মার মুখে শোনা আমার দাদামহাশয়ের যে রূপ কল্পনায় আঁকিয়াছিলাম ইঁহাকে দেখিয়া আমার সে ছবি জাগ্রত হইয়াছিল তাই বলিয়াছিলাম, "আপনি আমার দাদু—কেমন হলেন ত?" বৃদ্ধ সহাস্যে স্বীকার করিয়াছিলেন। তারপর দুরন্ত আবদারে কত যে তাঁহাকে বিরক্ত করিয়াছি কিন্তু অন্তর-নিহিত কুণ্ঠায় যে কথা জানিতে চাই তাহা কখনো জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। অবশেষে একদিন সুযোগ হইল, সেদিন তিনি স্ত্রীর অশান্তপনা বৃদ্ধির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছিলেন আমি বলিলাম, "ওঁর মন খুব কোমল, না দাদু? নইলে পুত্রশোক ত কত লোকের—।"

দাদু বাধা দিয়া বলিলেন, "না না তুমি জানোনা—শোক সহ্য করা যায়—যদি অনুতাপের হৃদয়-ছেঁচা রক্ত তার সঙ্গে না মেশে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "বলুন না দাদু আপনাদের ছেলে কি করে গেল।" বৃদ্ধ ক্ষণকাল কি ভাবিয়া বলিলেন, "এস বসা যাক—তার পর সে দুঃখের কাহিনী তোমাদের শোনাই—তার ছবি তোমরা দেখেছ ত? কত আরাধনার পর সে এ বাড়িতে এল। যার কামনা আমার বাবা কাকা শেষ মুহূর্ত্তেও করে গেছেন, আমার মাও যার আকাঙ্ক্ষায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন সে ঐ নীলমণি। ওর জন্মের পূর্ব্বে,—বংশ-লোপের অপরাধ শ্বশুরকুল ক্ষমা করবেন না—অবিশ্বাস্ত ভাগ্যের প্রতি আশঙ্কায় আমার স্ত্রীর বহু রজনী বিনিদ্র কেটে যেত। সকলের কামনা পূর্ণ করে সে যখন এলো বাড়িতে তখন উৎসবের ঢেউ বইল। বহু দিন অপেক্ষিত ধনজন সার্থক হয়েছে এতদিনে, দুঃখী ভিখিরির জয়োল্লাসে এইরূপ মনে হোত।

মণি যখন বড় হয়ে উঠল তখন দেখা গেল সকলের কামনার ধন হয়েও সে যেন তার মায়েরই নিজস্ব রত্ন—তার সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে কেউ তাকে স্পর্শ করতেও অধিকারী নয়। এমন কি সে স্নেহাকুল আবেষ্টনীর মাঝে আমি পর্য্যন্ত ঠাঁই পেলাম না। দাসদাসীর সংখ্যা বাড়লেও ছেলেকে নিজের কোল ছাড়া করেননি কখনো। পাঁচ বছরের ছেলেকেও কোলে নিয়ে বেড়াতেন। তাঁর পিত্রালয় থেকে কে বলেছিল, অত বড় ছেলে বয়ে বেড়াস কেন?—এজন্য পিত্রালয় যাওয়া ছেড়ে দিলেন। আমার মা ও নাতির মুখ দেখেই স্বর্গে গিয়েছিলেন, সুতরাং আমার স্ত্রীর কাযে বাধা দিতে কেউ ছিলনা। তাঁর সেবা-নিপুণ হাত শুধু ছেলের কাযেই নিযুক্ত রইল, সুকণ্ঠও কেউ শুনত না, যদি না ঘুম-পাড়ানী গান গাইতে হত। এক কথায় তাঁর জগৎ শুধু পুত্রময় হয়ে উঠেছিল। ক্রমে এলো তার শিক্ষার কাল, সেখানেও কেউ হস্তার্পণ করল না। আমি রইলাম পূর্ব্ববৎ নির্লিপ্ত দর্শক।

মণি যখন তেরো বছরের হ'ল এই সময়ে তার মার মুখে কিসের কালো ছায়া পড়ল। সে মহল থেকে বিতাড়িত আমারও মাঝে মাঝে ডাক পড়তে লাগল আবার। লক্ষ্য করে দেখলাম আমার স্ত্রীর সদা হাস্যমুখ—ছেলের জন্মের পর থেকে যে প্রফুল্লতায় ভাটা পড়েনি সে মুখও বিমর্ষ হয়ে উঠেছে।

মণি তখন বাড়ির সমস্ত বিলিতি জিনিস বর্জ্জনে বদ্ধ-পরিকর। বাড়ির লোক ব্যস্ত হয়ে উঠেছে; আমার স্ত্রী প্রথমে সহাস্যে সব ছেড়ে দিলেন—তারপর হঠাৎ কি কারণে বিদেশী বস্ত্রের আকর্ষণ তার কাছে দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

আমি কিন্তু বিনা আপত্তিতে আমার বিলিতি পোষাকগুলো দিয়ে তার আবদার পূর্ণ করতাম। তার পরিতৃপ্ত হাসি-টুকুর বিনিময়ে পেতাম স্ত্রীর তিরস্কার। একদিন বল্লাম, 'কেন তুমি রাগ কর? বালকের খেয়াল বৈত নয়'।

কিন্তু ক্রমেই জানতে পেলাম মণির কাযগুলো বালকো-চিত গণ্ডী ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মার সান্নিধ্য আর তার কাছে প্রিয় নয়—পাঠাভ্যাস বা খেলার সময় ছাড়াও সে কোথায় যে সময় কাটায়, বিস্মিত বেদনায় আমাকেও স্ত্রীর চিন্তার ভাগ নিতে হল। মার বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখ আর শীর্ণ দেহ দেখেও মণির কার্য্য-ধারার পরিবর্ত্তন হল না দেখে আমার আশঙ্কা নিঃসন্দেহে পরিণত হল—মণি কোথাও নিজেকে উৎসর্গ করেছে। বছর খানেক পড়ে সেবার আমাদের মণিকে নিয়ে দেশভ্রমণের সঙ্কল্পে সমস্ত আয়োজন স্থির; মণি বেঁকে বসল সে দেশভ্রমণে যাবে কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে। তার মার কাকুতি বিফল হ'ল—আমার তিরস্কারেও সে বিচলিত না হয়ে যাওয়ার জন্য বারবার জেদ করতে লাগলো। অনেক তর্কের পর তাকে অনুমতি দিলাম এই সর্ত্তে—যে তার সঙ্গে একটি লোক নিতে হবে। সে রাজি হয়ে মার অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চাইলে। তিনি নির্ব্বাক হয়ে রইলেন। মণি বিদায় নিয়ে যাবার পর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লেন, 'ওকে যেতে দিলে—ওগো ওকে ছেড়ে দিওনা—ওকে মানুষ কর তুমি—।'

মণি যে ফাঁকি দিতেও শিখেছে—টের পেলাম ঘণ্টা কয়েক পরে, আমাদের লোক যখন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ষ্টেষনে গিয়ে ঘণ্টা দুই পরে ফিরে এল। মণির দেখা সে পায়নি। বন্ধুদের রেলপথে ভ্রমণের ইচ্ছা নেই সেজন্য বাড়ি ফিরবার আদেশ দিয়ে মণি কোন অপরিচিত লোকের হাতে সংবাদ পাঠিয়েছে। আমার স্ত্রী দিন দিন অধিকতর বিষাদিনী হয়ে পড়েছিলেন। দিন দুই পরে তার কাছে যেতেই মনে হল, অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ মূর্ত্তি। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইতেই মৃদু কণ্ঠে বল্লেন, 'খোকা এসেছিল, পেছনের বাগানের শেষ প্রান্তে যে বাঁশঝাড় তার মধ্যে নাকি মণিকে তিনি দেখেছেন। কাছে এগিয়ে যেতে সে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।'

বিস্মিত হয়ে বল্লাম, 'তুমি ভুল দেখনিত? সারাদিন তার কথা ভাবছ, সেই মুখই চোখের ভ্রান্তিতে দেখেছ।'

আমার স্ত্রী অধীর কণ্ঠে প্রতিবাদ কর্ল্লেন, 'না না, তাকে ভুল হয়নি আমার তা ছাড়া মালীও তাকে দেখেছে। সে কোথাও যায়নি, শুধু বাড়ি ছেড়ে গিয়েছে। মালী বলে সে আরো দেখেছে দাদা বাবু সন্ধ্যের অন্ধকারে বাগানের ঝোপের আড়ালে ঘুরে বেড়ায়—ভয়ে শুধু একথা জানায়নি আমাদের।'

আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইলাম তবে কি বাড়ি থাকা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে? শুধু মাকে দেখতে সে একটিবার অন্ধকারে লুকিয়ে বাগানে আসে। সে জানে ঐ নির্জ্জন তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন স্থান মার অধিকতর প্রিয়, সন্ধ্যা-বেলা তাঁর সেখানেই কাটে।

মণি ফিরে এলে একথা যখন বলা হ'ল তখন সে চির-দিনের সুমিষ্ট হাসিতেই সব কথা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চাইল। কিন্তু বার বার কে তাকে বিশ্বাস করে, বিশেষ সে সময় স্কুল থেকে তাড়া আসছিল মণির সম্বন্ধে সতর্ক হবার জন্য—ঐটুকু ছেলেকে এঁটে উঠতে পারব না কে তা জানিত।

এ সময়ে আমাদের এক আত্মীয়—গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী—বদলী হয়ে, এখানে আসেন। মণির কার্য্য-কলাপ তাঁর অগোচর রইলো না। তিনি এজন্য যখন আমাদের উপদেশ দিতে লাগলেন তখন আমার স্ত্রী যেন অকূলে কূল পেলেন। একদিন তাঁর সামে মণিকে ডাকা হল। আমার আত্মীয় কত যে প্রশ্ন করলেন বা উপদেশ দিলেন মণি নিরুত্তর হাসি মুখে চিরভ্যস্ত ছলনায় স্থির হয়ে রইল। আমার স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বল্লেন, 'খোকা—এঁর কথা মন দিয়ে শোন, আর সব খুলে বল এঁকে—তুমি যে কি বিপদে তলিয়ে যাচ্ছ বুঝতে পারছ না কি? তোমার পূর্ব্ব-পুরুষের বিশ্বস্ততার সম্মান যে তোমা হতেই যেতে বসেছে।' আমার আত্মীয় সস্নেহে ভাষায় বোঝাতে চাইলেন, অন্যায়ের পথে প্রার্থিত মেলে না—তাছাড়া সে যে তার মার নয়নের মণি—তার লাঞ্ছনায় মা যে মণিহারা হবে।

মণি তেমি মৃদু হাসিতে অটল রইল। সে হাসির

আড়ালে এত আগুন চাপা ছিল সে দিনও মনে হয় নি। ওঃ—বজ্রগর্ভ মেঘ হাসির বিদ্যুৎ দিয়েই ভোলাতে চেয়ে ছিল।"

বৃদ্ধ ক্ষণকাল নীরব হইলেন। বোধ করি মণির সে মুখ মনোমধ্যে একবার দেখিয়া লইলেন। তার পর যেন আত্মস্থ হইয়া আবার ধীরে ধীরে বলিলেন—"এর পর শেষ ঘটনা তোমাদের বলছি। আবার বছর ঘুরে এল, জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড গরমে সেবার পশুপাখীও আপনার কোটর ছাড়তে চায় না। কিন্তু মণির কাযের বিরাম নেই, সেদিন বেলা বারোটায় রৌদ্র-তপ্ত শরীরে কোথায় ঘুরে বাড়ি এসে মণি মায়ের স্নেহ-শীতল কক্ষে আশ্রয় নিলে। তার মাও অভিমানে বিমুখ হয়ে উঠেছিলেন, বিনা প্রয়োজনে বাক্যালাপ করতেন না, কিন্তু সেদিন শ্রম-ক্লিষ্ট ছেলেকে ছুটে আসতে দেখে দূর-দেশ প্রত্যাগত ছেলেকে কাছে পাওয়ার আনন্দে আত্মহারা হয়ে বল্লেন,—'গরমের জন্য মার ঘরে এলি নারে মণি?' মণি সেদিন আগের মত অনর্গল কথায় মাকে তুষ্ট করেছিল, কিন্তু তার মাঝে সে যখন হঠাৎ উঠতে চাইল তখন তার মা বাধা দিয়ে বল্লেন, 'এখুনি ছুটতে পাবিনা। একটু ঠাণ্ডা হয়ে বোস্ দেখিনি—কত দিন আমার হাতে খাস্‌নি।' মণি বল্লে, 'না মা যাচ্ছি না কাপড় জামাগুলো তোলা হয়নি।' তার মা বল্লেন, 'চাকরদের ডাক তোর কায করতে কি কেউ নেই রে?' মণি তার কিশোর ভৃত্যকে ডেকে কাপড়-চোপড় তুলতে আদেশ দিয়ে বল্লে,—'দেখিস যেন পকেট হাতাসনি টাকা পয়সা কিছু নেই।' ভৃত্য বেরিয়ে যেতেই মণির মা বল্লেন, 'খোকা তোর জন্য সরবৎ আনছি,' বলেই বাইরে এসে চাকরকে দাদাবাবুর সরবতের জন্য বাগান থেকে লেবু আনতে পাঠিয়ে নিজে ছেলের ঘরে ঢুকলেন। ইদানীং এই রকম করে মণির কাগজ-পত্রের সন্ধান চলতো। আমার আত্মীয়ের পরামর্শে এবং পরিবর্তে পুত্রের প্রাণ-রক্ষার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আমার স্ত্রী এই পথে চলেছিলেন।

বহুদিন পর সে দিন মার আদরে মণি স্নানাহার করে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। সেই অবসরে তার গোপনীয় কাগজপত্র যে সব তার মা মণির অজ্ঞাতে সংগ্রহ করেছিলেন তা আমার আত্মীয়ের কাছে পৌঁছে গেল।

সেদিন আমাকে কোন কাযে স্থানান্তরে যেতে হয়েছিল।

অপরাহ্নে মণির গভীর ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন স্নেহে শঙ্কায় জননী তার শিয়রে বসে। মণি মার সতর্ক পাহারা দেওয়া নিয়ে পরিহাস কর্ল্লে। তারপর খাবার খেতে খেতে বল্লে,—'বেণী করে দাও মা আর যদি ফিরে না আসি।' অসহ্য উদ্বেগে তার মা তাকে সেদিন যেতে বারণ করলেন। কিন্তু সে কথা অগ্রাহ্য করেই সে চলে গেল। তারপর ফিরে এলো আবার ক্ষণকাল পরেই।

সন্ধ্যার ম্লান আলো অন্ধকারে তখন সারা পৃথিবী অস্পষ্ট হয়েছিল। মণি ছুটে এসে নিজের জিনিসপত্র উল্টে টেনে ছড়িয়ে কি যে খুঁজতে লাগলো, তারপর সেই কিশোর ভৃত্য যে মণির সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসী ও প্রিয় তাকে ডেকে নানা প্রশ্নে ব্যস্ত করে তুললো; শেষটায় মার কাছে এসে বল্লে, 'আমার কাগজ—মা তুমি নিয়েছো?' অপরাধীর কণ্ঠে একটি স্বর ফুটলো না বা চোখের জলে ছেলেকে আটকাতে পারলেন না,. মার মুখের দিকে নির্নিমেষে একবার চেয়ে মণি যেমন এসেছিল তেম্নি ছুটে চলে গেল।

যখন বাড়ি ফিরলাম সন্ধ্যার দীপে তখন প্রতি কক্ষ আলোকিত হয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণ অনুসন্ধানের পর আমার স্ত্রীকে পেলাম মণির কক্ষদ্বারে—আলুলায়িত কুন্তলে বিস্রস্ত বসনে দেয়ালের গায়ে নির্ভর করে বসে আছেন। সন্ধ্যার পরিচ্ছন্ন বেশ আজ তাঁর অঙ্গে নেই। মুদ্রিত দুই চোখ থেকে অবিরল অশ্রু ঝরে পড়ছে। তাঁর মুখে যখন সারা-দিনের ঘটনা শুনলাম তখন আমাকেও কোন নিশ্চিত বিপদের আশঙ্কায় অভিভূত করে ফেলল। 'কেন তাকে যেতে দিলে?'—বলে আমার আত্মীয়ের কাছে ছুটে গেলাম। তিনি কিন্তু অভয় দিয়ে বল্লেন, 'আর ভয় নেই আজ সবাইকে ধরা পড়তে হবে। মণির কাগজের মধ্যে যে একটা জায়গার নক্সা ছিল তাতে করেই আজকের কার্য্যোদ্ধার। কিন্তু মণির কেশাগ্র কেউ ছোঁবে না এ আদেশ বিশেষ করে জানানো হয়েছে।'

আত্মীয়ের কথায় বাড়ি ফিরে এলাম, স্ত্রী তেম্নি পড়ে আছেন। আমি কিসের আশায় সেই বাঁশঝোপের মধ্যে বারবার ঘুরে এলাম রাত্রির অন্ধকারে সে যদি মার কোলে

ফিরে আসে,—কিন্তু মিথ্যা আশা, নিথর নিঃসাড় বাঁশঝাড়ও অকম্পিত পত্রে যেন তাহার আশায় চেয়ে আছে। চারদিকে যত লোক পাঠানো হয়েছিল ক্রমে সবাই ফিরতে লাগ্‌লো,—কিন্তু একটি আশার বাণী কেউ শোনালে না।

পরদিন প্রভাতে আমাদের নীলমণি-হারা গৃহের শূন্যত পূর্ণ করতে সহরের যত লোক আমাদের বাড়ীতে এসে জুটলো। তার মধ্যে পুলিশের অফিসারও ছিলেন। শোনা গেল কাল সন্ধ্যায় যে বিপ্লবীদলকে ধরা হয়েছে তার মধ্যে মণি নেই।

স্ত্রীকে একথা বলা হ'ল না তিনি সেই থেকে জলটুকুও স্পর্শ করেনি। রাত থেকে মূর্চ্ছাও সুরু হয়েছে। চেতনার মুহূর্ত্তে একটিমাত্র প্রশ্ন মুখে, 'খোকা এসেছে রে?'

উদ্বেগাকুল সুকঠিন প্রতীক্ষায় দিনযাপন। কখনো পায়ের শব্দে কখনো পথিকের কোলাহলে মণি এসেছে আশায় চকিত হয়ে উঠেছি। আবার সন্ধ্যা এল, নিঃশব্দ চরণে কেউ বাড়িতে ঢুকলো না—মন ক্রমে স্থির করে তার মঙ্গল প্রার্থনায় সে রাত্রি কাটালাম যদি আর ফিরে নাও আসে সে যেন বেঁচে থাকে—তার পায়ের তলায় যেন কুশাগ্রও না বেঁধে।

আবার তৃতীয় দিনের সন্ধ্যা, আমার স্ত্রী হঠাৎ যেন কিসের আশায় শয্যা ত্যাগ করে বাইরে এসে দাঁড়ালেন একেবারে গেটের বাইরে—পথের গতি যেখানে মুক্ত। মনে হ'ল—কোন অজানার আভাসে তিনি উৎকর্ণ হয়ে উঠেছেন, কিন্তু অস্বাভাবিক স্তব্ধতায় আচ্ছন্ন মুখ। আমিও কথা না বলে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম; বোধ করি মণি এখন আস্‌বে যার মন তা বুঝতে পেরেছে—এমনি আশার গুঞ্জনে আমার বুকের স্পন্দন চঞ্চল হয়ে উঠলো, এমনি সময়ে একদল নিঃশব্দ জনতা আমাদের দিকে এগিয়ে এল! তারপর অতি নিকটে জনতা স্থির হয়ে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল—হ্যাঁ সেই অন্ধকারেও—তারা কার নিস্পন্দ স্থির দেহ খাটিয়ায় বয়ে এনেছে! বাক্যহীন জ্ঞানহারা দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলাম, আমার আত্মীয় স্ত্রীর কাছে নতজানু হয়ে বল্‌ছেন, 'বৌঠাকরুণ শান্ত হয়ে আপনার মণিকে কোলে তুলে নিন্! উঃ তাকে পেলাম—বড় বিলম্বে! এ অবস্থা তো অধমের কল্পনায়ও আসেনি। কতদূর জঙ্গলেই তারা নিয়েছিল! ওঃ আপনার মণিকে বাঁচাতে পারলাম না।' —হ্যাঁ খাটিয়ায় শুয়ে আমাদেরই দুলাল—কী ভীষণ নিশ্চল সে দেহ—আমাদের একমাত্র সন্তান তাই নিঃশব্দ নিরানন্দে বাড়ি এসেছে! আমি জড়ের মত চেয়ে রইলাম, কিন্তু সবিস্ময়ে শুনলাম আমার স্ত্রী বলে উঠলেন, এখানে নয়, 'এখানে নয়, আমার ঘরে নিয়ে চল!—'

সেই শেষ রাত্রি—শেষ উৎকণ্ঠায় যাপন, প্রাণের মৃদু স্পন্দন তখনো ছিল। অচেতন সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ দেহ নিয়ে ডাক্তারদের প্রাণান্তকর চেষ্টা চল্‌ল। শরীরে আর স্পর্শ করার স্থান নেই—উপযুক্ত প্রতিশোধ তারা নিয়েছে বিশ্বাসঘাতকের প্রতি।

আমার স্ত্রী নত হয়ে পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। রাত্রি শেষের দিকে একটু যেন জ্ঞান হ'ল। মাঝে মাঝে দু' একটি কথা সে উচ্চারণ করতে লাগ্‌ল! তার থেকে বোঝা গেল নিজের অপরাধ স্বীকার করে তুষানল প্রায়শ্চিত্তই সে মেনে নিয়েছে। কিন্তু তার মাই কি এর মূল? তবু সে যেন মাকে একটিবার দেখ্‌তে পায়। এই রকম কাতর বাক্য স্ত্রী অবিচলিত হয়ে শুনলেন। কিন্তু ভোরের দিকে ডাক্তারেরা যখন ঘর ছেড়ে চলে গেলেন সেই মুহূর্ত্তে তিনি মণিকে 'বাবা আমার!' বলে নিজের কোলে তুলে নিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন!

তারপর আমার কাযের পালা—দগ্ধ শরীরের জ্বালা দূর করতে বাগানের যত ফুল দিয়ে নিজের হাতে ঢেকে দিলাম তাকে! আমার স্ত্রী কিন্তু সে সব চেয়ে দেখলেন না। তাঁর বহুক্ষণব্যাপী মূর্চ্ছার মধ্যে আমাদের নীলমণিকে চিরবিদায় দিতে হ'ল।"

বৃদ্ধ এইবার দু'হাতে নিজের চোখ চাপিয়া ধরিলেন। তাকে সান্ত্বনা দিতে একটি কথা বলাও আমাদের সম্ভবপর হইল না। তারপর কখন পাগলীর জ্ঞান হইল এবং সে কি লুপ্ত চৈতন্যের জাগরণ? এ প্রশ্ন অমীমাংসিত লইয়াই সেদিন বাড়ি ফিরিলাম!

শ্রীমীনা দাশগুপ্ত

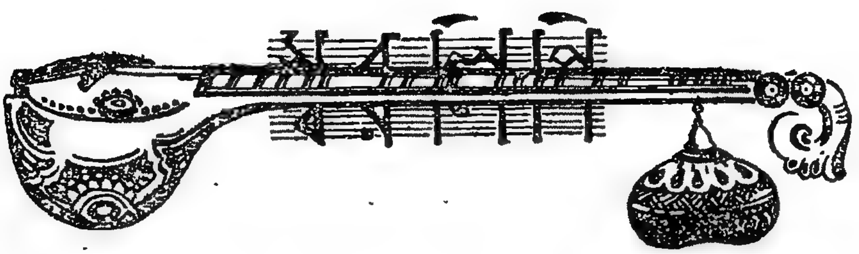

প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায় ফাগুন মাসে
কী উচ্ছ্বাসে
ক্লান্তিবিহীন ফুল-ফোটানোর খেলা।
ক্ষান্তকূজন শান্তবিজন সন্ধ্যা বেলা,
প্রত্যহ সেই ফুল্ল শিরীষ প্রশ্ন শুধায় আমায় দেখি'—
"এসেছে কি ?"
আর বছরেই এমনি দিনেই ফাগুন মাসে কী উচ্ছ্বাসে
নাচের মাতন লাগলো শিরীষ ডালে,
স্বর্গপুরের কোন্ নূপুরের তালে।
প্রত্যহ সেই চঞ্চল প্রাণ শুধিয়েছিলো,—
শুনাও দেখি "আসেনি কি ?"

আবার কখন এমনি দিনেই ফাগুন মাসে কী আশ্বাসে
ডালগুলি তার রইবে শ্রবণ পেতে
অলখ জনের চরণ শব্দে মেতে।
প্রত্যহ তার মর্মর স্বর বলবে আমায় কী বিশ্বাসে
"সেকি আসে ?"
প্রশ্ন জানাই পুষ্প বিভোর ফাগুন মাসে
কী আশ্বাসে,
হায় গো আমার ভাগ্য রাতের তারা
নিমেষ গণন হয়নি কি মোর সারা ?
প্রত্যহ বয় প্রাঙ্গণময় বনের বাতাস এলোমেলো।
"সেকি এলো ?"

## "মহুয়া"

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শান্তিদেব ঘোষ

|| দ্‌া -া ণ্‌া | সা সা সা | রজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | রা জ্ঞা মজ্ঞা | সা সা জ্ঞা | জ্ঞরা জ্ঞা -া |
প্রা ০ ঙ্ গ ণে মো র শি রী ষ শা খা য় ফা গু ন মা সে ০

| জ্ঞমা জ্ঞা -া | ঋা সা -ণ্‌া | {সা -দা দা | দা পা -া | পা র্সা র্সা | ণা পদা পমা |
কী উ ০ চ্ছা সে ০ {ক্লা ন্ তি বি হী ন্ ফু ল্ ফো টা নো র

| মপা মা -া | -া -পা -দা | মপা -া মা | জ্ঞরা জ্ঞা -জ্ঞা | রা -া জ্ঞা | রা জ্ঞা মা |
খে লা ০ ০ ০ ০ ক্ষা ন্ ত কূ জ ন্ শা ন্ ত বি জ ন্

| রজ্ঞা -া জ্ঞা । ঋা সা -া | (সা দা দা । দা পা পা | -া -া -া । -া সা সা) |

স ন্ ধ্যা বে লা ০ ক্লা ন্ তি বি হী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

| র্সা -া র্সা । র্ঋা র্সা ণা | ণা র্সা র্সণা । ণা ণা ণা | পা ণা ণা । দা দা পা |

অ ০ স্ত হ সে ই ফু ল্ ল শি রী ষ্ এ ০ র গু ধা র

| পা ণধা পমা । মপা মা -া | সা সা রা । জ্ঞা জ্ঞমা -া | -া -া -া । -া -মজ্ঞা -মজ্ঞমা |

আ মা র দে খি ০ এ সে ০ ছে কি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

| জ্ঞরা মজ্ঞা -রজ্ঞা । ঋা সা -া ||

এ সে ০ ছে কি ০

|| দা -দা দা । ণা র্সা র্সা | দা দা না । ণা র্সা র্সা | ণা র্সা র্জ্ঞা । র্ঋা র্সা -া |

আ র্ ব হ বে ই এ ম নি দি নে ই ফা গু ন মা সে ০

| দা দা -া । ণা র্সা -া র্সজ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা । র্রা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্রা র্রা র্জ্ঞা । র্রা র্জ্ঞা -া |

কী উ ০ চ্ছা সে ০ না চে র মা ত ন্ লা গ ল শি রী ষ-

| র্রা র্জ্ঞর্মা -া । -া -া -া | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞর্ঋা । র্ঋা র্সা র্সা | ণা -া র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা |

ডা লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ স্ব র্ গ পু রে র কো ন্ নূ পু রে র

| র্ঋা র্সা -া । -া -া -া | র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্ঋা র্সা র্সা |

তা লে ০ ০ ০ ০ ০ অ ০ স্ত হ সে ই

| র্সা র্ঋা র্সা । র্সা ণা -া | ণা ণর্সা র্সা । ণা ণা দা | মপা পণদা পমা । মপা মা মা |

চ ন্ চ ল প্রা ণ্ গু ঞ্জি রে ছি লো ০ শু না ও দে খি ০

I সা সা -রা । জ্ঞা জ্ঞমা -া I -া -া -া । -া -মজ্ঞমা -মজ্ঞা I
আ সে • নি কি • • • • • • •

I জ্ঞরা মজ্ঞা রজ্ঞা । ঋা সা -া II
আ সে • নি কি •

II র্পর্সা র্সা ণা । ণা ণা ণা I পা ণা ণা । দা দা পমা I মা মা মা । মপা মা -া I
আ মা র্ কু ঞ্ জ ব নি দি নে ই ফা গু ন মা সে •

I রা জ্ঞা -া । রা জ্ঞা -া I { সা জ্ঞা জ্ঞা । রা জ্ঞা জ্ঞা I রা রা জ্ঞা । রা জ্ঞা জ্ঞা I
কি আ • শা সে • { ডা ল্ গু লি তা র র ই বে শ্র ব ণ

I রা জ্ঞা -া । -মা -পা -দা I মপা পা মা । জ্ঞরা জ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞমা মা মা । জ্ঞা ঋা জ্ঞা I
পে তে • • • • অ ল খ অ নে র চ র ণ শ ব্ দে

[ -া -া -া ]
I ঋা সা -া । ( -া ঋা ণা I সা জ্ঞা জ্ঞা । রা জ্ঞা -া I -া -া -া । -া -া সা I) }
সে তে • • • • ডা ল্ গু লি তা • • • • • • র্ }

I র্ণর্সা -র্সা র্সা । ঋ র্সা ণা I ণা -র্সা র্সা । র্সণা ণা পা I পা ণা ণা । দা দা দা I
প্র • ত্য হ তা র্ ম র্ ম র স্ব র ব ল্ বে আ মা র

I পা ণদা পমা । মপা মা -া I সা সা রা । জ্ঞা মা -া I -া -া -া । -া -মজ্ঞমা -মজ্ঞা I
কি বি • শা সে • সে কি • আ সে • • • • • • •

I জ্ঞরা মজ্ঞা রজ্ঞা । ঋা সা -া I -া -া -া । -া -া -া II
সে কি • আ সে • • • • • • •

II দা দা দা । ণা র্সা র্সা I দা -দা দা । ণা র্সা -র্সা I ণা ণা র্জ্ঞা । র্ঋা র্সা -া I
প্র শ্ ন জা না ই পু ষ্ প বি ভো র্ ফা গু ন্ মা সে ০

I দা দা -া । ণা র্সা -া I র্সা -া র্জ্ঞা । র্রা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I র্রা র্রা র্জ্ঞা । র্রা র্জ্ঞা র্রা I
কী আ ০ বা সে ০ হা য় গো আ মা র ভা ০ গ্য রা তে র

I র্জ্ঞর্রা র্জ্ঞর্মা -া । -া -া -া I র্জ্ঞা র্জ্ঞা -র্ঋা । র্ঋা র্সা র্সা I ণা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্ঋা র্জ্ঞা I
তা রা ০ ০ ০ ০ নি মে ষ্ গ ণ ন হ য় নি কি মো র

I র্ঋা র্সা -া । -া -া -া I র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্ঋা র্সা র্সা I র্সা -র্ঋা র্সা । ণা ণা ণা I
সা রা ০ ০ ০ ০ এ ০ ত হ র ষ প্রা ০ ঙ্গ ণ ম য়

I পণা ণা ণা । দা দা -পা I পা ণদা পমা । মপা মা -া I সা সা রা । জ্ঞা জ্ঞা মা I
ব নে র বা তা স্ এ লো ০ মে লো ০ সে কি ০ এ লো ০

I -া -া -া । -া -মজ্ঞমা -মজ্ঞা I জ্ঞরা মজ্ঞা -রজ্ঞা । ঋা সা -া II II
০ ০ ০ ০ ০ ০ সে কি ০ এ লো ০

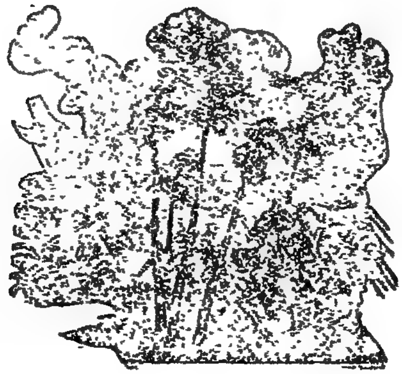

# ক্রোড়াঙ্ক

## শ্রীজ্যোতি সেন

সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরখানি একেবারে অন্ধকার। সেই রাশি রাশি ধোঁয়ার ভিতর বিনয়কে দেখাইতেছে ভূতের মত। চুলগুলি উস্ক খুস্ক, মুখ ভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর চোখ দু'টি অবসাদগ্রস্ত। তার বাঁ হাতে একখানি চিঠি, ডান হাতে সিগারেট আর সমুখে একগাদা হাতে লেখা কাগজ। ফিল্মের জন্য গল্পের 'সিনারিও' লেখা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখিয়া বিনয় চিঠি পড়িতেছিল, পড়িতে পড়িতে সিগারেটটি মুখে দিয়া খানিকটা ধোঁয়া টানিয়া শূন্যে ছাড়িয়া দিল।

বয়স তার বেশী নয়, মাত্র সাতাশ, এই বয়সেই তার চোখে মুখে জীবনের অভিজ্ঞতা দাগ কাটিয়া বসিয়াছে।

চিঠিখানি পড়িয়া বিনয় টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। ঠোঁটের কোণে তার হাসি দেখা দিল।

চিঠি পাঠাইয়াছেন মাধুরীর বাবা মিস্টার দত্ত।

বিনয়ের সঙ্গে একদিন পথে তাঁহার দেখা হইয়াছিল। বিনয়কে বার বার করিয়া তিনি তাঁহার বাড়ীতে যাইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু বিনয় যায় নাই। এবার চিঠিতে জানাইয়াছেন যে তাহার নাকি না গেলেই চলিবে না।

শুধু অনুরোধই নয়, একেবারে পীড়াপীড়ি।

যাইবে কি যাইবে না বিনয় তাহাই ভাবিতে লাগিল।

অনেকদিন যাবত মাধুরীদের সঙ্গে বিনয়ের কোন সম্বন্ধ নাই, যখন ছিল তখনকার কথা বিনয়ের মনে পড়িল। মাধুরীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী ছিল সে-ও। মনে প্রাণে সে তাহাকে ভালবাসিত।

প্রথম যৌবনের প্রেম গভীর হইয়াই দেখা দেয়। বিনয়ের সেই প্রেম প্রথম যৌবনের। মাধুরীকে সে দেবী বলিয়া কল্পনা করিত। মনে ভাবিত মাধুরীর মত মেয়ে বুঝি পৃথিবীতে আর নাই, মাধুরীকে না পাইলে তাহার জীবন নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

সেই স্বপ্ন একদিন ভাঙ্গিল। কল্পনার দেবী কল্পলোকে মিলাইল। বিনয় বুঝিল মাধুরী তাহার মন লইয়া খেলা করিয়াছে। খেলা করাই তাহার অভ্যাস। তাহাকে ছাড়িয়া সে আবার অপরের সঙ্গে সেই খেলা সুরু করিয়াছে। রাগে ও দুঃখে বিনয় সরিয়া পড়িল, ধিক্কার জন্মিল তাহার ভালবাসার উপর।

প্রেমের অপমান বিনয় সহ্য করিতে পারে নাই। এজন্য আত্মনিগ্রহ করিয়াছে সে অনেক।

মন লইয়া খেলা! পরাজয় হইলেই সর্ব্বনাশ। খেলিতে যাহারা জানে এ খেলা সাজে তাহাদের। বিনয় জানিত না। ভালবাসার উপর তাহার ধিক্কার জন্মিল। জীবনটা অবশ্য নিষ্ফল হইল না।

চিঠি পড়িয়া বিনয় ভাবিতে লাগিল হঠাৎ তাহার প্রতি মাধুরী ও তাহার বাবার এত আগ্রহ দেখা দিল কি করিয়া? তবে কি তাহাদের মতি গতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে?—ভাবিতে ভাবিতে বিনয় ভস্মাবশিষ্ট সিগারেটটা ফেলিয়া দিয়া কৌটা হইতে আরও একটা বাহির করিল এবং তাহাতে আগুন ধরাইয়া টানিতে টানিতে একরাশ ধোঁয়া ছড়াইয়া দিল।

মাধুরীকে বিনয় অনেক দিন দেখে নাই, দেখিবার ইচ্ছা তার হইতেছিল। মাধুরীর সেই সৌন্দর্য্য, লীলায়িত গতি ভঙ্গী সত্যই দেখিবার মত। অনেক ভাবিয়া অবশেষে যাওয়াই বিনয় স্থির করিল।

দাড়ি কামাইয়া ও বেশভূষায় ফিটফাট হইয়া বৈকালে সে বাহির হইল।

মাধুরীদের বাড়ী কাছে নয়, ওখান হইতে ট্যাক্সিতেও

লাগে প্রায় আধ ঘণ্টা। পথে নামিয়া বিনয় ট্যাক্সি লইল।

ট্যাক্সি প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে মাধুরীদের বাড়ীর কাছে গিয়া থামিল।

বিলাতি ধরণে তৈরী প্রকাণ্ড বাড়ী। এক সময় দেখিতে খুব সুন্দর ছিল। কিন্তু সেই সৌন্দর্য্য আর নাই। কালের দাগ লাগিয়া শ্রীহীন হইয়াছে। বাড়ীর জানালায় দরজায় খাটো খাটো লেসের পর্দ্দা। দেয়ালের ম্লান রঙে পর্দ্দাগুলির রঙ মিশিয়া একাকার হইয়াছে।

বাড়ীতে ঢুকিয়া বিনয় বৈঠকখানা ঘরের দিকে গেল। মাধুরীর বাবা তখন পাশের বসিবার ঘরটিতে ছিলেন, বসিয়া বসিয়া একখানা উপন্যাস পড়িতেছিলেন। বিনয়কে দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিলেন—'এস এস'!

বিনয়কে সঙ্গে করিয়া তিনি বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিলেন।

ঘরখানি বিলাতি ড্রয়িংরুমের ভারতীয় সংস্করণ। এক কালে হয়তো জাঁকজমক ছিল, এখন ইহার অবস্থা শোচনীয়। বহু পুরাতন একখানি কার্পেটে ঢাকা মেঝের উপর বসিবার কতকগুলি জীর্ণ আসবাব—সোফা, কৌচ কুশন চেয়ার এই সব এবং কয়েকটি পিতলের টবে আধ-মরা গোটা কয়েক বিলাতি পাম। রঙ-হারা চিত্রিত দেয়ালের ভিতর ঐ হতশ্রী আসবাবগুলি সুদিনের স্মৃতিটিই যেন জিয়াইয়া রাখিয়াছে। দেখিলেই মনে হয় দারিদ্র্যের সঙ্গে বিলাসী সভ্যতার সংগ্রাম চলিয়াছে।

মাধুরীর বাবা ও বিনয় দুইখানি কুশন চেয়ারে কাছাকাছি বসিল। মাধুরীর বাবা বলিলেন—'তোমার প্রতীক্ষায়ই ছিলাম।...বসে' বসে' আর ভাল লাগছিল না তাই এই নভেলখানা পড়ছিলাম। প্রেমের উপন্যাস পড়বার বয়েস আর আমার নেই, তবু পড়তে হ'ল। কিন্তু বেশ বই। প্রেমের উপন্যাস হলেও পড়তে অরুচি হয়না। প্রেম জিনিষটাকে অশ্রদ্ধা করবার উপায়ও তো নেই।'

বিনয় হাসিল। তার পর গম্ভীর হইয়া বলিল—'আপনার মতের পরিবর্ত্তন হ'য়েচে দেখচি।'

'পরিবর্ত্তন!...তা হবে।' বলিয়া তিনি মুখখানি কাঁচুমাচু করিলেন। সত্য কথাটা স্বীকার করিলেন যেন অনিচ্ছায়।

ভদ্রলোকটির নাম নীলকান্ত। বয়স পঞ্চাশ কি তারও বেশী। দীর্ঘ একহারা চেহারা। কিন্তু যেমন শক্ত তেমনি রুক্ষ। ভাঙাচোরা লম্বা মুখখানির ভিতর চোখ দু'টি যেন জ্বল জ্বল করে।

নীলকান্তের পিতা ছিলেন উচ্চপদস্থ লোক। পয়সা রোজগার করিয়াছিলেন বিস্তর। নীলকান্তকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য তিনি পয়সা কড়ি অতিরিক্ত পরিমাণে খরচ করিয়া বিলাতে রাখিয়াছিলেন। লেখাপড়া তিনি করেনও নাই, করিলেও কিছু হইত কিনা সন্দেহ। নিজের রোজগার কাহাকে বলে আজ পর্য্যন্ত তিনি তাহা জানেন না। পিতা বাঁচিয়া থাকিতে তাঁহারই অর্থে সাহেবী করিয়াছেন, এবং পিতার মৃত্যুর পরও তাঁহার অবশিষ্ট অর্থ নষ্ট করিয়াই ঠাটটা এতদিন কোন রকমে বজায় রাখিয়াছেন।

নীলকান্ত ডাকিলেন—'বয়!'

'হুজুর!'—বলিয়া একটি নেপালী ছোকরা আসিয়া হাজির হইল।

নীলকান্ত বলিলেন—'মিস্ বাবাকো বোলাও।'

নেপালী ছোকরাটি চলিয়া গেলে বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—'আমাকে ডেকেছেন কেন?'

তিনি হাসিয়া বলিলেন—'ব্যস্ত হ'য়ো না, বলব বলব। অনেক কথা আছে।'

—'বলুন না এখনই'

—'আগে চা-টা খাও। তার পর কথা হবে।'

বিনয় কহিল—'আমার সময় কিন্তু কম।'

নীলকান্ত বলিলেন—'তা' হোক্'।

বিনয় একটু মুস্কিলে পড়িল। কহিল—'কাজও একটু আছে।'

—'কাজ তোমার ঢের আছে তা' জানি। আজকাল সব সময়ই নাকি ব্যস্ত থাক। সে তো ভাল কথা।'

নীলকান্ত আরও কি যেন বলিতেছিলেন কিন্তু সহসা মাধুরীর কণ্ঠ শুনিয়া থামিলেন। মাধুরী জিজ্ঞাসা করিল—'কেন ডাকছ বাবা?'

নীলকান্ত কহিলেন—'দেখ, কে এসেচেন।'

মাধুরী তাহার সেই চিরাভ্যস্ত মরালগতিতে কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল। বিনয় দেখিল—মাধুরীর দেহে ভাঁটার টান পড়িয়াছে। সাজসজ্জা এবং প্রসাধনেও দেহের শ্রী চোখে লাগে না। লাবণ্যের অভাবে তাহার রূপ তৈলহীন প্রদীপের মত নিষ্প্রভ হইয়াছে।

মাধুরীকে দেখিয়া বিনয়ের বুকে হঠাৎ ঝড় দেখা দিল কিন্তু বাহিরে তাহা গোপন করিবার জন্য জোর করিয়া একটু হাসি তাহার ওষ্ঠ প্রান্তে টানিয়া আনিল।

মাধুরী বিনয়ের পানে তাকাইয়া সলজ্জ ভাবে কহিল—'ও!—আপনি!'

বিনয়ের মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

মাধুরীও আর কোন কথা বলিতে না পারিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

নীলকান্ত উভয়ের অবস্থাটা বোধ করি বা বুঝিলেন। বলিলেন—'তোমরা বসে' গল্প কর। আমি আসচি।' এই বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

মাধুরী ও বিনয় অনেকক্ষণ নির্বাক হইয়াই রহিল।

তারপর বিনয় নিজেকে সংবৃত করিয়া প্রথম কথা বলিল। কহিল—'তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে কোনদিন ভাবিনি।'

মাধুরী ম্লান একটু হাসিয়া বলিল—'চিঠি পেয়ে বোধ করি আশ্চর্য্য হয়েচেন?'

—'হবার কথাই তো।'

—'চিঠি না পেলে কোনদিনও আর আসতেন না?'

'না'—বিনয় মাথা নাড়াইল।

—'আপনি অত্যন্ত কঠিন লোক'—বলিয়া মাধুরী হাসিল। তারপর বিনয়ের চোখে চোখ দু'টি রাখিয়া গ্রীবা ভঙ্গী করিয়া সে পুনরায় কহিল—'আপনার সঙ্গে আমি সত্যি ঝগড়া করব।'

মাধুরীর ভাব ভঙ্গীতে সেই লালিত্য আর নাই, নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। বিনয়ের চোখ দু'টি হতাশ হইল। মাধুরীর হাব ভাব তাহার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল।

গম্ভীর হইয়া বিনয় কহিল—'কি হবে আর ঝগড়া করে? আজ এসব একেবারেই বৃথা।'

কথাটার অর্থ মাধুরী স্পষ্ট বুঝিল না। তথাপি চোখ মুখের তেমনি ভঙ্গী করিয়াই মাধুরী কহিল—'আমিই না হয় ভুল করেছি, কিন্তু আপনি—'

বিনয় তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—'থাক্। আমি শুনতে চাইনে।...কে ভুল করেচে আর কার শুধ্‌রে নেওয়া উচিত সে আলোচনার প্রয়োজন কি?'

মাধুরী মনে মনে আহত হইয়া নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বেদনা-ক্লিষ্ট মুখের পানে তাকাইয়া বিনয়ের যেন মাধুরীর জন্য দুঃখ হইল। কহিল—'পুরোণো কথা চাপাই থাক মাধুরী, কি হবে আর বুঝাপড়া করে?'

—'শুধু একটা কথা।'

—'না।'

বিনয় একটু বাদে পুনরায় বলিল—'সবই তো চুকে গেছে, আবার কি!...না-হয় মনে কর কিছুই হয়নি।'

মাধুরী আর্দ্র কণ্ঠে কহিল—'কেমন করে' আমি তা' মনে করব?...অসম্ভব!' বলিতে বলিতে তাহার চোখ দু'টি সজল হইয়া উঠিল।

বিনয় অবাক হইয়া মাধুরীর মুখের পানে তাকাইল, যেন এ কান্নার অর্থ সে তাহার চোখে মুখে খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু বেশীক্ষণ সে তাকাইতে পারিল না। মাধুরীর মুখে আকর্ষণের কিছু নাই। কি মুখ কি হইয়া গিয়াছে।

বিনয় প্রশ্ন করিল—'তোমার কি অনুতাপ হ'চ্ছে?... কেন?'

মাধুরী জবাব দিতে না পারিয়া মাথা হেঁট করিল।

বিনয় হাসিয়া বলিল—'তুমি আমাকে ভাবালে দেখছি।'

এই বলিয়া বিনয় একটা সিগারেট ধরাইল। মাধুরীকে আবার ভালবাসা যায় কি না তাহাই সে ভাবিতে লাগিল।

না,—অসম্ভব। মন হইতে যাহা মুছিয়া গিয়াছে তাহা ফিরাইয়া আনা যায় না। নূতন করিয়া ভালবাসিতে হইলে আবার নূতন আকর্ষণ চাই, একটা নূতন মোহ। কিন্তু মাধুরীকে দেখিয়া সেই মোহ জন্মে না।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া বিনয় প্রশ্ন করিল—'তোমার বক্তব্যটা কি পরিষ্কার ক'রে আমাকে বলতো।'

মাধুবী বলিতে পারিল না। বলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—'কি ভাবচ মাধুবী?'

—'ভাবচি, আমার কথা আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা।'

—'নিশ্চয় বিশ্বাস করব। বল।'

মাধুরী কহিল—'আমার দুর্ব্যবহারের জন্য আমি লজ্জিত, শুধু এই কথাটাই আমার বলবার ছিল।'

—'আর কিছু নয়?'

মাধুরী জবাব দিল না।

বিনয় বলিল—'তোমার লজ্জিত হবার কিছু নেই মাধুবী। আমাকে ভাল না বেসে যাকে তোমাব ভাল লেগেছিল তাকে ভালবেসেছিলে তাতে কিছুমাত্র তোমার অপরাধ হয়নি।'

—'ভুল করেছিলাম।'

—'হ'তে পারে। কিন্তু মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। ভুল কি আমি করিনি? তোমাকে চেয়ে আমিও তো ভুলই করেছিলাম। তা'র জন্য আমার কোন দুঃখ নেই।'

বিনয়ের কথাটা যত সরল ও সহজই হোক মাধুরী সহ্য করিতে পারিল না। মাধুরীর মুখখানা বেদনায় বিবর্ণ হইয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই যেন তাহার স্বচ্ছন্দ ভাবটা কোথায় অন্তর্হিত হইল।

মাধুবী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। বলিল—'আপনার কাছে মুখ দেখাতে সত্যি আমার লজ্জা করে। আমার দুর্ব্যবহার ক্ষমার অযোগ্য।'

বিনয় গম্ভীর ভাবে মাধুরীকে আশ্বাস দিল। কহিল—'তোমার ব্যবহার যেমনই হোক সেটা তোমার বাপ মার ব্যবহার বলেই আমি জানি, তুমি ছিলে তাদের পুতুল মাত্র। তোমার কোন দোষ নেই।'

—'যথেষ্ট দোষ আমারও ছিল।'

—'ছিল হয়তো। আমি জানিনে। জানবার প্রয়োজনও আমার নেই।'

থামিয়া গিয়া বিনয় পুনরায় কহিল—'আমার মত লোক তোমাকে চেয়ে সত্যিই তো তোমাকে অপমান করেছিল, সেই অপমানে তুমি যদি দুর্ব্যবহার করেই থাক, অন্যায় করনি।'

—'থামুন থামুন। ওরকম করে আমাকে কথা শোনাবেন না।'

—'না, মাধুরী, কথা শোনাবার জন্যে বলছি না। সত্যি, তোমার ব্যবহার কিছু অন্যায় হয়নি। তোমাকে বিয়ে ক'রে আমি সুখী হতাম না, তুমিও কষ্ট পেতে। উভয়েরই জীবন দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠত।'

বিনয়ের কথা শুনিয়া মাধুরীর যে কি হইল সে আর দাঁড়াইতে পারিল না, কাঁপিতে কাঁপিতে হঠাৎ বসিয়া পড়িল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

ঠিক এমন সময় নীলকান্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নীলকান্ত কিছুই বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্নময় দৃষ্টিতে বিনয়ের পানে তাকাইলেন।

বিনয় বলিল—'আমি তো কিছু বুঝতে পারছি নে।'

নীলকান্ত ডাকিলেন—'মাধুবী!'

মাধুরী সাড়া দিল না।

বিনয় কহিল—'আমি তা' হ'লে উঠি।'

নীলকান্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—'না না, ব'স।'

—'আমার এক জায়গায় যাওয়ার কথা আছে।'

—'তোমার সঙ্গে যে আমার অনেক কথা ছিল।'

বিনয় ঘড়ি দেখিয়া বলিল—'বলুন।'

নীলকান্ত বুঝিলেন বিনয় এড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। বুঝিতে পারিয়া তিনি দমিয়া গেলেন। তাহার চোখে মুখে একটা মানসিক সংগ্রামের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তিনি কহিলেন—'আর একদিন তা' হ'লে এস।'

বিনয় মাথা নাড়িয়া বলিল—'খামোকা আরো একটা দিন আমি নষ্ট কর্ত্তে চাইনে। আপনার কথা আমি বুঝেছি।··· না,—আর তা' হয়না। হ'তে পারেনা।' এই বলিয়া বিনয় উঠিয়া পড়িল।

যাইতে যাইতে বিনয় দুয়ারের কাছে গিয়া একবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেখিল মাধুবী সজল নেত্রে তাহারই পানে তাকাইয়া আছে। মাধুরীর চোখে জল দেখিয়া বিনয়ের কান্না পাইল।

সত্যই তো সে মাধুবীকে ভালবাসিয়াছিল।

বিনয়ের মনে পড়িল মাধুবী তাহার ভালবাসার মর্য্যাদা কিছুমাত্রও দেয় নাই। ঘৃণায় তাহার মন বিমুখ হইয়া গেল। মুহূর্ত্তকাল আর দেরী না করিয়া সে মাধুরীদের বাড়ী হইতে পথে বাহির হইয়া ট্যাক্সিতে উঠিল।

ট্যাক্সিতে দেহ এলাইয়া দিয়া বিনয় সিগারেটের ধোঁয়া উড়াইতে উড়াইতে সবেগে ফিরিয়া চলিল।

শ্রীজ্যোতি সেন

# বর্ষার চিঠি

শ্রীপ্রতাপ সেন

প্রতিবারে আসে বরষা যেমন, এবারেও আসিয়াছে,
মেঘের অলক উড়িছে আকাশ ছেয়ে,
হাস্না-হেনার গন্ধে বাতাস চঞ্চল হয় পাছে,
শীকরে আর্দ্র করেছে শ্যামল মেয়ে।
সাঁওতালী-খোঁপায় যুঁইফুলে মোড়া, তেমনি শোভিছে শিরে,
বিজলী-দশন চমকিছে বারবার ;
ধরণী-সখির শৈল-উরজ পিছল অশ্রু-নীরে
বিরহে কাতর মমতার পারাবার।
নিখিল বিশ্বে চলে কানাকানি, মেঘে মেঘে সংঘাত ;
সুদূর প্রিয়ার পরশ-মদির-দিঠি—
আকুল করেছে, বরষার বঁধু,—ব্যাকুল সজল রাত ;
প্রিয়ারে আমার পাঠানু ছোট্ট চিঠি !

হয়ত' শুইয়া তুমিও, সজনী, আছ অপলক চোখে,
হয়ত' পড়িছ আমার কবিতাখানি,
গত বরষায় আজিকার রাতে এমনি অধীর শোকে
লিখেছিনু যেই ছোট্ট কবিতা, রাণি।
হয়ত' পড়িছ বরষার কবি রবি-ঠাকুরের গান,
দাগ-দেওয়া সেই পুরাণ-বইয়ের পাতে,
তোমার মাথার সুরভি-মাখান আধ-ছেঁড়া বইখান,
যেখানা পড়েছি কতবার একসাথে।
প্রদীপের শিখা ম্লান হয়ে যেত, ঘুমায়ে পড়িতে কোলে,
বিস্ময়ে মূক,—দেখিতাম মুখখানি ;
বুকের ওপর আল্‌গোছা বাস ঈষৎ সমীরে দোলে,
ধরিয়া রাখিতে নারিত আপনা টানি'।

আজিকার রাতে তুমি কাছে নাই, হয়ত' ঘুমায়ে আছ,
হয়ত' স্বপনে আমার কোলেই শুয়ে ;
কালো-কালো চোখে কুহক জড়ায়ে নতুন ছলনা আঁচ,
শিথিল-বসন কাঁদিছে লুটায়ে ভুঁয়ে।

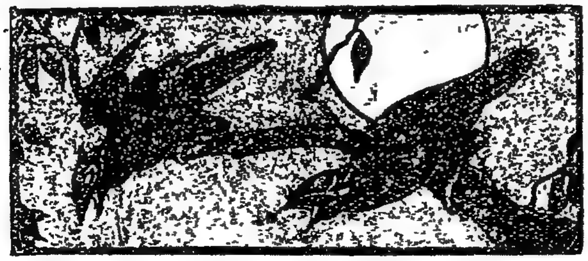

# বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ

অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন এম্-এ

মানব-চিত্তের বিভিন্ন অবস্থার রসযুক্ত সম্যক্ প্রকাশ লইয়াই সাহিত্যের কারবার। সাহিত্য কখনও বা অগ্রদূত হইয়া সমাজকে কল্যাণের পথে আহ্বান করে, আবার কখনও বা গভীর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সমাজের প্রতি স্তরের প্রকৃত অবস্থা উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখায়। এইরূপে সাহিত্যের ভিতর দিয়া একদিকে যেমন দেশের আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্বোধিত হয়, অন্যদিকে তেমনি দেশের চিত্তের প্রকৃত ইতিহাস রচিত ও রক্ষিত হয়।

বাঙালীর মনোভাবের বৈশিষ্ট্য ও পরিণতি বাংলা-ভাষার ভিতরে অবশ্যই প্রতিফলিত হইয়াছে। গভীর ভাবে অনুসন্ধান করিলে পণ্ডিতেরা বহু খুঁটি-নাটি তথ্য আবিষ্কার করিতে পারেন। কিন্তু এখানে সাধারণ ভাবে মাত্র দুই একটি বিশেষত্বের কথাই আলোচনা করা যাইতেছে।

ইংরাজ অধিকারের সম-সাময়িক ও তৎপূর্ব্বকার বাংলা সাহিত্যে দেবদেবীর উপাখ্যান এবং ঐতিহাসিক ঘটনামূলক রচনা ছাড়া আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ; থাকিলেও তাহা অতি সামান্য। কৃত্তিবাস-কাশীদাসের অমূল্য দান; এবং অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসান, ময়নামতীর গান, বেহুলা-সতী-সাবিত্রীর উপাখ্যান, অজামিলের হরিভক্তি, ধ্রুব-চরিত্র, ধ্রুবথ উদ্ধার, কংসবধ, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি পালাগান—এ সমস্তই বাঙালী হিন্দুর বিশিষ্ট ধর্ম্মীয় আবেষ্টনে পরিপুষ্ট। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির প্রেমের কবিতাও অনুভূতির নিবিড়তা ও ভাবের সূক্ষ্মতায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমাদর্শের অনুরূপ হওয়াতে ধর্ম্মীয় সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। তৎকালীন বাঙালী হিন্দুর এই ধর্ম্ম-সর্ব্বস্বতা প্রকৃত ধর্ম্মপ্রবণতার লক্ষণ, না পরাধীন বীর্য্যহীন জাতির শেষ অবলম্বন ধর্ম্মকেই প্রবলভাবে আঁকড়াইয়া থাকিবার প্রচেষ্টা, তাহা ভাবিবার বিষয়। প্রকৃত ধর্ম্মপ্রবণতায় সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই; কিন্তু ধর্ম্ম ও অতীত-গৌরব-কাহিনী যখন অন্ধের যষ্টির মত লোকের একমাত্র সম্বল হয়, তখন তাহা অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিবার জন্য অতিমাত্রায় আগ্রহ প্রকাশ পায়। সেই অসীম আগ্রহের মুখে বৈষ্ণব ও শাক্তের দ্বন্দ্ব এবং পরস্পরের দেবদেবীর শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রমাণ-প্রয়োগ দেখিতে পাই। প্রকৃত ধর্ম্মবোধ মানবপ্রীতির দৃঢ়-ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। পরাধীন জাতির পক্ষে প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া স্বাভাবিক কিনা (এমন কি, সম্ভব কিনা) তাহা সন্দেহের বিষয়। তথাপি তাহার অন্ধ-বিশ্বাস ও আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাদি পালন তুচ্ছ জিনিষ নয়—নিতান্ত প্রাণের জিনিষ বলিয়া উহাও মহামূল্য। বস্তুতঃ ভক্তি, বিশ্বাসপ্রবণতা, ও ভাবাতিশয্য আজিও অধিকাংশ বাঙালীর প্রধান বিশেষত্ব।

তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যে মুসলমান চিত্তের কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের রচনায় স্থানে স্থানে মুসলমানের অত্যাচার ও নিপীড়িত হিন্দুর অসহায় অবস্থার জ্বালাময় বর্ণনা দেখা যায়। অবশ্য বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত বলিয়া কোন কোন গ্রন্থে তাঁহাদের বিস্তর স্তুতিবাদও আছে, কিন্তু তাহার সহিত সমগ্র বাঙালীর চিত্তের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। মুসলমান রচয়িতাগণ যে কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও বিশেষ করিয়া মুসলমান কৃষ্টির তেমন আভাস পাওয়া যায় না।

মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ ইস্‌লামী আদর্শ হইলেও, অল্প কয়েকজন খ্যাতনামা দার্শনিক, সাধক ও মুর্শিদা-সঙ্গীত রচয়িতা ছাড়া অন্য কোন মুসলমান যে হিন্দুর সহিত মানবতার প্রশস্ত ক্ষেত্রে মিলিত হইতে চাহিয়াছিলেন, বা তাহার আবশ্যকতা ও ঔচিত্য অনুভব করিয়াছিলেন,

সাহিত্য হইতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। আসল কথা, বাংলা-সাহিত্য-রূপ মিলনক্ষেত্রই সে সময় তেমন করিয়া প্রস্তুত হয় নাই। তখন মুসলমান উর্দ্দু ও পার্শী পড়িত, চাকুরী-প্রত্যাশী হিন্দুরাও তাহাই পড়িত। তাহা ছাড়া মুসলমানের আরবী ও হিন্দুর সংস্কৃত ধর্ম্মভাষা ও দেবভাষারূপে পঠিত হইত। যাহা হউক উর্দ্দু ও পার্শীর ভিতর দিয়াই হিন্দু মুসলমানে অনেকখানি সম্প্রীতি হইয়াছিল বলিয়া কল্পনা করা স্বাভাবিক। কিন্তু কার্য্যতঃ পরস্পরের ভিতর বিদ্বেষের চিহ্নই অধিক পরিস্ফুট দেখিতে পাই। তাহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে মুসলমান ভুলিতে পারে নাই যে তাহারা এদেশ জয় করিয়াছে, আর হিন্দুও ভুলিতে পারে নাই যে মুসলমান তাহাদিগকে বেদখল করিয়া এদেশ অধিকার করিয়াছে। মুসলমান হিন্দুর প্রতি অনেক অত্যাচার করিয়াছে, আর হিন্দুও সুযোগ পাইলে তাহার প্রতিশোধ লইতে ছাড়ে নাই। এজন্য অধিকাংশ মুসলমানের নিকট সুলতান মাহমুদ, কালাপাহাড়, আওরঙ্গজেব, আমেদশাহ আব্দালী প্রভৃতিই আদর্শ নরপতি; আর হিন্দুর নিকট রাণাপ্রতাপ, শিবাজী প্রভৃতিই আদর্শ বীর; পরবর্ত্তীযুগে জাতীয়তাবোধ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাজসিংহ, সীতারাম এবং যাবতীয় মারাঠা ও শিখ বীর পূজার আসনে স্থান পাইয়াছেন। ভারতবাসীর জাতীয়তা-বোধ যতদিন ধর্ম্মসংস্কারের ঊর্দ্ধে না উঠিতেছে, ততদিন এরূপ সাহিত্য হিন্দুমুসলমানের মিলনের পথে সম্ভবতঃ বাধাই স্থাপন করিবে।

আর একটি কথা মনে হয়। আলোচ্য সময়ে বাংলা-ভাষার চর্চ্চা করা হিন্দুমুসলমান কেহই বিশেষ আবশ্যক বা গৌরবজনক বলিয়া মনে করিতেন না। আর সে সময়ে যে অধিকাংশ বাঙালী হিন্দুমুসলমানের মাতৃভাষা সংস্কৃত উর্দ্দু কিম্বা পার্শী ছিল, তাহাও ধারণা করিবার কোন হেতু নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, তাঁহারা ভাষা সম্বন্ধে এক অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম আবেষ্টনের মধ্যে বাস করিতেছিলেন। বোধ হয় এইরূপ কৃত্রিম অবস্থায় লালিত হওয়াতেই মনে প্রাণে কোন মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মহা উৎসাহে কাজ করিয়া যাওয়া স্বাভাবিক ছিলনা। কাজে কাজেই পুরাতনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের গৌরব এবং আপন আপন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা কল্পনা করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকাই সাধারণ প্রথা ছিল। তখনকার লোকের জীবনে অভাব অল্প ছিল বলিয়া সমস্যাও অধিক ছিলনা। সাহিত্যের ভিতর আমরা নিশ্চিন্ত আরাম ও প্রচুর অবসরের ভিতর ধর্ম্ম, প্রেম ও অবাধ হাস্য-রসিকতার সন্ধান পাই।

ক্রমে ক্রমে মুসলমানের হস্ত হইতে শাসনভার ইংরেজের হস্তে আসিয়া পড়িল। পার্শী আর আদালতের ভাষা রহিল না। রাজানুগ্রহ লাভের নিমিত্ত ইংরাজী শিক্ষা করিবার প্রয়োজন হইল। হিন্দু এই নূতন অবস্থাকে অপেক্ষাকৃত সহজ ভাবে গ্রহণ করিল; কিন্তু অপরিণামদর্শী মুসলমান অন্ধ অহঙ্কারের বশেই হউক, রাজনৈতিক ভেদনীতির জন্যই হউক, কিম্বা তাহাদের চরিত্রগত অপরিবর্ত্তনশীলতার জন্যই হউক, ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য ভাষা উপেক্ষা করিয়া রাজানুগ্রহে বঞ্চিত হইয়া চাকুরী ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে পিছাইয়া পড়িল, এবং অসভ্যতা ও বর্ব্বরতার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময় মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন এবং ইংরাজ রাজপুরুষের বাংলাভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা, প্রধানতঃ এই দুই কারণে বাংলাভাষার চর্চ্চায় এক গৌরবজনক নবযুগের সূত্রপাত হইল। এই সময় বাংলাভাষা মুসলমানীভাষার প্রভাব হইতে যথাসম্ভব মুক্ত হইয়া অতিরিক্ত সংস্কৃত-ঘেঁষা হইয়া পড়িল। সম্ভবতঃ তৎকালীন হিন্দুদিগের মনে বাংলাভাষাকে যাবনিক ও প্রাকৃত প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া দেবভাষার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ যোগস্থাপন করিয়া ইহার আভিজাত্য সম্পাদন করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছিল। ও-দিকে উর্দ্দু-পার্শী-ভাষায় অনভিজ্ঞ মুসলমান জনসাধারণের লোক-সাহিত্য হিসাবে আরবী-পার্শী ও উর্দ্দু শব্দ-বহুল পুঁথি সাহিত্যের প্রসার হইল। মনে হয়, এইরূপে বাংলাভাষা শৈশবেই দ্বিধা-বিভক্ত হওয়াতে হিন্দু-মুসলমান চিত্তে নূতন করিয়া আর এক ব্যবধানের সৃষ্টি হইল। পুঁথি সাহিত্যের বিষয় বস্তু অতীতে, মুসলমানের গৌরব ও বিজয়ের দিনে, অবস্থিত। ইহাতে অমুসলমানেরা কাফের ও নরককুণ্ডবাসী

এবং মুসলমানের হস্তে নিত্য-লাঞ্ছিত। পক্ষান্তরে হিন্দুয়ানী বাংলাসাহিত্য প্রধানতঃ বর্ত্তমানের সমস্যা লইয়া রচিত হইতে লাগিল নানাবিধ সামাজিক সমস্যা ছাড়াও, ইহাতে নির্য্যাতন-কারীর প্রতি নির্য্যাতিতের স্বাভাবিক আক্রোশ প্রকাশ পায়। এজন্য মুসলমান বাদশাহদের অত্যাচার, কাজীর বিচার, মুসলমান জনসাধারণের নৈতিক হীনতা ও চরিত্রগত দোষ, এবং বাদশাহদের কু-শাসনে দেশে দস্যু তস্করের প্রাদুর্ভাব, ইত্যাদি বিষয়ে অতিরঞ্জিত বর্ণনা দেখা যায়। ইহাতে কতক কতক সত্য থাকিলেও, কিয়দংশে ইহা যে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ স্থায়ী করিবার জন্য রাজনৈতিক কারণ হইতে উদ্ভূত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ঐতিহাসিক সত্য-বিকৃতিই এরূপ সন্দেহের প্রধান কারণ।

যাহা হউক, মোটের উপর দেখা যাইতেছে, এই সময় বাঙালী মুসলমান কেবল অতীতের দিকেই মুখ ফিরাইয়া রহিল; কিন্তু হিন্দু সামাজিক সমস্যাবহুল জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। সতীদাহ প্রথা, সমুদ্রযাত্রা, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি বিশেষ করিয়া হিন্দুর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন ও আদালতের ভাষা করিবার জন্য যে সমস্ত বাঙালী উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও মুসলমানকে অনুপস্থিত দেখিতে পাই। এইরূপ হিন্দু পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চাঞ্চল্যকর জীবন সমস্যার সম্মুখীন হইয়া ক্রমশঃ জাগ্রত ও শক্তি সম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল, আর আত্মবিস্মৃত মুসলমান তাহাদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে অনেকের জীবনে ও সাহিত্যে কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা গিয়াছিল সত্য; কিন্তু জনকয়েকের সাময়িক ক্ষতির তুলনায় সমগ্র সমাজের চাঞ্চল্যকর নব-অনুভূতি এবং নূতনতর জীবনাদর্শের প্রতি সবিস্ময় দৃষ্টিপাত অনেক অধিক মূল্যবান। কারণ, এই অন্ধ অনুবর্ত্তন বাহ্য ব্যাপার,—শীঘ্রই ইহার বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষযুক্ত সাহিত্য ও মনোবৃত্তি সৃষ্টি হইয়া গেল; পক্ষান্তরে সনাতন প্রথা ও নৈতিক আদর্শের দিক হইতে নূতনের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ, সনাতনকে প্রশ্ন করিয়া ও নূতনের সম্ভাব্যতা স্বীকার করিয়া সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবার প্রবৃত্তি এবং বর্ত্তমান প্রয়োজনের দাবী স্বীকার করিবার মত মনোবৃত্তির অনুশীলন স্থায়ীভাবে নবযুগের শুভ সূচনা করিল।

এই নবীন উল্লাসে যখন বাঙালীর সাহিত্য বেগবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন আস্তে আস্তে মুসলমানের ঘুম ভাঙিতে সুরু করিল। সাহিত্যে অবহেলার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অধঃপতন চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা হিন্দুর রচিত সাহিত্যে মুসলমানের যেরূপ দেখিতে পাইল, তাহাতে লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সম্ভবতঃ তাহারা বাংলা সাহিত্যে হিন্দুসভ্যতার সুস্পষ্ট ছাপ ও মুসলমান সভ্যতার স্পর্শ-লেশ-শূন্যতায় সহসা অভিভূত ও নৈরাশ্য পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে, বাংলা সাহিত্যে কয়েকজন মুসলমান লেখক ইসলাম ও মুসলমানের গৌরব ও শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। এই সাহিত্যে ঝাঁঝ ছিল, হয়ত শতকরা নব্বইভাগ সত্যও ছিল, কিন্তু যে মুক্ত দৃষ্টি ও যুগোপযোগী জ্ঞানগাম্ভীর্য্য সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ, তাহার অভাবে এই সব রচনার অধিকাংশ তথ্যপূর্ণ হইলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া রহিল। এই সময় আর এক শ্রেণীর লেখক হিন্দু সাহিত্যিকের সৃষ্ট চরিত্রের পাল্টা জওয়াব দিতে গিয়া মুসলমান নায়ক ও হিন্দুনায়িকা সম্বলিত নভেল লিখিতে আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য, রুচি সৌষ্ঠবের অভাবেই হউক, বা সাহিত্যিক সৃষ্টি প্রতিভার অভাবেই হউক, সেগুলি হিন্দু সমাজে ত দূরের কথা, মুসলমান সমাজেও স্থায়ীভাবে আদর লাভ করিতে পারিল না। এখন পর্য্যন্ত মুসলমান সমাজ এতদূর পিছাইয়া রহিয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে সাহিত্যিক প্রতিভাসম্পন্ন লোক অল্পই দেখিতে পাই। সামান্য প্রতিভার বিকাশেই প্রচুর বাহবা জুটিতেছে বলিয়া, আমার মনে হয়, সাহিত্যোচিত সাধনার বিঘ্ন ঘটিতেছে। নানা প্রকারের সমস্যায় আজ মুসলমান সমাজ জর্জ্জরিত। সাহিত্যের ভিতর দিয়া এইগুলি একরূপ গুছাইয়া লইয়া একটু অবসর পাইবার পরে অদূর ভবিষ্যতে আশা করা যায় যে বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান কালচারের একটা বিশিষ্ট ছাপ পড়িয়া হিন্দু-মুসলমান আদর্শের সমাবেশে পূর্ণতর সাহিত্যের উদ্ভব হইবে।

এইবার হিন্দুয়ানী ও মুসলমানী সাহিত্যের পৃথক আলোচনার পরিবর্ত্তে সাধারণ ভাবে বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্যের কয়েকটি মোটামুটি ভাব ধারার কথা উল্লেখ করিয়াই বক্তব্য শেষ করিব। (১) পূর্ব্বেকার বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সমগ্র ভারতবর্ষের কোন রাষ্ট্রীয় ঐক্যের ভাব ছিলনা; বর্ত্তমান সাহিত্যে সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির অধিকার স্বীকার ও নিখিল ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের ভাব পরিস্ফুট দেখা যায়। (২) আগেকার সাহিত্য ঘটনা-বহুল ছিল, তাহা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই উপভোগ করিতে পারিত; এখনকার সাহিত্য চিন্তা-বহুল, তাহা অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিতের উপভোগ্য নহে। ইহাতে অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতি শিক্ষিত লেখকদিগের অবজ্ঞা ও সহানুভূতিশূন্যতারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সম্ভবতঃ সাহিত্যে মস্তিষ্ক অপেক্ষা হৃদয়বৃত্তির সহিত সংস্রব থাকাই অধিক বাঞ্ছনীয়। (৩) পূর্ব্বে সাহিত্যের বিষয়বস্তু প্রায়ই রাজা মহারাজা কোটাল মন্ত্রী প্রভৃতির আখ্যান হইতেই গ্রহণ করা হইত; এখন সাধারণ লোকের পারিবারিক সুখ-দুঃখও সাহিত্যে স্থান পাইতেছে। কিন্তু অতি আধুনিকের কথা বাদ দিলে এই 'সাধারণ লোক' বলিতে সাধারণতঃ শিক্ষিত ধনী ও মধ্যবিত্তই বুঝাইত। অতি আধুনিক যুগে কুলিমজুর ও বস্তিওয়ালাদের জীবন কাহিনীও সাহিত্যের বিষয় হইয়াছে। এটা অবশ্য ভাল লক্ষণ; কিন্তু যে সাহিত্যিক-সুলভ সহানুভূতির স্পর্শে সাহিত্যে সুরুচি-সম্মত রস-সঞ্চার হয় তাহার অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। (৪) পূর্ব্বে আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করা হইত, এবং প্রায় প্রত্যেক রচনাই কোন বিশেষ নৈতিক আদর্শের পরিপোষক হইত; বর্ত্তমানে দোষগুণ-সমন্বিত মানুষ সৃষ্টি করা হয়। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে পূর্ব্বকালের চেয়ে আধুনিক কালে মানবসুলভ দুর্ব্বলতা স্বীকার করিয়া তাহার বিচার একটু অকঠোর করা হইয়াছে। (৫) পূর্ব্বেকার সাহিত্য নিত্যবস্তুর সন্ধান করিত, বর্ত্তমান সাহিত্য ক্ষণিক-লভ্যের মোহটাকেও অমূল্য বলিয়া স্বীকার করে। জীবনাদর্শের এইরূপ পরিণতির ফলে, পূর্ব্বে যে সমস্ত বিষয় অনৈতিক বলিয়া বিবেচিত হইত, এখন তাহার অনেকগুলিই লোকে আর ততটা দোষনীয় বলিয়া মনে করেনা। কাজে কাজেই পূর্ব্বে যে সমস্ত কাজ লোকে গোপনে করিলেও মনে মনে সঙ্কুচিত থাকিত, অতি-আধুনিক যুগে তাহা প্রকাশ্যে করিয়া বাহবা লইতে চায়। (৬) পূর্ব্বকাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত সাহিত্য সৃষ্টিতে একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা দেখা যাইত; কিন্তু অতি আধুনিক সাহিত্যে এইরূপ পরিকল্পনার অভাব লক্ষিত হইতেছে। ইহার কারণ কি লেখকদের মানসিক অপরিপক্কতা, না স্পষ্টতার প্রতি তাঁহাদের অবজ্ঞা, না অস্পষ্টতার প্রতি শিশুসুলভ আকর্ষণ—একথার মীমাংসা করা বর্ত্তমানে সুকঠিন। আমার মনে হয় পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ এবং অনুপলব্ধ সত্যের নীরস আবৃত্তির ফলেই বিভিন্ন ভাবের পূর্ব্বাপর সঙ্গতি-রক্ষা হইতেছে না। বাঙালীর এখন জীবন-সমস্যা অতিশয় কঠোর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার কোন মীমাংসাই হইতেছে না, অথচ সাহিত্যে বাস্তবতার দোহাই দিয়া প্রচুর পরিমাণে কৃত্রিম মালের সরবরাহ হইতেছে। বস্তি সাহিত্য যে-দিন সাহিত্যিকদের গভীর অনুভূতি ও সহানুভূতি দ্বারা রসময় হইবে, সেইদিনই তাহা প্রকৃত সাহিত্য রূপে গণ্য হইতে পারিবে, তৎপূর্ব্বে নয়। আমরা সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছি যখন অতি-আধুনিক সাহিত্যের বর্ত্তমান দিশাহারা অবস্থা ঘুচিয়া গিয়া তাহা এক সুস্পষ্ট পরিণতি ও লক্ষ্যের অভিমুখে ধাবিত হইবে এবং আমাদের জীবনসমস্যা সমাধানের শক্তি যোগাইবে।

কাজী মোতাহার হোসেন

# ব্যথার পূজা

শ্রীমতী ঊষা বিশ্বাস্ এম্-এ, বি-টি

শহরের বাইরে মাঠের মধ্যে সুন্দর একটি বাড়ী—ঠিক যেন ছবির মত। আশপাশে কাছাকাছি আর কোনও পাকা বাড়ী নেই। বাড়ীর সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে জনবিরল একটি রাস্তা—তা'তে অবিশ্রাম লোক-চলাচলের বা গাড়ীমোটরের ঠেলাঠেলি নেই। তা'র ওপারে খোলা একটি মাঠ। বাড়ীটি বেশ অনেকখানি জমির উপরে তৈরী। চারিদিকে মেদির বেড়া। তা'র গায়ে গোছায় গোছায় ধরে র'য়েছে ছোট্ট ছোট্ট বেগুনী রঙের সুন্দর ফুল ও সবুজ ও হলদে রঙের ছোট্ট ছোট্ট কাঁচা পাকা ফল। রাস্তার উপরেই একটি গেট। একটি থামে মার্বেল পাথরের ফলকের উপর ইংরেজিতে গৃহস্বামীর নাম লেখা, অপরটিতে লেখা বাড়ীটির নাম—'চিত্রা'। গেটের উপর দিয়ে লতিয়ে উঠেছে মঞ্জরিত একটি লতাগাছ—প্রস্ফুটিত পুষ্পসম্ভারে নিবিড়। বেড়ার ধারে ধারে কতগুলি ইউক্যালিপ্টাসের গাছ দাঁড়িয়ে র'য়েছে তা'দের দীর্ঘ ঋজু দেহ নিয়ে। তা'দের মাঝে মাঝে করবী ও শিউলিফুলের গাছ। গেটের দু'পাশে দু'টি গম্বুজাকৃতি ঝাউগাছ। বাড়ীর সামনে একখণ্ড বৃত্তাকার জমিতে দেশী-বিলিতী নানাজাতীয় ফুলের গাছ। তা'তে রঙ বেরঙের ফুল ফুটে নানা রঙের বিচিত্র সমাবেশ হ'য়েছে। গেট থেকে একটি সযত্ন-প্রস্তুত রাস্তা বেরিয়ে সেই চক্রাকার ভূমিখণ্ডকে বেষ্টন ক'রেছে। সিঁড়ির দু'পাশে ও বারান্দায় টবে কয়েকটা রজনীগন্ধার গাছ ও নানারকম পাম, ফার্ণ ও পাতাবাহারজাতীয় গাছ। সমস্ত বাগানটিই যেন গৃহস্বামীর সুরুচির সাক্ষ্য দিচ্ছে।

শরৎকাল। আশ্বিনের আরম্ভমাত্র। শীত এখনও পড়েনি। সকাল সন্ধ্যায় অল্প অল্প ঠাণ্ডা হাওয়া দিতে আরম্ভ হ'য়েছে মাত্র। মেঘমুক্ত নীল আকাশে জলশূন্য সাদা মেঘগুলি ভেসে বেড়াচ্ছে। আজ ভোরের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গিয়েছে। বাগানের সদ্যবর্ষণস্নাত গাছ-পালাগুলি সকাল বেলাকার অনতিপ্রখর সূর্য্যের আলোতে ঝলমল্ ক'রছে। সমস্ত প্রকৃতিতে যেন শরতের সোনার আলোর একটি স্নিগ্ধ রঙীন আমেজ লেগেছে আজ। বেশ একটি মিষ্টি ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। বাইরের আলো ঘরের উন্মুক্ত জানালা দিয়ে ডাক্তার গাঙ্গুলীর শয্যার উপরে এসে পড়েছে। চোখে আলো লাগ্‌তেই তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে এসে দাঁড়ালেন খোলা জানালার ধারে। সামনেই বাগান। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল তা'রই খানিকটা। মালী তখন আপন মনে বাগানে ফুল তুলছে—ঘরের ফুলদানীগুলো সাজাবে ব'লে। আজ সকালে বৃষ্টি হ'য়ে যাওয়াতে তা'র একটা কাজ কমে গিয়েছে—গাছে আজ আর তা'কে জল দিতে হ'বে না এবেলা। সে তাই ঠিক ক'রেছে বেশ সুন্দর ক'রে কয়েকটা ফুলের তোড়া তৈরী ক'রে তার 'সাহেবের' একবারে তাক লাগিয়ে দেবে। ডাক্তার গাঙ্গুলী অন্যমনস্ক হ'য়ে মালীর ফুলতোলা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। বেড়ার ধারে শিউলি গাছগুলির তলা একেবারে ফুলে ছেয়ে গিয়েছে। সাদা আস্তরণের মাঝে মাঝে কে যেন হলদে রঙের ছিটে ফেলে দিয়েছে। গাছের পাতায় পাতায় টলটল্ ক'রছে মুক্তোর মত জলবিন্দুগুলি। তা'র উপর রোদ পড়াতে সেগুলো জ্বলজ্বল্ ক'রছে। অদূরে একটি পুষ্পিত স্থলপদ্ম গাছ বিকশিত-কুসুম-স্মিত-বদনে বালারুণকে যেন তা'র সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে। মৃদু মন্দ প্রভাত সমীরে তা'র শাখায় শাখায় শিহরণ জেগে উঠেছে—পাতায় পাতায় তা'র কাঁপন ধ'রেছে। গাছের উপরে উড়ে বেড়াচ্ছে সুন্দর বাসন্তী রঙের একটি প্রজাপতি—মধুর লোভে আকুল হ'য়ে এক ফুল থেকে আর এক ফুলে উড়ে ব'সছে। ডাক্তার গাঙ্গুলী আনমনা

হ'য়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সেই জানালার ধারে—স্বপ্নাবিষ্টের মত। বাইরের প্রকৃতির এই অপরূপ বর্ণবিলাসচ্ছটা—তা'র দৃশ্য, গন্ধ, আলো—মনের মধ্যে তাঁর একটি মধুর স্বপ্নাবেশ জাগিয়ে তুল্‌ল। কাজের কথা যেন তিনি একবারে ভুলেই গেলেন। কানের মধ্যে যেন অনুরণিত হ'তে লাগ্‌ল অপূর্ব্ব মধুর একটি সুরের রেশ। "আমার রাত পোহাল শারদ প্রাতে"—এই অসমাপ্ত গানের পদটি থেকে থেকে তাঁর মনে আস্‌তে লাগ্‌ল। মালীর ফুল তোলা শেষ হ'য়ে গেল। সে একটা সাজি ভর্ত্তি ক'রে ফুল নিয়ে চল্‌ল বাড়ীর দিকে। পাশের ঘরে ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে আটটা বেজে গেল। ডাক্তার গাঙ্গুলী চম্‌কিয়ে ঘরের ভিতরে টিপয়ের উপরকার ছোট ঘড়িটির দিকে চাইলেন। অম্‌নি তাঁর খেয়াল হ'ল যে বেলা হ'য়েছে—অনেক কাজ আছে আজ তাঁর। ইতিপূর্ব্বেই বিছানায় শুয়ে শুয়েই তিনি সকালবেলাকার চা-খাওয়াটা সেরে নিয়েছেন। তাই এখন একবারে স্নান প্রসাধন সেরে প্রাতরাশের জন্যে প্রস্তুত হ'তে গেলেন।

ডাক্তার গাঙ্গুলী অবিবাহিত। বাড়ীতে তাঁর অন্য আত্মীয়স্বজনও কেউ নেই। আজ ন' বছর ধ'রে তিনি একাই এই সুদূর প্রবাসে পশ্চিমের একটি শহরে বাস ক'রছেন। তিনি এখানকার স্থানীয় সরকারী কলেজের একজন উচ্চ বেতনভোগী অধ্যাপক—ফিজিক্সের সিনিয়ার প্রফেসার। বিলেত থেকে লণ্ডন 'ডি-এস্‌সি' হ'য়ে এসে এখানেই তিনি প্রথম কাজ নেন। সেই থেকে আজ অবধি এখানেই অধ্যাপনা ক'র্‌ছেন। বয়স এখন তাঁর চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ হবে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ সুষ্ঠু দেহাবয়ব। রঙ গৌরবর্ণ—মুখের চেহারাও বেশ সুশ্রী। মোটের উপর তাঁকে সুপুরুষ বলা চলে। বিদ্যা, অর্থ, খ্যাতি, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, সম্মান—পৃথিবীতে মানুষ যা' কিছু কামনা করে—এগুলির কোনটা দিতেই বিধাতা তাঁকে কার্পণ্য করেন নি। এর মধ্যেই তাঁর পাণ্ডিত্যের ও অধ্যাপনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দেশে বিদেশে। বিজ্ঞান যেন তাঁর নেশা। দিনের বেশীভাগ সময় তাঁর কাটে কলেজের ল্যাবরেটরীতে ও পাঠাগারে। ল্যাবরেটরীতে ঢুকলে তাঁর আর স্নান আহারের কথাও মনে থাকে না। খানিকটা সময় তাঁর কাটে বাগানে। বাগানের প্রত্যেকটি গাছের সঙ্গেই যেন তাঁর গভীর স্নেহের সম্বন্ধ—প্রত্যেকটিকেই যেন তিনি চেনেন, প্রত্যেকটিরই ভাষা যেন তিনি বোঝেন। প্রতিদিন অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত তিনি পড়াশুনা করেন। সর্ব্বদাই যেন অবিরাম কাজের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে ডুবিয়ে রেখেছেন। তাঁর সেই নিরবকাশ কর্ম্মময় জীবনের নিশ্ছিদ্র অখণ্ডতার মধ্যে কোথাও যেন এতটুকু ফাঁক্ রাখ্‌তে দেননি তিনি। কি ছাত্রমহলে কি বন্ধুমহলে যশ আর তাঁর ধরে না। সকলেই তাঁকে ভালোবাসে, তিনি যেন সকলেরই আপনার জন। বুদ্ধিদীপ্ত সৌম্য সুন্দর মুখখানিতে তাঁর এমন একটি সরল, নিরহঙ্কার, অমায়িক ভাব যে যেই তাঁর সংস্পর্শে আসে সেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না হ'য়ে থাকৃতে পারেনা। অসাধারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব। তিনি বড় একটা কাউকে শাসন করতেন না। অথচ তাঁর কাছে কেউ কোনও অন্যায় করতে বা কাজে কোনও রকম শৈথিল্য প্রকাশ করতে সাহস পেতনা। তিনি যেন অজাতশত্রু। সকলেই অনুভব করত যে এই সদানন্দ প্রিয়দর্শন যুবকটির মধ্যে সত্যিকারের একটি মহৎ প্রাণ লুকিয়ে আছে। বাইরে থেকে দেখে তাঁকে খুব সাহেবীভাবাপন্ন লোক ব'লে মনে হ'ত। অথচ তাঁর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মধ্যে ও অকপট ব্যবহারে এমন একটি সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাব ছিল যে সকলেই অবাধে নিঃসঙ্কোচে তাঁর সঙ্গে মিশ্‌তে পার্‌ত। তাঁর ভৃত্যেরা তাঁর শিশুসুলভ সরলতায় ও মধুর সদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হ'ত। তারা সকলেই তাঁকে আপনার জনের মত ভালোবাস্‌ত। সাংসারিক সব বিষয়ে তাঁর এমন একটি অসহায় নির্ভরশীল ভাব ছিল যে ভৃত্যেরা তা'দের সাধ্যমত তাঁর সেবাযত্নে কখনও কোনও ত্রুটি ক'র্‌ত না। এমন একটি মানুষ কেন যে এতদিন পর্য্যন্ত বিবাহ করেননি এ প্রশ্ন হয়ত' তাঁর পরিচিতদের মধ্যে অনেকেরই মনে জাগ্‌ত। যে দেশে ছেলেদের পড়াশুনা শেষ হ'তে না হ'তেই তা'র বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হ'তে থাকে সেই দেশে এই অশেষগুণসম্পন্ন, সুদর্শন, কৃতী, ধনবান্, স্বাস্থ্যবান্ যুবকটি কেন যে এতটা বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রয়েছেন লোকে ভেবেই পেত না।

প্রথম প্রথম বন্ধুরা তাঁকে খুবই পীড়াপীড়ি ক'র্‌তেন বিয়ে ক'র্‌বার জন্যে। তাঁর বিয়ের অনেক ভাল ভাল সম্বন্ধও এসেছিল। আগে আগে প্রায়ই তার নিমন্ত্রণ হ'ত কোন না কোন বাঙ্গালী বাড়ীর পার্টিতে। সেখানে বিবাহযোগ্যা অনেক সুন্দরী, সুগায়িকা, সুশিক্ষিতা তরুণীর সঙ্গে তাঁর আলাপও করিয়ে দেওয়া হ'ত। কিন্তু দেখা গেল বিবাহ সম্বন্ধে তিনি একেবারেই উদাসীন। বন্ধুরা ক্রমে বুঝ্‌লেন যে তাঁর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা টল্‌বার নয়। তাঁরা শেষে অনুরোধ করা ছেড়ে দিলেন। বিবাহ সম্বন্ধে যে কোনও প্রচ্ছন্ন গভীর ব্যথা তাঁর অন্তরের নিভৃততলদেশে লুকিয়ে আছে তা'র সুস্পষ্ট আভাস পেয়েই হয়ত' বন্ধুরা শেষে এবিষয়ে একবারে নীরব হ'য়ে গিয়েছিলেন। কেউ বিয়ের কথা তুল্‌লেই ডাক্তার গাঙ্গুলী, এমন ক'রে হেসে উঠ্‌তেন যেন তিনি সেই হাসির আড়াল দিয়েই ঢাক্‌তে চাচ্ছেন তাঁর ব্যথাহত অন্তরের গভীর বেদনার উদ্গত অশ্রুকে। অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটিকে তাড়াতাড়ি চাপা দেবার জন্যে স্নিগ্ধ পরিহাসচ্ছলে তিনি হেসে বল্‌তেন—"আমার ত' বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে অনেকদিনই। জানেন না বুঝি? Science is my spouse—আর ক'বার বিয়ে ক'র্‌ব?" বন্ধুপত্নীরা সকলেই তাঁকে খুব স্নেহ ক'র্‌তেন। এই আপন-ভোলা সদাশিব মানুষটি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সকলের মনে—বিশেষ ক'রে মেয়েদের মনে—অনেকখানি স্থান অধিকার ক'রে নিতেন। প্রায়ই কোন না কোন বন্ধুর বাড়ীতে তাঁর আহারের নিমন্ত্রণ থাক্‌ত। বন্ধুপত্নীদের সকলেরই তাঁর নিঃসঙ্গ একাকীত্বের জন্যে তাঁর প্রতি একটা আন্তরিক সমবেদনা ছিল। তাঁদের সকলেরই মনে হয়ত' সন্দেহ হ'ত যে তাঁর অশ্রুত জীবনের সঙ্গে বোধ হয় কোনও একটি নিগূঢ় বেদনার ইতিহাস জড়িত আছে যা'র জন্যে তিনি আমরণ এই নিঃসঙ্গ কর্ম্মময় জীবনের কঠিন বৈরাগ্যকেই স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিয়েছেন এবং তাঁর সেই সঙ্কল্পের নিরতিশয় দৃঢ়তা থেকে বিচ্যুতি ঘট্‌বার কোন রকম সম্ভাবনাই নেই। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথম প্রথম কিছু না জেনে তাঁকে বিয়ে নিয়ে ঠাট্টা করতে গিয়ে বড় অপ্রতিভও হ'য়ে গিয়েছেন। একদিন ডাক্তার গাঙ্গুলীর এক সহপাঠী ও কলেজের অন্যতম অধ্যাপক সমরেশ মিত্রের বাড়ীতে তাঁর সান্ধ্যভোজের নিমন্ত্রণ ছিল। আহারের সময় খাওয়ার টেবিলে কথাবার্ত্তা হ'চ্ছিল। ডাক্তার গাঙ্গুলী হেসে বল্‌লেন—"বাড়ীতে বাবুর্চ্চির রান্না খেয়ে খেয়ে অরুচি ধ'রে যায়। মাঝে মাঝে বৌদি'র এখানে এসে তবু বেশ মুখ বদ্‌লানো যায়! সমরেশ, তোমার কপাল ভাল হে, এমন একটি স্ত্রীরত্ন পেয়েছ যিনি রন্ধনে একবারে সাক্ষাৎ দ্রৌপদী।" সমরেশের স্ত্রী সবিতা দেবী নিজের প্রশংসায় একটু লজ্জিত হ'য়ে পরিহাস ক'রে বল্‌লেন—"তা' আর আক্ষেপ থাকে কেন? আপনিও একটি দ্রৌপদী জোগাড় করুন না? তাহ'লে ত' আর বাবুর্চ্চির হাতের সুখাদ্য রান্না রোজ খেতে হয় না। এরকম সন্ন্যাসী হ'য়ে আর কতদিন জীবন কাটাবেন? এবারে 'ইতরে মিষ্টান্নাঃ' হ'ক্। আমরা একটু ভোজটোজ খাই। বলেন ত' ক'নে দেখা সুরু করি আমরা। না, কোথাও ঠিকঠাক আছে? কে সে ভাগ্যবতী? সাগরপারের কোনও তরুণী সুন্দরী নাকি? 'শুভস্য শীঘ্রম্।' শুভ কাজে দেরী ক'র্‌তে নেই। ক'রে ফেলুন 'শীগ্‌গির শীগ্‌গির।' ডাক্তার গাঙ্গুলীর মুখে ক্ষণেকের জন্যে ব্যথার একটি কালো ছায়া খেলে গেল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তিনি নিজেকে সাম্‌লে নিলেন। হৃদয়ের ঘনবেদনার বাষ্পটিকে একটি স্বচ্ছ-হাসির তারল্যে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা ক'রে তিনি হেসে উত্তর দিলেন—"সাগরপারের কোনও তরুণী সুন্দরীর আর এই 'কালা আদ্‌মী'কে পছন্দ হ'তে হয় না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বৌদি। বিয়ের বয়স কি আর আমার আছে?······বাঃ, আপনার দইবড়াটি ত' খাসা হ'য়েছে। আপনি এ বিদ্যাটি কোথায় শিখ্‌লেন বৌদি? এমনি একটি অন্নপূর্ণার মত বৌদি পাওয়া মন্দ নয়। আপনার এই পেটুক দেওরটির আপনি দিন দিন লোভ বাড়িয়ে দিচ্ছেন কিন্তু।" ব'লে ডাক্তার গাঙ্গুলী অকারণ 'হা' 'হা' ক'রে হেসে উঠ্‌লেন। তাঁর সেই হাসি যেন কান্নার চেয়েও করুণ। সবিতা বুঝ্‌লেন তিনি না জেনে অসাবধানে এই সদা-প্রফুল্ল মানুষটির অন্তরের গোপন ব্যথার স্থানে হাত দিয়ে ফেলেছেন। তারপর আর কোনও দিন তিনি এ প্রসঙ্গ তোলেন নি।

আজ সকালে ডাক্তার গাঙ্গুলী একবারে কলেজে যাবার পোষাক প'রে এসে ঢুক্‌লেন তাঁর পড়্‌বার ঘরে। তখনও প্রাতরাশের কিছু দেরী ছিল। ঘরটি চারিদিকে কাঁচের আলমারীতে সব মোটা মোটা বই সাজানো। শুধু বিজ্ঞানের বইই নয়, অন্যান্য অনেক বিষয়ের ও প্রাচীন ও আধুনিক বই রয়েছে। সমস্ত ঘরটিই যেন গৃহস্বামীর গভীর জ্ঞানানুরাগের পরিচয় দিচ্ছে। মাঝখানে একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপরে কয়েকটা বই, খানকতক ইংরেজি বাংলা মাসিক পত্রিকা ও কতগুলি লিখ্‌বার সরঞ্জাম। একটি 'পিনকুশানে' কতগুলি আলপিন বিঁধানো। একটি 'কলিংবেল' ও 'পেপার ওয়েট্'। টেবিলের একপাশে একটি কাগজপত্র রাখ্‌বার ট্রে। নীচে একটি 'ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেট'। টেবিলের দু'পাশে দু'টি চেয়ার। ঘরের কোণে আরও দু'খানা চেয়ার। দরকার হ'লে এগুলি কখনও কখনও ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ঘরটিতে অন্য আসবাবের বাহুল্য নেই। ডাক্তার গাঙ্গুলী এসে টেবিলের সাম্‌নে একটি চেয়ারে বসে পড়্‌লেন। একখানা ইংরেজি মাসিক পত্রিকা নিয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লেন। ঘড়ির দিকে একবার চাইলেন—দেখ্‌লেন ডাক আস্‌বার প্রায় সময় হ'য়ে এসেছে। আজ ছুটির দিন। কি একটা পর্ব্ব উপলক্ষ্যে কলেজ বন্ধ। তাই আজ কলেজে না গেলেও চলে। কিন্তু ডাক্তার গাঙ্গুলীর ছুটির দিনেও ছুটি নেই। কিছুদিন ধ'রে একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিয়ে তিনি ভয়ানক ব্যস্ত। তাই আজ প্রাতরাশের পরেই তিনি কলেজের ল্যাবরেটরীতে গিয়ে কাজ ক'র্‌বেন ঠিক্ করেছেন। অন্যদিন তাঁকে অধ্যাপনার কাজেও ত' খানিকটা সময় দিতে হয়। কাজেই ছুটির দিনেই তাঁর গবেষণা কাজের সুবিধা হয় বেশী।···খানিকটা পড়ে বইখানা হাতে নিয়েই ডাক্তার গাঙ্গুলী কেমন যেন উন্মনা হ'য়ে জানালার দিকে তাকালেন। সবুজ পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে নীল আকাশের একটুকরো দেখা যাচ্ছিল। ঐ সুদূর আকাশের অসীম শূন্যতার দিকে চেয়ে তাঁর মনটা আজ কেমন যেন উদাস হ'য়ে গেল। হঠাৎ কি একটা অজ্ঞাত ব্যথায় বুকের ভিতরটা তাঁর টন্‌টন্ ক'রে উঠ্‌ল। তাঁর নিঃসঙ্গ কর্ম্মব্যস্ত জীবনের গভীর শূন্যতা আজ তাঁর মনের মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয় নৈরাশ্যানুভূতি জাগিয়ে তুল্‌ল। তাঁর মনে হ'ল ঐ নীলাকাশের সীমাহীন উদাসীনতার সঙ্গে তাঁর আনন্দহীন সঙ্গীহীন জীবনের শূন্যতার কোন একটি নিবিড় যোগ আছে। তাঁর অশান্ত মনটা তাঁর প্রাণের মধ্যে একটি ঘনবিষাদের আবর্ত্ত সৃষ্টি ক'রে অসহায়-ভাবে তা'রই মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগ্‌ল। নিজের অজ্ঞাতেই একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি হাতের বইটার খোলা পাতার উপরে দৃষ্টিনিবদ্ধ ক'র্‌লেন। স্বভাবতঃই তিনি খুব ধৈর্য্যশীল—অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতির লোক তিনি। জীবনের চরম দুঃখের দিনে যখন অন্তরে তাঁর ব্যথার তুমুল ঝড় বয়েছে তখনও বাইরে তাঁর কোন চাঞ্চল্যই, কোন অস্থিরতাই দেখা যায়নি। তাঁর সেই সদা-প্রফুল্ল মুখের অম্লান, প্রসন্ন হাসির অন্তরালে তাঁর গভীর অন্তরে যে ব্যথার সমুদ্র লুকিয়ে থাকৃত সংসারে খুব কম লোকেই তার খবর জান্‌তে পেত। নিজের দুঃখকে জয় কর্‌বার জন্যে তাঁর সেই আপ্রাণ সাধনার ইতিহাস তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও জান্‌তেন না।···বাইরে বেয়ারার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—"ডাক, হুজুর"। ডাক্তার গাঙ্গুলী চম্‌কিয়ে উঠ্‌লেন—বল্‌লেন—"লে আও"। বেয়ারা ঘরে ঢুকে বিনীত সেলাম ক'রে কতগুলো চিঠি টেবিলের উপর রেখে গেল। হাতে নিয়ে চিঠিগুলি নাড়াচাড়া কর্‌তে কর্‌তে হঠাৎ ডাক্তার গাঙ্গুলীর চোখ পড়্‌ল মোটা একটা খামের উপরে। মেয়েলি হাতের লেখায় তাঁর নাম ও ঠিকানা লেখা। লেখাটি দেখেই তিনি চম্‌কিয়ে উঠ্‌লেন। সেটি তাঁর অতি পরিচিত বলে মনে হ'ল। 'না হ'তেই পারে না এ তা'র লেখা। সে আবার এতকাল পরে হঠাৎ কী প্রয়োজনে আমাকে চিঠি লিখ্‌তে যাবে?'—এই ভেবে ডাক্তার গাঙ্গুলী অধীর হস্তে খামটি ছিঁড়ে ফেলে তাড়াতাড়ি নামটি দেখ্‌লেন। সত্যিই ত', তাঁর সন্দেহই ঠিক। এ লেখা কি ভুল কর্‌বার? একদিন যে এ লেখাটি বড় আদরের ছিল তাঁর! একবার মনে হ'ল চিঠিখানা না পড়েই ছিঁড়ে ফেলেন। আজ এই সুদীর্ঘ বারো বছর ধ'রে যাকে ভুল্‌বার ঐকান্তিক সাধনা চলেছে তা'কেই আবার আজ কেন বৃথা স্মৃতি-পথে টেনে আনা?

তা'র. আজ এতদিন পরে তাঁকে আবার কী বল্‌বারই না থাকতে পারে? সব বলাই ত' ফুরিয়ে গিয়েছে একদিনের ছোট্ট একটি 'না'র সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর সাধনার মূর্ত্তিমান্ বিঘ্ন সেই চিঠিখানা পড়্‌বেন কি পড়্‌বেন না তিনি ভেবে উঠ্‌তে পার্‌ছিলেন না। খোলা চিঠিখানা হাতে নিয়েই তিনি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। বহু পুরাণো স্মৃতি তাঁর আলোড়িত হ'য়ে উঠ্‌ল আজ। স্মৃতিপটে একটার পর একটা ছবি ভেসে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। স্মৃতির অক্ষয় ভাণ্ডারে সঞ্চিত সেই দিনগুলি জীবন্ত হ'য়ে উঠ্‌ল আজ এত বছর পরে—মনে হ'ল এসব যেন সেদিনকার ঘটনা। দিন চলে যায় একটির পর একটি—তা'রা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যায়। বিগত দিনটি আর ফেরেনা। কিন্তু অতীতের বিশেষ বিশেষ দিনগুলি মানুষের স্মৃতির কোঠায় ঢুকে কালের বিস্মরণ থেকে নিজেদের বাঁচায়। স্মৃতি বর্ত্তমান ও অতীতের মধ্যে অলক্ষ্য একটি যোগসূত্র বেঁধে দেয়।···আজকের এই পত্রলেখিকাও ত' তাঁর কাছে একটি স্মৃতিমাত্র। সেই স্মৃতির মাধুর্য্য যতখানি জ্বালাও ততখানি।···তবু চিঠিখানা না পড়ে ছিঁড়তে কিছুতেই তাঁর মন সরল না। সম্বন্ধ ত বহুদিনই তাঁদের ঘুচে গিয়েছে—নিজের হাতেই ঘুচিয়েছে 'সে'। এত বছরকার নীরবতার পরে তাঁকে আজ কী বল্‌তে চায় 'সে'? সমাজ আজ তাঁদের দু'জনের মধ্যে নিঃসম্পর্ক দূরত্বের এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে দিয়েছে। মনে পড়ে গেল তাঁর বারো বছর আগেকার একটি দিনের কথা—যেদিন তাঁর প্রথম যৌবনের স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ সুখের আশার দলগুলি সব ধুলিসাৎ হ'য়ে গিয়েছিল। সেদিনটি আজও তাঁর হৃদয়ে অমলিন স্পষ্টতায় আঁকা রয়েছে। সেইদিন থেকেই সুরু হ'য়েছে তাঁর দুঃখের বিরুদ্ধে অন্তহীন অভিযান। সেদিন যেন জগতের সব আলো, সব আনন্দ, সব সুখই তাঁর কাছে নিষ্প্রভ, বেদনাম্লান হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিনও সেই দুর্ব্বিষহ দুঃখের চাপে তাঁর ব্যথাহত চিত্ত একেবারে দলিত, নিষ্পেষিত হ'য়ে যেতে চায়নি। সেদিনও সে তা'র নিজের মধ্যে থেকেই দুঃখ জয় ক'র্‌বার শক্তি অর্জ্জন করতে প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু আজও কি ভুল্‌তে পেরেছেন তিনি সেই ব্যথা? সময়ের সান্ত্বনার প্রলেপে আজ তা'র দাহ ততখানি না থাকলেও তা'র গভীরতা ঠিক ততখানিই আছে। যত অন্তর থেকে মুছে ফেল্‌তে চেয়েছেন তা'কে ততই দৃঢ় হ'য়েছে তা'র মূল তাঁর অন্তরের মধ্যে।··· আজ বুঝ্‌লেন যে নিজের অজ্ঞাতেই তিনি এতদিন ধ'রে সেই ব্যথাকে লালন ক'রে এসেছেন অন্তরের অন্তঃস্থলে—অন্তঃসলিলা ফল্গু যেমন ক'রে তা'র বুকের মধ্যে জলের ধারাটি লুকিয়ে রাখে। চিঠিখানি পেয়ে আজ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যেন খুলে গেল এক নূতন দিকে। অশান্ত হৃদয় আজ যেন তাঁর আর বাধা মান্‌তে চায় না—এতদিনকার ধৈর্য্যের ও সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে আজ সে উদ্বেল হ'য়ে উঠ্‌তে চায়। মুহূর্ত্তে নিজেকে সাম্‌লিয়ে নিয়ে ডাক্তার গাঙ্গুলী আবেগ কম্পিত হস্তে চিঠিখানা ধ'রে পড়্‌তে লাগ্‌লেন—

## ২

দার্জ্জিলিং
অক্‌ল্যাণ্ড রোড,
২৫শে ভাদ্র।

শ্রীচরণেষু,

অজয়দা', আজ সুদীর্ঘ বারো বছর পরে তোমায় এই চিঠি লিখ্‌ছি। জানিনা এ চিঠি লিখ্‌বার আমার আজ অধিকার আছে কিনা। অনেকদিন থেকেই ভাব্‌ছি তোমাকে চিঠি লিখ্‌বার কথা। কিন্তু মনে বার বার এই দ্বিধা উপস্থিত হ'য়েছে ব'লেই এতদিন সঙ্কল্প কাজে পরিণত হ'তে পারেনি। কত চিঠি লিখে শেষে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি—পোষ্ট করিনি। কত অসমাপ্ত চিঠি চোখের জলে ভিজে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু আজ আমি মৃত্যু-পথ-যাত্রিনী। আমার এ চিঠি যখন তুমি পাবে তখন হয় ত' আমি আর ইহজগতে থাকব না। আমার জীবন-প্রদীপ নিভে আস্‌ছে ধীরে ধীরে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি। তাই আজ সব দ্বিধা সঙ্কোচ মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এই চিঠি তোমায় লিখ্‌তে বসেছি। আর হয়ত সময় পাব না। ক্রমশঃ বেশী দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্‌ছি।···মনের সঙ্গে আজ আমার একটা বোঝাপড়া ক'র্‌বার সময় এসেছে। আজ এই

বারো বছর ধ'রে মনের মধ্যে যে আগুন জলেছে অহরহ, রাবণের চিতার মত, জানিনা তা' মরণেও নিভ্‌বে কিনা। কিন্তু আজ যদি আমার সব কথা তোমায় ব'লে তোমার কাছ থেকে ক্ষমা ভিক্ষে ক'রে যেতে পারি হয়ত' কতকটা শান্তিতে মর্‌তে পার্‌ব। এই আশাতেই মর্‌বার আগে তোমায় এই চিঠিখানা লিখে যাচ্ছি। আমি নিশ্চয়ই জানি আমার সব কথা শুন্‌লে আমায় তুমি ক্ষমা না ক'রে থাক্‌তে পার্‌বে না—যত বড় অপরাধই তোমার কাছে ক'রে থাকি আমি। তোমার উপর আমার এই অচল অটুট বিশ্বাস আছে ব'লেই আমার পক্ষে এতকাল বেঁচে থাকা সম্ভব হ'য়েছিল, তোমাকে হারাণোর পরেও। মনে ক'রো না যে একটা নভেলিয়ানা ক'র্‌বার লোভে তোমায় এ চিঠিখানা লিখে গেলাম। আজ এই বারো বছর ধ'রে বুকের ভিতর এই আগুন নিয়ে জলেছি তিলে তিলে পলে পলে। তোমার জীবনটাকেও নষ্ট ক'রেছি, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও পুড়িয়ে মেরেছি। একথা তুমি বিশ্বাস ক'র্‌তে পার্‌বে কি আজ, অজয়দা, আমায় তুমি যতখানি নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, চঞ্চলমতি মনে ক'রেছিলে আমি হয়ত' ততখানি নই? সেদিন আমার বাবা তোমার বাবার কথায় নিজেকে অপমানিত বোধ ক'রে আমাদের সম্বন্ধ ভেঙে দিতে সঙ্কল্প ক'র্‌লেন. সেদিনকার সেই নিদারুণ আঘাতের কথা আজও ভুল্‌তে পারিনি। আজও দুঃস্বপ্নের মত মনে পড়ে সেদিনটা।···ছোটবেলা থেকেই বালীগঞ্জে পাশাপাশি বাড়ীতে আমরা দু'টিতে প্রায় একসঙ্গেই মানুষ হ'য়েছিলাম। অতি শৈশবেই আমি মাতৃহীন হ'য়েছিলাম। কিন্তু মাসিমা'র (তোমার মা'র) নিবিড় স্নেহের মধ্যে থেকে মা'র অভাব প্রায় বুঝিই নি। তাঁর মধ্যেই যেন আমার হারাণো মাকে আবার ফিরে পেয়েছিলাম আমি। কিন্তু আমার মত হতভাগিনীর কপালে সে সুখও সইল না বেশীদিন। মাসিমা যেদিন মারা যান সেদিনকার কথা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন আমার অন্তরেও তোমার চেয়ে কম ব্যথা লাগেনি বোধ হয়। সেদিন আমি দ্বিতীয়বার মাতৃহীন হলাম। নিজের মা'কে ত' মনে পড়েনা—তাঁকে হারানোর ব্যথা বুঝ্‌বার বয়সও হয় নি তিনি যখন মারা যান। তারপর যে দিন আমার জীবনের সুখস্বপ্ন ভেঙে গেল সে'দিনও মাসিমা'র স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তিখানি মনে ক'রে বারবার চোখের জল ফেলেছি, লুকিয়ে লুকিয়ে। সেদিন শুধু বারবার এই কথাই মনে হ'চ্ছিল যে তিনি আজ বেঁচে থাক্‌লে হয়ত' শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা এতদূর গড়াত' না—তিনি হয় ত' এ বিবাদের মিলন-সেতু হ'তে পার্‌তেন। আজ তোমায় চিঠি লিখ্‌তে গিয়ে কত কথাই না মনে আস্‌ছে! বারবার খেই হারিয়ে ফেল্‌ছি লেখার। কত অবান্তর কথাই লিখে ফেল্‌ছি হয়ত'।······তারপরে কবে যে আমাদের বাল্যের সখ্য কৈশোরের নবরসানুভূতির মধ্যে দিয়ে যৌবনের প্রেমে পরিণত হল বুঝ্‌তেই পারিনি। আমরা দু'জ'নে যেন পরস্পরের জন্যেই সৃষ্ট হ'য়েছিলাম। আমাদের সম্বন্ধটা সকলেই যেন স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত ধ'রে নিয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই তুমি ছিলে সব বিষয়ে আমার আদর্শ। তুমি আগে ছিলে আমার খেলার সাথী, পরে হ'লে আমার আরাধ্য দেবতা, আমার শিক্ষাগুরু। যে বছর আমি ম্যাট্রিক দিলাম তোমার সে কী উৎসাহ আমাকে পড়ানোর! বাবার ইচ্ছা ছিল আমি ম্যাট্রিক পাশ কর্‌লেই আমাদের বিয়ে হয়। তুমিও সে বছরে এম-এস্‌-সি পাশ ক'র্‌লে। ঠিক ছিল আমাদের বিয়ের পরেই তুমি বিলেত যাবে।···তারপর সামান্য একটু মনোমালিন্য নিয়ে আরম্ভ হ'ল তোমার বাবার সঙ্গে আমার বাবার ঝগড়া। খড়ের আগুন ক্রমে বাড়্‌তে বাড়্‌তে দাবানলে পরিণত হ'ল। তোমার বাবা রেগে বল্‌লেন তাঁর ছেলের সঙ্গে আমার বাবার মত ইতর লোকের মেয়ের বিয়ে কখনই দেবেন না তিনি—তাঁর ছেলেকে "পাকড়াও" ক'র্‌বার জন্যে বাবা তাঁর নিজের মেয়েকে "লেলিয়ে" দিয়েছেন ইত্যাদি। শুনে বাবারও রাগ চড়ে গেল। তিনিও প্রতিজ্ঞা ক'রে বস্‌লেন যে তাঁর মেয়েকে যদি চিরকুমারী থাক্‌তে হয় ত' তা'ও স্বীকার কিন্তু তাঁকে যিনি এমন ক'রে অপমান ক'রেছেন তাঁর ছেলের সঙ্গে কখনও তিনি মেয়ের বিয়ে দেবেন না। "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হ'ল বেচারা উলুখড়ের প্রাণ গেল।" তাই হ'ল আর কি আমাদের দশা! তোমার সঙ্গে মেলামেশা করা বারণ হ'য়ে

গেল আমার। বাবার সেই কঠোর শাসনের নিগড় ভাঙ্গতে পারি এমন সাহস বা সাধ্য আমার ছিলনা তখন। যদিও বুকটা ফেটে যেতে লাগল, তবু মুখ ফুটে কোনও কথা বল্‌তে পার্‌লাম না বাবার কথার উপরে। আমার সেই নীরব দুঃখের খবর সেদিন জান্‌লেন শুধু আমার অন্তর্যামীই। আমাদের দেখাশুনাও প্রায় একরকম বন্ধ হ'য়ে গেল। তোমার বাবার দিক থেকেও হয়ত' তোমার উপরে ঐরকম কোনও আদেশ হ'য়ে থাক্‌বে।··· মনে আছে যেদিন তুমি লজ্জানম্রভাবে বাবার কাছে এসে আমাকে বিবাহ ক'র্‌বার সলজ্জ প্রস্তাব জানিয়েছিলে। আমি পাশের ঘর থেকে সবই শুনেছিলাম সেদিন তোমাদের কথাবার্ত্তা। তুমি বল্‌লে—"অশোকার এখন বিয়ে দেবেন না আপনি। ও আরও ক'বছর পড়াশুনা করুক্‌। এই ক'টা বছর অপেক্ষা করুন্‌। আমি বিলেত থেকে পাশ ক'রে ফিরে আসি। চাকরী পেলেই আমি বিয়ে ক'রব। তখন ও আমি স্বাধীন হব। বাবার অমতে তখন কিছু আস্‌বে যাবে না। আর বাবাও অশোকাকে এককালে খুবই স্নেহ ক'র্‌তেন, ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছেন ত'। শেষ পর্য্যন্ত ছেলে-বউকে তিনি ফেল্‌তে পার্‌বেন না কখনই।" কিন্তু বাবার মন তখন একবারে বেঁকে বসেছে। আর কারও মনের দিকে তাকাবার তাঁর আর সময় ছিলনা। তিনি এ প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী হ'লেন না। তাঁর প্রতিজ্ঞা অটল রইল শেষ পর্য্যন্ত। তুমিও তেম্‌নি অভিমানী ছেলে। বারবার অনুরোধ ক'র্‌বার ছেলে নও তুমি—তা' নিজেকে যত দুঃখই পেতে হ'ক্‌ সেজন্যে। তারপরে আমাকে একদিন একা পেয়ে আমার নিজের মুখ থেকে তুমি শুন্‌তে চেয়েছিলে আমার মতটা। তখনও আমি বালিকামাত্র। নিজের মন ভাল ক'রে বুঝতে শিখিনি। মনে পড়ে গেল বাবার বেদনাতুর ম্লান মুখখানি—অপমানের বজ্রাঘাতে ক্লিষ্ট। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। আমাব মা যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স এমন কিছু বেশী ছিলনা। কিন্তু মাতৃহীন মেয়ের মুখ চেয়ে বাবা আর দ্বিতীয়বার বিয়ে ক'রবার কথা মনেও আনেননি। আমার বাবাই হ'লেন একাধারে আমার মা এবং বাবা। সেই একান্ত স্নেহশীল পিতার কাছে এতখানি অকৃতজ্ঞ হ'বার কথা আমি তাই সেদিন ভাব্‌তেই পার্‌লাম না—নিজের যত দুঃখই থাক্‌ কপালে। বালিকাসুলভ লজ্জায় বেশী কথা বলতেও পার্‌লাম না—তোমার ব্যাকুল প্রশ্নের জবাব দিলাম তাই ছোট্ট একটি 'না' ব'লে। আমায় তুমি সেদিন ভুল বুঝ্‌লে নিশ্চয়ই। আমিও সেদিন তোমাকে কোনও কথা বল্‌বার বোঝাবার মত ভাষা খুঁজে পেলাম না। তোমার সেদিনকার সর্ব্বস্বহারা বেদনাহত মুখটি আজ এখনও আমার চোখে ভাস্‌ছে। চোখের সাম্‌নে এখনও যেন দেখ্‌তে পাচ্ছি সেই দৃশ্য, সেই ছবি। যাক্‌। সেদিন তোমাকে হারিয়ে আমার যে মনোভাব হ'য়েছিল তা' আর নাই বা বর্ণনা ক'র্‌লাম।···সেদিন বাবার দুঃখের কথাই মনে হ'য়েছিল—নিজের অন্তরের দিকে তাকাবার সময় পাইনি। একটা নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের গরিমা ও অভিমানও বোধ হয় সেদিন আমার মনের কোণে লুকিয়েছিল, নিজের অজ্ঞাতে। তাই নিজের জীবনকে অমন ক'রে বলি দেওয়াটা আমার কাছে তখন সহজসাধ্য ব'লে মনে হয়েছিল। তখনও বুঝিনি নিজের ক্ষতির পরিমাণটা। যত দিন যেতে লাগ্‌ল ব্যাপারটা ততই তলিয়ে বুঝ্‌তে লাগ্‌লাম। প্রাণের ভিতরটা অহরহ 'হু' 'হু' করতে থাকত। তারপর একদিন শুন্‌লাম তুমি বিলেত চলে যাচ্ছ। যাবার আগে তোমার সঙ্গে একবার দেখাও হ'ল না। কি জানি কেন মনে হ'ল তোমার সঙ্গে এরপরে এজীবনে আর কখনও দেখাও হ'বে না। ঠিক হ'লও তাই।···বাবা ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে সেদিন আমার মনের দিকে তাকাবার অবসর পাননি। কিন্তু যত দিন যাচ্ছিল ক্রমেই বোধ হয় তিনি তাঁর নিজের ভুল বুঝ্‌তে পার্‌ছিলেন। তাই বোধহয় আমাকে আরও নিবিড় স্নেহের বাঁধনে বাঁধতে চাচ্ছিলেন তিনি। যতক্ষণ বাড়ীতে থাক্‌তেন আমাকে সর্ব্বদাই কাছে কাছে রাখ্‌তেন, নিজের স্নেহচ্ছায়ায়। তিনি যেন আমাকে নিয়ত তাঁ'র স্নেহের পক্ষপুটে ঢেকে রেখে আমার সব ব্যথা ভুলিয়ে দিতে চান। তাঁর সমস্ত হৃদয়-নিঙড়ানো সেই অজস্র স্নেহধারা তাঁর একমাত্র সন্তানের উপর ঢেলে দিয়েই বোধহয় তিনি নিজের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে

চাচ্ছিলেন। সন্তানের যে ক্ষতি তিনি অদৃষ্ট-দোষে ক'রে ফেলেছেন সেটা যেন কতকটা পূরণ ক'র্‌তে চান নিজ অন্তরের স্নেহ-ভাণ্ডার উজাড় ক'রে দিয়ে।...বাবা বোধ হয় ভেবেছিলেন যে সময়ে আমি সবই ভুল্‌তে পার্‌ব। তোমার বিলেত যাওয়ার পর থেকেই তিনি আমার জন্যে পাত্র খুঁজ্‌তে লাগ্‌লেন। একথা জানতে আমার আর বাকী রইল না। একদিন আমাকে বিয়ের কথা বলাতে আমি আর অশ্রু সংবরণ ক'র্‌তে পার্‌লাম না—কেঁদে বল্‌লাম—"বাবা, আমার তুমি বিয়ে দিও না। বিয়ে আমি ক'র্‌ব না। লেখাপড়া ক'র্‌ছি—নিজের পেট নিজেই চালিয়ে নিতে পার্‌ব বেশ। আমার জন্যে তুমি ভেবোনা। আমি চলে গেলে তোমাকেই বা কে দেখ্‌বে? তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পার্‌ব না।" স্নেহময় পিতার স্নেহ-দৃষ্টির কাছে তাঁর একমাত্র সন্তানের গোপন ব্যথাটি সেদিন প্রকাশ পেয়েছিল কিনা জানিনা। বাবা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন—পরে আস্তে আস্তে আমার পিঠে গভীর স্নেহে হাত বুলাতে বুলাতে বল্‌লেন—"সে কি হয় মা? আমি আমার নিজের সুখের জন্যে তোকে আমার কাছে রেখে দেব চিরদিন? বুড়ো হ'চ্ছি। আর ক'দিনই বা বাঁচ্‌ব বল্‌? মরবার আগে তোকে আমি সংসারী দেখে যেতে চাই যে, মা। হাজার হ'ক, মেয়েমানুষের একটা আশ্রয় চাই ত'। তোর বড় ভাইটিও যদি আজ বেঁচে থাক্‌ত তাহ'লে আর তোর বিয়ে দিতে চাইতাম না। তোকে কার আশ্রয়ে রেখে আমি চোখ বুঁজ্‌ব, মা? অন্ততঃ আমার মুখের দিকে চেয়েও তুই বিয়েতে মত দে। তোর একটা ভাল বিয়ে দিতে পার্‌লেই আমি নিশ্চিন্ত হই। তোর মা আজ বেঁচে নেই, মা। তিনি থাক্‌লে আমার ভাবনার খানিকটা অংশ তিনি নিতেন। এমন ক'রে সব দায়িত্বই আমার উপরে পড়্‌ত না তাহ'লে আজ।" ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে বাবার গলার স্বর ভারী হয়ে এল। বুঝ্‌লাম বাবার মত বদ্‌লাবার নয়। তিনি বোধ হয় ভাব্‌লেন বিয়ের পরে আমি আস্তে আস্তে পূর্ব্বস্মৃতি ভুলে যেতে পার্‌ব। এবারেও বাবার ইচ্ছা জয়ী হ'ল। যদিও বুক ভেঙে যেতে লাগ্‌ল তবু বিয়ে ক'র্‌তে রাজী হ'লাম বাবার মুখ চেয়ে। ভাব্‌লাম বাবা যদি সুখী হন, নিশ্চিন্ত হন, তবে আমার এ'তে আপত্তি ক'র্‌বার কী অধিকার আছে। আমার ইহজীবনের সমস্ত সুখের আশায় জলাঞ্জলি ত' দিয়েছি আগেই। প্রাণপণে নিজের মনটাকে বাঁধ্‌তে চেষ্টা ক'র্‌তে লাগ্‌লাম। যথাসময়ে দিনক্ষণ দেখে শুভ লগ্নে বিয়ের অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হ'য়ে গেল। কিন্তু সেদিনও সারাক্ষণ তোমার সেই শেষদিনের বেদনাক্লিষ্ট মুখটি মনে পড়েছে। নিজের অন্তরে বারবার বিবেকদংশন অনুভব ক'র্‌ছিলাম—কে যেন আমার অন্তরের মধ্যে বল্‌ছিল—"পিতার প্রতি কর্ত্তব্য ক'র্‌তে গিয়ে নিজের প্রতি ক'র্‌ছ ঘোর অবিচার, আর আর একজনের প্রতি ক'র্‌ছ নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা।" জানিনা আমার বিয়ের খবরটা সাগরপারে তোমার কাছে পৌঁছেছিল কিনা।...বিয়ের মন্ত্র কিছুই আমার কানে যায়নি। শুভদৃষ্টির সময় চোখ তুল্‌তে পার্‌লাম না কিছুতেই। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠ্‌ল, আমি পড়ে গেলাম এইটুকু মনে আছে। তারপর কি হ'ল, কতক্ষণ আমি সেভাবে ছিলাম কিছুই জানিনা। যখন জ্ঞান হ'ল দেখ্‌লাম বাবা ব্যস্ত হ'য়ে আমার মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে জলের ঝাপটা দিচ্ছেন আমার মুখে। কে যেন আমার মাথার কাছে ব'সে আস্তে আস্তে আমার মাথায় বাতাস ক'র্‌ছে।...আত্মীয় বন্ধু যারা বিয়েতে এসেছিল সকলেই বল্‌ল—"অশোকার আমাদের কপাল ভাল। এমন রাজপুত্তুরের মত বর পেল।" আমার কপাল ভাল কি মন্দ সে বিচারের ভার রইল নির্ম্মম বিধাতার উপরে। অত দুঃখেও কথাটা শুনে আমার হাসি পেয়েছিল সেদিন।...তারপর চিরদিনের আবাস পিতৃগৃহ ছেড়ে গেলাম স্বামীগৃহে। আমার স্বামী রংপুরে ডাক্তারি করেন। বিয়ের পরে ক'দিন শ্বশুর বাড়ীতে থেকে পরে সেখানেই গেলাম। বিয়ের রাত্রেই সংকল্প ক'রেছিলাম যে স্বামীকে ভালবাস্‌তে না পার্‌লেও ভাল স্ত্রী হ'তে চেষ্টা ক'রব—তাঁকে সেবাযত্ন ক'র্‌তে কোনদিনই ত্রুটি ক'র্‌ব না সাধ্যমত। জানিনা তাঁকে সুখী ক'র্‌তে পেরেছি কিনা। তবে এটুকু বল্‌তে পারি যে ইচ্ছা ক'রে তাঁর মনে দুঃখ দিতে চাইনি কখনও আমার জ্ঞাতসারে। এ'ক' বছর ধ'রে আমাকে প্রাণপণে

কী অভিনয়টাই যে ক'রতে হ'য়েছে বলতে পারিনা। যাক্ আমার বিবাহিত জীবনের একটি সুদীর্ঘ বৈচিত্র্যহীন কাহিনী লিখ্‌বার সময় বা ইচ্ছা আমার নেই। আমি সুখী কি অসুখী সে বিচার এ'র পরে ক'রো তুমি। তবে এটুকু বলতে পারি যে স্বামীর কাছ থেকে অযাচিত অপর্য্যাপ্ত ভালোবাসায় আমি বঞ্চিত হইনি। তাঁর সেই অকুণ্ঠিত দানের আমি মোটেই যোগ্য নই—তা'র মর্য্যাদাও আমি রাখ্‌তে পারিনি। এটিই আমার জ্বালা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আমার স্বামী যদি দুশ্চরিত্র হ'তেন বা আমার প্রতি তিনি যদি উদাসীন হতেন তাহ'লে তাঁকে ভালবাস্‌তে না পারার দুঃখ আমার বুকে এম্‌নি ক'রে বাজ্‌ত না—তাহ'লে হয়ত' আমি মনের মধ্যে দিনরাত এম্‌নি ক'রে আত্মগ্লানির বৃশ্চিকজ্বালা অনুভব করতাম না। জানিনা তিনি আমার মনের কথা জানেন কিনা। কিন্তু কোনদিনই কোন প্রশ্নই তিনি করেননি আমায়। তাঁর কাছে এজন্যেও আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তাঁকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে শ্রদ্ধাভক্তির চেয়ে আরও বেশী কিছু চায় যা' আমি তাঁকে দিতে পারিনি। আমার বিয়ের পরে বাবাকে যখন আমি প্রণাম ক'রলাম তিনি আশীর্ব্বাদ করলেন—"সাবিত্রী সমান হও মা।" এর চেয়ে বড় আশীর্ব্বাণী বোধহয় তাঁর মুখ থেকে সেদিন বেরুল না আমার জন্যে। আমার মাঝে মাঝে মনে পড়ে আমাদের দেশের সতীনারীদের কথা। স্বামীকে "কায়েন মনসা বাচা" ভালোবাস্‌তে হবে, ভক্তি করতে হবে—এই আমাদের শাস্ত্রের বিধান। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা বোধহয় মানুষের মনের খবর রাখ্‌তেন না। যাক্।... বাবার স্নেহের অন্তর্দৃষ্টির কাছে ধরা প'ড়ে গিয়েছিল আমার মনের গোপন ব্যথা—যা'কে আমি প্রাণপণে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখ্‌তে চেয়েছি সর্ব্বদা। তাই তিনি বড়ই বিমর্ষ হ'য়ে গিয়েছিলেন আমার বিয়ের পর থেকেই। দেখা হ'লে আমায় কতদিন তিনি বলেছেন—"মা জেদের বশে আমার একমাত্র সন্তানের জীবনটা নষ্ট ক'রে দিয়ে যে মহাপাপ ক'রেছি তা'র জন্যে নিজেকে আমি কোনও দিনও ক্ষমা ক'রতে পারব না। সেদিন যদি অজয়ের প্রস্তাবে সম্মত হ'তাম! সেদিন শুধু আমার নিজের দিকটাই দেখেছি, তোর মুখের দিকে চাইনি, মা। যে ভুল ক'রে ফেলেছি, তা'র ত' আর কোনও প্রতীকার নেই। আমার পাপেরও তাই প্রায়শ্চিত্ত নেই। আমাকে পারিস্ ত' মা ক্ষমা করিস্।" ক্রমশঃ বাবার শরীর ভেঙ্গে যেতে লাগ্‌ল। আমার বিয়ের দু'বছরের মধ্যেই বাবা মারা গেলেন।...আমার যে কথা তোমাকে বল্‌তে চেয়েছি জানিনা ঠিক ক'রে তা' গুছিয়ে বল্‌তে পেরেছি কিনা। যা' বল্‌তে পারিনি তা' ও তুমি বুঝে নিতে পার্‌বে, আশা করি।

বিদায় বেলায় এই চিঠিখানি লিখে না জানি তোমার মনে আবার কতখানি দুঃখ দিলাম: সেজন্যেও আমায় তুমি ক্ষমা ক'রো। শুনেছি তুমি নাকি আজও অবিবাহিত। তোমার বাবার হাজার পীড়াপীড়িতেও তুমি নাকি বিয়ে ক'রতে রাজী হওনি। অজয়দা', এক এক সময় আমার মনে হয় যে তুমি যদি বিয়ে ক'রে সংসারী হ'তে তাহ'লে হয়ত' আমার মনের জ্বালা কিছু কম্‌ত। জ্বালা কম্‌ত কি বাড়্‌ত কে জানে?...তোমার খবর মাঝে মাঝে পেতাম রংপুরে থাক্‌তে তোমার খুড়তুতো বোন রেণুর কাছ থেকে। সে বোধহয় আমার মনের কথা জানে। তাই নিজে থেকেই সে মাঝে মাঝে তোমার দু' একটা খবর দিত। তোমার গবেষণার কথা ও পাণ্ডিত্যের প্রশংসা মাঝে মাঝে খবরের কাগজে পড়ি। গর্ব্বে আনন্দে তখন আমার বুকটা ফুলে ওঠে। ভালোবাসার যদি কোনও অধিকার থেকে থাকে ত' তোমার সৌভাগ্যে আনন্দিত হ'বার অধিকার হয়ত' আজও আছে আমার। এ অধিকার কেউ কোনদিন কেড়ে নিতে পার্‌বে না। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, কামনা করি, আমার ছেলে অশোকও যেন বড় হ'য়ে তোমার আদর্শে গড়ে ওঠে। আশীর্ব্বাদ ক'রো সে যেন তোমারই মত কৃতী, বিদ্বান্, চরিত্রবান্, খ্যাতিমান্ হয়। নিজের সন্তানের এই সুখটুকু দেখে যেতে পারলাম না এই যা দুঃখ রইল। বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি, অজয়দা'। এ জীবনের বোঝা আর যেন বইতে পার্‌ছি না। বিধি এতদিনে বোধহয় প্রসন্ন হ'য়েছেন আমার উপরে। আমার মরণের দিন ঘনিয়ে আস্‌ছে। আস্‌ছে

জন্মে যেন তোমায় পাই। এই কামনা নিয়েই আমি এ জন্মের মত পৃথিবী থেকে বিদায় নেব। বিধাতা আমার প্রাণের এই একাগ্র প্রার্থনা শুনবেন নাকি? আসছে জন্মটাও কি ব্যর্থ হবে এমন ক'রে?···আর লিখ্‌তে পারছি না। আর লিখবারও বিশেষ কিছু নেই। ক'দিন ধ'রে তোমায় এই চিঠিখানি লিখ্‌ছি, একটু একটু ক'রে।

মরবার আগে আর একজনের কাছেও ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে যেতে হ'বে। তিনি হচ্ছেন আমার স্বামী। তাঁর কাছে ও তোমার কাছে আমি সমান অপরাধী। তিনি এখন এখানে নেই। ক'মাস থেকে আমি এখানে রয়েছি চেঞ্জের জন্যে। আমার স্বামী মাঝে মাঝে এসে এখানে থাকেন। কাজের জন্যে তাঁকে রংপুরেই থাকতে হয়। তাঁকে শীগ্‌গির আসতে লিখে দিলাম।··· অক্ষয়দা', আমার এ ব্যথার নির্ম্মাল্য গ্রহণ ক'রে আজ আমার জন্মের মত বিদায় দাও। ক্ষমা ক'রো এ অভাগিনীকে। তোমাকে সে যত দুঃখ দিয়েছে তা'র চেয়ে বেশী দুঃখ হয়ত' সে নিজেই পেয়েছে। প্রণাম নিও। ইতি

হতভাগিনী অশোকা

৩

চিঠি পড়া কখন যে শেষ হ'য়ে গিয়েছে, শিথিল হাত থেকে কখন যে সেখানা মাটিতে প'ড়ে গিয়েছে ডাক্তার গাঙ্গুলী টেরও পাননি। হঠাৎ স্বপ্নলোকের মধ্যে থেকে যেন শুনতে পেলেন বেয়ারার কথা—সে বল্‌ছে—"খানা ঠিক্ হ্যায়, হুজুর"। শুনে তিনি চম্‌কিয়ে উঠলেন। মাটির উপরকার চিঠিখানার দিকে চোখ পড়ল তাঁর। সমস্ত বুকটা আলোড়িত করে বেরিয়ে এল একটি গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস। নিজেই সেই নিঃশ্বাসের শব্দে যেন চম্‌কিয়ে উঠ্‌লেন। বিস্ময়-বিমূঢ় বেয়ারাটার মুখের দিকে অর্থশূন্য দৃষ্টিতে একবার তাকালেন—তারপর: যেন যন্ত্রচালিতের মত বলে গেলেন—"আজ হাম হাজ্‌রি-নেহি খায়েঙ্গে। মেরী তবিয়ৎ আচ্ছী নেহি হ্যায়। আজ হাম্‌ কলেজমে ভি নেহি যায়েঙ্গে। ড্রাইভারকো বোল্‌ দেনা।" ব'লেই মাটি থেকে চিঠিখানা তুলে নিয়ে টল্‌তে টল্‌তে চল্‌লেন নিজের শয়ন-কক্ষের দিকে। বেয়ারাটা অবাক হ'য়ে সেইদিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

ঊষা বিশ্বাস

---

# স্বপ্ন ভাঙ্গিও না

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

নিত্য হেরি দেবতারে সুঠাম সুন্দর,
মানবের সুখ দুঃখে নহে নির্ব্বিকার,
ব্যথায় ব্যথিত চিত্ত স্নেহেতে জর্জ্জর,
অতল অতল তাঁর কৃপা পারাবার।

প্রতি মানবের মাঝে পেয়েছি সন্ধান
আত্মার সৌন্দর্য্য জ্যোতি পবিত্র দর্শন,
জীবন সংগ্রাম নহে মিলনের গান
স্বার্থ-দ্বেষ হিংসা-লেশ শূন্য এ ভুবন।

হয়ত বুঝেছি ভুল, কতটুকু জানি!
কল্পনা ভুলালো স্মৃতি কি যে ব্যথা বহে,
ভাঙ্গিও না তবু প্রিয় মোর স্বপ্নখানি
এ জীবন স্বপ্ন চেয়ে দীর্ঘতর নহে।

# শাশ্বতী বাণী

অধ্যাপক—শ্রীনলিনীমোহন শাস্ত্রী এম্‌-এ

আদিম মানব যুগ-শৈশবে
তুলে আধো আধো বাণী,—
কার সাড়া লাগি' কান খাড়া রাখি'
চেয়ে থাকে যোড়-পাণি।
গ্রহে গ্রহে ছুটে অপরূপ গান,—
ফেনিলোচ্ছ্বাসে ছলছল-তান,—
গিরি ভাঙে গড়ে, উড়ে যায় চাঁদ,—
অবাক্ হৃদয় মানি'।
কত শ্বাপদের সঙ্গে যুদ্ধ,
প্রেমে কত কোলাকুলি,
কত নব ভাব,—গত কত যুগ।
বিকাশ লভিল বুলী
কাজে ও কথায় লাগিল দ্বন্দ্ব
যুগ-যৌবনে,—কত না ছন্দ।
কত না বিষাদ—কত আনন্দ
করিল সে হানাহানি।
কর্ণে তাহার ঝরিল তখন
কাহার হর্ষবাণী ?
কত বিজ্ঞান—কত সাহিত্য—
কত না আবিষ্কার।
জল স্থল মরু আকাশ বাতাস
হয়ে গেল একাকার।
"ভয় নাই, ওরে, ভয় নাই, ভীরু।"—
ডাকে উত্তর দক্ষিণ মেরু।
গভীর বারিধি—হিমানী শৃঙ্গ—
দিল তারে হাতছানি।
কর্ণে তাহার ঝরিল তখন
কাহার সাহসবাণী ?
অন্তিম নর জরদ্‌-যুগের
অন্তে দাঁড়াবে যবে,
প্রলয়ের রোল শুনি' চারিধারে
একাকী ব্যাকুল হবে।
খ'সে পড়ে তারা, ধ'সে পড়ে গিরি,
ফেটে যায় রবি,—নভো-বুক চিরি'
ছুটে লেলিহান বহ্নির স্রোত
প্রলয়ের মেঘ টানি'।
কর্ণে তখন ঝরিবে তাহার
কাহার অভয় বাণী ?
তখন তাহার শেষ নিমেষের
একটি আর্ত্তরবে
রবে মানবের বাণীর প্রতিভূ
অসীমের উৎসবে।—
সেই বাণী বুঝি নূতন কল্পে
বীজের আকারে গানে ও গল্পে
আবার নূতন লভিবে বিকাশ
কখন কেমনে জানি।
প্রণাম তোমায় শাশ্বতী বাণী
সৃষ্টি-কমল-রাণী।

# অনুধাবন

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

(একাঙ্ক নাটিকা)

[ গড়ের মাঠ। ফাল্গুন মাসের বিকাল প্রায় ছটা। পশ্চিম আকাশে বড় রাঙা রবির রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েচে। দূর থেকে একজন যুবক একাগ্রমনে সূর্য্যাস্ত দেখছিল। মুখেচোখেতার শিল্পীর বিস্ময়। দেখলেই মনে হয়, একটা করুণ চিন্তার ছায়া পড়েচে অথচ চোখ দুটির মধ্যে আছে দৃঢ় সঙ্কল্পের জ্যোতি। সুপুরুষ কিন্তু তা' ধনীর ভোগপুষ্ট সৌন্দর্য্য নয়। সহসা চোখ ফেরাতেই ফণী দেখতে পেল, স্মৃতি খুব কাছে এসে পড়েচে। আড়ালে গা ঢাকা দেবার আগেই স্মৃতি কথা বললে। ]

স্মৃতি। এখানে কি খবর, হাওয়া খেতে নাকি ?

ফণী। গড়ের মাঠের মাঝখানে কোন ত' রসগোল্লার দোকান দেখচি না যে ধরে নেব, তুমি রসগোল্লা খেতে এখানে এসেচ ?

স্মৃতি। তার মানে ?

ফণী। খুবই সহজ। একবার নারী-প্রগতির এক মহিলা-পাণ্ডাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আচ্ছা, আপনারা ত' প্রগতি-প্রগতি বলে দেশটাকে খুব মাতিয়ে তুলেচেন, কিন্তু আপনারা চান কি? আজকালকার মেয়েদের জীবনে প্রধান কাম্য কি ? তিনি একটু মুচকে হেসে জবাব দিয়েছিলেন, আজকালকার মেয়েরা রসগোল্লা খেতে খুব ভালবাসে। এই আমাদের জীবনের প্রধান কামনা। তাই, আমি ভাবলুম, তোমার মত অতি-আধুনিক মহিলা বুঝি রসগোল্লা খাবার ব্যগ্রতায় আজ ভুলে গড়ের মাঠে এসে পড়েচে।

স্মৃতি। ( জোরে হেসে ) ও, মনে পড়েচে, বাবাঃ, এত কথাও তোমার মনে থাকে। ও ত' আমি একদিন আমাদের ক্লাসের এক কবিকে বলেছিলুম। তার হয়ে খুব প্রতিশোধটা নিলে যাহোক।

ফণী। প্রতিশোধ ! তাই বটে। (চাপা, ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তারপর মনে মনে বললে, আঃ, একটা মাত্র শব্দে এতটা উত্তেজনা প্রকাশ করা ভাল হয়নি। আজ নিজেকে চেপে রাখতেই হবে।)

স্মৃতি। ( একটু থেমে ) আচ্ছা ফণ, তোমায় যেন আজ একটু বিমর্ষ দেখাচ্চে কেন ?

ফণী। বিমর্ষ ? কই তার কোন ত' কারণ খুঁজে পাচ্ছিনা। বরং আমি বেশ স্ফূর্ত্তিতেই আছি মনে হচ্ছে। এমন ঝির-ঝিরে বাতাস আর পশ্চিম আকাশে রাঙা রবির করুণ মূর্ত্তি,—এর মাঝখানে বিমর্ষ ?

স্মৃতি। ফণ, তোমার মতন যারা ছবি আঁকে, সুন্দর দৃশ্যই কি কেবল তাদের চোখে পড়ে,—সুমিষ্ট ধ্বনি শোনবার কান কি তাদের থাকে না ? কান পেতে একবার শোন দিকিন, দূরে গাছে গাছে পাখীরা কি মাতামাতি লাগিয়েচে। তাদের কাকলি কি মিষ্টি ! আর তুমি অস্তগামী সূর্য্য নিয়েই গদ-গদ। আমি কিন্তু সূর্য্যের এই নিষ্প্রভ, ম্লানমূর্ত্তির দিকে চাইতেও পারি না। মনে মমতা হয়। কত বড় পরাজয় বল দিকি, দুপুরে যার অত-প্রচণ্ড তেজ, সন্ধ্যা এসে তাকেই কিনা এম্নি কাবু করে ফেলে !

ফণী। আমি কিন্তু ভাবি ঠিক উলটো। অস্তগামী রবির ঐ মূর্ত্তি ত' ম্লান নয়। ও যেন আশা ও সঙ্কল্পে দৃঢ়। চেয়ে দেখ দিকি, অন্ধকারের নাগপাশ কেটে নূতন উষার নতুন তেজে প্রকাশ হবার জন্যে কি প্রাণপণ সঙ্কল্প ওর মুখের রেখায় রেখায় রয়েচে। তাইত আমার এত ভাল লাগে। তুমি ত' ওর ও মূর্ত্তি দেখতে পাবে না। তোমার জীবনে কখন দ্বন্দ্বই এল না। গরীবের ছেলে, জীবনের সঙ্গে পদে পদে

হাতাহাতি করে আমায় বাঁচতে হয়েচে। কতবার কত ঝড় জীবনের সব কিছু ওলট্-পালট্ করে দিয়ে গেচে। কিন্তু তবু পরাজয় মানিনি। সেই দুর্য্যোগে প্রত্যেকবার কে আমায় বাঁচিয়েচে জান,—এই সূর্য্যাস্তের স্মৃতি। তুমি হাসচ, হাসো। কিন্তু একথা ঠিক, পরাজয় কখন মানব না জীবনে,—যত আঘাত, যত বাধাই আসুক না কেন। জানো, মানুষের জীবনে পরাজয়ের আঘাতই তার সম্পদ, তার গৌরব! (মুখ ফিরিয়ে নিলে।)

স্মৃতি। (স্বগতঃ, ওর চোখ ছল-ছল করে উঠল কেন, আশ্চর্য্য!) থাক, থাক, তোমার জীবন-তত্ত্ব। আমি হাসছিলুম অন্য কারণে। তবু ভাল আমার নামটা যে ভাবেই হোক একবার উচ্চারণ করেচ। আমি যতই করচি ফণ্-ফণ্, তুমি ততই এমন ভাবটা দেখাচ্ছিলে যেন আমার নামটা তোমার ভাদ্র-বৌয়ের,—মনে মনেও উচ্চারণ করতে নেই।

ফণী। তোমার নাম আবার কখন করলুম!

স্মৃতি। কেন, এইত বল্লে সূর্য্যাস্তের স্মৃতি।

ফণী। (খুব জোরে হেসে) ও হো-হো। একটা গল্প মনে পড়ল। একজন একবার—

স্মৃতি। (সহসা) ফণ্, চল, আমরা ঐ গাছটার আড়ালে বেঞ্চে বসিগে। এখানে বড় চোখের ভীড়। লোকগুলো কেমন করে চাইচে দেখ?

ফণী। (উত্তেজিত ভাবে) ঐ ত' তোমাদের দোষ। যতই কেননা, অতি-আধুনিকতার নতুন পোষাক পরো, তবু তার ভেতর থেকে আদ্যিকালের কুঁজো বুড়ি উঁকি মারবেই মারবে। কেন, লোকগুলো একটু চেয়েচ ত' তোমার ক্ষতি হয়েচে কি?

স্মৃতি। কি আমার অতি-আধুনিক পুরুষসিংহরে! আমাকে অবলা পেয়ে অত যে বড়াই দেখাচ্চো, একটা কাজ করতে বললে পারবে তুমি? অথচ তেমন কাজ অতি-আধুনিক পুরুষরা কেউই করতে দ্বিধা করেনা।

ফণী। অতি-আধুনিক পুরুষসিংহ বলতে তুমি কি বুঝচ জানিনা, কিন্তু একথা আমি বলতে পারি, কোন রকম সংস্কারের সঙ্কোচ আমার মনে নেই।

স্মৃতি। আচ্ছা, পরীক্ষা দাও।

ফণী। বল।

স্মৃতি। (একটু হেসে) এই আমি চোখ বুজ্লুম, এদের সকলের সামনে একটা চুমু খাও দিকিন।

ফণী। (অভিভাবকের সুরে) স্মৃতি!

স্মৃতি। (খুব জোরে হেসে) এই দেখো, জোর করে কেমন আমার নাম বলিয়ে নিলুম। পুরুষের শপথ নেওয়া আর শ্রাবণ মাসে রোদ্দুর ওঠা একই কথা।

[গাছের আড়ালে বেঞ্চে দুজনে বসল। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। দূরে লোক চলাচল করচে। স্মৃতি ফণীর বাঁ হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলে। তারপর কথা বললে।]

স্মৃতি। ফণ্, কতদিন পরে আবার দেখা হল বলত? সেই যেদিন তুমি তর্ক করতে করতে রাগ ক'রে চলে গেলে, সে প্রায় মাস দুই হয়ে গেল।

ফণী। রাগ ক'রে কি রকম? রাগ আমি একটুও করিনি। সেদিন শুধু সত্যি করে বুঝতে পেরেছিলুম, তোমার সঙ্গে আমার কোনখানেই মিল নেই,—না প্রকৃতির, না-বা রুচির অথচ—

স্মৃতি। অথচ, একদিন ভাবতে বাংলাদেশে আমার মতন অসাধারণ মেয়ে মেলে খুব কম।

ফণী। সে ভুল আমার সেদিন ভেঙে গেচে।

স্মৃতি। (জোরে হেসে ক্ষিপ্র-কণ্ঠে) তাই নাকি?—(একটু ভাববার ভাণ করে) আচ্ছা, এ দুমাসে তোমার জীবনে কি কোন পরিবর্ত্তন আসেনি?

ফণী। মোটেই না। বরং আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েচি, এমিধারা একঘেয়ে, মামুলি, বৈচিত্র্যহীন দিনের পর দিন নিয়ে।

স্মৃতি। এর মধ্যে কোন নতুন ঘটনা ঘটেনি? ভাল বা মন্দ কোন খবর কানে আসেনি?

ফণী। রোস, মনে করি। (ভাববার ভাণ করা।)

স্মৃতি। (স্বগতঃ, এবার কোথায় যাবে বাছাধন? স্বীকার করতেই হবে যে। কি দুষ্টু ছেলে বাবা। কথাটাকে কেবল এড়িয়ে যাচ্ছে।)

ফণী। হ্যাঁ, একটা খবর তোমায় দিতে ভুলে গেছলুম। ধীরেনবাবু চিঠি লিখেচেন, কোথাকার রাণা নাকি আমার

"শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের প্রথম দৃষ্টি" নামের ছবিখানা দশহাজার টাকায় কিনতে রাজি হয়েছেন। হ্যাঁ, আর্থিক দিক থেকে এ একটা সুখবর বটে, জানত' স্মৃতি, বেশ একটু টানাটানি করেই গত ক'বছর আমাকে দিন কাটাতে হচ্চে।

স্মৃতি। (স্বগতঃ, চুলোয় যাক অমন সুখবর। আচ্ছা, তুমি যদি নিজে সুরু না কর, অন্ততঃ জোর করে তোমায় সুরু করানর একটা আনন্দত' আছে। দেখি, কতক্ষণ তুমি আমার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে পার।) (একটু অন্যমনস্কভাবে) আমার জীবনে কিন্তু এই দুমাসে একটা মস্তবড় দুর্ঘটনা ঘটে গেচে।

ফণী। (নিরাসক্তভাবে) তাই নাকি?

স্মৃতি। কি তা নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করচে?

ফণী। জানতে ইচ্ছে করা অবশ্য স্বাভাবিক। কিন্তু বলতে যদি কিছু বাধা থাকে ত' না-হয় নাই বললে।

স্মৃতি। না, তেমন বাধা আর কি? (একটু দ্বিধার পর কৃত্রিম, অস্বাভাবিক কণ্ঠে) শোননি, আমার বিয়ের যে ঠিক হয়ে গেচে। (দুই ঠোঁটের মধ্যে একফালি হাসি)।

ফণী। (স্বগতঃ, কিছুতেই ছাড়ান নেই। কথাটা যতই এড়িয়ে যেতে চাচ্চি।) হ্যাঁ, কথাটা আভাসে শুনেছিলুম বটে। ব্যারিষ্টর গিরীনবাবুর সঙ্গে না? মনে করেছিলুম, কথাটা পাকাপাকি হয়ে গেলেই তোমাদের অভিনন্দন জানিয়ে আসব।

স্মৃতি। পাকাপাকি হয়ে গেলে কি রকম? আসচে ২৯শে ত' দিন ঠিক হয়ে গেচে। মাঝে কেবল আটদিন সময়।

ফণী। (সঙ্গে-সঙ্গেই কৃত্রিমকণ্ঠে) তাই নাকি? তোমাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্চি, স্মৃতি দেবী। বাস্তবিক, আমার আজ খুব আনন্দ হচ্ছে। তোমাকে যোগ্য আসন থেকে জীবনসুরু করতে দেখার মত শুভ খবর আমার পক্ষে আর কি হতে পারে?

স্মৃতি। আমার একটা গল্প মনে পড়ল ফণ্। এক বোষ্টমীকে গোখ্‌রো সাপে কামড়েছিল। সে যখন বিষের জ্বালায় মর-মর, তখন তার গোঁসাই এসে বললে, ভাবিসনি, একেবারে জাত বামুন টুকরেচে, তোর একটা সদ্গতি হয়ে গেল যাহোক।

ফণী। (একটু ভাববার পর দরদের সুরে) আমায় মাপ কর স্মৃতি, আমি ভাবতে পারিনি যে তুমি এতে অসুখী।

স্মৃতি। (বিস্মিত হয়ে) কিসে ফণ?

ফণী। এই গিরীনবাবুর সঙ্গে বিয়েতে।

স্মৃতি। (জোরে হেসে) তাই নাকি? আমার অসুখী মনের গোপন খবর তুমি কোথা থেকে পেলে?

ফণী। কেন, তোমার গল্পে কি সেই ইঙ্গিতই নেই?

স্মৃতি। (স্বগতঃ, ওঃ, গল্পটা বড় অসাবধানে মুখ থেকে ঝরে পড়েচে ত'। এদিক থেকে আর একটা মানে হতে পারে বটে। কিন্তু এত সহজে হার মানবো,—তা'কি হয়!) (মুরব্বিয়ানার সুরে হেসে) ফণ্, তোমার আজকাল কি হয়েচে বলত? এত অন্যমনস্ক যে আমার গল্পটাও ভাল করে শোননি। গিরীনবাবুর মতন বিদ্বান, সুপুরুষ, পশারওলা ব্যারিষ্টর,—এরকম পাত্র বাংলাদেশে কটা মেলে যে তাকে পেয়ে হব অসুখী?

ফণী। (স্বগতঃ, গল্পটা সত্যিই ভাল করে শুনিনি নাকি?—একটু বিস্ময়ের সুরে) আমিত' তাই ভাবছিলুম, এও কি সম্ভব?

স্মৃতি। (একটু গম্ভীরভাবে) কিন্তু এ বিয়ে বোধ হয় হবেনা।

ফণী। তার মানে? এইত' তোমাদের আজকালকার মেয়েদের রোগ। হেঁয়ালি ছাড়া যেন কথা বলতেই জাননা।

স্মৃতি। স্পষ্ট ক'রে বললেও যে তোমরা বোঝ না ছাই।

ফণী। সে ক্ষেত্রে বুঝতে হবে শ্রোতার দোষ নেই, বক্তাই যত নষ্টের গোড়া।

স্মৃতি। আজকালকার পুরুষের বিশেষত্ব হচ্ছে, নিজেদের দোষ কিছুতেই দেখতে না-পাওয়া।

ফণী। আর তোমাদের বিশেষত্ব হচ্ছে, নিজেদের দোষ দেখতে পেয়েও পরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। (কৃত্রিম নিরাসক্তির সুরে) আচ্ছা, থাক ওকথা। যা বলতে যাচ্ছিলে একটু খুলেই বলনা।

স্মৃতি। খুলেই ত' বলতে চাই, কিন্তু শোনবার মত তোমার অবসর কোথা? (একটু থেমে) ফণ্, আজ আমি তোমার পরামর্শ চাই।

ফণী। যদি বলি দিতে অপারগ?

স্মৃতি। তাহলে বুঝব, অপারগ নয় অনিচ্ছুক। কিন্তু আগে কথাটাই শোনত'। এ বিয়ে কিছুতেই হবেনা, বুঝেচ?

ফণী। কেন, মনের মত সবই ত' পেয়েচ?

স্মৃতি। সবই ত' পেয়েচি, তবু যে খুঁত রয়েচে।

ফণী। কি রকম?

স্মৃতি। গিরীনবাবুর কাছে কি-কি পাওয়া যাবে, তাই আগে দেখা যাক। পয়লা নম্বর ধর অগাধ ঐশ্বর্য্য।

ফণী। বেশ। (স্বগতঃ, জীবনে ঐশ্বর্য্যের আসন সব চেয়ে হল বড়।)

স্মৃতি। দ্বিতীয় নম্বর রূপ।

ফণী। বেশ। (স্বগতঃ, রূপ চায় রূপ। নিজের অনন্যসাধারণ রূপের কথা স্মৃতি কি কখন ভুলতে পারে?)

স্মৃতি। তৃতীয় নম্বর হচ্ছে,—আচ্ছা, ধরে নেওয়া যাক, মনের মিলও আমাদের হয়েচে। কিন্তু—

ফণী। কিন্তু কি?

স্মৃতি। সেদিন হঠাৎ আবিষ্কার করেচি, রুচির মিল মোটেই নেই। ভয় হয়, বিয়ের পর বনিবনা কিছুতেই হবে না। অথচ নিত্যকালের জন্যে দুজনে কেউ কারোকে আর ছাড়তে পারব না।

ফণী। রুচির মিল কিসে হলনা?

স্মৃতি। তুমি বড্ড শুখ্‌নো শুখ্‌নো জেরা কচ্চ, ফণ্‌। ঠিক-ঠিক জবাব দেওয়া দুরূহ হয়ে উঠ্‌চে। ধর, রুচির মিল-প্রথমেই ধরা পড়ল বিয়ের রোমান্টিক ব্যাখ্যায়। জীবনে বিয়ের ব্যাপারটাকে গিরীনবাবু এত অসাধারণ করে রাঙিয়ে দেখেন যে ভয় হয়, বিয়ের দিন সাতেক পরে আমার রূপের মোহ যেদিন ওঁর ঘুচবে, সেদিন হয়ত ছেঁড়া কাপড়ের মতই ওর মন থেকে আমাকে ঝেড়ে ফেলে দেবেন। ফলে, গার্হস্থ্য-জীবনে খুঁটি-নাটি নিয়ে নিত্য হবে ঝগড়া আর মন-কষাকষি। হিন্দু-বিয়ের আবার ডিভোর্স নেই!

ফণী। তোমার কথা মেনে নিতে পারলুম না, স্মৃতি।

স্মৃতি। জানি, ডিভোর্স কথাটাই যত গোল বাঁধিয়েচে। যাই বল, হিন্দু বিয়ের মত অস্বাভাবিক, কৃত্রিম প্রথা আর নেই। মানুষের মন,—পরিবর্ত্তন আর বিচিত্রতাই তার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। একবার বিয়ে করলে ত' তার রক্ষে নেই। মনের সেই স্বাভাবিক ধর্ম্মকে চেপে মেরে কর একত্র বাস যতদিন না একজনের দেহ যায় পঞ্চভূতে মিলিয়ে। আশ্চর্য্য!

ফণী। তুমি আমায় অনেকবার ঠাট্টা করেচ, ভাবপ্রবণ ভাবুক বলে। কিন্তু, যাই বল, ডিভোর্স প্রথাটা হচ্চে, ও দেশের সভ্যতার একটা মস্ত বড় পরাজয়ের গ্লানি। ডিভোর্স হাতে রেখে যখন মানুষ বিয়ে করে তার মানে কি এই নয় যে বিয়ের সময় পর্য্যন্ত তারা পরস্পরকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেনি। এ বিয়ে না করলেই হয়।

স্মৃতি। সে কি! বিয়ে না করলে সাধারণ মানুষের জীব-ধর্ম্ম মিটবে কেমন করে।

ফণী। সাধারণ মানুষের কথা সাধারণ মানুষরা ভাবুকগে যাক। তুমি কি এতদিন ধরে সাধারণ হবার সাধনা ক'রে এলে?

স্মৃতি। কি রকম?

ফণী। বিয়ের আগে যেখানে ভালবাসা জন্মাবার অবসর হলনা, তাকে বিয়ে বলিনা,—বলি, ব্যভিচার। কিন্তু, যেখানে সত্যিসত্যি দুই আত্মায় হল মিতালি, সেখানে বিয়ের শুভ-লগ্নে দুজনে কি এই কথাই স্বীকার করে নিলে না যে নিত্যকালের জন্যে দুজনে পড়লুম বাঁধা। পরস্পরের জীবনকে পূর্ণতর করার জন্যে আজীবন করব সাধনা।

স্মৃতি। কিন্তু পরে যদি বনিবনা না হয়?

ফণী। চিত্তে চিত্তে দ্বন্দ্ব ত' আছেই। খুঁটিনাটি নিয়ে মনোমালিন্য ত' হবেই। পরিবর্ত্তনশীল মানুষের মন নিয়ে অনেক কিছু কাঁটা ত' গজিয়ে উঠবেই। কিন্তু তাতে বিচ্ছেদ ঘটবে কেন? বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যেই ত' জীবনের সত্যিকার আনন্দ। মুক্তির পথ রুদ্ধ করে পূর্ণবিশ্বাসে জীবনের অতল তলে যদি ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারলুম ত' বুকভরে ওর আনন্দ লুটে নেব কেমন করে? যেখানে মুক্তির পথ খোলা, সেখানেই জাগে পদে-পদে সঙ্কোচ,—পদে-পদে হিসাব নেবার আকাঙ্ক্ষা।

স্মৃতি। অদ্ভুত তোমার ব্যাখ্যা, ফণ। জীবনকে তুমি অত সিরিয়াস্‌ভাবে দেখ কেন বলত ?

ফণী। জীবনকে যারা চেনে, তারা সিরিয়াস্‌ভাবে না নিয়ে থাকতে পারেনা। তোমরা চিনতে পারনা, তাই এই শিথিলতা। আধুনিক মেয়েদের এইখানেই হয়েচে গলদ। পুরোতন দিনের মত তোমাদের দৃষ্টি আজো আছে সঙ্কীর্ণ,—ক্ষীণ, কিন্তু ওদেশের সাহিত্য আর বিজ্ঞানের বইগুলো এনে দিয়েচে সেই ক্ষীণ দৃষ্টির ওপর জীবনের তীব্র আলোর বন্যা। তার প্রখরতায় তোমাদের দৃষ্টি গেচে অন্ধ হয়ে। তাই তোমরা জীবনের সত্যিকার রূপ,—এর গুরুত্ব অনুভব করতে পারনা। মনে হয়, এ বুঝিবা শুধুই ফাঁকি, সারাজীবন বুঝি শুধু ন্যাকামি করেই যাবে কেটে।

স্মৃতি। আজকালকার মেয়েদের নিয়ে ত তুমি খুব সস্তায় যত পারচ সাধারণ-তত্ত্ব আবিষ্কার করচ। কিন্তু জীবনে ক'জনের সঙ্গে মিশেচ শুনি ?

ফণী। Typeকে বোঝার জন্যে অনেক সময় এক জনের সঙ্গই পর্য্যাপ্ত।

স্মৃতি। সে ত' সম্ভব হয়, যখন দুজনের মধ্যে ঘটে গভীর ভালবাসা। আচ্ছা, সোজা করে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। কোন মেয়েকে সত্যি করে জীবনে কখন ভালবাসতে পেরেচ ?

ফণী। শুনে তোমার লাভ ?

স্মৃতি। কিছুই না, শুধু অলস ঔৎসুক্য।

ফণী। হুবহু মিলে যাচ্চে। শুধু অলস ঔৎসুক্য। জীবনের মুহূর্ত্তগুলো কি এতই অকেজো,—এতই সস্তা ?

স্মৃতি। উত্তর দাও। কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তেও কি জীবনে কারোকে ভালবেসে ফেলনি ?

ফণী। আজকালকার মেয়েদের নিয়ে ত প্রেম করা চলেনা। চলে প্রণয়, চলে ন্যাকামি, চলে অভিনয়। তোমাদের অনুভূতি হয়ে গেচে এতই ফিকে,—এতই হাল্‌কা যে প্রেমের বিপুল সম্ভাবনার উপলব্ধি তোমরা কল্পনাও করতে পারনা।

স্মৃতি। আমরা মাটির মানুষ। আকাশ-কুসুমের ভুয়ো স্বপ্নে ভুলে থাকতে পারিনা বলেই তবু ঘর-সংসার পাততে পারি। আর বাংলাদেশের অতি-আধুনিক পুরুষ তোমরা, প্রেমের বিপুল সম্ভাবনার নেশায় এতই মশগুল যে জীবনে বিয়ে করার আর অবসরই পাওনা। বিয়ে করেননি কেন জিজ্ঞেস করলেই বল, এত কম আয়ে খাওয়াবো কি ? কিন্তু, একথা বোঝনা যে এদেশে শতকরা পঁচানব্বুইজনের আয় চিরকাল এম্নি ধারাই থাকবে।

ফণী। তুমি আমাকে ভুল বুঝেচ। আমার কথার গভীরতা তোমার বোধগম্য নয়। তাই করচ এই ভুল। যদি বলি, স্বপ্নই আমার সত্যিকার জীবন। তারপর একদিন আসবে এই অপূর্ণ জীবনকে পরিপূর্ণ করে সার্থকতার বিরাট আনন্দ। কিন্তু, তাই বলে এ জীবনে আমি নিরাশ হয়ে বসে নেই। এ জীবনেই যতটুকু পারি, ব্রহ্মাণ্ডের দিক-দিক থেকে লুটে নেব মধু। তাই, যা পেলুম না, তার আক্ষেপ আমাকে নিরাশ করতে পারেনা।

স্মৃতি। (খুব জোরে হেসে) কিন্তু এক্ষেত্রে আমার নিরাশ হওয়া ছাড়া উপায় নেই যে। বিয়ে ত' আমার দিক থেকে ভাঙচে না,—ভাঙচে গিরীনবাবুর দিক থেকে।

ফণী। ( সহসা উৎসুক ভাবে ) কেন ?

স্মৃতি। তিনি আরো রূপসী গুণী মেয়ের মোহে আটকে পড়েচেন। ( গাম্ভীর্য্যের ভাণ ) [ কিছুক্ষণ চুপ-চাপ। সূর্য্য ক্রমশঃ পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়েচে। পৃথিবীর বুকের ওপর আব্‌ছায়া অন্ধকারের স্নেহাঞ্চল। ]

ফণী। স্মৃতি।

স্মৃতি। কি ফণ্‌ ?

ফণী। ( ধীরে ধীরে ) জীবনে সত্যিই তাহলে আঘাত পেয়েচ ? আজ তোমার বড় দুর্দ্দিন।

স্মৃতি। তাইত' তোমার কাছে পরামর্শ করতে এসেচি ফণ্‌। কাল বিকালে দেখলুম, তুমি এখানে বেড়াতে এসেচ। একদৃষ্টে পশ্চিম দিকে কি যেন দেখছিলে। বাবা সঙ্গে ছিলেন, কাছে আসতে পারলুম না। আজ তাই ছল করে একাই চলে এসেচি।

ফণী। এখন কি করতে চাও ?

স্মৃতি। আশা ভেঙে গেলে যা মেয়েরা সকলেই করে। জীবনে বিতৃষ্ণা এসে পড়েচে। মনে করেচি, এবার

চাকরী নিয়ে মেয়ে-পড়ানের কাজে লেগে যাব। ছোট্ট বোর্ডিং-এর সঙ্কীর্ণ আবহাওয়ায় নিজেকে একেবারে দেব লুপ্ত করে। জগতে আমি আছি আর আছে গভীর অবসাদ আমার সঙ্গী। হ্যাঁ, আজ সকালে একখানা চিঠি পেয়েছি, নারী-নিকেতনে আমার চাকরী মিলেচে।

[ কিছুক্ষণ চুপচাপ। ]

স্মৃতি। কি ভাবচো ফণ্‌?

ফণী। ভাবচি, এ হবেনা।

স্মৃতি। কি হবেনা?

ফণী। আঘাত যতই কেন না আসুক, জীবনের কাছে এত সহজে পরাজয় স্বীকার আমরা কিছুতেই করব না।—স্মৃতি পাববে?

স্মৃতি। কি ফণ্‌?

ফণী। (সহসা) কেন আমাদের ওপর ভগবানের এই অকারণ অত্যোচার! (কিছুক্ষণ ভেবে) কিন্তু হতাশ হলে চলবে না স্মৃতি। যাকে পেতে চাই, তাকে জয় করে নেব,—যত বাধাই আসুক না কেন? না, এম্নিভাবে মুহূর্ত্তের অবসাদে তোমার সারাজীবনকে বিসর্জ্জন দিতে পাবেনা, কথখনো নয়।

স্মৃতি। (অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে) তুমি যদি আমার অবস্থায় পড়তে তাই করতে কি?

ফণী। নিশ্চয়ই! মনের জিনিষকে অধিকার করার চেষ্টাই ত সৃষ্টির গোড়ার কথা। আমি হলে তোমার মত অবসাদে ভেঙে না প'ড়ে জীবনের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতুম। ঈপ্সিতকে অধিকার করে তবে পেতুম বিশ্রাম।

স্মৃতি। (উত্তেজিত ভাবে) ভীরু, কাপুরুষ! তোমার মুখে একথা শোভা পায়না।

ফণী। (রাগতঃ ভাবে) কেন, জীবনে কোনদিন আমায় দেখেচ পরাজয়ের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে?

স্মৃতি। (বিদ্রূপের হাসি হেসে) মোটেই না। গিরীন বাবুব মতন সাধারণ মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে হটে গিয়ে নিশ্চিন্তে দিন কাটায়, তার মুখে একথা বাচালতা মাত্র।

ফণী। (সহসা উত্তেজিতভাবে) এই সন্ধ্যাবেলা নির্জ্জনে আগুন নিয়ে খেলা করা ভাল নয়, স্মৃতি। প্রলোভনের মায়ায় আমাকে আর উত্তেজিত করনা। মনে রেখ, মানুষের সংযমের আছে একটা সীমা। ও বুঝেচি, বিয়ে ভেঙে যাবার গল্প সবই তোমার তৈরি-করা মিথ্যা কথা। গিবীনবাবুকে আত্মসমর্পণ করার আগে আমার কামনার আগুনকে জাগিয়ে দিয়ে তুমি সাপুড়ের মত আমাকে নিয়ে খেলা করতে চাও। সাফল্যের ভবপুর আনন্দে অন্ধ তুমি,—তাই আমার অন্তরের বেদনা আজ তোমার ক্রূর লীলাখেলার উপকরণ!

স্মৃতি। আত্মভোলা পুরুষের মনে কামনা জাগিয়ে দেওয়াইত' নারীব রমণীত্ব। সেই ত' তার ধর্ম্ম।

ফণী। (রাগে আত্মহারা হয়ে) ওঃ! তাই, এই নতুন নারীত্বের পূজারিণী তুমি, জীবনে চাও একাধিক পুরুষের সংসর্গ। তোমার লালসার ক্ষুধা কিছুতেই আর মেটেনা।

স্মৃতি। (দুহাতে মুখ ঢেকে) ছি-ছিঃ, তোমার মুখে এই কথা! (কেঁদে ফেললে) চারিদিকে এই লাঞ্ছনা আর ত' সহ্য হয়না। বাড়ীতে অত্যোচার, বাইরে এই লাঞ্ছনা,—যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর!

ফণী। (শান্তভাবে স্মৃতির হাতদুটো নিয়ে নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে) কিছু মনে করনা স্মৃতি, মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় আমি আত্মহারা হয়ে গেছলুম। যদি জানতে মাসখানেক ধবে আমার মনে কি ঝড় বইচে!

স্মৃতি। (ফণীর বুকে মুখ লুকিয়ে) আর যদি বুঝতে বিয়ে ঠিক হবার পর থেকে এই এক মাস কি ভাবে আমার কাটচে? মনোমত পাত্রের হাতে স'পে দেবাব জন্য অবাধ্য মেয়েকে শায়েস্তা করার কাজ বাপমাকে যে কত নিষ্ঠুর ক'রে তোলে,—তা যদি বুঝতে?

ফণী। (স্মৃতিকে বুকের ওপর চেপে ধরে) স্মৃতি, আমায় মাপ কর, আমি ভুল বুঝেছিলুম। কিন্তু আমাদের দুজনের যে কিছুতেই মিল নেই,—না রুচির, না-বা প্রকৃতির।

স্মৃতি। কতটুকুই বা আমরা পরস্পরকে জানতে পেরেচি? মানুষের প্রকৃতি কি এতই ফিকে? জীবন ভোর সেইত' হবে আমাদের সাধনা,—করব পরস্পরকে জানবার চেষ্টা। যেদিন পূর্ণভাবে জানতে পারব সেদিন সব অমিল যাবে লুপ্ত হয়ে।

[ অতি-উৎসুক কে একজন পাশ দিয়ে হন-হন করে চলে গেল। কিন্তু সেদিকে এরা ভ্রূক্ষেপ করলে না। ফণীর চোখ দুটিতে অসীম আনন্দ। দুজনেই নিস্তব্ধ। কিছুক্ষণ পরে— ]

ফণী। স্মৃতি।

স্মৃতি। কি ফণ্‌?

ফণী। (মুখের কাছে স্মৃতির মুখ নিয়ে এসে) তোমাব আশায় গিরীনবাবু হয়ত এখন তোমাদের বাড়ীতে অপেক্ষা করচেন। আর তুমি —

স্মৃতি। (বুকে শুয়ে শুয়ে) দুষ্টু! এই দুমাস ধরে যে চুপ করে বসে মজা দেখছিলে, ওরা যদি ধবে-বেঁধে গিবীনবাবুব হাতে আমায় স'পে দিত! মাগো, সেকথা ভাবলেও যে—(স্মৃতির গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।)

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

# চীনের সাধনা

### স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ভারতের ন্যায় চীনও তাহার স্বর্ণযুগে ধর্ম্ম, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সকল বিভাগে অদ্ভুত কৃষ্টি সৃষ্টি করিয়াছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার গৌরব ও উৎস পেরিক্লসের অধীনস্থ এথেন্সও চীনের মত সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। চীনের ধর্ম্মও বিশ্ব-মনের অনুভূতিতে পর্য্যবসিত। চীনেরা এই বিশ্বাত্মাকে তাও বলে। এই তাও-ধর্ম্মই প্রাচীন চীনেরা সাধন করিত। ব্রাউনিংএর ভাষায় এই তাও-ধর্ম্মের সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে, নিখিল ভুবনে ভগবান ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত আছেন—কুঞ্জে কুঞ্জে ঈশ্বরের স্বর্গীয় জ্যোতি কিরণ দিতেছে। উপনিষদের ভাষায় "জগৎ ব্রহ্মময়; তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" চীন ও বৃহত্তর চীন বা জাপানের শিল্প ও সাহিত্য এই সাম্য ও অন্তর্দৃষ্টির ভাবে ভরপুর হইয়া অত্যুন্নত হইয়াছিল। সুতরাং প্রাচীন চীনের উজ্জ্বল সাধনার আলোচনায় আশা করি নব্য দেশগুলির বহু সমস্যার সমাধান সহজ হইবে।

আদিম কাল হইতে চীনের একমাত্র ধর্ম্ম ছিল তাও। চীনের তাও ও ভারতের ব্রহ্ম প্রায় একার্থবাচক। জগৎ সৃষ্টির সময় এই বিশ্ব-তাও দুইভাগে বিভক্ত হইলেন: স্বর্গীয় তাও ও মর্ত্ত্য লোকের তাও। এই তাও-দর্শন চায় বহুত্বে একত্ব দৃষ্টি: এই বিভাগদ্বয় সুতরাং বাস্তব নহে কাল্পনিক ও বাহ্য। যদিও লাওজে এই তাও-ধর্ম্মের আচার্য্য ও প্রচারক ছিলেন তথাপি কন্‌ফুসিয়াসও এই প্রাচীন দর্শনের সদানুষ্ঠান করিতেন। কন্‌ফুসিয়াসের নীতি-দর্শন উত্তর চীনে এবং লাওজের আদর্শবাদ দক্ষিণ চীনে প্রতিষ্ঠালাভ করে। এই ঋষিযুগলের মতবাদদ্বয় পরস্পর এত ঘনিষ্ঠভাবে প্রভাব বিস্তার ও বিজড়িত করিয়াছিল যে, উহা হইতে একটা নূতন প্রবাদের সৃষ্টি হইল। কোন মহৎ ব্যক্তির বিষয় বলিতে গেলে লোকে বলিত যে, তিনি কর্ম্মকালীন কন্‌ফুসিয়ান্ এবং বিশ্রাম সময়ে তাও-বাদী। তারপরে চীনে প্রবেশ করিলেন বুদ্ধদেব। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সুবিমল জ্যোতি যখন হিমালয়ের উপর দিয়া চীনদেশ আলোকিত করিল তখন চীনাগণ ধ্যানের সময় বৌদ্ধ-পথানুবর্ত্তী হইয়া পড়িল। পরিশেষে তাও-ধর্ম্মের সারাংশ বৌদ্ধ-ধর্ম্মে মিলিত হইয়া এক অভিনবরূপ ধারণ করিল। এই নব ধর্ম্ম-সম্মিলনে কর্ম্মহীন বিশ্রামে ধ্যান ও সচ্চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও সাহিত্য সাধনার সমাবেশ হইল। অবসর আলস্যময় নহে সৃষ্টিমূলক। শারীরিক কর্ম্ম বন্ধ হইলে—মন-জগৎ বহির্জগৎ হইতে অবসর গ্রহণ করে তখনই অন্তর্জগতের সৃষ্টিলীলার আরম্ভ হয়। লাওজে, কন্‌ফুসিয়াস ও বুদ্ধ এই তিন জন মহাপুরুষ চীন-জীবনের তিনজন শিক্ষক। চীন-জীবনে তাই তিক্ত, মিষ্ট ও লবণময় তিন প্রকার আস্বাদ পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব অনুভব করিলেন জীবন দুঃখময়—তিনি এই দুঃখ হইতে শান্তির পথ আবিষ্কার করিলেন। কন্‌ফুসিয়াস্ বিশেষভাবে মানব-ব্যবহারের উন্নতি সাধনে তৎপর ছিলেন। মানুষ কিরূপে গৃহ, সমাজ, জাতির সহিত সংযোগ ও সাম্য রক্ষা করিতে পারে, এবং কিরূপে বর্ত্তমান সমাজ রাজনীতি ও ধর্ম্ম-নীতির সহায়ে অতীত ও সনাতন সমাজের সহিত সুর মিলাইয়া অভ্যুদয় লাভ করিতে পারে—এই সমস্যা সমাধানে তিনি নিযুক্ত রহিলেন। আর লাওজে সাধন করিলেন ও শিক্ষা দিলেন কিরূপে মানুষের সহিত ঈশ্বরের, ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির, অণুর সহিত মহতের, সসীমের সহিত অসীমের মিলন সম্ভবপর।

পাশ্চাত্যের শিল্প ব্যষ্টিত্ব ও বৈচিত্র্যের ডমরু ধ্বনি

করিতে করিতে প্রাচ্যে উপস্থিত। পশ্চিমের এই শিল্পের জন্যই শিল্প এই মতবাদের মূলে আছে অহমিকা ও জড়বাদের বীজ। পরিদৃশ্যমান জগৎ যদি বাস্তব না হয় তবে ইন্দ্রিয়-সুখ হইবে কিরূপে? তাই এই ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎকে আঁকড়াইয়া থাকিতে পশ্চিমের আর্ট সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে। চীনদেশে কিন্তু আবহমান কাল হইতে ইহার ঠিক বিপরীত ঘটিয়াছে। চীন সহজাত জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টিতে বুঝিয়াছিল যে, বহুত্বের—নানাত্বের পশ্চাতে একত্ব ও অদ্বৈত দর্শনেই সর্ব্ব শিল্পের জন্ম। পাশ্চাত্যে ধর্ম্ম ও শিল্পের আদর্শ ভীষণভাবে বিপথগামী। পার্থক্য ও বৈচিত্র্য, ব্যক্তিত্ব ও ব্যষ্টিত্ব ব্যতীত পশ্চিম ধর্ম্ম ও শিল্পের অন্য কোন রূপ দিতে পারে না। শ্রীঈশা যে বলিলেন, প্রেম-স্বরূপ ঈশ্বরের সহিত মিলিত হওয়াই ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা তাহা পাশ্চাত্য সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছে। তাহাই ধর্ম্মের প্রকৃত মিশন। ধর্ম্মের হৃদয়-কন্দরেই ঐক্য ও সাম্যের প্রাণ নিহিত। সুতরাং একমাত্র ধর্ম্মই এই অমূল্য রত্নের সন্ধান দিতে পারে। কাজেই ধর্ম্মের সহিত যখন শিল্পের বিরোধ হয় বা শিল্প যখন ধর্ম্মের আনুগত্য স্বীকার না করে তখনই শিল্প পথভ্রান্ত হয়। চীনে কিন্তু ধর্ম্ম ও শিল্প একাসনে অধিরূঢ় হইয়া চীনের সাধনায় এক অভূতপূর্ব্ব কৃষ্টির বিকাশ করিয়াছিল। চীনে শিল্প ও ধর্ম্ম সাধনার মধ্যে কোন অলঙ্ঘ্য প্রাচীর নাই। উভয়েই ভিক্ষুদের আলয় বিহারের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। প্রাচীন চীনে শিল্প ছিল প্রয়োগমূলক ধর্ম্ম। (Applied Religion)

চীনদেশীয় শিল্পের জন্ম হয় সৃষ্টিমূলক স্বপ্নে। শিল্পী এই স্বর্গীয় স্বপ্নে আপনার অস্তিত্ব শিল্পের মধ্যে বিসর্জ্জন দিয়া ঈশ্বরের যন্ত্র-স্বরূপ হন। লরেন্স বিনিয়ন (১) বলেন যে, জীবনের প্রত্যেক গতিতে ভগবানের সঙ্গীত-প্রকাশই চীন-শিল্পের উদ্দেশ্য। ওকাকুরা (২) বলেন যে, বস্তু-জগতের স্পন্দনের মধ্যে স্রষ্টার প্রাণ-স্পন্দন বিকাশ করাই চীন-শিল্পের সাধনা। চীনের শ্রেষ্ঠ শিল্পী-ঋষি উ-তাও-শু এর তিরোভাব-গল্পে উহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। উ-তাও-শু রাজ-প্রাসাদের দেওয়ালে সম্রাটের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে একটি বিশাল চিত্র অঙ্কিত করিলেন। সম্রাট উহার সৌন্দর্য্য ও শিল্প-নৈপুণ্য দর্শনে অতিশয় মুগ্ধ হইলেন। তখন উ-তাও-শু তাহার হস্ত-ধারণ করিলেন। চিত্রে একটি বৃহৎ গুহা দৃষ্টিগোচর হইল!! শিল্পী স্বষ্ট শিল্পের মধ্যে পদার্পণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন—তাঁহাকে আর ইহলোকে দেখা গেল না!!!

ইহার ভাবার্থ এই যে, শিল্পী ও শিল্প, স্রষ্টা ও সৃষ্টি পথিক ও পথ মূলতঃ এক ও অভিন্ন। ইহাই চীনের শিল্প-সাধনা। চীন-শিল্পের সাধনায় অন্তরের চক্ষু ও কর্ণ উন্মুক্ত হয় এবং শ্রবণ ও দর্শন-শক্তি সাম্য ও একত্ব দর্শনের যন্ত্ররূপে পরিণত হয়। তখন চক্ষুবান ও কর্ণবান মানুষের নিকট অন্তর্জগতের পরম পদার্থের যৎকিঞ্চিৎ দৃষ্টিগোচর ও শ্রবণগোচর হয়। এল, আডাম্‌স্ বেক (৩) কোন ধ্যান-মগ্ন শিল্পীর মানস-চক্ষে একটি বৃক্ষের সূক্ষ্ম রূপ কিরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল তাহার একটি অত্যাশ্চর্য্য বর্ণনা দিয়াছেন। "আমি বৃক্ষের বহিঃস্বরূপটি আর দেখিতে পাইলাম না। বৃক্ষের প্রতিবিম্ব মাত্র আমার আমার চক্ষুর সম্মুখে রহিল। সূর্য্য কিরণে যেমন কোন বস্তুর ছায়া পড়ে ইহা ঠিক তদ্রূপ। বৃক্ষের এই প্রতিবিম্ব জ্যোতির্ম্ময়। নির্ম্মল অথচ মধুর ও শীতল জ্যোতিঃ এই সূক্ষ্ম-রূপ হইতে নির্গত হইতে লাগিল। ঐহিক বস্তুর ছায়ার ন্যায় উহা স্থির বা অন্ধকারময় নহে। জলমধ্যস্থ চারাগাছের সুনীল পাতার ন্যায় উহা নীলাভাযুক্ত। এই বৃক্ষের ঊর্দ্ধাংশ জলের ন্যায় সুশীতল, জ্যোতির সহস্র রশ্মিদান করিতে লাগিল। এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য সত্যই চর্ম্ম-চক্ষুর গোচর নহে। বাহিরের আলোক অন্ত-র্জ্যোতির আভাস মাত্র। সূক্ষ্ম ও স্থূল-আলোক মূলতঃ অভেদ। তবে যন্ত্র যতই সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ হয় ততই সেই যন্ত্রে বেশী আলোক প্রকাশিত হয়। পৃথিবীস্থ বৃক্ষরাজির সমষ্টি জীবন যেন আমার পরিজ্ঞাত হইল।" চীনের কবি ও শিল্পীগণ বস্তুনিচয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ লাভ করিয়া তদনুযায়ী চিন্তা ও কার্য্য করিতেন। তাহারা সঙ্কীর্ণ মানবীয় সম্বন্ধের ও ভেদের অতীত হইয়া বিশ্বের প্রাণ-তন্ত্রীতে সাম্যের সুমধুর সুর গাইতে জানিতেন। পাশ্চাত্য-শিল্প যেমন নগ্নত্ব

(nudism) বা লিঙ্গত্বের (sex) সাধনায় পারদর্শী চীন-শিল্পী ঠিক উক্ত বিষয়ে তদ্রূপ অনভিজ্ঞ। জীবনের সহিত জীবনের—ক্ষুদ্র জীবনের সহিত বিরাট জীবনের—যোগস্থাপনই চীনের প্রকৃত সাধনা। প্রাচীন চীন অনুভব করিয়াছিল জীবন-শিল্পই ধর্ম্ম।

জে, ডবলিউ, টি মাশনের (৪) মতে শুধু শিল্পে সাহিত্যে ও স্থাবর বস্তুতে নহে, জীব-জগতের সহিত ব্যবহার বা যোগাযোগেও চীনের শিল্প সাধনা প্রকাশিত। সুন্দরের সাধনাই চীনের জীবন-ধর্ম্ম। চীনদেশীয় ধর্ম্মানুযায়ী ঈশ্বর স্বীয় আকৃতি ও স্বভাবানুযায়ী মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং যে মানুষ স্বীয় আত্মার অন্তরে দেবত্ব দর্শন করে তিনি স্রষ্টার সৃষ্টি-লীলায় বা স্থিতি, ও সংহার কর্ম্মে সহযোগীরূপে চালিত হয়। চীন-ধর্ম্মের দুই অংশ প্রকৃতি-পূজা ও ঋষি-উপাসনা তাহার শিল্পে প্রকাশিত হইয়াছে। ডাক্তার র‍্যাল্‌ফ্‌ শোকমান (৫) বলেন প্রকৃত শিল্পীর বৈশিষ্ট্য এই: "কোন কিছুর মধ্য দিয়া নিজেকে প্রকাশ না করিয়া নিজের মধ্য দিয়া তিনি পরমার্থ বস্তুর প্রকাশ করিবেন। বিথোভেন অশ্রুত-সঙ্গীত শ্রবণে নিজেকে প্রকাশ না করিয়া এই শব্দহীন সঙ্গীত প্রকাশ করিতে লাগিলেন।" চীন-শিল্পের বিশেষত্ব হচ্ছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে ধর্ম্ম ও দর্শনের পরমার্থ-সত্যগুলি ফুটিয়ে তোলা। চীন ভাগবত-শিল্পের সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিল।

মানব ও প্রকৃতির স্বর্গীয় মিলনের প্রতীকরূপে চীনে শিল্পের উৎকর্ষ হয়। শিল্প ও ধর্ম্মের আদর্শই এই একত্ব। উভয়ের সাধনায় সাধক সত্য, শিব ও সুন্দরের সহিত একীভূত হয়। কবি কীটস্‌ যেমন বলিয়াছেন "আমি চক্ষুতেই বাস করি।" শিল্পী একটী 'দৃষ্টি'মাত্রে পরিণত হয়। চীনের একটী প্রবাদে আছে, যে মন জলের মতন সব কিছু গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদের প্রতিবিম্ব প্রদান করে তাহাই প্রকৃত গ্রহণশীল মন। চীনের শিল্পে আধিভৌতিক এমন কিছু নাই যাহা তাহার ধর্ম্মে ছিলনা। চীনের এই সত্য ও সুন্দরের সাধক এবং অরণ্য ও পর্ব্বতবাসী শিল্পীগণের নিকট নদী ও পর্ব্বত, আকাশ ও সমুদ্র, উপবন ও উদ্যান স্বর্গের আকার ধারণ করিত কারণ এই সকলের মধ্যে তাহারা ঈশ্বরের সামীপ্য অনুভব করিত।

৮ম হইতে ১৩শ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাং ও শাং রাজবংশের অভ্যুদয়ের সময় চীনের গৌরবময় যুগের চরমোন্নতি হইয়াছিল। সম্রাট তাই শাং বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের বিরোধের স্পর্শে আসিতেন না। তাহার রাজধানী নেষ্টোরিয়ান খ্রীষ্টান, মানিকেরিয়ান এবং মুসলমানদিগের নিকট সমানভাবে উন্মুক্ত ছিল। ৬৩৫ খ্রীঃ সিরিয়া দেশীয় সাধু ওলোপ্পেন কর্ত্তৃক খ্রীষ্টধর্ম্ম তথায় প্রথম প্রচারিত হয়। সেই সময় তাহার যশ ও সম্পদে আকৃষ্ট হইয়া ভারত, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি নানা দেশ হইতে শ্রোতা আসিতে লাগিল। ৬৪০ খ্রীঃ গ্রীক রাজদূত চীনের রাজদরবারে হাজির হয়। পারস্যের মুসলমান রাজশক্তির প্রথম খালিফগণ ওমর ও ওথমান, এবং কোরিয়া ও জাপান প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশসমূহ হইতেও রাজদূত উপস্থিত হইল। চীন দেশীয় অর্ণবপোত পারস্য উপসাগর অবধি যাতায়াত করিত এবং অন্যদিকে শত শত আরব বণিকগণ চীনের উপকূলে বসবাস আরম্ভ করিল।

ক্র্যানমার বিয়াং সাহেব বলেন (৬) শিল্প ও ধর্ম্মশীলতা ও শিল্পের অন্যান্য পারমার্থিক উৎস লইয়া চীন শতাব্দীর পর শতাব্দী উন্নত ছিল। চীনে দেশ ও সমাজ শাসন ও জীবন নির্ব্বাহের প্রধান গতি আধ্যাত্মিক আদর্শ কর্ত্তৃক নিয়মিত হইত। পশ্চিমে তাই চীন শব্দটীর অর্থ জন-সাধারণের নিকট ছিল "উপকারিতা"—যে উপকারিতার পরিণতি হয়ে সৌন্দর্য্যে। কিন্তু চীনেরা উহা অন্যভাবে প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা বলে—"পৃথিবী স্বর্গের ডাকে সাড়া দিবার পূর্ব্বে স্বর্গ পৃথিবীতে নামিয়া আসিবে। কারণ পৃথিবীই স্বর্গের পাদপীঠ।"

হুগ কশেট (৭) বলেন যে "সমস্ত উন্নত শিল্পের আবেদন কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়ের প্রতি পৃথকভাবে নহে—উহা সমগ্র হৃদয়কে পূর্ণভাবে উদ্বেলিত করিবে। প্রকৃতির বেদীতে সমষ্টির উপাসনাই শিল্পের ধর্ম্ম। চীনে জাতীয়ভাব হইতে শিল্প কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নাই। যে জীবনধারা চীনে পরিপক্ক হইয়াছিল তাহাকে মানবীয় অভিজ্ঞতার

একটী পূর্ণ প্রস্ফুটিত কুসুম বলা যাইতে পারে।" রাজনীতিজ্ঞ, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, ভিক্ষু সকলেই আধ্যাত্মিক রাজ্যের সমানাধিকার উপভোগ করিত। পরস্পরের ভিতর প্রেম, প্রীতি ও সহযোগের বন্ধন অতি দৃঢ় ছিল এবং একের মধ্যে একাধিকের কার্য্য সন্নিবিষ্ট থাকিত। প্রথমে কয়েকটী প্রধান শহরেই চীনের কৃষ্টি পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল—পরে সমস্ত চীন-জাতি উহা সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ ও আয়ত্ত করে।

চীনে ধর্ম্মই ছিল শিক্ষা, শিল্প, ও রাজনীতির মূলভিত্তি। কারণ অন্য যে কোন ভাব অপেক্ষা ধর্ম্ম-ভাবই অধিকতর প্রশস্ত এবং জাতীয় কৃষ্টি যে সকল আকারে পুঞ্জীভূত হয় তন্মধ্যে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠতম। সত্যের প্রতি সমগ্র জীবনের গতি পরিবর্ত্তনের নামই ধর্ম্ম। কবিতা, চিত্রাঙ্কণ ও হস্তলিপি এই তিনটীই চীনে এক ক্যানভাসের উপর মিলিত হইত। বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ পর্ব্বতশিখরস্থ উদ্যান-বেষ্টিত মন্দিরের কক্ষে বাস করিয়া শিল্প সাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। চীনে তাই ধর্ম্ম হইতে শিল্পকে পৃথক করা এক প্রকার অসম্ভব। জীবন ও সত্যের ত্রিবিধ অনুশীলন শিল্প, সঙ্গীত ও কবিতায় হইত। লরেন্স বিনিয়ন (১) বলেন যে, "শিল্প জীবনের একটী অনাবশ্যক বস্তু বা অংশ নহে। উহা বাস্তবেরও দ্বিতীয় সংস্করণ নহে। উহা আদর্শ-জীবনের এক প্রকার সাধনা। সাম্য যাহাই হউক না কেন উহা জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। জীবনের কৌশল বা প্রাণের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বোধ হয় এই সাম্যে।" শিল্প সৌন্দর্য্যের ধর্ম্ম বা সৌন্দর্য্য-যোগ। ওকাকুরা (২) বলেন যে, "সৌন্দর্য্যের মোহিনী-স্পর্শে হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থিগুলি উন্মুক্ত হয়। অন্তরের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়। মন মনের সহিত আলাপ করে। আমরা তখন অশ্রুতনাদ—অনাহতধ্বনি শ্রবণ করি। অদৃষ্টের দর্শন তখন লাভ হয়।" চীন-শিল্পের আদর্শানুযায়ী প্রকৃতির সহিত মানব-সঙ্গীতের সুর-মিলন আবশ্যক। ভ্যান এলাষ্ট সাহেব (৮) বলেন, "৩৬৬ দিনে বৎসর হয় বলিয়া চীন দেশের বাদ্যযন্ত্রের দৈর্ঘ্য ৩·৬৬ ফুট। পঞ্চভূতের অনুযায়ী ৫টী তার আছে। যন্ত্রের উর্দ্ধাংশ নভোমণ্ডলের মত গোলাকার এবং নিম্নাংশ পৃথিবীর ন্যায় সমতল। ১২টী মাসের জন্য ১২টী ষ্টাড্ আছে। চীনের সঙ্গীত বিশ্ব-সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি মাত্র। মানব-মনকে বিশ্ব-সঙ্গীতের আস্বাদ দান করাই তাহার আদর্শ। পর্ব্বত শিখরে, অরণ্য-কান্তারে, আকাশে বাতাসে এই সঙ্গীত সদাই গীত হইতেছে—কিন্তু তাহা আমাদের শ্রবণের অজ্ঞাত।" চীনের সঙ্গীত ধর্ম্মাদর্শের দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। চীনে শিল্পের সহিত সঙ্গীতের অদ্ভুত সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। হস্ত-লিপির মধ্য দিয়া শিল্প ও সাহিত্যের চির-সৌহার্দ্দ্য। চীনভাষার শব্দগুলিকে লিখিত অপেক্ষা চিত্রিত বলিয়াই বেশী মনে হয়। চীনভাষার অক্ষরগুলিকে ভাবের চিত্রিতরূপ বলিলেই ঠিক হয়। শব্দগুলি চিন্তার চিত্রমাত্র। চিত্র শব্দটীর মৌলিক অর্থও তাই।

চীনের কবিকুলও অরূপ সত্যের সাধক। ভারতীয় ঋষিগণের মত তাহারাও মনে করেন বিশ্ব-শক্তি বাক্য মনের অতীত। দিবারাত্রি যখন সন্ধ্যার স্থির মুহূর্ত্তে অনন্তের আভাস দিতে থাকে—সেই কালাতীত সান্তও অনন্তের সন্ধিক্ষণে চীন-কবি দাঁড়াইয়া চিন্তাকে ভাষার রূপদান করে। সেই দুর্লভ সময়ে মানব যখন শরীরের সীমা অতিক্রম করিয়া অসীমে মিলাইতে চায়, তখন সৎ ও অদ্বৈতের অনুভূতিতে দুঃখ ও দৈন্য, শোক ও পরিবর্ত্তনের ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে মন মুক্তিলাভ করে। বৈচিত্র্যের পশ্চাতে একত্বের দর্শন লাভই চীনের সাধনার সিদ্ধি। য়োনা নোগুকী (৯) বলেন, "চীন ও জাপানের শিল্প কল্পনা বা আড়ম্বরের তৃষ্ণা মিটাইতে চায় না। অসীম সৌন্দর্য্যের দান করাই তাহাদের উদ্দেশ্য, অরূপের রূপ-দর্শনে এই পার্থিব-সৌন্দর্য্য তুচ্ছ মনে হয়। সেই সৌন্দর্য্যেই অসীম ও সসীমের আলিঙ্গন দৃষ্ট হয়। এই

See (1) The Flight of the Dragon by Lauence Binyon.
(2) The Ideals of the East by K. Okakura.
(3) The Story of Oriental Philosophy by L. Acams Beck.
(4) The Creative East by J. W. T. Mason.
(5) Morals of Tomorrow by Dr. Ralph Sochman.
(6) The Vision of Asia by Cranmar Byng.
(7) The Proving of Psyche by Hugh Fausset.

(8) Chinese Music by Van Aalast.
(9) Spirit of Japanese Art by Yone Noguchi.

শিল্পী-ঋষিদের নিকট বাস্তব-জগতের মাপকাটি নগণ্য হয়। তাদের শিল্পে সসীম অপেক্ষা অসীমের মহিমাই বেশী প্রকাশিত হইত। সীমার মাঝে অসীমকে ফুটিয়ে তোলাই ছিল তাদের আদর্শ। লরেন্স বিনিয়নের ভাষায় তাঁহারা ভাগবত ইঙ্গিত কীট-পতঙ্গ, জীবজন্তু, লতাপাতার মধ্যে সর্ব্বত্র দর্শন করিতেন। কোন বস্তু বা বিষয়েই অর্থ বা রূপ গ্রহণ করিতে তাঁহারা পশ্চাৎপদ ছিলেন না। সৃষ্টির সামান্য দ্রব্য বা ব্যাপারে তাঁহারা স্রষ্টার প্রকাশ বুঝিতে অনিচ্ছুক ছিলেন না। চীন-শিল্পের এই বিশ্বজনীনতার ভাব অতীব প্রশংসার্হ। অচেতন পদার্থও তাহাদের নিকট সচেতন প্রতীয়মান হইত। মৃত্তিকা বা ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদি ও অলঙ্কারে অন্তর্নিহিত প্রাণ-শক্তির প্রকাশ দ্বারা তাঁহারা শিল্পের সাধন করিতেন। শিল্প সাধনার পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের সর্ব্বগতি ও শক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল।"

এমিল হোভলাক্ (১০) বলেন "চীন-শিল্পীদের চক্ষে ভাবই সর্ব্বস্ব-রূপ নহে। রূপ এই অদৃশ্য, অগ্রাহ্য ভাব-প্রকাশের যন্ত্রমাত্র। শিল্পই চীন-জীবনের শ্রেষ্ঠ কুসুম।" ফ্রাঙ্ক বেকার (১১) বলেন, "শিল্প-সৃষ্টি বিশ্ব-জীবনের প্রতীক মাত্র। শিল্পী ভাবরাজ্যে বাস করেন। রূপের দ্বারা মানবকে সেই ভাবরাজ্যের স্পর্শদানই তাহার কর্ত্তব্য। শিল্প স্বর্গ হইতে মরধামের জন্য অমৃত আনয়ন করিতে প্রয়াসী।" অনুপ্রেরণা বা ভাবাবেশ ব্যতীত শিল্প-সাধনা নীরস ও নিষ্ফল। যে শিল্পী ভাবরাজ্যে যত বেশী বাস করিতে পারেন তাহার সৃষ্টি তত সুন্দর তাহার সাধনা তত সিদ্ধিপ্রদ।"

লি পো ও টু ফু নামক চীনের শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় ছিলেন পরিব্রাজক। টুফু একাকারে শিল্পী ও কবি ছিলেন এবং পদব্রজে, অশ্বপৃষ্ঠে ও নৌকাযোগে নদীবক্ষে অধিকাংশ সময় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। গৃহ, পুত্র, পরিবার ও সংসারের খবর রাখিতে তিনি পারিতেন না। তিনি বলেন প্রকৃতির লীলা-নিকেতনেই আমি জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ লাভ করিয়াছি। ওয়েল্‌শের কেল্টিক কবিদের সহিত চীন-কবিদের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। জল-প্রপাতের গরিমা, অরণ্যের মহিমা, কুসুমের সৌন্দর্য্যে তাঁহারা প্রকৃতির সহিত মিলিত হইতেন। তাঁহাদের নিকট মানুষ ও জন্তুর প্রভেদ ছিলনা। কবি যাহা গান করেন—তিনি তাহাই হইয়া যান। একজন উদীয়মান কবি লি-পোর নিকট আসিয়া অনুরোধ জানাইলেন, "মহাশয়, আমাকে শিক্ষা দিন আমি কিরূপে একজন আদর্শ কবি হইতে পারি।" লি-পো তদুত্তরে বলিলেন "প্রথমে কবিতার নিয়মাদি শিক্ষা কর—পরে রচনা কালে উহা হইতে স্বাধীন হইয়া লিখিতে আরম্ভ কর। নিয়মাদি জানার পর নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারিলে কবি কৃতকার্য্য হন।"

চীন দেশের ন্যায় অন্য কোন দেশে চিত্র ও কবিতার মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয় নাই। চীন দেশের কবিতা চিত্রের মতই দেখিতে সুন্দর আর চিত্র যেন কবিতার আর এক রূপ। টুফুর কবিতাগুলি ছবির মত স্থির জলে প্রতিবিম্বিত নিস্পন্দ বৃক্ষশাখার মত। চীনের শিল্প প্রাণবাদের দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। শক্তি ও বুদ্ধি জীবনের এই দুই প্রধান পদার্থের উৎকর্ষ সাধনা করিতে উহা সুনিপুণ। উ-তাও-শু এবং ওয়াং উই চীন জাতির দুই প্রধান শিল্পী। ঈশ্বরের প্রেম ও জ্ঞান মানবের অন্তরে নিহিত—উহার বিকাশ সাধন চীন-শিল্পের সাধনা। চীন দেশের কবিতায় এমন সুন্দর চিত্র আছে—যখন মন বস্তু-জগতের সীমা ছাড়িয়া ভাবরাজ্যে বিচরণ করে। মন ধীর স্থির ও শান্ত হইয়া অনন্তের মাঝে বিলীন হয়। অসীমের আহ্বানে অধীর হইয়া চীনদেশের এক কবি গাইয়াছেন, "সম্মুখের ফটক দিয়া আমি মঠে প্রবেশ করিলাম। মঠাধ্যক্ষ আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া আসন গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। ধ্যানমগ্ন ভিক্ষুর পার্শ্বে বসিয়া আমার প্রাণ জুড়াইল। আমি দুনিয়ার জ্বালা যন্ত্রণা সব ভুলিয়া গেলাম। সেই গভীর নীরবতার অনুভব করিলাম আমি ও ভিক্ষু এক। সেই অনির্ব্বচনীয় সাম্যের আনন্দে আমি আমার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিলাম। শুধু আমরা—সেই নীরবতা স্পর্শে উদ্যানের ফুলগুলিও স্পন্দহীন হইল। তখন আমার হৃদয়-পদ্মে পরম সত্যের সূর্য্য উদিত হইল।"

কবি পু-চু-ই গাহিয়াছেন, "আমার হৃদয়ে কোন দুঃখের স্থান নাই। বিশ্বদেবকে আমি সদাই আমার মনোমন্দিরে দর্শন করি। এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমি দিন গুণিতেছি কবে আমি বিশ্বদেবের মধ্যে নিজেকে চিরতরে বিলাইয়া অমর হইব।"

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

---

(10) China by M. Emile Hovelaque.
(11) Myth, Nature and Individual by Frank Baker.

# চব্বিশ ঘণ্টায়

## শ্রীগিরিজা মুখোপাধ্যায়

১

ছোটকাল থেকেই বিনয়ের জীবন বিচিত্র ও বিবিধ বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে নানা আঁকাবাঁকা পথে গিয়েছিল। গরীবের ছেলে, অথচ দুরাশার অন্ত ছিলনা, এবং মনে ছিল দুর্জ্জয় আত্মবিশ্বাস এবং অসম সাহস। দুঃখকে সে কোনো দিনই ডরায়নি। কেননা, প্রতিদিন তার মনে এই অভিলাষ কেবলি জাগত, পৃথিবীকে সে একবার দেখে নেবে। শুধু ঘরের কোণে যে শান্ত পবিত্র জীবন, তার প্রতি এর ছিল নিদারুণ অবজ্ঞা, এবং সেই জন্যই আদর্শ বাঙালী ছেলেদের সঙ্গে মনের মিল তার কোনোদিনই ঘটেনি। বিনয় ছিল জীবনের উপাসক, যৌবনের পূজারী, এই জন্যই সারাটা জীবন ধ'রেই এর মনে জমেছিল, অনেক হতাশা, বিক্ষোভ ও অভিমান। মানুষের প্রতি অগাধ বিশ্বাস নিয়ে ষোলো বছরের বিনয় একদিন জীবনের সন্ধানে বেরিয়েছিল, কিন্তু দশবছরের বিপুল অভিজ্ঞতায় যদিও সে বিশ্বাস তার কোনোদিন টলেনি কিন্তু বিবিধ মানুষের অপরিসীম অধোগতি ও নীচতা বারবার দেখে দেখে এর চিন্তা ক্রমশঃই ভিন্ন হ'য়ে উঠছিল।

বিলেতে আসার জন্য এর দিনরাত উৎসাহের সীমা ছিলনা। কতদিন এই স্বপ্নে এর দিন কেটেছে তার ঠিক নেই। য়ুরোপের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ মিতালী হ'য়ে ছিল, পশ্চিমের সাহিত্য দর্শন ও চিত্রের মধ্য দিয়ে, কাজেই এদেশে এসে অবধি তার একদিনও ফুরসৎ ঘটেনি। পুঁথিগত জ্ঞানকে যাচাই করে নেওয়ার জন্য দিনরাত তার পরিশ্রমের অন্ত ছিলনা। যেখানে যা কিছু জানবার, বোঝবার ও দেখবার ছিল, বিলেতে এসে এক মাসের মধ্যে বিনয় বুভুক্ষের মত গ্রাস করেছে।

কিন্তু তার পরেই ঘটল এর জীবনের সত্যিকার বিপর্য্যয়। যাদের কথার উপর নির্ভর ক'রে যাদের উপর বিশ্বাস করে সে এই অনিশ্চিত জীবনের পথে বেরিয়েছিল, তারা একে একে বিনয়কে ত্যাগ করল। লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো ছাড়া অন্য কোনো কাজও তার বিদেশে কোথাও জুটল না।

সেদিন সকাল বেলা উঠেই গৃহ-কর্ত্রী দরজায় ঠকঠক্ ক'রে শব্দ করলেন এবং কোনো উত্তর না পেলেও সশব্দে ঘরে ঢুকলেন। দুসপ্তাহের টাকা না পেয়ে মর্ম্মাহত এই ইংরেজ-মহিলা, সামান্য সৌজন্যটুকুও বিসর্জ্জন দিয়েছিল। বিনয়কে সুপ্রভাত বলে বাধিত করতেও সে ঘৃণা বোধ করছিল।

গৃহকর্ত্রী বললেন—"মিঃ ব্যানার্জ্জী, আজকেও যখন তোমার টাকা এলনা, তখন ঘরের চাবি আমাকে ফেরৎ দিয়ে যাবে। আজ থেকে তুমি আর বাড়ীতে ঢুকতে পাবে না। টাকা দিতে পারলে এসে জিনিষপত্র নিয়ে যেও।"

বিনয় আমতা আমতা করে বলে, "বুঝলেনা মিসেস ওয়ারেন, সাত হাজার মাইল দূরে আমাদের বাড়ী। টাকা আস্‌তে ত—"

বুড়ী তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে, "ও সব আমি বুঝি না বাবু। পয়সা না নিয়ে তোমরা এ দেশে আসই বা কেন? আমরা যদি তোমার দেশে যেতুম, তা হলে কি পয়সা না নিয়ে যেতে পারতাম?"

বিনয়ের মুখে যে উত্তর আসছিল, সেটা চাপা দিয়েই সে বল্‌লে, "তা ত বটেই, তবে বুঝলে কি না—"

এবার এই ইংরেজ মহিলা সত্যিই বীরাঙ্গনা হয়ে উঠলেন

—"আমি ও সব ঢেব বুঝি। আজ থেকে তুমি বাড়ীতে ঢুক্‌তে পাবে না। এই শেষ কথা।"

অগত্যা বাধ্য হয়ে বিনয় ওভারকোটের পকেট থেকে চাবিটা বার ক'রে কম্পিত হস্তে বাড়ীওয়ালীকে সমর্পণ করল। এইবার মিসেস ওয়ারেন সৌজন্য প্রকাশে ত্রুটী করলেন না। তিনি বললেন, "ধন্যবাদ," এবং সদর্পে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

বেনয়ি তখনও রাত্রিবাস অঙ্গে। জানলার পর্দা সরিয়ে সে দেখল তখনও রাস্তায় বরফ পড়ছে। দূরে হ্যাম্পষ্ট্যাড হিদের মাঠ বরফে সাদা হয়ে গেছে। এই দারুণ দুর্দ্দিনে তার পকেটে একটী পেনীও নাই। বাইরের দিকে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে তার চোখে জল এল। তার মনে হ'ল, বোধ হয় সে এখনই মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়বে।

কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে আগুনের কাছে এসে বসল। কয়লার অভাবে অনেকক্ষণ আগেই আগুন প্রায় নিভে গেছে। বার দুই খোঁচাখুঁচি করেও যখন আগুন আর জ্বলল না, তখন গাউনের পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে চোখ মুছে বিনয় কাপড় পরতে লাগল।

## ২

রাস্তায় বেরিয়েই বিনয় টের পেল সে শীতে কাঁপছে। মাত্র জুতোড়া মোজা, তাও শতছিন্ন। বরফের উপর দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে তার মনে হচ্ছিল এখনই সে বসে পড়বে। পা থেকে আরম্ভ ক'রে সমস্ত শরীর তার দুলছে। যেমন শীত আর তেমনি ঝড়।

কিন্তু কী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এই বরফে ছাওয়া দেশের। সমস্ত বাড়ী ঘর, ছাদ, জানালা সাদা হয়ে গেছে। চিম্‌নীর ধোঁয়া কালিমাখানো বাড়ী ঘর দোর কার অঙ্গুলি স্পর্শে একরাতের মধ্যে শুভ্র হ'য়ে উঠেছে। কী নির্ম্মল দীপ্তি, কী স্বচ্ছ আভা!

চারদিকে ছেলে মেয়ে, বুড়ো বুড়ীর দল বরফের মধ্যে ছুটোছুটী করছে, এ ওর গায়ে বরফের ঢিল ছুড়ে মারছে। কী প্রচণ্ড দাপাদাপি।

তার মনে পড়ল, একদিন দার্জ্জিলিংয়ে কাঞ্চন-জঙ্ঘার দিকে তাকিয়ে হিমালয়ের স্নিগ্ধ নিস্তব্ধতা তাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। এক অন্তর্মুখী বেদনা তার চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল। সে ভেবেছিল, এই নিঃসারতা, এই নির্ব্বিকারতার আহ্বান কতখানি সত্যি। মানুষকে ঊর্দ্ধে টেনে নেওয়ার যে নিঃশব্দ ইঙ্গিত, তার সার্থকতা কোথায়?

কিন্তু আজ তার মনে হল, এইখানে, এই শক্তি-অভিমানী জাতির দেশে প্রকৃতির আহ্বান অন্য রকমের। মানুষকে নিশ্চল নিষ্ক্রিয়তার দিকে প্রকৃতি টানেন না। প্রকৃতির আঙ্গিনায় নব নব খেলার অভিনয়ে যোগ দেওয়ার জন্য এর ডাক। এই জন্যই, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে হৃদয়ের যোগ এত ঘনিষ্ঠ, এদেশে মানুষ ও প্রকৃতির মাঝখানে ব্যবধান অল্প, পরিচয় গভীরতর। প্রকৃতি এখানে বিশাল নয়, এখানে প্রকৃতির ক্ষেত্র দিগন্তবিস্তৃত ও সীমাহীন নয়। এ-যেন ইংলণ্ডের বৈঠকখানা, বাগানবাড়ীর ড্রয়িংরুম। এর সজ্জা, এর শোভা, এই জন্যই এত মার্জ্জিত, এত খানি সুললিত ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন।

বিনয় এই সব নানান কথা ভাবতে ভাবতে মাঠের দিকে চলেছে। এক এক সময়ে তার মনে হচ্ছিল, সে যেন স্বপ্ন-গ্রস্ত। তার সামনের সুমধুর সৌন্দর্য্য, এবং পেটের ক্ষুধা কোনটাই সত্য নয়। যেন দুটোই ফাঁকি। কেননা, এমন দিনে, এমন উৎসবের প্রভাতে তার পেটে আহার নাই, একথার কী কোনো অর্থ হয়? কেমন করে এও সম্ভবপর হল, যে এমনি আনন্দের উষায় সে আজ এই প্রথম চিন্তা নিয়ে জাগল, যে আজ সারাদিন খাবে কি? বিনয় একবার ভাবল, তার পেটের ক্ষুধাটা নিতান্তই অসত্য, এর সত্যিকার অস্তিত্ব আজকের দিনে অন্ততঃ অসম্ভব।

কিছুদূর যেতেই সে দেখল, রাস্তা দিয়ে একটা ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে আস্‌ছে দিলীপ ওরফে মিঃ রে। দিলীপকে সে দেশ থেকেই চিনত এবং ভাল করেই। এদেশে এসেও তাদের প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। দিলীপ উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্‌ল, "হ্যালো বিনু, কী লাভলি, আজকের সকালটা। চোখ জুড়িয়ে যায়। নয় কি? তোমার কী হলো কথা কইছনা যে?"

বিনয় বলল—"হ্যাঁ, সত্যিই ভারী চমৎকার লাগছে আজ ভোর থেকে। তার পর, কোথায় চলেছ ?"

"এই খানিকটা ঘুরে আসি মাঠে। কাল রাত প্রায় তিনটের সময় একটা নাচ থেকে ফিরেছি। কাজেই শরীরটা এখনও ম্যাজ ম্যাজ করছে। তোমার খবর কি ? এখনও ব্রোক্ নাকি ? চলনা আজ টিভালিতে ছবি দেখে আসি, ফ্রক্ষেষ্টাইন। ভারী সুন্দর হয়েছে শুনলুম।"

"আমি ভাই পূর্ব্ববৎ। খাওয়ার পয়সা নাই, ছবি দেখব ?"

"ভারী দুঃখিত বিনু তোমার জন্য। এমন দিনে হাতে পয়সা না থাকলে আমি হয় গুলি ক'রেই মরতুম।"

"ভাল কথা, দিলীপ, গোটা ছয়েক পেনী দিতে পার ? আজকের আমার খাবার একটীও পয়সা নেই।"

"হ্যাঁ ভাই বুঝলে কিনা। আমারও ত খুব টানাটানি। তা ছাড়া ডরোথীকে বলেছি আজ রোমানোতে নিয়ে যাব। কাজেই বুঝলে কি না,—কি বলে তোমার—আজ প্রায় দু পাউণ্ডের ধাক্কা। কাজেই ভাই মাপ করো। মনে কিছু করো না যেন। তাহলে আসি, কি বল ? গুড্ বাই।

দিলীপ্ হন্ হন্ করে আবার চলে গেল। বিনয় একবার তার দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে আবার হাঁটতে সুরু করল।

৩

তখন বেলা দুটো। সকাল থেকে বিনয় শুধু হেঁটেছে, চোখের জলে, আর বৃষ্টিতে টাইটা ভিজে চপ্ চপ্ করছে। কোথায় যাবে, কি করবে কোনো কিছুরই তার ঠিক নেই। কতবার সতৃষ্ণ নয়নে হোটেল কাফের জানালাগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে চোখের জল ফেলেছে, আর ভেবেছে কী দারুণ অবনতি ঘটল তার। কোথায় প্রিয়তমার জন্য, বসন্ত বায়ুর জন্য সে হা-হুতোশ করবে, চোখের জলে বালিশ ভেজাবে, তা নয় এক টুকরো রুটীর জন্য এক বাটি চায়ের জন্য সে চোখের জল ফেলছে। এইত একটু দূরেই হ্যাম্পষ্টেড হীথ। ঐখানে ঐ মাঠের দিকে তাকিয়েই ত কীটস্ ইসোবেলা লিখেছিল, প্রেমের মর্ম্মন্তুদ গান ত এই খান থেকেই কবির কণ্ঠে উদ্গীত হয়েছিল। আর সে কি না, য়ুনিভার্সিটির সাহিত্যের ভাল ছেলেটি হয়েও, ক্ষুধার্ত্ত কুকুরের মত কেবল খাবার দোকানের আশে পাশে ঘুরে বেড়াল। এই হ্যাম্পষ্টেড হীথ, সাহিত্যের ভেতর দিয়ে কত রকমে সে তাকে জেনেছে, কত শিল্পীর তুলিকা-পাতে, কত কবির বন্দনা-গানে এর সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত। অথচ, তার কাছে এর কোনোই মানে নাই। আজ সে শুধু চায় এক টুকরো রুটি আর এক বাটী চা। বিনয়ের মনে বারবার এই কথাই জাগছিল যে এত কবিতা, এত সঙ্গীত, পৃথিবীর এত সৌন্দর্য্য মানুষের বাহ্য প্রয়োজনের কাছে কি কিছুই নয়। আজকের এই নিদারুণ শীত, জিরো ডিগ্রির উত্তাপ, আর তার পকেটে একটিও পয়সা নেই। এই যে তিনটি ঘটনার সমাবেশ, এর কাছে কী আর সমস্তই তুচ্ছ ? তার মনের ও প্রাণের আর সমস্ত দাবী, তার পেটের ক্ষুধার কাছে পরাভূত। এই যদি সত্য হয়, তবে মানুষ কেবল ক্ষুধার গানই গাহিল না কেন ? সকলের উপরে সমাজ ও ব্যক্তি ক্ষুধার দেবতাকেই পূজা করল না কেন ? যুগ যুগ ধরে এই বঞ্চনার কোথায় সার্থকতা ছিল, এই কথাই তার মনে বার বার পীড়া দিচ্ছিল।

কতদিন ত সে শুনেছে, তর্ক করেছে, যে মানুষ কেবল পেটের তাগিদে বেঁচে থাকতেই পৃথিবীতে আসে নাই। মানুষের জীবনে আরও বৃহত্তর মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। কেবল বেঁচে থাকাটাই সব নয়।

কিন্তু বেঁচে থাকাটাই যদি এত নিদারুণ হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে এর উপরের কথাটা সে ভাববে কি ক'রে ?

কিন্তু তবুও ভাবতেই হ'বে। কেননা, তার শিক্ষা-দীক্ষা আছে উন্নত রুচি আছে কাজেই আর সবাইকার মত নিজেকে পথের কাদায় টেনে আনবে কি ক'বে ? বিনয় তাই ভাবত, এবং এমন ক'রে কোনোদিনই ভাবেনি, যে একটী দিন পেটে আহার না পড়লে মানুষ যখন পাগল হ'য়ে ওঠে তখন এ-সব শিক্ষার প্রয়োজন কি ?

পথ চলতে চলতে একবার তার মনে হ'ল পাশের পরিচিত কাফের ঐ পরিচারিকা মেয়েটী তার দিকে তাকিয়ে হাসল না কি ? ছোট্ট একটা ইটালীয়ান্ দোকান।

পাড়ার যত নিষ্কর্ম্মার দল সন্ধ্যার পর এক বাটী চা সামনে রেখে আড্ডা দেয় আর ঐ সুন্দরী ইটালীয়ান্ মেয়েটীকে জ্বালাতন করে। কিন্তু যাই হোক্ এই দোকানের হ্যাম-স্যাণ্ডুউইচ কিন্তু পরম উপাদেয়।

বিনয় কাঁচের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ভাবে, আহা রে, যদি কেউ হঠাৎ ধপ্ ক'রে একখানা স্যাণ্ডুউইচ ওর মুখে ফেলে দ্যায়। অথবা রোজিনা বুঝতে পারে, আজ দুইদিন ধ'রে আমি কিছু খাইনি; এবং তাই যেই আমি দোকানে ঢুকব অমনি টুপ্ ক'রে আমার ওভার-কোটের পকেটে তিন চার-পাঁচ খানা স্যাণ্ডউইচের বাণ্ডিল ফেলে দেবে। আর আমি যেন ভুল করে দোকানে ঢুকেছি অথবা এমন একটা দামী জিনিষের ফরমায়েস দেব, যা হ্যাম্পষ্টেডের ত্রিসীমানায়ও পাওয়া যায় না, এবং তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গিয়ে হীথের ঐ বেঞ্চিটায় ব'সে বেশ ক'রে, ভাল ক'রে এবং আরাম ক'রে টপাটপ্ গিলব। হায় রে, যীশুখৃষ্টের আমলে ত কতই তাজ্জব ব্যাপার ঘটেছিল। গান্ধীজীর আমলে কি এই সামান্য একটা ঘটনাও ঘটতে পারে না।

আচ্ছা ঢুকেই দেখা যাক্ না। বিনয় যেন মরিয়া হ'য়েই, এবং এখনই একটা মিরাক্‌ল্ ঘটবে, এরকম বিশ্বাস ক'রে দোকানে ঢুকে পড়ল। রোজিনা প্রসন্ন-মুখে এগিয়ে এসে বল্‌ল, "কী চাই, তোমার আজ হঠাৎ অসময়ে! কী সুন্দর বরফ পড়েছে দেখেছ?"

"হ্যাঁ, দেখছি বই কি? তোমাদের দোকানে নিশ্চয়ই এখন স্যাণ্ডুউইচ্ পাওয়া যায় না?"

"কেন যাবে না! আমরা ত সারাদিনই তৈরী রাখি। কয়খানা দেব?" এই ব'লেই রোজিনা, এগিয়ে গিয়ে একটা প্লেটে স্যাণ্ডুউইচ্ সাজাতে লাগল।

বিনয় ত অপ্রস্তুত! কোথায় পাবে সে স্যাণ্ডুউইচের দাম! তাড়াতাড়ি এ-পকেট ও-পকেট মিনিটখানেক হাতড়ে বল্‌ল—"দেখ্ রোজিনা, আমি ত ভেবেছিলুম তোমাদের এখানে স্যাণ্ডুউইচ্ পাব না। তাই—বুঝলে কিনা,—পয়সা নিয়ে আসিনি। কাজেই আমাকে মাপ করো।" রোজিনা বললে—"তাতে আর কি হয়েছে। পরে দিয়ে যেও, তাহ'লেই হবে।"

বিনয় একেবারে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল। সত্যিই তা হ'লে ঐ স্যাণ্ডুউইচ্‌গুলো তার? তার মনে হ'ল রোজিনা যেন কাউণ্টারের ওপারে ম্যাডোনার মতই মমতাময়ী দেবী।

রোজিনা গুণ্‌তে গুণ্‌তে বল্‌ল, "ছ'খানা দিই।"

বিনয় নিজেকে সাম্‌লে নিয়েছিল। অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে উদাসীনভাবে বলল—"ছ'খানা? আচ্ছা তাই দেও।"

পকেটে স্যাণ্ডুউইচ্ পুরে আনন্দের চোটে রোজিনাকে সে ধন্যবাদ দিতেও ভুলে গেল। রাস্তায় বেড়িয়ে তার মনে হ'ল, পায়ের নীচে পৃথিবী যেন আনন্দে টল্‌মল্ করছে। তিন দিন পরে, আজ সে ছয়খানা স্যাণ্ডুউইচের মালিক! এ সৌভাগ্য সে কোথায় রাখবে? জোরে জোরে পা ফেলে বিনয় এবার বুক ফুলিয়ে হাঁটতে লাগল।

## ৪

চারটে বেজে গেছে। ইতিমধ্যে আকাশ একটুখানি ফর্সা হয়েছে এবং হীথের চারপাশে বরফ গলে গলে ঘাসের চিহ্ন দেখা দিয়েছে। বিনয় প্রায় দুই ঘণ্টা ধ'রে একটা বেঞ্চিতেই ব'সে আছে। প্রায় এক ঘণ্টা ধ'রে নানা রকমে এবং বিবিধ ভঙ্গীতে সে স্যাণ্ডউইচগুলো ব'সে ব'সে চিবিয়েছে। এখন তার হাতের সামনে কোনো কাজ নেই। ভস্মীভূত স্যাণ্ডুউইচ্‌গুলোর স্মৃতিই তার মনে বার বার ক'রে জাগছে। তার ক্ষুধা আবার প্রচণ্ড হ'য়ে উঠ্‌ছে।

এখন সে কি করবে? সামনে সমস্ত রাত, এবং বান্ধব-শূন্য লণ্ডনে সে কপর্দ্দকহীন। কোথায় যাবে সে, কি করবার আছে তার?

এরকম বিপদে মানুষে নাকি ভগবানের কথা ভাবে? সেও কি ভগবান্‌কে ডাকবে? কোন্ ভগবান্‌কে ডাকলে এই মিসেস্ ওয়াবেনের পাষাণ হৃদয় গলবে? কেষ্ট-ঠাকুর ত এই ম্লেচ্ছ-মহিলাকে জব্দ করতে আসবেন না? আর যীশুখৃষ্ট, সেইবা এই কালা আদমীর প্রার্থনা শুনবে কেন?

বিনয় ভাবতে সুরু করল,—আচ্ছা যীশুখৃষ্টের গায়ের রংত ইংরেজগুলোর মত টকটকে লাল ছিল না। তা হ'লেও, এত বর্ণ-বিদ্বেষ সত্ত্বেও এরা যীশুখৃষ্টের ভজনা করে কি

ক'বে? য়িহুদীদের গায়ের রং ত প্রায় আমাদেরই মত। তা সত্ত্বেও যীশুখৃষ্ট এত পূজা, এত নৈবেদ্য পায় কি ক'রে?

ঐত একটা গির্জ্জার চূড়ো হ্রদের ওপারে দেখা যাচ্ছে। ঐখানে গিয়ে ধর্ণা দিলে কী মিসেস্ ওয়াবেনের মনে অনুতাপ আসবে? এবং অনুতাপে দগ্ধ হ'য়ে আমাকে একটা পাকা ডিনার খাইয়ে দেবে? সুপ্, গরুর ডালনা, মিষ্টি আর কাফি! খাবার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে বিনয়ের চোখ অশ্রু-ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। মনে হয় তার চিন্তার সমাপ্তি ঘটেছে, এই খাদ্য-সমুদ্রে। ঐখানেই তার পার্থিব অস্তিত্বের নির্ব্বাণ।

এই রকম ভাবেই অনেকক্ষণ কেটে গেছে। এমন সময় বিনয় বুঝতে পাবল, একটী লোক বারবার তার বেঞ্চের পাশ দিয়ে ঘোরাঘুরি করছে এবং মনে হ'ল সেও যেন ঐখানে বস্‌তেই উৎসুক। বিনয় তাকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাক্‌ল এবং বসতে বল্‌ল।

লোকটী অত্যন্ত বিনয়েব সহিত বল্‌ল, "ধন্যবাদ।"

অনেকক্ষণ দুজনেই চুপ্‌চাপ্। কথা জোগায় না দে'খে বিনয় আস্তে আস্তে বলল—"কী সুন্দর বরফ পড়েছে!"

লোকটী এবার যেন সজাগ হ'য়ে উঠল এবং বল্‌ল, "হ্যাঁ, ভারী চমৎকারই বটে। তোমাদের দেশে ত তোমরা বরফ পড়তে কোনোদিন দেখ না। নয় কি?"

বিনয় বলে—"হ্যাঁ, ভারতবর্ষের যে সমস্ত জায়গায় বরফ পড়ে সেখানে আমি কোনোদিন যাইনি।"

লোকটী আগ্রহের সহিত আবার জিজ্ঞেস করে—"আমাদের দেশ তোমার কেমন লাগে?"

বিনয় বলে—"সেকথা শুনলে তুমি কি খুসী হবে?"

লোকটী মাথা নেড়ে বস্‌তে থাকে—"নিশ্চয়ই, তুমি কি ভাবছ আমাদের দেশের নিন্দা করলে আমি খুবই দুঃখ পাব? এদেশের জলমাটীর উপর আমার দরদ এত বেশী নয় যে অন্য কারো সমালোচনা অসহ্য হবে।"

বিনয় বল্‌ল—"তা না হ'লেও, জানো ত প্রত্যেক মানুষেরই স্বজাতির প্রতি একটা নিবিড় রক্তের টান আছে, যাতে কবে নিজের অজ্ঞাতসারে সে নিজের দেশ ও জাতির প্রতি পক্ষপাতী হ'য়ে ওঠে।"

লোকটী উত্তরে বলে—"তা হ'তে পাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা কি আজকের দিনে সত্য নয় যে পৃথিবীতে আজ এমন একদল লোক জন্মাচ্ছে যারা কেবল নিজেদের দেশের কথাই ভাবে না, নিজেদের সঙ্গে মিলিয়ে সকল জাতি এবং সকল মানুষের কথাও ভাবে।"

বিনয় বল্‌ল—"তার সংখ্যা কত কম জানি ব'লেই ত প্রতি পদে সাবধান হ'তে হয়।"

লোকটী উত্তরে বল্‌ল—"তার সংখ্যাই ত আমাদের কালে সব চাইতে বেশী। যারা খেতে পায় না, যাদের শোবার যায়গা নেই, তাদের আবার দেশ কি, তাদের আবার জাতি কোথায়? তোমার মুখ দেখেই ত বুঝতে পারছি, তোমার খাবার জোটে না, বোধ হয় মাথা গুঁজবার ঠাঁইও নেই এবং আমারও যখন সেই অবস্থা তখন তোমাতে আমাতে তফাৎটা কোথায়? তোমার গায়েব চামড়া কটা ব'লেই কি তুমি আমার চ'ইতে আলাদা? আমি ত শুধু এই বুঝি যে পৃথিবীতে মাত্র দুটো জাতি আছে, যারা খেতে পায় ও যারা পায় না। তুমি আর আমি ত সগোত্র।"

বিনয় কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্‌ল—"দেখ যদিও মোটামুটি অথবা তার চাইতেও বেশী ক'রে তোমার কথাটা সত্যি তা হলেও ঠিক এমন সরলভাবে মানুষে মানুষে যে পার্থক্য তা উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আমি সেই জন্য এই সহজ বিশ্লেষণটা সব সময় মেনে নিইনি।"

লোকটী হাসতে হাসতে বল্‌ল—"আমি তোমার মনের গতিবিধি খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু ভাই বুঝলে, আর কয়েক বছরের মধ্যেই দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে যত বৈষম্য যত পার্থক্য আছে সব সরল হ'য়ে এইখানে এসে ঠেক্‌বে, তা তুমি দেখে নিও। কিন্তু সে সব কথা পরে হবে, আমার পকেটে আজ কিছু পয়সা আছে। সেগুলো যেন আমায় কামড়াচ্ছে। চল দুজনে মিলে কিছু গিলে আসা যাক।"

বিনয় অবাক হ'য়ে গেল! সারাদিনে তার একটার পরে আর একটা সৌভাগ্য! আরো একবার খাওয়ার নিমন্ত্রণ এ-সৌভাগ্য সে কোথায় রাখবে? তবুও তার সম্ভ্রান্ত-মর্য্যাদাবোধ তাকে পীড়িত করতে লাগ্‌ল। মুখে

খানিকটা বিড়ম্বনার ভাব দেখিয়ে বল্‌ল—"এর আর কি দরকার? বুঝলে কিনা, আমি ত রাতে আবার বাড়ীতে গিয়ে খাবই। থাক্‌না ওসব হাঙ্গামে। ধন্যবাদ তোমাকে।" লোকটী উৎসাহের সঙ্গে উঠে পড়ল এবং বলতে লাগল—"আরে, রেখে দাও তোমার বুর্জোয়া-সংস্কার। চল ঐখানকার 'পাবে' বসে কিছু খেয়ে আর টেনে নি।"

এই কথা ব'লেই বিনয়কে প্রতিবাদের অবসর না দিয়েই টেনে তুল্‌ল। বিনয় অগত্যা তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে একটা টেবিলের সামনে মুখোমুখি হ'য়ে বস্‌ল।

৫

ইংলণ্ডে গরীবদের বৈঠকখানা এই পাবলিক্ হাউস্-গুলো। যাদের ঘরে আগুন রাখবার পয়সা নাই, যাদের কোনো ক্লাবে চাঁদা দেবার সামর্থ্য নাই, তারাই সারাদিনের খাটুনির পর এক গেলাস বিয়ার কিংবা এক গেলাস 'লাগার' নিয়ে তামাক খেয়ে কয়েক ঘণ্টা এখানে কাটিয়ে দেয় এবং পাড়া-পড়শীর সঙ্গে একটা ছুটো ইতর ইয়ারকি ক'রে মেজাজ হালকা করে।

এহেন স্থানে বিনয় যে অসোয়াস্তি বোধ করবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু তবুও ভোজনের এই অযাচিত নিমন্ত্রণ তারপক্ষে উপেক্ষা করা নিতান্তই কঠিন ছিল। তাছাড়া অনাহুত বন্ধুটীর আন্তরিকতা তাকে মুগ্ধ ক'রেছিল। ছেলেটীর বয়স বেশী নয়, কিন্তু সারা দেহে দারিদ্র্যের ছাপ। মুখের হাসিও যেন বিদ্রূপের মত দেখায়। ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখ্‌লে বোঝা যায় এই হতভাগ্য জীবনে কোনো দিন এতটুকু আরাম বা আদরের সুযোগ পায়নি। এবং জীবন যেন কেবলি নিপীড়ন আর অভাবের সমষ্টি।

কিন্তু তবুও এর পৌরুষ মরে যায় নি। দু গেলাস মদ খাওয়ার পরে জর্জ্জের বাহুতে যেন অসুরের শক্তি এসেছে, এবং মনের দরজা যেন অকস্মাৎ সকল দিক দিয়ে খুলে গেছে। কথায় এর কী ঝাঁঝ, কী নিষ্ঠুর তেজ। কী পৈশাচিক ঘৃণা এর সকল মানুষ আর সমাজের উপর।

বিনয় স্তব্ধ হ'য়ে কেবল জর্জ্জের কথা শোনে। মদ খাওয়া তার অভ্যাস ছিল না। কাজেই বুভুক্ষার পরে দুই গেলাস বিয়ারই তাকে যেন আধমরা ক'রে ফেলেছিল। ভাল ক'রে সব কথা বোঝবার শক্তিও তার লোপ পেয়েছে। সে মাঝে মাঝে দু একটা হুঁ হাঁ ক'রে ঝিম্ হ'য়ে বসে থাকে।

জর্জ্জ অনর্গল বলে যায় কেমন ক'রে একদল মানুষ সমাজের মাথার উপর বসে অনর্জ্জিত অর্থে দিনের পর দিন ভোগের প্রাসাদ তৈরী করছে আর হাজার হাজার লোক তাদের দেহের রক্তে এই ঐশ্বর্য্যের উপাদান যোগাচ্ছে। নির্ম্মম সমাজ-যন্ত্র হাজার হাজার মানুষের আর্ত্তনাদকে উপেক্ষা করে কেবল জন কয়েকের আরাম ও বিলাসের জন্য কলের চাকার মত ঘুরছে। কোথায় কে বাঁচল কোথায় কার জীবন না বাড়তেই শেষ হয়ে গেল সে-সব দেখবার ফুরসৎ তার কোথায়?

ক্রমশঃ রাত বাড়ছিল। দোকান বন্ধ হওয়ার ঘণ্টা বাজল। বিনয় অগত্যা জর্জ্জের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার রাস্তায় হাঁটতে সুরু করল। এখন সে কোথায় যাবে? এই শীতের রাতে আজ মাথা গুঁজবার স্থানটুকুও তার নাই। মনে পড়ল একদিন এমনি শীতের রাতে কলকাতার রাস্তায় সে শুয়ে কাটিয়েছিল। তখন তার মনে ছিল অন্তহীন দুরাশা, জীবন ছিল রঙীন্ স্বপ্নে মস্‌গুল্। সামনের দিকে তাকিয়ে সে সেইজন্যই সমস্ত দুঃখকে অনায়াসে গ্রহণ করে নিয়েছিল। কিন্তু সেদিনের সঙ্গে আজকের কী অসামান্য তফাৎ! আজকে যে তার সমুখে আঁকড়িয়ে ধরার কোনো সম্বলই নাই, তার সমস্ত আশার গ্রন্থি যে ছিন্ন হ'য়ে গেছে, এই নির্ম্মম সত্যটাকে সে আপনার কাছ থেকে লুকোবে কি ক'রে এই কথাই সে ভেবে পাচ্ছিল না। দুঃখকে সে কোনদিনই ডরায় নি, কিন্তু নিরর্থক কষ্ট-ভোগের মধ্যে ত কোনো গৌরব নাই একথা সে যেমন ভালো ক'রে জানে এমন আর কয়জনে জেনেছে।

হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হ'লো তার সমস্ত চিন্তার শক্তি যেন এক মুহূর্ত্তে অবশ হ'য়ে গেছে এবং যেন জীবনের সমস্ত আনন্দ অকস্মাৎ কেমন ক'রে তার চোখের সামনে লোপ পেয়ে গেল। শুধু তার মনে পড়ল কাইজারলিঙের এই রকম অনুভূতির কথা,—যখন দিনের পর দিন ভাব্‌তে

বুদ্ধ

( 'জেসো' পদ্ধতিতে অঙ্কিত )

শিল্পী—৺প্রকৃতি দেবী

মহাসাগরের উপরে জাহাজে কাটিয়ে কাইজারলিঙের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিস্মরণ ঘটেছিল। বিনয়ের এই মুহূর্ত্তে কেবল মনে হচ্ছিল, বিনয় নামে কোনো মানুষের পার্থিব অস্তিত্বটা নিতান্ত বাজে কথা। রাস্তার উপর দিয়ে গড়িয়ে চলা ফুটবলের মত তার অবশ অপার্থিব চেতনাই কেবল সত্যি। আর সত্যি,—ছেঁড়া মোজার ভেতর দিয়ে ঢোকা কন্‌কনে শীত।

খানিকটা টল্‌তে টল্‌তেই, সে পথ চলছিল এবং আশে পাশের মানুষগুলোকে গ্যাস্‌পোষ্টের আলোতে যেন নিতান্তই আবছায়ার মত দেখাচ্ছিল। বিনয়ের চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীর যে মূর্ত্তি জেগে উঠছিল তাকে মনোরম বলা চলেনা, কেননা পৃথিবীকে সুন্দর ভাববার যে বোধ-শক্তি, সুন্দর ক'রে দেখবার যে চেতনা, তা দিনের পরে দিন জীবনের সঙ্গে লড়াই ক'রে তার লোপ পেয়েছিল। বিনয়ের এ পৃথিবীর নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য তাকে দিনের পর দিন সমস্ত জীবন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, কাজেই খুব কন্‌কনে শীতের রাতে গ্যাসের আলোতে রাস্তা আর বাড়ী যে অপরূপ ঔজ্জ্বল্যে জেগে ওঠে তা দেখবার মত দৃষ্টি আজ আর তার কোথায়?

নিজের জীবনকে হাজার বার ধিক্কার দিয়েছে, কিন্তু তবুও এই সামান্য দেহটার জন্য তার কী মায়া? একটী লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগাতেই বিনয় চমকিয়ে উঠ্‌ল, এবং সোজা হ'য়ে দাঁড়াবার চেষ্টা ক'রে বল্‌ল, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত।"

যে লোকটীকে সে ধাক্কা দিয়েছিল সে ইতিমধ্যে থেমে দাঁড়িয়েছে এবং বিনয়ের দুঃখিত বলার ভঙ্গী দেখে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠেছে।

বিনয় এবার সত্যই অপ্রস্তত হ'য়ে উঠল, কেন না এত রাতে একটী মেয়ের গায়ে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় লজ্জা পাওয়াটাকে সে সুশোভন মনে করতে পারে নি। বিনয় এগিয়ে গিয়ে টুপিটা নামিয়ে গলায় যথেষ্ট সৌজন্যের সুর নামিয়ে বল্‌ল—"আমায় মাপ করুন, আমি দেখ্‌তে না পেয়েই আপনার গায়ে ধাক্কা দিয়েছি।"

মেয়েটী বিনয়ের এই কথার উত্তরেও কোনো জবাব না দিয়ে কেবল এক দৃষ্টিতে বিনয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। একটু আগে তার মুখে যে পরিহাসের হাসি জেগেছিল, তা উড়ে গেছে। চোখে মুখে যেন অপরিসীম অনুকম্পা।

বিনয় তার কথার কোনো জবাব না পেয়ে, "আচ্ছা, গুড্ নাইট্, মাপ করুন," বলে যেই পিছন ফিরেছে, অমনি মেয়েটী তার কাঁধে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বল্‌ল—তুমি কি একলা বাড়ী যেতে পারবে? জান, তুমি মাতাল হয়েছ। তোমার পা কাঁপছে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

বিনয় অকস্মাৎ এই আচরণে হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিল। সে খানিকটা জড়িতকণ্ঠেই বল্‌ল—"আমি ত বাড়ী যাচ্ছি না, কাজেই আপনি ভাববেন না। আচ্ছা, ধন্যবাদ।"

মেয়েটী এতক্ষণ ধরে কেবল বিনয়ের চোখের দিকেই চেয়েছিল। বিনয়ের কথার উত্তরে যেন একটু চমকে উঠ্‌ল এবং তারপরে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন স্বরে বল্‌ল—"এত রাতে বাড়ী যাবেনা, তাহ'লে কোথায় যাবে শুনি? লণ্ডনের রাস্তায় রাত একটার পরে এমন কোনো মাধুর্য্য নাই, যার জন্য এত রাতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হবে?"

বিনয় স্পষ্ট বুঝতে পার্‌ল, কণ্ঠে শাসনের সুর। সে আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, কে এই মেয়েটী হঠাৎ রাত দুপুরে তাকে ধমকাতে এল। একে কোনদিনও সে জেনেছে বলে তার মনে পড়ল না, তবুও এর কণ্ঠে যে পরিচয়ের আভাষ, যে স্নেহের প্রকাশ তাতো কৃত্রিম বলে মনে হয় না।

সে একটু রসিকতা করার ভাণ ক'রে বল্‌ল—"কোথায় আর যাব? যদি জাহান্নমে যাবার সুযোগ ঘটে তাহ'লে একবার চেষ্টা ক'রে দেখব আর কি?"

মেয়েটী একটু শক্ত হ'য়ে বল্‌ল—"তাত জানি বাছা, জাহান্নমে যাওয়ার নাম ক'রে তোমরা পুরুষেরা, শেষ পর্য্যন্ত মদের ভাঁটীতেই ত যাও। ঐত তোমাদের দৌড়। কিন্তু ওসব ন্যাকামি ছেড়ে দিয়ে আমায় বল্‌বে কি,—তোমার বাড়ী কোথায়। তাহ'লে তোমায় পৌছে দিয়ে আসতুম?"

বিনয় হঠাৎ বলে ফেল্‌ল—"কোথায় আর যাব? আজ রাতে আমার যাওয়ার কোনো ঠাঁই নাই।"

এই বলে উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

মেয়েটী আবার জিজ্ঞেস করল—"তার মানে ?"

বিনয় কোনো রকমে এর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য একটু রূঢ় স্বরেই বল্ল—"তার মানে দিয়ে তোমার দরকার কি বাছা ? আসল কথা হচ্ছে আমার থাকার জায়গা নেই। এইবার তুমি বাড়ী যাও।"

মেয়েটী এই রূঢ়তা যেন গায়ে নিল না। আবার বল্ল—"ঠাঁই নাই বল্লেই ত চলে না। রাতে এক জায়গায় মাথা গুঁজতে ত হবে। না এই বরফের রাতে রাস্তায় কাটাবে ভেবেছ ?"

বিনয় ক্রমশঃ অত্যন্ত উত্যক্ত হ'য়ে উঠ্‌ছিল। রাস্তার একটা মেয়ে তার উপর সর্দ্দারি করবে এটা যেন কিছুতেই সে গায়ে নিতে পারছিল না। তবুও যতখানি পারে নিজের বিরক্তি গোপন ক'রে সে বল্ল—"যদি দরকার হয় তা হ'লে কাটাব বই কি। কিন্তু তোমার এত মাথা ব্যথা কেন জান্‌তে পারি কি ?"

মেয়েটী একথার কোনো জবাব দিল না। কিছুক্ষণ বিনয়ের দিকে তাকিয়ে মনে মনে কি যেন ভাব্‌ল। তারপর অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে এগিয়ে এসে বিনয়ের বাহুতে নিজের বাহুবেষ্টন ক'রে অত্যন্ত আদরের সুরে বল্ল—"লক্ষীটী, আমার বাড়ীতে চল। রাস্তায় এত রাতে একা ঘুরে বেড়ালে এখুনি পুলিশে তাড়া করবে বুঝেছ কি ?"

বিনয় যেন মহা ফাঁপরে পড়ল। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটী মেয়ে রাস্তা থেকে তাকে বাড়ী যেতে ডাক্‌ছে এ-রহস্য বুঝ্‌বে সে কেমন ক'রে ? খানিকটা হতভম্বের মতই ওর কথামত ওর সঙ্গে সঙ্গে বিনয় চুপ ক'রে হাটিতে লাগ্‌ল। তারপর ধীরে ধীরে বল্ল—"একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ছেলের সঙ্গে এত রাতে হাটিতে তোমার ভয় লাগছে না ?"

মেয়েটী এ-কথায় হেসে ফেল্‌ল। বল্ল—"ভয় ? কিসের ভয় তোমাকে ? আমি কি নিজেকে রক্ষা করতে পারিনে না কি ?"

বিনয় বল্ল—"তা পারতে পার। কিন্তু আমি ত একটা ডাকাত কিংবা বদমায়েসও হ'তে পারি।"

মেয়েটী এবার খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে ফেল্‌ল এবং বল্ল—"ওরে বাপরে ? তুমি হবে ডাকাত। তা'হলেই হয়েছিল আর কি ?"

বিনয়ের মুখের ও চোখের দিকে তাকাতে তাকাতে বল্ল—"কী ডাকাতের নমুনা !"

বিনয় ক্রমশঃই যেন বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ছিল। কী ঘটছে কিছুই সে ঠাহর ক'রে উঠ্‌তে পারছিল না। একে মদের নেশায় তার মাথা ঘুরছে, তার ওপর এই অসাধারণ রহস্যময় মেয়েটী। কি করবে এবং কি বল্‌বে কিছুই সে ভেবে পাচ্ছিল না। তাই সে খানিকটা অবজ্ঞার সুরে বল্ল—"ডাকাত না হ'তে পারি তবুও পুরুষ মানুষ ত ?"

ইতিমধ্যে তাদের একটা রাস্তা পার হওয়ার দরকার হ'ল। কাজেই রাস্তার ওপারে না যাওয়া পর্য্যন্ত কোনো কথাই হ'ল না। রাস্তার ওপারে গিয়ে মেয়েটী একটী বাড়ীর সামনে থাম্‌ল, এবং অত্যন্ত মিনতির সুরে বল্ল—"খুব আস্তে, বুঝেছ ?"

বিনয় কি একটা বল্‌তে যাচ্ছিল। মেয়েটী তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বন্ধ ক'রে দিল। বিনয় অগত্যা আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌তে লাগল এবং মেয়েটী যখন চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুক্‌ল, তখন আস্তে আস্তে সেও ঢুকে পড়ল।

দরজার সামনে প্যাসেজে খুব পুরু কার্পেট ছিল না। কাজেই দুএকবার জুতোর চাপে মেজেতে শব্দ হ'তেই মেয়েটী সঙ্কিতভাবে বিনয়ের দিকে অন্ধকারে তাকাল। বিনয় লজ্জিত হ'য়ে আরও সাবধানে অন্ধকারে পা ফেলে ওর পিছনে চল্‌তে লাগ্‌ল। এক তলাতেই মেয়েটীর ঘর। অল্পক্ষণেই ঘরে পৌছানো গেল। ঘরের ভেতরে ঢুকেই মেয়েটী সুইচ্ টিপে দিল এবং বিনয়কে ঘরে ঢুকিয়েই তাড়াতাড়ি দরজার চাবি বন্ধ ক'রে দিল।

নিজের ওভারকোট ও বিনয়ের ওভারকোট খুলে মেয়েটী তাড়াতাড়ি আগুন করতে লেগে গেল। বিনয় এক কোণে একটা সোফায় ব'সে মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটা আঁচ করতে লাগ্‌ল।

ইতিমধ্যে কয়লা ধরিয়ে মেয়েটী হাতমুখ ধুয়ে বিনয়ের পেছনে এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছে। সারাদিন হেঁটে পরিশ্রান্ত হ'য়ে বিনয় সোফায় বসে চোখ বুজে পড়েছিল। কাজেই

ও কখন এসে ওর পেছনে দাঁড়িয়েছে কিছুই টের পায়নি।

মেয়েটী বিনয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে আস্তে আস্তে বল্‌ল—"কী, ডাকাতি করবে না?"

বিনয় এবার যেন ঠাণ্ডা হ'য়ে উঠেছে। সে তাড়াতাড়ি চোখ রগড়ে ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ল—"তুমি ত ইতিমধ্যেই আমাকে লুট ক'রে নিয়েছ। কিন্তু যাই হোক্ তোমার এত সমস্ত দয়ার জন্ত অসংখ্য ধন্তবাদ। আমার পরিচয়টাও তোমাকে দিয়ে দিই। আমার নাম বিনয় ব্যানার্জ্জি এ-নাম মনে রাখিতে তোমার পক্ষে সহজ হবে না। তোমার নাম?"

"আমার—এভিলিন্ কুক্। তোমাদের নাম আমার কাছে খুব হেঁয়ালীর মত শোনায় না। তোমাদের দেশের অনেক লোককেই আমি এক কালে চিন্‌তুম।"

বিনয় আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌ল্—"ভারতবর্ষের অনেক লোককে চিন্‌তে তুমি?"

"হ্যাঁ, মায়ের কাছে শুনেছিলুম, তাঁর প্রথম জীবনে ভালবাসার আলো জ্বালিয়েছিল তোমাদেরই কোনো দেশী লোক, এবং সারাজীবন তাঁর কুমারী-জীবনের লজ্জাকে যদিও সে ঘৃণা ক'রেছে, তবুও আমাকে যিনি জন্ম দিয়েছিলেন, আজিও বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তাঁর প্রতি মায়ের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অন্ত নাই। আজিও দেখেছি, তাঁর স্বামীর অগোচরে আমার বাপের ছবির দিকে তাকিয়ে তিনি চোখের জল ফেলেছেন।"

বলতে বলতে এভিলিনের চোখও যেন সজল হ'য়ে উঠ্‌ছিল, বিনয় মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, এভিলিন সেদিকে কোনো নজর না দিয়েই ব'লে যেতে লাগ্‌ল—"আমারও যে কতবার ইচ্ছে হয়েছে তাঁকে একবার দেখি। কিন্তু সাত হাজার মাইল দূরে নিদারুণ গরমের দেশে যাবার কথা ভাব্‌লে এক এক সময় ভয় হয়। তাই মন থেকে ঐ ইচ্ছাকে বার বার দূর ক'রে দিই।"

এই কথা বলেই এভিলিন চুপ করল। মনে হ'ল তার সমস্ত অনাদৃত বাল্য ও যৌবনের জন্ত তার মনে যে ক্ষোভ জমে উঠেছিল, তাই অকস্মাৎ যেন এক সঙ্গে মনের দুয়ারে ভীড় ক'রে তার চিন্তাকে সুদূরাভিমুখী ক'রে দিয়েছে। বিনয়ের চুলের মধ্যে আঙুল দিয়ে খেলা করতে করতে সে যেন ক্রমশঃই চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ছিল। তারপর হঠাৎ বিনয়ের অস্তিত্বের কথা তার মনে পড়াতেই ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌ল—"আমি কী ছাইভস্ম বকে যাচ্ছি। তোমার জন্ত কাফি করার কথা এতক্ষণ মনেই পড়েনি। তুমি এখানে চুপ্‌টী ক'রে আগুনের কাছে বসে থাক। আমি পাঁচ মিনিটে কাফি নিয়ে এসে হাজির হব।"

বিনয় যেমন ভাবে ছিল তেমনি চুপ ক'রে সোফায় পড়ে রইল। এইমাত্র যে কাহিনী সে শুন্‌ল তার মর্ম্মান্তিক পরিচয় তখনও তার মনকে উত্তেজিত ক'রে রেখেছিল। সে কেবলই ভাব্‌ছিল, জীবন-যুদ্ধে অপরাজিত এই নিঃসঙ্গ মেয়েটীর কথা, তার অসীম দুঃসাহস ও অপরিসীম তেজের কথা। যেই দুর্ভাগ্য নিয়ে সে এই পৃথিবীতে এসেছিল, সেই অপমানের লজ্জাকে সে কেমন ক'রে দিনের পর দিনে আপন বিক্রমে পরাভূত করেছে সেই কথা ভেবে তার নিজের দুঃখের তীব্রতা যেন অতিশয় মৃদু বলে মনে হ'ল, এবং এই তরুণীর জীবনকে সে সম্পূর্ণ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখ্‌তে আরম্ভ করেছে ভেবে মনে মনে আনন্দ বোধ করল।

এভিলিন্ দুই বাটী কাফি নিয়ে সোফায় এসে বিনয়ের পাশে বস্‌ল। তারপর কাফিতে চিনি দিয়ে নিজের বাটীতে একটা চুমুক দিয়ে অত্যন্ত উল্লাসের সঙ্গে বল্‌ল—"রাস্তায় ঘোরার চাইতে আগুনের ধারে ব'সে কাফি খাওয়াটা খারাপ নাকি?"

বিনয় সচেতন হ'য়ে এভিলিনকে ধন্তবাদ দিয়ে বল্‌ল—"হ্যাঁ, তোমার মত মমতাময়ী কোনো মেয়ে যদি রাস্তায় থেকে আজ আমায় কুড়িয়ে নিয়ে না আস্‌ত তাহ'লে ভালমন্দ বিচারই বা করতুম কী ক'রে?"

এভিলিন্ বিনয়ের পিঠ চাপড়িয়ে উৎসাহের সঙ্গে বল্‌ল—"এত শিগ্‌গির মুসড়িয়ে যেয়োনা বাপু! জীবনটা ত আর গোলাপ ফুলের বিছানা নয়, তবে আর দুঃখ কিসের? সব ভাবনা দূরে রেখে কাফিটা ঠাণ্ডা হবার আগে খেয়ে ফেল্‌ত দেখি, লক্ষ্মী ছেলের মত। ভুলে যাও যে তোমার থাকবার ঠাঁই নাই। আমার কুটীরে আজকের রাতে তুমি একজন সম্মানিত অতিথি। তোমার স্বাস্থ্য, তোমার সফলতার জন্ত এই কাফি পান করলুন।

এই বলে এভেলিন্ নিজের বাটীতে দীর্ঘ একটা চুমুক দিল। বিনয়ও তার পেয়ালাটা মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে এভিলিনের বাটী ছুঁইয়ে এক ঢোক খেয়ে ফেল্‌ল। তারপর আস্তে আস্তে এভিলিনের একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বল্‌ল—"আজকে সকালে যখন পকেটে একটিও পয়সা নাই এই চিন্তা নিয়ে জেগেছিলাম, তখন স্বপ্নেও ভাবিনি, ভগবান্ আমার জন্ত এ রকম আশীর্ব্বাদও কোনোখানে সঞ্চিত ক'রে রেখেছিলেন।"

এভেলিন্ যেন অত্যন্ত বিব্রত হ'য়ে উঠ্‌ল এবং বল্‌ল—"এসব চাটুবাক্য শোনার আমার এখন অবসর নাই।

কাল ভোরে নটায় অফিসে হাজিরা দিতে হবে। কাজেই ইতিমধ্যে একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে। তুমি গিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মত বিছানায় ঢুকে পড়, আমি সোফায় একটা কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ছি।"

বিনয় অকস্মাৎ সজাগ হ'য়ে উঠ্‌ল এবং দৃঢ়তার সুরে বল্‌ল—"তা কিছুতেই হবেনা। তোমাকে সোফায় শুতে দিয়ে আমি আরামে বিছানায় ঘুমোব এ কিছুতেই হবে না। আমি কাপড়চোপড় ছাড়বনা এবং এখানেই ঘুমিয়ে পড়ব। তুমি চট্‌করে কাপড় ছেড়ে বিছানায় ঢুকে পড়।"

অনেকক্ষণ কথা কাটাকাটির পর এভিলিন্ রাজী হ'য়ে আলো নিভিয়ে দিল এবং বিছানার ভিতর থেকে বিনয়কে শুভরাত্রি জানিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

* * * *

তখন ভোর হ'য়ে আসছে যদিও শীতের প্রভাতে আলোর ক্ষীণ রেখাও কোথাও জাগে নি। বিনয় আগুনের কাছে সোফায় পা ছড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। সারাদিনের দুশ্চিন্তা ও ক্লান্তির পর সর্ব্বাঙ্গে তার ঘুম এসেছে। এভিলিন্ কতক্ষণ থেকে সোফার উপর ঝুঁকে তার চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সে জানতেও পারে নি, এবং তার ঘুমন্ত চোখে ও ললাটে কত স্নেহভরে অজস্র চুমো দিয়েছিল তাও সে জান্‌তে পারেনি।

চোখ মেলে যখন চায়ের বাটী হাতে এভিলিন্‌কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখ্‌ল তখনও তার বিস্ময় কাটে নাই। গত রাতের সমস্ত ঘটনা স্মরণ ক'রে ধড়্‌ফড়্ ক'রে উঠেই এভিলিন্‌কে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে বেরুবার জন্য তৈরী হ'তে লাগ্‌ল।

এভিলিন্ দরজার কাছ পর্য্যন্ত এসে করমর্দ্দন ক'রে আস্তে আস্তে বল্‌ল—"এভিলিন্‌কে ভুলে যাবে না ত? এই খামের মধ্যে আমার কার্ড আছে। পকেটে পুরে নাও।"

বিনয় খামটা পকেটে পুরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। এভিলিন্ দরজার আড়াল থেকেও হাত নেড়ে বিদায় জানাল।

( ৬ )

বাড়ীর দরজার সাম্‌নে এসে আশঙ্কায় বিনয় অনেকক্ষণ ধরে দরজার কড়া নাড়তে সাহস পায় নি। অনেকক্ষণ দ্বিধার পরে বেল্ টিপে দেওয়া মাত্রেই মিসেস্ ওয়ারেন ছুটে এসে দরজা খুলে দিল এবং অত্যন্ত সশব্যস্ত হ'য়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বিনয়কে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করল। কেন সে রাতে আসেনি? এই শীতের রাতে কোথায় ছিল ইত্যাদি।

বিনয় অকস্মাৎ মিসেস্ ওয়ারেনের ভাববিপর্য্যয়ের কোনো কারণ খুঁজে না পেয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল এবং অনুভব করল সত্যিই এই ইংরেজ মহিলার হৃদয় তার কষ্টে দ্রবীভূত হয়েছে, এবং লক্ষ্য করল যে মিসেস্ ওয়ারেনের চোখ ছলছল করছে।

ইতিমধ্যে মিসেস্ ওয়ারেনের বিধবা ছোট বোন্ এসে হাজির হয়েছে। সে দিদিকে শীগ্‌গির বিনয়ের জন্য প্রাতরাশ তৈরী করতে পাঠিয়ে দিয়ে ধমকানির সুরে বল্‌তে লাগ্‌ল—"একটা আশী বছরের বুড়ীর রাগের ভয়ে তুমি বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেলে? তুমি না যুবক, তোমার সমুখে না সমস্ত জীবনটা এখনও বাকী? আর তুমি কিনা, কবরে পা বাড়িয়ে রয়েছে, এ রকম এক বুড়ীর ধমকে বাড়ী থেকে ভয়ে উধাও হ'লে? যৌবনের প্রতি কি তোমার এতটুকু মর্য্যাদা-বোধও নাই?

বিনয় বিস্মিত হ'য়ে ভাব্‌তে লাগল, সতিই ত তার যৌবনের যে কানাকড়িও দাম আছে একথা ত আজকের এই মুহূর্ত্তের আগে তার একটিবারও মনে পড়ে নাই। আর সত্যিই কী মানুষের যৌবন একটা স্বতন্ত্র জিনিষ? য়ুরোপে এসেই বারবার একথা সে সর্ব্বত্র শুনেছে, যৌবনের সম্মান কর। সমাজকে, রাষ্ট্রকে? ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে যৌবনের মূল্য অধিকতর। বিনয় ভাব্‌ছিল, কী জানি একথা সত্য কিনা?

আচ্ছন্নের মত অন্যমনস্কভাবে ঘরে ঢুকেই দেখ্‌ল টেবিলের উপর তার নামে ব্যাঙ্ক থেকে এক চিঠি এসেছে। গত কাল দেশ থেকে কে একজন তাকে কিছু টাকা পাঠিয়েছে।

আনন্দের আতিশয্যে অভিভূতের মত সে সোফায় বসে পড়ল এবং গত রাতের কথা মনে পড়াতেই এভিলিনের দেওয়া খাম খানা সে পকেট থেকে বার ক'রে খুলল। খামের ভিতরে কোন কার্ড ছিল না, ছিল শুধু দশ শিলিংএর একখানা নোট আর এই কটি কথা—

I have loved you for a night and the memory of that night will bring for ever bliss to my life. So, Good-bye.—Evelyn.

অনেকক্ষণ অবাক হ'য়ে বিনয় চিঠি ও দশ শিলিংএর নোটখানার দিকে মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে রইল। সে শুধু ভাব্‌ছিল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মানুষের জীবনে কত কিছুই না ঘট্‌তে পারে?

শ্রীগিরিজা মুখোপাধ্যায়

# আলোচনা

## ১। জগতের সর্ব্ববৃহৎ লাইব্রেরী ও বৃটিশ মিউজিয়ম

শ্রীক্ষিতিনাথ সুর বি-এ

গত আষাঢ় মাসের বিচিত্রায় 'নব যুগের সাধনা' প্রবন্ধে, ৭৭১ পৃষ্ঠায় কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় লিখিয়াছেন —'British Museum জগতের মধ্যে, সবচেয়ে বড় লাইব্রেরী; তাহারই পুস্তকসংখ্যা ৪০ লক্ষ মাত্র।'

বর্ত্তমান বর্ষের (১৯৩৪) Hindusthan Year Bookএ জগতের বড়ো বড়ো লাইব্রেরীগুলির একটী তালিকা আছে, তাহাতে দেখা যায় British Museumএর স্থান তৃতীয়। লেখক মহাশয় মুদ্রিত পুস্তকের কথাই বলিতেছেন, সুতরাং অন্যদিক দিয়া শ্রেষ্ঠত্ব থাকিলেও, এই হিসাবে উহা তৃতীয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

নীচে একটা তালিকা দিলাম—

1. Public Library, Leningrad,—About 4, 832, 948 books, 331,000 Pamphlets.

2. Bibliotheque Nationile, Paris,—About 4,000,000 printed books; 20,000 books in Chinese, 125,000 Mss., 205,000 coins and medals and about 3,000,000 prints.

3. British Museum, London,—Probably about 3,200,000 printed books, 53,650 Mss., 85,000 Charters and Rolls, 18,000 seals and casts of seals, 2850 Papyri, 120,000 Oriental printed books and 16,400 Oriental Mss.

Hindusthan Year Book—1934.
P. 23.

Year Bookএর হিসাবে British Museum এর মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা ৩৩ লক্ষের কিছু বেশী এবং রায় মহাশয়ের হিসাবে ৪০ লক্ষ।

রায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের উপাদান কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন জানিনা এবং Hindusthan Year Bookএর কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহার উপাদান কোথা হইতে লইয়াছেন তাহাও জানান নাই। তবে আমার মনে হয়, আপনার পত্রিকায় যখন ইহা প্রকাশিত হইয়াছে, তখন বিচিত্রার পৃষ্ঠাতেই আলোচনা হইয়া স্থির হওয়া উচিত—

১। জগতের মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ লাইব্রেরী কোনটী?

২। British Museumএর পুস্তক সংখ্যা কত?

## ২। বাঙ্গলা সাহিত্যে একশত ভালো বই

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র গুহ বি-এল্

গত মাসের "বিচিত্রা"য় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস এম্, এ, বি, এল্ মহাশয়ের "বাংলা সাহিত্যে একশত ভালো বই"এর তালিকাটি দেখিলাম। শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের তালিকায় "অনেক ভালো বহির নাম তিনি বাদ দিয়াছেন" সন্দেহ নাই। এরূপ বাদ দেওয়া বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের পক্ষে আদৌ অগৌরবের কথা নহে এবং ১০০ খানি পুস্তকের মধ্যে যে তালিকা পর্য্যবসিত তাহাতে বহু ভাল পুস্তক বাদ না পড়িয়াই পারেনা। কিন্তু দাস মহাশয়ের তালিকাটীকে

যদিও তিনি স্বয়ং "সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সম্পূর্ণ দোষবর্জ্জিত ও ভ্রমলেশহীন" বলিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই, তথাপি আমরা এই দাবিটি নিঃসংশয়ে স্বীকার করিতে পারিতেছি না এবং মনে হয় তাঁহার "লাইব্রেরীতে অনেক বাংলা, ইংরেজী, এমন কি ফরাসী ভাষায় অনেক অনেক ভালো পুস্তকই" থাকা সত্ত্বেও তিনি "যে সব অক্লান্তকর্ম্মী সাহিত্যসেবী বহুবৎসর ধরিয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া বহুদিক্ দিয়া নানা উপকরণ ও আনুষঙ্গিক মালমশ্‌লা সংগ্রহ করিয়া যে সব অমূল্য রত্নরাজি বাংলাভাষায় দান করিয়াছেন তাঁহাদের কোন সন্ধানই তিনি লন নাই।" আমিও "শুধু একখানি গ্রন্থের নাম করিব", যে "বইখানিকে দেখিলে মনে হয় বাংলাসাহিত্যের একটী অমর অক্ষয় অবদান" ইত্যাদি। ডক্টর শশাঙ্কমোহন সেনের "বাণীমন্দির" খানি (যাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে) এরূপ একখানি পুস্তক নহে কি? ইহার সমকক্ষ একখানি পুস্তক বাংলাভাষায় আছে কি? তা ছাড়া, শশাঙ্কমোহনের "সাবিত্রী", "স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে" এবং "শৈলসঙ্গীত"এর ন্যায় কয়খানি পুস্তকই বা বাংলাভাষায় আছে? আমার জানিতে কৌতূহল হয় যে শ্রীযুত দাস মহাশয় এই সমস্ত পুস্তকের এবং শশাঙ্কমোহনের "বঙ্গবাণী"র সহিত পরিচিত থাকিয়াও ইহাদের একখানিরও "কোন সাহিত্য-প্রতিষ্ঠা আছে বা ভবিষ্যতে থাকিতে পারে" না বিবেচনা করতঃ উহাদিগের কোনখানিকে তাঁহার তালিকায় স্থান দেন নাই কিনা, এমন কি সেন মহাশয়ের তালিকার অন্তর্গত „স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে" নামক কাব্যখানিকেও "লক্ষ্যের মধ্যে আনেন নাই" এবং "কোন আমলই দেন নাই" কিনা! তাঁহার ন্যায় নানা গ্রন্থের লাইব্রেরীর মালিক বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে শশাঙ্কমোহনের পুস্তক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা কল্পনা না করাই সঙ্গত, বিশেষতঃ যখন সেন মহাশয়ের তালিকার অন্তর্ভুক্ত "স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে"র ন্যায় কাব্যখানি দাস মহাশয়ের তালিকায় স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে কোথাও স্থান পায় নাই, তখন অনুমান করা অন্যায় নহে যে তাঁহার তুলনায় বিচারের ফলেই ঐ পুস্তকখানি অবজ্ঞাত নরকে স্থান পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। শশাঙ্কের স্নিগ্ধজ্যোতিঃ বোধ হয় সকলের ভাল লাগে না, বিশেষতঃ যাহারা কালধর্ম্মপ্রভাবে সাহিত্যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার প্রতি নিষ্ঠাবান্ হইয়াছেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও আবছায়া এবং অন্ধকারই প্রিয়তর হইতে পারে। দাস মহাশয়ের সাহিত্য-সহানুভূতি সে দিকে কি না নিশ্চিতরূপে বুঝা যায় না, যদিও তিনি "বড় বেশী আধুনিক, বড় বেশী দুঃসাহসী, হয়তো বড় বেশী অশ্লীল" লেখকদের অনুকূলে "অনেক কথাই" লিখিয়াছেন এবং গলিত শব আশ্রয় করিয়া সাধনার পক্ষপাতী সাহিত্য-তান্ত্রিকদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন।

আরও একাধিক পুস্তক সম্বন্ধে যথেষ্ট মতদ্বৈধের অবকাশ আছে। শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের উল্লিখিত ইন্দিরা-দেবীর "স্পর্শমণি"ও দেখিতেছি দাস মহাশয়ের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই, যদিও একাধিক অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট (যাহারা নিজেদের মত "ভ্রমলেশশূন্য" মনে করিবেন না এরূপ ব্যক্তিদের মতে) পুস্তক তাঁহার তালিকায় স্থান পাইয়াছে।

পত্র সুদীর্ঘ হইয়া গেল, আর বাড়াইব না। আমার ন্যায় দীর্ঘকাল যাবৎ ব্রহ্মদেশ-প্রবাসী নগণ্য ব্যক্তির উপর "কোন পুস্তকবিশেষের বিজ্ঞাপন" দেওয়ার অভিসন্ধি আরোপিত হইতে পারে কিনা জানিনা। আর সম্ভবতঃ আমার ন্যায় সাহিত্য-রাজ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির লিখা কিছু "বিচিত্রা"য় প্রকাশিত হইবার যোগ্যই বিবেচিত হইবে না।*

* আশঙ্কা অমূলক। বিঃ সঃ

## ১। বাঙ্গালী বিধবার বৈশিষ্ট্য

### শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু এম্-এ

বাংলার হিন্দু বিধবার পোষাক সধবা ও কুমারীর পোষাক হ'তে বিভিন্ন। তা'তে বিধবার বৈধব্যের প্রতি বিশেষভাবে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। আভরণহীন, বর্ণহীন এবং সাধারণতঃ অন্তর্বাস (underwear)-হীন বিধবার পোষাক তার হতভাগ্যটাকেই সমাজে ঘোষণা করে। হয়ত এ পোষাকের মূলে ছিল বিধবার যতী সাজ্‌বার ব্যক্তিগত বা সামাজিক ইচ্ছা। কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বিধবা সাধারণতঃ সধবার মতই পোষাক ও আভরণ পরে থাকে, শুধু কপালে সিঁদুর দেয়না। (মহারাষ্ট্রে যে বিধবা শিরঃমুণ্ডন করে সেই শুধু ভিন্ন পোষাক পরে)। বিধবার সিঁদুর না থাকাটাও কেহ কেহ বিসদৃশ মনে করছে; মহারাষ্ট্রে কেহ কেহ বিধবাকেও সিঁদুর পরাবার জন্য আন্দোলন কর্চ্ছে। বাঙ্গালীর চক্ষে কি বিধবার শ্রীহীনতা বিসদৃশ ও নিষ্ঠুর বলে ঠেকে না? বাঙ্গালীর অন্তঃকরণ কোমল বলেই লোকে জানে; এ করুণ দৃশ্যটা তার প্রাণে আঘাত করে না? যদি করে তবে সে কেন তা' সৃষ্টি কর্চ্ছে?

বাঙ্গালী বিধবার আহার ও সধবা-কুমারীর আহার হ'তে বিভিন্ন। সমস্ত উচ্চ শ্রেণীর বিধবারাই নিরামিষাশী। অনেকেরই ধারণা নিরামিষ আহার বিধবার জন্য মুনি ঋষিরা নির্দ্দিষ্ট করে গেছেন, কারণ তা' ব্রহ্মচর্য্য পালনের সহায়তা করে। এ কথাটাতে কতদূর সত্য আছে তার বিচার করা দরকার। ভারতে জৈন, লিঙ্গায়ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক আমিষ স্পর্শও করেনা। সে কারণে তারা আমিষাশী সম্প্রদায়ের লোকের চেয়ে অধিক সংযমী বা চরিত্রবান, একথা তারা নিজে বা অন্য কেউ বল্‌তে পারবে না, সরকারী অপরাধ-বিষয়ক বিবরণেও সে যুক্তির সমর্থন পাওয়া যায় না।

বাংলার বাইরে সধবা বিধবার আহারের পার্থক্য নেই। বাংলায় তা' রাখবার বিশেষ দরকার আছে কি?

## ২। ছন্দের গঠন সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর

### শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম-এ

সম্প্রতি 'বিচিত্রা'র 'বিতর্কিকা'য় ছন্দের গঠন-তত্ত্ব নিয়ে যে জিজ্ঞাসার অবতারণা করা হ'য়েছে তার সম্বন্ধে সহজ ভাবে কোন জবাব দেওয়া সম্ভব হবেনা এজন্যে যে যা "কাব্য হিসেবে" "মূল্যহীন" এবং "তথ্য হিসেবে"ও তথৈব চ অর্থাৎ যা' সোজা কথায় কবিতাই নয় তা'র স্থির কোন ছন্দরূপও থাক্‌তে পারেনা। যাকে কবিতা বলেই স্বীকার করিনে তা'র আর ছন্দই কি আর তার বিচারই বা কি করে সম্ভব? নীচের যুক্তিগুলোই আমার এই উক্তির সাপক্ষে দাঁড় করাচ্চি।

যে কবিতাটিকে আশ্রয় ক'রে ছন্দের গঠনতত্ত্ব আলোচিত

হ'বার জন্য নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে তা' কোন নির্দ্দিষ্ট ছন্দে লেখা কবিতা হয়নি। কবিতার এক পংক্তি পড়লেই তার ছন্দ-সুর আপ্‌না থেকেই কানে বেজে উঠে; তখনই চট্ ক'রে বুঝ্‌তে পারি কবিতাটি অক্ষর-বৃত্ত, স্বরবৃত্ত কি মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অন্তর্গত। আলোচ্য কবিতাটি'র কোন অংশ অক্ষর-বৃত্ত, কোন অংশ স্বরবৃত্ত ও কোন অংশ আবার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা; শুধু তাই নয় কোন অংশ আবার নিছক গদ্য পদবাচ্য। একে একে সবই উদ্ধৃত ক'রে দেখাচ্চি।

কবিতাটিকে যে ভাবে সাজিয়ে লেখা হ'য়েছে অর্থাৎ এর বাহ্যরূপ দেখে একে অক্ষর-বৃত্ত দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ বলে ভুল হ'বে। এবং এই ভুলের বশবর্ত্তী হবে এটিকে অক্ষরবৃত্তানুরূপ আবৃত্তি করতে আরম্ভ ক'রে,

"ঐ তোমার দৃষ্টিখানি          যে মধুর বার্ত্তা আনি'
উঠ্‌ত গো মোর বুকে বেজে,"

এই পর্য্যন্ত পড়েই তার পরবর্ত্তী ছত্রাংশেই

"তোমার ঐ হৃদয় জুড়ে—"

পর্য্যন্ত এসেই অক্ষরবৃত্তের আবৃত্তিসুরের পরিবর্ত্তন করতে হবে কারণ এই ছত্রাংশে আট অক্ষরের স্থলে নয় অক্ষর হওয়ায় অর্থাৎ একটি অক্ষর বেশী থাকায় অক্ষর-বৃত্তের গুরুতর ব্যতিক্রম হ'য়ে গেল।

এবার আবৃত্তি-সুরের একটু মোড় ঘুরিয়ে দেখা যাক্ ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায়। এখন দেখা যাক্ কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত কিনা? ছন্দের এ রীতি অনুসারে কবিতাটির প্রথম দু'টি পংক্তিকে এ ভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে; যেমন,

ঐ ( অই ) তোমার দৃষ্টিখানি (১০ মাত্রা)
যে মধুর বার্ত্তা আনি (৯ মাত্রা)
উঠ্‌ত গো মোর বুকে বেজে, (১০ মাত্রা)
তোমার ঐ হৃদয় জুড়ে (১০ মাত্রা)
যে প্রেম সদাই স্ফুরে (৮ মাত্রা)
হায় প্রিয়ে, আজকে কোথা সে যে (১১ মাত্রা)

তা' হ'লে উপরের দু'পংক্তির মাত্রা নির্দ্দেশ থেকে আমরা দেখ্‌তে পাই যে, এক পংক্তির মাত্রা সংখ্যা হচ্চে, ১০+৯+১০ ও অপর পংক্তির ১০+৮+১১। অতএব এ থেকেই স্পষ্ট দেখা গেল যে আলোচ্য কবিতাটি মাত্রাবৃত্তের শুদ্ধি রক্ষা ক'রে চলেনি' অর্থাৎ এ মাত্রাবৃত্ত ছন্দেরও কবিতা নয়। তবে দেখা যাক্ স্বরবৃত্ত ছন্দের, সাধারণ নিয়মগুলো এর উপর প্রযুজ্য হয় কি না।

স্বরবৃত্ত ছন্দের রীতি অনুসারে চরণের প্রত্যেক স্বরান্ত-ব্যঞ্জন কি স্বর অর্থাৎ উচ্চারণ বা ধ্বনি-স্থানগুলো কতকগুলো নিয়মিত ছেদে বিভক্ত হ'য়ে থাকে যেমন,

"সাম্‌নেকে তুই | ভয় করেছিস্ | পেছন্ তোরে | ঘিরবে ॥"

এখানে চারটি ধ্বনিস্থানের পর পর নিয়মিত ছেদ পড়ে গেছে সেজন্য এটিকে স্বরবৃত্ত ছন্দের অন্তর্গত বলা হবে। কিন্তু আলোচ্য কবিতাটি এমন ছেদ ও ধ্বনি-রীতির শাসন মেনে চলেছে কি না দেখা যা'ক্:

ঐ তোমার দৃষ্টিখানি ‖ যে মধুর বার্ত্তা আনি ‖
উঠ্‌ত গো মোর বুকে বেজে,
তোমার ঐ হৃদয় জুড়ে          যে প্রেম সদাই স্ফুরে
হায় প্রিয়ে আজ্‌কে কোথা সে যে?

উপরের ধ্বনিস্থান-নির্দ্দেশ থেকে এই দেখা গেল যে এর প্রথম পংক্তিটুকুর মধ্যে স্বরবৃত্তের নিয়মানুযায়ী নিয়মিত ধ্বনিস্থানের পর পদচ্ছেদ ঘটলেও দ্বিতীয় পংক্তিতে এ নিয়মে ব্যতিক্রম ঘটেছে। এমন কি এর প্রথম পংক্তিতে যে পর্য্যন্ত গলদ র'য়েছে তা উপরের নির্দ্দেশ-চিহ্নগুলো দেখ্‌লেই জানা যাবে। কারণ প্রথম পংক্তির ধ্বনিস্থান সাতের পর দু'বার ছেদ পড়্‌লেও তৃতীয়বার সপ্তম ধ্বনিস্থানের পর আর ছেদ পড়্‌ল না। ছেদ পড়্‌ল গিয়ে একেবারে শেষে; আটের পর। অতএব স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্চে যে আলোচ্য কবিতাটি স্বরবৃত্ত ছন্দেরও অন্তর্গত নহে! আধুনিক বাংলা আলঙ্কারিকদের মতে অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের

পরও আর একরকম ছন্দ নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে থাকে। তাকে বলা হয়, অসম ছন্দ। এর বিশেষ গুণ এই হ'ল যে পদান্তে মিল থাকলেও এর পদ মধ্যে যতির কোন নির্দ্দিষ্ট হিসেব-বিচার নেই। এ স্বরবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত দুই-ই হ'তে পারে, যেমন,

অশ্রু-আঁখি
তোমারে কাঁদিয়া ডাকি,—
খড়্গ ধর প্রেমিক আমার,
কর গো বিচার !······( অক্ষর বৃত্ত )

কিম্বা,

স্ত্রীর মরণের পরে যবে
সবে মাত্র এগারো মাস হবে,
গুজব গেল শোনা
এই বাড়ীতে ঘটক করে আনাগোনা।···( স্বরবৃত্ত )

এখন আলোচ্য কবিতাটি এ ছন্দের অন্তর্গত কিনা তা' দেখা যাক্। কবিতাটির মধ্যে অল্পবিস্তর ছন্দপতন দোষ থাকলেও এটি পড়লেই বোঝা যাবে যে এতে পদভাগে মিলের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন, 'থানি' 'আনি'; 'জুড়ে' 'ক্ষুরে'; 'আগে' 'মাগে' ইত্যাদি। পদান্তে মিল থাকলেও অসম ছন্দের কবিতার পদভাগে মিল থাকতে পারে না কারণ এর যতি অনিয়ম-বিন্যস্ত ব'লে সুনির্দ্দিষ্ট পদভাগ এর নেই; অতএব তাতে মিলের কোন প্রশ্নই উঠেনা। সেজন্য আলোচ্য কবিতাটি অসমছন্দের মধ্যে গিয়েও পড়ল না।

এখন দেখা গেল যে, যে কবিতাটিকে আশ্রয় ক'রে "ছন্দের গঠন-তত্ত্ব নিয়ে পরীক্ষা করা" তাকে কোন নির্ভুল ছন্দের পদবীর মধ্যে টেনে নেওয়া গেলনা। তা' হ'লে বুঝতে হবে যে কবিতাটি কোন বিশেষ ছন্দেরই অশুদ্ধ সংস্করণ। এখন এর অশুদ্ধিগুলো দেখিয়ে দিলেই কবিতাটির ছন্দ দোষ যে কত মারাত্মক তা' সহজেই চোখে পড়বে।

কবিতাটির প্রথমভাগ মূলতঃ অক্ষরবৃত্তের দীর্ঘত্রিপদী ছন্দের মধ্যে নিয়ে ফেলা যায়; অবশ্য যেখানে যেখানে ভুল রয়েছে সেই সেই জায়গায় দীর্ঘত্রিপদীর নিয়মানুসারে পদ ভাগে ৮+৮+১০ ক'রে অক্ষর বিন্যাস ক'রে নিলেই কবিতাটির নির্ভুল হয়।

আলোচ্য কবিতাটির দ্বিতীয় ভাগ স্বতন্ত্র ছন্দের অন্তর্গত। যেমন,

"আবার তোমার ঐ দৃষ্টিখানি প্রিয়ে
রাখ মোর মুখে,
তোমার ঐ চিত্তখানি মোর চিত্ত দিয়ে
বুক রাখ বুকে !"

এই ছন্দটি অক্ষরবৃত্ত পয়ারের স্বজাতি। পয়ার যদি পদ চার হয় তা' হ'লে এর এক এক কলি পদ বেশি আছে ব'লে একে ষট্‌পদী বলা চলে। তবে একটু গোলমাল বাঁধছে দুই পদেরই দু'টি যুগ্ম-স্বরকে (Dipthong) নিয়ে। এদের যদি ভেঙ্গে লিখি অর্থাৎ 'ঐ' কে 'অই' ক'রে লিখি তা'হ'লে চোখের ক্ষতি-পূরণ হয়ত হ'ল কিন্তু তাতে কানের কাছে চোখের চুরি ধরা পড়ল। আর ছন্দ ত কানেরই, চোখের ত নয়! এখন প্রশ্ন হচ্ছে অক্ষর-বৃত্ত ছন্দে যুগ্ম-স্বরের স্থান কি? এ নিয়ে এই 'বিচিত্রা'র পৃষ্ঠেই মসীযুদ্ধ কম হয়নি। কিন্তু আমি স্পষ্টতঃই যা বুঝতে পারি তা' এই যে যুগ্ম-ব্যঞ্জনের যদি অক্ষরবৃত্তে এক অক্ষরের ওজন হ'ল তা'হলে যুগ্ম-স্বরের মধ্যে দায়ে পড়ে দুই অক্ষরের হিসেব করা চলবে কেন? ওকেও এক অক্ষর হিসেবেই ধরতে হবে। এই নিয়ম অনুসারে উদ্ধৃত পদ্যাংশটুকু নির্ভুল অক্ষরবৃত্ত নহে। এতে ৮+৬+৬ এরকম পদভাগ ও অক্ষরবিন্যাস থাকলে ওকে অক্ষরবৃত্ত 'ষট্‌পদী' বলতে পারি। আলোচ্য কবিতার এই শেষভাগে অক্ষরবৃত্তের নিয়মানুযায়ী দু'এক স্থলে দু'একটি অক্ষরের কম্‌-বেশ ক'রে একে নির্ভুল অক্ষরবৃত্ত ষট্‌পদীতে দাঁড় করান যায়।

অতএব এসব আলোচনা ক'রে দেখা গেল যে যে কবিতা 'কাব্যহিসেবে' 'মূল্যহীন' এবং 'তথ্য হিসেবে'ও তাই, ছন্দ হিসেবেও সে একটা বড় আমল পেলনা!

## ৩। নামের পদবী

শ্রীমদনমোহন ভট্টাচার্য্য

মেয়েদের নামের পদবী নিয়ে যথেষ্ট গোলমাল হয় সত্য। আজ যে মিস্ স্মৃতিরেখা দাস কাল সে মিসেস্ স্মৃতিরেখা বোস হ'য়ে যেতে পারেন এবং বিবাহের পর স্মৃতিরেখা বোস এই নাম জেনে সেই স্মৃতিরেখা দাস কিনা তা' ঠাহর করা শক্ত হ'য়ে পড়ে সত্য। কিন্তু পদবীর বদলের জন্য যে গোলমালের সৃষ্টি হয় তা' সমাধান করার আগে নামের জন্য যে সমস্যার আবির্ভাব হয় তার একটা নিষ্পত্তির চেষ্টা করা ভাল; কারণ পদবীর বদলের জন্য গোলমাল হয় দু'জন নারীরই ভিতর, কিন্তু নামের জন্য গোলমাল বাধে নারী ও পুরুষের ভিতর।

আজকাল মেয়েদের নামের গোড়ায় 'শ্রীমতী' লেখার রীতি ত প্রায় উঠেই গেছে। পুরুষ ও নারী উভয়েরই নামের পূর্ব্বে কেবল 'শ্রী'ই শ্রীদান করে। মাসিক পত্রিকায় যাঁরা প্রবন্ধ বা কবিতা লেখেন তাঁরা কেবল লেখেন শ্রী'অমুক'—তিনি পুরুষই হ'ন আর নারীই হ'ন। যিনি লিখেছেন তিনি লেখক কি লেখিকা তা' পাঠকের কাছে মাঝে মাঝে বুঝে ওঠা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। স্ত্রীলোকদের স্ত্রীবাচক নাম এবং পুরুষদের পুংবাচক নাম যদি হ'ত তা'হ'লে এই বিষয়ে কোন গোলমালই থাকত না—নামের আগে 'শ্রী'ই থাকুক বা 'শ্রীমতী'ই থাকুক। নামের মধ্যভাগ একেবারে উঠে যাওয়ায় পাঠক লেখকের লেখা পড়ছেন, না লেখিকার লেখা পড়ছেন তা' নির্ণয় করতে একেবারে অসহায় বোধ করেন। যেমন যদি লেখা থাকে—শ্রীজ্যোৎস্না মিত্র। এই নামটী যাঁর তিনি পুরুষ কি নারী তা' নির্দ্ধারণ করা এক রকম অসম্ভব। কিন্তু যদি নামের মধ্যভাগের উল্লেখ থাকে তা' হ'লে এই গোলমালের আর সম্ভাবনা ঘটেনা। শ্রীজ্যোৎস্নাকুমার মিত্র বা শ্রীজ্যোৎস্নারাণী মিত্র—কোনটী কার হওয়া উচিত তা' স্পষ্টই বোঝা যায়। দু'জনেরই নামের আগে 'শ্রী' থাকলেও কোন অসুবিধা হয় না। এই রকম প্রতিভা দাসগুপ্ত—এই নামও যথেষ্ট গোলমালের সৃষ্টি করতে পারে; যেহেতু স্ত্রীবাচক প্রতিভা নামও অনেক পুরুষের দেখা যায়। শ্রীরমা বসু বলতে আমরা উভয় রূপই কল্পনা করতে পারি—যতক্ষণ না আমরা পুরো নাম জানতে পাই। রমাপদ বসু কিংবা রমারাণী বসু—কোনটা ঠিক জানলেই আর আমাদের এ বিপদে পড়তে হয়না। যে ক্লাসে ছেলে মেয়ে একসঙ্গে পড়ে সেখানে যদি প্রোফেসার বলেন বিমলা ব্যানার্জ্জিকে বাইরে ডাকছে ছেলেদের চোখ পড়ে মেয়েদের উপর, কিন্তু যখন তাদেরই মধ্যে থেকে গোঁফদাড়ি নিয়ে একজন দাঁড়িয়ে ওঠে তখন হাসির রোল উঠতে দেরী হয়না এবং বিমলাকেও যথেষ্ট অপ্রতিভ হ'তে হয়। মেয়েদেরও ঠিক এই একই অবস্থায় পড়তে হ'তে পারে। মনীষা, বকুল, সঙ্ঘমিত্রা, কমলা, বীণা প্রভৃতি নাম এখন নারীদেরই একচেটে এবং নিত্যানন্দ, বিমান, রজত, মুরারী প্রভৃতি নামের উপর পুরুষেরই অধিকার বেশী; কিন্তু কালের গতি যে রকম তা'তে কোন নামেই কোন লিঙ্গের একচেটে অধিকার থাকবে না। কাজেই নামের সমস্যার সমাধান সবচেয়ে ভাল ভাবে হয় যদি নারীদের সকলেই নামের গোড়ায় 'শ্রীমতী' লেখেন।

এইবার পদবী বদলের কথা। পদবী বদল হবার বালাই পুরুষের নেই। অবিবাহিত অবস্থায় যে সন্তোষ বসু বিবাহিত অবস্থায়ও সে সন্তোষ বসু। বিবাহের পর স্ত্রীর পদবী অনুসারে পদবী বদল করার মত দুর্ভাগ্য পুরুষের হয়নি। বিবাহের পর মেয়েদের পদবী বদ্‌লে যাওয়ায় অসুবিধা হয় বটে—কিন্তু তাও দূর করা সম্ভব। শ্রাবণ সংখ্যার বিতর্কিকাতে শ্রীমতী নির্ম্মাল্য রায় বলেছেন যে নারীদের পক্ষে নামের পদবী উঠিয়ে দিয়ে 'দেবী' ব্যবহার করলেও বড় গোলযোগ হবে 'যেহেতু স্কুল কলেজে এক ক্লাসে ও পরিচিত মহলে' একই নামযুক্তা বহু নারী থাকতে পারে। একথা সত্য। তিনি এর প্রতীকারের কোন উপায় দেখেননি। 'এ শুধু আমাদের দেশে নয় সব দেশেই, নর-নারীর তুল্য অধিকার যেখানে মেনে নেওয়া হয়েছে সেই পাশ্চাত্যেও Miss Walker বিয়ের পর তাঁর স্বামীর পদবী

অনুসারে হবেন Mrs. Jachson; আমাদের দেশে ত কথাই নেই'—এই বলে তিনি তাঁর অসামর্থ্যের যুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু পাশ্চাত্যের লোকেরা খ্যাতনামা নারীদের বিবাহের পরও পদবী বিষয়ে গোলোযোগ কিরূপে বিদূরিত হ'তে পারে তার পন্থাও দেখিয়েছেন। Miss Amy Jhonsonএর নাম বিশ্ববিশ্রুত হ'য়ে গেল—তারপর তাঁর যখন বিবাহ হ'য়ে গেল তখন তাঁর নাম হ'ল Mrs. Mollison। এখন Mrs. Mollison বললে তিনিই যে পূর্ব্বেকার Amy Jhonson, তা' কারুর বুঝতে দেরী হয় না। যখন প্রথম বিবাহ হ'ল তখন তাঁর নাম Mrs. Mollison ব'লে পাশে 'পূর্ব্বেকার Amy Jhonson'—লেখায় সে গোলমাল এড়ান গেছে। কিছুদিন এইরূপ লেখার পর সকলে জানলেন Mrs. Mollisonই Miss Amy Jhonson। এখন Mrs. Mollison লিখলেই সকলে Amyকেই বোঝেন। গায়িকা রেণুকা সেনগুপ্তা এখন রেণুকা দাস। তাঁর পদবী বদলে যাওয়ায় তাঁকে কোনই অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। উক্ত উপায়েই এই অসুবিধা দূর করা সম্ভব হয়েছে। যাঁরা এক পদবীতে লোকের কাছে বিদিতা, পদবী বদলের পর তাঁদের এই পন্থা অবলম্বন করতে হবে—আর যাঁরা সাধারণের কাছে অবিদিতা তাঁদের ত এ বালাই একেবারেই নেই।

অপরিচিতা নারীকে কিরূপে সম্বোধন করা উচিত সে বিষয়েও অনেক আলোচনা হয়েছে। বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের "মা" ব'লে সম্বোধন যুক্তিসঙ্গত নয়—তার কারণ শ্রীমতী নির্ম্মাল্য দেবীই দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আমি তাঁর সঙ্গে প্রায় সব বিষয়েই একমত—কেবল এক বিষয় ছাড়া। তিনি বলেছেন বোন ব'লে ডাকা 'একটু কেমন যেন ঠেকে—ডাকবার পক্ষে তেমন সহজ নয়।' কিন্তু সমবয়সী বা বয়সে কিছু ছোট মেয়েদের সঙ্গে অন্য কোন রকম সম্বন্ধ না থাকলে সবচেয়ে যোগ্য সম্বন্ধ ভ্রাতা ও ভগিনী। যখন সব জাতিই ভগিনী হিসাবে সম্বোধন করে তখন আমাদের বোন বললে কেনই বা মিষ্টি শোনাবে না। আমাদের দেশে এরূপ সম্বোধনের প্রচলন নেই ব'লেই প্রথমটা একটু কেমন কেমন লাগবে, কিন্তু প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে এর মিষ্টত্বও বাড়বে আশা করা যায়। অবশ্য কিরূপ সম্বোধন পেলে নারীজাতি খুশী হবেন তা' শ্রীমতী নির্ম্মাল্য দেবী আমার চেয়ে বেশী বুঝবেন।

## ৪। বানান-সমস্যা

### উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বিভিন্ন লেখকের লেখা নিয়ে নাড়াচাড়া করবার যাঁদের কারণ ঘটে তাঁরা জানেন বাঙ্গলা ভাষায় বানান নিয়ে, বিশেষতঃ কথ্য ভাষার ক্রিয়াপদের বানান নিয়ে, ক্রমশঃ একটা গুরুহ সমস্যা গ'ড়ে উঠেছে। একই শব্দ বিভিন্ন লেখকে বিভিন্ন বানান দিয়ে ব্যবহার করচেন, শুধু সেই কথাই বলছিনে; একই লেখক অনেক সময়ে তাঁর এক লেখারই মধ্যে একই শব্দের একাধিক বানান ব্যবহার করছেন তাও দেখা যায়। এর দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে, কোনো কোনো শব্দের বানানের অদ্বিতীয় রূপ কি হবে তা এখনো আমরা একান্তভাবে স্থির করে উঠতে পারিনি।

পরীক্ষার জন্য তথাকথিত সাধু ভাষার একটি বাক্য নেওয়া যাক্। ধরুন, "কাঁচের ফানুস কেমন করিয়া করে আমি তাহা জানি না।" সাধু ভাষার এই বাক্যটি কথ্য ভাষায় এতগুলি বিভিন্নরূপ ধারণ করতে পারে—

(১) কাঁচের ফানুস কেমন **কোরে** করে তা আমি জানিনে।

(২) কাঁচের ফানুস কেমন **ক'রে** করে তা আমি জানিনে।

(৩) কাঁচের ফানুষ কেমন **করে'** করে তা আমি জানিনে।

(৪) কাঁচের ফানুষ কেমন **করে** করে তা আমি জানিনে।

(৫) কাঁচের ফানুষ কেমন **কর্যে** করে তা আমি জানিনে।

১ম উদাহরণের 'কোরে' বানানটির উদ্ভব আমাদের শব্দ উচ্চারণ করবার ধ্বনি-নিষ্ঠা থেকে। কোনো একটি শব্দ উচ্চারণ করবার সময়ে যে-যে ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতি যে-যে স্বরবর্ণ প্রয়োগ করি লেখবার সময়েও সেই-সেই ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতি সেই-সেই স্বরবর্ণ প্রয়োগ করব, এই হ'ল ধ্বনি-নিষ্ঠা। যখন বলি **কোরে** (koray) তখন লিখ্‌বও **কোরে**। এই ধ্বনি-নিষ্ঠা আমরা সর্ব্বত্র রাখ্‌তে পেরেছি কি-না এবং রাখা উচিত কি-না সে কথা পরে কখনো বিবেচনা করা যাবে, উপস্থিত আমরা অপর রূপগুলির মধ্যে কি মূল ইঙ্গিত আছে তা পরীক্ষা ক'রে দেখি।

২য় উদাহরণের **ক'রে** শব্দের মধ্যবর্ত্তী ইলেক্ চিহ্ন (,) 'ক'-কে অকারান্ত উচ্চারণ করবার নিষেধ-নির্দ্দেশ। সুতরাং কোনো ক্রিয়াপদের ব্যঞ্জন বর্ণের অব্যবহিত পরে ইলেক্ চিহ্ন থাক্‌লে আমরা সেই ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণকে ওকারান্ত ক'রে নেব। যথা,—ক'রে দিয়ো, ব'সে আছি। ম'রে গেছে ইত্যাদি। কিন্তু তাই ব'লে **এখনি করো,** অথবা **কালকে কোরো** বাক্য দুটিকে **এখনি কর'** বা **কালকে ক'র'** রূপে লেখবার প্রথা নেই।

৩য় উদাহরণে **করে'** শব্দের অন্তে ইলেক এই কথা ব্যক্ত করছে যে **করে**-র পর ইলেক থাকার জন্য **করে**-র সাধারণ উচ্চারণ না হয়ে বিকৃত উচ্চারণ হবে, সুতরাং **কোরে** উচ্চারণ হবে। অনেকের মতে **করে**-র ইলেক চিহ্নটি **করিয়া** শব্দের লুপ্ত 'য়া'র প্রেত দেহ।

৪র্থ উদাহরণে দুটি পাশাপাশি **করের** মধ্যে বানানগত কোনো প্রভেদ নেই, যদিও তাদের মধ্যে উচ্চারণের প্রভেদ বর্ত্তমান। এ ক্ষেত্রে অর্থ বুঝে উচ্চারণ করতে হবে।

৫ম উদাহরণের **কর্য্যে** রূপটি অধুনা প্রায় অবলুপ্ত, কিন্তু বহুপূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যেও ক্রিয়াপদের এ রূপটি দেখেছি ব'লে মনে পড়ে।

উপরে পাঁচটি উদাহরণে **করে** শব্দর যে পাঁচটি বিভিন্ন রূপ দিলাম সে শ্রেণীর ক্রিয়াপদ ছাড়া ক্রিয়াপদের অন্যান্য রূপেও বানান বিভ্রাটের অন্ত নেই। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করছি। বেরোচ্চে, বেরুচ্চে; এসেচে, এসেছে; পেলাম, পেলুম, পেলেম; ক'রতাম, কোরতাম, কোর্ত্তাম, কোর্ত্তুম; বল্‌ল, বল্‌লো, বল্‌লে, বোল্‌লো; খেলো, খেলে; দেখ, দেখ, ছাখ, ছাখো; ইত্যাদি। এর আর অন্ত নেই।

ক্রিয়াপদ ছাড়া অন্যান্য পদেও নানা রূপে বানান-সমস্যা দেখা দিয়েছে। যথা,—সন্ধ্যা, সন্ধ্যে; নিন্দা, নিন্দে; বৈকাল, বিকাল, বিকেল; বয়স, বয়েস; উত্তর, উত্তুর; ইত্যাদি।

এই বানান-বিভ্রাটের মূলে একটি প্রশ্ন রয়েছে,—সেটি হচ্ছে—যা বলি তাই লিখ্‌ব, না যা লিখি তাই বল্‌ব; না যা লিখি তা সময়ে সময়ে বল্‌ব না, অর্থাৎ যা বলি তা সময়ে সময়ে লিখ্‌ব না।

যা বলি সব সময়ে যদি ঠিক তাই লিখ্‌তে হয় তা হ'লে 'উত্তুরে'র অত্যাচারে 'উত্তর' বেচারীকে উত্তুর-মেরুর মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়, এবং 'দক্ষিণ' বেচারীকে খুঁজে বার করতে হয় ছদ্মবেশী 'দোক্‌খিন্' এর বর্ণবন্ধনের ভিতর থেকে। বানানের স্বরূপ প্রধানতঃ phonetic হবে একথা মানি। কিন্তু phoneticismকে বেশি প্রশ্রয় দিলে শেষ পর্য্যন্ত গোভীর বোনের বুক্‌খের ওপোর বোসে পোক্‌খী ডানা নাড়্‌তে থাক্‌বে, সে কথাও ভুল্‌লে চল্‌বে না। একই শব্দের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন উচ্চারণ হ'য়ে থাকে, এমন-কি একই প্রদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উচ্চারণ হ'য়ে থাকে। সুতরাং পশ্চিম বঙ্গের phoneticismকে পূর্ব্ববঙ্গ ষোল-আনা স্বীকার ক'রে নেবে কেন? শব্দের দুটি আশ্রয় আছে, বানান এবং উচ্চারণ; তার মধ্যে কোনোটিকে যদি নিত্যমূর্ত্তি দিতে হয় ত' বানানকেই দেওয়া চলে, উচ্চারণকে নয়।

এ বিষয়টি বিতর্কিকার মধ্যে অবতারণা করবার একটি বিশেষ উদ্দেশ্যও আছে। আমরা অবগত হয়েছি যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে নির্দ্দেশিত বানান-বিভ্রাটগুলির অনুরূপ বানান-সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং ভাষাতত্ত্ববিদ্ একটি বানান নির্দ্ধারণ সমিতি গঠিত ক'রে অবিলম্বে এ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করতে উদ্যত হয়েছেন। তাঁদের এই অতি প্রয়োজনীয় এবং শ্লাঘনীয় কার্য্যে যদি বিচিত্রার পক্ষ থেকে কিছু সাহায্য দেওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে আমরা বিচিত্রার পাঠকগণকে এই বিষয়ের আলোচনায় সাদরে আহ্বান করছি।

# কয়েন্সিডেন্স

## শ্রীহিতেশ চক্রবর্ত্তী

ভূমিকম্প জনিত নানারকম কাজে চম্পারণ্য জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। ১১,০০০ লোককে ৭৫০০০৲ দিয়ে গত একমাস কাটালাম ফাটা বাড়ীতে, খড়ের ঘরে, ভাঙ্গা বাড়ীর বারান্দায় বা তাঁবুতে।

এমনি করে দুদিন পূর্ব্বে বারাচাকিয়া গ্রামে ছিলাম। চিনি কলের বাবুদের অনুগ্রহে তাঁদের একটী কোয়ার্টার পেয়েছিলাম বাসের জন্য। Factoryতে ভেঁপু বাজে ভোর পাঁচটায়, চিনি কলের বাবুরা বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়েন; এক ঘণ্টার মধ্যে তৈয়ারী হ'য়ে চিনি কলে যান; কুলিরা দলে দলে ছোটে। ছ'টার সময় আর একটী ভেঁপু বাজে, কাজ আরম্ভ হয়। মধ্যে বারটার সময় ঘণ্টা দুয়েকের জন্য খাওয়ার ছুটি। দূর গাঁয়ের কুলিরা ছাতু ইত্যাদি খেয়ে কাটিয়ে দেয়, তারপর দেড়টা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত খেটে মনের আনন্দে বাড়ী ফেরে। পরম সন্তুষ্টের দল বাবুরা কল ফেরৎ ফুটবল খেলেন; সন্ধ্যায় বাজে আড্ডায় তাসটাস্ খেলে সময় কাটিয়ে ন'টা বাজতে না বাজতে শয্যা গ্রহণ করেন। এঁদের কোয়ার্টারগুলি ছোট ছোট ব্যারাকের মত খোলার বাড়ী। ঋতু উপভোগ করার এমন যায়গা আর নেই। বর্ষাকালে ঘরে দু' ইঞ্চি জল দাঁড়ায়—অতএব ঘরে থেকেও বর্ষা-জলের দৃশ্য এঁরা পান। গ্রীষ্মকালে নীচু খোলার চালের মধ্যে দিয়ে সূর্য্যের প্রখরতা অনুভব করেন; ঘরে জানালার বালাই না থাকায় ও মেজেগুলি স্যাঁৎস্যাতে ব'লে শীতকালে ঠাণ্ডার অভাব হয় না। পরে হাওয়ার সাথে ড্রেনের গন্ধ ভেসে এসে ঘর আমোদিত করে। তারই মধ্যে চিনি কলের বাবুরা জীবনের মিষ্টত্বে মাতোয়ারা থাকেন। এমনি ক'রে দিন কাটে।

ওদিকে ফ্যাক্টরীর অপর পার্শ্বে ইন্দ্রপুরী। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা বারান্দা-সমন্বিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঠাণ্ডা বাঙ্গলো। বিজলি বাতি, পাখা, Refrigerator, Poly Pony, তাদের trainer, motor car; ফলফুলে পরিপূর্ণ, অগণ্য ভৃত্যবর্গে মুখরিত সে এক অপর রাজ্য।

যাক্ সে সব কথা। সমস্ত দিন টাকা বেঁটে অবুঝ লোকেদের সঙ্গে তাদের অকারণ চাহিদার বিরুদ্ধে সমস্তক্ষণ তর্ক করার পর সন্ধ্যার বাসায় (চিনিকল বাবুদের কোয়ার্টারে) ফিরলাম। কিছু কাজ না থাকায় পাশের কোয়ার্টার বাবুর নিকট একটি নভেল, মাসিক পত্র, এমন কি পুরাণো খবরের কাগজ বা যে কোনও পাঠ্য চেয়ে পাঠালাম। এমন অসহায় অবস্থায় অনেকদিন সুদূর ডাক বাঙ্গলায় শেষ পর্য্যন্ত জুতো-মোড়া খবরের কাগজ খুলে পড়তে হয়েছে। অনেক খোঁজার পর পাশের কোয়ার্টার বাবুর কাছ থেকে পেলাম একখানি চার বৎসরের পুরাণো Grand Magazine। চিনি কলের বাবুর কাছ থেকে এ হেন বস্তু পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করলাম। কয়েকটি গল্প পড়ার পর ৫৫৪ পৃষ্ঠায় Purple & Fine Lines গল্পটি পড়লাম; মন্দ লাগল না।

তারপর দিন, অর্থাৎ পরশু, মতিহারী ফিরলাম। ফিরে মাসিক পত্রিকাগুলির খোঁজ ক'রে প্রথমে পেলাম—আষাঢ়ের বিচিত্রা। আনন্দ হল—মনটায় আষাঢ়ে ভাবের হয়ত একটু সমাবেশ হবে। কয়েক পাতা পড়ার পর শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু মহাশয়ের স্ত্রীরত্নং পড়লাম।

পরশু দিন এই গল্পটি (চার বৎসরের পুরানো Grand Magazine—January 1930) ইংরাজিতে পড়ে আজ এই গল্পটি যে আবার বাঙ্গলায় পড়ব এ আশা করিনি। ভাবলাম একেই বলে Coincidence। বাঙ্গলায়ও গল্পটি মন্দ উৎরোয়নি—তবে Grand Magazine বা author May Edington-এর কোনও উল্লেখ দেখলাম না। দুই লেখকের চার বৎসরের আগে পিছে মনোভাবের আশ্চর্য্য ঐক্য বলতে হবে।

# শরৎ-প্রশস্তি

## শ্রীকুমুদ ভট্টাচার্য্য

তোমার লাগিয়া, হে প্রেম-পূজারী, মনের নিভৃত কোণে
রচিয়া রেখেছি সোনার আসনখানি,
তোমারে বেঁধেছি, হে পরমপ্রিয়, সুচির আলিঙ্গনে,
তোমার বাণীতে পেয়েছি আপন বাণী।

সারা বাংলার চিত্ত-বিজয়ী, কুশলী শিল্পী নব,
বুকে আমাদের জাগায়েছো ভালোবাসা,
অমৃত-নিঝর রচনে তোমার আনন্দ অভিনব,
মানব মনের বেদনারে দিলে ভাষা।

ছোট হ'য়ে যারা ছিলো সুগোপন রুদ্ধ আঁধার গেহে,
আপনারে যারা দেখেনি কখনো চাহি',
তুমি তাহাদেরে বাহির দুয়ারে টানিয়া এনেছো স্নেহে,
আলোকের স্রোতে ওঠে তারা অবগাহি'।

ভাগ্যের ফেরে আজীবন কাল ছিলো যে পঙ্কলীনা,
এককণা প্রেম পায়নি কাহারো কাছে,
তারি বেদনায় উঠেছে বাজিয়া তোমার বুকের বীণা,
পঙ্কে দেখেছো পঙ্কজ কোথা আছে।

চন্দ্রে যে আছে কলঙ্ক ঠিক, তথাপি মিথ্যা নহে
আলো আছে সেই চন্দ্রেরই বুকে জাগি',
কলঙ্ক-দোষে আলো হবে মিছে—কে এমন কথা কহে ?
আমরা যে সব ভিখারী আলোরই লাগি'!

এ সত্য তুমি দেখিয়াছ, আর বুঝিয়াছ প্রাণে প্রাণে,
সকল সত্য লভেছো এমনি ক'রে,
সত্য দ্রষ্টা কবিরে তো তাই হৃদয় আপন জানে,
লেখায় তোমার তাই ওঠে মন ভ'রে।

প্রেম মন্ত্রের নব উদ্গাতা, সত্যের উপাসক,
শিবে সুন্দরে মূর্ত্ত হে মহীয়ান্,
ওগো বাংলার গল্পের গুরু, নবীনের প্রচারক,
উল্লাসে আজি গাহি তব জয়গান।

**"অমিতার প্রেম"**—শ্রীমতী আশালতা দেবী প্রণীত। ৬১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ডি, এম, লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১।৷০ টাকা।

আশালতা দেবীর নাম আজকাল বাংলা সাহিত্যের পাঠক পাঠিকাদের নিকট সুপরিচিত। যে কয়জন মহিলা লেখিকা বাংলাভাষার সেবা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন তিনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি ছোট গল্প, প্রবন্ধ এবং উপন্যাস সবই লিখিতে পারেন।

বক্ষ্যমান উপন্যাসখানি একটি যুবক এবং যুবতীর প্রেমের রোমান্স লইয়া লিখিত। নায়ক অমিয় এবং নায়িকা অমিতা—অমিয়র বোন চারুর মধ্যস্থতায় উভয়ের আলাপ পরিচয়। অমিতা লেখাপড়া, গান, বাজনা প্রভৃতি accomplishments-এ অগ্রগণ্যা কিন্তু ছ্যাব্‌লা নয়—deep ধরণের মেয়ে। তাহার বৌদি বীণার উৎপাতে তাহার মন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে—ফলে সে অস্বাভাবিক রূপে অমিয়র উপর বিরূপ হইয়া উঠে। অমিয়ও কেম্ব্রিজে পড়িবার জন্য বিলাত চলিয়া যায়। বলা বাহুল্য এ অবস্থা উভয়ের পক্ষেই অস্বাভাবিক। অতএব অমিয় course শেষ করিবার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসে। ইতিমধ্যে অমিয়র অনুপস্থিতিতে অমিতাও নিজেকে চিনিতে পারে এবং তারপর একদিন উভয়ের মন বোঝাবুঝির শেষ হয়। অমিতার বাবা ভবানীবাবু জোর করিয়া কিছু করেন নাই—তিনি জানিতেন Nature একদিন উভয়কেই পরস্পরের একান্ত সন্নিকটে আনিয়া দিবে।

**মানসী**—শ্রীমতী আশালতা দেবী প্রণীত। পি, সি, সরকার এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত। ১৬৬ পৃষ্ঠা মূল্য ১।৷০ দেড় টাকা।

এখানি সম্ভবতঃ আশালতা দেবীর দ্বিতীয় উপন্যাস—প্রথমখানি "অমিতার প্রেম"।

গল্পের মধ্যে যেটি বিশেষ ক'রে চোখে পড়লো সেটি হচ্চে লেখিকার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষমতা এক নিরুপমা দেবীর 'দিদি' ব্যতীত অন্য কোন মহিলা লেখিকার লেখার মধ্যে এই নিপুণতা দেখেছি ব'লে মনে পড়চে না।

সুরমা এবং সোমনাথ তাদের বাপমায়ের অমতে বিয়ে করলে। সোমনাথকে বাধ্য হ'য়ে চাকরি নিতে হ'ল এবং সুরমাকে সংসারের অধিকাংশ কাজ করতে হ'ল। কিন্তু এই স্বল্পাবকাশের নিবিড়তায় তাদের প্রেম হ'য়ে উঠ্‌লো ঘনিষ্ঠ। সোমনাথের বাপের মৃত্যুর পর তারা আবার দেশে ফিরে এলো কিন্তু সুরমা এবার টেনিস খেলা, বায়স্কোপ দেখা প্রভৃতি নিয়ে এত মেতে উঠ্‌লো যে সোমনাথের সঙ্গে তার যোগসূত্র ক্রমশঃ ছিঁড়ে যেতে লাগ্‌লো। অবশেষে সোমনাথ যখন কবিতা লিখে খ্যাতি লাভ করলে তখন তাদের হ'ল প্রকৃত মিলন।

লেখিকার ভাষা সাবলীল, স্বচ্ছন্দ এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিদ্যোতক। কোটেশানের বাহুল্য দেখে মনে হয় তিনি যথেষ্ট পড়াশোনা করেছেন।

সুরমার বাবা দেবকুমারবাবু সম্বন্ধে (১৮।১৯ পৃষ্ঠা) লেখিকা যে পুরাণো গল্প দিয়েছেন সেটুকুই বইখানির খেলো অংশ—না দিলেই ভাল হ'ত।

ছাপা, বাঁধাই ভাল। ৩৪ পৃষ্ঠায় ১৪ লাইনে "মঞ্জুরিত" স্থানে "মঞ্জরিত" এবং ৪৮ পৃষ্ঠায় ৪র্থ লাইনে "সৌজন্যতা" স্থানে "সৌজন্য হ'বে।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

**অন্দরের আলো** (গল্পের বই?)—শ্রীলালমোহন দে, মূল্য ১।৷০ দেড় টাকা।

সাহিত্যাচার্য্যগণ "সাহিত্য হাটে প্রবেশযোগ্য বলিয়া ছাড়পত্র" দিয়া আমাদের কর্ত্তব্যভার লঘু করিয়া দিয়াছেন।

উপরন্তু "প্রথম রচনার অসম্পূর্ণতা থাকিলেও রস-সৃষ্টির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার যে-ইঙ্গিত ও নিদর্শন রহিয়াছে, তাহাই এই রচনাগুলিকে পাঠক সমাজে পরিচিত করাইয়া দিবার জন্য আমাকে (শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দেকে) সাহসী করিয়াছে।" কিন্তু, উপরোধে ঢেঁকি গিলিবার বালাই আমাদের না থাকায়, আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, বর্ণনা-ভঙ্গীর দোষে, অযথা রস-সৃষ্টির (রসিকতা করিবার) প্রয়াসে, এবং এই রস-সৃষ্টিরই ব্যর্থ আশায় 'রচনা'গুলি রক্ষিত হওয়ায় অধিকাংশ রচনাগুলিই অপাঠ্য হইয়াছে। "পানিনির পরাজয়" ও "জহরের দুঃখ" ভিন্ন অন্য রচনাগুলি না ছাপিলেই ভাল ছিল।

**দক্ষিণ আফ্রিকা দৌত্য-কাহিনী**—শ্রীদেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। মূল্য ৮০, প্রকাশক—নিখিলচন্দ্র সর্বাধিকারী এম, বি, ২০নং সুরি লেন, কলিকাতা।

ভারতীয়েরা যে সকল স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন সে সকল স্থানের আর্থিক পরিপুষ্টি সাধনে স্থানীয় ভারতীয়দিগের পরিশ্রম ও সততা যথেষ্ট সহায়তা করিলেও ঔপনিবেশিক ভারতীয়েরা এখন স্থানীয় অধিবাসিগণের ও অন্য ঔপনিবেশিকগণের হস্তে অশেষ প্রকার নির্য্যাতন ভোগ করিতেছেন। ভারতীয়দিগের প্রতি এই অত্যাচার দক্ষিণ আফ্রিকায় চরমে উপনীত হইয়াছে—নাগরিকদিগের প্রাথমিক অধিকার সমূহের সামান্যতম অংশ হইতেও ভারতীয়েরা সেখানে বঞ্চিত। এই অবস্থার প্রতিকার কল্পে ১৯২৫ সালে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে দৌত্য অভিপ্রায়ে এক ডেপুটেশন প্রেরিত হয়। এই ডেপুটেশনের সদস্যরূপে লেখকের দৌত্য কাহিনী লইয়াই পুস্তকখানি লিখিত।

সাধারণ ভ্রমণ কাহিনীর কায়দায় লিখিত হইলেও দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের প্রতি নির্য্যাতন ও বিসদৃশ ব্যবহারের চিত্র পুস্তকখানিতে পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখকের গভীর স্বদেশ প্রেমের নিদর্শনও সর্বত্র সুপরিস্ফুট। ভাষা স্বচ্ছ ও গতিশীল। ছাপা ও কাগজ ভাল।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

**শ্রী-হীন কৃষ্ণ**—শ্রীতড়িৎকুমার বসু প্রণীত ও ১৬৯, রসারোড, বুকষ্টল হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫২+৮৫। মূল্য, কাপড়ে বাঁধাই, দেড় টাকা, ও মেকী মরোক্কো বাঁধাই, দুই টাকা।

'শ্রী-হীন কৃষ্ণ' বাংলার প্রথম 'সিচুয়েসন' নাটক। আমাদের কলিকাতার অতি-আধুনিক সাধারণ জীবন লইয়া এই নাটকখানি লিখিত। ইহার বিষয়বস্তু, 'টেক্‌নিক্' বা গঠনপ্রণালী ও dialogue অতি আধুনিক—এত বেশী যে পড়িতে পড়িতে মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া ওঠে। লেখক যদিও ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে এখানি সম্পূর্ণ অভিনয়-উপযোগী নাটক, তথাপি মনে হয় ইহার stage-success নিতান্তই সন্দেহজনক। বলিলে রূঢ় শুনাইবে, কিন্তু ইহার ভাষা মাঝে মাঝে অত্যন্ত নোংরা ও কথাবার্ত্তা নিতান্ত খেলো হইয়া উঠিয়াছে। লেখক যেখানেই humourএর সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানেই তিনি বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন; যাহা হইয়াছে তাহা humour ত নয়ই, উপরন্তু wit ও নয়, এমন কি হাস্যরসও নয়—তা একান্ত নোংরা রঙ্গরস। লেখককে আমরা জানি, বাংলা ছায়াচিত্র জগতে তাঁহার নাম সুপরিচিত, তাঁহার নিকট হইতে এরকম লেখা আমরা আশা করিনি। দুই একটি নমুনা দিতেছি;—"নভেল পড়ে' যেমন আমার 'সোনা-ছুঁড়ি' নর্ত্তকী নাম ধারণ করলে, ইন্‌টেলিজেন্‌সিয়ার হাতে পড়ে' তেমনি কামের নাম হল প্রেম, আর কামের ইন্ধন যোগাবার পন্থা হ'ল বিবাহ প্রথা", অথবা, "ভায়রা-ভাই আমার ত সাক্ষাৎ যুবতী-কন্‌ট্রোলার, হয় আমার একটা হিল্লে করুক, না-হয় স্বরাজ পাবার পথটা বাত্‌লে দিক্", কিম্বা,

"বৌদি, মাইরি, কি বলিব আর,
জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে
তুমি থেকো ব্যাচিলার (Bachelor)"

তারপর ইহার চরিত্রগুলিও সব অদ্ভুত। পুরুষগুলি আধুনিক কলেজের ছাত্র—রোগা, ছিপছিপে, চোখে চশমা, বাহারে চুলের বাবু। তরল উপন্যাস ও কবিতার পাতায় তাহাদের চোখ, হাতের পেন্সিল দাঁতের সঙ্গে সোহাগ করিতে ব্যস্ত। আর মেয়েগুলিও তদ্রূপ—তাহাদের পরণে ফিরোজা,

মাথায় এলো খোঁপা, পায়ে জরীর নাগরা। হাতে এসেন্সের স্প্রে। আধুনিক অভিসার অর্থাৎ flirting এর জন্ত সদাই প্রস্তুত।

বইখানি পড়িয়া আমরা মোটেই খুসী হইতে পারিলাম না।

**গলার কাঁটা**—অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। পৃষ্ঠা ১৬৪। দাম এক টাকা দশ আনা।

এখানি সাধারণ উপন্যাস নহে। ইহার মধ্যে কিছু বৈচিত্র্য ও নূতনত্ব আছে। লেখকের উদ্যম ভালো, প্রয়াস প্রশংসনীয়। রোমাঁ রোলাঁ যেমন 'জাঁ ক্রিস্তফ্', গল্স্ওয়ার্দ্দি যেমন 'ফর্সাইথ সাগা,' রেমন্ট যেমন 'পেজ্যাণ্ট্স্', ও অন্যান্য বিদেশীয় লেখকেরা যেমন সুদীর্ঘ মহা-উপন্যাস লিখিয়াছেন, তেমনি নরেনবাবুও "নর-নারায়ণ" নামে সপ্তকাণ্ড একটি মহা-উপন্যাস লিখিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। "গলার কাঁটা" বইখানি সেই মহা-উপন্যাসের দ্বিতীয় কাণ্ড। এই পুস্তকে লেখক নাগরিক চিত্র ত্যাগ করিয়া যে গ্রাম্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। পল্লীগ্রামের ভাব, ভাষা, আচার, ব্যবহারও প্রচুরভাবে তিনি বইএর মধ্যে ঢুকাইয়াছেন। গল্পাংশও বেশ হৃদয়গ্রাহী; লেখকের pathos ফুটাইবার ক্ষমতাটুকুও বেশ। এক একটি গ্রাম্য চিত্র, ও ঘরসংসারের সুখদুঃখের কথা ভারী চমৎকার। আমরা আশা করি রেমন্টের 'The Peasants'এর মত একখানি বই বাংলাভাষায় তিনি দান করিবেন। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই চমৎকার।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

**যার যেথা দেশ**—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম লাইব্রেরী, ৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৷৷০ টাকা।

এ বইখানি উপন্যাস। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিচিত্রায় "সত্যাসত্য" নামে যে সুদীর্ঘ উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তারই প্রথম দিকের খানিকটা অংশ "যার যেথা দেশ"। অর্থাৎ, "যার যেথা দেশ" "সত্যাসত্য" উপন্যাসের প্রথম সর্গ।

একটি সুলক্ষণা সুন্দরী মেয়ে যখন চোখের উপর দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে ক্রমশঃ বেড়ে ওঠে, তখন তার রূপের প্রতিদিনকার খণ্ড খণ্ড প্রকাশ দেখে ভাল যে লাগে না, তা নয়; কিন্তু সহসা যখন একদিন তাকে হয় ত কোনো বিবাহ-সভায় বধূবেশে দেখি, তখন তার যোল বৎসরের পূর্ণীভূত দেহ মনের অখণ্ড সুষমার অপূর্ব্বতায় একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাই। তখন বুঝ্‌তে পারি পুষ্পপল্লবে সমৃদ্ধ ফুল-গাছের শোভা পুষ্পের শোভাও নয়, পল্লবের শোভাও নয়, এমন কি উভয়ের যোগফলের যে যুক্ত শোভা তাও নয়, তারও বহু-অতিরিক্ত একটা স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য। সম্পূর্ণ পুস্তকরূপে একত্র-গ্রথিত "যার যেথা দেশ" বইখানি পড়তে পড়তেও সেই কথাই মনে হ'ল। মনে হ'ল এ'কে বিচিত্রার মধ্যে মাসে মাসে পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে যা দেখেছি এর নূতন পরিচ্ছদে এ একেবারে তা' থেকে সম্পূর্ণ নূতন। এর সমগ্র মূর্ত্তির অখণ্ড লাবণ্যে মুগ্ধ হ'লাম।

কতকগুলি ফুলকে মালার আকারে সাজিয়ে রাখলেই মালা হয় না—সেই ফুলগুলির মধ্য দিয়ে যখন একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র সঞ্চারিত হ'য়ে সবগুলিকে সংযুক্ত করে তখন হয় মালা। উপন্যাসের বিভিন্ন ঘটনাবলীর ভিতর দিয়েও সেইরূপ একটি অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র সঞ্চারিত হ'লে তবে হয় উপন্যাস। উপন্যাসের এই যোগসূত্রের মধ্যেই উপন্যাসের সমস্ত কৌতূহল, সমস্ত বিস্ময়ের অবস্থিতি। 'যার যেথা দেশে' সেই যোগসূত্রটি আছে। এই বিলিতি চেরিব্লসম্ আর দেশী মালতীফুলের মালাটি রসিকজনের মন মুগ্ধ করেছে।

'যার যেথা দেশের' কলাকৌশল (technique) সম্পূর্ণ অভিনব। এ বইখানি পড়তে পড়তে সব সময়ে ঠিক করা যায় না যে, এর পাত্রপাত্রী বিভিন্ন নরনারী, না বিভিন্ন চিন্তা-চরিত্র; বাদল, সুধী, দে সরকার, কলিন্স্, উজ্জয়িনী, মিসেস্ উইল্‌স্,—না সোশালিস্‌ম্, র‍্যাশনালিজ্‌ম্, বৈষ্ণবতা, লেবর, ষ্টেট্। সুতরাং এ উপন্যাসটি পাঠকের চিত্তে শুধু গল্পের মোহই বিস্তার করে না, চিন্তার খোরাকও জোগায়। মনে হয় এ বইখানি বাঙ্গলা ভাষার একটি দীর্ঘস্থায়ী সম্পদ হ'য়ে রইল।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

# শ্যামাদাস স্মৃতি-তর্পণ

শ্রীসুধাংশুশেখর গুপ্ত বি-এ

৺কবিরাজশিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি

বাচস্পতি ছিলেনা তো, তুমি ছিলে শান্ত বনস্পতি,
প্রচ্ছায় শীতল-তল, শ্রান্ত ক্লান্ত পথিকের গতি।
এ বাক্‌সর্ব্বস্বদেশে, তুমি ছিলে মৌন মহীরুহ,
নিরন্নের স্নেহ-নীড়, নিরুপায় বিপন্নের ব্যূহ।

ব্যাধি হ'তে ছিলে তুমি আধিচিকিৎসায় সুনিপুণতর
হে ভিষক শিরোমণি, তোমার দুয়ারে তাই হোতো জড়ো
আতুরের চেয়ে নিত্য অনাথের ভিড়।
আজি এ নিবিড়,
আষাঢ় মেঘের মাঝে ডুবে গেলে সুপ্রসন্ন-জ্যোতি
হে ওষধিপতি।

ভারত ভেষজে তুমি এনেছিলে নূতন জীবন,
তুমি বিলায়েছ আলো যেইখানে যত অকিঞ্চন,
দীনছাত্র, পতিহীনা, অতিদুঃস্থা, ক্ষীণ, অসহায়,
দীপহীন কুটীরেতে ব'সেছিল শূন্য নিরাশায়,
সেই ঘরে ঘরে।
আজি তব তরে,
শোকাকুল দুঃখী দেশ তাই কেঁদে মরে।

অন্ধের ভেঙ্গেছে নড়ি, পঙ্গু কয় খোয়ায়ে নয়ন,
শেষের ভরসা-হারা হোলো আজ রোগীর জীবন।
এ বিপুল ব্যথাতুরা পৃথিবীর ভার
হা বাসুকী, তুমি বিনা কে বহিবে আর?
তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি ছিলে আরো মহীয়ান,
হে দেব, আদর্শে তব দীপ্ত হোক বাঙ্গালীর প্রাণ।

# পরলোকে প্রকৃতি দেবী

### শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি-এ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, "বিচিত্রার" পাঠক-পাঠিকা এবং বাংলার সুধী-সমাজের নিকট সুপরিচিতা যশস্বিনী প্রতিভান্বিতা শিল্পী শ্রীযুক্তা প্রকৃতি দেবী গত ২রা জুন শনিবার দুরারোগ্য মেনিন্‌জাইটিস্‌ রোগে আক্রান্ত হইয়া মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার এই অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা মাতা, তাঁহার শ্বশুর সর্ব্বজন পরিচিত দার্শনিক পণ্ডিত ও এটর্ণী শ্রীযুক্ত মোহিনী-মোহন চট্টোপাধ্যায়, তাঁহার স্বামী সলিসিটর শ্রীযুক্ত মহীমোহন চট্টোপাধ্যায়, তাঁহার এক মাত্র কন্যা শ্রীমতী সুরভি-দেবী, বি, এ ও দুই পুত্র এবং আরও বহু আত্মীয় পরিজন এবং অনুরাগী দেশবাসী বিশেষরূপে মর্ম্মাহত হইয়াছেন।

প্রকৃতি দেবী

প্রকৃতি দেবী ছিলেন কলাকুশলা শিল্পী এবং আজীবন চিরসুন্দরের পূজারী। তাঁর চিত্রাঙ্কন প্রণালী প্রধানতঃ ভারতীয় এবং প্রাচ্য চিত্র-কলা পদ্ধতি অবলম্বনে অনুসৃত হইত। শিল্প-কলার ক্ষেত্রে তাই তিনি অবনীন্দ্র ঠাকুর প্রমুখাৎ প্রাচ্য-শিল্প-সাধকগণের অনুবর্ত্তিনী থাকিয়া তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার দ্বারা ভারতবর্ষের জাতীয় শিল্পের উপাসনা করিয়া আসিয়াছেন। শুধু মাত্র চিত্রাঙ্কনের মধ্যেই তাঁহার প্রতিভা নিয়োজিত ছিলনা। কারু-কলার আরও বহু ও বিভিন্নমুখী পথে তাঁহার প্রতিভার প্রদীপ্ত পরিচয় তাঁহাকে কলা-রসজ্ঞ সুধী-সমাজের অন্তরে অমর করিয়া রাখিবে।

ওয়াটার কলার চিত্র রচনায় তাঁহার পরিকল্পনা ও দক্ষতা অতি অল্পকাল মধ্যেই শিল্পী সমাজে বিশেষ সমাদর পাইয়াছিল। নিদর্শন-চিত্র Design-Painting বা অলঙ্করণ চিত্র রচনায় তাঁহার শক্তি ছিল সত্যই অনন্যসাধারণ। এই বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁহার শিল্প-প্রতিভা বর্ত্তমান যুগের যে-কোন দেশের যে-কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সমতুল্য ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষের গিরিগাত্র পরিশোভিত অলঙ্করণ-চিত্রাবলীর অনবদ্য রূপ-শ্রী যেন নবতর কলেবর ধারণ করিয়া অতীন্দ্রিয়লোকের অপরিকল্পনীয় রূপচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহার অলঙ্করণ-চিত্রের রূপ ও রেখার মূর্ত্তি পরিগ্রহণ

করিয়াছিল। ভারতীয় শোভন-শিল্প অথবা অলঙ্করণ শিল্পের অঙ্গীভূত তাঁহার "চিত্রণ" নামক শিল্প-গ্রন্থের প্রত্যেকটি চিত্র হইতে আমাদের এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। ১৩৩৭ সনের কার্ত্তিক মাসের "বিচিত্রায়" উক্ত গ্রন্থের সুদীর্ঘ সমালোচনা লিখিত হইয়াছিল এবং তৎকালে রসিক সমাজ কর্ত্তৃক দেশে ও বিদেশে গ্রন্থখানি বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল।

আমাদের বেশভূষ, গৃহসজ্জা, আসবাব পত্র প্রভৃতির গঠন সৌষ্ঠবে যাহাতে ভারতবর্ষের নিজস্ব এবং মার্জ্জিত রুচি অবলম্বনে পরিকল্পিত রূপ-বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয় সেই দিকে তাঁহার গভীর আগ্রহ প্রকাশ পাইত। তাঁহার এই আগ্রহের সাফল্য কল্পে তিনি বহুশত নিদর্শন-চিত্র (Oriental designs) আঁকিয়াছিলেন এবং ঐ সকল নক্সা-চিত্রের কয়েকগুলি একত্র গ্রথিত করিয়া তিনি আর একখানি অভিনব শিল্প-পুস্তিকা প্রণয়নে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার বাসনা চিরতরে অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। "বিচিত্রায়" একাধিকবার তাঁহার অঙ্কিত ছবি এবং অলঙ্করণচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯২৯ সনে তদানীন্তন লাট-মহিষী মাননীয়া লেডী জ্যাকসন কর্ত্তৃক উন্মোচিত সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির শিল্প-কলা প্রদর্শনীতে এবং পর বৎসর কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট ছাত্র-ছাত্রী সমাজ কর্ত্তৃক পরিচালিত চারু-কলা প্রদর্শনীতে বৌদ্ধ জীবন অবলম্বনে এবং রবীন্দ্র-নাথের কাব্য-কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত তাঁহার কয়েকখানি Water colour ছবি, জেসো চিত্র এবং রেশমের উপর অঙ্কিত চিত্র ভারতীয় চারু-শিল্পের বর্ণবৈচিত্র্যে এবং delicate expression এ বহু নরনারীকে মুগ্ধ করিয়াছিল। গত তিন বৎসর যাবৎ উক্ত প্রদর্শনী-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ-গণ কর্ত্তৃক প্রতি বৎসর উনি শিল্প-নির্ব্বাচন-সমিতির অন্যতমা বিচার-কর্ত্রী নির্ব্বাচিত হইয়া আসিয়াছিলেন। বঙ্গ-দেশের বাহিরেও যথা দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ নগরীর কারু-শিল্প প্রদর্শনীতেও, তাঁহার হাতের ছবি ও কারু-কলার সমাদর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে কেবল চিত্রাঙ্কনের মধ্যেই তাঁহার প্রতিভা সীমাবদ্ধ ছিলনা। বঙ্গীয় ও ভারতবর্ষীয় পল্লী-শিল্পের অঙ্গীভূত বহুবিধ গৃহস্থালী শিল্পকলার বিচিত্র সুন্দর পথে তার গতি ছিল অপ্রতিহত। পল্লী-শিল্পানুরাগী শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস মহাশয়ের প্রচেষ্টা ও অনুরোধে প্রকৃতি দেবীর কয়েকখানি ছবি, পল্লী শিল্পাঙ্গীভূত তাঁহার হাতের সূচীকার্য্য, গালার কাজ, জেসো-চিত্র, মীনার কাজ, বটিকের কাজ, চামড়ার উপর অলঙ্কার-শিল্প,

পুরুষ ও প্রকৃতি

প্রকৃতি দেবী অঙ্কিত 'পুরুষ ও প্রকৃতি' নামক ছবিখানি প্রসিদ্ধ মূর্ত্তি-শিল্পী শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর পাল মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করিয়াছে। তাহা হইতে প্রতিলিপি লইয়া উপরের ছবিটি প্রস্তুত।

কাষ্ঠ-খোদাই, আচার, মোরব্বা প্রভৃতির নিদর্শন সুদূর লণ্ডনের একটি প্রদর্শনীতে প্রেরিত ও প্রশংসিত হইয়াছে। বাংলার মহিলাদের পক্ষে ইহা গৌরবের বিষয়।

তিনি নিজে ছিলেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আর সুন্দরের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল প্রগাঢ়। সুন্দরের সৃষ্টি-সাধনেও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। প্রাত্যহিক সংসার পরিচালনার অবসর সময়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে বসিয়া তিনি সারা-জীবন আত্মভোলা হইয়া কলালক্ষ্মীর আরাধনা করিয়া আসিয়াছিলেন। এতখানি কলানুরাগ এবং অনিন্দ্যসুন্দর রূপদক্ষতা অতি অল্প মহিলার মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয়।

উচ্চাঙ্গের নাটকাভিনয় প্রযোজনায় তাঁহার অপরূপ নৈপুণ্য ছিল। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির ছাত্রীদের সহযোগিতায় এবং "বঙ্গলক্ষ্মীর" শ্রদ্ধেয়া সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর পরিকল্পনায় অনুষ্ঠিত যথাক্রমে "ওমর খৈয়ম," "বেহুলা" এবং "শ্রীনিবাসের ভিটা" নামক নাটিকাত্রয়ের মূক-অভিনয়ের প্রযোজনার মধ্যে এবং উক্ত অভিনয় সম্পর্কিত নৃত্যকলায় সুকুমার কলার আর কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রকৃতি দেবীর রসসৃষ্টির ঐন্দ্রজালিক প্রতিভা অনবদ্য মাধুর্য্যে প্রতিভাত হইয়াছিল। সম্প্রতি তিনি অজন্তার গুহা-চিত্র অবলম্বনে Fresco Painting বা প্রাচীর-চিত্র এবং Eggtempera পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন অনুশীলন করিতেছিলেন।

তিনি একজন প্রতিভামণ্ডিতা শিল্পী (artist) ছিলেন বলিলেই এই মহিয়সী রমণীর সবখানি পরিচয় দেওয়া হয়না। তিনি ছিলেন নারীত্বের আদর্শ প্রতীক আদর্শ গৃহিণী এবং আদর্শ জননী। ৺মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত জলধিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তিনি কনিষ্ঠ কন্যা ছিলেন। ১৯০৭ অব্দের ১৬ই জুন কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সর্ব্বজন-বরেণ্য মনীষী ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের দৌহিত্র এবং শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র এটর্ণী শ্রীযুক্ত মহীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তিনি বিবাহ সংস্কারে আবদ্ধ হন। সুতরাং পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুল উভয় পক্ষ থেকেই তিনি ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায় ভুক্তা। কিন্তু অভিজাত বংশের অনেকের মধ্যে জীবনের উচ্চআদর্শ বা ভাবধারার প্রতি যে বিমুখতা দেখা যায় তাঁহার মধ্যে তাহা ছিলনা। তিনি অভিজাত ছিলেন আপনার বংশগত মর্য্যাদা রক্ষায়। আপনার প্রতিভা ও বিদ্যার জগতে অন্তরের বিপুল ঐশ্বর্য্যের আভিজাত্যে তিনি ছিলেন ঐশ্বর্য্যশালিনী।

সর্ব্ব শ্রেণীর সর্ব্বসমাজের নরনারীর প্রতি তিনি অকৃত্রিম সহানুভূতি পোষণ করিতেন এবং তাঁহার স্বদেশের ভগ্নীগণের মধ্যে যাহাতে দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় নির্ম্মল সৌন্দর্য্য-বোধ, জাতীয় শিল্পকলার প্রতি আন্তরিক ভালবাসা, মানুষের প্রতি মানুষের আচরণের মধ্যে পরম ঔদার্য্য-বোধ জাগরিত হয় তাহা দেখিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা উন্মুখ থাকিতেন। আপনার সুবৃহৎ সংসারের গুরুদায়িত্বের প্রতি অবহেলা না করিয়া এবং যতখানি সম্ভব বহির্জগতের প্রচার ও কল-কোলাহল হইতে নিজেকে অন্তরালে রাখিয়া তিনি বহুবিধ নারী-মঙ্গল-বিধায়িনী কাজের মধ্যে আপনার সেবা-পরায়ণ হস্ত প্রসারিত করিয়াছিলেন। নারী সমাজের মঙ্গল সাধনায় তাঁহার দুর্নিবার আগ্রহ ছিল। "সরোজ-নলিনী নারী-মঙ্গল-প্রতিষ্ঠানের" মূল সমিতির সদস্যারূপে ও তাহার অন্তর্ভুক্ত "রাজবালা নারী-মঙ্গল সমিতি" এবং "নারী কল্যাণ সমিতির" সম্পাদিকা রূপে তিনি নারী-জাগরণ কার্য্যের সহিত আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেন। "পুরী বিধবা আশ্রম", লেডী অবলা বসু মহোদয়ার পরি-চালনায় প্রতিষ্ঠিত "নারী শিক্ষা সমিতি," "বিদ্যাসাগর বাণীভবন" প্রভৃতি সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি সংশ্লিষ্টা ছিলেন।

লোক সমাজকে পুষ্ট করে নারীর কল্যাণ স্পর্শ সংসারকে লক্ষ্মীমন্ত করে নারীর শুভ সহযোগ এই সত্যটি অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ উপলব্ধি করিয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমান কালে বহুযুগ সঞ্চিত পরাধীনতা এবং কুসংস্কারের পরিণামে আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকের মধ্যেই উপরোক্ত সত্যের সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গলক্ষ্মীর বরকন্যা প্রকৃতি দেবীর জীবনের সর্ব্ব দিকে কিন্তু উপরোক্ত সত্যের সার্থকতা অপূর্ব্ব ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার মায়ার পরশ দিয়া তিনি তাঁহার সংসারকে

শান্তি-কুঞ্জে রূপায়িত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের মহান অনুপ্রেরণার দ্বারা তিনি বহু লোককে সত্য ও সুন্দরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য্যরাজির দ্বারা তিনি তাঁহার স্বদেশের শিল্প ও ললিত-কলাকে সমৃদ্ধশালী করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে প্রদীপ্ত নারীত্বের দীপ্তিময়ী এবং শান্তমধুর ব্যঞ্জনা বাংলার নারী-সমাজকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। তাঁহার জীবন-নাট্যের আকস্মিক ও অতর্কিত অবসানে বাংলার একটি অর্দ্ধ-উন্মেষিত প্রতিভা অকালেই স্তিমিত হইল। বাংলার পরম সৌভাগ্যক্রমে বাঙালীর অন্তঃপুরে এঁর মত একজন সর্ব্বগুণ-সমান্বিতা আদর্শ কুললক্ষ্মী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বাংলারই একান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে নারী-জাগরণের মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁহার ইহ-জীবনের সাধনা পূর্ণতার পথে পৌছুতে না পৌছুতে অমৃতলোকের আহ্বানে তাঁহাকে অকালে ইহসংসার ত্যাগ করিতে হইল। তাঁহার মৃত্যুতে শিল্প-জগতের বিশেষ করিয়া পল্লী-শিল্পের যে ক্ষতি সাধিত হইল তাহা অচিরে পূরণ করা সম্ভব নহে। নারী-জাগরণের পথে এবং আমাদের জাতীয় শিল্প-কলার আরাধনায় এই মহিমান্বিতা মহিলার জীবনের সুন্দর ও মহান আদর্শ অনুসৃত হইলে তাঁহার অমর আত্মার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শিত হইবে। আমরা তাঁহার আত্মার অক্ষয় শান্তি কামনা করি।

বিচিত্রার বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত রঙিন ছবি 'কলাপী' ও একবর্ণ ছবি 'বুদ্ধ' প্রকৃতি দেবীর শিল্প-সৃষ্টির দুটি সুন্দর নিদর্শন। 'কলাপী' ছবিটি রেশমী বস্ত্রের উপর এবং 'বুদ্ধ' ছবিটি 'জেসো'-পদ্ধতিতে অঙ্কিত। রেশমের উপর রঙ দিয়ে ছবি আঁকা কঠিন কার্য্য, কিন্তু 'কলাপী' ছবিতে প্রকৃতি দেবী সে বিষয়ে অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। এই প্রবন্ধের তলদেশের চিত্রটি প্রকৃতি দেবীর অঙ্কিত 'অলঙ্করণ চিত্রে'র একটি উৎকৃষ্ট নমুনা।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

# সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর-সরস্বতী

## শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, ডি-লিট্

কোনও প্রকারের গান কি বাজনা আমি কখনও শিখি নাই, সঙ্গীতের কিছুই জানিনা। সঙ্গীত-সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু সঙ্গীতনায়ক, সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা-ভাব নিবেদন করিবার অবসর পাইয়া আমি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি। জীবনে যতগুলি শ্রেষ্ঠ বস্তু পাইয়াছি, যে বস্তুগুলির জন্য পরমেশ্বরের নিকট আমি কৃতজ্ঞ, তন্মধ্যে ধ্রুপদের ন্যায় উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত হইতে আনন্দ অথবা আনন্দের আভাস প্রাপ্ত হইবার সামর্থ্য অন্যতম। আমার মাতুলালয়, হাওড়া শিবপুর গ্রাম সঙ্গীতচর্চ্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। মামার বাড়ীতে ধ্রুপদ প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীতের আলোচনার জন্য প্রায়ই বন্ধুগোষ্ঠী আহূত হইত। বাল্যকালে এইরূপ বন্ধু গোষ্ঠীর এক কোণে বসিয়া ধ্রুপদ, খ্যাল শুনিবার সৌভাগ্য আমার পক্ষে খুবই ঘটিয়াছিল। শিশুকালের অন্যতম স্মৃতি স্বরূপ একদিনের ঘটনা আমার মানস পটে এখনও উজ্জ্বল হইয়া আছে—এক বর্ষার দিনে, মামার বাড়ীর বৈঠকখানায় শিবপুরের বিখ্যাত গায়ক নিকুঞ্জ দত্তের ('কানা নিকুনে'র) কণ্ঠে গীত একটী গান একবার শুনিয়াছিলাম—এই গানটী মনের উপর বিশেষ

সঙ্গীত-নায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

মোহ বিস্তার করিয়াছিল ; গানটীর সুর, তাল আদির কথা কখনও জানিবার চেষ্টা করি নাই, কিন্তু পাখোয়াজের স্নিগ্ধ-গম্ভীর ধ্বনির সহিত ইহার সুরের ধীরোদাত্ত গতি এবং ইহার বাণীর হিন্দী শব্দের মোহ এখনও ৩০।৩২ বৎসর পরেও কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই—এই বাণীর ঝঙ্কার এখনও যেন মাঝে মাঝে কানে বাজে—"ঘোরে ঘোরে বরসত বাদরবা"। পরবর্ত্তীকালে নানা প্রকারের সঙ্গীত শুনিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছে। কিন্তু ধ্রুপদের সরল উদার মহিমময় সৌন্দর্য্য আমাকে যতটা আকৃষ্ট করিয়াছে, আর কোনও প্রকারের সঙ্গীতে ততটা করিতে পারে নাই। ধ্রুপদ সঙ্গীত ও সঙ্গে সঙ্গে পাখোয়াজের গুরু ও ললিত সঙ্গত শুনিয়া বড় বড় জিনিষের কথাই মনে আসে—হিমালয়ের বিরাট ভাব, সাগরের বিশালত্ব, গ্রীক্ দোরীয় রীতির স্থাপত্য, গথিক গির্জ্জার অভ্যন্তর, মহাবলীপুর, এলুরা ধারাপুরীর ভাস্কর্য্য রাজপুত চিত্রকলা ; সঙ্গীত ও বাদ্য মধ্যে ধ্রুপদের অনুরূপ প্রভাব মাত্র রোমান কাথলিক মন্দিরে পূজার সময়ের অর্গান বাদ্য তথা কিছু কিছু জার্ম্মান সঙ্গতে শিল্পীদের রচিত ঐক্যতান যন্ত্রসঙ্গীত হইতেই পাইয়াছি।

শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধ্রুপদ সঙ্গীতের অদ্বিতীয় নায়ক। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি এখন পথভ্রষ্ট। হাল্কা ও চুট্কি জিনিষের প্রাবল্য আসিয়া গভীর অনুভূতি সাপেক্ষ উচ্চ অঙ্গের বস্তুর প্রতি আমাদের আকর্ষণ কমাইয়া দিয়াছে। সুতরাং "কালোয়াতী গান" বলিয়া সাধারণে। ধ্রুপদের প্রতি একটা উপেক্ষা ও বিরাগ দেখা দিয়াছে। ধ্রুপদ সম্বন্ধে এই উপেক্ষার ভাব ওই সঙ্গীতের প্রধান কেন্দ্র উত্তর ভারতবর্ষে হিন্দুস্থানেও খুব দেখা যাইতেছে। কেবল মহারাষ্ট্রে ও বঙ্গদেশে সঙ্গীত রসরসিকদের মধ্যে ধ্রুপদের যা কথঞ্চিৎ আদর দেখা যায়।

শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভারতবর্ষের অন্যতম প্রথম শ্রেণীর ধ্রুপদী। বহুবার মুগ্ধ হইয়া ইঁহার গান শুনিয়াছি ইঁহার ন্যায় গুণী জগতে দুর্ল্লভ। বাঙ্গলা দেশে বিষ্ণুপুরে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে সর্ব্ববিধ সংস্কৃতি ও চর্য্যার যে একটী কেন্দ্র ঐস্থানের মল্লবংশীয় স্বাধীন রাজগণের আশ্রয়ে গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই কেন্দ্রে নানাবিধ রূপ-শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত শিল্পও বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিষ্ণুপুর রাঢ়-বঙ্গে একমাত্র শিল্প-সুষমাময় নগরী হইয়া দাঁড়ায় ; বিষ্ণুপুরের প্রাচীন মন্দিরাবলী এবং বিষ্ণুপুরের পট্ট-বস্ত্র, শঙ্খ ও ধাতু-শিল্প, বিষ্ণুপুরের অতীত শিল্প-গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অন্য বিষয়ে বিষ্ণুপুরের গৌরব অস্তমিত হইলেও, শিল্প ও সঙ্গীতে তাহা কথঞ্চিৎ সংরক্ষিত আছে। বিশেষতঃ সঙ্গীত বিষয়ে বিষ্ণুপুর এখন ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান স্থান। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বিষ্ণুপুরে সঙ্গতের চর্চ্চা চলিয়া আসিতেছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের আশ্রয়ে পশ্চিমাঞ্চল হইতে আগত তানসেনের বংশজাত বাহাদুর আলী খাঁ বা বাহাদুর সেন ও তাঁহার সহযোগিগণ বিষ্ণুপুরের প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীতের ধারাকে আরও পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করিতে সহায়তা করেন। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত সঙ্গীতের ধারা এখনও বিষ্ণুপুরে তথা বঙ্গদেশেও প্রবাহিত রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বাবুর পিতা বাঙ্গলার সঙ্গীতগুরু স্বর্গীয় অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাহাদুর সেনের শিষ্য পরম্পরার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এবং তিনি এই শিষ্য-গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম কৃতিব্যক্তি ছিলেন।

সঙ্গীতের প্রাচীন ধারা এই ভাবে শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বাবুর পরিবারের সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই ধারা এখন গোপেশ্বরবাবুর এবং তাঁহার ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, পুত্র, শিষ্য ও অনুশিষ্যদের সাধনায় আরও শক্তিলাভ করিয়া বাংলাদেশ তথা ভারত-বর্ষের সঙ্গীত রসিক জনগণের চিত্তকে সরস করিতেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির একটী প্রধান অঙ্গ হইতেছে সঙ্গীত ; নিজ পরিবারের সহিত শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বাবু এই অঙ্গকে জীবিত ও প্রাণবন্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এই নিমিত্ত দেশাত্মবোধযুক্ত ও নিজ জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি আস্থাশীল প্রত্যেক ভারতবাসীর ইঁহাদের সম্বন্ধে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এই কৃতজ্ঞতা যে অন্ততঃ আংশিক ভাবেও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেশের সর্ব্বত্র শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বাবুর প্রতি সম্মাননা হইতে বুঝা যায়। শ্রীভগবৎ সমীপে এই আন্তরিক প্রার্থনা করি শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বাবু সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সপরিজনে ও সশিষ্যানুশিষ্যে তাঁহার জীবনের ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিতে থাকুন।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

# গোয়ালিয়র দুর্গ

শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগির

গোয়ালিয়র দুর্গে প্রথম যেদিন আসিয়াছিলাম সেদিন মনে হইয়াছিল যেন আপন ঘর বাড়ি ছাড়িয়া অনেক দূরে অন্য এক রাজ্যে আসিলাম। গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড গরম মাথায় করিয়া ষ্টেশন হইতে 'টঙ্গা' লইয়া দুর্গের গেটে যখন আসিয়া পৌঁছাইলাম তখন ঘাটি' ভাঙ্গিয়া উপরে যাইবার স্পৃহা এতটুকুও না থাকিলেও সূর্য্যের প্রখর তাপে গেটে বসিয়া থাকাও যুক্তিযুক্ত মনে হইল না। অগত্যা উপরে যাওয়াই স্থির করিলাম। উপরে যাইতে দেখা যায় পাথরের গায়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জৈন মূর্ত্তিগুলি সূর্য্যের প্রচণ্ড প্রতাপকে অগ্রাহ্য করিয়া দাঁড়াইয়া আছে নির্জ্জন পথে।

উপরে আসিয়া পৌঁছাইলাম গলদঘর্ম্ম অবস্থায়। ভাঙ্গা মন্দির, পুরাতন বাঁধানো পুকুর ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে, পাহারাওয়ালার নিকট খোঁজ লইয়া যখন আপন গন্তব্য-স্থানে পৌঁছাইলাম তখন সত্যই মনে হইল এই দুর্গের উপর বন্দী হইয়া কতদিন থাকা সম্ভব হইবে।

হিন্দোলা বা বাদল মহল গেট

গোয়ালিয়র দুর্গে যখন প্রথম আসিয়াছিলাম তখন গোয়ালিয়র দুর্গের ইতিহাস ভালো জানা ছিলনা। দুর্গের প্রত্যেকটি দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া মনে স্বপ্নজাল সৃষ্টি করিয়াছিল। এখন পুরাতন মন্দিরগুলি, ভাঙ্গা ঘাট, মানসিংহের প্রাসাদ সব যেন অনেকদিনের চেনা মনে হয়। যুগ যুগ ধরিয়া কত যে ব্যাপার এই দুর্গের ভিতর ঘটিয়াছে, সে কথা মাঝে মাঝে সত্যিই ভুলিয়া যাই।

কবে এই দুর্গের গোড়া পত্তন হইয়াছিল তার খবর কে রাখে!

সূর্য্যসেন, এক রাজপুত কুমার, হয়তো এই গোয়ালিয়র দুর্গের গোড়া-পত্তন করিয়াছিলেন। গোয়ালিপা নামে এক সন্ন্যাসী হয়তো এই পাহাড়ে ছিলেন কৃচ্ছ সাধনে—যুবক আসিয়াছিলেন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া সন্ন্যাসীর নিকট। সন্ন্যাসী তাঁহাকে এই পাহাড়েরই এক ঝরণার এক ফোঁটা জল দিয়া তাঁহার রোগ মুক্ত করিয়া দিলেন। বোধহয় ইহা হইতেই হইল গোয়ালিয়র দুর্গের গোড়াপত্তন।

চতুর্ভুজ মন্দির

দেখিয়া, মন্দিরের গায়ে সুদক্ষ শিল্পীর সুনিপুণ হস্তের মূর্তির উপরও মানুষের হিংসা প্রতিহিংসার নিষ্ঠুর আঘাত—দেখিয়া মনটা ব্যথায় ভরিয়া উঠে।

গোয়ালিয়র দুর্গটি ৩০০ফিট উচ্চ একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। লম্বায় ১$\frac{3}{4}$ মাইল এবং দৈর্ঘে ৬০০হইতে ২৮০০ ফিট। দুর্গের প্রাচীর ৩০।৩৫ ফিট উচ্চ। গোয়ালিয়র দুর্গটি যে প্রাকৃতিক দৃশ্যে উত্তর ভারতে অতুলনীয় এ বিষয় সন্দেহ নাই।

গোয়ালিয়র দুর্গের গেট দুইটি। একটি পুরাতন গোয়ালিয়র সহরের দিকে। আরেকটি অন্যদিকে। গোয়ালিয়র সহরের দিকের গেট হইতে উপরে উঠিবার রাস্তাটি অত্যন্ত চড়াই। গাড়ী কিংবা মোটর এ রাস্তায় উপরে উঠিতে পারে না, নিয়মও নাই। হাতী কিংবা ঘোড়ায় কিংবা পদব্রজে উপরে ওঠা সম্ভব। অন্য গেটটি হইতে যে রাস্তা উপরে গিয়াছে তাহা অপেক্ষাকৃত চড়াই কম এবং এই রাস্তায় মোটরে উপরে যাওয়া সম্ভব। এই গেটটির নাম উরভাই দরজা।

তাহার পর যুগ যুগ কাটিয়া গিয়াছে। কত নরনারী মরিয়াছে এই গোয়ালিয়র দুর্গে, কত রাজপুতবীর প্রাণ দিয়াছেন গোয়ালিয়র দুর্গের জন্য। মুসলমান আসিয়াছে গোয়ালিয়র দুর্গ জয় করিতে—রাজপুতবীরেরা প্রাণ দিয়াছেন যুদ্ধে, দুর্গের ভিতর রাজপুত নারীগণ 'জহর-ব্রত' সমাধা করিয়াছেন। এই সকল করুণ কাহিনী ইতিহাসে যে না পাওয়া যায় তাহা নয়।

এখন গোয়ালিয়র দুর্গে আসিলে অতীতের ধ্বংসাবশেষ

গুজরী মহল

গোয়ালিয়র গেট দিয়া উপরে উঠিবার পথে দ্বিতীয় গেটের নাম হিন্দোলা বা "বাদল মহল গেট"। এই স্থানে

মানমন্দির বা রাজা মানসিংহের প্রাসাদ

পূর্ব্বকালে একটি দোল্না থাকায় এই গেটটির নাম 'হিন্দোলা' বলা হয়। এই সুন্দর গেটটি পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত।

**গুজরী মহল**—পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজা মানসিংহ তাঁহার প্রধানা রাণী 'মৃগনয়না'র জন্য এই প্রাসাদটি নির্ম্মাণ করেন। প্রাসাদটি দুর্গের উঠিবার মুখেই অবস্থিত। রাণী 'মৃগনয়না' জাতিতে গুজরী হওয়ায় প্রাসাদটির নাম গুজরী মহল বলা হয়। পাথরের দোতালা প্রাসাদটি ২৩২ ফিট × ১৯৬ ফিট। বাহিরের সাদাসিধা এবং

খাস-বহু মন্দির

গম্ভীর ভাব উপরের গোম্বুজগুলি এবং বারান্দার কারুশিল্পে অধিক সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। গুজরী মহলের ভিতর প্রকাণ্ড অঙ্গন, চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট ঘর। দরজা, জানালা, এবং ঘরের ভিতর ব্র্যাকেট ইত্যাদিতে খোদাই কাজের অভাব নাই। আঙ্গিনার ঠিক মাঝখানে কতগুলি ঘর আছে—সেই পথে মাটির নীচের ঘরে যাওয়া যায়। এখন এই গুজরী মহল গোয়ালিয়র ষ্টেটের আর্কিয়লজিক্যাল মিউজিয়ম ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। পুরাতন মূর্ত্তি, শিলালিপি এবং পুরাতন ছবি এবং অন্যান্য দ্রষ্টব্য জিনিষ এখানে রাখা আছে। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীযুক্ত অসিত-কুমার হালদার ইত্যাদির চিত্রিত বাঘগুহার ফ্রেস্কোর কপি এখানে একটি ঘরে রাখা আছে।

**চতুর্ভুজ মন্দির**—গোয়ালিয়র গেটের রাস্তা দিয়া উপরে উঠিবার মধ্যপথে এই মন্দিরটি পাথরের গায়ে অবস্থিত। মন্দিরের ভিতর মূর্ত্তিটি চতুর্ভুজ

বিষ্ণু-মূর্ত্তি ; এই জন্যই মন্দিরটিকে চতুর্ভুজ মন্দির বলা হয়। এই মন্দিরে দুইটি শিলালিপি পাওয়া যায়—যাহা হইতে

খাস-বহু মন্দিরের ভিতরকার দৃশ্য

বুঝিতে পারা যায় যে মন্দিরটি কনৌজ রাজা রামদেবের রাজত্ব-কালে নির্ম্মিত হয়।

**মান-মন্দির** কিংবা রাজা মানসিংহের প্রাসাদ (১৪৮৬-১৫১৬)—মানসিং মন্দির পুরা-কালে হিন্দু রাজপ্রাসাদের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ! পূর্ব্বদিকের প্রশস্ত সম্মুখভাগ লম্বায় ৩০০ ফিট এবং উচ্চতায় ৮০ ফিট। দক্ষিণেও লম্বায় ১৫০ ফিট এবং ৫০।৬০ ফিট উচ্চতায়। দেওয়ালের গায়ে চতুর্দ্দিকে নীল, সবুজ, হলদে রঙের টাইলে হাঁস, মানুষ, হাতী বাঘ ইত্যাদির বিচিত্র ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। ছবিগুলি সত্যই সুন্দর।

প্রাসাদের ভিতর দুইটি অঙ্গন—অঙ্গনের চতুর্দ্দিকে ঘর। প্রথম অঙ্গনটি ৩৪ফিট×৩৪ ফিট ৬ ইঞ্চি। এবং দ্বিতীয় অঙ্গনটি ৩৯ফিট×৩৮ফিট ৬ ইঞ্চি। প্রাসাদটি দোতালা এবং পূর্ব্বদিকে মাটির নীচেও ঘর আছে।

অঙ্গন দুইটি যদিও খুব বড় নয় কিন্তু ঘরে ঢুকিবার দরজায়—ব্র্যাকেটে, জানালায় নানারূপ ডিজাইনের খোদাই কাজ দেখা যায়। মানসিংহের প্রাসাদের উপর হইতে সহরের দৃশ্য অতি সুন্দর, এবং সন্ধ্যায় মানসিংহ-প্রাসাদের গম্বুজের উপর যখন ময়ূরের দল ঘুরিয়া বেড়ায় তখন সন্ধ্যাকাশের গায়ে গম্বুজ এবং ময়ূরগুলিকে দক্ষ শিল্পীর হাতে আঁকা ছবির মত মনে হয়।

ছোট খাস-বহু মন্দির

**শ্বাস-বহু মন্দির।** এক জোড়া মন্দির। মন্দির দুইটি সুন্দর জায়গায় অবস্থিত। শ্বাস্‌-বহু অর্থাৎ শাশুড়ী এবং বউ। অনেকের বিশ্বাস এ মন্দির দুইটি জৈন মন্দির। কিন্তু মন্দিরের মূর্ত্তি, কারুকার্য্য এবং হিন্দু শিলালিপি দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় মন্দির দুইটি জৈন মন্দির নয়।

এই মন্দির দুইটির মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড় মন্দিরটি হিন্দু বিষ্ণুমন্দির এবং ১০২ ফিট লম্বা এবং ৭৪ ফিট চওড়া। এই মন্দিরটি সত্যই অতি সুন্দর। মন্দিরে একটি সংস্কৃত শিলালিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে মহিপাল এক রাজপুত রাজা ১০৯৩ সালে মন্দিরটি স্থাপন করেন। মন্দিরের ভিতরে ঘরটি ৩২ফিট × ৩১ ফিট ৩ ইঞ্চি। মন্দিরের মাঝখানের ছাদটির কারুকার্য্য অত্যন্ত সুন্দর। এই ছাদটি প্রকাণ্ড চারটি থামের উপর অবস্থিত। মন্দিরে নূতন মেরামতগুলি খুব সহজেই চোখে পড়ে! মন্দিরে ঢুকিবার দরজাটি নানারূপ মূর্ত্তি এবং খোদিত কার্য্যে পরিপূর্ণ। বাহিরের প্রথম প্যানেলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের মূর্ত্তি। বাম দিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মধ্যে এবং শিবমূর্ত্তি ডাইনে। মন্দিরটি বিষ্ণুমন্দির—সেইজন্যই বিষ্ণুমূর্ত্তিটিকে মধ্যস্থান দেওয়া হইয়াছে। এই মূর্ত্তিগুলির নীচের প্যানেলটিতে গরুড়ের মূর্ত্তি।

জৈন ভাস্কর্য্য

সিন্ধিয়া স্কুল

মন্দিরের থামগুলির কাজও অতি সুন্দর। এই থামগুলির নীচের দিকটা নানান দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদাই করা। গঙ্গা, যমুনা, গণেশ, কুবের ইত্যাদির মূর্ত্তি এই মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত ছোট মন্দিরটিও বিষ্ণুমন্দির। মন্দির দুইটির খোদাই কাজ একই ধরণের। এ মন্দিরটি ছোট হইলেও একটি সুন্দর জিনিষ।

**জৈন-ভাস্কর্য্য**—গোয়ালিয়রে দুর্গের চারপাশে পাথরে খোদিত জৈন মূর্তিগুলি প্রকাণ্ড এবং উত্তর ভারতে প্রসিদ্ধ হইলেও অত্যন্ত এক ধরণের এবং শিল্প হিসাবেও ইহাকে উচ্চস্থান দেওয়া যায় না। দুর্গের চারধারে যে স্থানে পাথর কাটিবার এতটুকু সুবিধা মিলিয়াছে সেখানেই এই মূর্তিগুলি দেখা যায়। সবচেয়ে বড় মূর্তিটি উচ্চতায় ৫৭ ফিট!

পূর্ব্বকালে দুর্গের উপর জলের ব্যবস্থার জন্য পাথর বাঁধানো কতগুলি পুকুরের বন্দোবস্ত ছিল। এখনো সেই সব পুকুরের কোনো কোনোটায় যথেষ্ট জল আছে। সূর্য্যকুণ্ড, গঙ্গোলা তাল, একখাম্বা তাল, কাটোরা তাল, রাণী তাল ইত্যাদি নামে এই পুকুরগুলি পরিচিত। রাণীতালটি ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভালো অবস্থায় আছে। সিন্ধিয়া স্কুলের ছাত্রদের সাঁতারের বন্দোবস্ত এই বাঁধানো পুকুরটিতেই করা হইয়াছে।

**তেলী-মন্দির**—গোয়ালিয়র দুর্গে যতগুলি মন্দির আছে তাহার মধ্যে এই মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। উচ্চতায় ১০০ ফিটের হইতেও বেশী। আকারে এই মন্দিরটি অন্যান্য মন্দিরের মত একেবারেই নয়। নবম শতাব্দীতে ইহা স্থাপিত হয়। ইহাও বিষ্ণুমন্দির। ইহা দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের ন্যায় গঠিত কিন্তু ভিতরকার কারুশিল্প অন্যান্য উত্তর ভারতের মন্দিরের কারুশিল্পেরই ন্যায় খোদিত। এই মন্দিরটির প্রকৃত নাম খুব সম্ভবতঃ তেলেঙ্গনা মন্দির ছিল—যাহা দ্বারা বোঝা যায়, তেলেগু দেশের সহিত এই মন্দিরটি সংশ্লিষ্ট। তেলী-মন্দির নাম তেলেঙ্গনা মন্দিরের অপভ্রংশ। এই মন্দিরের মূর্তিগুলি অতি সুন্দর। প্রায় সমস্ত মূর্তিগুলিরই ভগ্ন অবস্থা হইলেও শিল্প হিসাবে এই দুর্গের অন্যান্য মন্দিরের মূর্তির চেয়ে এই মন্দিরের মূর্তিগুলি যে উচ্চদরের, সে বিষয় সন্দেহ নাই।

( উপরে ) তেলী-মন্দির　　( নিম্নে ) সিন্ধিয়া স্কুলের খেলার মাঠ

**সিন্ধিয়া স্কুল**—দুর্গের উপর গোয়ালিয়র রাজ্যের সর্দ্দার এবং জায়গীরদারদিগের সুবিধার জন্য গোয়ালিয়রের স্বর্গীয় মহারাজা মাধব রাও ১৮৯৮ সালে সর্দ্দার স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সর্দ্দার স্কুলটির নাম গত বৎসর হইতে সিন্ধিয়া স্কুল হইয়াছে। আজকাল কেবলমাত্র সর্দ্দার, জায়গীরদার ছাড়াও অন্য সাধারণ সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেরা এই স্কুলে ভর্তি হইতে পারে। এই স্কুলের ছাত্রেরা কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং আজমীর বোর্ডের পরীক্ষায় বসিতে পারে। ইহা ছাড়া সন্তরণ-বিদ্যা, ঘোড়ায় চড়া, কলাবিদ্যা ইত্যাদি সব আয়োজনই আছে। দুর্গের ওপর স্বাস্থ্য ভালো হওয়ায় এবং ছাত্রদের খেলা ইত্যাদির যথেষ্ট বন্দোবস্ত থাকায় প্রত্যেক ছাত্রই স্বাস্থ্যবান। সিন্ধিয়া স্কুলের শিক্ষক এবং ছাত্রগণ সহরের জনাকীর্ণ কোলাহল হইতে বহুদূরে না হইলেও কিছু উপরে—আপন আপন কার্য্য করিয়া স্কুলটিকে আদর্শ করিয়া গড়িয়া তুলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

গোয়ালিয়র দুর্গের মোটামুটি দ্রষ্টব্যস্থান গুলির কথা কেবলমাত্র এই প্রবন্ধে লিখিত হইল।

শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগির

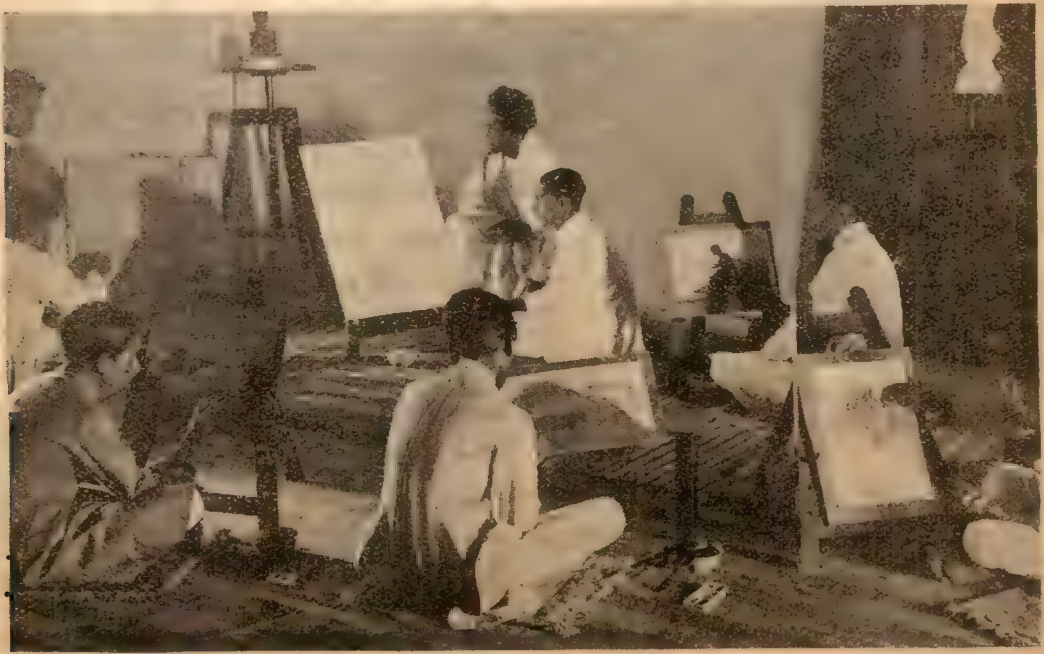

# মধুপর্ক

শ্রীআশীষ গুপ্ত

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

## মায়ার দেশে

এ কাহিনী কামরূপের নয়। রূপকথার রাজপুত্র পথ হারিয়ে প্রায়ই যে যাদুর দেশে গিয়ে পৌঁছোয়। হয়ত সেখানকার রাজপুরীর সিপাহী-শান্ত্রী একশ' বছর ধরে নিদ্রিত,

কোপ্যানের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত মায়া ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন

হয়ত সেই প্রাসাদের রাজকন্যা সোনার কাঠির স্পর্শে জাগবে, এ মায়ার কাহিনী সে দেশের ইতিবৃত্তও নয়।— দক্ষিণ এ্যামেরিকায় মেক্সিকোর দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে ব্রিটিশ হণ্ডিউর‍্যাস অবস্থিত, তথাকার অধিবাসীদের নাম মায়া, অতএব এ মায়া ইংরেজের মায়া।

ব্রিটিশ হণ্ডিউর‍্যাসের আয়তন ৮৫৯৮ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা মাত্র ৪৬,০০০। এর মধ্যে বেশীর ভাগই নিগ্রো। সমস্ত উপনিবেশের মায়াভাষী লোকের সংখ্যা ৭৮০০ এর বেশী নয়। রাজধানীর নাম বেলিজ।

মায়ারা নামে রোম্যান ক্যাথলিক হ'লেও তাদের পিতৃ-পিতামহের দেবতাদের পরিত্যাগ করেনি। তাদের মতে ডিয়স সমস্ত পৃথিবী রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং পর্ব্বত ও উপত্যকার দেবতা হুইৎহক অতিশয় শক্তিশালী। ওরা একদিকে কুমারী মেরী, সাধু এ্যাণ্টনি, সাধু লুই এবং অন্যদিকে শুকতারা, ইন্দ্র, পবন, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ ইত্যাদির সংমিশ্রণে এক চমৎকার জগাখিচুড়ী বানিয়েছে।

মায়ারা প্রধানত কৃষিকার্য্যের উপরেই তাদের জীবিকার জন্য নির্ভর করে। বল্‌তে গেলে কৃষিই একরকম তাদের সব। যে সকল স্থানে তারা তাদের ফসল বোনে সেগুলিকে মিলপা বলে, এর আয়তন নয় দশ বিঘা হ'বে। মিলপা ব্যতীত তাদের প্রত্যেকেরই খানিকটা করে' ভালো জায়গা থাকে কমলা লেবু এবং কোকোর চাষ করবার জন্য; কিন্তু এদের শূকর পালনের অভ্যাসের ফলে এই সব চাষ-বাসের কাজ সেই জীবগুলির কৃপায় প্রায়ই কঠিন হ'য়ে ওঠে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মায়ারা যেসব ফল, শাকসবজী এবং নানাবিধ শস্য উৎপন্ন করে তার পরিমাণ বিস্ময়জনক। এনথকার মেহগ্যানি বিশ্ববিখ্যাত এবং এই মেহগ্যানিই ব্রিটিশ হণ্ডিউর‍্যাসের ক্রমোন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ।

চাষবাসের কাজে মায়ারা দল বেঁধে পরস্পরকে সাহায্য করে' থাকে। গাছ কাট্‌বার আগের দিন রাত্রিতে তারা ক্ষেত্রপতির গৃহে সমবেত হয় এবং মুরগী, শূকর, কোকো

ও মদ ইত্যাদি সহকারে প্রচুর খানাপিনা লাগায়, তার সঙ্গে বেশ কিছু গানবাজনা যে না চলে তাও নয়।

মায়াদের গৃহ, পেরেকের সাহায্যব্যতিরেকে নির্ম্মিত—
ইহার দেওয়ালগুলিকে ছাদের ভার বহন করিতে হয় না

মায়া পুরুষেরা কুড়ি বছর বয়সের আগেই বিবাহ করে, মেয়েদের বিবাহের বয়স সাধারণতঃ ষোলর পূর্ব্বেই। বহু-বিবাহ প্রথা এদের অজ্ঞাত, বিবাহ-বিচ্ছেদও তাই,—কিন্তু পত্নীত্যাগ সুপ্রচলিত। নারীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ বহু স্থলেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু শিশুদের সম্বন্ধে এদের মনোবৃত্তি স্নেহশীল।

কোনও উৎসবের সময় মায়া পুরুষেরা প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করে এবং মত্ত স্বামীদের গৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্ত্রীলোকেরা বাহিরে অপেক্ষা করে' থাকে।

মৃত্যু এবং কবর দেওয়া সংক্রান্ত অনুষ্ঠান এদের অতিশয় সাদাসিধে। মৃতদেহকে এরা যত শীঘ্র মাটি চাপা দিতে পারে ততই যেন এদের শান্তি! অনেক সময় এরা মৃতের জন্য শেষ প্রার্থনাটি অবধি করেনা। মৃত ব্যক্তির জন্য কফিন এরা কদাচিৎ ব্যবহার করে কারণ এদের ধারণা যে তাহ'লে নাকি বিগত প্রাণ ব্যক্তিটিকে স্বর্গ অবধি ওই কফিন বহন করে' নিয়ে যেতে হবে।

কৃষিকার্য্যের পরেই মায়ারা যা ভালবাসে তা হচ্ছে শিকার। এরা আধুনিক বন্দুকের সাহায্যে শূকর, হরিণ, জলহস্তী এবং নানাবিধ পশুপক্ষী শিকার করতে ভালবাসে। কখন কখন তীর ধনুকও ব্যবহৃত হয়। শিকারের পূর্ব্বে হুইজহকের কাছে প্রার্থনা করা হ'য়ে থাকে।

মায়াদের গৃহগুলি এমন ধরণে তৈরী যে এর ছাদের ভার দেয়ালের উপর পড়েনা। এদের বাড়ীতে স্ত্রীলোক অতিথি এলে তারা সাধারণতঃ রন্ধনগৃহে বসে গল্পগুজব করে, পুরুষেরা বৈঠক বসায় শয়ন গৃহে।

মায়াদের প্রধান গ্রামগুলিতে একজন করে' গ্রামাধ্যক্ষ থাকে। প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসে নূতন মণ্ডল নির্ব্বাচিত হয়। বয়োজ্যেষ্ঠরা এদের নাম প্রস্তাব করে এবং সতেরো বছরের অধিক বয়সের পুরুষেরা হাত তুলে তাদের মনোমত ব্যক্তির পক্ষে ভোট দেয়। মণ্ডলমশাইয়ের মাহিনা মাসে চার ডলার, অর্থাৎ প্রায়, সাড়ে দশ টাকা। গ্রামের লোকদের স্বভাব চরিত্র এবং দোষ-ত্রুটির জন্য মণ্ডলই দায়ী। পান্ট্যা গর্ড্যার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যে কাজ করতে আদেশ দেবেন তার জন্য লোক সরবরাহ করবার ভারও এই মণ্ডলের। গ্রামাধ্যক্ষ স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজও করে' থাকে। কোনও বে-আইনী কাজ অথবা অপরাধের জন্য পঁচিশ ডলার অবধি জরিমানা করবার অথবা সাতদিন পর্য্যন্ত

স্বহস্তে সেলাই করা ব্লাউস-পরিহিতা আধুনিক মায়া-নারী

কারাদণ্ডের আদেশ দেবার ক্ষমতা তার আছে। যেসব গুরুতর অপরাধের শাস্তি দেবার অধিকার তার নেই

সে সকল অপরাধের মামলা পাণ্ট্যা গর্ডার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করা হয়। মণ্ডলের কাজে সাহায্য করবার জন্য একজন সহকারী এবং আটজন চৌকিদার আছে। চৌকিদারেরা মাহিনা পায়না, কিন্তু ধৃত অপরাধীর শাস্তি বিধান হ'লে, প্রতি অপরাধীর জন্য পঁচিশ সেণ্ট পুরস্কার পেয়ে থাকে।

## "ডে হুয়ে বিন্ সে আ"

চীনদেশে কানে টেলিফোন তুলে ধরলেই খুব মিষ্টি সুরে এই অদ্ভুত কথা শোনা যায়। এর মানে "নাম্বার প্লিজ"। চীনা মেয়ে "অপারেটর" সবারই নাম আর টেলিফোন নম্বর মুখস্ত করে রাখে। অন্যান্য দেশে নম্বর ডেকে টেলিফোনে যোগাযোগ ঘটে কিন্তু চীনদেশের রীতি সেখানে নাম ধরে ডাকতে হয়। কাজেই টেলিফোন আফিসে চাকরী নিতে হলে প্রথম কাজ হচ্ছে সহরের সমস্ত লোকের নাম আর টেলিফোন নম্বর কণ্ঠস্থ করা।

জাপানে কিন্তু আমাদের দেশের মত নম্বর ধরেই ডাকা হয়। কিন্তু এই টেলিফোনের নম্বরগুলি সেখানে বিশেষ গুরুতর একটা জিনিষ। জাপানীদের ধারণা যে কতকগুলি নম্বর শুভ ও কতকগুলি অশুভ। তাই সেখানে টেলিফোনের নম্বর রীতিমত বেচাকেনা হয়। নম্বর বিক্রী করবার দালালের কাছে গেলেই নূতন নম্বর কিনতে বা নিজেরটি বিক্রী করতে পাওয়া যায়। ৪২ নম্বরটি জাপানীদের মতে ভয়ানক অশুভ, কারণ এর গূঢ় অর্থ না কি মৃত্যু। ৪৯ সংখ্যাটিও ভালো নয়। যে নম্বরগুলি অশুভ বলে কেউ নিতে চায়না, সেগুলিকে পুলিশ-থানার নম্বর করে দেওয়া হয়—ভাবটা বোধহয় এই যে পুলিশদের আবার শুভাশুভ কি? যে নম্বরগুলি শুভ বলে সকলে মনে করে, সেগুলির বেশ দাম ওঠে, এমন কি এক একটার হাজার টাকা পর্য্যন্ত দাম পাওয়া যায়।

সকলের চেয়ে শুভ নম্বর ৮ আর তারপরই ৩৫৭।

## খবর কানে হাঁটে

ছোট্ট একটি গলির মোড়ে ঝরঝরে একখানি মোটর গাড়ীর ড্রাইভারের হাতে আচম্কা অত্যন্ত জোরে ভেঁপু বেজে উঠতেই, জীর্ণ একটি ঠিকা-গাড়ীর ততোধিক শীর্ণ ঘোড়াটি চমক্ খেয়ে ভড়্‌কে গিয়ে লাফিয়ে ওঠার ফলে তার পায়ে লেগে এক টুকরো পাথর ছিট্‌কে গিয়ে পাশের দোকানের সার্সি ভেঙ্গে ফেললে। ঝন্ ঝন্ করে শব্দ হতেই পথচারী একটা ছেলে এগিয়ে ব্যাপারখানা দেখবার চেষ্টা করতেই এক টুকরো কাচ পড়ে তার নাকটা কেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বহুলোক জুটে হট্টগোল করে এ্যাম্বুলেন্স ডেকে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল হাঁসপাতালে আর পরদিনই খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে খবর বার হল—"ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা; কাচের টুকরায় পথিক বালক জখম; এ্যাম্বুলেন্স যোগে প্রাণরক্ষা।" সম্পাদক তীব্র মন্তব্য করলেন যে দিন দিন মোটর চালকদের শৈথিল্য ও অসাবধানতা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, এ বিষয়ে পুলিশের দৃষ্টিপাত করা একান্ত বাঞ্ছনীয় আর প্রত্যেক মোটর গাড়ীতে সেফ্‌টি কাচ লাগান অত্যন্ত আবশ্যক।

## নাক—ইন্‌সিওর

সেখ জালাল কোয়ারাইসি (Sheik Jelal Quaraishi) নামে জনৈক আরববাসী একটি বিলাতী কোম্পানীতে ত্রিশ হাজার টাকায় তাঁর নাকটি ইন্‌সিওর করেছেন। সেখ সাহেবের ব্যবসা দুষ্পাপ্য সুগন্ধি সংগ্রহ করা। তাঁর ঘ্রাণশক্তি এতই অদ্ভুত যে তিনি একবার মাত্র আঘ্রাণ নিয়ে বলে দিতে পারেন কোন্ সুগন্ধি কোন্ ফুলের নির্য্যাসে প্রস্তুত হয়েছে ও সেই নির্য্যাসে কি কি ফুল মিশ্রিত করা হয়েছে। দেশবিদেশে ভ্রমণ করে তিনি বহুশত সুগন্ধি সংগ্রহ করেছেন। সকলের চেয়ে দুষ্পাপ্য সুগন্ধিটি সংগ্রহ করা হয়েছে টুটেন্ খামেনের সমাধি থেকে; সেটি প্রায় চার হাজার বছরের পুরাণ।

## মানুষের চামড়া

মানুষের চামড়ায় যে বই বাঁধান হতে পারে, একথা সহজে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। কিন্তু সম্প্রতি সত্যই নরচর্ম্মে একটি বই বাঁধান হয়েছে। বইটির রচয়িতা বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত ক্যামিল্লা ফ্ল্যামারিয়ন

(Camilla Flammarion)। বইখানি এখন আছে ফরাসী জাতীয় গ্রন্থাগারে ও সেটি বাঁধান হয়েছে পণ্ডিতের গুণমুগ্ধা একটি রমণীর দেহচর্ম্মে।

## কুকুরের হোটেল

কুকুরের হোটেল কেউ কোনদিন দেখেনি, কোথাও আছে বলে এতদিন শোনাও যায়নি। কিন্তু দিন কয়েক হল প্যারিস্ নগরীতে কুকুরদের জন্য একটি রেস্তরাঁ খোলা হয়েছে। খাবার পাওয়া যায়, সুপ, বিস্কুট, মাংসের পুডিং, গাজর, বীন, ভাত ও মিষ্টি। যে কুকুর মাংস খেতে চায় না তার জন্য নিরামিষ খাবারও পাওয়া যায়। সুপের দাম দিতে হয় না আর অন্যান্য খাবারের দাম অবশ্য দিতে হয় কুকুরের মালিককে।

## চাঁদের ধাঁধা

চারিদিক আলো করে সন্ধ্যাবেলা যখন চাঁদ ওঠে তখন তাকে দেখে মনে হয় ক-ত বড়। আবার যখন সেই চাঁদ ঠিক মাথার ওপরে আসে, তখন মনে হয় যেন আকারে অনেকখানি ছোট হয়ে গিয়েছে। আসলে কিন্তু ব্যাপারখানা

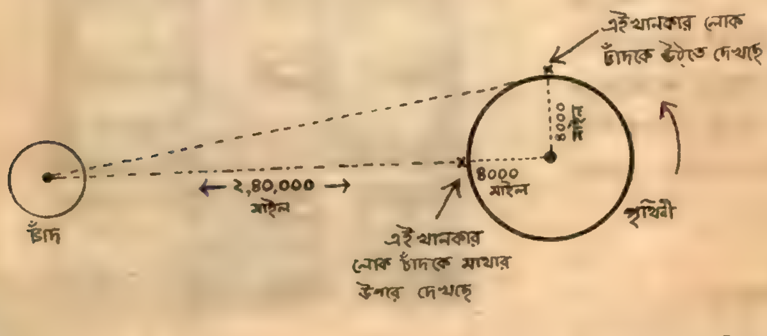


ঠিক উল্টো। চাঁদ যখন ওঠে তখনই আমরা তাকে দেখি ২ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল দূরে আর মাথার ওপরে এলেই সেই চাঁদ ৪০০০ মাইল কাছে চলে আসে; সুতরাং তখন তার আকার ১/৬০ বড় হওয়া উচিৎ। এ ধাঁধার মানে আর কিছুই নয়, এটি আমাদের চোখের ধাঁধা। পাশের ছবিখানিতে ক থেকে খ পর্য্যন্ত বেশী দূর, না খ থেকে গ পর্য্যন্ত? হঠাৎ দেখে মনে হবে যে ক থেকে খ পর্য্যন্তই বেশী। কিন্তু মাপ্‌লে দুটোই ঠিক সমান দেখতে পাওয়া যাবে। ক আর খ'র মাঝে অনেকগুলি বিন্দু আছে বলে মনে হচ্ছে এটি বেশী লম্বা। চাঁদের বেলাও ঠিক তাই। চাঁদ যখন সবে ওঠে তখন তাকে আমরা দেখতে পাই গাছের ফাঁকে, বাড়ীর ছাদের ওপরে, পাহাড়ের চূড়ার আড়ালে; আর যখন মাথার ওপরে আসে তখন তাকে দেখি একেবারে ফাঁকা শূন্যের মাঝখানে। ফুট খানেক লম্বা সরু একটা কাগজের নল পাকিয়ে তার ভেতর দিয়ে উদীয়মান চাঁদটি দেখলেই এ ধাঁধা ধরা পড়ে যাবে। গাছপালা বা ঘর-বাড়ী তখন আর চোখে পড়বে না; মাথার ওপরে চাঁদকে যত বড় দেখায়, উঠবার সময়ও তখন তেমনই দেখাবে।

## ধূলিহীন আবর্জ্জনা

আজকালকার দিনে আমরা চতুর্দ্দিকে ধূলা ও কোলাহলের অনিষ্টকারিতার কথা শুন্‌তে পাই, অতএব ধূলিবিহীনভাবে এবং নিঃশব্দে রাস্তার আবর্জ্জনা অপসারিত কর্‌বার কোনও নব আবিষ্কৃত উপায় সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল স্বাভাবিক। এই পন্থা সর্ব্বত্র অনুসৃত হ'লে আর পথের পাশে পাশে ডাষ্টবিনের প্রয়োজন হ'বে না, প্রয়োজন হ'বে না তার সুগন্ধের, তার মশামাছির—শত ব্যাধির লক্ষ বীজাণু যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়্‌বে তার আর উপায় থাক্‌বে না।

মোটের উপর জিনিষটা এই। দুটি মালবহনোপযোগী মোটর গাড়ীর একটির উপরে ৭৫ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট মোটর

স্থাপিত করা হয়,—এই মোটরের সঙ্গে ভ্যাক্যিউয়াম প্রডিউসার যন্ত্রের যোগ আছে।

অপর মোটর গাড়ীখানাতে বড় এক ইস্পাতনির্ম্মিত আধার থাকে, তারই মধ্যে আবর্জ্জনা আকর্ষণ করে' নেওয়া হয়। গৃহের নিম্নতল থেকে দীর্ঘ নলের ভিতর দিয়ে শোষণ-যন্ত্রের সাহায্যে লোকচক্ষুর অগোচরে নির্ব্বিবাদে এই কার্য্য সাধিত হয়। সম্মুখের গাড়ীখানা যখন জঞ্জালে পূর্ণ হ'য়ে যায় তখন সেটাকে আবর্জ্জনা ফেল্‌বার জায়গায় চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং আর

আবর্জ্জনা অপসারণে ব্যবহৃত মোটর গাড়ী

একখানি গাড়ী তার স্থান অধিকার করে। অতএব সময়ের বিন্দুমাত্র অপব্যয় হয়না, এমনি করেই সহরের জঞ্জাল সংগৃহীত হ'তে থাকে। যেসব জায়গায় এইরূপে আবর্জ্জনা অপসারণের স্থায়ী প্রয়োজন অনুভূত হ'বে, সেখানে জঞ্জালের খাত থেকে রাস্তা অবধি কায়েমীভাবে নল সংযুক্ত করে' রাখা যেতে পারে, তাতে সুবিধে হ'বে এই যে সহরের আবর্জ্জনা এই গাড়ীর সাহায্যে দ্রুততর গতিতে দূরীভূত হ'তে পার্‌বে।

## অষ্টপ্রহরব্যাপী বাজার

"ডেলামাট" নামে এ্যামেরিকায় একরকম স্বনিয়ন্ত্রিত দোকানের উদ্ভব হ'য়েছে,—এখানে মাংস এবং মুদিখানার যাবতীয় সামগ্রী কিন্‌তে পাওয়া যায়। পয়সা না দিলে যে সব পাত্রের ভিতর হ'তে জিনিষ বেরোয় না তেম্‌নিতর পাত্র হ'তে শীতল অথবা স্বাভাবিক উত্তাপযুক্ত খাবার সরবরাহ করা হয়। দিনের বেলা একটি মেয়ে এসে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন

মেয়েটি রিফ্রিজারেটেড ইউনিট হইতে মাংস কিনিতেছে। মুহূর্ত্তের মধ্যেই গোলাকার শিকলের সাহায্যে টাটকা মাংসখণ্ড নামিয়া আসিয়া শূন্য স্থান পূর্ণ করিবে।

করে' দিয়ে যায় এবং কলগুলিতে যথারীতি দ্রব্যসামগ্রী আছে কিনা তার তত্ত্বাবধান করে। অবশ্য সে যাবার সময়ে যন্ত্রের অন্তর্গত অর্থাধারগুলির ভিতর হ'তে সঞ্চিত অর্থ নিয়ে যেতে

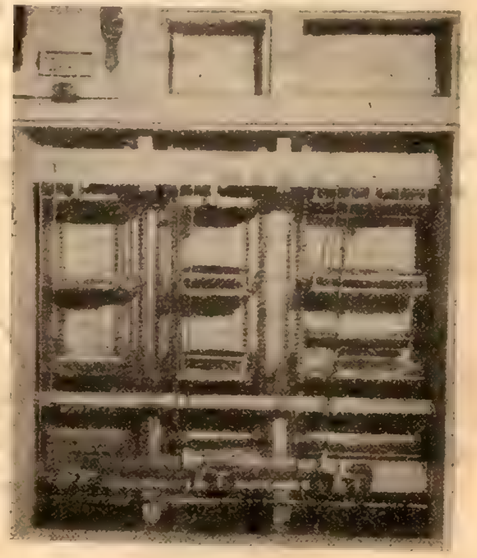

স্বনিয়ন্ত্রিত দোকানের অভ্যন্তর
চেন, সামগ্রীবহনকারী ট্রে এবং ক্লাচগুলি দেখা যাইতেছে।

ভোলে না,—এবং এই কলগুলি মানুষের সাহায্য ব্যতীতই পরদিন পর্য্যন্ত চল্‌তে থাকে।

এই যন্ত্র দু'প্রকারে নির্ম্মিত হয়। প্রথম শ্রেণী জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক রিফ্রিজারেটারের পদ্ধতিতে এবং দ্বিতীয় শ্রেণী, যাতে তাদের ভিতরকার দ্রব্যসামগ্রী গৃহের উত্তাপেই নাড়াচাড়া করতে পারা যায় সেই উপায়ে।

মিঃ হার্ভে তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রের কৌশল বুঝাইয়া দিতেছেন। সমস্ত জিনিষগুলিই বাহির হইতে দেখা যায় বলিয়া, বিজ্ঞাপনের দিক হইতেও এই যন্ত্রের মূল্য অপরিমেয়।

ক্রীত জিনিষের মূল্য যখন প্রদত্ত অর্থের চেয়ে কম হয়, তখন এই যন্ত্রগুলি ঠিক মানুষের মতই হিসাব করে' প্রাপ্য পয়সা ফেরত দেয়। জিনিষপত্রগুলি উত্তমরূপে প্রদর্শিত হয়, এবং ছিদ্রপথে মূল্য প্রদান করবার পর একটা হাতল ঘুরিয়ে দিলেই ক্রীত সামগ্রী ক্রেতার হাতে চলে' আসে। তৎক্ষণাৎ গোলাকার শৃঙ্খলসংযুক্ত বাক্সকোষের উপরে পুনরায় নূতন সামগ্রী এসে উপস্থিত হয়। একটি ক্ষুদ্র মোটরের সাহায্যে সমস্ত যন্ত্রটি পরিচালিত হ'য়ে থাকে।

## টোরাক বিজলী শলাকা

বজ্র এবং বিদ্যুতের অত্যাচার হ'তে বিজলীবাতির তারগুলোকে রক্ষা করা এক বিরাট ব্যাপার। প্রত্যেকবার বজ্রপাতের পরেই সেগুলোর পরীক্ষা কার্য্য এবং তাদের ইন্‌সুলেশনগুলোর পরিবর্ত্তন আবশ্যক এবং যে স্থলে ফিউজ ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে সেখানে নূতন ফিউজ সংযুক্ত করা প্রয়োজন। কিন্তু এসব করতে বহু লোকের নিরবসর সতর্ক দৃষ্টির এবং বহু অর্থের আবশ্যক,—অথচ এর সমস্তটাই অপব্যয়, বজ্র এবং বিদ্যুতের প্রতি-বাৎসরিক ধ্বংসকার্য্যের ফল। নবউদ্ভাবিত বিজলী শলাকার সাহায্যে এই অপচয় হ'তে আমরা অব্যাহতি পাব। এর গঠনপ্রণালী সরল। মেয়েদের ছাতার ন্যায় দীর্ঘ একটি নল নেওয়া হয়, তার দুই প্রান্তে একখণ্ড করে' ধাতু সংযুক্ত থাকে, এরাই ক্যাথোড্ এবং অ্যানোডের কাজ করে এবং লোভ দেখিয়ে বিদ্যুৎকুমারীকে নলের মধ্য দিয়ে নিয়ে যায়। এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ এত দ্রুত-গতিতে পরিবাহিত হয় যে গৃহের বিজলীবাতির দীপ্তিও নাকি ক্ষীণতম মাত্রাতে কাঁপে না।

কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত বজ্র টোরাক বিজলী শলাকার উপরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর দ্রুতগতিতে টোরাকের মধ্য দিয়া পরিবাহিত হইতেছে।

ওয়েষ্টিংহাউসে এই বিজলীশলাকা নিয়ে যে পরীক্ষাকার্য্য চলেছিল তাতে এর মধ্য দিয়ে ১৩২,০০০,০০০ ভোল্ট,

এ্যাম্পিয়ার্‌স্ বিজলী ব্যবহার করা হয়েছিল! মনে হয়েছিল যেন বিজলী-শলাকার উভয় প্রান্তে আগুন ধরে' গিয়েছে এবং ছ'ইঞ্চি কামানের থেকে গোলা নিক্ষিপ্ত হ'লে যে রকম শব্দ শুনতে পাওয়া যায় তেম্‌নিতর শোনা গিয়েছিল! সমস্ত ব্যাপারটা ঘট্‌তে কিন্তু ১/৫০০ সেকেণ্ডের অধিক সময় লাগেনি। এঞ্জিনিয়াররা এবং এর উদ্ভাবক টোরাক সাহেব বল্‌ছেন যে এই বিজলী-শলাকাকে যদি সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকরী করে' তুল্‌তে পারা যায়, তাহ'লে প্রতি বৎসর পৃথিবীর কোটি কোটি টাকা বেঁচে যাবে।

## লজিক

খোকা—মা, ভোঁদার সঙ্গে খেলা করব?

মা—না, ভোঁদা বড় দুষ্টু ছেলে।

খোকা—(একটু পরে) ওর সঙ্গে মারামারি করব তবে?

## যুক্তি

এই ঘড়িটার দাম কত?

পনেরো টাকা।

এই ছোটটার?

পঁচিশ টাকা।

আর এই ছোটটার?

পঞ্চান্ন টাকা।

সর্ব্বনাশ! আর যদি ঘড়ি না-ই কিনি তা'হলে কত লাগ্‌বে?

## সিংহ বশ করার সহজ উপায়

বিখ্যাত সিংহবশকারী ভ্যান এ্যামবুর্গকে একদিন এক হোটেলে জিজ্ঞাসা করা হ'য়েছিল, যে পশুদের উপর তাঁর অত্যাশ্চর্য্য প্রভাবের কারণ কি। তাতে তিনি বল্‌লেন, "প্রথমতঃ আমি সবসময়েই তাদের একথা বুঝিয়ে দিই যে তাদের সম্বন্ধে আমার একটুও ভয় নেই, দ্বিতীয়তঃ আমি আমার চোখের দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্যও জীবজন্তুর উপর থেকে অপসারিত করিনা। আমার দৃষ্টির ক্ষমতার পরিচয় আমি এখনই আপনাদের দিচ্ছি—" বলে' নিকটবর্ত্তী এক চাষাড়ে চেহারার লোকের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে' তিনি বল্‌লেন, "আপনারা ওই লোকটাকে, দেখ্‌ছেন,—যেন একটি ভাঁড়! ওকে উদ্দেশ করে' একটি কথাও না বলে' আমি লোকটাকে এদিকে নিয়ে আস্‌ব—" এই কথা বলে', আসন গ্রহণ করে', এ্যাম্‌বুর্গ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে পিঠ সোজা করে' সে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল এবং ঘরের ওদিক থেকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'য়ে এপাশে ভ্যান্ এম্‌বুর্গের নিকটে এসে উপস্থিত হ'ল।

এ্যাম্‌বুর্গের মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটে উঠ্‌বার আগেই নিদারুণ দুর্ঘটনার ফুৎকারে তা নিমেষ মধ্যে মিলিয়ে গেল! সম্মুখে এসে লোকটা তাঁর মুখে এক বিরাট মুষ্ট্যাঘাত কর্‌ল, দৃষ্টিশক্তির সম্মোহন ক্ষমতার সকল গর্ব্ব নিয়ে এ্যাম্‌বুর্গ ভূতলশায়ী হ'লেন। লোকটা চীৎকার করতে লাগ্‌ল, "আর আমারদিকে অমন কটমট করে' তাকাবি? তাকাবি আর—?"

## শিশুপ্রীতি

গৌরমোহনবাবু মস্তিষ্কবিদ্যা বেশ ভালো করেই আয়ত্ত করেছেন, অর্থাৎ মাথার গঠন দেখে তিনি নির্ভুলভাবে মানুষের প্রকৃতি বলে' দিতে পারেন। পদ্মলোচনবাবুর মাথার পিছনের দক্ষিণদিকের স্ফীত অংশের দিকে চেয়ে গৌরমোহনবাবু বল্‌লেন, "ওই যে মাথার ফোলা জায়গাটা, ওতে শিশুপ্রীতি প্রকাশ করে—"

পদ্মলোচনবাবু কাতর! তাঁর চোখে জল! তিনি বল্‌লেন, "বলুন বলুন আপনার বিজ্ঞানে যা বলে তাই বলুন! ওইখানটাতেই ছোঁড়াগুলো কাল ঢিল ছুড়ে মেরেছিল বটে!"

## তারা এত ঘামেনি

একজন বিখ্যাত পিয়ানোবাদক একবার তুরস্কের সুলতানের সম্মুখে কয়েকখানি অপূর্ব্ব গৎ বাজিয়েছিলেন! যতক্ষণ বাজনা চলছিল ততক্ষণ সুলতানের চোখেমুখে যে তাঁ

ফুটে উঠেছিল, তা যে প্রশংসার এবং বিমুগ্ধতার সে বিষয়ে বাদকের মনে সন্দেহ ছিলনা। বাজনার শেষে সুলতান বল্লেন, "আমি অ্যালবার্গের বাজনা শুনেছি—"

শিল্পী মাথা নুইয়ে সুলতানকে অভিবাদন করলেন এবং বিনয়ের হাসি হাসলেন।

"আমি লিস্তের বাজনা শুনেছি—"

শিল্পীর মাথা অভিবাদনের উৎসাহে আরও নুয়ে পড়ল এবং মনোযোগ খরতর হ'ল।

"কিন্তু আজ পর্য্যন্ত যারা আমার সম্মুখে বাজনা বাজিয়েছে, তাদের মধ্যে একজনও আপনার মত ঘামেনি!"

## সমাধান

ট্রেনের এক কামরায় বসে' দু'জন ভদ্রমহিলার জানালা নিয়ে কলহ বাঁধে। একজন জানালা বন্ধ করবার এবং অন্যে সেটা খুলে রাখবার পক্ষপাতী। তাদের ঝগড়া মিটাবার জন্য অবশেষে গার্ডকে ডাকা হ'ল। প্রথমা বল্ল, 'জানলা যদি বন্ধ থাকে আমি দমবন্ধ হ'য়ে মরব—"

দ্বিতীয়া বল্ল, "জানলা যদি খোলা থাকে তাহ'লে ঠাণ্ডাতেই আমার হ'য়ে যাবে!"

গার্ড ত ফাঁপরে পড়্লেন।

দুইজন উত্তেজিত ব্যক্তির মধ্যবর্ত্তী আসন অধিকার করে যে নিরীহ চেহারার লোকটি এতক্ষণ অবধি নিঃশব্দে বসেছিলেন, তিনি বললেন, "মশাই শুনছেন, প্রথমে জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে ১ নম্বরকে দমবন্ধ করে' মারুন, তারপর খুলে দিয়ে ২ নম্বরকে ঠাণ্ডা লাগিয়ে শেষ করুন, তবেই আমরা শান্তি পাব!"

## ভূমিকম্পবিধ্বস্ত কলিকাতা!

হয় নাই, কিন্তু গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখের ভূমিকম্প আর একটু গুরুতর হইয়া কলিকাতায় দেখা দিলে এমনটিই হইতে পারিত। ছবিটি কল্পনাপ্রসূত নহে—কলিকাতার কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটেরই একটি স্থান।

শুধু ভূমিকম্পে বিপদ নয়, কলিকাতার রাস্তায় চলিয়া বেড়ানো যে অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ারই সামিল, উপরের ছবিখানা মনোযোগ দিয়া দেখিলেই সে কথাও বুঝা যাইবে। ডানদিকের ফুটপাথের প্রান্তসীমায় দণ্ডায়মান উড়িয়া ঠাকুরটির বড় রাস্তা মহাসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবার পূর্ব্বে কত শঙ্কা, কত দ্বিধা; এবং যিনি একবার অকূলে ভাসিয়াছেন তীরে পৌঁছিবার জন্য তাঁহার যে কি অপরিসীম ব্যাকুলতা সে কথা বুঝিতে হইলে দ্রুতধাবমান পথমধ্যবর্ত্তী লোকটির পদদ্বয়ের মাঝখানের ব্যবধানের প্রতি একবার চাহিয়া দেখুন! অবশেষে কূলে যখন তরী নিরাপদে ভিড়িল তখনকার শান্তি এবং নিশ্চিন্ততা বামদিকের লোকটির চরণের নৃত্য-দোদুল ভঙ্গীতেই সুপ্রকাশ।

আলোক চিত্র—শ্রীতারকপদ কীর্ত্তি

শ্রীআশীষ গুপ্ত ও শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

# খেলাধূলা

সি, জে

## অষ্ট্রেলিয়া-ইংলণ্ডের চতুর্থ 'টেষ্ট'

২০শে জুলাই হ'তে লিড্‌সে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেষ্ট খেলা আরম্ভ হয়। 'টস' করিয়া ইংলণ্ড প্রথম খেলার অধিকার পাইল এবং প্রায় সমস্ত দিন ধরিয়াই "ব্যাট্" করিল—কিন্তু গ্রিমেট ও রিলার "বোলিঙে" বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। সকলে মিলে মাত্র ২০০ শত 'রান' করিতে সক্ষম হয়। ইংলণ্ডের খেলার পর অষ্ট্রেলিয়া 'ব্যাট্' করিতে নামিয়া প্রথম দিনে মোটেই সুবিধা করিতে পারে নাই—তিন জন 'আউট্' হইয়া মাত্র ৩৯ 'রান' করে। কিন্তু দ্বিতীয় দিন পন্‌স্‌ফোর্ড ও ব্র্যাডম্যান দুজনে খেলিয়া 'রানের' সংখ্যা ৩৯ হইতে ৪২৭ পর্য্যন্ত তোলে; ইঁহারা দুজনে মোট ৩৮৮ 'রান' করে। ইহার পূর্ব্বে আজ পর্য্যন্ত কোন টেষ্ট খেলার (দুজনে মিলিত 'রান') এর চেয়ে বেশী হয় নাই; এইটাই হচ্ছে টেষ্ট খেলার যে কোন উইকিটের 'পার্টনারসিপে'র রেকর্ড 'রান'। পন্‌স্‌ফোর্ড ১৮১ 'রান' করিয়া 'আউট' হইয়াছিলেন, ব্র্যাডম্যান ২৭১ 'রান' করিয়াও 'নট-আউট' থাকেন—তৃতীয় দিনে ব্র্যাডম্যান ৩০৪ 'রান' করিয়া 'আউট' হইয়াছিলেন। অষ্ট্রেলিয়ার 'রান'-সংখ্যা হইল মোট ৫৮৪। প্রথম 'ইনিংসে' ইংলণ্ড অপেক্ষা অষ্ট্রেলিয়া ৩৮৪ 'রান' বেশী করে। যথেষ্ট সময় থাকায় সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে চতুর্থ টেষ্ট অষ্ট্রেলিয়া অতি সহজেই জিতিবে। চতুর্থ দিবস যখন ২২৯ 'রানে'ই ইংলণ্ডের ভাল ছয় জন ব্যাট্‌স্‌ম্যান 'আউট' হইয়া গেল তখন ইংলণ্ড 'ইনিংসে' হারে কিনা সেইটাই ভাবনার কথা ছিল। ইংলণ্ডের হার যখন সুনিশ্চিত তখন বৃষ্টি এসে ইংলণ্ডকে বাঁচিয়ে দিল; এমন বৃষ্টিই আরম্ভ হল যে মাঠ ডুবে গেল খেলা আর সম্ভব হল না—কাজেই খেলা 'ড্র' হল; ইংলণ্ডও নিশ্চিত পরাজয় হইতে রক্ষা পাইল। কেবলমাত্র বৃষ্টি এ যাত্রায় ইংলণ্ডকে বাঁচাইয়া দিল—অষ্ট্রেলিয়ার নিতান্ত দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। প্রথম 'টেষ্টে' অষ্ট্রেলিয়া জিতিয়াছিল, দ্বিতীয় 'টেষ্টে' ইংলণ্ড, এবং তৃতীয় চতুর্থ 'টেষ্টে' 'ড্র' হয়েছে—কাজেই পঞ্চম 'টেষ্ট' যত দিনই হোক না কেন শেষ পর্য্যন্ত খেলিয়া একটা মীমাংসায় আনিতে হইবে। 'ওভালে' ১৮ই আগষ্ট হইতে ৫ম 'টেষ্ট' আরম্ভ হইবে। এই 'টেষ্টে' যে দল জয়লাভ করিবে, সেই দলই 'অ্যাসেস' পাবে—কাজেই এই খেলার ফলাফলের জন্য সকলেই বিশেষ আগ্রহে প্রতিক্ষায় থাকিবে।

ব্র্যাডম্যান্
(অষ্ট্রেলিয়া)

## ফুটবল

এ বৎসর কলিকাতার ফুটবল খেলার ইতিহাসে দুটি অভিনব ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে—প্রথমটি মহমেডান স্পোর্টিং দলের লিগ্ খেলার শীর্ষস্থান অধিকার কারণ ভারতীয় দলের ইহাই প্রথম লিগ-বিজয়। দ্বিতীয়টি আই, এফ, এ, সিল্ডের ফাইনাল খেলা বন্ধ হওয়া। এ বৎসর ডারহাম ও কে-আর-আর এই দুইটি স্থানীয় সেনাদল আই, এফ, এর 'ফাইনালে' উঠিয়াছিল—৩০শে জুলাই কলিকাতার মাঠে 'ফাইনাল' খেলা হইয়াছিল। রেফারি এ্যাসোসিয়সনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ পি, গুপ্ত সেদিনকার খেলার রেফারি ছিলেন। খেলার প্রথমেই ডারহাম একটি 'গোল' দেয়, কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধ খেলা শেষ হওয়ার ৭।৮ মিনিট পূর্ব্বে কে, আর, আর, গোলটি পরিশোধ করে এবং এর দুই মিনিট পরেই তাহারা আরও

একটি গোল দেয়। ডারহামের পরাজয় তখন সুনিশ্চিত, সেই সময় শেষ মূহুর্ত্তে ডারহাম একটি 'ফ্রি কিক্' হইতে 'গোল' পরিশোধ করায় খেলাটা অমীমাংসিত থাকে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে ২৫ মিনিটের বেশী খেলান হইয়াছিল। এবং ডারহাম তাহাদের 'গোল'টি সেই অতিরিক্ত সময়ে দেয়। রেফারী স্বীকার করেন যে খেলার মাঝে সময় অযথারূপে নষ্ট হওয়ায় ৬৪ সেকেণ্ড বেশী খেলান হইয়াছে। কিন্তু কে, আর, আর, বলে যে দু' মিনিটের বেশী খেলান হইয়াছে

কিঙ্স্ রয়াল রাইফল্‌স্

১৯৩৩ সালের রানার্স অপ্ ১৯৩৪ সালের ফাইনালিষ্ট

এবং সেই অতিরিক্ত সময়ে ডারহাম 'গোল' দিয়াছে। ইহার জন্য কে, আর, আর প্রটেষ্ট (protest) করে; কিন্তু তাহাদের সে 'প্রটেষ্ট' গ্রাহ্য হয় নাই, এবং কে, আর, আর-এর আপত্তি সত্ত্বেও মিঃ পি গুপ্তকেই শেষের দিনও সেই খেলার রেফারি নিযুক্ত করা হয়। পরের দিন অর্থাৎ ৩১শে জুলাই পুনরায় খেলা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেদিন দুপুরেই খবর বাহির হইল যে 'ফাইনাল' খেলা হইবে না কারণ ডারহাম ও কে আর আর দুটি দলই 'শিল্ডে'র প্রতিযোগিতা হইতে বিরত হইয়াছে। রেফারীর বিরুদ্ধে অনুযোগ ছাড়াও দুটি দলের কর্ত্তারা পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে এই খেলার জন্য দুটি দলের পরস্পরের প্রতি যে প্রকার মনোভাব দাঁড়াইয়াছে তাহাতে তাদেরকে পুনরায় খেলিতে দিলে একটা গোলযোগ বা অশান্তির সৃষ্টি হওয়ায় সম্ভাবনা এবং তাহার ফলে দুটি regiment-এর মধ্য ভাব নষ্ট হইতে পারে, এমন অবস্থায় খেলা হইতে বিরত হওয়াই তাঁহারা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। আই এফ এ ভারতের শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগীতা—তার 'ফাইনাল' এই ভাবে বন্ধ হওয়া সত্যই দুঃখের ও লজ্জার কথা। সামান্য একটা কারণ বা ওজুহাতে 'ফাইনালে' পুনরায় খেলিতে অস্বীকৃত হওয়াটাও কোনো দলের পক্ষেই ন্যায়সঙ্গত কাজ হয় নাই; Sporting Spirit বলাই চলে না।

এবার কিন্তু খেলায় এক মহমডান স্পোর্টিং ভিন্ন আর কোনও ভারতীয় দল 'সিল্ডে'র থার্ড রাউণ্ডে যেতে পারে নাই বা কোনও ইউরোপীয় বা মিলিটারী টিম্ হারাইতে পারে নাই এটা—ভারতীয় দলের পক্ষে গৌরবের কথা নয়। অবশ্য 'সিল্ডে'র অধিকাংশ খেলাই জল-কাদার মধ্যে হওয়ায় দেশীয় দল তেমন সুবিধা করিতে পারে নাই; এমন কি ক্যামেরোনিয়ান বা সরপ্ সায়ারের মত ভাল ভাল মিলিটারী টিমকেও যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে এবং হারও স্বীকার করিতে হইয়াছে। 'সিল্ড' খেলাটা আরও কিছুদিন পূর্ব্বে অর্থাৎ লিগ খেলার প্রথম অর্দ্ধেক শেষ হওয়ায় পরই আরম্ভ করিলে টিমদের জল-কাদায় এ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না—এবং ভাল ভাল টিমগুলির খেলাও আরও অনেক ভাল হইতে পারে। জুন মাসে 'সিল্ড' খেলা আরম্ভ করায় আপত্তি কি তা আই, এফ এ-র কমিটিই জানে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যে ভারতীয় টিম আই, এফ, এ পাঠাইয়াছিল তাহাদের ১৩ই আগষ্ট কলিকাতায় পৌঁছিবার

কথা। সেখানে একটি ভিন্ন সমস্ত খেলাতেই তাহারা জয়লাভ করিয়াছে। সেখানে তিনটী 'টেষ্ট' ম্যাচ্ খেলারও ব্যবস্থা হইয়াছিল—এ তিনটি খেলাতেই ভারতীয় টিম জয়লাভ করিয়াছে ইহা সত্যই আনন্দের কথা। দক্ষিণ আফ্রিকায় টিম যাওয়ায় এখানে সব চেয়ে বেশী ক্ষতি হইয়াছে এরিয়ানের। এরিয়ানের তিনটি ভাল খেলোয়াড় এস্ মজুমদার, এস চক্রবর্ত্তী এবং এ গাঙ্গুলী ভারতীয় টিমের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলিয়া যাওয়ায় এবারে লিগ্ খেলায় এরিয়ান মোটেই সুবিধা করিতে পারে নাই এবং উহারা লিগ্ খেলায় মাত্র ১২ পয়েন্ট পাইয়া নিম্নতম স্থান অধিকার করিয়াছে। আগামী বৎসর তাহাদিগকে সেকেণ্ড ডিভিসনে খেলিতে হইবে। লিগের ওঠা নামা বন্ধ হইবে কিনা সে সম্বন্ধে স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত নিজেদের ভাল ভাল খেলোয়াড়কে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইতে দেওয়া এরিয়ান টিমের কর্ত্তাদের বুদ্ধিমানের কার্য্য হয় নাই।

ডারহাম্স্ লাইট্ ইন্ফ্যান্ট্রি

১৯৩১ সালের রানার্স অপ্ ১৯৩৪ সালের ফাইনালিষ্ট্

সেকেণ্ড ডিভিসন লিগ খেলায় স্পোর্টিং ইউনিয়ান ও ও ই, বি, রেলওয়ে দু'দলই লিগ জয়ী হইবার চেষ্টা করে। শেষ পর্য্যন্ত দুই টিমেরই সমান পয়েন্ট হওয়ায় তাদের পুনরায় খেলিতে হইয়াছিল—এ খেলায় স্পোর্টিং ইউনিয়ান যদিও অনেক ভাল খেলিয়াছিল—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তিন গোলে হার স্বীকার করিতে হইয়াছিল—আগামী বৎসর হইতে ই, বি, রেলওয়ে প্রথম ডিভিসন লিগে খেলিবে।

ট্রেড্স্ কাপ 'ফাইনাল' খেলায় পুলিস সেণ্ট জোসেফকে ৩-১ গোলে পরাজিত করিয়াছে।—

রেফারিং—এবারে লিগ খেলা দুজন রেফারী তদারক করিয়াছে—অবশ্য মিলিটারী টিমের খেলাতে একজন করিয়াই রেফারী খেলাইয়াছে। কারণ Army Bourd দুজন রেফারীর তদারকে মিলিটারী টিমকে খেলিবার অনুমতি দেয় নাই। Army Sports Central Board of India এবারে স্থির করিয়াছেন যে যে সব ফুটবল প্রতিযোগীতায় দুজন রেফারী নিযুক্ত হইবে সেই সব প্রতিযোগীতায় কোনও মিলিটারী টিম খেলিতে পারিবে না—বা মিলিটারীর কোন লোকও রেফারী হইতে পারিবে না। আশা করা যায় ভবিষ্যতে আর কোনও খেলায় দুজন রেফারী নিযুক্ত করা হইবে না। লিগ খেলায় দুজন রেফারী থাকা সত্ত্বেও অনেক খেলায় রেফারিং মোটেই সন্তোষজনক হয় নাই। পূর্ব্বে যখন খেলার Standard এর চেয়ে অনেক বেশী উচ্চ ছিল এবং খেলার বেগও যখন এর চেয়ে বেশী দ্রুত ছিল, তখন যদি একজন রেফারী দ্বারা খেলার তদারক করা সম্ভব হইত তবে এখন তাহা কেন হইবে না তা বোঝা কঠিন। একটি রেফারী এ্যাসোসিয়েসন আছে সত্য, কিন্তু তাদের কর্ত্তারা নিজের টিমের বা নিজের স্বার্থ লইয়া এত ব্যস্ত যে রেফারীংএর উন্নতি করার একটা ব্যবস্থা করিবার সময় পান না। লিগ খেলার মত, সিল্ড খেলাতেও এবারে

রেফারীদের বিরুদ্ধে অনেক নালিশ শোনা গিয়াছে এবং অধিকাংশ স্থলে রেফারীর ভুলের চেয়ে তাদের অক্ষমতাই বেশী প্রকাশ পাইয়াছে। রেফারীদের এই দুর্ণামের জন্ত রেফারী পোষ্টিং বোর্ড, বিশেষ করে রেফারী এ্যাসোসিয়েসনের প্রেসিডেন্ট অংশতঃ দায়ী।

সিল্ড খেলায় ডালহৌসী ও নরফক ম্যাচে রেফারীর দোষে নরফ্ক যে ভাবে হারিয়াছে তাহা সত্যই দুঃখের। ইউ চক্রবর্ত্তী যিনি এ ম্যাচে রেফারি ছিলেন তার অক্ষমতার পরিচয় তিনি নিজে ডারহাম, ইষ্টবেঙ্গল খেলাতে যথেষ্টই দিয়াছিলেন এবং তাঁহার রেফারিং এতই খারাপ হইয়াছিল তার জন্ত ডারহাম লিগে আর খেলিবে না এইরূপ জনপ্রবাদও হইয়াছিল। পোষ্টিং বোর্ডের সদস্তেরা তাঁহার অক্ষমতা জানা সত্ত্বেও সিল্ডের অত বড় এক খেলায় তাঁহাকে রেফারী নিযুক্ত করাটা সুবিবেচকের কার্য্য করেন নাই। সিল্ড প্রতিযোগিতার শেষ দিনের সব খেলার ভার দেওয়া হইয়াছিল মাত্র দুই জন রেফারীর উপর, কারণ পোষ্টিং বোর্ড মনে করিয়াছিল যে ডানকান্ ও পি গুপ্ত ছাড়া অন্ত রেফারী নিযুক্ত করিলে খেলার গোলযোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে—কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে 'সেমি-ফাইনাল' ও 'ফাইনালে' এদের উভয়ের কাহারও রেফারিং মোটেই সন্তোষ জনক হয় নাই এবং রেফারীর দোষে 'ফাইনাল' খেলা বন্ধই হইয়া গেল। খারাপ রেফারিং-এর জন্ত মিলিটারীর বড় কর্ত্তার নিকট হইতে যে চিঠি আই, এফ্ এর নিকট আসিয়াছে তাহাতে জানা যায় কলিকাতার রেফারিং এর উন্নতি না হইলে মিলিটারী টিম লিগে বা সিল্ডে ভবিষ্যতে খেলিবে কি না তাতে যথেষ্টই সন্দেহ আছে। নিজের দিকে না টানিয়া বা তোষামোদের দ্বারা রেফারীর উপযুক্ততা বিচার না করিয়া যদি ঠিক ভাবে রেফারী পোষ্ট করা হয় তবে রেফারিং এর অনেক গলদ দূর হইতে পারে।

সি, জে

তরুণ তরুণীর কেশ প্রসাধনে অপরিহার্য্য অঙ্গ
"ORIGINAL JESSORE" মার্কা যশোহরের চিরুণী
না দেখে কিনলে ঠকবেন।
যশোহর কম্ব, বাটন এণ্ড ম্যাট ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং
২০, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শতাধিক বর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান
৺জীতরাম নাথ
বলাইচাঁদ নাথ
৯৫ মনোহর দাস ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা

পূজার বাজার আরম্ভ হইয়াছে
সকল প্রকার দেশী তাঁতের কাপড়ের
একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান
দ্রষ্টব্য—কাটা ছেঁড়া হইলে যতদিন পরেই হোক বদলান হয়।

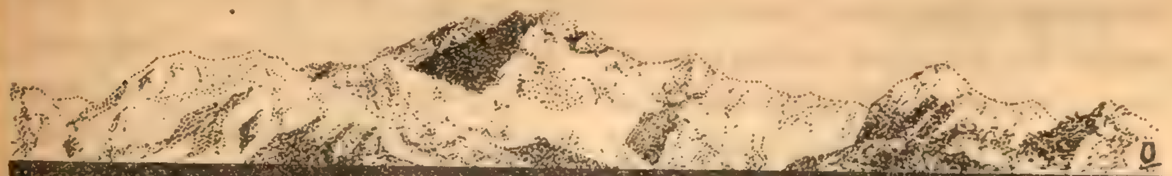

# দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

## কংগ্রেস ও সোসালিষ্ট দল

কংগ্রেস প্রধানত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও ধনীদের চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এখনও ইঁহারাই তাহার সর্ব্বপ্রধান শক্তি। পৃথিবী ব্যাপিয়া ধনিকদের বিরুদ্ধে যে অভিযান চলিয়াছে, তাহার ঢেউ ভারতবর্ষেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং এখানকার মধ্যবিত্ত ও ধনীদের (?) মনে ইহা কতকটা শঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছে। কংগ্রেসকে দেশের সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি হইয়া উঠিতে হইলে, তাহাকে ধনী ও মধ্যবিত্তদের বর্ত্তমান স্বার্থের বিরুদ্ধে যাইতে হইবে, একথা চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সম্ভবত অনেক পূর্ব্বেই বুঝিয়াছেন। কিন্তু, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া যাঁহারা কংগ্রেসের কার্য্য ও আলোচনাদি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন, কংগ্রেসকে বাধ্য হইয়া দ্রুত এই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে হইতেছে।

কিন্তু, কংগ্রেসে সোসালিষ্ট দলের অভ্যুত্থানে, শ্রেণী-বিরোধ, ব্যক্তিগত সম্পত্তিনাশ প্রভৃতি আশঙ্কা করিয়া অনেকেই যে শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন তাহা, কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির গত বোম্বাই অধিবেশনে, সোসালিষ্টদের বিরুদ্ধে লোককে আশ্বাস দিয়া কংগ্রেসকে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাহা হইতেই স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন ও শ্রেণীবিরোধ যে কংগ্রেসের নীতিবিরুদ্ধ, সে সম্বন্ধে আশ্বাস দিবার জন্য করাচি সিদ্ধান্তের কতকাংশকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইয়াছে।

কংগ্রেসের সোসালিষ্টদল যে অনেকটা প্রভাব সঞ্চয় করিয়াছেন তাহা, বেনারস্ অধিবেশনে কংগ্রেসকে, বোম্বাই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যে কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে, তাহা হইতেই স্পষ্ট হইবে। পণ্ডিত জওহরলাল মুক্তি পাইলে, তাঁহার নেতৃত্বে এই দল আরও শক্তিশালী হইবেন বলিয়া অনেকেই মনে করেন।

## ভারতবর্ষ ও সোসালিজ্‌ম্

আমাদের দেশের রাষ্ট্রিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকল দলের আশা ও ধারণা সমান না হইলেও প্রকৃত অনৈক্য বিশেষ মারাত্মক নহে। সর্ব্বোচ্চ দাবী সর্ব্বপ্রকার পর-মুখাপেক্ষীতাহীন পূর্ণস্বাধীনতালাভ এবং সর্ব্বনিম্ন দাবী, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি ডোমিনিয়নগুলির ন্যায় অধিকার ও মর্য্যাদা লাভের অপেক্ষা কম নহে। এই উভয় আদর্শের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য খুব অধিক না থাকিলেও, ইহা লইয়া আমাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে তীব্রতার অভাব নাই। কিন্তু, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কি হইবে, সে সমস্যা অপেক্ষা আমাদের রাষ্ট্রের রূপ ও প্রকৃতি কি হইবে, দেশের কোন সম্প্রদায় ও কোন শ্রেণীর তাহাতে কি স্থান, ও কতটুকু আধিপত্য থাকিবে, কোন্ পথ অনুসরণ করিয়া আমাদের অভীষ্টলাভ হইবে, তাহা লইয়াই দলাদলি এবং মতভেদ তীব্রতর।

আমাদের রাজনৈতিক চেতনার পশ্চাতে ইউরোপের রাজনৈতিক আদর্শ ও চিন্তার প্রেরণা ও প্রভাব রহিয়াছে। আমাদের রাষ্ট্রিক আকাঙ্ক্ষা, ইউরোপের বহুপরীক্ষিত বুদ্ধিজীবি ও ধনিকদের দ্বারা প্রভাবিত গণতান্ত্রিকতার

মূলনীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং আমাদের রাষ্ট্রিক অধিকার লাভের চেষ্টা, রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির বিরোধ, ইউরোপের প্রজাশক্তির অধিকার লাভের নিয়মানুগ প্রচেষ্টার অনুগামী।

রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন অথবা কোনও মৌলিক অধিকার লাভের জন্য, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রজাশক্তি অনেক সময় সশস্ত্র বিদ্রোহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু, ভারতবর্ষের অবস্থার পক্ষে কোনও প্রকার সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্ভব, সফল অথবা দেশের কাহারও পক্ষে শুভকর হইত না। ইহা ভারতবর্ষের চিরন্তন নীতি এবং আদর্শের বিরুদ্ধগামীও হইত। সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব ও অহিংসভাবে গণ আন্দোলন পরিচালন করিবার পন্থা প্রদর্শন করিয়া মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শের অনুগামী এবং তাহার সর্ব্বপ্রকার অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী যে নূতন রাজনৈতিক অস্ত্রের সন্ধান দিয়াছেন, তাহা শুধুমাত্র ভারতের মুক্তিসংগ্রামে নহে, হয়ত সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিবে। শক্তি প্রয়োগের পদ্ধতিতে এই দূরপ্রসারী ফলপ্রদ অভিনবত্ব থাকিলেও, আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির সমগ্র প্রকৃতি, ইহার উদ্ভবের প্রেরণা এবং আকাঙ্ক্ষিত পরিণাম পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রিক আদর্শ হইতে উদ্ভূত।

কিন্তু, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত কোনও প্রকার পদ্ধতি মানুষকে সর্ব্বপ্রকার সুখ সুবিধা প্রদান করিতে পারে নাই; ইউরোপীয় গণতান্ত্রিকতাও পারে নাই। এইজন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রনীতিক অশান্তি, নূতন নূতন রাষ্ট্রনীতিক আদর্শের পরিকল্পনা এবং পরস্পর বিরোধী বহুদলের সৃষ্টি হইয়াছে। রাশিয়ার সমাজ তান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠা, এই ব্যবস্থার অধীনে, রাশিয়ার সর্ব্বতোমুখী উন্নতি, তথাকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত কৃষক ও শ্রমিক-কুলের দুর্দ্দশার অপ্রত্যাশিত অবসান, জগৎব্যাপী বিরুদ্ধতার মধ্যেও তাহার ক্রমিক প্রতিপত্তি লাভ, সকল কল্পনাপ্রবণ লোকেরই বিস্ময়ের কারণ হইয়াছে। ভারতবর্ষের তরুণ সম্প্রদায়েরও রাজনীতিক চিন্তা ইহাদ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া রাশিয়ার পূর্ব্বের অবস্থার সহিত নানা বিষয়ে ভারতবর্ষের অবস্থার একটা মিল আছে বলিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সহিত, শুধু রাশিয়া কেন, পৃথিবীর কোনও দেশেরই অবস্থার ঐক্য নাই।

সকল দেশেরই রাষ্ট্রের রূপ সেই দেশের বিশেষ অবস্থার উপযোগী হইয়া থাকে, এবং সেই দেশেরই বিশেষ অবস্থা হইতে তাহা উদ্ভূত হইয়া থাকে। একদিকে কৃষক ও শ্রমিক ও অন্যদিকে ধনিক এই উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থের বিরোধই আমাদের রাষ্ট্রনীতির সর্ব্বপ্রধান সমস্যা নহে; এমন কি আর্থিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করিয়া শক্তিশালী একটি রাজনীতিক দলও দেশের মধ্যে গড়িয়া উঠে নাই। এই প্রকার কোনও দল গড়িয়া উঠিয়া, তাহা শক্তিশালী হইবার সম্ভাবনা এইজন্য বিশেষ কম থাকিবে যে, এখনও দেশের মধ্যে এই প্রকারের চেতনা জাগ্রত হয় নাই এবং জাগ্রত হইবার পক্ষে নানা বিঘ্ন রহিয়াছে। এখনও দেশের সাধারণ লোক রাজনৈতিক স্বার্থ বলিতে হিন্দুর স্বার্থ, মুসলমানের স্বার্থ, বর্ণহিন্দুর স্বার্থ, অনুন্নত সম্প্রদায়ের স্বার্থ এই প্রকার বুঝিতেছে। বর্ত্তমানে একমাত্র জাতীয়তা বোধের প্রসারের দ্বারা, দেশের লোকের এই মনোভাব পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করা উচিত। এই মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে, সমাজ-তান্ত্রিকতা প্রচারের চেষ্টা দেশকে আরও খণ্ডিত করিয়া ফেলিবে।

আমাদের দেশে প্রকৃতপক্ষে ধনিক নাই; মজুরদের সমস্যা দেশব্যাপী নহে। দেশের মধ্যে স্বার্থের কিছু বিরোধ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও কৃষকদের মধ্যে রহিয়াছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কৃষকদিগকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিলে, এবং এই বিরোধিতার কার্য্যে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারিলে, এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ পাকা হইয়া উঠিতে পারিবে। এই প্রকার বিরোধের সময় কৃষকেরা কর্ম্মীদের দ্বারা পরিচালিত হইতে চাহিতে পারেন এবং এই সময় তাঁহাদের প্রতি আনুগত্যও দেখাতে পারেন। কিন্তু, কোনও রাজনীতিক প্রয়োজনের সময়, কৃষকদের উপর কর্ম্মীদের এই প্রভাব

কার্য্যকরী হইবে কিনা, তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মনে এখনও সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি প্রবল; এবং এই বুদ্ধিকে জাগাইয়া রাখিবার লোকের এবং দলের অভাব নাই।

কোনও রাজনীতিক সঙ্কটের সময় মুসলমান কৃষকেরা সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের প্রভাব এড়াইতে পারিবেন না এবং হিন্দু কৃষকেরাও, কোনও কোনও অভিসন্ধি-সম্পন্ন অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতার প্রভাবাধীন হইতে পারেন। ফলে, কথিত মত চেষ্টার দ্বারা, দেশের মধ্যে কোনও প্রকার লাভের সম্ভাবনা না থাকিলেও, শ্রেণী-বিরোধের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ইহার আরও একটা কুফল এই হইতে পারে যে বর্ত্তমানে দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির কার্য্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত যুবকদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ইহা সকল দিক দিয়া সকল প্রকারে তাঁহাদের অর্থে, কর্ম্মে ও বুদ্ধিতে পুষ্ট। দেশের মধ্যে শ্রেণীবিরোধ বাধিয়া গেলে, আত্মরক্ষার জন্য ইঁহাদের অনেককে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইবে। এই বিরোধের ফলে পরস্পরের মধ্যে যে বিদ্বেষের সৃষ্টি হইবে, তাহাতে এই সম্প্রদায়ের যুবকদের অনেকের মনোভাব সঙ্কীর্ণ করিয়া তাঁহাদিগকে কতক পরিমাণে সাম্প্রদায়িক করিয়া তুলিবে।

আমাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রসার অল্পই ঘটিয়াছে। এখনও সাম্প্রদায়িক মনোভাব দেশের মধ্যে প্রবল। সমগ্র দেশের লোক সংখ্যার অনুপাতে যে স্বল্প সংখ্যক লোক জাতীয়তার পক্ষপাতী, তাঁহাদের কেহ কেহ এমন কোনও বিশেষ রাজনীতিক আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া দলগঠনের চেষ্টা করেন, যাহাতে জাতীয়তাবাদী লোকগুলি পরস্পর বিরোধী দলে বিভক্ত হইতে বাধ্য হইবেন, তাহা হইলে, তাহাতে জাতীয়তাবাদীদের শক্তি ক্ষীণতর হইবে, এবং তাহার অনেকটা অংশের আত্ম-কলহে অপব্যয় হইবে।

কিন্তু, বর্ত্তমানে গণতান্ত্রিকতার মূলনীতিকে ভিত্তি করিয়া সকল মানুষকে সমান অধিকার দিতে হইবে, শ্রেণী-বিরোধ জাগ্রত না করিয়া, কাহারও বাঁচিবার অধিকার অস্বীকার না করিয়া, সকল সম্প্রদায়ের লোকের পরিপূর্ণ বিকাশে এবং সংযোগ সাধনেই যে জাতির প্রকৃত শক্তির উৎস নিহিত সে কথা মনে রাখিয়া জাতিগঠনের এবং জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিবার চেষ্টা করাই সঙ্গত হইবে। আমাদের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির উপর জাতীয়তাবোধ জয়ী হইবার পর, কোনও একটি বিশেষ আদর্শ দেশের পক্ষে উপযোগী বোধ হইলে তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা অন্যায় বা বর্ত্তমানের ন্যায় ক্ষতির কারণ হইবে না।

ইউরোপে সমাজ-তান্ত্রিকতার উৎপত্তির মূল কারণটির প্রতি আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইউরোপীয় সভ্যতার সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ দিক হইতেছে যে, ইহা নিজ দেশের এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশের বহু লোককে বঞ্চিত করিয়া অল্পসংখ্যক লোকের কল্পনাতীত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়াছে। এই সকল দেশে সাধারণ লোকে যে সকল সুখ সুবিধার অধিকারী হইয়াছেন, তাহার পশ্চাতে ধনিকদের সদিচ্ছা বা সহযোগিতা যে কিছুমাত্র নাই, তাহা নহে, তাহা হইলেও, সে সকল সুখ সুবিধা প্রধানতঃ লাভ হইয়াছে, সাধারণ লোকের এবং শ্রমিক, কৃষক, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকদের সংঘবদ্ধতার চাপে। এই সকল দেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিচালনে, প্রতিনিধিমণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তীতায় সাধারণ লোকের যথেষ্ট হাত আছে বলিয়া যদিও উপর হইতে দেখা যায়, তাহা হইলেও, এই সকল রাষ্ট্রে ধনিকদের প্রভাব এখনও অপরিসীম এবং তাঁহাদেরই স্বার্থরক্ষার বিবেচনা ও ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী।

এখানে একদিকে, সুখ, সম্ভোগ এবং বিলাসের আতিশয্য, ঐশ্বর্য্যের অতিসঞ্চয় এবং অন্যদিকে, তাহারই পশ্চাতে দারিদ্র্য ও বঞ্চনা। এখান হইতে ধনিকদের বিরুদ্ধে যে সঙ্গত অসন্তোষের আরম্ভ, তাহাই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং সমাজ-তান্ত্রিকতার মধ্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

এখন ভারতবর্ষে এই প্রকারের বৈষম্য এবং তাহার প্রতিকারের জন্য সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রয়োজন আছে কিনা, তাহাই বিশেষভাবে বিবেচ্য। ভারতবর্ষে এবং বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে ধনীর সংখ্যা খুবই কম। এখানে যে

শোষণ এবং বঞ্চনা আছে, তাহা এক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক দেশের অন্য সম্প্রদায়ের উপর অনুষ্ঠিত হইতেছে না। এই শোষণ চলিয়াছে সমগ্র দেশের উপর বিদেশীদিগের দ্বারা।

যে স্বল্পসংখ্যক ধনী এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকদের ভুল করিয়া ইউরোপের সমশ্রেণীর লোকদের সহিত তুলনা করা হইতেছে, প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের অবস্থা দেশের অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের অপেক্ষা ভাল নহে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা সাধারণতঃ শিক্ষিত বলিয়া অন্যান্য শ্রেণীর সম-আর্থিক-অবস্থাপন্ন লোকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক জাগতিক সুখ সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলে, দেখা যাইবে যে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকদের গড় আর্থিক অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। অনেক সময়েই বিশেষ আর্থিক কষ্টভোগ করিয়াও ইঁহাদিগকে অভাবের উর্দ্ধে থাকিবার ঠাট বজায় রাখিতে হয়।

দেশে যে অল্পসংখ্যক ধনী আছেন, তাঁহারাও ধনের সংঘবদ্ধ শক্তির প্রয়োগের দ্বারা দেশের জনসাধারণকে পিষ্ট করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের যদি সে শক্তি থাকিত, তাহা হইলে বিদেশীয় শোষণ হইতে দেশকে বরং কতকটা রক্ষা করিতে পারিতেন এবং তাহাতে বর্ত্তমানে অপকার অপেক্ষা উপকার হইবারই সমধিক সম্ভাবনা থাকিত।

আমাদের দেশে বিশেষ করিয়া বাংলায়, জমিদারী ব্যবস্থার জন্য, জমিদার, গাঁতিদার, প্রভৃতি শ্রেণীর লোকের সহিত কৃষকদের একটা স্বার্থের বিরুদ্ধতার সৃষ্টি হইয়াছে এবং কতকটা শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে।

কিন্তু, এই ব্যবস্থা বর্ত্তমান অবস্থায় অধিক দিন স্থায়ী হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় না; কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমিদারী, গাঁতিদারী প্রভৃতি সম্পত্তি রক্ষা ক্ষতির কারণ হইয়া পড়িয়াছে। যাহার আর্থিক ভিত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে ব্যবস্থার অধিকদিন বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নহে। অনেক ক্ষেত্রে আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে, প্রজারা সংঘবদ্ধ হইলে, জমিদারের অন্যায় শোষণ বন্ধ ত হয়ই; বরং জমিদারের অবস্থাই শোচনীয় হইয়া উঠে।

যাহা হউক, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে দেশের পক্ষে নানাদিক দিয়া অহিতকর, ইহা যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্যম এবং কর্ম্মশক্তিকে অনেকটা পরিমাণে নষ্ট করিয়াছে, একথা সকলেই বুঝিয়াছেন এবং অনেকেই এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু, দীর্ঘ দিনের আর্থিক ব্যবস্থার ফলস্বরূপে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে, ইচ্ছা করিলে তাহা হইতে একদিনেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব নহে। ইহার জন্য কোনও প্রকার শ্রেণীবিরোধ না জাগাইয়া, অন্য মৃদুতর উপায়ে ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা দেশের পক্ষে শুভকর হইতে পারে। শুধুমাত্র শিক্ষার বিস্তারের দ্বারাই ইহার অনেকটা সহায়তা হইবে।

কংগ্রেসের সোসিয়ালিস্ট্ দল সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলিয়াছেন, "এই দলের কর্ম্মতালিকার পশ্চাতে এই ধারণা অন্তর্নিহিত রহিয়াছে যে, জনসাধারণ ও কয়েকটি শ্রেণীর মধ্যে, ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে এরূপ স্বার্থের বিরোধ নিশ্চয়ই রহিয়াছে যে তাঁহারা কখনই একযোগে পরস্পরের মঙ্গলের জন্য কাজ করিতে পারেন না। আমি এই ধারণার পক্ষপাতী নহি। আমার বহু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ইহার বিপরীত ধারণার পরিপোষক। শ্রমিকেরা যাহাতে নিজেদের অধিকারের কথা এবং তাহা প্রতিষ্ঠা করিবার কথা শিখিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থারই বিশেষ প্রয়োজন।"

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক আদর্শ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের বিশেষ অবস্থার কথা বিবেচনা করিতে হইবে, অন্ধভাবে কোনও একটি ইউরোপীয় আদর্শ এদেশের উপযোগী হইবে না।

## সমন্বয়ের প্রকৃত উপায় কি

কৃষকদের প্রকৃত উপায় ও অভিযোগের কারণ যে রহিয়াছে এবং জমিদার গাঁতিদার মহাজন প্রভৃতির বিরুদ্ধে ইঁহাদের বিদ্বেষ যে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একদিকে জমির মালিকেরা এবং অন্যদিকে মহাজনেরা দেশের লোককে নানা উপায়ে শোষণ করিয়া এবং তাঁহাদের উপর নানাবিধ অন্যায় অত্যাচার করিয়া দেশের লোককে তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহাদের এই নীতিকে ভবিষ্যতে চালাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবার মত শক্তি তাঁহাদের

নাই। এবং বর্ত্তমানে তাহা আর লাভজনক নহে। তদ্ব্যতীত এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকেরাই এ কথা ভাবিতেছেন, কৃষক ও মজুরদের দুঃখ দূর ও উন্নতি না হইলে দেশের মুক্তি সম্ভব হইবে না; তাঁহারাই দেশের এই সকল বহুদুঃখে অবনত লোকের সেবার জন্য আত্মনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন; কাজেই, ইঁহাদের মধ্যবর্ত্তিতা ও চেষ্টায় এই বিরুদ্ধতার অবসান এবং স্বার্থের সমন্বয় বিধান অসম্ভব নহে।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত কারণের সহিত হিন্দু সমাজের আভিজাত্য এবং জাতি-বৈষম্য সমস্যাটিকে জটিলতর করিয়াছে এবং অনুন্নত হিন্দুদের মধ্যে এই বিদ্বেষকে তীব্রতর করিয়াছে। যাহাতে দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার জন্য এবং সমগ্র হিন্দু সমাজও নিজেদের মঙ্গলের জন্য বর্ণ হিন্দুদিগকে এই মিথ্যা অভিমান ত্যাগ করিতে হইবে। পরিবর্ত্তিত অবস্থাকে যাহারা স্বীকার করিয়া লইতে পারে, তাহারাই এ জগতে বাঁচিবার অধিকার পায়।

## ডাঃ বীরবল সাহানী

১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমষ্টার্ডাম নগরে আন্তর্জাতিক বোটানিক্যাল কংগ্রেসের যে ষষ্ঠ অধিবেশন হইবে, তাহার একটি বিশেষ শাখার সহকারী সভাপতির পদগ্রহণ করিবার জন্য উক্ত কংগ্রেসের অরগ্যানাইজিং কমিটি কর্ত্তৃক, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ বীরবল সাহানী ডি-এস্ সি (লণ্ডন), এস্ সি-ডি (ক্যাণ্টাব) নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সভার কোনও শাখার সহকারী সভাপতি হইবার সম্মান আর কোনও ভারতীয় এবং সম্ভবতঃ আর কোনও এশিয়াবাসী প্রাপ্ত হন নাই। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্ সি-ডি উপাধিও ভারতবাসীদের মধ্যে ডাঃ সাহানীই প্রথম পাইয়াছেন। ইউরোপীয় বিদ্যার সর্ব্বোচ্চ বিভাগে ভারতীয়দের সাফল্য ও কৃতিত্ব, বিশ্বে ভারতীয়দের সম্বন্ধে অনুকূল মত সৃষ্টিতে যে সহায়তা করে, বাহিরের অন্য কোনও প্রকার কার্য্যের দ্বারা তাহা সম্ভব হয়না। যে-সকল মনীষি বিদ্যা এবং প্রতিভার বলে, বিশ্বসভায় ভারতবাসীর মর্য্যাদা বাড়াইতেছেন, অধিকতর উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে যাহাতে তাঁহাদের দলের কথা বিস্মৃত না হইয়া, তাহার উপযুক্ত মূল্যদান করিতে পারি, সে বিষয়ে আমাদের সাবধান হইতে হইবে।

আমরা ডাঃ সাহানীকে তাঁহার এই অসাধারণ সম্মান লাভের জন্য অভিনন্দিত করি।

## একজন কৃতী বাঙ্গালী

ফরিদপুরের সরকারী উকিল রায় নলিনীকান্ত সেন বাহাদুরের পুত্র ডাঃ পি-কে-সেন, এম-বি (ক্যাল), এম-ডি (বার্লিন), ইংলণ্ডের কেড্রিফ্ (Cadriff) বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। এখানকার যক্ষ্মা হাঁসপাতালটি ব্রিটীস সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত। তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায়, মেডিসিন ও প্যাথোলজিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মার্ক পাইয়া এবং প্রথম স্থান অধিকার করিয়া "টি-ডি-ডি" (যক্ষ্মা বিষয়ক রোগ সমূহের বিশেষজ্ঞ) উপাধি লাভ করিয়াছেন। এই বিষয়ে আরও গবেষণা করিবার জন্য বিলাতস্থ ভারতের হাই কমিশনার তাঁহাকে একটি বিশেষ বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। বিদেশে ভারতীয় ছাত্রদের কৃতিত্ব ও গৌরব, ভারতের গৌরবকে বর্দ্ধিত করে।

## বাঙ্গালীর সম্মান

লণ্ডনের ব্রিটীস সাম্রাজ্যের ইউনিভার্সিটিজ ব্যুরো, ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ দাসকে জানাইয়াছেন যে, গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্য ১৯৩৪-৩৫ সালের কর্ণেগী কর্পোরেশন বৃত্তি, তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীন, ইংরাজী সাহিত্যে গবেষণার জন্য ডাঃ দাস আগামী সেপ্টেম্বর মাসে বিলাত যাত্রা করিবেন। আমরা বাঙ্গালী অধ্যাপকের এই সম্মান লাভে আনন্দিত।

## মহাত্মাজীর বাংলাভাষা প্রীতি

কর্পোরেশনের বাংলা অভিনন্দনের উত্তর মহাত্মাজী বাংলায় দিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি বাংলাভাষা ও তাহার মাধুর্য্যের অনুরাগী। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে যে অক্ষয় সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে সম্মান ও শ্রদ্ধাদানে বাধ্য করে। বাংলা শিক্ষার ইচ্ছা তাঁহার চিরদিনের স্বপ্ন হইয়া আছে, যদিও এই স্বপ্ন আজও সফল হয় নাই। বয়স বৃদ্ধির সহিতও তাঁহার বাংলা শিক্ষা করিবার আগ্রহ কমে নাই।

অন্য কেহ এই কথা বলিলে, তাহাকে শুধুমাত্র ভদ্রতার কথা বলিয়া ধরা যাইতে পারিত। কিন্তু, মহাত্মাজী কেবল ভদ্রতার জন্য এতটা অনর্থক কথা এতটা আবেগের সহিত বলিবেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে।

যদি মহাত্মাজীর বাংলার প্রতি এইরূপ প্রীতি এবং শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে, এতদিন ধরিয়া তিনি বাংলার প্রতি বিশেষ অবিচার করিয়াছেন বলিতে হইবে। হিন্দী যে এতটা প্রাধান্য এবং প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ হইতেছে মহাত্মার ন্যায় সর্ব্বজনমান্য প্রতিপত্তিশালী নেতা হিন্দীর পক্ষ বিশেষ দৃঢ়তার সহিত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি যদি ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকেরদ্বারা ব্যবহৃত, অন্ততঃ সাধারণ হিসাবেও ভারতের দ্বিতীয় প্রধান ভাষা, বাংলা শিক্ষা করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা মধ্যে মধ্যে বলিতেন, তাহা হইলেও, সম্ভবতঃ অন্যান্য প্রদেশে বাংলার চর্চ্চা কিছু অধিক হইতে পারিত। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ বলিয়া ইহাতে শিক্ষার্থীদের অন্যদিক দিয়াও যথেষ্ট লাভ হইতে পারিত।

সকল ভারতবাসীকে যেমন মহাত্মা হিন্দী শিক্ষার কথা বলিয়াছেন, তেমনি হিন্দী ভাষী লোকদের পক্ষেও যে বাংলা অথবা অন্য কোনও একটি প্রধান ভারতীয় ভাষা অবশ্য শিক্ষণীয়, একথা বলা মহাত্মার পক্ষে বিশেষ ন্যায়সঙ্গত হইত।

## কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ভাইস্ চ্যান্সেলর

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলরের পদে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিয়োগে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহার বয়স বর্ত্তমানে ৩৩ বৎসর মাত্র; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরদিগের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়কনিষ্ঠ। তিনি স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্বনামখ্যাত দ্বিতীয় পুত্র। ইতিমধ্যেই নানাদিকে তাঁহার শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা, স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অসামান্য শক্তি ও প্রতিভার পরিচায়ক। দেশবাসী আশা করে, শ্যামাপ্রসাদ বাবু তাঁহার পিতার শূন্যস্থান পূর্ণ করিতে পারিবেন।

## হিন্দী প্রচারে পাঁচলক্ষ টাকা

নিখিল ভারতীয় হিন্দী সাহিত্য সম্মিলনে হিন্দী প্রচারের জন্য পাঁচলক্ষ টাকা পৃথক করিয়া রাখিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। হিন্দীকে অধিকতর জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা হইবে।

আসামে হিন্দী প্রচলনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হইবে। আসামে যে, কোনও একটি প্রধান ভারতীয় ভাষার প্রসারের উপযুক্ত ক্ষেত্র রহিয়াছে, সে কথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি এবং একথাও বলিয়াছি যে, এখানে বাংলার দাবী ও সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। কিন্তু, আমাদের নিশ্চেষ্টতা ও উদ্যমহীনতার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে। বাঙ্গালীর আত্মপ্রসারের জন্য যে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের প্রয়োজনীয়তা আছে, একথাটা আমরা আজও ভাল ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

## বিদেশে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য দান

প্রকাশ, শ্যামজী কৃষ্ণ বর্ম্মা নামক, ইউরোপে নির্ব্বাসিত কোনও ভারতীয়ের পত্নী মৃত্যুকালে বিদেশে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য, প্রায় ৩০ লক্ষ পরিমাণ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। দাতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত ট্রাষ্টিরা এবং প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ সম্মিলিতভাবে এই টাকা হইতে বৃত্তি প্রভৃতি দান সম্বন্ধে সকল কার্য্য পরিচালনা করিবেন।

এদেশ হইতে প্রতিভাশালী যোগ্য ছাত্র ছাত্রীরা এদেশের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া যত অধিক সংখ্যায় উচ্চতর বিদ্যালাভের জন্য বিদেশে যাইবার সুযোগ পান, ততই ভাল।

## আমরা রাজনীতির মধ্যে আসিয়া পড়িতে বাধ্য হই

যদিও জাতীয় কার্য্য বলিতে আমরা প্রধানতঃ রাজনৈতিক কার্য্যই বুঝিয়া থাকি, এবং ইহাই আমাদের কর্ম্মজীবনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তেজনা আনিয়া দেয়, তাহা হইলেও, মনে রাখিতে হইবে যে, ইহার মূল্য নিতান্ত সাময়িক; আজ যাহার মূল্য অপরিমেয় কাল তাহা মূল্যহীন হইয়া পড়ে; একদেশের সর্ব্বজনপূজ্য রাজনীতিক নেতা, অপর দেশের শত্রু বলিয়া বিবেচিত হন। বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার জন্য আমাদের রাজনীতিকে গ্রহণ করিতে হয়। চিত্তরঞ্জন সেবা সদনে মহাত্মা গান্ধীর এই সম্বন্ধীয় উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন;—

"পরলোকগত লালা লজ্‌পত রায় এবং দেশবন্ধু দাশ, তাঁহাদের সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক নেতা ছিলেন এবং রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রামেই তাঁহাদের সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইহা কি বিস্ময়ের বিষয় নহে যে তাঁহারা মৃত্যুকালে তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দান না করিয়া, মানব ও সমাজ সেবায়, তাহাও আবার নারীদের জন্য, দান করিয়া গিয়াছেন। এই ঘটনাটি আমাদের সূক্ষ্মদর্শী লোকদের বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিবার ও উপলব্ধি করিবার বিষয়। ইহা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, হয়ত আমাদের প্রকৃতির মূলধর্ম্মই হইতেছে সমাজ ও মানব সেবা। আমরা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজনীতির মধ্যে আসিয়া পড়িতে বাধ্য হই। আমাদের নির্ব্বাচন করিয়া লইবার স্বাধীনতা থাকিলে, আমরা সমাজ সেবাই গ্রহণ করিতাম। ঠিক এই বিষয়টির জন্যই লোকমান্যও অনুশোচনা করিয়া গিয়াছেন। সকলেই জানে, তিনি দুইবার কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং এই দুইবারেই, বৈজ্ঞানিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক লিখিয়া তাঁহার সময় ও প্রতিভা ব্যয় করিয়াছিলেন—কোনও রাজনীতিক পুস্তক লিখিয়া করেন নাই।"

## সহশিক্ষা অথবা কোন শিক্ষাই নয়

ভবানীপুর ওয়াই-এম-সিতে অনুষ্ঠিত সহশিক্ষা সম্বন্ধে একটি বিতর্কে সভা কর্ত্তৃক সহশিক্ষার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইলেও, এই সভার সভাপতি ডাঃ আরকুহার্টের কথাগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি এই কথাটি বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায়, বালিকাদের পক্ষে, হয় সহশিক্ষা না হয় কোন শিক্ষাই নয়, এই দুইয়ের মধ্যে একটি বাছিয়া লইতে হইবে। তিনি বলেন, "ব্যক্তিগতভাবে আর একটু অগ্রসর হইয়া আমি বলিব যে, শুধু বর্ত্তমান অবস্থায় নয়, বস্তুত সর্ব্বাবস্থায়ই, উচ্চ শিক্ষার পক্ষে সহশিক্ষাকে সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থা বলিয়া আমি মনে করি।" ডাঃ আরকুহার্ট তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলেন যে, কলেজে ছাত্রীদের উপস্থিতি কলেজের সমগ্র আবহাওয়াকে পরিমার্জ্জিত করিয়া তুলে। তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে ইহাও বলেন যে, ছাত্রীরা তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারে বিশেষ আত্ম-মর্য্যাদার পরিচয় দিয়াছেন।

অন্যদিক সম্বন্ধেও তিনি বলিয়াছেন, "কলেজে ছাত্রীদের উপস্থিতি ছাত্রদের ভদ্র ব্যবহার ও পৌরুষের উপর যে দাবী উপস্থিত করিয়াছে, তাঁহারা তাহাতে বিশেষ প্রশংসা-যোগ্য ভাবে সাড়া দিয়াছেন।"

সহশিক্ষার পক্ষে এই সকল কথা আমরাও পূর্ব্বে একাধিক বার বলিয়াছি। তিনি কলেজে সহশিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, সুবিবেচনার সহিত পরিচালিত হইলে, স্কুলের পক্ষেও তাহা সত্য হইবে। স্কুলে সহশিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায় যে, এই ব্যবস্থা ব্যতীত বালিকাদের শিক্ষার, বিশেষ করিয়া পল্লীতে কোনও প্রকার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। কাজেই, এখানে সহশিক্ষা অথবা শিক্ষাহীনতার মধ্যে নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে। বরং পল্লীতে পরিচিত আবেষ্টনের জন্য এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাল্পতার জন্য, শিক্ষকদের সহিত ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত

সম্পর্ক অনেকটা ঘনিষ্ঠ হইবে এবং তাহার ফলে, এই সব ছাত্রছাত্রীর উপর নিজেদের চরিত্রের প্রভাব বিস্তার করা এবং তাহাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা, শিক্ষকদের পক্ষে অনেক সহজ হইবে।

স্কুলেও ছাত্রীদের উপস্থিতি, ছাত্রদিগকে কথাবার্ত্তায় এবং ব্যবহারে অধিকতর সংযত ও ভদ্র করিবে এবং উভয় পক্ষেরই মর্য্যাদা-জ্ঞান বাড়াইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

## কংগ্রেস ও জনসাধারণের স্বার্থ

মহাত্মাজী কলিকাতায় আসিলে, একদল ছাত্র তাঁহার সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে যে সকল প্রশ্ন করেন, তাহার মধ্যে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি মনে করেন না যে, এমন সময় আসিয়াছে যখন, কংগ্রেসের, ভূম্যধিকারী ও ধনিকদের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া জনসাধারণের স্বার্থের জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়ান উচিত ?"

ইহার উত্তরে মহাত্মাজী বলেন ;—

"না ; আমরা, জনসাধারণের তথাকথিত বন্ধুরা, যদি এইরূপ দাঁড়াইতে চাই, তাহা হইলে, আমরা তাহাদের ও আমাদের সমাধি খনন করিব। আমি পরলোকগত স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় ধনিক ও জমিদারদিগকে জনসাধারণের সেবায় নিয়োগ করিতে চাই।………আপনারা কি মনে করেন যে এই সকল তথাকথিত সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের লোকেরা সম্পূর্ণভাবে দেশাত্মবোধ বর্জ্জিত। আপনারা যদি এরূপ মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, ইঁহাদের প্রতি দারুণ অবিচার এবং জনসাধারণের স্বার্থের বিশেষ ক্ষতি করিবেন।………মহৎ আদর্শের আহ্বানে ইঁহারাও সাড়া দিতে জানেন।……আমরা যদি তাঁহাদের বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়া তাঁহাদিগকে নিশ্চিন্ত করিতে পারি, তাহা হইলে, আমরা দেখিতে পাইব যে, ক্রমেই তাঁহারা অধিকপরিমাণে জনসাধারণকে তাঁহাদের ধনসম্পদের অংশ দিতেছেন।

"তদ্ব্যতীত, যেন আমরা নিজেদের কাছে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি যে, আমরা কতটা জনসাধারণের সহিত একীভূত হইতে পারিয়াছি। দেশের সংখ্যাতীত সাধারণ লোক ও আমাদের মধ্যের ব্যবধানকে কি আমরা দূর করিতে পারিয়াছি। কাচের ঘরে বাস করিয়া আমাদের অপরের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করা উচিত নহে।……ধনিকেরা যে ভাবে জীবনযাপন করেন বলিয়া আমরা তাঁহাদের দোষ দিয়া থাকি, আমরা নিজেরা এখনও সে দোষ সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিতে পারি নাই। শ্রেণীবিরোধের কল্পনা, আমি ভাল বলিয়া মনে করি না। ভারতবর্ষে শ্রেণীবিরোধ শুধু যে পরিহার্য্য তাহা নয়, সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য…।"

মহাত্মাজী ভূম্যধিকারী ও ধনিকদের নিকট হইতে যতটা আশা করেন, তাঁহাদের নিকট হইতে যে ততটা কাজ খুব সহজে পাওয়া যাইবে, আমরা তাহা মনে করি না। সেজন্য চেষ্টাও করিতে হইবে এবং তাঁহাদের উপর চাপও দিতে হইবে ; অবশ্য যাহাতে শ্রেণী বিরোধের সৃষ্টি হইতে পারে, এমন কোনও পন্থা দেশের পক্ষে কখনই শুভকর হইবে না।

কিন্তু, আমরা যাহারা বিশেষ জোর করিয়া সোসালিজমের কথা বলিতেছি ; দেশের জনসাধারণের সহিত তাহারা এখনও সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে নাই। এই সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে স্থাপিত হইবে, বর্ত্তমানের ব্যবধান ও অসন্তোষের কারণ অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইবে।

## সংস্কৃত 'উপাধি' পরীক্ষায় ছাত্রীর কৃতিত্ব

চট্টগ্রামের জগৎপুর আশ্রমটোল হইতে, শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রহ্মচারিণী ও শ্রীমতী বাসন্তী ব্রহ্মচারিণী নামক দুইটি প্রতিভাশালিনী ছাত্রী, এ বৎসর সাংখ্য দর্শনের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই বালিকাদ্বয়ই ঢাকার পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের উপাধি বিতরণী সভায় মহামান্য বাংলার গভর্ণরের নিকট হইতে দুইটি সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন এবং এখানেই 'কলাপে'র উপাধি পরীক্ষায় তাঁহাদের অসামান্য কৃতিত্বের জন্য, তাঁহারা সরস্বতী ও ভারতী উপাধি প্রাপ্ত হন।

সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য ইহাঁরা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ হইতে বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

এই টোলের অপর দুইটি ছাত্রীও ব্যাকরণে পাণ্ডিত্যের জন্য সরকারের নিকট হইতে বিশেষ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা ব্যতীত আরও অনেক ছাত্রছাত্রী এখানে পারদর্শিতার সহিত সংস্কৃত শিক্ষা করিতেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দিকে মেয়েরা বহু সংখ্যায় ঝুঁকিয়াছেন এবং সেখানে সংস্কৃত বিদ্যায়ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু, টোলের শিক্ষায় তাঁহাদের এরূপ যোগ্যতার নিদর্শনের কথা ইহার পূর্ব্বে আমরা শুনি নাই। মেয়েদের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা প্রশংসা ও ধন্যবাদের পাত্র।

## ভারতবাসীদের স্বাস্থ্যের হিসাব

ভারতবাসীদের বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীদের স্বাস্থ্যের অবস্থা শোচনীয়। আমাদের অজ্ঞতার জন্য, দারিদ্র্যের জন্য, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের জন্য, এবং সংঘবদ্ধতা, খাদ্য ও উদ্যমের অভাবের জন্য নিবারণযোগ্য নানাপ্রকার অসুখে আমরা বহু সংখ্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হই, এবং আরও অনেক বেশী সংখ্যায় ভুগিয়া চিরকালের অথবা দীর্ঘ বা অল্প সময়ের জন্য সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে স্বাস্থ্যহীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকি।

কিন্তু, আমাদের স্বাস্থ্যের প্রকৃত অবস্থা কি, স্বাস্থ্যহীনতার জন্য কোন্ স্থানে কোন্ কারণ কতটুকু দায়ী; আমাদের এ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত কোনও কারণে আমাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে কিনা, বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যহীনতার বিভিন্ন কারণ বর্ত্তমান আছে কি না, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার কতটা প্রতিকারযোগ্য, প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা অনুসন্ধান হওয়া কর্ত্তব্য।

আমাদের স্বাস্থ্যহীনতার স্থানীয় নানাকারণ ত রহিয়াছেই; সম্ভবতঃ অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, একই স্থানের অধিবাসী সকল সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যের অবস্থা এক প্রকার নহে এবং একই রোগের প্রাদুর্ভাবও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সমান নহে। বলিষ্ঠ, বর্দ্ধিষ্ণু, স্বাস্থ্যবান সম্প্রদায়ের পাশেই, ক্ষীণকায়, ক্ষয়িষ্ণু এবং নির্জ্জীব সম্প্রদায়ের বাস এদেশে একেবারেই বিরল নহে। অনুসন্ধানের ফলে এ সকল সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য এবং প্রতিকারের উপায় আবিষ্কৃত হওয়া অসম্ভব নহে।

ভারত সরকারের হেল্থ্ কমিশনার মেজর জেনারেল জে ডি গ্রেহাম ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যের অবস্থা নির্ণয় করিবার জন্য, তাঁহার গত বার্ষিক রিপোর্টে একটি কমিশন নিয়োগের পরামর্শ দান করিয়াছেন। এই কমিশন, স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব আছে, এমন সকল বিষয়ই,—বিশেষ করিয়া, জনসংখ্যা, আর্থিক অবস্থা, বেতন খাদ্য প্রভৃতির কথা বিবেচনা করিবেন। ইহার ফলে দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য কোনও কার্য্যকরী উপায় অবলম্বনের পথও প্রশস্ত হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন।

তিনি বলিয়াছেন, ফেডারেল শাসনতন্ত্রের প্রবর্ত্তনের সহিত একটি ফেডারেল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। আমরা মনে করি ইহার আবশ্যকতা তাহারও পূর্ব্বে।

## কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত

কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেন নাই, কারণ স্বাজাতিকতার আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী তাঁহারা তাহা করিতে পারেন না; বর্জ্জনও করিতে পারেন নাই, কারণ, সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের ফলে যাঁহারা সুবিধা পাইয়াছেন, ইহাকে বর্জ্জন করিলে তাঁহারা দল ছাড়িয়া যাইতেন।

কিন্তু, গ্রহণ বা বর্জ্জন, কোনটিই করিতে না পারিবার ফল কতকটা গ্রহণ করিবার মতই হইয়া গিয়াছে।

কংগ্রেস যে শুধুমাত্র দেশের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তাহা নহে, ইহা সাম্প্রদায়িকতাহীন জাতীয়তার আদর্শকে সৃষ্টি করিয়াছে, প্রচার করিয়াছে, ও সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধতার মধ্যে ইহাকে জাগ্রত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে।

কংগ্রেস এ পর্য্যন্ত যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, এবং যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহা এইজন্য করেন নাই যে, দেশের সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকে সেই সকল মত বা কাজ চাহিতেছিলেন। দেশের স্বার্থের পক্ষে এবং জাতি-গঠনের পক্ষে যে আদর্শ, মত বা কাজ কংগ্রেস প্রয়োজনীয়

মনে করিয়াছেন, তাহা নির্ভীকভাবে করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই কংগ্রেস এতটা মর্য্যাদা এবং শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কংগ্রেস প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বটে, কিন্তু, এই প্রতিনিধি মাত্র তাঁহারাই নির্ব্বাচন করিতে পারেন, যাঁহারা কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাস করেন এবং তাহা মানিয়া লইবার প্রতিশ্রুতি দান করেন। যাঁহারা জাতীয়তার ও জাতীয়মুক্তির আদর্শে বিশ্বাসী নহেন, কংগ্রেস এমন লোকদের প্রতিষ্ঠান নহে। কাজেই, সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তকে বর্জ্জন করিতে না পারায়, কংগ্রেসের আদর্শ খর্ব্ব হইয়াছে।

আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে যাইয়া কোনও প্রতিষ্ঠানের শক্তি ক্ষয় হওয়া সেই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ততটা দুর্দ্দৈবের কথা নয়। যতটা দুর্দ্দৈবের কথা, কোনও বিশেষ অবস্থার জন্য আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিতে বাধ্য হওয়া।

কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িক আব্দারকে মানিয়া লওয়া যে কংগ্রেসের আদর্শের বিরোধী, তাহা, এই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তকে পরোক্ষে গ্রহণ করিতে যাইয়াও, কংগ্রেসকে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

পণ্ডিত মালবীয় এবং শ্রীযুক্ত আনের পদত্যাগে লোকচক্ষে কংগ্রেসের মর্য্যাদা আরও নামিয়া গিয়াছে।

কিন্তু, এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা মনে রাখিতে হইবে। কংগ্রেস নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া এমন অবস্থায় পতিত হইয়াছেন যাহাতে শক্তির প্রমাণ দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। অথচ, এদিকে প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, কতকগুলি সম্প্রদায়কে এমন লুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে যে, সাম্প্রদায়িক স্বার্থ বর্জ্জিত জাতীয়তার পরিপোষক কোনও প্রস্তাবে তাঁহারা কখনই সম্মত হইতেন না। এইরূপ অবস্থায় যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের সমর্থন পাইতে পারেন, এই আশায় সম্ভবতঃ কংগ্রেস এই প্রকার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

ইহাতে লাভ লোকসান কতটা হইবে, তাহাও দেখিবার বিষয়। তাঁহাদের এই নিরপেক্ষতার নীতিতে সাম্প্রদায়িক মনোভাববিশিষ্ট মুসলমানেরা খুসী হইবেন না, এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতাদের অপেক্ষা মুসলমান ভোটারদের উপর তাঁহাদের প্রভাব অনেক বেশী। কাজেই, এদিক দিয়া কংগ্রেস লাভবান হইবেন, এমন আশা খুবই কম। অন্যদিকে জাতীয়তার পক্ষপাতী হিন্দুদের সহানুভূতিও কংগ্রেস বর্ত্তমান নীতির ফলে কিছু পরিমাণে নিঃসন্দেহ হারাইয়াছেন। কাজেই, বর্ত্তমানে অনুসৃত নীতির ফলে কংগ্রেস যে বিশেষ লাভবান হইবেন, এমন মনে হয়না।

## বর্ত্তমানে কর্ত্তব্য কি হইবে

বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেসের সমর্থক জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের পক্ষে কি করা কর্ত্তব্য হইবে, তাহা বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, কংগ্রেসই দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ভারতের মর্য্যাদা বাহিরে এবং সরকার পক্ষের কাছে যাহা কিছু বাড়িয়াছে, তাহা কংগ্রেসের জন্য। আমরা যতটুকু রাজনৈতিক অধিকার ও সুবিধা পাইয়াছি, জনসাধারণের মধ্যে যতটুকু দেশাত্মবোধ জাগ্রত হইয়াছে, জাতীয় জীবনের সকল বিভাগে যতটুকু প্রাণ সঞ্চার হইয়াছে, তাহার জন্য আমরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে কংগ্রেসের নিকট ঋণী। ভবিষ্যতে আমাদের যে রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইতে হইবে, তাহাও কংগ্রেসের মধ্য দিয়াই পাইতে হইবে। কাজেই, কংগ্রেস যদি ভুলও করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও, যাহাতে কংগ্রেসের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে অথবা বাহিরের লোকের কাছে, তাহার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইতে পারে, এমন কোনও কাজ করা আমাদের পক্ষে মারাত্মক রকমের ভুল হইবে।

কংগ্রেস যাহাতে ভুল সংশোধন করিয়া তাহার চিরন্তন নীতি আদর্শের অনুসরণ করিতে পারে, কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়া, তাহা করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুযুক্তির কার্য্য হইবে।

কংগ্রেসের বাহির হইতেও আইন পরিষদে ঢুকিয়া জাতির মঙ্গলকর সকল কার্য্যে, কংগ্রেসদলের সহিত একযোগে কার্য্য করিব,—দেশের পক্ষে এ আশ্বাস যথেষ্ট নহে। কংগ্রেসের মনোনীত ব্যক্তিরা যাহাতে সর্ব্বত্র জয়ী হইতে পারেন, দেশের লোকের উপর কংগ্রেসের প্রভাব যাহাতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টা করা দেশের হিতকামী সকল ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য হইবে।

শ্রীসুশীল কুমার বসু

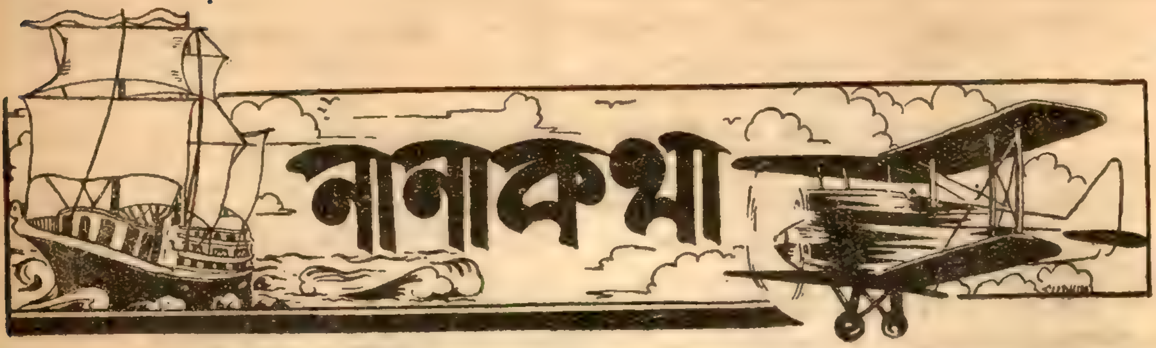


## কলিকাতায় মহাত্মা গান্ধী

সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে মহাত্মা গান্ধীর কলিকাতায় আগমনে কলিকাতাবাসীর দৈনন্দিন জীবনে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ কলিকাতায় বেশিদিন অবস্থানের তাঁর অবকাশ হোলো না, যদি হোত তবে হয়ত বাংলার বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় দলাদলির সমস্যাটা মীমাংসার পথে কতকটা অগ্রসর হ'তেও পারত। সামান্য কয়েকঘণ্টার কথাবার্ত্তায় কোনো ফলই হয়নি। মহাত্মাজীর উদ্দেশ্য ছিল, —রাষ্ট্রীয় দলাদলি ও সঙ্কীর্ণ কলহের মূল কারণটি বাঙালীর অন্তর থেকে উৎপাটিত করে দেওয়া,—কিন্তু অনেকদিন ধরে একটু একটু করে যা' অন্তরের মধ্যে শিকড় গেঁথেছে,—একদিনে তা' উৎপাটিত করার মত যাদুমন্ত্র বোধ হয় কেউ

দেশবন্ধু পার্কে মহাত্মা গান্ধী মঞ্চের উপর উঠ্‌চেন

আলোক-চিত্রক—শ্রীশম্ভূদাস চট্টোপাধ্যায়

জানেন না, মহাত্মাও না। আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মীদের যতই দোষ দিই না কেন তাদের পরস্পরের বিরোধের মধ্যে যতই লজ্জার কারণ থাকুক না কেন,—এ লজ্জা বাঙালীকে ততদিন বহন করতে হ'বে, যতদিন না পর্য্যন্ত আবার একজন দেশবন্ধুর মত নেতার আবির্ভাব বাঙলা দেশে হ'বে। অনেকে মনে করেন,—বাঙালীর মধ্যে দলাদ'ল মেটাবার জন্য একজন

দেশবন্ধু পার্কে মহাত্মা গান্ধী মঞ্চের উপর বসে বক্তৃতা দিচ্ছেন

আলোক-চিত্রক—শ্রীশম্ভুদাস চট্টোপাধ্যায়

অবাঙালী নেতার প্রয়োজন হওয়াটা বাঙালীর পক্ষে লজ্জাকর, একথা ঠিক। কিন্তু রাষ্ট্রীয় দলাদলির জন্য যে সকল কলঙ্ক বাঙালীর রাষ্ট্রীয় জীবনে ঘট্‌ল,—যার একটা চরম দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছিলাম কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচন ব্যাপারে, তা' আরও বেশি লজ্জাকর।

যা হো'ক যদিও মহাত্মা গান্ধীর কলিকাতা আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য সফল হয়নি,—তবুও আমরা যে তিন দিন তাঁকে আমাদের মাঝে পেয়েছিলাম,—তাঁর মহত্ত্ব ও পবিত্রতার সংস্পর্শে এসেছিলাম, তাঁর বাণী শুনেছিলাম,—একথা আমাদের অনেকদিন মনে থাকবে। পুণাচুক্তির প্রসঙ্গে মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে বাঙালীর মনে কিছু অভিমান আছে, একথা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু এই মহাপুরুষের প্রতি বাঙালীর যথার্থ মনোভাব কি,—তা প্রকাশ পেয়েছিল সেদিনকার দেশবন্ধু পার্কের বিরাট জনতায়, কলিকাতা কর্পোরেশনের অভিভাষণে, এবং হরিজন কার্য্যের জন্য কলিকাতায় মহাত্মাজী যে অর্থসংগ্রহ করতে পেরেছিলেন তার অঙ্কের মধ্যে।

দেশবন্ধু পার্কে গান্ধী-সন্দর্শন-প্রার্থী জনসমুদ্র

আলোক-চিত্রক—শ্রীশম্ভুদাস চট্টোপাধ্যায়

মহাত্মাজীর মহত্ত্ব বাঙালী কোনোদিন ভুলবে না, যদিও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ঘূর্ণিপাকে এবং কঠিন সমস্যাজালের মাঝখানে মহাত্মাজী বাঙালীর প্রতি তথা অন্যান্য প্রদেশবাসীর প্রতি একটু আধটু অবিচার করেও ফেলেন।

## কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ

স্বর্গীয় সার রমেশচন্দ্র মিত্র থেকে আরম্ভ করে অনেক বাঙালীই অস্থায়ীভাবে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদের যোগ্য বিবেচিত হ'য়েছেন,—কিন্তু স্থায়ীভাবে যে কেন যোগ্য বিবেচিত হননি,—তা বোঝা দুঃসাধ্য। আমরা আশা করেছিলাম, আজকালকার প্রগতির যুগে সর্ব্বজনপ্রিয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় স্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতির পদে বাঙালীর নিয়োগের পথে সংস্কারগত বাধা ঘোচাতে সক্ষম হ'বেন। কিন্তু আমাদের এ আশা পূর্ণ না হওয়ায় আমরা দুঃখিত হ'য়েছি। অস্থায়ীভাবে মন্মথবাবু যে সম্মানের অধিকারী হ'য়েছেন, আমরা তাতে খুসী হ'য়েছি বটে, কিন্তু তাঁর মত সুযোগ্য বিচারপতির পক্ষে এ সম্মান কিছু বেশি নয়।

## কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস্-চান্সেলার

সার হাসান সুরাবর্দ্দীর পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চান্সেলারের পদে স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে মনোনীত এবং নিযুক্ত ক'রে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট দেশের জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েচেন।

শ্যামাপ্রসাদের বয়ক্রম মাত্র ৩৩ বৎসর। এত অল্প বয়সে এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার এ পর্য্যন্ত আর

কেউ পাননি। কিন্তু বয়সের কথাটা শুনতে ভাল হ'লেও কতকটা অবান্তর; কারণ আসল কথা হচ্চে যোগ্যতার,—

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বয়সের ন্যূনতা সেই যোগ্যতারই প্রমাণ। যোগ্যতার বেগ দুর্দ্দমনীয় না হ'লে এত অল্প বয়সে কেউ এ পদলাভ করতে সমর্থ হন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যাপারে অতি দ্রুতবেগে শ্যামাপ্রসাদের শক্তি-সঞ্চয় লক্ষ্য ক'রে এ কথা আমরা সকলেই জানতাম যে, একদিন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হ'য়ে বসা অনিবার্য্য। সেই 'একদিন' এত শীঘ্র উপস্থিত হওয়ায় আমরা বিস্মিত হইনি, সুখী হয়েচি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরলোকগত স্যর আশুতোষের হাতে-গড়া জিনিস। তিনি এ'কে কেটেছেন, ছেঁটেচেন বদলেছেন, বাড়িয়েছেন, এ'কে নূতন মূর্ত্তি দান করেছেন, জগতের বিশ্বশিক্ষায়তনে এ'কে গৌরবের আসনে বসিয়েছেন, কিন্তু তবু তাঁর সমস্ত অভিপ্রায় সমস্ত কল্পনা শেষ করতে পারেন-নি, অনেক কিছু অপরিসমাপ্ত রেখে চ'লে যেতে হয়েচে। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তাঁর প্রতিভাশালী সুযোগ্য পুত্র তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই অনধিগত গৌরবে ভূষিত করবেন। আমরা শ্যামাপ্রসাদের অটুট স্বাস্থ্য এবং এই নবলব্ধ পদে সুদীর্ঘ অবস্থিতি কামনা করি।

গত ৮ই আগষ্ট ১৯৩৪ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কার্য্যভার গ্রহণ করেছেন।

## শ্রীযুক্ত সুশীল সেন

ভারতবর্ষীয় কোম্পানী আইন এবং বীমা-আইন সংশোধনের জন্য ভারত সরকার কর্ত্তৃক মাসিক তিনহাজার টাকা বেতনে একটি বিশেষ পদ সৃষ্টি করা হ'য়েছে,—এবং ঐ পদে কলকাতার সুবিখ্যাত এটর্ণি শ্রীযুক্ত সুশীল সেনের নিয়োগে আমরা বিশেষ সুখী হ'য়েছি; অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে আইন ব্যবসায়ে সুশীলবাবু যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, সেজন্য আমরা তাঁকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

## শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার চন্দ

বাংলাদেশের Director of Public Instruction-এর পদে শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার চন্দের নিয়োগে আমরা বিশেষ আনন্দিত হ'য়েছি। সরকারের শিক্ষা-বিভাগের এই উচ্চপদে বাঙালীর নিয়োগ এই প্রথম।

## বাঁশবেড়িয়া গ্রন্থাগারিক শিক্ষাকেন্দ্র

সুপরিচালিত গ্রন্থাগার সভ্যজগতের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। উন্নত প্রণালীতে গ্রন্থাগার

পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগারিকের গ্রন্থাগার পরিচালনা বিদ্যাটি শিক্ষা করা আবশ্যক। আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে, এমন কি ভারতবর্ষেরও কোন কোন অংশে গ্রন্থাগার পরিচালনা বিদ্যা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে; বাংলাদেশে সেরূপ কোন ব্যবস্থা নেই।

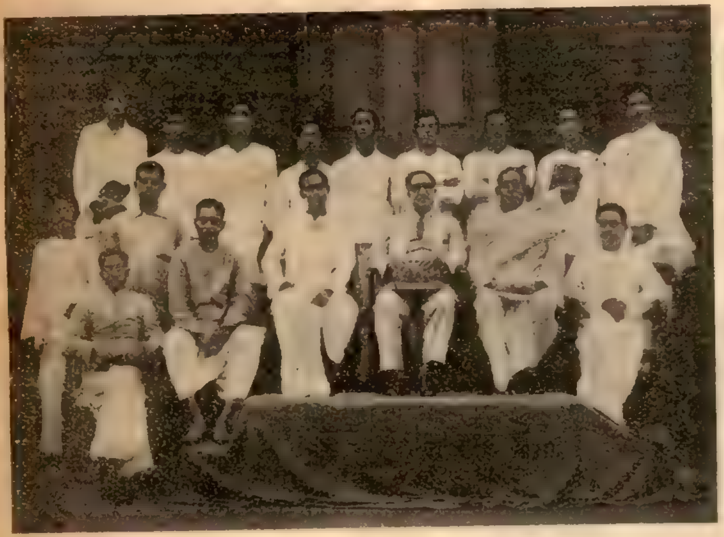

হুগলী জেলা পাঠাগার সমিতি
বাঁশবেড়িয়া গ্রন্থাগারিক শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যাপকবৃন্দ ও শিক্ষানবিশগণ

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতা কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এবং শ্রীতিনকড়ি দত্ত প্রভৃতি কর্ম্মিগণের উদ্যোগে গত জুন মাসে হুগলী জেলার গ্রন্থাগার সমিতির অধীনে হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামে মাত্র পনের দিনের জন্য বাংলাদেশে সর্ব্ব প্রথম গ্রন্থাগারিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ও বরোদায় গ্রন্থাগার পরিচালনা বিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু নামক জনৈক যুবক শিক্ষাকেন্দ্রের ভার গ্রহণ করেছিলেন। এবং কেন্দ্রের অবৈতনিক পরিচালকের পদ গ্রহণ করেছিলেন কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক।

মাত্র পনরদিনে গ্রন্থাগার পরিচালনা বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয় ব'লে শিক্ষাকেন্দ্রে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও গ্রন্থাগার পরিচালনার আধুনিক পদ্ধতি সমূহের সহিত শিক্ষার্থীগণের সাধারণভাবে পরিচয় সাধনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কেন্দ্রটিকে স্বল্পকাল স্থায়ী পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা (Experimental Scheme) হিসাবে স্থাপন করা হয়েছিল ব'লে কেন্দ্রে যোগদানের নিমিত্ত দেশের নানা স্থান হ'তে বহু শিক্ষার্থীর আবেদন পাওয়া সত্ত্বেও মাত্র এগার জনের অধিক শিক্ষার্থীর আবেদন মঞ্জুর করা সম্ভব হয় নি। উক্ত এগারজন শিক্ষার্থীর মধ্যে দুইজন এম, এ; তিনজন বি, এ; অবশিষ্ট সকলে আণ্ডার গ্রাজুয়েট ছিলেন। 'মোহনবেণু' কাগজের ভূতপূর্ব্ব পরিচালক শ্রীযুক্ত দেবীকুমার গোস্বামী এম-এ Librarian Training পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

বাংলাদেশে গ্রন্থাগারিকের কার্য্য শিক্ষা দেবার এইটিই প্রথম প্রচেষ্টা ব'লে শিক্ষাকেন্দ্র সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককেই নানা প্রকার বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়ে কার্য্য করিতে হয়েচে এবং বহু প্রকারের অসুবিধা ভোগ করতে হয়েচে। তা সত্ত্বেও কেন্দ্রের কার্য্য বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়েচে, তাই আনন্দের বিষয়। গ্রন্থাগার পরিচালনা বিদ্যাশিক্ষা করবার জন্য শিক্ষার্থিগণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছিল। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিষয় অবগত হওয়ার পর শিক্ষার্থিগণ এই বিজ্ঞানের অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছেন। শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের ফলে দেশের সর্ব্বত্র বিশেষ সাড়া পড়েছে এবং গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল ব্যক্তিই গ্রন্থাগারিকের কার্য্য শিক্ষা দেবার প্রয়োজনীয়তা গভীররূপে উপলব্ধি করেছেন। কেন্দ্রের কার্য্য শেষ হওয়া সত্ত্বেও এক্ষণে প্রায় প্রত্যহ নানা স্থান হ'তে গ্রন্থাগারিক শিক্ষাকেন্দ্র সম্পর্কে সংবাদাদি জানবার জন্য এবং শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান করবার জন্য কেন্দ্রের উদ্যোক্তাদের নিকট বহু পত্র ও আবেদন আসছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকের কার্য্য

# বৈজ্ঞানিক ভোজ

বিচিত্রার পরিচালক—

**শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র** এম্-এ, ডি-লিট্, ( প্যারিস )

প্রণীত

## পূজার পূর্ব্বে বাহির হইবে—

এবার পূজায় এই মনোহর বইখানি গল্পে, কৌতুকে, চিত্রে বাংলাদেশের বালক বালিকাদের চিত্ত হরণ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

একখানি করিয়া বই কিনিয়া ছেলেদের হাতে দিয়া তাহাদের মুখে অন্তরের হাসি ফুটাইয়া তুলুন।

### সর্ব্বত্র পাওয়া যাইবে

## প্রকাশক—বিচিত্রা নিকেতন

২৭।১ কড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

শিক্ষা দেবার জন্য সিণ্ডিকেটের এক প্রস্তাব একণে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে। ঐ প্রস্তাব যা'তে সত্বর কার্য্যে পরিণত হ'তে পারে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় উভয়েরই এক্ষণে বিশেষ তৎপরতা সহকারে চেষ্টা করা আবশ্যক।

## পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ

জার্ম্মাণীর স্বদেশ প্রেমিক রাষ্ট্রনায়ক প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গের মৃত্যুতে জগতের একজন বরেণ্য মহামানবের তিরোভাব হ'ল। হিণ্ডেনবার্গের কল্পনাশক্তি ছিল বিরাট এবং কার্য্য করবার শক্তি এবং সাহস ছিল অপরিমেয়। সেই শক্তির প্রভাবেই তিনি ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে হার হিট্লারের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হন। আমরা এই বিরাট পুরুষের পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

## ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্ঘ

বিগত ২৩শে জুলাই সোমবার এলবার্ট হলে ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্ঘের দ্বাদশ বাৎসরিক সম্মেলনের অধিবেশন হ'য়েছিল। এই অধিবেশনের একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে এবারকার কর্ম্মী-নির্ব্বাচন সকলের সম্মতিক্রমেই হ'য়েছিল, ভোট নেবার প্রয়োজন হয়নি। সভাপতির পদে 'অমৃত-বাজার পত্রিকা'র শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসুর নির্ব্বাচনে সকলেই বিশেষ রকম আনন্দিত হ'য়েছেন। বস্তুতঃ ১৯২২ সালে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা থেকে আজ পর্য্যন্ত তিনিই সঙ্ঘের প্রাণস্বরূপ হ'য়ে আছেন,—একথা একবাক্যে স্বীকার করতেই হ'বে। আমরা আশা করি তাঁর নেতৃত্বে সঙ্ঘের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি-সাধন হ'বে, এবং সঙ্ঘ তার সার্থকতার দিকে অগ্রসর হ'বে।

বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও অশান্তির যুগে সংবাদপত্র পরিচালনা যে কিরূপ দুরূহ ও বিপদ-সঙ্কুল কাজ তা সকলেই অবগত আছেন। এমন দিনে,—এই রকম সঙ্ঘের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুভূত হয়। কলিকাতার ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্ঘ,—দেশের অন্যান্য সাংবাদিক সঙ্ঘগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। এর সভ্যতালিকায় শুধুই বাংলাদেশের সাময়িক পত্রিকাগুলি নয়, ব্রিটিশ-শাসিত অন্যান্য প্রদেশের, দেশীয় রাজ্যসমূহের ও পর্ত্তুগীজ ভারতেরও অনেক সাময়িক-পত্রিকার নামও আছে। অদূর ভবিষ্যতে দেশের সমস্ত সাংবাদিক সঙ্ঘগুলির একটি বৃহত্তর সঙ্ঘের পরিকল্পনাও কর্ত্তৃপক্ষের মনে আছে।

এই সঙ্ঘের বর্ত্তমান বার্ষিক বিবরণে প্রকাশ যে দেশের প্রেস-আইনের কঠোরতার বিরুদ্ধে অভিযান পরিপূর্ণ উদ্যমেই চালানো হ'য়েছিল, যদিও এদিকে আশানুরূপ সফলতা লাভ করা যায়নি। সংবাদপত্রের তার-বার্ত্তাবহনের মূল্য বৃদ্ধির যে প্রস্তাব সম্প্রতি সরকার থেকে করা হ'য়েছে,—তার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি প্রকাশ করার ফলে উক্ত প্রস্তাব ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত মুলতুবি আছে,—এবং ইতিমধ্যে সরকারপক্ষ থেকে ভিন্ন ভিন্ন সংবাদপত্র পরিচালকদের মতামত আহ্বান করা হয়েচে। এ ছাড়া সংবাদ-পত্রের কার্য্যালয় সমূহে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের সুবিধা-অসুবিধা সুখ দুঃখের দিকে এই সঙ্ঘের দৃষ্টি আছে দেখে আমরা সুখী হ'লাম।

বিবরণে আরও প্রকাশ যে এ বৎসর সংবাদপত্র পরিচালকদের জন্য একটি ক্লাব ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হ'য়েছে। সুখের বিষয় কাশিমবাজারের মহারাজা অনারেবল শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী সমবায় ম্যান্সনের মধ্যে বিনা খাজনায় ক্লাবগৃহের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ যথাযথ ক্লাবটীকে পরিচালনার জন্য যতটা অর্থের প্রয়োজন,—ততটা অর্থসংগ্রহ এখনো করতে পারা যায়নি।

পরিশেষে বিবরণে আমরা দেখে সুখী হ'লাম যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংবাদপত্র পরিচালনা সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করার জন্য এই সঙ্ঘ চেষ্টা করছেন। এঁদের এই সকল বহুমুখী প্রচেষ্টা সফল হোক আমরা এই কামনা করি।

## মশক উচ্ছেদ সমিতি

গত কয়েক বৎসর যাবত কলিকাতায় মশার উৎপাত বৃদ্ধি ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছে। এর নিবারণের

জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের সাহায্যে একটি Mosquito Brigade Union প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। এই সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত তিনটি ছাপানো পত্র আমাদের হস্তগত হ'য়েছে। তর্ক-মীমাংসা নাম দিয়ে কথোপকথন ছলে এই পত্রগুলির মধ্যে মশক-উচ্ছেদ ও ম্যালেরিয়া নিবারণ সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা আছে। আমরা আশা করি এই পত্রগুলি সাধারণের মধ্যে এ সম্বন্ধে জ্ঞান-বিস্তারের সহায়তা করবে।

## ফ্লুয়েলিন (FLUELENE)

কলিকাতার এমিল্ মেডিক্যাল প্রোডাক্টস-এর নবাবিষ্কৃত ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের মহৌষধ এক বোতল ফ্লুয়েলিন উপহার পেয়ে ব্যবহারের পর ইহার অত্যাশ্চর্য্য উপকারিতায় আমরা বিস্মিত হয়েছি। যে তিন চারটি ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করেছিলাম সবগুলিই অতি সত্বর আরোগ্যলাভ করেছিল। কঠিন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগের সমস্ত জানা উপকরণগুলি ত এতে আছেই, কিন্তু এর প্রধান উপকরণ বহু কষ্টে এবং বহু অর্থলোভের সাহায্যে একজন সাঁওতাল কবিরাজের নিকট হ'তে প্রাপ্ত সাঁওতাল পরগণার অরণ্যের কোনো উদ্ভিৎ। জনৈক সিভিল সার্জ্জেন দুমকায় অবস্থান কালে উক্ত কবিরাজের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে অত্যাশ্চর্য্য চিকিৎসায় বিস্মিত হন, সেই কবিরাজেরই নিকট থেকে উপকরণটি সংগৃহীত। রোগের সূচনায় প্রতিষেধকরূপে, এবং রোগাবস্থায় আরোগ্যের জন্য, উভয়তই, এ ঔষধটি পরম উপকারী। আমরা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি যে, অচিরে এই ঔষধটি পরিচিতি লাভ ক'রে রোগপীড়িত জনসাধারণের অশেষ মঙ্গলসাধন করবে।

## মহিলা শিল্প-প্রদর্শনী নারী শিক্ষা সমিতি

নারী শিক্ষা সমিতির কর্তৃপক্ষের অনুরোধে সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নমুদ্রিত বিজ্ঞাপনটি আমরা প্রকাশিত করলাম।

আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর বাংলা ২৯শে ভাদ্র শনিবার, বৃহস্পতিবার শিল্প ও নানাবিধ কারুকার্য্যের অনুশীলনে উৎসাহদান কল্পে একটি মহিলা-শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হইবে। প্রদর্শনী চারদিন খোলা থাকিবে।

১। স্থান—বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন আশ্রম, ২৯৪।৩ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

২। সময়—২টা হইতে ৬টা।

৩। প্রবেশ ফিঃ পুরুষদিগের জন্য—৵০, মহিলা ও বালকদিগের জন্য—/০। ফি দ্বারে গৃহীত হইবে।

৪। ষ্টল—(নানাবিধ জিনিস বিক্রয়ের জন্য) পরিসর —৭৷০ × ৭৷০ ফুট, বাঁধান ষ্টল দুইটী বিজলী বাতী পয়েণ্ট সহ ভাড়া ৭৲ টাকা।

এই উপলক্ষে মহিলাদিগকে হস্তনির্ম্মিত নানাপ্রকার শিল্প ও কারুকার্য্য প্রদর্শনী কমিটির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা শ্যামমোহিনী দেবীর নামে ২৯৪।৩ নং আপার সারকুলার রোড (বাণী-ভবনে) পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর হইতে ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রদর্শনীর দ্রব্যাদি গৃহীত হইবে। দ্রব্যাদির দুইটি তালিকা তৎসঙ্গে প্রেরণ করিতে হইবে। প্রত্যেক জিনিষের পশ্চাতে নির্ম্মাতার নাম ও ঠিকানা ও মূল্যের টিকিট দৃঢ়রূপে লাগান না থাকিলে তাহা গ্রহণ করা হইবে না। সম্পাদিকাকে খবর পাঠাইলে তিনি লোক পাঠাইয়া কলিকাতার অধিবাসিনী মহিলাগণের নিকট হইতে প্রদর্শনীর জন্য দ্রব্যাদি আনাইতে পারিবেন।

অ না থা বি ধ বা র
সম্বল, দুঃস্থের সংস্থান, বিপদে সম্পদ, অভাবে বন্ধু।
মাসিক ।৵০ হইতে ২৲ চাঁদায় ৫০০৲ জীবন বীমা। অনূঢ়া কন্যার বিবাহের ও বিধবার জন্যে মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা।
দি স্যাঙ্গুইন ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ ৯৮।৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
কমিশনে বা বেতনে এজেণ্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যক।

কোন জিনিস নষ্ট হইবার বা হারাইয়া যাইবার আশঙ্কা নাই। প্রদর্শনী অন্তে ১৯শে সেপ্টেম্বর হইতে ২২শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে দ্রব্যাদি ফেরত লইতে হইবে, বিলম্বের জন্য নষ্ট হইলে বা হারাইলে আমরা দায়ী হইব না।

যাঁহারা প্রদর্শনীতে "ষ্টল" লইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রদর্শনী কমিটীর সম্পাদিকা মহাশয়ার নিকট নারী শিক্ষা সমিতির আপিস্ ২৯৪।৩, আপার সারকুলার রোডে আবেদন করুন। ষ্টলের ভাড়া সাত (৭৲) টাকা আবেদন পত্রের সহিত জমা দিতে হইবে।

নিম্নলিখিত বিভাগে কার্য্যের উৎকৃষ্টতা অনুসারে পারিতোষিক দান করা হইবে। মহিলাদিগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হস্ত নির্ম্মিত দ্রব্যাদির জন্য মাননীর সন্তোষের রাজা স্যর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার সহধর্ম্মিণী লেডি রাণী সাহেবার নামে একটী স্বর্ণ পদক পুরস্কার দিবেন এবং বালিকা বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট কার্য্যের জন্য অনরেবল নবাব ফারোকী সাহেবের প্রদত্ত কাপ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

(১) বয়ন—সুতী, রেশম, পশম।
(২) আলপনা—(কাগজে এবং কাঠে)।
(৩) সাধারণ সেলাই।
(৪) পশমের, সুতির জিনিস বোনা (নিটিং ও ক্রুশে)।
(৫) বেতের কাজ।
(৬) সূক্ষ্ম সূচী কার্য্য (এমব্রয়ডারী)।
(৭) কাঁথা।
(৮) মাটীর কাজ।
(৯) চরকার সূতা।
(১০) চামড়ার কাজ।
(১১) খেলনা (কাপড়ের ও কাগজের)।
(১২) চিত্রকলা।
(১৩) কাশ্মিরী কাজ (শালের কাজ)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতিদিন অপরাহ্নে শিক্ষাপ্রদ বিষয়ে বক্তৃতা ও আমোদজনক ক্রীড়াকৌতুকের ব্যবস্থা করা হইবে।

মহিলা শিল্প-প্রদর্শনী কমিটীর সম্পাদিকা—
শ্রীশ্যামমোহিনী দেবী।

নারী শিক্ষা সমিতির সম্পাদিকা—
শ্রীঅবলা বসু।
৯ই আগষ্ট, ১৯৩৪।

সহকারী সম্পাদিকা—
শ্রীপ্রতিভা সেন।
শ্রীশোভনা গুপ্ত।

## বেথুন কলেজের পুরাতন ছাত্রী তালিকা

বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়া কলেজের পুরাতন ছাত্রীবৃন্দের একটী তালিকা সঙ্কলন করছেন। এই সংবাদে আমরা বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। বঙ্গদেশের তথা প্রাচ্য-ভারতের শ্রেষ্ঠ স্ত্রীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীবৃন্দের এই তালিকা বাঙ্গালায় স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসের দিক দিয়ে বিশেষ মূল্যবান হ'বে। তা ছাড়া নূতন ও পুরাতন ছাত্রীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসম্বন্ধ স্থাপন বিষয়েও এই তালিকা সহায়তা করবে। আমরা আশা করি, কলেজের সকল পুরাতন ছাত্রীই অবিলম্বে তাঁদের নাম ধাম ও কলেজে অধ্যয়নের সন প্রভৃতি অধ্যক্ষ মহোদয়ার নিকট পাঠিয়ে তালিকাটীকে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ করবার সহায়তা করবেন।

## পরলোকগত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী

মৈমনসিংহ মুক্তাগাছার স্বনামধন্য জমীদার ও দেশপ্রেমিক ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় বিগত ৬ই শ্রাবণ ১৩৪১ রবিবারে পরলোক গমন করেছেন। কয়েকদিন জ্বর ভোগের পর তাঁর প্রাণ বিয়োগ হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স মাত্র ৫৯ বৎসর হয়েছিল।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ তাঁর নিজ অঞ্চলের সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মৈমনসিংহ নারী রক্ষা সমিতি এবং হিন্দু সভার তিনি সভাপতি ছিলেন ; এবং তাঁর নিজ হাতে গড়া মৈমনসিংহ জমিদার সভার তিনি ছিলেন সম্পাদক। দুস্থ এবং দরিদ্রজনকে সাহায্য দানকরতে তিনি কখনো পরাঙ্মুখ হতেন না। সুতরাং তাঁর মৃত্যুতে মৈমনসিংহ যে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েচে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মুক্তাগাছা জমিদার বংশ শিকার বিষয়ে খ্যাতি দীর্ঘকাল থেকে বহন ক'রে আসছে। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ সে খ্যাতির মর্য্যাদা সম্পূর্ণ রক্ষা ক'রে গিয়েছেন। তাঁর রচিত পুস্তক "শিকার কা'হিনী" শিকার বিষয়ে একটি মূল্যবান এবং উপাদেয় পুস্তক।

আমরা ব্রজেন্দ্রনারায়ণের শোকসন্তপ্ত পরিজনদিগকে আমাদের ঐকান্তিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

## আশ্বিন এবং কার্ত্তিকের বিচিত্রা

আগামী আশ্বিন মাসের বিচিত্রা ২৭শে ভাদ্র এবং কার্ত্তিকের বিচিত্রা ১৭ই আশ্বিন প্রকাশিত হবে। বিজ্ঞাপন-দাতাগণ তদনুসারে উক্ত দুই মাসের কাগজে নূতন বিজ্ঞাপন দেবার এবং পুরাতন বিজ্ঞাপনে পরিবর্ত্তনাদির ব্যবস্থা করবেন।

Edited by Upendranath Ganguly, Printed by Saratchandra Mukherjee at The Sreekrishna Printing Works
259 Upper Chitpore Road, and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.

বিচিত্রা
আশ্বিন, ১৩৪১

দিবাস্বপ্ন

শিল্পী
শ্রীনির্ম্মল গুহ

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY
Sec. No.........
Book No.........

বিচিত্রা

| অষ্টম বর্ষ, ১ম খণ্ড | আশ্বিন, ১৩৪১ | ৩য় সংখ্যা |
| --- | --- | --- |

# কাঠবিড়ালী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাঠবিড়ালীর ছানা দুটি
আঁচল তলায় ঢাকা,
পায় সে কোমল করুণ হাতে
পরশ সুধামাখা।
এই দেখাটি দেখে এলেম
ক্ষণকালের মাঝে,
সেই থেকে আজ আমার মনে
সুরের মতো বাজে।
চাঁপা গাছের আড়াল থেকে
একলা সাঁঝের তারা
একটুখানি ক্ষীণ মাধুরী
জাগায় যেমন ধারা;
তরল কলধ্বনি যেমন
বাজে জলের পাকে
গ্রামের ধারে বিজন ঘাটে
ছোটো নদীর বাঁকে,

লেবুর ডালে খুসি যেমন
প্রথম জেগে ওঠে
একটু যখন গন্ধ দিয়ে
একটি কুঁড়ি ফোটে ;
দুপুর বেলার পাখী যেমন
—দেখতে না পাই যাকে—
ঘন ছায়ায় সমস্ত দিন
মৃদুল-সুরে ডাকে ;
তেম্‌নিতরো ঐ ছবিটির
মধুরসের কণা
ক্ষণকালের তরে আমায়
করেছে আন্‌মনা।
দুঃখ সুখের বোঝা নিয়ে
চলি আপন মনে,
তখন জীবনপথের ধারে
গোপন কোণে কোণে,
হঠাৎ দেখি চিরাভ্যাসের
অন্তরালের কাছে
লক্ষ্মী দেবীর মালার থেকে
ছিন্ন পড়ে আছে
ধূলির সঙ্গে মিলিয়ে গিয়ে
টুক্‌রো রতন কত,—
আজকে আমার এই দেখাটি
দেখি তারির মত॥

শান্তিনিকেতন
২২ আষাঢ়
১৩৪১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# তান্ত্রিক সাধনা

## শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচির আবিষ্কৃত কৌলজ্ঞাননির্ণয় সম্বন্ধে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছি এবং সেটি বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত হয়েছে। এখন তান্ত্রিকধর্ম্মের গোড়ার কথায় আসা যাক্। আমাদের দেশে ধর্ম্মের তিনটি মার্গ সুপরিচিত। যথা (১) কর্ম্মমার্গ (২) জ্ঞানমার্গ (৩) ভক্তিমার্গ। এ তিন মার্গেরই উদ্দেশ্য এক—মুক্তি। কৌলধর্ম্মের চতুর্থমার্গকে শক্তিমার্গ বলা যায়। কারণ এ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য যুগপৎ ভুক্তি ও মুক্তি। কতকগুলি অলৌকিক শক্তিলাভ করাই এ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। শক্তির ধ্যানধারণা উপাসনা এই শক্তি লাভের মুখ্য উপায়।

এখন দেখা যাক্ কৌলরা কি কি "মহদাশ্চর্য্যকারকম্" শক্তি অর্জ্জন করতে ব্রতী হয়েছিলেন।

(১) অনিমাদি গুণ (২) দূরাৎ দর্শন (৩) দূরাৎ শ্রবণ (৪) মৃতকোত্থাপন। (৫) পরকায় প্রবেশন (৬) প্রতিমা-জল্পনা (৭) ঘটপাষাণ স্ফোটন (৮) রূপাদি পরিবর্ত্তন (৯) আকাশ-ভ্রমণ (১০) চণ্ডবেগ (১১) জরামরণ নাশন (১২) যোগিনী-মেলন।

এসব শক্তি লাভ করবার লোভ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক; আর এর মধ্যে কতকগুলি শক্তি লাভ করা মানুষের সাধ্যাতীত নয়।

আমরা এ যুগে যাকে বিজ্ঞান বলি তার সাধনার প্রসাদে এর মধ্যে অনেকগুলি শক্তিই আজ মানবের করায়ত্ত, যথা :—

(১) দূরশ্রবণ (Telephone, Radio)

(২) দূরদর্শন (Telescope, tele-vision)

(৩) প্রতিমা জল্পন (Talkie)

(৪) পাষাণ স্ফোটন (Dynamite)

(৫) আকাশভ্রমণ (Aeroplane)

(৬) চণ্ডবেগ (Motor)

(৭) জরানাশন (Monkey-gland)

(৮) মৃতকোত্থাপন (Soviet ডাক্তার করেছেন), তবে আজ পর্য্যন্ত পরকায়-প্রবেশনের কৌশল কোনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন নি, সম্ভবতঃ কখনও করবেন না। কারণ এ যুগে পরের দেহে প্রবেশ করবার লোভ আমাদের নেই।

তান্ত্রিকদের সঙ্গে বৈজ্ঞানিকদের প্রভেদ এই যে, উভয়ে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করেছেন। বৈজ্ঞানিকদের উপায় হচ্ছে যন্ত্র ও তান্ত্রিকদের মন্ত্র। বৈজ্ঞানিক ও তান্ত্রিক উভয়েরই কারবার প্রকৃতি নিয়ে। তান্ত্রিকরা চেয়েছিলেন "পরা-প্রকৃতিকে" বশ করতে আর বৈজ্ঞানিকরা বশ করেছেন অপরা প্রকৃতিকে। এখন তান্ত্রিক সাধনার সংক্ষেপে পরিচয় দেব।

২

এ সাধনার প্রথম পদ হচ্ছে যোগাভ্যাস। যোগ কথাটা আমাদের অভিধানে বহুকাল থেকেই আছে। কিন্তু এ কথাটার অর্থ কি? বহু শাস্ত্রে যোগের নানারূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এক গীতাতেই নানাবিধ যোগের উল্লেখ আছে। এস্থলে আমি কালিদাসের একটি বাক্য উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। কালিদাস শিবের উদ্দেশে বলেছেন যে

যোগিনো যং বিচিন্বন্তি ক্ষেত্রাভ্যন্তর বর্ত্তিণম্।
অনাবৃত্তি ভয়ং যস্য পদমাহু মনীষিণঃ॥

(কুমারসম্ভব ষষ্ঠসর্গ, ৭৭ শ্লোক)

এই শ্রেণীর যোগীদের বোধ হয় সেকালে রাজযোগী বলত। কারণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে রাজগুহ্যযোগের উপদেশ দিয়ে শেষ কথা বলেছেন—

"মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু"

(গীতা নবম অধ্যায়)

পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্রেও এ জাতীয় যোগের উল্লেখ আছে। "ঈশ্বর প্রণিধানাৎ বা"—এ সূত্রের সাক্ষাৎ যোগদর্শনেই পাওয়া যায়।

কোন কোনও ব্যক্তি যে ঈশ্বর প্রণিধান করতে পারেন—এ কথায় আমি বিশ্বাস করি। ইংরেজীতে এঁদেরই বলে mystics, আর mysticism আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কেন সে কথা পরে বলব।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আদেশ করেছেন, "মন্মনা ভব", অপরপক্ষে তন্ত্রশাস্ত্রে বলে "উন্মনা ভব"। সম্ভবতঃ কথাটি বৌদ্ধদের কল্পিত। কারণ বৌদ্ধরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না। তাই তাঁরা একের স্থানে শূন্য বসিয়েছেন। বর্ত্তমান যুগে যাঁরা ঈশ্বর মানেন না, কিম্বা লজিক যাঁদের মানতে বারণ করে, তাঁরা "মন্মনার" বদলে উন্মনা কথাটা গ্রাহ্য করতে পারেন। উন্মনা হওয়ার অর্থ উর্দ্ধ চৈতন্যে আরোহণ করা। মানুষের অন্তরে যে অধঃ চৈতন্য আছে তা আমরা আজকাল সকলেই মানি; এর থেকে অনুমান করা যায় উর্দ্ধচৈতন্য বলেও মনের একটা উপরের ধাপ আছে। আর আমরা যে মনোভাবকে æsthetic ও religious বলি সে সবই এই লোকেরই বস্তু। আর সে সব মনোভাবই উর্দ্ধমূল অবাঙশাখ। এই কারণে তন্ত্রশাস্ত্রের উন্মনা কথাটি যেমন চমৎকার তেমনি সত্য। এ যোগের সাধনের উপায় হচ্ছে ধ্যান।

৩

এখন কালিদাসের আর একটি বচন উদ্ধৃত করে দেওয়া যাক্। শিবের বিষয় তিনি বলেছেন যে,—

"অণিমাদি গুণোপেতমস্পৃষ্ট পুরুষান্তরম্।"

অর্থন শিব ব্যতীত অপর কোনও পুরুষের অর্থাৎ জীবের যে শক্তি নেই, সেই শক্তি অর্জ্জন করাই তান্ত্রিক সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং এই সব অসাধ্য সাধন করবার অন্যতম উপায় হচ্ছে হঠযোগ অভ্যাস।

এই হঠযোগ ব্যাপারটা হচ্ছে ব্যায়াম। এ ব্যায়াম যুগপৎ শরীরের ও সূক্ষ্ম শরীরের। সূক্ষ্ম শরীর বস্তুটি কি জানিনে। হয়ত তা মনেরই একটা অঙ্গ, অর্থাৎ মন হচ্ছে সূক্ষ্ম শরীরের একটা বিকার। এ Gymnastics সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য নেই, কারণ এ দেহতত্ত্ব আমি জানি নে। কারণ এক্ষেত্রে আমি কোনরূপ মেহনত করিনি।

তবে এই পর্য্যন্ত বলতে পারি যে, কালিদাস যে যোগের কথা উল্লেখ করেছেন—তাতেও সিদ্ধিলাভ করা কতকগুলি ক্রিয়া সাপেক্ষ ছিল। গীতার পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে সে সব প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে। আমি এস্থলে গীতার শুধু একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"স্পর্শান কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাং শ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ
প্রাণাপানৌ সমৌ, কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ"
(গীতা ৫ অধ্যায় ২৭ শ্লোক)

এই প্রাণায়াম আর চোখ ভ্রূমধ্যে নিবিষ্ট করাই হচ্ছে হঠযোগের আদি প্রক্রিয়া। আর এ সব শারীরিক ক্রিয়া যে, যোগ-সাধনের সহায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রাণায়াম যে, যোগের মূল প্রক্রিয়া তার প্রমাণ ইড়া ও পিঙ্গলা হচ্ছে প্রাণবায়ুর গমনাগমনের বাম ও দক্ষিণ পথ। ও সুষুম্না হচ্ছে একটি কাল্পনিক মধ্যপথ, যে পথ দিয়ে প্রাণ মস্তিষ্কে আরোহণ করে অর্থাৎ মনে পরিণত হয়। মন যে প্রাণেরই বিকার, একথা ইউরোপের কোনও কোনও বড় দার্শনিকের মুখেও শুনতে পাই। Elanvital নামক কথাটা কি উক্ত মতের বর্ত্তমান সংস্করণ নয়? সে যাই হোক্ বায়ুর্ব্বেদে আমার অধিকার নেই অতএব সে বেদ সম্বন্ধে আর বাচালতা করব না।

অবশ্য হঠযোগ আরও নানারূপ প্রক্রিয়ার উল্লেখ করেছে। কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে দেখ্‌তে পাই—

"মাসেন জিতযেন্মৃত্যুং সত্যং সত্যং মহাতপে।
রসনা তালুমূলেতুকৃত্বা বায়ুং পিবেচ্ছনৈ॥

এ সব কথা শুনে আমার মনে খট্‌কা লাগে। যাঁর তা লাগে না তিনি রসনাকে কুঁচিমোড়া ভাঙ্গিয়ে তালুমূলে নিবিষ্ট করে দেখুন; এক মাসের মধ্যে অমর হন কি না।

৪

তান্ত্রিকদের সাধনার দ্বিতীয় পদ হচ্ছে মন্ত্রজপ। এই কারণে তান্ত্রিক সাধকেরা মন্ত্রী নামেও অভিহিত। মন্ত্রশক্তিতে

বিশ্বাস এ দেশে অবশ্য সনাতন ও সর্ব্ব-সাধারণ। বেদ আমি জানিনে কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্র ত জানি। আর শুনতে পাই যে গায়ত্রী হচ্ছে বেদমাতা। আর গায়ত্রী মন্ত্রকে কি কোনও হিন্দু কখনও নির্বির্য্য মনে করেছে? আর এক কথা, যে দার্শনিক দল বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মকে rationalism এর ভিত্তির উপর খাড়া করতে চেয়েছেন সেই মীমাংসকেরা কি দেবতাদেরও মন্ত্রাত্মক বলেন নি? এমন কি তন্ত্রশাস্ত্রেও গায়ত্রী মন্ত্র যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র তা স্বীকৃত হয়েছে। এখন তন্ত্রমতের সঙ্গে বৈদিক মতের প্রভেদ কি? আমার বিশ্বাস মন্ত্রোদ্ধার করা ও মন্ত্রচৈতন্য উদ্রেক করাই হচ্ছে তান্ত্রিক সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। মন্ত্রোদ্ধারের অর্থ হচ্ছে মন্ত্রের অর্থ উদ্ধার আর মন্ত্রচৈতন্যের অর্থ হচ্ছে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার জ্ঞানলাভ। কি করে মন্ত্র উদ্ধার করতে হয় আর কি করে মন্ত্র-চৈতন্য জাগ্রত করতে হয় তার বিবরণ তন্ত্রশাস্ত্রেই আছে।

ভাষারও যে একটি শক্তি আছে একথা আমিও মানি, কারণ সকলেই মানতে বাধ্য। আমরা যাকে সাহিত্য বলি, পলিটিকস্ বলি, তার অন্তরে সর্ব্বপ্রধান শক্তি কি কথার শক্তি নয়? কিন্তু সে শক্তির ক্ষেত্র হচ্ছে মনোজগতে। কিন্তু কোন একটি শব্দসমষ্টির অন্তরে electricityর মত যে অদ্ভুত শক্তি আছে তা আমরা কেউ বিশ্বাস করিনে। মন্ত্র অসিদ্ধ প্রমাণাভাবাৎ। মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি কৌলমতে মন্ত্রের দ্বারাই সাধিত হয়। মন্ত্রের এইরূপ অলৌকিক শক্তি শব্দের অর্থের উপর নির্ভর করে না, করে শব্দসমষ্টির উপর। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে কবজ, তাবিজ মাদুলির শক্তিতে কৌলরা বিশ্বাস করতেন। কারণ এইসব তাবিজ, মাদুলির অন্তরে তাঁরা মন্ত্রগর্ভ ভূর্জ্জপত্র পূরে দিতেন। শব্দব্রহ্মের এরূপ পরিণতি অথবা উন্নতি আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর। মন্ত্রবলে কৌলেরা নানারূপ অসাধ্য সাধন করতে চেয়েছিলেন,—যে চেষ্টা আমার বিশ্বাস সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়েছে। কথায় জড়জগৎকে বশ করা যায় না, জয় করাও যায় না। প্রকৃতি শুধু অন্ধ নন, বধিরও বটেন।

৫

তান্ত্রিকদের হাতে পড়ে মন্ত্র সব বীজমন্ত্র হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ ভাষার শক্তির অপেক্ষা অক্ষরের শক্তি বেশি প্রবল বলে গণ্য হয়েছিল। অর্থাৎ ভাষার moleculeএর চাইতে তার atomএর শক্তিই প্রাধান্য লাভ করেছিল।

এই অক্ষরের শক্তিকে আমরা বৈদিক যুগ থেকে বিশ্বাস করে আসছি। আমাদের ধর্ম্মে ওঁ-এর চাইতে বড় ধ্বনি নেই। আর ওটি হচ্ছে আদি-অনাদি-বীজমন্ত্র। কৌল-জ্ঞাননির্ণয়ে অকার থেকে হকার পর্য্যন্ত—বর্ণমালার সকল অক্ষরের মাহাত্ম্যের উল্লেখ আছে। ওঁ যেমন বৈদিক ধর্ম্মের মূল শব্দ, বোধ হয় "হুম্" হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম্মের তাদৃশ মূলমন্ত্র। আর হুম্‌ও বহুকাল থেকে প্রচলিত আছে। "ওঁ মণিপদ্মে হুম্" এই মন্ত্রের দিব্যাবদানে সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আর আপনি জানেন দিব্যাবদান কালকের বই নয়। এ দুই ধ্বনি হয়ত প্রাণায়াম থেকে উদ্ভূত হয়েছে। জনৈক বন্ধুর মুখে শুনেছি নিশ্বাস টানতে হলে ওঁ উচ্চারিত হয় আর ফেলতে হলে "হুম্"। এস্থলে একটি কথা বলে রাখি, অক্ষর সব যুগেই সব দেশেই একটি মহা আবিষ্কার হিসেবে গণ্য হয়েছে। সংখ্যার আবিষ্কার চাইতেও অক্ষরের আবিষ্কার কোন হিসেবেই কম আশ্চর্য্যজনক নয়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক বলেছেন যে, "The forms of mathematical expressions must be regarded as discoveries of fundamental importance; the alphabet is a symbolic discovery of similar type, whose importance likewise cannot be over-estimated" এই কারণেই তান্ত্রিকরা অক্ষরকে সর্ব্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করতেন।

তান্ত্রিকরা আবিষ্কার করেছিলেন যে ব্যঞ্জনবর্ণ বীজ, স্বরবর্ণ শক্তি ও বিসর্গ কীলক অর্থাৎ গোঁজ। এর অর্থ কি বুঝলেন? তার উপর বিন্দু অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু ত আছেই—আর রেফে নাকি বীজমন্ত্র দীপিত হয়। ফলে বীজমন্ত্রের নমুনা হচ্ছে শ্রীং হ্রিং ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ যাকে হিং টিং ছট্ বলেন তা আসলে হ্রিং ট্রিং ফট্। কারণ রেফদীপিত না হলে, বীজমন্ত্র দীপিত হয় না। আর ফট্ বষট্ স্বধা স্বাহা প্রভৃতি অর্থহীন শব্দ বৈদিক। ও সব হোমের ভাষা। এই বীজ মন্ত্রের প্রধান গুণ এই যে এ মন্ত্র অনায়াসে কণ্ঠস্থ

করা যায়। এবং সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরও এ মন্ত্রে অধিকার আছে। আর পূর্ব্বে বলেছি যে, এ ধর্ম্ম হয়ত অবৈদিক সমাজে প্রচারিত হয়।

এ ছাড়া অবশ্য তন্ত্রশাস্ত্রে নানারূপ মণ্ডলের বর্ণনা আছে। সে সবের আর উল্লেখ করব না। তাহলে এ পত্র প্রকাণ্ড প্রবন্ধ হয়ে উঠবে। সংক্ষেপে বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, পাটীগণিতের প্রথম ন সংখ্যা ও জিয়োমেট্রির ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, বৃত্ত প্রভৃতির অন্তরে তাঁরা নানা প্রচ্ছন্ন শক্তির আবিষ্কার করেছিলেন, আর তাদেরই সাধনা করতেন। শুধু অক্ষরের অন্তরে নয়, রেখাবদ্ধ খণ্ড আকাশের অন্তরেও তাঁরা জমাট শক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। এ একরকম New Physicsএর বৈমাত্র দাদা। তান্ত্রিকরা দেহস্থ শক্তিবিন্দুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, বৈজ্ঞানিকেরা পেয়েছেন বহিস্থ শক্তিবিন্দুর। আমরা এ বিশ্বের বীজ উদ্ধার করলে দেখতে পাই বাইরেও বিন্দু—ভিতরেও তাই, অর্থাৎ শূন্য।

৬

তান্ত্রিকরা alchemyরও চর্চ্চা করতেন। তাঁরা যে রূপোকে সোনাতে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করেছিলেন শুধু তাই নয়। দ্রব্যগুণের সাহায্যে মৃত্যুকেও জয় করতে চেষ্টা করেছিলেন।

মীনভাষিত "অকুলবীর" তন্ত্রে দেখ্‌তে পাই যে নানা শ্রেণীর সিদ্ধ ছিলেন, যথা—"পাতাল-সিদ্ধ" "রসায়ন-সিদ্ধ" ইত্যাদি। পাতাল-সিদ্ধ বল্‌তে কি বোঝায় তা জানিনে। কুলার্ণবের জলে আমি নেমেছি বটে, কিন্তু সে হাঁটু পর্য্যন্ত, "ডুবেছি না ডুব্‌তে আছি দেখি পাতাল কতদূর" এ দৃঢ় সঙ্কল্প করে নয়। তবে আমার বিশ্বাস "রসায়ন-সিদ্ধ" বল্‌তে alchemistই বোঝায়। সিদ্ধ নাগার্জ্জুন ত প্রসিদ্ধ alchemist। তাঁর কীর্ত্তিকলাপের লম্বা বর্ণনা কথাসরিৎ-সাগরে আছে। তিনি নাকি এমন একটি "সিদ্ধ রসায়ন" বানিয়েছিলেন যা খেলে মানুষ অমর হত। ইউরোপের alchemistরাও Elixir of Life বানাতে চেষ্টা করতে ত্রুটি করেননি। কিন্তু কৃতকার্য্য হননি। নাগার্জ্জুন এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েছিলেন। কিন্তু সে "সিদ্ধরস" তাঁর কোনও কাজে লাগেনি।

বিভীষণ, অশ্বত্থমা প্রভৃতি যে আজও ভূভারতে পর্য্যটন করছেন, সে নাগার্জ্জুনের রসামৃত খেয়ে নয়।

বিলেতি alchemistদের প্রধান কারবার ছিল পারা নিয়ে; আমাদেরও দেশের সিদ্ধরাও ঐ না-স্থূল না-তরল ধাতুর অন্তরেই নানা শক্তির সন্ধান করেছিলেন। পারদ দর্শন বলে এ দেশে একটা দর্শনও আছে।

অবশ্য এঁদের সাধনা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। এদেশে এঁদের researchএর ফলে নানারূপ নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে। ইউরোপেও ঠিক তাই হয়েছিল। ইউরোপের সর্ব্বাগ্রগণ্য alchemist সম্বন্ধে একজন বড় ডাক্তার লিখেছেন:—

"of Panacelsus (1493—1541) it is enough to say that inspite of the fantastic life he led, the list of discoveries assigned to him in chemistry and general medicine is astonishing. He discredited Galen whose medicines were largely from the plant-world, and introduced the use of metals such as, mercury, calomel, iron, antimony and others. (Science Today. P. 62)

এখন বৈদিক ঔষধ ও তান্ত্রিক ঔষধের প্রধান প্রভেদই এই যে বৈদিক ঔষধের মূল উপকরণ হচ্ছে ওষধি ও তান্ত্রিক ঔষধের ধাতু যথা পারদ, লৌহ ইত্যাদি। আমাদের শাস্ত্রে বলে রোগ প্রশমনের তিনটি উপায় হচ্ছে মণি, মন্ত্র, ওষধি। এস্থলে মণির অর্থ বোধহয় minerals অথবা metals।

৭

হঠযোগ, মন্ত্রজপ, মণ্ডল, অঙ্কন, alchemy অর্থাৎ রসায়ন, এই সকলই হচ্ছে তান্ত্রিক সাধনার মাল মসলা। আর এ সকল প্রয়াসের মূলে আছে অলৌকিক শক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা।

হঠযোগের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মশক্তি উদ্ধার করা। মানুষের দেহাভ্যন্তরে যে অঘটনঘটনপটিয়সী শক্তি সুপ্ত

আছে, সেই শক্তিকে জাগ্রত করতে পারলেই সাধক যে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করবেন, সে বিষয়ে কৌলদের মনে কোন সন্দেহ ছিলনা।

প্রাণায়ামই হচ্ছে যোগের আদি প্রক্রিয়া। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারলেই যে প্রাণকে বশীভূত করা যায়, এই ছিল যোগীদের ধারণা। এই কারণেই ইড়া পিঙ্গলা নামক প্রাণবায়ুর যাতায়াতের পথের এত মাহাত্ম্য। আর সুষুম্না হচ্ছে "মন পবনের" আরোহণের যোগীদের কল্পিত পথ। এই পৃষ্ঠ দণ্ডের সুরঙ্গ দিয়ে যা উপরে ওঠে তাকে মনোপবন বলা হয়েছে। আর মন জিনিষটে আগেই বলেছি যে প্রাণেরই একটি বিশেষ বিকার, এ যুগের ইউরোপীয় দার্শনিকরা তা আবিষ্কার করেছেন। আর প্রাণ যে দেহস্থ তা সর্ব্ববাদীসম্মত। সুতরাং তান্ত্রিকদের মতে প্রাণকে বশীভূত করতে পারলে মনকেও বশীভূত করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ মন্ত্রজপের উদ্দেশ্য মন্ত্রশক্তির দ্বারা নানা-জাতীয় স্ত্রী দেবতা উপদেবতা ও অপদেবতার বশীকরণ। এখন এই সব উপদেবতা ও অপদেবতার নামরূপের আর বর্ণনা করব না। কাকিনী থেকে আরম্ভ করে হাকিনী পর্য্যন্ত সর্ব্ব অক্ষরের আশ্রয়ে তাদের নামকরণ করা হয়েছে। আর, রূপ তাঁদের মনোহারী নয়, ভীতিপ্রদ। ফলে তাঁদেরই ভয়ে মন্ত্রগর্ভ কবচ ধারণ, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বীজমন্ত্রের ন্যাস প্রভৃতি তান্ত্রিক সাধনের আত্মরক্ষার উপায় স্বরূপে গণ্য হয়েছিল।

নিরাকার অসীম আকাশকে সাকার সসীম আকাশে পরিণত করবার উদ্দেশ্যে ত্রিকোণাদি মণ্ডলাদি স্থাপন। তান্ত্রিকরা সব ছিলেন Einsteinএর শিষ্য। তাঁরা absolute spaceয়ে বিশ্বাস করতেন না, করতেন relative spaceয়ে, কারণ রেখাবদ্ধ হলেই শক্তি সংহত হয়। তান্ত্রিকরা একে বলতেন "দিগ্‌বন্ধন"। এবং অগ্রগ (horizontal) এবং উদগ্রগ (perpendicular) রেখার সাহায্যেই তাঁরা নিরাকার আকাশকে সাকার করতেন। এ হচ্ছে আসলে রেখাক্ষরের সাধন। এই সব মণ্ডলকে তান্ত্রিকরা যন্ত্র বলতেন। অর্থাৎ তান্ত্রিকদের যন্ত্র মন্ত্রেরই রেখাক্ষরে রূপান্তর মাত্র। অবশ্য সব রেখারই আদি হচ্ছে বিন্দু, অন্তও তাই। এই কারণেই তন্ত্রশাস্ত্রে বিন্দুর এত প্রাধান্য।

৮

তাঁরা বিশ্বাস করতেন বিশ্বের ধাতু এক। আমাদের মামুলি পঞ্চভূতও নয় বিলেতের ৯২ elementsও নয়। ফলে তাঁরা আপাতঃদৃষ্টিতে বিভিন্ন ধাতুকে এক ধাতুতে পরিণত করাকে বলতেন, রসায়ন সিদ্ধি। অবশ্য তাঁরা রূপোকে সোনা করতে চেয়েছিলেন, সোনাকে রূপো করতে নয়।

ছেলেবেলায় ঠাকুরদেব মুখে শুনেছি যে—

"বনমানুষের হাড়ে হাড়ে গুণ
সে নুনকে বানায় চুণ, আর চুণকে বানায় নুন।"

বনমানুষের হাড়ের এই গুণ আছে কিনা জানিনে। কিন্তু শ্বেতমানুষের হাতে এ বিদ্যা আছে তা সকলেই জানেন, তাঁরা alchemical না হোক chemical-gold বানিয়েছেন। বিশ্বে যে ৯২টি আদিভূত আছে এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। সম্ভবতঃ hydrogenই হচ্ছে আদিভূত, বাকী কটি তার বিকার মাত্র। মানুষকে হয় সব ধাতুকে এক ধাতুতে পরিণত করতে হবে নয়ত তাদের সংখ্যা বাড়াতে হবে। ইতিমধ্যেই শুনছি ইতালির কোন বৈজ্ঞানিক একটি নূতন ধাতু নির্ম্মাণ করেছেন। ফলে ধাতুর সংখ্যা এখন ৯২ থেকে ৯৩ হয়েছে। ধাতুর ধাৎ বদলানো এখন মানবশক্তির অতীত নয়। এ যুগের বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন যে বিশ্বে substance বলে কোনও পদার্থ নেই। যা আছে সে শুধু অর্থ। যা নেই তাকে আমরা যা খুসী তাই রূপ দিতে পারি।

মুদ্রাও ছিল তান্ত্রিক সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। মুদ্রা হচ্ছে কণ্ঠের নয় করের ভাষা। আর এ ভাষার মূলে আছে করলিপি। এ ভাষায় নর্ত্তক নর্ত্তকীরাও তাঁদের মনোভাব দর্শকদের কাছে প্রকাশ করেন, আর তান্ত্রিকরা তাঁদের মনোভাব দেবদেবীর কাছে প্রকাশ করতেন।

৯

কুলার্ণবের মতে—

"গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিঞ্চ মন্ত্রে চাক্ষর বুদ্ধিকম্।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্ব্বানে নরকং ব্রজেৎ।"
(দ্বাদশ উল্লাস ৪২।)

অতএব এ শাস্ত্র আমার জন্যে নয়। আমি সহজ মন নিয়ে তন্ত্রশাস্ত্র পড়েছি আর সহজ ভাবে যা বুঝেছি তাই উপরে বললুম। Magic-য়ে আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু সে বিজ্ঞানের, তন্ত্রশাস্ত্রের নয়। যন্ত্রশক্তিতে আমি বিশ্বস্ত কিন্তু তান্ত্রিকদের "যন্ত্র মন্ত্র" শক্তিতে নয়। তন্ত্রশাস্ত্র ধর্ম্ম হ'তে পারে কিন্তু বিজ্ঞান নয়, আর যদি বিজ্ঞান হয়ত আরব্য উপন্যাসের দেশের। তবে এ কথাও সত্য যে পৃথিবীতে এমন কোনও ধর্ম্ম নেই যার অন্তরে তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতির অল্পবিস্তর সাক্ষাৎ না পাওয়া যায়। নিষ্ক্রিয় কর্ম্মও নেই ধর্ম্মও নেই। আর ক্রিয়া মাত্রই ক্রিয়াশক্তির প্রয়োগ। আর মানুষের সকল চেষ্টার মূলে আছে তার আত্মশক্তির উদ্বোধন আর প্রয়োগ। তান্ত্রিকরা মন্ত্র পড়ে অবশ্য মানুষকে অতিমানুষ করতে পারেন নি, কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা যন্ত্র গড়ে মানুষকে অতিমানুষ ক'রে তুলেছেন, না অমানুষ ক'রে ফেলেছেন? আর যদি ধরেই নেওয়া যায় যে বিজ্ঞান মানুষকে অতিমানুষে পরিণত করেছে, ত সে শুধু বাহুবলে, আত্মবলে নয়। সে যাই হোক যে সাধনার বলে মানুষ তার লৌকিক মানবশক্তিকে অতিক্রম করতে চায়, সে প্রচেষ্টাকে আমি সম্পূর্ণ নিষ্ফল মনে করিনে। কারণ এই সাধনাই প্রমাণ যে মানুষ মনে করে যে তার পরিচিত তুচ্ছ মানবতার লৌকিক গণ্ডী অতিক্রম করা সম্ভব। আর তান্ত্রিকরা যাকে সাধন বলতেন সে প্রক্রিয়া হচ্ছে experiment। এখন তাঁরা শরীর ও মন নিয়ে যে experiment করেছেন, তা যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়েছে, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। উক্তরূপ সাধনার ফলে তাঁরা হয়ত নিজ নিজ দেহ-মনের উপর অসাধারণ প্রভুত্ব লাভ করেছিলেন। কিন্তু মন্ত্র জপ করে যে তাঁরা জড় প্রকৃতির উপর জয়ী হয়েছিলেন, এ কথায় আমি মোটেই বিশ্বাস করিনে।

তবে এ যুগের কোনও কোনও মহা-বৈজ্ঞানিক যে বিশ্বাস করেন তার প্রমাণ স্বরূপ প্যারিস বিশ্বালয়ের গণিত-শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক Le Roy-এর কটি কথা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তিনি বলেছেন :—

Une Causalité efficace jusqu' au sein du physique আছে। (Le Problème de Dieu par. Le Roy p 311) একটি কথার অর্থ হচ্ছে prayer (মন্ত্র?) শক্তি জড় উপরও কার্য্যকরী।

উক্ত গণিত শাস্ত্রীর একথা শুনে আমার মন ডিগবাজী খায় না। শাস্ত্রে বলে অঙ্কস্য বামাগতি। আর সম্ভবতঃ অঙ্কশাস্ত্রীদের মতিরও বামা গতি। শুধু ফরাসী কেন, ইংলণ্ডের অনেক বিজ্ঞানাচার্য্য Jeans বলেছেন যে বিশ্ব তেরিজ বারিজ দিয়ে গড়া—আর ভগবান হচ্ছেন একমেবা-দ্বিতীয়ং অঙ্কশাস্ত্রী। এর থেকে প্রমাণ হয় যে বহির্জ্জগৎ যে আত্মশক্তির অধীন এ বিশ্বাস এ যুগের বিজ্ঞানাচার্য্যরা হারাননি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

# অভিজ্ঞান

## উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

### ১৯

বেড্‌ সুইচ টিপে ঘর আলোকিত ক'রে পার্শ্ববর্তী নিদ্রিত স্বামীর গা নাড়া দিয়ে সবিতা ডাক্‌লে, "ওগো, ওগো, শুনছ ?"

ধড়মড় ক'রে শয্যার উপর উঠে ব'সে উৎকণ্ঠিত স্বরে প্রকাশ বল্‌লে, "কি ?"

অবরুদ্ধ স্বরে সবিতা বল্‌লে, "অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? চোর ডাকাত নয়। তুরৎ সিং বল্‌ছে, কে একজন মেয়েমানুষ কল্‌কাতা থেকে এসেছে।"

"মেয়েমানুষ ? কোথায় ?"

"কি আশ্চর্য্য। কোথায় আবার ? আমাদের বাড়ি।"

তুরৎ সিং বাইরের বারান্দা থেকে প্রভু এবং প্রভুপত্নীর কথোপকথনের মৃদু গুঞ্জন শুনতে পেয়ে প্রকাশ জাগ্রত হয়েচে বুঝ্‌তে পেরে কপট কাশির শব্দ ক'রে নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করলে।

প্রকাশ ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলে, "তুরৎ সিং।"

"হুজুর।"

"কিয়া হায় ?"

"হুজুর, এক্‌ঠো মায়ী লোক কলকত্তে সে আয়ী হৈঁ।"

"কাঁহা হৈঁ ?"

"বরন্দে পর খড়ী হৈঁ।"

'কলকত্তে সে আয়ী হৈঁ'—এ তুরৎ সিংএর অনুমানের কথা, কেউ তাকে বলে নি। বহুদর্শিতার ফলে সে জানে যে, রাত চারটার সময় রেল থেকে কেউ এলে কলিকাতা থেকেই এসে থাকে ;—এ স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপারে অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন।

তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ ক'রে হল ঘর পেরিয়ে এসে ঔৎসুক্যের সহিত দোর খুলে প্রকাশ দেখ্‌লে সিঁড়ির নিকট বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে একটি স্ত্রীলোক, এবং তার নিকটেই নিম্নে গাড়ি-বারান্দায় একজন পুরুষ। কম্পাউণ্ডের প্রান্তে রাজপথে একটা মোটারের অস্তিত্ব এঞ্জিন চলার মৃদু ধক্‌ ধক্‌ শব্দে বোঝা যাচ্ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে সবিতাও স্বামীর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

প্রকাশ এবং সবিতা আবির্ভূত হ'তেই ইয়াসিন্‌ সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করলে, "ঠিক চিন্‌তে পাচ্ছেন ? এঁরাই ত ?"

তুরৎসিং পূর্ব্বেই বারান্দার বিজলী-বাতি জ্বেলে দিয়েছিল, সুতরাং ভাল ক'রে দেখ্‌তে পাওয়ার পক্ষে কোনো অসুবিধা ছিল না। মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বল্‌লে, "হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, তা হ'লে এখন আসি,—নমস্কার।" ব'লে যুক্তকরে সন্ধ্যাকে নমস্কার করে ইয়াসিন্‌ ত্বরিতপদে অন্তর্হিত হ'ল, এবং পর মুহূর্ত্তে বিকট শব্দ ক'রে রাজপথের মোটারকার দ্রুতবেগে প্রস্থান করলে।

সবিতা সন্ধ্যার কাছে এগিয়ে এসে বল্‌লে, "আপনি কে, চিন্‌তে পারছিনে ত।"

"চিন্‌তে পারছনা সবি দিদি, পোড়ারমুখীকে চিন্‌তে পারছনা ?" ব'লে সন্ধ্যা একেবারে ঝাঁপ দিয়ে সবিতার দেহের উপর প'ড়ে দু হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলে।

তাড়াতাড়ি এক হাতে সন্ধ্যাকে জড়িয়ে ধ'রে অপর হাত দিয়ে তার মুখ আলোর তুলে ধ'রে দেখে গভীর বিস্ময়ে সবিতা ব'লে উঠ্‌ল, "ওমা, ওমা, সন্ধ্যা যে! তুই কোথা থেকে এলি রে সন্ধ্যা ? তুই কোথা থেকে এলি ?"

কিন্তু সন্ধ্যার তখন সবিতার প্রশ্নের উত্তর দেবার মত অবস্থা একেবারেই ছিল না,—তার মুখ হয়ে গিয়েছিল পাংশু, চোখ আসছিল বুজে, দেহ আসছিল এলিয়ে।

"ওগো, ওগো, শীগ্‌গির ধর, সন্ধ্যা প'ড়ে যাচ্ছে।" ব'লে সবিতা সন্ধ্যাকে সজোরে চেপে ধরলে।

দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে প্রকাশ দুই বাহুর উপর সন্ধ্যার বিবশ দেহ তুলে নিলে, তারপর ধীরপদক্ষেপে হলঘর অতিক্রম ক'রে শয়ন-কক্ষে পৌঁছে তাদের শয্যার উপর সন্তর্পণে তাকে শুইয়ে দিলে।

সবিতা ভয়ার্ত্তকণ্ঠে বল্‌লে, "ওমা, কি হবে গো! শীগ্‌গির ডাক্তার ডাকতে পাঠাও!"

প্রকাশ বল্‌লে, "কিছু ভয় নেই, মানসিক উত্তেজনায় এরকম হয়েচে। তুমি শীগ্‌গির একটু জল নিয়ে এস,—আর তোমার স্মেলিং সল্টের শিশিটা।"

মুখে চক্ষে কিছুক্ষণ জল হাত বুলিয়ে দিয়ে প্রকাশ স্মেলিং সল্টের শিশিটা নেড়ে নিয়ে ছিপি খুলে সন্ধ্যার নাকের কাছে ধরলে। তীব্র অ্যামোনিয়ার গন্ধে নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সন্ধ্যা পাশ ফিরে শুলো।

প্রকাশ বল্‌লে, "আর ভাবনার কথা কিছু নেই। খানিকটা ঘুম হ'লে শরীর ঠিক হয়ে যাবে। তুমি পাশে শুয়ে থাক, আমি ততক্ষণ ও-ঘরে গিয়ে একটা সোফা-টোফায় আশ্রয় নিই।"

কিন্তু হল ঘরে গিয়ে সোফার মধ্যে আশ্রয় নিতে ইচ্ছা হ'ল না। পূর্ব্বদিকের আকাশে অন্ধকার তরল হ'য়ে এসেছে, খোলা দোর-জান্‌লার মধ্য দিয়ে ঝিরঝির ক'রে যে বায়ু প্রবেশ করছে তার মধ্যে প্রত্যুষের লঘুতা, দূরে কম্পাউণ্ডের সীমানায় একটা কিংশুক গাছের ভিতর পাখীর ঝাপট শোনা যাচ্ছে। অতি-প্রত্যুষের এ কমনীয় শোভা উপভোগ করবার সুযোগ কদাচিৎ ঘ'টে থাকে। ঘটনাচক্রে যদিই বা সে সুযোগ উপস্থিত হ'ল, তাকে প্রত্যাখ্যান করতে প্রকাশের ইচ্ছা হ'ল না। সিগার কেস, অ্যাশ্‌-ট্রে এবং দেশলাই নিয়ে সে বাহিরে বারান্দায় গিয়ে একটা ইজিচেয়ারে বস্‌ল। তারপর কেসের ভিতর থেকে একটা মোটা চুরুট বার ক'রে ভাল ক'রে ধরিয়ে নিয়ে সমস্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

নিদ্রার খানিকটা প্রয়োজন যে একেবারে ছিল না তা নয়, কারণ মামুলী বরাদ্দ পূর্ণ হ'তে তখনো ঘণ্টা দেড়েক বাকি ছিল। কিন্তু রাত্রি শেষের এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার বিস্ময় মনকে তখনো এমন নাড়া দিচ্ছিল যে, নিদ্রা তাকে পরাজিত করতে পারলে না। দস্যু-অপহৃতা এই মেয়েটি তার গৃহে সহসা এসে উপস্থিত হ'ল কেন, কোথা থেকে সে এখন আস্‌ছে, কে তাকে রেখে গেল, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে ত্বরিতবেগে সে কেনই বা প্রস্থান করলে,—ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্ন তার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রইল।

কিছুক্ষণ পরে ঘরের ভিতর কথাবার্ত্তার শব্দে প্রকাশ বুঝ্‌তে পারলে সন্ধ্যা সুস্থ হয়ে জেগে উঠেছে, কিন্তু সে সেখানে না গিয়ে চুপ করে চেয়ারেই প'ড়ে রইল। মনে মনে ভাবলে, নারীর মনের গভীর দুঃখের এবং লজ্জার কথা একজন নারীরই কাছে প্রথমে ব্যক্ত হয়ে কতকটা সহজ হ'য়ে যায়, সেই ভাল। এ কথাও সে মনে মনে স্থির করলে যে, সন্ধ্যার বিগত দুঃখময় জীবনের বিষয়ে কোনো ঔৎসুক্যই সে তার কাছে কখনো প্রকাশ করবে না,—যে-টুকু সে নিজে বল্‌বে অথবা সবিতার কাছে শুন্‌তে পাবে তাই যথেষ্ট।

মূর্চ্ছিতা সুন্দরী সন্ধ্যার অপূর্ব্ব স্তিমিত শ্রী মনে ক'রে প্রকাশের মন সমবেদনায় সিক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। নিজের শয্যার উপর সে যখন তাকে শুইয়ে দিয়েছিল তখন তাকে কমলেরই মত সুন্দর মনে হয়েছিল, কিন্তু সে কমলের উপর যেন গন্ধক-ধূমের মলিন পীতাভ অবলেপ।

"তুমি এখানে রয়েছ? আমি ভেবেছিলাম হলঘরে হয়ত ঘুমচ্ছ।"

প্রকাশ চেয়ারে উঠে-ব'সে পিছন ফিরে চেয়ে দেখ্‌লে সবিতা আস্‌ছে এবং তার পিছনে পিছনে সন্ধ্যা। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে স্নিগ্ধকণ্ঠে সন্ধ্যাকে আহ্বান করলে। "এস, এস সন্ধ্যা!" একটা চেয়ার তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্‌লে "ব'স এখানে।"

সন্ধ্যা এগিয়ে এসে নত হ'য়ে প্রকাশের পদধূলি গ্রহণ করলে। শশব্যস্তে স'রে গিয়ে প্রকাশ বল্‌লে, "আহা হা, পায়ে হাত দিয়োনা! আমার পা'টা এমন কিছু বস্তু নয় যে, তার ধুলো কারো মাথায় যেতে পারে। আচ্ছা, তোমরা এক-একটা চেয়ার নিয়ে বোসে পড়।"

সন্ধ্যা এবং সবিতা উপবেশন করলে প্রকাশ নিজের আসন গ্রহণ ক'রে বল্‌লে, "একটু ঘুমোলে না কেন সন্ধ্যা? শরীরটা সুস্থ হ'য়ে যেত।"

সবিতা বল্‌লে, "ঘুমোবে কি, কেঁদে কেঁদেই ত' প্রাণটা

বার করলে। তুমি চ'লে এলে, তার ঠিক পাঁচ মিনিট পরে উঠে বসল, সেই থেকে কান্না! আহা, ওর কষ্টের কথা শুনলে পাষাণও বোধহয় গ'লে যায়। কিন্তু ওকে যে শেষ-পর্য্যন্ত ফিরে পাওয়া গেল, এই আমাদের পরম ভাগ্য বলতে হবে।" ব'লে বিশেষ কোনো দেবতার উদ্দেশ্যে যুক্ত-কর মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করলে, "সন্ধ্যা যে মুক্তি পেয়েছে সে খবর কলকাতায় সকলে জেনেছেন কি ?"

সজোরে মাথা নেড়ে সবিতা বললে, "কেউ জানে না, মুক্তি পেয়ে প্রথম ও তোমার কাছেই ছুটে এসেছে।"

প্রফুল্ল মুখে প্রকাশ বললে, "সে আমার পরম সৌভাগ্য ব'লে মনে করলাম। তোমাকে ফিরে পাওয়ার আনন্দের বোধনটি যে আমাদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হ'ল, এ সত্যই আমার সৌভাগ্যের কথা সন্ধ্যা! এখন আজকের দিনের উৎসবটি কি ক'রে জাগিয়ে তুলতে হবে তাই হচ্চে চিন্তার বিষয়।"

সবিতা বললে, "উৎসব তুমি কি বলছ ? সন্ধ্যা ত' আজই কলকাতা যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েচে ; যদি সম্ভব হয় আজ সকালের গাড়িতেই।"

একটু বিস্ময়ের সুরে প্রকাশ বললে, "আজ সকালের গাড়িতেই ? কেন এত তাড়া কিসের ? আমি কলকাতায় তার ক'রে খবর দিচ্ছি, তাঁরা এসে সন্ধ্যাকে নিয়ে যান। খবর পেয়ে তাঁরা এসে নিয়ে যান, সেইটেই ঠিক।"

প্রকাশের কথার শেষাংশ শুনে সন্ধ্যার মুখ দুশ্চিন্তায় বিবর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। আমিনা তার মনের মধ্যে যে আশঙ্কার বীজ নিক্ষেপ করেছিল তা থেকে উৎপন্ন কাঁটা মুক্তির আনন্দের মধ্যেও অনুক্ষণ তাকে বিদ্ধ করেছে। কেবলই মনে হয়েচে আমিনা যা বলেছিল তা যদি মিথ্যে না হয়! তা ছাড়া সে নিজেও ত কতকটা সেই হিন্দু সমাজকে চেনে যে-সমাজ শুধু দ্বার রুদ্ধ করতেই জানে, খুলতে জানে না ; যে শুধু বলতে পারে 'যাও',—'এস' বলবার শক্তি যার নেই। যে অবস্থা থেকে সে বিচ্যুত হয়েচে সেই অবস্থা ফিরে পাওয়া ছাড়া সন্ধ্যার জীবনের আর কোনো কাম্য কোনো চিন্তাই নেই, তাই অসঙ্কোচে সে আর্ত্তস্বরে প্রকাশকে বললে, "কেন মুখুজ্যে মশাই, আমি নিজে গেলে কি-এমন ক্ষতি হ'তে পারে ? আপনি কি মনে করেন তাঁরা আমাকে না নিতেও পারেন ?"

সে আশঙ্কা যে প্রকাশের মনে একেবারে ছিল না তা নয়, এমন কি সেই কথারই ইঙ্গিত বোধহয় অজ্ঞাতসারেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল,—কিন্তু সন্ধ্যাকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে সে একটু প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বললে, "না, না, আমি সে সব কিছুই মনে করছিনে সন্ধ্যা। আমার বলার অর্থ, তুমি গিয়ে এখন কোথায় উঠ্‌বে বল ?—বাপের বাড়িতে, না শ্বশুরবাড়িতে ? শ্বশুরবাড়ি যদি যাও, মেশো-মশাই, মাসিমা হয়ত' একটু ক্ষুণ্ণ হবেন ; বাপের বাড়ি যদি যাও তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী হয়ত অপমানিত বোধ করবেন। তার চেয়ে খবরটা দিয়ে গেলে তোমার আর কোনো দায়িত্ব থাকে না। তাঁরা সেখান থেকে একটা যা হয় স্থির ক'রে এখানে এসে তোমাকে নিয়ে যান সেই ত ভাল ?"

"কিন্তু তাঁরা যদি এখানে না আসেন ?"

প্রকাশ বললে, "তা হ'লে অবশ্য তোমাকেই যেতে হবে। পাহাড় যদি মহম্মদের কাছে না আসে ত' মহম্মদ পাহাড়ের কাছে যাবে—এ আপ্ত বাক্য।"

অনুনয়ের করুণকণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "সেই যদি যেতেই হয় মুখুয্যে মশাই, তা হ'লে আগেই যাইনে কেন ?"

প্রকাশ স্মিতমুখে বললে, "যুক্তি চালাবার তোমার ক্ষমতা আছে সন্ধ্যা, কিন্তু আমার যুক্তিটাও নেহাৎ বাজে ব'লে মনে হচ্চে না।"

"কিন্তু আমি যে আর স্থির থাকতে পাচ্ছিনে !"

সবিতা বললে, "আহা, সত্যি, ওর কষ্ট আর দেখ্‌তে পারা যায় না! তুমি আজকেই ওকে কলকাতা পাঠাবার ব্যবস্থা কর। ব্যবস্থা আর কি করবে, নিজে গিয়ে রেখে এস।"

প্রকাশ বললে "তথাস্তু। আজই তোমার যাওয়া স্থির। দুপুরের গাড়িতে সম্ভব হবে না, কারণ অফিসে কতকগুলো জরুরী কাজ সারতে হবে। রাত দুটোর বম্বে মেলে রওনা হ'য়ে কাল সকালে কলকাতায় পৌঁছোনো। কেমন ? খুসী তো ?"

সন্ধ্যার মুখে মৃদুহাস্যের দীপ্তি ফুটে উঠ্‌ল ; ঘাড় নেড়ে বললে, "আচ্ছা।"

"বেশ কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি এখনি দু' জায়গায় দুটো জবাবি তার ক'রে দিচ্ছি; তার ফলে যদি এই উত্তর আসে যে, বৈকালে বম্বে মেলে রওনা হ'য়ে তাঁরা রাত্রি দশটার সময়ে এখানে এসে পৌঁছবেন, তা হ'লে অন্তত পাঁচ দিন এখানে তুমি বন্দী থাকবে। অবশ্য, সে কারাগার সুখের আগারই হবে।"

সন্ধ্যার মুখে পুনরায় একটা ক্ষীণ হাসির আভা দেখা দিলে। সবিতা বললে, "তা প্রিয়লালই যদি ওকে নিতে আসে তা হ'লে কি সহজে ওদের ছাড়ব? সম্পর্ক ত' আর একটা নয়,—দুটো।" তারপর সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "ওরে সন্ধ্যা, তোর শ্বশুর দূর-সম্পর্কে আমার মামাশ্বশুর হ'ন তা জানিস্?"

সন্ধ্যা বললে "না।"

"তোর শ্বশুর আমার শাশুড়ীর দূর সম্পর্কের পিসতুত ভাই। অনেক দূর হ'য়ে গেল বটে, কিন্তু তবু সম্পর্ক তো?" তারপর হঠাৎ প্রকাশের দিকে চেয়ে সবিতা ব'লে উঠল, "ও মা, তুমি সন্ধ্যার সঙ্গে কথা কচ্ছ কি ক'রে! সন্ধ্যা যে তোমার ভাদ্র-বউ হোল।" বলে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল।

প্রকাশ হাসিমুখে বললে, "ক্ষেপেচো? শালী কখনো ভাদ্র আশ্বিন হয় না,—চিরকালই ফাগুন। সোনা কখনো তামা হয় না, তা যতই তাকে পয়সার হিসেবে গুণতে চেষ্টা কর না কেন। কি বল সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা কোনো কথা না ব'লে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

সবিতা চেয়ার থেকে উঠে পড়ে বললে, "সোনা কখনো তামা হয় কি-না সে হিসেব পরে করা যাবে, এখন চল্ সন্ধ্যা, খানিকটা শুয়ে শুয়ে গল্প করা যাক্। তোর যাবার ব্যবস্থা ত' সব ঠিক হয়ে গেল।"

প্রকাশ বললে, "সেই ভালো, আমিও ততক্ষণ দুটো তার লিখে ফেলে পাঠিয়ে দিই। শুভ সংবাদটা যত শীঘ্র দেওয়া যায় ততই ভাল। তারপর সাতটার সময়ে সকলে মিলে ভাল ক'রে চা খাওয়া যাবে,—তোমরা তার মধ্যে তয়ের হ'য়ে নিয়ো।"

সন্ধ্যা ও সবিতা চ'লে যাচ্ছিল, প্রকাশ ডেকে বললে, "সন্ধ্যা, তোমার শ্বশুর বাড়ির নম্বরটা মনে আছে? রাস্তা আমি জানি, কিন্তু নম্বরটা ঠিক মনে নেই।"

সন্ধ্যা ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "এগারো নম্বর।"

"দেখ, সুস্থ সবল চিত্তে আমি নম্বরটা ভুলে গেছি, কিন্তু তুমি এত ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও ঠিক মনে রেখেছ। সাধে কি আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের পতিগত প্রাণ ব'লে থাকে!" ব'লে প্রকাশ হাসতে লাগল।

সবিতা বললে, "তবুও ত তোমরা কথায় কথায় আমাদের সীতা-সাবিত্রী ব'লে ঠাট্টা করতে ছাড় না!"

সহাস্যমুখে প্রকাশ বললে, "সেটা-কি জানো?—কবির ভাষায় যাকে বলে 'তরল সুরে ঠাট্টা ক'রে শুনিয়ে দিতে চাই, আসল কথাটাই'—আমাদের ঠাট্টাও তাই!"

প্রকাশের কথা শুনে সবিতা ও সন্ধ্যা হাসতে হাসতে প্রস্থান করল।

আর একটা চুরুট ধরিয়ে খানিকটা পুড়িয়ে বাকিটা অ্যাশ-ট্রের মধ্যে নিক্ষেপ ক'রে প্রকাশ উঠে পড়ল। অফিস-রুমে গিয়ে সন্ধ্যার পিতাকে এবং শ্বশুরকে দুটো টেলিগ্রাম লিখে ফেললে। দুটোরই এক মর্ম্ম, এক শব্দ,—'শুভ সংবাদ। সন্ধ্যা আজ হঠাৎ টাটানগরে উপস্থিত হয়েচে। সে আপনাদের কাছে যাবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত। আমি নিয়ে যাব, অথবা আপনারা নিতে আসবেন, সে কথা তার ক'রে জানাবেন'। তারপর বেল্ বাজিয়ে একজন বেয়ারাকে ডেকে একখানা দশ টাকার নোট দিয়ে টেলিগ্রাম দুটো ডাকঘরে পাঠিয়ে দিলে।

বেলা তখন প্রায় দশটা, প্রকাশ অফিস যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্চে, এমন সময় সন্ধ্যার পিতার তারের জবাব এল,—'শুভ সংবাদে সকলেই সুখী। সন্ধ্যার শ্বশুরকে যদি সংবাদ না দিয়ে থাক ত' অবিলম্বে দেবে। তাঁর ঠিকানা ১১ নং দত্তপুকুর রোড। চিঠি যাচ্ছে'।

নিকটে সবিতা এবং সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে ছিল, প্রকাশের পড়া হয়ে গেলে তারা তার হস্ত থেকে টেলিগ্রামটা নিয়ে একে একে প'ড়ে দেখে ফিরিয়ে দিলে। সন্ধ্যাকে নিতে আসার অথবা আনিয়ে নেওয়ার বিষয়ে টেলিগ্রামে একটি কথা নেই,—সে বিষয়ে প্রকাশের যে প্রশ্ন ছিল সে সম্বন্ধে

একেবারে নীরব। আর যা নেই, তা শুভ সংবাদের পরিমাণের হিসাবে আনন্দ প্রকাশের সচ্ছলতা। নেহাৎ যে আনন্দটুকু প্রকাশ না করলে সাধারণ সহৃদয়তার ব্যতিক্রম ঘটে, শুধু সেইটুকু। সন্ধ্যার প্রতি নিমেষের জন্য দৃষ্টিপাত ক'রে সবিতা লক্ষ্য করলে নৈরাশ্যের আঘাতে তার মুখ কঠোর হয়ে উঠেচে। যতটা সম্ভব তাকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে সে বললে, "যতই হোক, মেয়ের বাপ তো, সব দিক বিবেচনা ক'রে না চললে চলে না। পাছে কোনো কথা ওঠে সেই জন্যে নিজের তরফ থেকে কোনো-কিছু না ক'রে শ্বশুরকে খবর দিতে বলেছেন।"

সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু আমাকে কলকতা যাবার জন্যে অনুমতি দিলেও কি কোনো কথা উঠ্‌ত সবিদি? মুখুয্যে মশাই ত' লিখেছিলেন যে তিনি পৌঁছে দিতে পারেন।"

এ কথার উত্তর দিলে প্রকাশ; বললে, "বাঙ্গালী মেয়ের বাপ সন্ধ্যা, ভয়ে আধমরা হ'য়েই থাকে। তোমাকে দেখবার জন্যে ছুটে আসবার সাহস যাঁর হয় নি, তিনি তোমাকে যাবার জন্যে কেমন ক'রে লেখেন বল? সে যে আরো বেশি দায়িত্বের কথা হোতো।"

দৃঢ়স্বরে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু দায়িত্ব কেন, তা আমি একটুও বুঝ্‌তে পারছিনে মুখুজ্জেমশাই! কিসের দায়িত্ব?"

সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে প্রকাশ দেখ্‌লে তার দুই চোখের মধ্যে অগ্নিকণা প্রজ্জলিত হয়েচে। সে ভয় পেয়ে গেল; শান্ত স্বরে বললে, "এ সব আলোচনা এখন বন্ধ থাক সন্ধ্যা। হয় ত' এ সমস্ত কথাই নিরর্থক হচ্চে। আর একটু পরে তোমার শ্বশুরের তার এলে তখন হয় ত' এ সব কথা আলোচনা করবার কোনো প্রয়োজনই হবে না। এখন তোমরা যাও, খেয়ে নাও গে।"

সন্ধ্যার শ্বশুরের কাছ থেকে যখন টেলিগ্রাম এল তখন বেলা দুটো। একটা শীট্-মিল-এ প্রকাশ ব'সে মিলের একটা বেমেরামৎ অংশ পরীক্ষা করছে, এমন সময়ে তার একজন আরদালী গিয়ে তাকে তারখানা দিলে। খাম খুলে তাড়াতাড়ি তারখানার উপর একবার চোখ বুলিয়ে প্রকাশের মুখে বিরক্তির চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌ল। এক মুহূর্ত্ত কি ভাবলে, তারপর টেলিগ্রামটা ভাঁজ ক'রে খামের মধ্যে পুরে আমার বুক পকেটে রাখ্‌লে। খানিকটা কাজ করার পর দেখ্‌লে একটা সম্ভাবিত দুরূহ সমস্যার চিন্তায় কাজে মন বসছে না। বিরক্ত হয়ে সেদিনের মতো সেইখানে শেষ ক'রে নিজের অফিসরুমে চ'লে গেল।

বেলা তখন সাড়ে তিনটে। প্রশস্ত বারান্দার এক প্রান্তে একটা মারব্‌ল্ পাথরের গোল টেবিল ঘিরে আট দশখানা চেয়ার ছিল, তারই দুখানা অধিকার ক'রে সবিতা ও সন্ধ্যা গল্প করছিল। সন্ধ্যার চক্ষু রক্তাভ,—বোধ-হয় একটু পূর্ব্বেই কেঁদেছিল, তারই চিহ্ন।

সবিতা বললে, "ও-সব চিন্তা তুই ছেড়ে দে সন্ধ্যা। কোথাকার কে এক আমিনা তোর মাথাটি একেবারে খেয়ে দিয়েছে দেখেছি।"

ম্লান হাসি হেসে সন্ধ্যা বললে, "শুধু আমিনার কথা কেন বলছ সবিদি, তুমি নিজেই কি হিন্দু সমাজের কথা জানো না? গল্পে উপন্যাসে পড়োনি? খবরের কাগজে দেখোনি?"

"গল্প উপন্যাসের কথা এখন ছাড়্, উপন্যাসে সব-কথা একটু বাড়িয়ে না বললে লোকের ভালো লাগবে কেন? এখন লোকের মতি গতি অনেক বদলে গেছে।"

সন্ধ্যা বললে, "মতি বদলে থাক্‌তে পারে, কিন্তু গতি বদলায়নি। আর তাও যদি বদলে থাকে ত' সে সাধারণ ভদ্রলোকদের মধ্যে, বনেদী বংশে নয়। আমার শ্বশুররা যে বনেদী বংশ!"

"আচ্ছা, দেখ্‌না তোর শ্বশুরের কাছ থেকে কি জবাব আসে, তারপর যা বল্‌তে হয় বলিস্। আগে থেকেই খাঁড়া উঁচিয়ে রাখ্‌চিস কেন?"

"খাঁড়া উঁচিয়ে আর আমি কি রাখ্‌ব সবিদি। কিন্তু আমার কি মনে হচ্চে জানো? বাবার কাছ থেকে তবু যা হোক্ একটা উত্তুর এসেচে, শ্বশুরের কাছ থেকে কোনো উত্তুরই আস্‌বে না। বেলা চারটে বাজ্‌তে চল্‌ল এখনো জবাবি এক্স্‌প্রেস্ টেলিগ্রামের উত্তুর এলনা,—এ তুমি বুঝতে পারছ না?"

"হয়ত অফিসে এসেছে।"

"তা যদি এসে থাকে ত' খারাপ খবরই এসেছে, ভালো হ'লে মুখুজ্জে মশাই তখনি পাঠিয়ে দিতেন।"

দূরে একটা মোটরকারের হর্ণ শুনে সবিতা বললে, "ঐ উনি আসছেন। সকাল সকাল যখন ফিরছেন তখন নিশ্চয়ই ভাল খবর নিয়ে টেলিগ্রাম এসেছে।"

কিন্তু গাড়িবারান্দায় যখন মোটর এসে দাঁড়া'ল তখন ভিতরে প্রকাশের উৎসাহহীন মুখ দেখে শুভসংবাদের ভরসা আর বড় কিছু রইল না।

প্রকাশ গাড়ি থেকে নেমে এলে সবিতা জিজ্ঞাসা করলে "টেলিগ্রাম এসেছে ?"

"এসেছে।"

"কি খবর ?—ভালো ?"

"ঐ একই রকম।" মুখখানা একটু কুঞ্চিত বোধহয় অজ্ঞাতসারেই হ'য়ে গেল। সন্ধ্যা উঠে দাঁড়িয়েছিল, আস্তে আস্তে চেয়ারে ব'সে পড়ল।

সবিতা হাত বাড়িয়ে বললে, "কই দেখি ?"

পকেট থেকে টেলিগ্রামটা বার ক'রে প্রকাশ সবিতার হাতে দিলে। সবিতা প'ড়ে সন্ধ্যার সামনে টেবিলের উপর রেখে দিলে। স্পর্শ না ক'রেই সন্ধ্যা টেলিগ্রামটা ধীরে ধীরে প'ড়ে নিলে।

টেলিগ্রামের মর্ম্ম এইরূপ,—'শুভসংবাদের জন্য ধন্যবাদ। বৌমা উপস্থিত এখন কিছুদিন তাঁর বাপের কাছে থাকেন সেইটেই বাঞ্ছনীয়। তাঁকে যদি এখনো খবর না দেওয়া হ'য়ে থাকে ত অবিলম্বে যেন হয়। চিঠি যাচ্ছে।'

টেলিগ্রামের মধ্যে যে কঠোর কথা মৌন হয়ে বর্ত্তমান রয়েছে তার আঘাতে তিনটি প্রাণী ক্ষণকাল স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল। কেউ তা নিয়ে কোনো আলোচনা করতে সাহস করলে না। এ যেন ঠিক বিদ্যুৎপূর্ণ তামার তার, চোখে দেখ্‌তে নিরাপদ, কিন্তু স্পর্শ করলেই ভিতরে তার মৃত্যুদায়ী প্রবাহ।

মৌনভঙ্গ করলে প্রকাশ; বললে, "আমি ত অফিসের কাজ গুছিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে এসেছি। কিন্তু তুমি কি আজ রাত্রে কলকাতা যেতে চাও সন্ধ্যা ?"

সন্ধ্যা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল; মৃদুস্বরে বললে, "না।"

প্রকাশ বললে, "সেই কথাই ভালো। কাল দুজনেরই চিঠি আসবে, সেই দেখে যেমন ভাল হয় ব্যবস্থা করলেই হবে।"

"কিন্তু চিঠিতেও যদি আমাকে নিয়ে তাঁরা এমনি ছোঁড়াছুঁড়ি করেন, তখন আমি কোথায় যাব মুখুজ্জে মশাই!" ব'লে দুই বাহুর মধ্যে মুখ গুঁজে সন্ধ্যা নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগ্‌ল।

সন্ধ্যার পিঠের উপর দক্ষিণ বাহু রেখে সমবেদনার করুণকণ্ঠে সবিতা বললে, "তাই যদিই হয় তা হ'লে কোথায় আবার যাবি ভাই? আমাদের কাছেই থাক্‌বি। যতদিন দরকার, যতদিন ইচ্ছে। আমাদের ত' আর ছেলেপিলে নেই যে, সমাজের ভয় করতে হবে!"

প্রকাশ বললে, "আমার আবার বোনও নেই সন্ধ্যা, সুতরাং আমি মনে কর্‌ব এতদিনে আমি একটি বোন লাভ করলাম। কিন্তু এ সব বাজে কথার কোনো দরকার নেই, কাল চিঠি এলে দেখ্‌বে আজ তুমি যা ভয় করছ তার কোনো কারণই ছিল না।"

কিন্তু পরদিন যখন চিঠি এল তখন দেখা গেল, কারণ যথেষ্টই ছিল। দুটি চিঠিই দুখানি টেলিগ্রামের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত সংস্করণ মাত্র,—বাহুল্যবর্জ্জিত, উচ্ছ্বাসবিহীন, যুক্তির সারবত্তায় সুনিবিড়। উভয় চিঠিরই প্রতিপাদ্য, সন্ধ্যা এখন কিছুদিন অপর পক্ষের কাছে থাকে সেইটেই বাঞ্ছনীয়। আনন্দ অথবা সমবেদনার বাড়াবাড়ি কিছুমাত্র নেই, পাছে তদ্দ্বারা বিবেচনার অভাব পরিলক্ষিত হয়। উভয়পক্ষের সহিত উভয়পক্ষের দেখাশুনার পর চিঠি লেখা, তার ইঙ্গিত চিঠির মধ্যে বর্ত্তমান।

চিঠি পড়ার পর মিনিটখানেক চুপ ক'রে ব'সে থেকে সন্ধ্যা উঠে ধীরে ধীরে তার ঘরের দিকে চ'লে গেল। কাল টেলিগ্রাম এলে সে কেঁদে আকুল হয়েছিল, আজ তাকে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তেও দেখা গেল না।

ভয়ার্ত্তকণ্ঠে সবিতা বল্‌লে, "কি হবে গো! শেষ পর্য্যন্ত মেয়েটা ভেসে যাবে নাকি ?"

প্রকাশ বললে, "বাঙ্গলা দেশ ত! ভেসেও যেতে পারে, ডুবেও যেতে পারে,—কিছুই আশ্চর্য্য নয়!"

"তারপর ?"

"তারপর যা' তাকেই বলে অদৃষ্ট,—এখন কেমন ক'রে বলব বল ?" (ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

# সুন্দরের সীমানা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

এই কদিন হ'ল "আর্য্য পাবলিশিং হাউস" সুন্দরের সীমানা নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশ ক'রেছেন। এ পুস্তিকা হচ্ছে আসলে পত্রাবলী। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীমান্ দিলীপকুমার রায় ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত পরস্পরকে আর্ট সম্বন্ধে যে চিঠি লিখেছেন সেই চিঠি কখানি একত্র করে, পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হ'য়েছে।

উক্ত পুস্তিকার প্রকাশক এঁদের মতামত সম্বন্ধে আমাকে দু'কথা বলতে অনুরোধ করেছেন। এ অনুরোধ আমি ভয়ে ভয়ে রক্ষা করছি। কারণ, "সুন্দরের সীমানা"র আলোচনা করার অর্থ হচ্ছে আর্ট সম্বন্ধে তর্কে যোগ দেওয়া।

এ তর্কে যোগ দিতে যে আমার সাহস হয়না—তার কারণ Plato, Aristotle থেকে সুরু ক'রে Aldous Huxley ও T. S. Elliott প্রভৃতি এ যুগের বিলেতি কবি ঔপন্যাসিকরা আর্ট সম্বন্ধে তাঁদের কাঁচা পাকা মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং করছেন। অর্থাৎ এ তর্কের কোন সীমানা নেই অন্ততঃ কালের হিসেবে। আর বর্ত্তমানে যে কেউ নূতন কথা বলছেন, তাও ত মনে হয় না।

Croce এ যুগের একজন বিখ্যাত দার্শনিক। আর তাঁর খ্যাতি তাঁর Æsthetics এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এখন যদি কেউ তাঁর উক্ত গ্রন্থ পড়েন ত দেখ্‌তে পাবেন যে আজ আড়াই হাজার বৎসর ধরে ইউরোপে সুন্দর সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত উক্ত গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে আর Croce সে সব মতকে তাঁর দর্শনের কষ্টি পাথরে পরখ করে দেখেছেন ও দেখিয়ে দিয়েছেন যে তার একটীও খাঁটি সোনা নয়। আর মজা হচ্ছে এই যে, আমরা যাকে নব্য মত বলি, তার অধিকাংশই অতি প্রাচীন মত। Poor humanity। মানুষে যত নতুন কথাই বলুক তা সব প্রায়ই পুরানো কথার পুনরুক্তি মাত্র। অন্ততঃ ধর্ম্ম ও আর্ট প্রভৃতি সম্বন্ধে।

তর্কটা উঠেছে পণ্ডিচেরীর আশ্রমে বন্ধু সমাজে। "আর্ট ফর আর্টস্ সেক" এই কথাটা নিয়ে। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র উক্ত মতের পক্ষে ওকালতি করেছেন—শ্রীমান্ দিলীপ তার বিপক্ষে বাহাস্ করেছেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত বলেছেন আর্টের মূল পাওয়া যাবে ধর্মে। শ্রীঅরবিন্দ এ উভয় পক্ষের সমন্বয় করেছেন।

আমি প্রথমেই বলে রাখি যে আমি "আর্ট ফর আর্টস সেক" মতটি গ্রাহ্য করি। কেন না তা প্রত্যাখ্যান করবার কোনও কারণ নেই।

ধরুন যদি উক্ত বাক্যে Art এর বদলে Science বসিয়া দেওয়া যায় তাহলে কি কোনও বৈজ্ঞানিক চমকে উঠবেন। বৈজ্ঞানিকরা সত্যের যে রূপ দেখ্‌তে চান, সত্যের সেই রূপের সাক্ষাৎ লাভ করাই বিজ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য। বৈজ্ঞানিক সত্যকে অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে কাজে ভাঙিয়ে নেওয়া যায়, তাই বলে সাংসারিক লাভ লোকসানের হিসাব বৈজ্ঞানিককে উদ্‌ভ্রান্ত করে না।

তার পর উক্ত বাক্যে যদি আর্টের বদলে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করা যায় তাহলেও আমরা চম্‌কে উঠবো না। ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা যে কর্ম্ম জিজ্ঞাসা নয় তা আমরা সকলেই জানি। এখন "আর্ট ফর আর্টস্ সেক" বলায় আর্টের কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না, বলা হয় শুধু আর্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে আর্ট। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সত্যের মত, ধর্ম্মের মত, আর্ট একটি স্বতন্ত্র স্বপ্রতিষ্ঠিত সত্তা। আর এ সত্যের প্রতি পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় যে আর্ট সকল প্রকার সাংসারিক ফল নিরপেক্ষ। উক্ত বাক্যকে আর্টের negative definition বলা যেতে পারে। অর্থাৎ নেতি নেতি বলে আর্টকে

বুঝিয়ে দেওয়া। আর্ট কর আর্ট বলতে আমি বুঝি যে আর্ট utilityর কোঠাতেও পড়ে না moralityর কোঠাতেও নয়। এর থেকে অবশ্য কেউ যেন মনে না করেন যে utility এবং moralityর কোন মূল্য নেই।

সুরেশচন্দ্র আরও বলেছেন যে আর্ট হচ্ছে non-moral। একথাতেও আপত্তি করবার কোন কারণ নেই। যদি কেউ বলেন যে Science non-moral তাহলে কোনও বৈজ্ঞানিক ক্ষিপ্ত হবেন না। গত শতাব্দীর atom এ শতাব্দীতে electron হয়ে গেছে। আর এ বিষয়ে অনেক তর্কও আছে। কিন্তু atom moral এবং electron immoral এমন কথা কেউ বলেন নি। যদিচ atom ছিল অতিশয় শান্ত শিষ্ট অর্থাৎ জড় পদার্থ আর electron হচ্ছে চঞ্চল, স্বেচ্ছাচারী ও অব্যবস্থিতচিত্ত। অবশ্য electronএর এ হেন চরিত্রের পরিচয় পেয়ে কেউ কেউ চটে যেতে পারেন, যেমন গিয়াছেন Bertrand Russell, কেন না, electron তাঁর determinism নামক moral doctrineএর তলা ফাঁপিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু আর্ট non-moral বলে, যে তার moralityর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই এ কথাও সত্য নয়। রামায়ণ ঘোর moral কাব্য এবং সেই সঙ্গে মহাকাব্য। অপরপক্ষে Guy de Maupassantর গল্প moral নয় অথচ Maupassant মহা আর্টিষ্ট। বাল্মীকি ও মোপাসাঁ এ উভয়কেই আমরা কেন আর্টিষ্ট বলি, সেইটি ধরতে পারলেই আমরা আর্টের ধর্ম্মের সন্ধান পাব।

শ্রীমান দিলীপের বক্তব্য যদি আমি বুঝে থাকি তাহলে আমার ধারণা তিনি দেখিয়েছেন, যে আর্টের form ছাড়াও content বলেও একটা জিনিষ আছে। অবশ্য আছে। শূন্যের কোনও form নেই। formএর অস্তিত্ব উপাদান নিরপেক্ষ নয়। এই form ও contentএর তর্কটা অতি সেকেলে তর্ক। এ তর্কের সহজ মীমাংসা এই যে form এবং content উভয়ে মিলে আর্ট হয়। চরম আর্টে এ দুইকে পৃথক করা যায় না। আর তা ছাড়া উপাদানই form গড়ে তুলেছে, অথবা formই উপাদান গড়ে তুলেছে তাও বলা কঠিন। আর morality প্রভৃতি সবই আর্টের উপাদান হতে পারে কিন্তু আর্ট নয়। কেননা আর্টের স্পর্শে তাদের চরিত্র বদলে যায়। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ইংরাজী পত্রে এ তর্কের যে সমাধান করেছেন, আমার মনে হয় যে সেইটিই সঙ্গত।

সুরেশচন্দ্রের পত্র পড়ে যদি কারও মনে হয় যে তিনি techniqueকেই আর্ট বলেছেন, তাহলে তিনি শ্রীযুক্ত সুরেশের কথা ভুল বুঝেছেন। Technique অবশ্য, ছবিতেও চাই গানেতেও চাই লেখাতেও চাই। এর কারণ অনাত্ম বস্তুর inertia অতিক্রম করবার কৌশলের নামই technique। এবং যে technique অতিক্রম করতে না পারে সে artist নয় artisan মাত্র।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে There is not only physical beauty of the world—there is moral, intellectual, spiritual beauty also। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। যাকেই মানুষে বড় মনে করে, তার অন্তরে সে হয় সত্য নয় সুন্দরের সাক্ষাৎ পায়।

এই সব beautyর যিনি সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং উপযুক্ত formএর সাহায্যে তা আমাদের মনোগোচর করতে পারেন, তিনিই হচ্ছেন যথার্থ আর্টিষ্ট যথা কালিদাস প্রভৃতি।

তর্কের অবশ্য পূর্ব্ব পক্ষ ও উত্তর পক্ষ আছে—কিন্তু আর্টের সদর মফঃস্বল বলে দুটি পিঠ নেই। তর্কের উভয় পক্ষকে যা reconcile করে তাই আর্ট—কারণ যথার্থ আর্ট সকল তর্ককে অতিক্রম করে। যে তর্কের কোনও মানে মেলা আছে তা logicএর উপর প্রতিষ্ঠিত। logicএর আমি মহাভক্ত, কেননা আমাদের বিক্ষিপ্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে logic নিয়মিত করে। কিন্তু সুন্দরের সীমানা লজিকের সীমানার অন্তর্ভূত নয়।

উপরে যা বললুম তা অবশ্য খুব স্পষ্ট হল না। তার কারণ আর্ট ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন ভাষাতেই কোনও স্পষ্ট কথা নেই। কেননা ভাষার কারবার আসলে কেজো কথা নিয়ে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

# শিল্প ও সমাজ

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তি
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুরাণে পাঠ করিয়াছি স্বর্গে দেবাসুরের সংগ্রাম হইত—অমৃত লইয়া, ত্রিলোকের অধিশ্বরত্ব লইয়া, অমরতা লইয়া। এইরূপ একটি সংগ্রামে একবার অসুরেরা দেবগুরু, ব্রাহ্মণ, বিদ্বান, বৃহস্পতির মন্ত্রণা-বশে ও সেনাপতি সহস্রাক্ষের শৌর্য্যে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া সমুদ্রগর্ভে ও পর্ব্বতকন্দরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। পরাজয়ের গ্লানি ও শ্রান্তি কিঞ্চিৎ উপশমিত হইলে অসুরদিগের গুরু ভৃগু-পুত্র, ব্রাহ্মণ-সন্তান শুক্রাচার্য্য* নিভৃত পর্ব্বতকন্দরে অসুরদিগের

* শুক্রাচার্য্য কবি ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম কবিতা বা কাব্যমাতা। পুরাণকার তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ ভৃগুর ব্রহ্মজ্ঞান লাভের কারণ, হেতু বা শক্তি বলিতেছেন। এবং শুক্রের বিশেষণ স্বরূপ নিম্নলিখিত শব্দগুলি প্রয়োগ করিয়াছেন; যথা,—কবি, দ্রষ্টা, শ্রষ্টা, বৈদ্য, বজ্রধর।

পঞ্চপাণ্ডবের ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা
শ্রীনন্দলাল বসু

এক গুপ্তসভায় এইরূপ বলিতে লাগিলেন, বৎসগণ,—দেবতাগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইবার যে কারণ ধ্যান বলে আমি জ্ঞাত হইয়াছি, তাহা কহিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। দেহের যেরূপ মস্তিষ্কই চালক এবং মস্তিকের বিকৃতির সহিত দেহ বিকৃত হয়, সেইরূপ সমাজের গুরু বা নেতাই সমাজ দেহের শ্রীবৃদ্ধি বা শক্তিহীনতার কারণ। মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি হয় ঋষ্ হইতে এবং ঋষিগণই জীবধর্ম্মের গুরু বলিয়া খ্যাত। আমি স্বয়ং ঋষি ও জীবধর্ম্মী অসুরগণের গুরু হইয়াও দৈবদুর্ব্বিপাকে ক্ষীণদৃষ্টি ও হীনবীর্য্য হইয়াছি এবং আমারই দৃষ্টিহীনতা ও হীনবীর্য্যতা নিবন্ধন তোমরা আজ পরাজিত ও হতশ্রী হইয়াছ। বিগত শৌর্য্যের জন্য অনুতাপে বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া আমি যাহা আদেশ করিতেছি তাহা পালন করিলে তোমরা আগামী যুদ্ধে জয়লাভে সমর্থ হইবে। বুধগণ এইরূপ কহিয়াছেন যে, আপনাদের দুর্ব্বল

গরুড়
শ্রীনন্দলাল বসু

মুহূর্ত্তে কদাচ নগণ্য শত্রুর বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করিবে না। অতএব বৎসগণ সম্প্রতি রাজনৈতিক কারণে সাময়িক ভাবে দেবতাদিগের সহিত কপট সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে এবং তোমরা যে অস্ত্রত্যাগ করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রতধারী ও নিরামিষাশী হইয়াছ তাহাই জানাইতে হইবে। ইতিমধ্যে আমি একশত বৎসরের জন্য সুন্দরের উপাসনা করিব এবং তপস্যান্তে তাঁহারই বরপ্রসাদাৎ পুনরায় দৃষ্টিলাভে সক্ষম হইব। পিতামহ ব্রহ্মা এই সত্যদৃষ্টিকেই মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা আখ্যা দিয়াছেন। আমি একশত বৎসর গত হইলে সুন্দর উপাসনার সঞ্জীবনী সুধায় তোমাদিগকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিব এবং অসুরেরাই ত্রিলোকের অধীশ্বর হইবে। আমার অনুপস্থিতিতে কোনও আপদ উপস্থিত হইলে আমার গর্ভধারিণী ভৃগুপত্নী কাব্য-মাতার স্মরণাপন্ন হইলে বিপদ তোমাদিগকে স্পর্শও করিতে

মনসা দেবী
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

পারিবে না। কবিতা স্বয়ং প্রকৃতি বলিয়া ত্রিলোকের পূজ্য ও অবধ্যা—ইহাও পিতামহের নির্দ্দেশ।

জীবন বীর্য্যহীন হইলে, দৃষ্টি তমসাচ্ছন্ন হইলে, দেহ রোগগ্রস্ত হইলে, ভারতবর্ষের দেহধর্ম্মের গুরু শুক্রাচার্য্য পরাজিত বিধ্বস্ত অসুরদিগকে পুনরায় সুস্থ পরাক্রমশালী শ্রীমান ও বীর্য্যবান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন একমাত্র সুন্দরের উপাসনা করিয়া। সুন্দরের উপাসনা করিলে বল ও বীর্য্য লাভ হয় এবং "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"।

এই প্রসঙ্গে আর একটি পৌরাণিক রূপক উল্লেখযোগ্য। দক্ষ প্রজাপতি দৃষ্টিহীনতা নিবন্ধন সুন্দরের অবমাননা করিয়াছিলেন বলিয়াই বসুন্ধরা সতীশূন্যা হইয়াছিলেন এবং তিনি নৃমুণ্ড হারাইয়া ছাগমুণ্ডে বিভূষিত হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ যে শক্তিকে সহধর্ম্মিণী করিয়া মানবের চিরন্তন শ্রেষ্ঠ কামনা সীমাহীন অব্যক্তকে, সর্ব্বব্যাপী ও শাশ্বত আত্মাকে মূর্ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন সেই শক্তি সেই অনুভূতিকে কবিতা বা কাব্যমাতা বলা হইয়াছে।

সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইনিই মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যার জনক শুক্রাচার্য্যের জননী। ইনিই তন্ত্রের কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। সাধনা করিয়া তাঁহাকে জাগ্রত করিতে না পারিলে সাধকের সিদ্ধি নাই। এই আনন্দস্বরূপা প্রকৃতি দেবীকে ভক্তরূপে যাঁহারা বন্দনা করেন তাঁহারাই ঋষ্ অর্থাৎ সত্যদৃষ্টি প্রভাবে সর্ব্বত্রই রসরূপী সুন্দরকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া কখনও কথায় কখনও সুরে কখনও রঙে কখনও রেখায় কখনও সঙ্গীতে কখনও ভঙ্গীতে মূর্ত্তিদান করিয়া আচার্য্য, কবি, গুরু, ঋষি প্রভৃতি নামে পরিচিত হন। অন্তরের আনন্দে নানা উপকরণে বিভিন্ন রূপে কবি সুন্দরকে সৃজন করিয়া মুমূর্ষুকে প্রাণ দিতেছেন, ভীতকে অভয় দিতেছেন, বীর্য্যদান করিতেছেন দুর্ব্বলকে। এই জন্যই শুক্রাচার্য্য আপদ্‌কালে কাব্যমাতার শরণাপন্ন হইতে অসুরদিগকে আদেশ করিতেছেন।

এখন কথা হইতেছে এই ধানভানিতে শিবের গীত

বোধিসত্ত্বের হস্তিদন্ত
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেন? সম্পাদক মহাশয় অনুরোধ করিয়াছেন আধুনিক ভারতশিল্প ও বিশিষ্ট শিল্পীগণের বিশেষত্ব লইয়া একটী প্রবন্ধ লিখিতে। এতখানি পৌরাণিক আখ্যায়িকার অবতারণা আপাত-দৃষ্টিতে অবান্তর মনে হইতে পারে, কিন্তু হিন্দু গৃহে জন্মলাভ করিয়া কথা বলিতে বা বুঝিতে শিখিবার পূর্ব্ব হইতেই মাতা ভগিনীর ক্রোড় হইতেই দেবদেবীর প্রতিমাকে প্রণাম করিতে শিখিয়াছি, পৌরাণিক দশকর্ম্মের মধ্য দিয়া মানুষ হইয়াছি, এমন কি মাতার কুমারীজীবনের শিবপূজার স্বপ্ন পর্য্যন্ত শোণিত স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে। আজিকার অবনীন্দ্র, নন্দলাল প্রমুখ রূপদক্ষগণের চিত্রকাব্যে, প্রাচীন বুদ্ধমূর্ত্তিতে, দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যে ভাস্কর্য্যে এবং বিশ্বের অপরাপর জনপদের প্রাচীন ও আধুনিক রূপকর্ম্মগুলি হইতে যে রসাস্বাদন করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি তাহার প্রথম ইঙ্গিত আসিয়াছিল আমাদের পুরাণ-পরিকল্পিত

উমার তপস্যা
শ্রীনন্দলাল বসু

নিত্য-আরাধ্য সামাজিক জীবনের দেবদেবীর প্রতিমা দর্শনের ভিতর দিয়া, চণ্ডিমণ্ডপে গন্ধপুষ্পচর্চ্চিত কথকঠাকুরের পুরাণ গান হইতে। তথাকথিত শিল্প-সমালোচকের ন্যায় আধুনিক ভারতশিল্পকে ভাষান্তরিত করিতে না পারিয়া, পাঠকের মন ও চক্ষুকে ভারতশিল্পের রূপের দিকে আকৃষ্ট না করিয়া এক ঝলক আধ্যাত্মিক ধোঁয়া উড়াইয়া তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়লব্ধ চশমা পরিশোভিত ক্ষীণ দৃষ্টিকে চিরতরে মুদ্রিত করিয়া দিবার বাসনা বা তাঁহাদের সুদুর ভবিষ্যতে কোনও কালে রূপদৃষ্টি ফুটিবার সম্ভাবনাকে কোনও রূপ তাত্ত্বিক বোমা মারিয়া বিনাশ করিবার ইচ্ছা আমার নাই।

মানব মনের শ্রেষ্ঠ বাসনাকে রূপদান করাই যদি আর্টের উদ্দেশ্য হয়, এবং পৌরাণিক সাহিত্যের তেত্রিশ কোটী দেবদেবীর স্বার্থক রূপ কল্পনা, ও পৌরাণিক ঋষির ধ্যাননেত্রে

কিরাতার্জ্জুন
শ্রীনন্দলাল বসু

যদি মানব-মন-সিন্ধু-মথিত ভারত প্রতিভার মানস শতদলের উপর লীলাকমল ও অমৃতভাণ্ড হস্তে কলাকমলার রূপমূর্ত্তি পরিকল্পিত হইয়া থাকে তাহা হইলে পুরাকালে লিখিত হইলেও পুরাণ সাময়িক সাহিত্যের সঙ্কীর্ণ পর্ণকুটীর হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মহাকালের বিরাট ও বিস্তীর্ণ চিত্রশালায় স্থান পাইয়াছে। এবং সেই কারণেই আজিকার অবনীন্দ্র নন্দলাল এবং অপরাপর স্বার্থক শিল্পীগণ যাঁহারা এ জীবনের সর্ব্বত্রই মানবে দেবতায় পশুতে পক্ষীতে জলেস্থলে পত্রেপুষ্পে সুন্দরকে দেখিতেছেন ও আঁকিতেছেন। তাঁহারাও রূপদৃষ্টি ও শিল্পসৃষ্টির প্রথম প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, পৌরাণিক সাহিত্য, মূর্ত্তি ও চিত্রশিল্প হইতে।

ভারতবর্ষের শিক্ষাভিমানী বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত পণ্ডিত মণ্ডলী বা অর্থবান তথাকথিত শিল্পরসিকবৃন্দ ভারতমাতার রূপমূর্ত্তি দেখিতে অভিলাষী হইয়া আধুনিক রূপদক্ষদিগের

দময়ন্তী
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রথম যুগের শিল্প-সৃজন পরিদর্শন করিলে সে যুগের অবনীন্দ্র নন্দলাল, শৈলেন্দ্র, ক্ষিতীন্দ্র বিচিত্রিত ভারতীয় শিল্পকলা, শিবদুর্গা, রাধাগোবিন্দ, কালীয়দমন, দুষ্মন্ত শকুন্তলা, কচ ও দেবযানী প্রভৃতি রামায়ণের ও মহাভারতের ও অপরাপর পৌরাণিক চিত্রমূর্ত্তিতে পূর্ণ দেখিবেন। ইহাই আমার চিত্র-শিল্প আলোচনা করিতে পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবতারণা করিবার কারণ।

কাব্য ও চিত্র-শিল্প সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্প একই আনন্দ ও রসরূপে মূর্ত্ত হইলেও, তাহাদের উদ্দেশ্য ও আবেদন এক হইলেও, রসিক মনের মণিকোঠায় প্রবেশের পথ তাহাদের এক নয়। একজন কাব্য ও সঙ্গীতরূপে কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করেন মনপ্রাণ আকুল করিতে নব নব সুর বাণী ও ছন্দের রত্নচতুর্দ্দোলায়, আর একজনের প্রবেশ পথ একই প্রয়োজনে আঁখির ভিতর দিয়া বর্ণের সপ্তাশ্বযোজিত

যম ও নচিকেতা
শ্রীনন্দলাল বসু

বিচিত্র আলোকময় রেখায় রথারোহণ করিয়া। যাত্রারম্ভে দুইএর ভিন্ন মূর্ত্তি থাকিলেও যাত্রাশেষে রসিকের হৃদি-বৃন্দাবনে দুইএ মিলিয়া একই আনন্দরসঘন ভাবে ভরা যুগলমূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইতেছেন।

সঙ্গীত উপভোগ করিতে হইলে শ্রোতার যেরূপ সুরে কান তৈয়ারী থাকা প্রয়োজন, কাব্য-সমালোচকের যেমন ধ্বনি ও ছন্দে কান প্রস্তুত চাই, চিত্র-সমালোচকেরও তদ্রূপ রেখা ও বর্ণ-ছন্দের আবেদন বা সুর ধরিতে পারিবার মত দৃষ্টিশুদ্ধির প্রয়োজন আছে। চিত্র-সমালোচককে জানিতে হইবে রূপদক্ষ অঙ্কিত চিত্র দৃষ্ট বস্তুর ছাপ নয়, জীবনের ন্যায়ই তাহা প্রাণবন্ত। তাহার মন রহিয়াছে, মনের কথা রহিয়াছে, সহানুভূতি লইয়া ইহার সান্নিধ্য লাভ করিলে অর্থাৎ চোখের সহিত মন মিলাইয়া ছবি দেখিলে রূপ তাহার নীরব রেখায় ভাষায় রঙের ভাষায় জীবনের বন্দনা-গান করিয়া মনপ্রাণ

শিবতাণ্ডব
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

আকুল করিয়া দিবে। রূপ সান্নিধ্যে রূপদৃষ্টি লাভ হইলে রূপ-রসিক বুঝিতে পারিবেন এবং পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষাভিমানী অর্দ্ধশিক্ষিত তথাকথিত পণ্ডিত মণ্ডলীকে বুঝাইতে পারিবেন যে, ভারতবর্ষের রূপ-দেবতা সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ কেবলমাত্র কথিত ভাষায় পয়ার অমিত্রাক্ষর ও মন্দাক্রান্তা ছন্দে নৃত্য করিতেছেন না, কথার অন্তরালে রূপলোকের নাট্য বেদীকায় তিনি রেখা ও বর্ণ-ছন্দেও নৃত্য করিতেছেন। রূপরসিক তাহাদিগকে বুঝাইতে সক্ষম হইবেন জাতীয় জ্ঞানমন্দির বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কলালক্ষ্মীকে নির্ব্বাসিত করিলে এই জাতীয় দুর্দ্দিনে বীর্য্য সাধনা, শক্তিসাধনা, জ্ঞানসাধনা, অসম্পূর্ণ থাকিবে। কাব্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া জীবনকে উৎসবময় করিতে হইলে, কদর্য্যতার হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে, জাতীয় স্বরাজ্য কামনা সত্য হইলে, সাময়িক মাসিক পত্র প্রকাশিত শিল্প-সমালোচনারূপ সাহিত্যিক

ভিক্ষার্থী বুদ্ধ
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বৈরচারের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে বর্ত্তমান সমাজের স্তম্ভরূপী বাক্‌সর্ব্বস্ব পণ্ডিতমণ্ডলীকে অবহেলিত নীরব শিল্পসাধকদিগের রূপসাধনার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে হইবে। কবি-জয়ন্তীর ন্যায় জাতীয় চিত্রশালা স্থাপনায় দেশব্যাপী উৎসব করিতে হইবে। আপনার শুদ্ধদৃষ্টি লইয়া শিল্পবস্তুর সহিত সাক্ষাৎ ভাবে পরিচয় লাভ করিয়া শিল্প-সমালোচনা করিতে হইবে। জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে অসনে বসনে জাতীয় সংস্কৃতি ও সুরুচি প্রকাশ করিতে হইবে। মাসিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় কেবল মাত্র শিল্পীর নাম দেখিয়াই অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট চিত্র প্রকাশ করিয়া, কোনও অখ্যাতনামা সার্থকশিল্পী অঙ্কিত শ্রেষ্ঠ চিত্রখানি পত্রিকার মধ্যে বা শেষভাগে ছাপিয়া আপনাকে শিল্পরসিক বলিলে চলিবে না।

এক সময়ে ভারতবর্ষে আপামর সাধারণে তীর্থযাত্রাকে

শিবের বিষপান
শ্রীনন্দলাল বসু

জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করিত। সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক কর্ম্মের অবসানে পরিণত ও পরিতৃপ্ত মন লইয়া বহুযোজনব্যাপী দুরূহ ও দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া জাতীয় প্রতিভাকে অভিনন্দিত করিবার যে অভিনব রীতি সমাজে বর্ত্তমান ছিল, ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আজিকার আমরা বহুদিনপুষ্ট সেই জাতীয় সংস্কার বর্জ্জন করিয়াছি, ইংরাজী শিক্ষিত আধুনিক ধর্ম্ম-সংস্কারকগণের আত্মঘাতী উদ্যম ও ওজস্বিতার ফলে ভারত-বর্ষের বহুরূপী ভগবান আজ নিরাকার হইয়াছেন। ভারতের তীর্থক্ষেত্রগুলি আজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টির অন্তরালে সংস্কারাভাবে জীর্ণ ও হতশ্রী হইয়া বিগত সভ্যতার পরিত্যক্ত কঙ্কালে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভাস্কর্য্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, পৃথিবীর যে-কোন দেশের রূপদক্ষগণের রূপকর্ম্মের আদর্শ স্বরূপ এদেশের নটরাজ, শিবকামসুন্দরী প্রভৃতি বিগ্রহমূর্ত্তিগুলি

জতুগৃহ দাহ
শ্রীনন্দলাল বসু

শিক্ষিত ভারতবাসীর দৃষ্টির অলক্ষ্যে বৈদেশিক প্রত্নতাত্ত্বিকগণ কর্তৃক মৃত্তিকাগর্ভ ও পরিত্যক্ত ভগ্নমন্দিরের রত্নসিংহাসন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন জ্ঞানমন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। জীবন্ত জাতি সমূহের নবীন ভক্তপূজারীবৃন্দ তাঁহাদের পূজা করিতেছেন, ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া আপনাদিগের নিবন্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন, রূপশিল্পীগণ নূতন সৃজনের প্রেরণালাভ করিতেছেন এবং রূপরাসকবৃন্দ আমাদের নিত্য-উপাস্ত দেবদেবীর রূপমূর্ত্তি হইতে বিমল আনন্দলাভ করিয়া জীবন উৎসবময় করিতেছেন। অপর পক্ষে বিদ্যাভিমানী ও স্বরাজ্যকামী আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার ঐশ্বর্য্যের বাহিক চাকচিক্য প্রসূত তমসাচ্ছন্ন দর্শন লইয়া ইউরোপীয় জাতি সমূহের আত্মসৌন্দর্য্য ও সত্য-সাধনার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছি না; স্বধর্ম্ম হারাইয়া

কালিয় দমন

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

ভয়াবহ পরধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বাহিক উপকরণ বাহুল্যে জীবনকে ভারাক্রান্ত করিতেছি। সর্ব্বপ্রকার জাতীয় সৃজন-সংকল্প স্বতঃস্ফূর্ত্ত না হইয়া অনুকরণে পর্য্যবসিত হইতেছে। জীবন. বীর্য্যহীন ও শ্রীহীন হইয়াছে। যাহাদিগকে আশ্রয় করিয়াছি তাহাদিকেও সম্পূর্ণ দেখিতে পাইতেছিনা, জাতীয় ধমনীতে প্রাণস্পন্দন নাই বলিলেই চলে এবং সামাজিক জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন, ভাণ ও মিথ্যাচার প্রতিপত্তি লাভ করিতেছে।

এইরূপ অবস্থায় একমাত্র আশার কথা হইতেছে যে, সত্যের মৃত্যু নাই এবং অবনীন্দ্র নন্দলাল প্রমুখ সত্যাশ্রয়ী অমর আদর্শবাদী রূপশিল্পীগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। জাতীয় আত্মাকে তাঁহার মূর্ত্তিদান করিয়াছেন। প্রগলভতা ত্যাগ করিয়া ভক্ত পূজারীর ন্যায় শিক্ষার্থীর ন্যায় তাঁহাদের সার্থক শিল্পসৃজনের সম্মুখীন হইলে জাতীয় মস্তিষ্ক সমতালাভ করিবে; সত্য, শিব, সুন্দরের সান্নিধ্যে আসিয়া জাতীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে এবং আত্মসচেতন

একলব্য
শ্রীনন্দলাল বসু

হইয়া জাতি জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইয়া শ্রী ও ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হইবে।

শিল্প-সমালোচনা করিতে বসিয়া প্রথমেই মনে হইল, যে দেশে শিল্পের সহিত জীবনের কোনও যোগ নাই সে দেশে শিল্প-সমালোচনা না করিয়া শিল্পের সহিত সমাজের সম্বন্ধ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখাই বেশী প্রয়োজনীয় এবং সেই কারণেই যিনি আপনার অন্তরালোকে রূপসৃজনের মধ্য দিয়া জাতীয় জীবনের অন্ধকার নাশ করিতেছেন সেই সর্ব্বজন প্রণম্য শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথকে প্রণাম করিয়া এবং তাঁহার ও অপরাপর শিল্পীগণের কতকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র প্রকাশিত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

# এক যাত্রায় পৃথক ফল

## শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

### প্রথম অঙ্ক

[ চৈত্রমাসের প্রভাত। কমিশ্‌নার সাহেবের বাংলোর সামনের দিক্‌। প্রশস্ত বারান্দার নীচে লাল কাঁকরের রাস্তা, বাগানের সামান্য অংশ চোখে পড়ে। বারান্দার পশ্চিম দিকে কাঠের পার্টিশান করিয়া বারান্দাকে দুই অসমান অংশে খণ্ডিত করা হইয়াছে। ক্ষুদ্রতর অংশে সুনীতি দেবী বসিয়া আছেন, বিরদা দাসী তাঁহার নিকট হইতে কি কি তরকারি কুটিতে হইবে সে সম্বন্ধে আদেশ লইতেছে। বাংলোর বাহিরে একটা গাড়ী থামিবার শব্দ হইল। অল্পক্ষণ পরেই সৌম্য ও শীলা আসিয়া রাস্তায় দাঁড়াইলেন। ]

সৌম্য। এই বাড়ীই ত? দেখ। আমি এর আগে এখানে আসিনি।

শীলা। হাঁ গো হাঁ, এই বাড়ী। চুপ, ঐ যে মা বসে আছেন। বাবা বোধ হয় কোথাও বেরিয়েছেন।

সৌম্য। তাহলে আমি হরি সিংকে ইসারা করে দিচ্ছি বাক্সগুলো নামিয়ে আনুক গাড়ী থেকে।···খবর না দিয়ে চুপি চুপি এসেছি, কেউ জানে না। দেখনা, এক মজা করি।···এই, কোই হায়! (ছুখিৎ সিং বাহির হইয়া আসিল) কমিশ্‌নার সাহাব কোঠিমে হায়?

ছুখিৎ সিং। জী নেহি। সাহাব বাহাদুর বাহার গিয়া, আনেকো কুছ্‌ ঠিকানা নেহি। মেম সাহেব বাহাদুর কাম্‌মে হায়, ফুর্স‌ৎ নেহি। মুলাকাৎ কো টাইন্‌ সাড়ে পাঁচ বাজে সে।

সৌম্য। অর্থাৎ আমাদের ভাগিয়ে দিতে চায়।··· দেখো, তুম এই দো কার্ড লে যাকে দেও।

ছুখিৎ সিং। (দুইখানি জলে ভেজা রোদে পোড়া চেয়ার বাহির করিয়া বসিতে দিয়া কহিল) আপলোক বৈঠিয়ে, হাম্‌ কার্ট্‌ লে যাতা। (প্রস্থান)

শীলা। কি দুষ্টুমি করছ তুমি কার্ড পাঠিয়ে।

সৌম্য। এস বসা যাক। বেশ weather-beaten চেয়ার দুখানি।

শীলা। ছিঃ ওতে বসনা। ছারপোকায় ভর্ত্তি।

সৌম্য। হোক ছারপোকা, ওরা হল India's dumb millions!

[ বারান্দার অপর অংশে যাইয়া ছুখিৎ সিং সুনীতি দেবীকে কার্ড দুখানি দিল ]

ছুখিৎ সিং। ভাগায় দেনেকো বহুৎ চিষ্টা কিয়া, লেকিন্‌ গিয়া নেহি। মুলাকাৎ করনে মাংতা।

সুনীতি দেবী। কে আবার এই সকাল বেলায় কাজের সময় জ্বালাতন করতে এল। লোকদের আক্কেল বলে কি পদার্থ নেই বাছা। চশমাটা আবার কোথায় ফেললুম। এই বিরদা, যা ত মা, চশমাটা খুঁজে এনে দে, পড়ে দেখি কার কার্ড।

[ ইতিমধ্যে সৌম্য ও শীলা চুপিচুপি সরিয়া গেলেন ]

বিরদা। (বারান্দা সংলগ্ন ঘরের মধ্যে গিয়া সেখান হইতে চেঁচাইয়া কহিল) খুঁজে ত পাচ্ছিনি মা, ছিষ্টি ঢুঁড়নু, কুথাকে যে গেলেন চশমা জোড়াটি—

সুনীতি দেবী। দেখ্‌না, আয়না-টেবিলে, নয়ত গোসলখানায়, নয়ত আলমারির মাথার উপর, নয়ত ডুলির মধ্যে। ঐখানেই আছে, যাবে আবার কোন্‌ চুলায়। ওরে, এই এই, কে আছিস! বাইরে একটা কুকুর ঘুরছে, যা যা, এখুনি ওর মুখে একটা লাথি মেরে আয়। দুধের কড়ায় মুখ দেবে।

বিরদা। (ঘরের মধ্য হইতে উচ্চৈঃস্বরে) না পেলি গো মা, হাই জুতার ভিতর হাত পুরে দেখলি, ছাতাটি খুলে দেখলি, বাকী আর কিছু রাখলি না, পেলি না।

সুনীতি দেবী। মাগী যেন ন্যাকা !···ওরে ঐ ছোঁড়া, আবার বসল বসল, ঐ কাগটা বসল ঐখানে। যা যা, ঝাঁটা রেখে ওর কানটা মলে দিয়ে আয়, কাল আমার সমস্ত বড়ী খেয়ে গেছে।

ছুখিৎ সিং। হো কাউয়া নেহি হজুর, সো এক ডুসর-ধাড়ি কাউয়া বা!

সুনীতি দেবী। আরে না না ঐটেই। সেটাও ছিল কালো কুচকুচে দেখতে, আর ডাকছিল কা কা করে। ঐটেই সেইটে।

জমাদার। কাগটা পেলিয়ে গেলেন মা।

সুনীতি দেবী। পেলিয়ে গেলেন মা! কোনো কর্ম্মের নস, কেবল গিলতে পারিস। দে বারান্দাটা আর একবার ঝাঁটা দে।···অ বিরদা, পেলি চশমা? ও মাগীর কর্ম্ম নয়, যাই আমি নিজে গিয়ে দেখি। (যেমন উঠিলেন, অমনি ঠক্ করিয়া খাপশুদ্ধ চশমা পড়িয়া গেল) এই ত চশমা রয়েছে, আর মাগী চারিদিক খুঁজে মরছে, মাগী যেন কানা। ···(চশমা পরিয়া কার্ড পড়িলেন) এস্ রয়, আই-সি-এস, মিষ্টার এণ্ড মিসেস্ রয়,—এরা আবার কারা?...ওমা, এযে শীলা সৌম্য,—দেখদিকি দুষ্টুমি, চুপিচুপি এসেছে, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কার্ড পাঠিয়ে দিয়ে। ওরে ও ছুখিৎ সিং, অবিরদা, এই ঠাকুর, ওরে তোরা সবাই গেলি কোন্ চুলায়, মেয়ে জামাই এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তোরা কি সবাই চোখের মাথা খেয়েছিস্ নাকি—ওরে—

[হুড়মুড় করিয়া যে যেখানে ছিল সবাই আসিয়া পড়িল—বিরদা তরকারি কুটিতে ছিল তাহার হাতে বঁটি, ঠাকুর রাঁধিতেছিল আসিবার কালে তাড়াতাড়ি খুন্তিটা হাতে করিয়াই আনিয়াছে, মালী ছিল বাগানের কাজে, কোদালটি সঙ্গে আনিয়াছে, জমাদার ঝাড়ুটি পরিত্যাগ করে নাই]

সকলে। কি হয়েছে মা, কি হয়েছে?

সুনীতি দেবী। হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। দিদিমণি আর দাদাবাবু এসে বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তোরা সবাই হাঁ করে ঘুমুচ্ছিস্?

সকলে। আমাদের দিদিমণি?

সুনীতি দেবী। আরে হাঁ হাঁ—আমাদের দিদিমণি নয়ত কি ওপাড়ার নস্কর বাবুদের দিদিমণি! তোদের কথা শুনলে গা জ্বলে।

[সকলে বাহিরের দিকে তাকাইতে লাগিল]

ছুখিৎ সিং। ভাগ্ গিয়া। দিদিমণি দাদাবাবু নেহি, আউর কোই হোবে।

সুনীতি দেবী। না না, ভাল করে দেখ্। যাই আমিই গিয়ে দেখি।

[সবাই ভাল করিয়া বাহিরের দিকে দেখিতে লাগিল, এমন সময় সৌম্য ও শীলা ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহারা ইতিমধ্যে কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া পরিচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছেন। যথাবিহিত প্রণামাদির পর—]

সুনীতি দেবী। এস এস বাবা এস। এস এস আমার মা এস। বড্ড রোগা দেখছি। একটা খবর দিয়ে আসতে হয়। কী যে সব ছেলেমানুষী কর তোমরা বাছা, দেখ দিকি কত কষ্ট হল!

সৌম্য। কষ্ট আবার কি মা। চুপি চুপি ঘরে ঢুকে দেখি তোয়ালে সাবান, কাপড় চোপড় সব সাজান রয়েছে, আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে সে সমস্ত সদ্ব্যবহার করলাম।

সুনীতি দেবী। বেশ করেছ। বেয়ারাকে ডাকলে না কেন, দেখ দিকি কত কষ্ট হল।

সৌম্য। খুব মজা হল মা। বিরদা আপনার চটিজুতার ভেতর হাত দিয়ে দেখছিল সেখানে চশমা আছে কি না।

শীলা। আর মা, তোমার কি বিরক্তি! বলছিলে লোকগুলার কি আক্কেল বলে কোনো জিনিষ নেই বাছা!

সুনীতি দেবী। আমি কি জানি বাছা যে তোমরা এসেছ।

শীলা। মা, তোমার ছুখিৎ সিং আমাকে চিনতেও পারল না। নতুন লোক হলেও মাস ছয়েক আগে আমাকে দেখেছে ত।

ঠাকুর। ছুখিৎ সিং, তুমি একটি আস্ত গধ্বা আছ।

ছুখিৎ সিং। কাহে লা!

সৌম্য। এই যে ঠাকুর, চিনতে পার? তোমায় কলকাতার বাড়ীতে দেখেছিলাম। কেমন আছ?—তা হাতে খুন্তি কেন, লড়াই করছিলে নাকি?

ঠাকুর। রান্না করছিলুম দাদা,—সিঙাড়া ভাজিকিরি পাঠাতে হবে নোল্‌তি বাবুদের বাড়ী, আর ডাক্তার সাহেবের বাড়ী মালোপুয়া।

সৌম্য। ধন্য কপাল ওদের। তা আমরা কি খাব মা—

সুনীতি দেবী। খাবে বই কি বাবা,—অ ঠাকুর, এঁটো খুন্তিটা রাখ বাছা, হাত ধুয়ে আর এক কড়া ঘি নিয়ে যাও, দাদাবাবু ডালপুরী ভালবাসেন, বেশ ভাল করে ডালপুরী তৈরী কর।

শীলা। আর মা, আমার জন্যে খাজা।

সুনীতি দেবী। নিশ্চয়! ঠাকুর, অমন সঙের মতন দাঁড়িও না বাছা—নাও, আর এক কড়া ঘি—

সৌম্য। জয় প্রভু জ'গঁড়নাথ, ঠাকুর, আজ পেলে তিন তিন কড়া ঘি। দেখো, লোভে পড়ে যেন চুরি করে বস না, তাহলে স্বর্গে যেতে পাবে না, সেখানে তুমি না থাকলে আমাদের খাওয়াবে কে!

সুনীতি দেবী। কি দাঁড়িয়ে হাসছ ঠাকুর। এই নাও চাবি নাও, ঘি বের করে নাও আর বাবুর্চিকে বলে দাও দাদাবাবু দিদিমণির জন্যে এক্ষুণি চা রুটি ডিম করে আনবে—যাও।

[ সৌম্য ইতিমধ্যে একটি গ্লাস হাতে লইয়া সোরাই হইতে জল ঢালিবার উপক্রম করিলেন ]

সুনীতি দেবী। ওমা, ওকি, ওকি! বাবা তুমি নিজের হাতে জল গড়িয়ে খাবে! কেন, এই বিরদা, ও ঠাকুর, ঐ দুখিৎ সিং—তোরা সবাই কি মরেছিস্!

[ তাহারা মরে নাই একথা প্রমাণ করিবার জন্য হুড়মুড় করিয়া সকলে আসিয়া সৌম্যের হাত হইতে গ্লাস কাড়িয়া লইল। মালীর কোদালের চোট্ লাগিয়া সোরাই ভাঙিয়া বিরদার পায়ের উপর পড়িল,—জল ছিটাইয়া গেল। জমাদার ঝাঁটা সমেত ঠাকুরকে ছুঁইয়া ফেলিল ]

বিরদা। (তার স্বরে) মালী মুখপোড়া আমায় খুন করলে রে—

ঠাকুর। (রোষ কষায়িত নেত্রে) তুই ঝাড়ু নিইকিরি মোরে ছুঁইলি কেমতি রে মেথড়!

মালী। (ভাঙা সোরাই হাতে লইয়া) শড়া সোড়াই ত ভাঙিকিড়ি পকাই গেল!

সুনীতি দেবী। আজ তোদের সবাইকে বিদেয় করব, আসুন উনি ফিরে। এই জমাদার, দে বারান্দা আর একবার ঝাঁটা দে।

সৌম্য। নিজের হাতে জল গড়িয়েও খেতে দেবেন না মা! কি মুস্কিল!

সুনীতি দেবী। না বাবা, দুদিনের জন্যে এসেছ, কেন কষ্ট করতে যাবে!

[ এমন সময় বাহিরে মোটর আসিয়া থামিল ]

শীলা। ঐঃ বাবা এলেন, যাই। (দৌড়িয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন, প্রায় তখনি মিষ্টার ব্যানার্জির কাঁধে ঝুলিতে ঝুলিতে পুনরায় প্রবেশ করিলেন)

মিঃ ব্যানার্জি। এঁ্যা, তোমরা যে হঠাৎ, কোনো খবর দেওয়া নেই কিচ্ছু নেই, কখন এলে?

শীলা। খুব মজা, নয় বাবা? উনি চারদিনের casual leave নিয়ে বললেন, চল, না বলে হঠাৎ গিয়ে পড়া যাক্, আমিও বললুম চল। তোমাদের খুব আশ্চর্য্য করে দেব বলে খবর দিইনি। তা আজ সকাল থেকে যা মজা হচ্ছে—যাকে বলে হৈ হৈ ব্যাপার, রৈ রৈ কাণ্ড! এই ভাঙা সোরাই হচ্ছে তার latest outburst!

মিঃ ব্যানার্জি। এই, তোরা সবাই সঙের মত কোদাল কুড়ুল নিয়ে কি করছিস্? যাঃ, পালা।...পাগলী মা আমার, চিরদিনই কি এম্‌নি ছেলেমানুষ থাকবে? তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে বাড়ী আমাদের অন্ধকার হয়ে গেছে। কেউ যদি হাসে, আমি বলি আমার শীলা মা বুঝি! তোমার মা আর আমি রোজ সন্ধ্যায় বসে বসে ভাবি তোমরা ছুটিতে কি করছ।

সুনীতি দেবী। (হাতপাখা লইয়া মিঃ ব্যানার্জিকে বাতাস করিতে করিতে) বস, একটু ঠাণ্ডা হও, এই রোদ্দুর থেকে এলে। তোমার জন্যে লেবুর সরবৎ করে রেখেছি, বরফ দিয়ে এখুনি নিয়ে আসছে।

মিঃ ব্যানার্জি। তুমি আবার কষ্ট করে পাখা করছ কেন? (শীলাকে) তোমার মায়ের কী যে বাতিক, মাথার

ওপর ফ্যান্ ঘুরলেও হাতপাখাটি করা চাই। যাক,. তারপর সৌম্য তোমাদের প্রোগ্রাম কি বল শুনি।

লীলা। বাবা, উনি ভগ্নস্তূপ দেখেন নি। চলনা আজ সবাই মিলে যাওয়া যাক, সোজা মোটরের রাস্তা ত রয়েছে।

মিঃ ব্যানার্জি। বেশত, তোমরা যাও। প্রাচীন পাল ও সেন রাজাদের অনেক কীর্ত্তি কাহিনী দেখতে পাবে। খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করে ছুটোর সময় বেরিয়ে পড়।

সৌম্য। আপনারাও চলুন না।

মিঃ ব্যানার্জি। আজ আমার একটু কাজ আছে। তাছাড়া আমি ওসব অনেকবার দেখেছি আর ভাল লাগে না। বরং তোমার শাশুড়ীকে নিয়ে যাও।

সুনীতি দেবী। না না, রক্ষে কর। ওসব ভাঙা কলসি আর কাণা হাঁড়ি কতবার মানুষ দেখতে পারে। তাছাড়া আমি না থাকলে ঠাকুর ডালপুরী ধরিয়ে ফেলবে, খাজা মোটা করে ফেলবে।

মিঃ ব্যানার্জি। এই, কোই হায়, ড্রাইভার বাবুকো বোলাও।

[ ড্রাইভার জগু প্রবেশ করিল। বয়স পঁয়ত্রিশও হইতে পারে পঁয়তাল্লিসও হইতে পারে। পাকানো পাকানো রোগা-চেহারা, মাথায় লম্বা টেরি, চোখ ঈষৎ বসিয়া গিয়াছে, গালের হাড় ঠেলিয়া বাহির হইয়াছে। পরিয়া আছে ড্রাইভারের খাকী সুট—আড়ষ্ট হইয়া আছে ]

মিঃ ব্যানার্জি। দেখ জগু, আজ ছুটোর সময় বড়-গাড়ী তৈরী রাখবে। দাদাবাবু দিদিমণি ভগ্নস্তূপ দেখতে যাবেন। যাও, তেলটেল সব ঠিক আছে কিনা দেখে নাও।

জগু। আজকে ?

সুনীতি দেবী। এই রেঃ, ওর মাথায় বাজ পড়েছে। দুপুর বেলার ঘুমটি আজ আর হচ্ছে না, বুঝেছ ?

সৌম্য। বড়গাড়ী কেমন চলছে জগুবাবু?

জগু। কেমন আর চলবে, ভালই চলছে।

সুনীতি দেবী। সে তোমার গুণে নয়, গাড়ীর গুণে। অখণ্ড পরমায়ু গাড়ীর তাই জগুর হাতে এখনো টিঁকে আছে। গিয়ার টানে যখন তখন আওয়াজ হয় যেন ষ্টীম্ রোলার চলে গেল। এঞ্জিনটার মধ্যে দুশো মণ ধুলো, একটিবারও মোছে না।

সৌম্য। সে কি, জগুবাবু ?

জগু। কি হবে মুছে-দাদাবাবু! আবার চললেই ত আবার ধুলো জমবে।

সুনীতি দেবী। শোনো কথা! এম্নি কুঁড়ে ওটা,—সাইকেল কিনে দেবার পর থেকে ও আর পায়ে হাঁটে না। যদি বলি জগুবাবু একবার হাঁচ ত, সাইকেল করে গিয়ে হেঁচে আসবে।

[ ছুখিৎসিং এর প্রবেশ ]

ছুখিৎ সিং। ছোটা হাজরি তৈয়ার হজুর।

সুনীতি দেবী। চল চল সমস্ত রাত ট্রেনে এসেছ, আর সকাল থেকে যা হৈ হৈ। খুব খিদে পেয়েছে তোমাদের। চল চল, আর দেরি নয়।

## দ্বিতীয় অঙ্ক

[ শোবার ঘর। মেঝের উপর নীল রঙের কার্পেট পাতা; দুইটা স্প্রীংএর খাটে বিছানা করা, মশারি ফেলা। দুই ধারে দুইটা টিপয় তাহাতে কাঁচের জলাধারে জল ও গ্লাস। প্রত্যেক খাটের সঙ্গে সংলগ্ন নীল শেড্ দেওয়া বাতি। ঘরের এক কোণে আয়না টেবিল, তাহার উপর প্রসাধনের বিভিন্ন সরঞ্জাম। একপাশে, আয়না টেবিলের অনতিদূরে ছোট্ট বেঞ্চের উপর দুইটা চামড়ার সুটকেস্, একটার ডালা খোলা। জানালায় কার্টেন্ দেওয়া। গোসলখানায় যাইবার দরজা উন্মুক্ত রহিয়াছে, গোসলখানার ভিতরে অন্ধকার। একটিমাত্র বাতি শোবার ঘরে জ্বলিতেছে। ]

( এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে অতি সন্তর্পণে জগু প্রবেশ করিল )

জগু। সবাই খেতে বসেছে। কতই খাচ্ছে মাইরি, কাটলিস্ আম্লেট্ মামলেট্! এই তকে যদি কিছু হাতিয়ে নিতে পারি। এই যে, আজ বরাৎ ভাল্, সুটকেস্টা খোলাই পড়ে আছে। আহা কিবা চটক্দার তোফা সব সাড়ীরে দাদা! নিই দুখানা বেছে। ( দুখানি সাড়ী

উঠাইয়া লইয়া কোটের বোতাম খুলিয়া ভিতরে গুঁজিয়া ফেলিল)। আরে গেল যা,—গোসলখানায় ও শব্দটা কিসের! জমাদার শালা নিশ্চয়। একটু আড়াল হওয়া যাক। সাড়ী পেলে যা খুসি হবে জুঁই মাইরি! পেট্রল চুরি করে বেচা পয়সা দিচ্ছি, নিত্যি লুকিয়ে মোটরে হাওয়া খাইয়ে নিয়ে আসছি, সাতপুরুষে কেউ কখনো তার মোটর গাড়ী চক্ষে দেখে নি,—তবু শালীর মন পাইনে! (চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল এমন সময় বাহিরে শীলা ও সৌম্যের গলার আওয়াজ পাইয়া ক্ষিপ্রতা সহকারে ফিরিল) এই রে সেরেছে, সর্বনাশ করেছে। (তাড়াতাড়ি জানালার ধারে ঘন নীল পর্দ্দার ভিতর লুকাইয়া পড়িল)।

[শীলা ও সৌম্য প্রবেশ করিলেন—সমস্ত বাতি জ্বালিয়া দিলেন]

সৌম্য। আঃ, এতক্ষণে তোমায় একলা পেয়ে বাঁচলাম। 'চুম্বন দাও সখি তূর্ণ!' (চুম্বন)। চতুর্দ্দিক লোকে লোকারণ্য,—শ্বশুরবাড়ী ত নয়, যেন মিউনিসিপ্যালিটির pay day!

শীলা। এতদিনের পর এলুম কিনা, তাই সবাই দেখা করতে এল,—ললিত বাবুরা এলেন, তাঁর মেয়ে পান্নু এল—

সৌম্য। ঐ জলন্ত বন্ত মহিষের মতন যাঁর চেহারা—

শীলা। রেস্তারেণ্ড্ ক্রীক্ এলেন—

সৌম্য। ক্রন্দনশীল কুমীরের মত যার মুখ—

শীলা। ঠাট্টা হচ্ছে, দেখবে মজা!—(সৌম্যের পিঠে ঘুসি মারিলেন) আহা, হা,—লাগল নাকি গো?

সৌম্য। লেগেছে বই কি, খুব লেগেছে। কথায় কথায় এমন মারধোর ভাল না, কোনদিন তোমায় পুলিসে ধরে নিয়ে যাবে।

শীলা। আর কখ্খনো তোমায় মারব না, এই কান মলছি।

সৌম্য। আহাহা, করকি, ছিছি, কেন কান মললে শীলু, আমি শুধু ঠাট্টা করছিলুম। এস কাছে এস, ওকি তোমার চোখে জল এল কেন?

শীলা। তুমি শীলু বলে ডাকলে আমার খুব ভাল লাগে, চোখে জল আসে।

সৌম্য। শীলু আমার শীলু। ওল্টালে হবে লুসি। তুমি আমার শীলু-লুসি। "She I cherished turned her wheel—

শীলা। "Beside a Bengali fire"—কি বল? কবির ওপর কবিয়ানা করা গেল, কিন্তু ছন্দে বাধল।

সৌম্য। তা বাধুক, কবির ওতে আপত্তি হবে না। শীলু-লুসি, এই তোমার চোখ চুমি, মুখ চুমি, চুল চুমি, কপাল চুমি।

শীলা। তুমি ত সব সময় আমার নাম ধরে ডাক না!

সৌম্য। অর্দ্ধরাত্রে ধীরে ধীরে যে নামে ডাকিব প্রেয়সীরে,—সেই কানে কানে ডাকা নাম হল শীলু-লুসি, শীলু-লুসি। আর বইটা কোথায় গেল, পেন্সিলটা জান কি, চাবিটা দাও ত,—এ সবের পক্ষে 'ওগো শুনছ'ই যথেষ্ট।...এই দেখ, শীলু-লুসি, তোমার জন্যে কি চুরি করে এনেছি। (পকেট হইতে একটি সদ্যবিকশিত ম্যাগ্নোলিয়া ফুল বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন) নেবে তুমি?

শীলা। ওমা কি সুন্দর, দাও দাও। আঃ, কি মিষ্টি গন্ধ! কোথায় পেলে গো?

সৌম্য। ঐ যে রাস্তার ধারে কাদের মস্ত বাগান, সেখানে ফুটেছিল। আমি পাঁচিল টপ্কে তোমার জন্যে নিয়ে এসেছি।

শীলা। মাগো, কী চোর তুমি! যদি ধরা পড়তে!

সৌম্য। ধরা ত পড়ি নি।...এনেছি শুধু তোমায় দেব বলে।

শীলা। আমার মাণিক! (সৌম্যের মাথার চুলের পরে চুম্বন দিলেন)

সৌম্য। রামচন্দ্র যেমন দেবীর পূজায় নীলোৎপলের জন্যে নিজের চোখ দিতে গেছলেন, আমিও যদি তেমনি একাগ্র সাধনায় তোমায় আমার সর্ব্বস্ব দিতে পারতাম!—

শীলা। সবই ত দিয়েছ আমায়, আমি ত আর কিছুই চাই না! তুমি চিরদিন এম্নি থাক, আমায় এম্নি ভালবাস। (ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল) ওমা, দশটা বেজে গেল,—যাও তুমি কাপড় চোপড় ছেড়ে এসে শুয়ে পড়।

সৌম্য। ধর, যদি বলি শোব না?

শীলা। দুষ্টুমি করো না, যাও শুয়ে পড়।

সৌম্য। ধর, যদি বলি ঘুম পায় নি?

শীলা। তোমার 'ধর যদি বলা' বার করছি। শোবে কিনা বল?

সৌম্য। কি করে শোব, আমার মাথায় যে হঠাৎ কবিত্ব এল।

শীলা। এত রাত্রে আবার কিসের কবিত্ব এল তোমার মাথায়?

সৌম্য। ঘুম পায়নির ওপর কবিত্ব।

শীলা। আচ্ছা বলে ফেল চট্ করে। তারপর শুতে যাবে। (আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল খুলিয়া চিরুণী করিতে লাগিলেন)।

সৌম্য। Shakespereএর বাংলা অনুবাদ। কবিতাটি ছোট্ট। শোনো—

গরম ক্লাসের মাঝে টেবিলে তুলিয়ে পদ
পণ্ডিতে ঘুমায়ে লয়। হাতেতে পাখার দড়ি—
ভোঁস্ ভোঁস্ নিদ্রা যায় যত পাখাওলা।
আর আমি রাজশয্যাপরে,—আমারি কি ঘুম নাই।
সিন্ধুক খুলিতে গিয়া চোরেতে ঘুমায়ে পড়ে—
আমারি কি ঘুম নাই! সত্য বটে, সত্য বটে—
যে মুণ্ডেতে করে থাকে মুকুট ধারণ,
সে মুণ্ডই করে ছট্ ফট্ বিছানায় বালিসের পরে।

শীলা। চমৎকার, অনেক মেঘদূতের কবিতানুবাদের চেয়ে ভাল। দেখ, তোমার কবিত্ব শুনে আমার হঠাৎ মনে পড়ল—আমার সুটকেসে চাবি দিতে ভুলে গেছি! (সুটকেসের দিকে যাইলেন) এ কি, আমার কাপড় চোপড় এমন করে ঘাঁটল কে!

সৌম্য। তুমিই ঘেঁটেছ, আবার কে ঘাঁটবে?

শীলা। ওগো, দেখ, আমার সেই জর্জেট সাড়ীখানা ত পাচ্ছি না—সেই যাতে আমি অমন সুন্দর করে পাড় বসিয়ে ছিলাম, সেই টে। কোথায় গেল গো, ওমা কি হবে, আমার অমন সাড়ীটা কেউ চুরি করলে নাকি গো!

সৌম্য। চুরি আবার কে করবে! ভাল করে খুঁজে দেখ, ঐখানেই কোথাও ফেলেছ!

শীলা। (সমস্ত ভাল করিয়া খুঁজিলেন) নাঃ, কোথাও নেই। ওগো, আমার অমন সাড়ীটা গেল!

সৌম্য। না, না যাবে কি বল, আছে ঐখানেই কোথাও। বোধ হয় ওঘরে ফেলে এসেছ। ছিঃ কেঁদনা শীলু-লুসি, লক্ষীটি চুপকর। না পাওয়া যায়, আমি তোমায় ঠিক ঐ রকম আর একটা সাড়ী কিনে দেব।

শীলা। আমি অত কষ্ট করে অত দিন ধরে খেটে পাড় বসালুম, আমার অমন সখের জিনিষ কে নিলে গো!

সৌম্য। কেউ নেয় নি। চল ও ঘরে গিয়ে দেখি, ওইখানেই ফেলে এসেছ হয়ত।

শীলা। না আমি ওখানে ফেলি নি, তবু চল দেখি।

[ দুজনে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন ]

[ তৎক্ষণাৎ পরদার আড়াল হইতে জগু বাহির হইয়া আসিল ]

জগু। জয় মা কালী, বড্ড বাঁচিয়ে দিয়েছ বাবা! দূর হোক্‌গে সাড়ী দুখানা ফিরিয়েই দিয়ে যাই, মেয়েটা চোখের জল ফেলছে যখন। (সুটকেসের কাছে আসিতেই আয়না টেবিলে রাখা ম্যাগ্নোলিয়া ফুলটির উপর জগুর দৃষ্টি পড়িল। সেটা দেখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল, কি ভাবিল, ফুলটি ধীরে ধীরে হাতে লইয়া ঘ্রাণ লইল, তারপর ফুলটি টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল) দেব না ফিরিয়ে!

[ পলায়ন করিল ]

## তৃতীয় অঙ্ক

[ পরের দিন সকাল বেলা। আলাপন কক্ষে পুরু মৃজাপুরী কার্পেটের উপর টেপ্‌ষ্ট্রী-ঢাকা 'সেটি', মাঝখানে ছোট্ট গোল-টেবিলের উপর একগুচ্ছ গোলাপ ফুলদানীতে সাজান। দেয়ালে নানাবিধ ফটোগ্রাফ্। মান্টল্‌পিসের উপর একধারে তাজমহলের মর্ম্মর-অনুকৃতি, অপরধারে বুদ্ধদেবের ভূমিস্পর্শ মূর্ত্তি। এক কোণে সুদৃশ্য আধারে রক্ষিত গ্রামোফোন, আর এক কোণে হাল্‌কা লিখিবার টেবিল। ]

মিঃ ব্যানার্জি। চাকরদের মধ্যে জমাদার আর ড্রাইভার হল নতুন লোক।

সুনীতি দেবী। এটা জমাদারের কাজ, আমি বলে দিলুম, তোমরা দেখে নিও।

সৌম্য। যদি চুরি করে থাকে তাহলে ওকে মারা উচিত।

সুনীতি দেবী। খুব উচিত বাবা। ওটাকে বেশ করে মারা উচিত।

মিঃ ব্যানার্জি। ন না, মারধোরের দরকার নেই।

সুনীতি দেবী। তুমি হলে বুদ্ধদেবের অবতার। জ্ঞাতিরা সাতগুষ্টি মিলে তোমার পৈতৃক বিষয় ঠকিয়ে নিলে, তুমি কথাটি কইলে না।

মিঃ ব্যানার্জি। সে সবের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক আছে?

সুনীতি দেবী। খুব সম্পর্ক আছে। দেখ তুমি বড় বেশী বাজে কথা বল, আমি তোমার মতন অমন বাজে বকি না।

মিঃ ব্যানার্জি। এই, কে আছিস, জমাদারকে ডেকে দে।

(জমাদারের প্রবেশ)

এই, তুই কিছু জানিস দিদিমণির সাড়ী হারাণর কথা?

জমাদার। আমি হুজুর?

সুনীতি দেবী। হাঁ হাঁ তুই! দেখনা বেটার চেহারা! পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত টেরি, তেলে জব্ জব্ করছে। আর দিন রাত কেবল বিড়ি আর বিড়ি। ওই নিয়েছে।

মিঃ ব্যানার্জি। দেখ, সমস্ত দিন বিড়ি খায় বলেই প্রমাণ হল না যে ও চোর।

সুনীতি দেবী। খুব প্রমাণ হল। তুমি আর আমাকে প্রমাণ শেখাতে এস না।

মিঃ ব্যানার্জি। এই ছোঁড়া, জানিস্ কিছু তুই?

জমাদার। এজ্ঞে জানিও বটে জানি নাও বটে। যদি বলেন সাড়ী মুই নিয়েছি, তবে জানি না, আর যদি বলেন দুস্‌রা কেউ নিয়েছে কিনা তবে জানি বটে।

মিঃ ব্যানার্জি। সে কিরে! কে নিয়েছে?

জমাদার। কাল রাতে দিদিমণির গোসলখানায় ঝাড়ু দিয়ে ঘর যাব, সেই তক্কে দেখি কি ডেরেইভর বাবু দিদিমণির বাক্স থেকে কি লিল, লাল পারা!

মিঃ ব্যানার্জি। বলিস কি! মিথ্যে কথা বলছিস না ত! নিজে দেখেছিস জগুকে?

সুনীতি দেবী। হাঁ গো হাঁ, ও জগুরই কাজ। বলিনি আমি তোমাদের, তখন থেকেই ত বলছি। মানুষ চিনতে আমার আর বাকী নেই।

মিঃ ব্যানার্জি। ডাক জগুকে।

[জগুর প্রবেশ]

জগু। আমাকে কি ডেকেছেন হুজুর?

মিঃ ব্যানার্জি। জমাদার বলছে কাল রাত্রে তোমাকে দিদিমণির সুটকেস্ থেকে লালরঙের কোনো কাপড় উঠিয়ে নিতে দেখেছে।

জগু। আমাকে! হায় ভগবান, হায় মা কালী! হুজুর বাহাদুর আপনি একজন বড় অফিসার হয়ে সামান্য মেথরের কথায় আমাকে চোর বললেন! উঃ, কী লজ্জা, কী অপমান! ইচ্ছা করছে গঙ্গায় ডুবে মরি!

সুনীতি দেবী। তাই মর, আপদ চুকে যাক।

জগু। (সুনীতি দেবীর পা জড়াইয়া ধরিয়া) মা, আপনি শুদ্ধ আমায় সন্দেহ করেন! হায় রে, আজ যদি আমার নিজের মা থাকত!

সুনীতি দেবী। না, না, বাছা, ওঠ, পা ছাড়। দেখ তোমরা সবাই ভুল করছ। আমি তখন থেকেই বলছি জগু অমন কাজ কখনো করবে না। আমি ওকে খুব চিনি।

মিঃ ব্যানার্জি। তুমি সকলকেই খুব চেন। আমার মনে হয় ও জগুরই কাজ।

সৌম্য। ওকে পুলিসে দিন।

শীলা। না না, পুলিসের হাঙ্গামে আর দরকার নেই। দেখ জগু যদি নিয়ে থাক ত ফিরিয়ে দাও, আমরা আর কিছু বলব না, কি বল বাবা?

মিঃ ব্যানার্জি। আচ্ছা, বেশ!

জগু। ভদ্দর লোকের ছেলে আমি, পেটের দায়ে চাকরি করি দিদিমণি। আপনি আমায় চোর ভাবলেন! তার চেয়ে (পকেট হইতে পেন্সিল কাটা ছুরি বাহির করিয়া)

এই নিন ছুরি নিন, দিচ্ছি এই গলা বাড়িয়ে, আমায় হত্যা করুন!

শীলা। (মিঃ ব্যানার্জির কাছে ঘেঁসিয়া) বাবা, ও অমন করছে কেন!

সৌম্য। থিয়েটার করবার আর জায়গা পাওনি, এখানে এসেছ থিয়েটার করতে! চলে এস আমার সঙ্গে...আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখুনি ফিরে আসছি।

[ জগুকে টানিতে টানিতে প্রস্থান করিলেন, বাহিরে মোটর ছাড়িবার শব্দ হইল ]

মিঃ ব্যানার্জি। ওরা গেল কোথায়?

সুনীতি দেবী। এই দেখ, সৌম্য ছেলেমানুষ, কিছু না করে বসে!

( বিরদার প্রবেশ )

বিরদা। দাদাবাবুর সেই শিখ বেয়ারাটি সকাল থেকে বকর বকর করছে।

শীলা। কেন কি হয়েছে?

বিরদা। কি জানি দিদিমণি।

( হরি সিং এর প্রবেশ। বিপুল তাহার দাড়ি গোঁফ, মাথায় মস্ত ঝুঁটির উপরার্দ্ধ পাগড়ীতে ঢাকা )

হরি সিং। সালাম হুজুর, সালাম মেম্ সাব, সালাম। (জোড় হাত করিয়া) কমিশ্‌নার সাহাব, মেরে নালিস হায়।

মিঃ ব্যানার্জি। কিয়া নালিস্?

হরি সিং। হুজুরে দেখিয়ে মায় খানী দানী ঘরকা লড়কা হুঁ—

মিঃ ব্যানার্জি। কিয়া হুয়া?

হরি সিং। খাইয়ে মেম্ সাব্ মেরে মুল্ক্ পাঞ্জাব জিলা ঘুরদাস্‌পুর—

সুনীতি দেবী। হ্যাঁঃ, এই সকালবেলা তোমার মুল্ক্ পাঞ্জাব জেলা ঘুরদাসপুর না গেলে আর চলছে কেন! চল্লুম এক্ষুনি আর কি!

হরি সিং। মেরে পাঁচি পাঁচি বিঘা জমিন, পাঁচি পাঁচি গাউ, পাঁচি পাঁচি ভঁয়সা, কিয়া রোশনাই;—দিন মে রোশনাই; রাতমে রোশ্‌নাই,—আলকাট্রি সে জবর!

মিঃ ব্যানার্জি। আল্‌কাট্রি কৌন চিজ হায়?

হরি সিং। আল্‌কাট্রি নেহি মালুম আপকো? ঐ যো ফাট্ বাত্তি, ফাট্ পাঙ্খা (অঙ্গভঙ্গী সহকারে)—ঐ যো বিজলী বাত্তি উস্কী আল্‌কাট্রি বোলতী হায়।

বিরদা। (হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িবার উপক্রম করিল), ওমা, আল্‌কাট্রি কি রে মুখপোড়া শিখ, এলেক্‌টিরি, জানিস্ না! কি মুখ্‌খু রে তুই!

হরি সিং। মুর্‌খ্! নেহি জী, ম্যায় মুর্‌খ্ নেহি, ম্যায় তিনঠো পাশ হায়।

মিঃ ব্যানার্জি। হাঁ!

হরি সিং। হাঁ জী! মায় একঠো পাশ হায় টেক্সীমে, আউর এক প্রাইভেট্ গাড্ডী মে, আর তিস্‌রা পাশ লেরি মে। এই তিন পাশ। মেরে লাইসন্স্ ভি হায়।

শীলা। মস্ত পাশ। জান বাবা, হরি শিং আবার ইংলিস পোয়েট্রিও জানে। হরি সিং, সাহেবকো তুম ইংলিস্ পোয়েট্রি শুনাও ত।

হরি সিং। আপকী মেহেরবাণীসে মেম্‌সাব মেরে সত্তি কুছ্ কুছ্ মালুম হায়। শুনিয়ে হুজুর ইংলিস্ পোট্রি—

টুইঙ্কেলে টুইঙ্কেলে লিটিল সটার—
হা ভাই ভাণ্ডার ভাট্ ইউ আর।

মিঃ ব্যানার্জি। আচ্ছা, সব মালুম হুয়া। তো তোমরা নালিস কিয়া বাত্‌লাও।

হরি সিং। হুজুর, আপকা ড্রাইভার গাড্ডীকো সটার্ট্ মেনেকো ওয়াখ্‌ৎ হ্যাণ্ডিল্ নেহি মারতা, সেল্‌ফ্ লাগাতা, মায় বোলা কি ভাই এয়্সা ঠিক্ নেহি হায়। বাস্ এত্নি বাৎ বোলা, ত ইস্‌লিয়ে ও মায়কো বহুৎ খারাব জবান্ সে গালি দিয়া। মায় খানীদানী ঘরকা লড়কা, মিস্তা মোকান্ জিলা ঘুরদাসপুর মুল্ক্ পাঞ্জাম মে পাঁচি পাঁচি বিঘা জমিন—

মিঃ ব্যানার্জি। আবার আরম্ভ করলে রে! কি আপদ! আচ্ছা আচ্ছা, তুম যাকে সামনে বৈঠো।

হরি সিং। বহুৎ আচ্ছা হুজুর। মায় যাতা হুঁ।

( প্রস্থান )

মিঃ ব্যানার্জি। আঃ, লোকটা কি বকতেই পারে। ওকে নিয়ে তোমরা চালাও কি করে?

শীলা। লড়ায়ে গিয়েছিল লোকটা, গুলির দাগও গায়ে আছে। ওর ওপর কেমন মায়া পড়ে গেছে।

[ এমন সময় বাহিরে মোটর ফিরিয়া আসিল। জগুকে টানিতে টানিতে সৌম্য প্রবেশ করিলেন ]

সৌম্য। ( লাল রঙের একটি সাড়ী বাহির করিয়া ) এই নাও তোমার সাড়ী।

শীলা। ওমা! এটাও নিয়েছে!

সুনীতি দেবী। সে কি! তুমি যেটা হারিয়েছিলে এটা সে সাড়ী নয়! কতগুলো সাড়ী হারিয়েছে তারও খোঁজ নেই? আচ্ছা মেয়ে যাহোক, বেশ!

মিঃ ব্যানার্জি। আহা, ওকে বোকো না, দুদিনের জন্যে এসেছে। যাও ত মা আমার, ভাল করে খুঁজে দেখে এস ত কখানা হারিয়েছে সব শুদ্ধ।

শীলা। এখানা আর সেইখানা বাবা, মোট দুখানা।

সৌম্য। এই হতভাগা! সে সাড়ীখানা কোথায়?

( জগু আর একখানা সাড়ী বাহির করিয়া দিল )

মিঃ ব্যানার্জি। স্বীকার করালে কি করে?

সৌম্য। পুলিস্ সাহেবের কাছে নিয়ে যাব বলে ভয় দেখাতেই বললে চলুন বার করে দিচ্ছি।

সুনীতি দেবী। কোথায় রেখেছিল?

সৌম্য। ( ইতস্ততঃ করিয়া ) বাজারের একটা স্ত্রীলোকের কাছে।

সুনীতি দেবী। ছিঃ ছিঃ জগু তোমার এই কাজ!

মিঃ ব্যানার্জি। এখুনি তুমি দূর হয়ে যাও।

জগু। মা—

সুনীতি দেবী। মা মা করো না, দূর হও।

জগু। মা, আমি কাল থেকে কিছুই খাই নি, সাড়ী দুখানা নিয়ে পর্য্যন্ত মনের মধ্যে আমার কি রকম যে হচ্ছে—

সুনীতি দেবী। দূর হও, দূর হও, এই দশটা টাকা নিয়ে দূর হয়ে যাও। ( টাকা দিলেন )

মিঃ ব্যানার্জি। হাঁ হাঁ, ওকে টাকা দিও না, এতে ওকে প্রশ্রয়—দেওয়া হবে।

সুনীতি দেবী। যাক্ গে মরুক গে, কত টাকা কত দিকে যায়, আর ওর বিচার ভগবান করবেন। সাড়ী দুটো যে পাওয়া গেল এই ঢের।

জগু। মা আপনার দয়া চিরকাল মনে থাকবে। চললাম মা (প্রণাম করিল; উঠিয়া যেমন প্রস্থানোদ্যত হইল, অমনি একজন পুলিস্ ইন্‌স্‌পেক্টার দরজার কাছে পথ আটকাইয়া দাঁড়াইল। তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া হরি সিং। ইন্‌স্‌পেক্টার মিঃ ব্যানার্জি প্রভৃতিকে মিলিটারি কায়দায় সেলাম করিল )

জগু। দোহাই হুজুর, আমাকে বাঁচান।

মিঃ ব্যানার্জি। ( ইন্‌স্‌পেক্‌টারকে ) কে আপনাকে খবর দিল?

হরি সিং। মায় দিয়া হুজুর।

[ সকলে নির্ব্বাক নিস্তব্ধ, জগু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল ]

## চতুর্থ অঙ্ক

[ আদালত সংলগ্ন একটি ঘর, সেই ঘর দিয়া এজলাস্ ঘরে যাইতে হয়। ঘরের মাঝখানে একটি টেবিল পাতা, চতুর্দ্দিকে বেঞ্চ। একপাশে একটা আলমারিতে কি সমস্ত কাগজপত্র ঠাসা। আলমারিতে প্রতি থাকে ধুলা জমিয়াছে, ভিতরের কাগজগুলি হলদে হইয়া গিয়াছে।

এজলাস ঘর এই ঘরের ডানদিকে। এজলাস ঘর দেখা যাইবে না—কেবল এই দুই ঘরের মাঝখানে যে দরজা আছে তাহা দিয়া লোক যাতায়াত করিবে। ]

উকীল। আজ দায়রা রয়েছে, বোধ হয় তোমার কেস্ আজ আর হবে না।

মক্কেল। আমার কেস্ যেদিনে সেদিনে আবার দায়রা রাখা কেন? রোজ রোজ কাজের ক্ষতি করে কাঁহাতক আসি বলুন?

উকীল। তা আমি কি করব বাপু!

[ দক্ষিণদিকের দরজা দিয়া পেস্কারবাবু এই ঘরে আসিলেন ]

পেস্কার। কোন্ কেস্ আপনার?

মক্কেল। ১৭ নম্বর ও, সি, অ্যাপীল। আমি হলাম অ্যাপীল্যান্ট্।

পেস্কার। ওঃ।

মক্কেল। আপনি ত পরম নিশ্চিতভাবে বললেন, 'ওঃ' পেস্কার মশাই, এদিকে আমার মামলা যদি আজ না ওঠে তাহলে আমি ত মারা যাই। অনেক দূর থেকে এসেছি।

পেস্কার। সকলেরই তাই।

( মক্কেল ও উকীল দৃষ্টি বিনিময় করিলেন )

মক্কেল। ( পেস্কারের হাতে কিছু গুঁজিয়া দিয়া ) আপনি একটু অনুগ্রহ করলেই আমার কেস্‌টি আজ শোনা হয়।

পেস্কার। নিশ্চয় দেখব। আপনি যখন অতদূর থেকে কাজের ক্ষতি করে এসেছেন।—এ কথা আগে বলতে হয়।

[ ছয় সাত জন জুরারের প্রবেশ ]

পেস্কার। আপনারা সবাই জুরার ত? যান, এজলাস ঘরে গিয়ে বসুন। এখনি দায়রা সুরু হবে।

একজন জুরার। দেখুন পেস্কারবাবু, আজ আমার একটু বিশেষ জরুরি কাজ আছে। আমাকে যদি বাদ দিয়ে দিতে পারেন।

পেস্কার। তা কি হয়। আইনে বাধবে যে।

ঐ জুরার। দেখুন, বিশেষ দরকার। ছেলেটাকে কুকুরে কামড়েছে।

পেস্কার। আপনাকে ত কামড়ায় নি।

ঐ জুরার। ( পেস্কারের হাতে কিছু গুঁজিয়া দিয়া ) দেখুন পেস্কারবাবু একটু দয়া করে।

পেস্কার। বিলক্ষণ। তা আর বলতে। আপনার ছেলেকে কুকুরে কামড়েছে। কই এ কথা ত শুনি নি। আগে বলতে হয়। একটা কাগজে দরখাস্ত করে ঠিক করে রাখুন, রেহাই করে দেব।

আর একজন জুরার। এই যে বললেন আইনে বাধবে।

পেস্কার। কখন বললুম। কুকুরে কামড়ালে আর আইনে বাধবে না। যান, আপনারা আর গোলমাল না করে এজলাস ঘরে গিয়ে বসুন।

( জুরারগণ দক্ষিণদিকের দরজা দিয়া চলিয়া গেলেন )

[ সৌম্যের প্রবেশ ]

সৌম্য। ওঃ আপনি বুঝি পেস্কার? সেসন্‌স্ কেস্‌টা কখন হবে বলতে পারেন?

পেস্কার। জজ সাহেবের কাগজ সই করা হলে।

মক্কেল। তখন থেকে শুনছি কাগজই সই করছেন। এত কিসের কাগজ রে বাপু।

উকীল। চুপ চুপ, বেয়াদপি করো না।

সৌম্য। তাইত, তাহলে কি করা যায় এখন। পেস্কার বাবু, তা আমি কোথায় থাকব এতক্ষণ বলতে পারেন?

পেস্কার। আপনার যেখানে খুসি। এখানে এই বেঞ্চটায় বসতে পারেন ইচ্ছা করলে, আবার দাঁড়িয়ে পায়চারিও করতে পারেন।

সৌম্য। সাক্ষীদের বসবার কোনো ঘর নেই?

পেস্কার। আছে বই কি, ঐ বটগাছের তলায় ঐ যে টিনের ঘর দেখছেন, ঐ যে লোকটা তামাক খাচ্ছে বসে ঐখানে, ইচ্ছা করলে ওখানে গিয়েও বসতে পারেন।

সৌম্য। ঐখানে! উঁহুঃ!

উকীল। আপনি কি এই দায়রা মামলায় সাক্ষী আছেন আজ?

সৌম্য। হাঁ।

উকীল। যদি বেয়াদপি মাফ্ করেন, আপনার নামটি জিগেস করতে পারি কি সার?

সৌম্য। নিশ্চয় পারেন, সার। এই নিন আমার কার্ড নিন।

উকীল। ( পড়িয়া ) ওঃ বটে বটে, আপনিই এস্ রয় আই, সি, এস,—ও পেস্কার মশাই—

পেস্কার। ( যোড়হস্তে ) হুজুর এতক্ষণ বলেন নি কেন! আহা হুজুরের কত কষ্টই না হল। আমি কি আগে জানি ছাই। দেখ দিকি, কত কষ্টই না হল। আসুন হুজুর, জজসাহেবের খাস্ কামরায় বসবেন।

[ পেস্কার ও সৌম্যের প্রস্থান ]

মক্কেল। দেখলেন বাবু। যেমন শুনল আই, সি, এস্ অমনি ভিন্নমূর্ত্তি, 'আসুন হুজুর, আসুন হুজুর।' আর এতক্ষণ

বলছিল গাছতলায় ঐ তামাক খাওয়া লোকটার পাশে বসতে! দেখলেন!

উকীল। স্লেভ্-মেণ্টালিটি আর কাকে বলে! ...... (ডানদিকের দরজা দিয়া উঁকি মারিয়া) ঐ যে জজ সাহেব এজলাসে এসে বসেছেন।

মক্কেল। বসেছেন নাকি! তাহলে বোঝা যাচ্ছে আদালতে এবার কাগজের মড়ক হয়েছে, সই করবার মতন কাগজ আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

উকীল। চুপ চুপ, ও রকম কথা বলতে আছে! কোথাকার গেঁয়ো লোক হে তুমি!

[ প্রথম জুবার বাহির হইয়া আসিলেন ]

উকীল। কি মশাই, ছুটি পেলেন?

জুরার। হাঁ পেয়েছি।

উকীল। আপনারই ছেলেকে কুকুরে কামড়েছে না?

জুবার। সাতপুরুষেও নয়। আসল কথাটি কি জানেন, জুরীর হাঙ্গাম ধাতে সয় না। সমন করে ধরে নিয়ে আসে, কি করি বলুন।

উকীল। এই কি প্রথম?

জুবার। না প্রথম কেন হবে। প্রথমবারে কালা সেজে-ছিলুম, জজসাহেব ছেড়ে দিলেন।

উকীল। বাঃ, আর দ্বিতীয় বার?

জুবার। বললাম মায়ের অনুগ্রহ হয়েছে। হৈ হৈ করে সকলে বার করে দিলে।

উকীল। বটে, আপনার ত মশায় চমৎকার বুদ্ধি!

জুরার। তা আর বলতে! কাউকে বলে দেবেন না যেন! তৃতীয়বার বলেছিলুম আসামী আমার জ্ঞাতি ভাই হয়। আসামীর অস্বীকার জজসাহেব সন্দেহের চক্ষে দেখে আমায় ছেড়ে দিলেন। আর এবার ছেলেকে কুকুরে কামড়াল।

উকীল। এত হাঙ্গামের দরকার কি, ডাক্তারের সার্টি-ফিকেট দিলেই ত হয়।

জুবার। হয়, তবে ডাক্তার বেটাকে আট গণ্ডা পয়সা দিতে হয়। তার উপর পেস্কার আছে।

উকীল। তা বটে। তবে আজকের কেসটা ছিল মজার।

জুবার। হাঁ, শুনছিলাম বটে, কমিশনার সাহেবের মেয়ের সাড়ী চুরি করেছে তাঁর ড্রাইভার। তা সেসনে দিলে কেন?

উকীল। লোকটা দাগী চোর। এর আগেও চুরি করে জেল খেটেছে।

জুবার। আইনের কথা আপনারাই ভাল বোঝেন। এমন লোককে মানুষ ড্রাইভার রাখে!

উকীল। জেনে শুনে কি আর রেখেছে!

জুবার। তা বটে। আচ্ছা তাহলে আসি।

[ প্রস্থান ]

[ সৌম্য ও একজন দারোগার প্রবেশ ]

সৌম্য। কি রকম হচ্ছে দারোগা বাবু?

দারোগা। ভালই হচ্ছে সার। কেস ত খুব ষ্ট্রং—আসামীর উকীল জমাদার ছোঁড়াকে খুব জেরা করছে।

সৌম্য। জেরা করছে নাকি! জেরাকে আমি বড় ভয় করি।

উকীল। দেখছেন না সার, আদালতের ভেতর আজ কী ভিড়! আপনাকে জেরা করবে কিনা, তাই সবাই শুনতে এসেছে।

সৌম্য। এঁ্যা—তাই নাকি! (ঘাম মুছিয়া) আচ্ছা।

দারোগা। এর পরই আপনার সাক্ষ্য।

সৌম্য। এর পরই আমার! সর্ব্ব—, আচ্ছা।

[ দারোগার প্রস্থান ]

উকীল। এই বুঝি আপনার প্রথম সাক্ষী দিতে আসা, সার? (সৌম্য ঘাড় নাড়িলেন) প্রথম অনেকের ভব ভয় করে, কারো কারো কাছা খুলে যায়, কেউ বা নিজের নাম আর কিছুতেই মনে করতে পারে না। আমরা র'তদিন দেখছি কি না!

সৌম্য। নিজের নাম মনে করতে পারে না, কি আশ্চর্য্য! (তাড়াতাড়ি পকেট হইতে একটা কার্ড লইয়া নিজের নাম পড়িতে লাগিলেন)।

[ দারোগা ত্বরিৎ এজলাস ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল ]

দারোগা। আসামী দোষ স্বীকার করেছে, আর আপনাকে সাক্ষী দিতে হবে না সার!

সৌম্য। তাই নাকি, সত্যি! যাক্ বাঁচা গেল। (বিনা কারণে দারোগার সহিত ঘন ঘন করমর্দ্দন করিতে লাগিলেন)।

দারোগা। জজসাহেব জুরীকে চার্জ দিচ্ছেন, এখুনি তাঁরা এই ঘরে আসবেন।

সৌম্য। এই ঘরেই জুরীরা retire করে বুঝি?

(দারোগা ঘাড় নাড়িল)

[জজের চাপরাশি আসিয়া সকলকে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিল। সকলে বাহির হইয়া গেলে এজলাসে যাইবার দরজা ছাড়া আর সমস্ত দরজা জানালা ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিল। খানিকপরে জুরাররা আসিয়া পৌঁছিলে এজলাসে যাইবার দরজাও বন্ধ হইয়া গেল]

ফোরম্যান্। আসুন, আগে আমাদের বিলগুলো লিখে ফেলা যাক। পরে আর সময় পাওয়া যাবে না।

১ম জুরার। আপনারা যখন মকরদামার নোট লিখছিলেন, আমি তখনি নিজের কাজ গুছিয়ে রেখেছি।

২য় জুরার। দেখুন ফোরম্যান্ বাবু, এসেছি থার্ডক্লাসে, তা সেকেণ্ড্ ক্লাসের ভাড়ার বিল করব ত?

ফোরম্যান্। নিশ্চয়, এ ত জানা কথা। যাক, আপনাদের সকলের বিল ত লেখা হয়ে গেল, এখন আসুন মামলাটা একটু আলোচনা করা যাক।

১ম জুরার। চুরির কেসে জুরীর বিচার কেন? ছাগল চুরি, গোরু চুরি, সাড়ী চুরি এসবের বিচার করে অনাহারি হাকিম। আমরা হলাম ফাঁসীর হাকিম, দ্বীপান্তরের হাকিম, আমাদের কাছে এর বিচার কেন?

২য় জুবার। আসামী বেটা হল দাগী চোর। বেটার চেহারাটা দেখলেন না! এর আগে ত বার তিনেক জেল খেটেছে, দারোগা চুপি চুপি আমাদের বলছিল, শোনেন নি বুঝি? তাই দায়রার বিচার। শাস্তি বেশী হবে।

ফোরম্যান্। শুনুন, শুনুন, জজসাহেব বলে দিয়েছেন, মনে নেই, আমাদের বিচার করতে হবে আসামী সাড়ী দুটো চুরি করেছে কি না—শুধু এই টুকু মাত্র। সে আগে কি করেছে না করেছে তা আমাদের ধর্ত্তব্য নয়।

১ম জুরার। আরে রাখুন মশায় জজসাহেবের বক্তৃতা। ঘটনা সম্বন্ধে বিচারের মালিক আমরা, জজ নয়।

২য় জুরার। এই সোজা কথাটি বুঝছেন না ফোরম্যান্ বাবু, বেটা যখন এর আগে তিন তিনবার চুরি করেছে মশাই,—তখন এ চুরিও না করলে করল কে? চোরের স্বভাব চুরি করা।

৩য় জুরার। (নাকে নস্য ঠাসিয়া) যা বলেছেন মশায়! "যঃ স্বভাবো হি যস্য স্যাৎ—"

৪র্থ জুরার। এমন লোককে ড্রাইভার রাখে! ছিঃ ছিঃ।

১ম জুরার। গ্রহের ফের! এমনি হয়েছিল আমাদের ইস্কুলের একবেটা মালীর বেলায়। গল্পটা বলি শুনুন—

২য় জুরার। আমার নিজের বেলা কি হয়েছিল জানেন না বুঝি! শুনুন তবে, সে ভারি মজা। আমার চাকরটা—

ফোরম্যান্। ওসব কথা এখন যেতে দিন। আমাদের প্রথম দেখতে হবে সাড়ী দুখানা চুরি গিয়াছিল কি না—

১ম জুরার। যাবে না চুরি! অমন করে খোলা বাক্সে ফেলে রাখা কেন?

২য় জুরার। গরীবের সামনে প্রলোভন ছড়িয়ে রাখা!

৩য় জুরার। কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখান।

৪র্থ জুরার। মেয়েটা যেন ন্যাকা—

১ম জুরার। বড়লোকের নভেলপড়া মেয়ে আর কত ভাল হবে!

২য় জুরার। কখানা সাড়ী চুরি গেছে তার হুঁস্ই নেই। শুনলেন না সরকারি উকীলের বক্তৃতা—

৩য় জুরার। বুঝলেন না, বিস্তর আছে, দুখানা গেলেই বা কি, আর থাকলেই বা কি!

৪র্থ জুরার। টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। অথচ কত লোক না খেয়ে মরছে।

৩য় জুরার। (নস্য লইয়া) যা বলেছেন। "অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তীহ যমালয়ং"।

২য় জুরার। আহা আসামী বেচারা গরীব। লোভে পড়ে যদি নিয়েই থাকে তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

১ম জুরার। আর সে নিজের জন্যে নেয় নি, নিয়েছিল তার এক ইয়েব জন্যে—

২য় জুরার। তার মোটিভ্টা দেখতে হবে ত! আহা গরীব বেচারা।

৩য় জুরার। তার ওপর সে কি বললে শুনলেন ত? বললে জামাই বাবু একটা ফুল চুরি করে তাঁর স্ত্রীকে উপহার দিলেন দেখে তারও সাড়ী দুখানা নিয়ে গিয়ে তার ইয়েকে উপহার দেবার কথা মনে হল।

৪র্থ জুরার। তবেই দেখুন, তার চুরির জন্তে জামাই বাবুই দায়ী।

ফোরম্যান। আপনারা বলছেন কি! সে হল সামান্ত ফুল আর এ হল দামী সাড়ী।

১ম জুরার। ওর কাছে ফুলের যা দাম, এর কাছে সাড়ীরও তাই দাম।

২য় জুরার। এও চুরি, সেও চুরি।

৩য় জুরার। তার জন্তে জামাইটার ত কিছু হল না।

৪র্থ জুরার। বড় লোকের সাতখুন মাফ্।

১ম জুরার। আইনের চোখে গরীব বড়লোক প্রভেদ করে না।

২য় জুরার। আর আমরা হলুম বিচার করবার মালিক।

১ম জুরার। আমার মতে আসামী নির্দ্দোষ।

২য়, ৩য় ও ৪র্থ জুরার। আমাদেরও সেই মত।

ফোরম্যান্। কিন্তু আপনারা ভুলে যাচ্ছেন আসামী নিজে দোষ স্বীকার করেছে।

১ম জুরার। ওহো তাও তো বটে।

২য় জুরার। বেটা একটা আস্ত গাধা! কেন স্বীকার করতে গেলি—

৩য় জুরার। বেটার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল!

ফোরম্যান্। তাহলে আপনাদের সবাইএর মত যে আসামী দোষী?

অন্যান্ত সকলে। অগত্যা তাই বলতে হবে বই কি!

[ জুরারগণ এজলাসে চলিয়া গেল ]

[ চাপরাশি দরজা জানালা খুলিয়া দিল ]

( উকীল ও মক্কেলের পুনঃ প্রবেশ )

মক্কেল। এইবার আমার মামলাটা হবে ত বাবু?

উকীল। হাঁ হাঁ—তুমি যে তখন থেকে ছটফট করছ।

মক্কেল। দেখুন বাবু জজ সাহেবকে বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন, সবজজ যে বলেছে বাদীর রাস্তায় আমি কোনোদিন হাঁটি নি ওটা একেবারে মিছে কথা—এই দেখুন না, এই যে আমার জুতার সুকতালা ক্ষয়ে গেছে এত, কি করে?—বাদীর রাস্তা হেঁটে হেটেই না? বেশ করে আপনি বুঝিয়ে দেবেন।

[ সৌম্য ও সরকারী উকীলের প্রবেশ ]

সরকারী উকীল। (হাসিয়া) আসামীর চার বচ্ছর জেল হয়ে গেল সাব।

সৌম্য। চারবচ্ছর!…সামান্ত দুখানা সাড়ীর জন্তে চারবচ্ছর জেল! মনটা খারাপ হয়ে গেল!

[ হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় জগুকে সিপাহীরা লইয়া যাইতে লাগিল ]

জগু। মনটা খারাপ হয়ে গেল! আহা কি দয়ার শরীর! আপনিও গেছলেন যে পথে আমিও গেছলুম সেই পথে। আমার হয়ে গেল শ্রীঘর আর আপনার ভাগ্যে বাসর ঘর!—একেই বলে একযাত্রায় পৃথক ফল।

( যবনিকা )

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

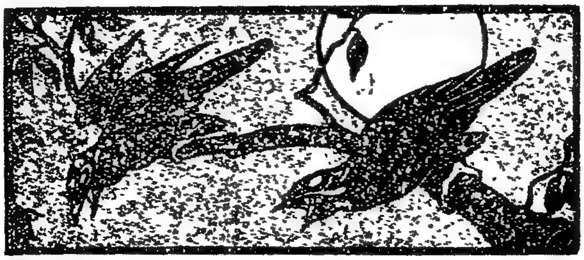

# রবীন্দ্রনাথের 'অহল্যার প্রতি' কবিতার ভূমিকা

অধ্যাপক হেরম্ব চক্রবর্ত্তী এম্-এ

এই কবিতাটি কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের "মানসী" নামক কবিতাগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এই কবিতাটির মধ্য দিয়া সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন কবি-চিত্তের যে অপূর্ব্ব রসঘন মূর্ত্তি প্রকট হইয়াছে তাহা তুলনাহীন। কবি রবীন্দ্রনাথ নিসর্গকে কেবল মাত্র দেখেন নাই, ইহাকে অনুভব করিয়াছেন। নিসর্গ সৌন্দর্য্যে সমাহিত-চিত্ত কবি সৌন্দর্য্যের অন্তরালে কি সত্তা আছে তাহা অনুভব করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। কবির নিকট এই সৃষ্টি শুধু সুন্দর নয় রহস্যময়ও বটে। বর্ত্তমান জীবনে কবি এই যে সৃষ্টির বিচিত্র সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছেন ইহাত শুধু তাঁহাকে মুগ্ধই করে নাই, সেই সঙ্গে কত জন্ম জন্মান্তরের স্মৃতি তাঁহার মনের মধ্যে জাগাইয়া তুলিয়াছে, এই সৃষ্টি তাহার বর্ত্তমানের পরিদৃশ্যমান বিচিত্ররূপ দিয়াই কবি চিত্তকে মুগ্ধ করে নাই, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের মধ্যে বহু জন্ম জন্মান্তরের স্মৃতিরেখার রূপ-সমারোহ বহিয়া আনিতেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বলাকা'র একটি কবিতায় বলিয়াছেন,

> "তাই যা দেখিছ তারে ঘিরিছে নিবিড়
> যাহা দেখিছ না তারি ভিড়।"

এই সৃষ্টির বর্ত্তমান সৌন্দর্য্য-সম্ভারই তাহা হইলে কবিকে বিস্মিত করে নাই, অধিকন্তু তাঁহার মনের অবচেতন লোকে যে সমস্ত স্মৃতি সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে তাহাদিগকে জাগাইয়া তুলিয়া কবিকে রহস্যময়ের পূজারী করিয়াছে।

> তাই আজি দক্ষিণ পবনে
> ফাল্গুনের ফুল গন্ধ ভরিয়া উঠিছে বনে বনে
> ব্যাপ্ত ব্যাকুলতা,—
> বহু শত জনমের চোখে চোখে কানে কানে কথা।

এই ভাবে এই সৃষ্টির বিচিত্র সৌন্দর্য্য কবির মনকে অতীতের পানে উধাও করিয়া লইয়া যায়। মহাকবি কালিদাসও দুষ্মন্তের মুখ দিয়া বলাইয়াছিলেন,

> রম্যানি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
> পর্য্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোহপি জন্তুঃ।
> তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধ পূর্ব্বং
> ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি॥

আজ এই বৈজ্ঞানিক জগতে বাস করিয়া মানুষ আর সৃষ্টিকে তাহার সহজ সরল বাহিরের রূপের ভিতর দিয়া দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেনা। সৃষ্টিতত্ত্বের তথা জীব-পর্য্যায়ের অভিব্যক্তির জটিলতা মানুষের মনকে সৃষ্টি এবং মানব জীবনের সহজ সরল রূপের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখিতে সক্ষম নয়। এই বৈজ্ঞানিক জগতে বাস করিয়া আমরা বর্ত্তমানকেই খণ্ডভাবে দেখিতে পারিনা, সেই সঙ্গে মনে পড়িয়া যায় অনন্ত প্রবহমান অখণ্ড সৃষ্টি প্রবাহের কথা। কবি রবীন্দ্রনাথের উপরও এই অভিব্যক্তিবাদের ছাপ কম পড়ে নাই; তাই তাঁহার নিকট আমাদের বর্ত্তমান জীবন একটি খণ্ড সত্তামাত্র নহে—ইহা একটি অখণ্ড জীবন-প্রবাহের ক্রমধারা। ইহার বর্ত্তমান অস্তিত্বকে তিনি অখণ্ড সৃষ্টিধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই। এই সৃষ্টিও সেইজন্য কবির নিকট চির রহস্যময়। কিন্তু ইহার সবখানি ত কবি দেখিতে পান নাই—যাহা দেখিয়াছেন তাহা যে খণ্ডমাত্র; তাহার সহিত যুক্ত হইয়া রহিয়াছে যে যুগ যুগান্তরের স্মৃতি-বাহিনী! এই বস্তু জগতের অসংখ্য বিচিত্র আনন্দ বেদনা কবিচিত্তে অহরহ যুগ যুগান্তরের লক্ষ স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছে। নারীর সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ শোভা কোনদিনই কবিচিত্তকে বর্ত্তমানের সসীমতার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। কবির যে "নাল্পে সুখমস্তি" তাঁর যে অল্পে, অংশে সুখ নাই! সীমার মধ্যে খণ্ডের মধ্যে

তাঁহার চিত্ত যে ব্যাকুল ও দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া উঠে! তাই বর্ত্তমানের সহিত অতীতকে, খণ্ডের সহিত অখণ্ডকে, রূপের সহিত অরূপকে যুক্ত করিয়া না দিতে পারিলে যে তাঁর চিত্ত দ্বিধায় কুণ্ঠায় ম্লান হইয়া পড়ে। সেই জন্য বর্ত্তমান জীবনের প্রিয়াকে দেখিয়াও তাঁর মনে হয়,

"আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে,
অনাদি কালের আদিম উৎস হতে॥

নারীকেও তিনি প্রয়োজনের সসীম বন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত করিয়াই দেখিয়াছেন। উর্ব্বশীকে তিনি সমস্ত জাগতিক সম্বন্ধের অতীতরূপে অখণ্ড শাশ্বত নারীভাবেই দেখিয়াছেন। এই সুন্দরী বসুন্ধরা সম্বন্ধেও কবির ঐ একই প্রকার মনোভাব। তিনি বলেন,

"আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের। তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃ মণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন
যুগ যুগান্তর ধ'রে'।"

সেই একই কথা,—সেই বর্ত্তমানকে অতীতের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেখা,—সেই খণ্ডকে অখণ্ডের সহিত সংযুক্ত করিয়া উপভোগ করা। কিন্তু ইহাতেও কবিচিত্ত সুস্থির হইতে পারে নাই। বর্ত্তমান জীবনের খণ্ড ধারাকে অতীতের অনন্ত সৃষ্টিধারার সহিত সংযুক্ত করিয়াও কবি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহার মনের মধ্যে প্রশ্ন উঠিল—এই সৃষ্টি ধারা কি অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে? অনন্তকাল ধরিয়াই কি ইহা চলিতে থাকিবে? ইহার কি কোন আদিও নাই, অন্তও নাই? তাহা যদি হয় তবে এ সৃষ্টির কোন অর্থই থাকেনা। কবি বলেন যে এই সৃষ্টি একটি অখণ্ড সত্তা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, এবং একদিন এই অখণ্ড সত্তায় পৌছিয়াই নিজকে সার্থক করিয়া তুলিবে। সৃষ্টির মধ্যে এই যে এত খণ্ডতা এত বৈচিত্র্য, এত বিচ্ছিন্নতা ইহার মূলে একই অখণ্ড সত্য বিরাজ করিতেছে। আমরা সকলেই সেই এক পরম সত্ত হইতে উদ্ভূত হইয়াছি। তাইত আমরা পরস্পরকে এত ভালবাসি, তাইত প্রকৃতির খণ্ড সৌন্দর্য্য আমাদিগকে এত মুগ্ধ করে।' আমরা যে একদিন একের মধ্যে ছিলাম আজ বহু হইয়াছি। তাই জীবনের নিবিড়তম রস মুহূর্ত্তে কবির চিত্ত সুদূরতম অতীত স্মৃতির ছায়াপথ ধরিয়া আবার সেই আদিমতম জন্মক্ষণে ফিরিয়া যাইবার জন্য মাঝে মাঝে ব্যাকুল হইয়া উঠে। কবি তাই আকুল আগ্রহে উচ্ছ্বাসভরা ভাষায় বলেন,

"আমারে ফিরায়ে লহ
সেই সর্ব্বমাঝে, যেথা হ'তে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্ররূপে, গুঞ্জরিছে গান
শতলক্ষসুরে, উচ্ছ্বসি' উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গীতে প্রবাহি' যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু।"

কিন্তু এই যে সৃষ্টিধারার উৎসমুখ, এই যে বিরাট গোপন রস যজ্ঞশালা, যেখান হইতে এই বিচিত্র রস ধারার অজস্র পরিবেশন যুগ যুগ ধরিয়া চলিতেছে, সেই স্থানের সন্ধান আমাদের কে বলিয়া দিবে? ইন্দ্রিয় গ্রাম সেইখানে পৌছিতে পারে না। জীব-পর্য্যায়ের বিবর্ত্তন পথে আমরা সেই আদি উৎসমুখ হইতে বহু দূরে চলিয়া আসিয়াছি, সেখানে ফিরিবার আর উপায় নাই। কেবল কল্পনার সাহায্যে আমাদের মন মাঝে মাঝে সেই কল্পরাজ্যে উধাও হইয়া যায়। কবি চিত্ত তখন আকুল আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে,—

"জননী লহ গো মোরে
সঘন বন্ধন তব বাহুযুগে ধ'রে
আমারে করিয়া লহ তোমার বুকের,
তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র সুখের
উৎস উঠিতেছে যেথা, সে গোপনপুরে
আমারে লইয়া যাও রাখিও না দূরে।"

কিন্তু সেখানে আর ফিরিয়া যাওয়া যায় না। সেখানে ফিরিয়া যাইতে হইলে যে ক্রম বিবর্ত্তনের সমস্ত স্তরগুলিকে আবার ফিরিয়া পার হইয়া যাইতে হয়! জড়ত্ব হইতে চৈতন্যের পর্য্যায়ে চলিয়া আসিবার পথে বিবর্ত্তনের যে সমস্ত বিচিত্র স্তর পার হইয়া আসিতে হইয়াছে সে সকলকে নিশ্চিহ্ন

করিয়া মুছিয়া ফেলিতে হয়। কিন্তু তাহা ত সম্ভব নয়, চৈতন্য হইতে জড়ে ফিরিয়া যাওয়া যে অসম্ভব।

হঠাৎ কবির মনে পড়িয়া যায় যে অহল্যা ত এক নিমিষে চৈতন্য হইতে জড়ে পরিণত হইয়াছিলেন! তিনি জীব পর্য্যায়ের ক্রম বিবর্ত্তন পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ এক সময় গৌতমের অভিশাপে এক মুহূর্ত্তে বিবর্ত্তন ধারাব বিপরীত গতির চরমতম সীমায় উপনীত হইয়া জড় পদার্থে পরিণত হইয়াছিলেন! এই ত একজনকে পাওয়া গিয়াছে যিনি সৃষ্টির জড়তম পদার্থ হইতে হঠাৎ জীবপর্য্যায়ের চেতনতম সত্তায় ফিরিয়া আসিয়াছেন! তবে ইঁহাকেই জিজ্ঞাসা করা যাক্ না কেন সেই আদি উৎসমুখ, জননীব সেই গোপন অন্তঃপুর যেখান হইতে সৃষ্টিধারা প্রথম উৎসৃত হইয়া উঠিয়াছে, সেখানের সংবাদ তিনি কিছু বলিতে পারেন কিনা। তাই কবি আকুল আগ্রহে অহল্যাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"আছিলে বিলীন
বৃহৎপৃথ্বীর সাথে হ'য়ে এক দেহ
তখন কি জেনেছিলে তার মহা স্নেহ?
ছিল কি পাষাণতলে অস্পষ্ট চেতনা?
জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা,
মাতৃধৈর্য্যে মৌনমূক সুখ দুঃখ যত
অনুভব করেছিলে স্বপনেব মত
সুপ্ত আত্মা মাঝে?"

ধরিত্রীর সদ্যোজাতা কুমারী অহল্যা আজ চৈতন্যময় সত্তায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান পরিদৃশ্যমান পরিচিত জগতকে তিনি যুগ যুগান্তরের সহস্র স্মৃতির সহিত সংযুক্ত করিয়া দেখিতেছেন। তাই যখন 'হাসে পরিচিত হাসি নিখিল সংসার' তখন অহল্যার হৃদয়

কোন দূর কাল ক্ষেত্রে চলে গেছে একা
আপনার ধূলিলিপ্ত পদচিহ্ন রেখা
পদে পদে চিনে' চিনে'।

সুতরাং এই বিশ্বপ্রকৃতি অহল্যার নিকট এক বিস্ময়ের বস্তু, একটি বিশেষ রহস্যের আধার হইয়াছে। কবি তখন বলেন,—

"তুমি বিশ্বপানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমাপানে চেয়ে কথা নাহি কয়,
দোঁহে মুখোমুখী। অপার রহস্যতীরে
চির পরিচয় মাঝে নব পরিচয়।"

হেরম্ব চক্রবর্ত্তী

# প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

## একাঙ্ক নাটিকা

### প্রথম দৃশ্য

সগানারেলের বাড়ী; সম্মুখে রাজপথ।

সগানারেল। (নেপথ্যে) এই ফিরে এলাম বলে; সাবধানে থেকো। বাইরের দুয়োর বন্ধ করে দাও এখনি; কাজকর্ম্ম যেমন চল্‌ছে তেমনি চলুক। যদি কেউ টাকা দিতে আসে চট্ করে জেরোনিমোর বাড়ীতে আমাকে দিয়ে এসো, আর যদি কেউ টাকা চাইতে আসে, বলে দিও আমি বাইরে গিয়েছি, আজ আর ফিরব না।

জেরোনিমো। (শেষ কয়টি কথা শুনতে শুনতে প্রবেশ) বাঃ চাকরদের খাসা উপদেশ দেওয়া হচ্ছে ত।

সগানারেল। এই যে জেরো। বেশ হয়েছে, তোমারই বাড়ী যাচ্ছিলাম। চল চল ঘরে চল।

জেরোনিমো। কেন? হঠাৎ এত অনুগ্রহ?

সগানারেল। ভাই তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে; ঘরে চল।

জেরোনিমো। এইখানেই শুনি না কেন?

সগানারেল। তবে একটু নিরালায় এসো ভাই। কাজটা একটু জরুরী কি না, তাই ভাবলাম একবার বন্ধু লোকের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

[দুইজনে দুয়ারের এক পাশে সরে এসে]

জেরোনিমো। এত লোক থাকতে আমার মত জানতে চাও এ জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু ব্যাপার কি?

সগানারেল। দাঁড়াও; আগে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে। আমাকে খুসী করবার জন্য কিছু বলবে না; তোমার স্পষ্ট কথাই শুনতে চাই।

জেরোনিমো। বেশ, তোমার যা ইচ্ছে।

সগানারেল। তা হবে না, প্রতিজ্ঞা কর।

জেরোনিমো। করলাম। কিন্তু এখন ব্যাপার কি বল।

সগানারেল। (একটু সলজ্জভাবে) আমার বিয়ে করা সম্বন্ধে তোমার কি মত?

জেরোনিমো। কার বিয়ে? তোমার?

সগানারেল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার।

জেরোনিমো। দাঁড়াও, আগে একটা কথার উত্তর দাও।

সগানারেল। কি?

জেরোনিমো। তোমার বয়স কত?

সগানারেল। আমার?

জেরোনিমো। হ্যাঁ।

সগানারেল। (হেসে) সত্যি, জানি না ভাই।

জেরোনিমো। খুব কম করে হলেও তুমি বাহান্ন কি তিপ্পান্ন পার হয়ে গিয়েছ।

সগানারেল। কে, আমি? মোটেই না।

জেরোনিমো। তা' হলে যখন প্রতিজ্ঞাই করেছি, খোলাখুলিই বলি যে বিয়ে করা তোমার সাজে না। বিয়ের স্বপ্ন দেখতেও তোমায় আমি বারণ করি। এতদিন এমনি থেকে এখন যদি দুনিয়ার সব চেয়ে ভারী বোঝাটা সাধ করে কাঁধে তুলে নাও, তাহলে তোমাকে নিতান্তই নির্ব্বোধ ভাবব।

সগানারেল। (ঈষৎ রেগে) আর আমি তোমাকে বলে রাখছি যে বিয়ে আমি করবই। যাকে বিয়ে করব

---

Molièreএর L' Amour Médecinএর ছায়া নিয়ে

ঠিক করেছি তাকে বিয়ে করা মোটেই বোকামীর কাজ হবে না।

জেরোনিমো। ও! তাহলে স্বতন্ত্র কথা। তুমি ত আমাকে সে কথা বল নি।

স্গানারেল। মেয়েটিকে আমার খুব ভালো লাগে। নিজের চেয়েও আমি তাকে বেশী ভালোবাসি।

জেরোনিমো। নিজের চেয়েও? বল কি!

স্গানারেল। নিশ্চয়ই। তার বাবাকেও বলেছি

জেরোনিমো। মেয়েটি রাজী হয়েছে?

স্গানারেল। আলবৎ, আজ রাত্রেই বিয়ে, সব ঠিক ঠাক।

জেরোনিমো। ওঃ তবে ত আমার আর কিছুই বলবার নাই, স্বচ্ছন্দে বিয়ে কর।

স্গানারেল। এখন কি সব ভেঙ্গে দিতে বল? বিয়ের চিন্তা করাও আমার অন্যায়? বয়সের বিচার করতে যেয়ো না, আমার দিকে চেয়ে দেখ। পঁচিশ বছরের ছোকরা কি আমার চেয়ে বেশী তাজা? আমাকে কোনও দিন বাতে ভুগ্‌তে দেখেছ? লাঠি হাতে কি হাঁপাতে হাঁপাতে আমাকে কোনও দিন সিঁড়ি বেয়ে ওঠা নামা করতে হয়েছে?

জেরোনিমো। সত্যি, আমারই ভুল হয়েছিল। তুমি বিয়ে কর। তোমার বিয়ে করাই উচিৎ।

স্গানারেল। আগে আমি বিয়ে করতে ভয় পেতাম কিন্তু এখন এ কাজ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। একটা স্ত্রী থাকলে সময়ে অসময়ে একটুখানি আদর যত্ন করবে, একটু দেখবে শুনবে। আর তা ছাড়া যদি চিরকাল কুমারই থাকি, পিতৃপুরুষের বংশ যে একেবারে লোপ পাবে।

জেরোনিমো। বাস্তবিক! এর চেয়ে সুখের কথা আর কি আছে। যত শীঘ্র পার বিয়ে কর।

স্গানারেল। সত্যি তোমার এই মত?

জেরোনিমো। নিশ্চয়ই, তিন সত্যি।

স্গানারেল। তোমার মত বন্ধুর এই কথা শুনে ভারী আনন্দ হচ্ছে।

জেরোনিমো। যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তিনি কে?

স্গানারেল। ডোরিমেন।

জেরোনিমো। ডোরিমেন? বেচারী ডোরিমেন?

স্গানারেল। হ্যাঁ।

জেরোনিমো। এলক্যান্‌টরের মেয়ে?

স্গানারেল। হুঁ।

জেরোনিমো। লড়ুয়ে এল্‌সিয়াডিসের ভগ্নী?

স্গানারেল। বাস্‌।

জেরোনিমো। খাসা!

স্গানারেল। কেন, কেন, তুমি কি বল?

জেরোনিমো। কিছুই না। চমৎকার। চট্ করে সেরে ফেল।

স্গানারেল। কেন, ভালো মানাবে না?

জেরোনিমো। নিশ্চয়ই মানাবে। আর দেরী করো না।

স্গানারেল। তোমার কথা শুনে আমার বুক ফুলে উঠছে। তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব জানি না। আজ রাত্রে আমার বিয়েতে তুমি এসো ভাই।

জেরোনিমো। আলবৎ। (স্বগতঃ) ডোরিমেন। স্গানারেল আর ডোরিমেন। সতেরো আর তিপ্পান্ন। চমৎকার।

[প্রস্থান]

## দ্বিতীয় দৃশ্য

ডোরিমেনের পিতৃগৃহের বারান্দা

স্গানারেল। ডোরি, ডোরি এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছ ডোরি?

ডোরিমেন। বাজারে যাচ্ছি।

স্গানারেল। (ব্যাকুল ভাবে) ডোরি, এতদিনে এবার আমাদের সব সাধ মিটবে, না? আর তোমার কোনও কথা শুনছি না। এবার যা খুসী হবে তোমাকে নিয়ে তাই করব তুমি কিচ্ছু বল্‌তে পাবে না। তোমার আনন্দ হচ্ছে না ডোরি?

ডোরিমেন। হচ্ছে না? নিশ্চয় হচ্ছে; চূড়ান্ত হচ্ছে। বাবার কাছে এতদিন ভয়ে জুজু হয়ে থাকতে হত। কতদিন ভেবেছি কবে একটু হাত পা নেড়ে ইচ্ছে মত চলে

ফিরে বেড়াব, কে এসে আমার বাবার ঘরের বাঁধন খুলে দেবে—ভাগ্যি তুমি এলে। এবার আমি স্বাধীন, এবার আমি হাওয়ার পরী। তুমি বুদ্ধিমান্, আমার কথা নিশ্চয় বুঝতে পারছ। এতদিন বাঁধা ছিলাম, এবার সুদ্ শুদ্ধ আদায় করে নেব। গালফুলো লোক আমার ভালো লাগে না, সত্যি বলছি খুঁত খুঁতে স্বামী থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। একলা আমি একদণ্ড থাকতে পারি না। হাসি, নাচ গান, আমোদ-প্রমোদ আমার বড্ড ভালো লাগে—ফূর্ত্তি আমার চাইই। তোমার সঙ্গে আমার খু-উ-ব ভালো বনবে। তোমার কোনও কাজে আমি বাধা দেব না আর আমাকেও তুমি—ও কি, তোমার কি হল?

স্গানারেল। (হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে) কিছু না, মাথাটা একটু ঘুরে উঠেছিল।

ডোরিমেন। ও কিছু না। বুড়ো বয়সে ও রকম হয়ে থাকে। যাক্ আমি বাজারে যাই। নূতন একটা পোষাক দেখে এসেছি কিনতে হবে। "বিল্" গুলো তোমার কাছে পাঠাতে বলে দেব, টাকা দিয়ে দিও। [প্রস্থান]

## তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ

জেরোনিমো। এই যে স্গানারেল, তোমাকেই খুঁজছিলাম। তোমার ভাবী কনের জন্যে একটা হীরের আংটি চাই না? একজন লোক খাঁটী—

স্গানারেল। না, না. এখন কিছু তাড়াতাড়ি নাই

জেরোনিমো। (সবিস্ময়ে) অর্থাৎ?

স্গানারেল। এখন কয়েকটা নতুন কথা মনে হচ্ছে জেরো। বিয়ের বিষয় আর একটু ভেবে দেখতে হবে আর তাছাড়া গত রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখেছি এক বিরাট সমুদ্রের ওপর আমি ভেসে চলেছি, ছোট্ট একটা জাহাজ, হঠাৎ—

জেরোনিমো—আমার একটু কাজ আছে ভাই; আর স্বপ্ন জিনিষটা আমি ঠিক বুঝি না কিনা। তোমার বাড়ীর কাছেই ত দুজন পণ্ডিত থাকেন, তাঁদের কাছে একবার যাও না কেন। আমি যাই ভাই। [প্রস্থান]

স্গানারেল। ঠিক্ ঠিক্ একবার পণ্ডিতদের কাছে যাই।

## চতুর্থ দৃশ্য

প্যান্‌ক্রে নামে পণ্ডিতের বাড়ী। পণ্ডিত মহাতার্কিক। বাড়ীতে পা দিয়েই নেপথ্যে শোনা গেল—

যাও, যাও, একটা কথা বোঝ না, আবার তর্ক করতে আসা। নিয়ম জানো না, ন্যায় মানো না, দর্শনে তোমার কি অধিকার?

স্গানারেল। পণ্ডিত মশাই।

প্যান্‌ক্রে। (বাইরে এসে, কিন্তু ঘরের ভিতরে দৃষ্টি রেখে) নিশ্চয়ই; আমি বলেছি, বলছি ও বলব যে তর্কে তোমার কোন অধিকার জন্মায় নি। এরিষ্টটলের বিচারে প্রমাণ করে দেব তুমি অবোধ, অবোধ্য, অবধ্য, অবাধ্য।

স্গানারেল। পণ্ডিত মশাই।

প্যান্‌ক্রে। (পূর্ব্ববৎ) তর্ক করতে আসার স্পর্দ্ধা আছে কিন্তু তর্কের রীতি শেখ নি।

স্গানারেল। (খুব জোরে) পণ্ডিত মশাই।

প্যান্‌ক্রে। (পূর্ব্ববৎ) কোনও পুঁথিতে দেখাতে পার এমন কথা?

স্গানারেল। (আরও জোরে) প-ণ্ডি-ত মশাই।

প্যান্‌ক্রে। আসুন্, আসুন্, জয়োহস্তু।

স্গানারেল। আমি—

প্যানক্রে। (মুখ ফিরিয়ে) তোমার পূর্ব্বপক্ষ কল্পিত, উত্তর পক্ষ অসম্ভব, আর সিদ্ধান্ত অহেতুক।

স্গানারেল। আমি বলছি—

প্যানক্রে। অর্ব্বাচীন, শাস্ত্র মানো না, তোমার সহিত তর্ক মহাপাপ।

স্গানারেল। (ভীষণ ভাবে) পণ্ডিত অগ্নিশর্ম্মা, আপনার ক্রোধের কারণটি জানতে পারি কি?

প্যানক্রে। অবশ্য; এক নির্ব্বোধ অবোধ্য এক তর্ক উত্থাপন করেছিল, অদ্ভুত, অসম্ভব, অসংবদ্ধ।

সগানারেল। কেন, কি?

প্যানক্রে। (বিমর্ষ ভাবে) কি নয়? কলি, ঘোর কলি। দেশে রাজা নাই, কে দেখবে বলুন।

সগানারেল। আরে ব্যাপারটাই বলুন না।

প্যানক্রে। মানুষ কখনও ভূতের মত হতে পারে? ভূতের আকারের মত হতে হবে কারণ—

সগানারেল। (হেসে) তাই হোক্। আমি ভেবেছিলাম বুঝি ভয়ানক কিছু।

প্যানক্রে। (সরোষে) কি বলেন? একটা বুঝি ভয়ানক নয়? অর্ব্বাচীন।

সগানারেল। শুনুন।

প্যানক্রে। নির্ব্বোধ, অশ্রাব্য—

সগানারেল। সর্ব্বনাশ! শুনুন মশাই।

প্যানক্রে। ভূতের মত? কুষ্মাণ্ড।

সগানারেল। (খুব তাড়াতাড়ি) আমি আপনাকে একটি কথা বলতে এসেছি। আমার জন্য একটি—

প্যানক্রে। গর্দ্দভ, বর্ব্বর, নাস্তিক।

সগানারেল। (স্বগতঃ) চুলোয় যাও। (জোরে) মশাই ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে আছি, অবসর হবে কি?

প্যানক্রে। এহ হে হে মাপ করবেন। বলে কি না—

সগানারেল। থামুন্ একটা কথার উত্তর দেবেন?

প্যানক্রে। নিশ্চয়। আপনি কিসে আলাপ করবেন?

সগানারেল। (অবাক্ হয়ে) কিসে আলাপ?

প্যানক্রে। আজ্ঞে…

সগানারেল। কিসে আলাপ? মুখে আলাপ মশাই, মুখে আলাপ!

প্যানক্রে। তা নয়, আপনি কোন ভাষায়—

সগানারেল। ও তাই বলুন।

প্যানক্রে। আরবীতে কথা কইবেন?

সগানারেল। না।

প্যানক্রে। পারসীতে?

সগানারেল। না।

প্যানক্রে। জারম্যান?

সগানারেল। না।

প্যানক্রে। গ্রীক?

সগানারেল। না।

প্যানক্রে। হিব্রু?

সগানারেল। না?

প্যানক্রে। তুর্কী?

সগানারেল। না, না, না, বাংলা, বাংলা, বাংলা।

প্যানক্রে। ওঃ বাংলাতে?

সগানারেল। হঁ।

প্যানক্রে। তা'হলে ডান ধারে আসুন। বাঁ কানে আমি অন্যান্য ভাষাগুলি শুনি আর ডান কানে শুধু বাংলা।

সগানারেল। আমি বিয়ে করব ভেবে একটি পাত্রী ঠিক করেছিলাম কিন্তু—

প্যানক্রে। (সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে) চিন্তাস্রোত প্রকাশের চেষ্টার মূলে বাক্যের স্ফূর্ত্তি। বস্তুর ছায়া চিন্তা, চিন্তার কায়া বস্তু, আশ্চর্য্য।

[শশব্যস্তে সগানারেল প্যানক্রের মুখে হাত চাপা দিল। হাত সরিয়ে নিলেই প্যানক্রে আবার নিজের মনে বকে চলে]

বাক্য ও চিন্তা মূলে এক। বাক্য চিন্তার অনুবৃত্তি। সুগঠিত চিন্তার ফল সুষ্ঠু বাক্য।

[সগানারেল প্যানক্রেকে ধরে নিয়ে গিয়ে ঘরে বন্ধ করে দিল]

প্যানক্রে। (বাইরে এসে) বাক্যই শব্দ, শব্দই জগৎ; বাক্যের সাহায্যে আপনার বক্তব্য বোঝান না কেন?

সগানারেল। তাই ত বোঝাতে এসেছি, শোনেন কোথায়?

প্যানক্রে। বলুন, আমি অবহিত।

সগানারেল। আমি নিজের জন্য একটি—

প্যানক্রে। সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেন।

সগানারেল। আমি একটি মেয়েকে—

প্যানক্রে। বেশী দীর্ঘসূত্রতা করবেন না।

সগানারেল। আঃ।

প্যানক্রে। যা বলবার সংক্ষেপে, সূত্রাকারে বলুন।

সগানারেল। আমি—

প্যানক্রে। অতি বিস্তার, বাগাড়ম্বর, পুর্ব্বানুবৃত্তি, এ সকল বক্তব্যের হানিকর।

[ রাগের বশে স্গানারেল ছাতা তুলে প্যানক্রেকে আক্রমণ করলে ]

প্যানক্রে। কী! আপনি আমাকে হত্যা করতে চান? নিজে সরল করে বোঝাতে পাবেন না, দোষ কি আমার? আমি সাত বছর বয়স থেকে এরিষ্টটল—

স্গানারেল। কাকাতুয়া!

প্যানক্রে। ন্যায়শাস্ত্র আমার কণ্ঠস্থ। জ্যোতিষ, ছন্দ, অর্থনীতি (দুই পা পিছনে গিয়ে) ভূগোল, জ্যামিতি, ব্যাকরণ, (এগিয়ে এসে) ভূতত্ত্ব, সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, ইতিহাস (ফিরে গিয়ে) বিজ্ঞান, স্থাপত্য, রসায়ন, (এগিয়ে এসে) বীজগণিত, সামুদ্রিক, ভূতবিদ্যা, আমার—

স্গানারেল। (সরোষে) আমার প্রস্থান। বর্ব্বর, মূর্খ, আহাম্মক!

[ প্রস্থান ]

## পঞ্চম দৃশ্য

অপর পণ্ডিত মারফুরিয়াসের গৃহ

মারফুরিয়াস্। আসুন স্গানারেল।

স্গানারেল। (স্বগতঃ) না এটি গরু নয়। (জোরে) পণ্ডিত মশাই আমি এসেছি আপনার কাছে কয়েকটি বিশেষ কারণে। আমাকে সৎপরামর্শ দিতে হবে।

মারফুরিয়াস্। এমন কথা বলবেন না। আমাদের মায়াবাদে বলে যে কিছুই নিশ্চয় করে বলা যায় না—সব বিষয়েই সন্দেহ প্রকাশ করা উচিত। অতএব 'আমি এসেছি' না বলে "বোধ হচ্ছে যেন আমি এসেছি" বলা উচিৎ।

স্গানারেল। বোধ হচ্ছে?

মারফুরিয়াস্। নিশ্চয়ই।

স্গানারেল। কিন্তু এতে সন্দেহ কি? আমি ত এসেই ছি।

মারফুরিয়াস্। তা'তে সন্দেহ আছে। বোধ হলেও সত্য না হতেও ত পারে।

স্গানারেল। সে কি মশাই? আমি এসেছি, এটাও কি মায়া?

মারফুরিয়াস্। ভেবে দেখা দরকার, কিন্তু পুঁথির বিধান।

স্গানারেল। বলেন কি? আমি কি এখানে আসিনি? আপনি কি আমার সঙ্গে কথা কইছেন না?

মারফুরিয়াস্। আমার বোধ হচ্ছে যেন আপনি এসেছেন, যেন আমি আপনার সঙ্গে কথা কইছি—কিন্তু এ যে সত্য তা'র নিশ্চয়তা কি?

স্গানারেল। না মশাই রসিকতা করবেন না। যাক্ গে, আপনাকে বলতে এসেছি যে আমি বিয়ে করব ভাবছি।

মারফুরিয়াস্। এ বিষয়ে আমি ত কিছু জানি না।

স্গানারেল। আপনাকে তাই বলছি।

মারফুরিয়াস্। তা' হ'তে পারে।

স্গানারেল। যা'কে বিয়ে করতে চাই তা'র মত সুন্দরী আর আছে কি না সন্দেহ। দেখ্‌লেই বিয়ে করতে ইচ্ছে করে।

মারফুরিয়াস্। অসম্ভব নয়।

স্গানারেল। তা'কে বিয়ে করা ভালো হবে কি না?

মারফুরিয়াস্। হ'তেও পারে, না হ'তেও পারে।

স্গানারেল। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ—এ যে আর এক সুর। (প্রকাশ্যে) আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি। যা'র কথা বল্‌লাম, তা'কে বিয়ে করা ভালো হবে?

মারফুরিয়াস্। হতে পারে।

স্গানারেল। খারাপ হবে?

মারফুরিয়াস্। হয়ত হবে।

স্গানারেল। মশাই, ঠিক একটা জবাব দেবেন?

মারফুরিয়াস্। আমারও ত তাই ইচ্ছে।

স্গানারেল। মেয়েটিকে আমার খুব ভালো লাগে।

মারফুরিয়াস্। লাগা অসম্ভব নয়।

স্গানারেল। তা'র বাবাও রাজী হয়েছেন

মারফুরিয়াস্। হয়ে থাক্‌তে পারেন।

স্গানারেল। কিন্তু ভয় হচ্ছে যে হয়ত বিয়ে করে ঠক্‌তে পারি।

মারফুরিয়াস্। আশ্চর্য্য নয়।

স্গানারেল। আপনার কি মনে হয়?

মারফুরিয়াস্। কিছুই না।

স্গানারেল। কিন্তু আমার অবস্থায় পড়লে আপনি কি করতেন?

মারফুরিয়াস্। কি জানি—

স্গানারেল। আমাকে কি পরামর্শ দেন?

মারফুরিয়াস্। আপনার যা ইচ্ছা।

স্গানারেল। মশাই, এবার সত্যি ক্ষেপে যাব।

মারফুরিয়াস্। তার আমি কি করতে পারি?

স্গানারেল। চুলোয় যান্—

মারফুরিয়াস্। যেতেও পারি।

স্গানারেল। (স্বগতঃ) দাঁড়াও এবার সুর বদ্‌লে দেব।

[ মারফুরিয়াস্‌কে প্রহার ]

মারফুরিয়াস্। হাঁ, হাঁ, ওকি, ওকি থামুন্।

স্গানারেল। একটু দক্ষিণা মন্দ কি?

মারফুরিয়াস্। আপনার এত বড় স্পর্দ্ধা। আমার মতন পণ্ডিতকে প্রহার করা?

স্গানারেল। মশাই, আপনিই শিক্ষা দিয়েছেন সব বিষয়ে সন্দেহ করা উচিত। "আমাকে প্রহার করা" না বলে "বোধ হচ্ছে আমাকে প্রহার করা" বলা উচিত নয় কি?

মারফুরিয়াস্। আচ্ছা আদালত খোলা আছে।

স্গানারেল। তার আমি কি করতে পারি?

মারফুরিয়াস্। সারা শরীরে কালশিরে পড়েছে।

স্গানারেল। পড়ে থাকতে পারে।

মারফুরিয়াস্। আপনিই এর জন্য দায়ী।

স্গানারেল। অসম্ভব নয়।

মারফুরিয়াস্। আপনার নামে নালিশ করব।

স্গানারেল। হয় ত করবেন।

মারফুরিয়াস্। আপনার জেল হবে।

স্গানারেল। হতেও পারে।

মারফুরিয়াস্। যান্ যান্, ঢের হয়েছে, খুব শিক্ষা হল।

স্গানারেল। হ'ল হয় ত।

[ প্রস্থান ]

## ষষ্ঠ দৃশ্য

রাজপথ

স্গানারেল। ভারী মুস্কিল ত। কার কাছে যাই এবার? আচ্ছা ঐ ত দুটো বেদে ঝোলাঝুলি নিয়ে আসছে, একবার হাত দেখালে হয় না?

[ বেদে দুজন কাছে এল ]

স্গানারেল। ওহে বাপু, হাত দেখতে পার?

প্রথম বেদে। পারি বৈ কি। ঠিক বলে দেব।

দ্বিতীয় বেদে। এ হাতে চার আনা দেবেন আর এ হাতে দেখে দেব।

স্গানারেল। (পয়সা দিয়ে) এই নাও। দুই হাত দেখে ঠিক ঠিক বল দেখি।

প্রথম বেদে। চার আড়াইয়ে দশ।

দ্বিতীয় বেদে। দশ।

প্রথম বেদে। গুপ্তধন।

দ্বিতীয় বেদে। স্ত্রী লাভ।

প্রথম বেদে। একটু—

দ্বিতীয় বেদে। হুঁ।

প্রথম বেদে। রাজা হতে হতে হলেন না।

দ্বিতীয়। দাতা, জ্ঞানী।

স্গানারেল। তা না হয় হল। কিন্তু যদি বিয়ে করি পরে অনুতাপ করতে হবে না ত?

দ্বিতীয় বেদে। অনুতাপ?

প্রথম বেদে। এঁ্যা, অনুতাপ?

স্গানারেল। হ্যাঁ; কখনও আমার বঞ্চিত হবার ভয় আছে?

[ বেদে দুজন পরস্পরের প্রতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একটুখানি চেয়ে চুপ করে থাকল ]

স্গানারেল। এ আবার কি? আচ্ছা বিপদ! শুনছ আমার স্ত্রী আমাকে কখনও ছলনা করবে?

প্রথম বেদে। ছলনা?

স্গানারেল। হ্যাঁ।

দ্বিতীয় বেদে। আপনার স্ত্রী?

সগানারেল। হ্যাঁ, হ্যাঁ।

[ কোনও উত্তর না দিয়ে একটু হেসে বেঁদে দুজন নাচতে নাচতে চলে গেল ]

## সপ্তম দৃশ্য

ডোরিমেনের পিতৃগৃহ

লাইকাষ্ট। সত্যি ?

ডোরিমেন। সত্যি।

লাইকাষ্ট। তুমি শেষে ঐ বুড়ো—

ডোরিমেন। হ্যাঁ।

লাইকাষ্ট। আজ রাত্রেই ?

ডোরিমেন। আজই রাত্রে।

লাইকাষ্ট। ডোরি, তোমাকে যে নিজের চেয়েও বেশী ভালোবাসে, তার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছ ?

ডোরিমেন। ভুলিনি লাইকাষ্ট। ওকে কেন বিয়ে করছি তুমি জানো না। টাকাকড়ি তোমারও নাই আমারও নাই। ও বুড়ো আর ক'দিন ? তারপর সব টাকা আমার ; তখন তুমি আর আমি, আমি আর তুমি— (হঠাৎ সগানারেলকে দেখে)—এই যে তোমার কথাই বলছিলাম আমার বন্ধুকে।

লাইকাষ্ট। ইনিই ?

ডোরিমেন। হ্যাঁ আমার ভাবী স্বামী।

লাইকাষ্ট। নমস্কার, ডোরির সঙ্গে আমার আলাপ ছেলে বেলা থেকেই। ঈশ্বরের কাছে—

[ সরোষে ও বেগে সগানারেল-এর প্রস্থান ]

* * * *

[ এলক্যান্টরের ঘরে ]

এলক্যানটর। এসো বাবা এসো।

সগানারেল। আজ্ঞে আমি—

এলক্যানটর। কিছু বলতে চাও ?

সগানারেল। হ্যাঁ আমি—

এলক্যানটর। বল, বল, লজ্জা কি ?

সগানারেল। আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু এখন দেখছি আমার বয়স অনেক হয়েছে, আমি তাঁর যোগ্য নই।

এলক্যানটর। সে কি কথা। তুমি যেমন আছ আমার মেয়ে ত তোমাকে তেমনি পছন্দ করেছে।

সগানারেল। থাকে না, সময়ে সময়ে আমার ব্যবহার বড়ই অভদ্র হয়। তিনি আমার সঙ্গে বাস করতে পারবেন না।

এলক্যানটর। আমার কন্যা সাধ্বী ; বেশ মানিয়ে নেবে, কোনও ক্ষতি হবে না।

সগানারেল। আমার শারীরিক কতগুলি—

এলক্যানটর। ও কিছু না, সতী নারী স্বামীর শরীরের বিষয় কিছু জানতে চায় না।

সগানারেল। তবে স্পষ্টই বলি—আমার হাতে তাঁকে দেবেন না।

এলক্যানটর। অর্থাৎ ? আমি কথা দিয়েছি, এখন—

সগানারেল। আমি আপনাকে অঙ্গীকার থেকে মুক্তি দিলাম

এলক্যানটর। আমাদের বংশে কেউ কথা দিয়ে ফিরিয়ে নিতে জানে না।

সগানারেল। দেখুন আমি পরিষ্কার বলছি যে আপনার মেয়েকে আমি বিয়ে করব না।

এলক্যানটর। বিয়ে করবে না ?

সগানারেল। না।

এলক্যানটর। কেন ?

সগানারেল। প্রথমতঃ আমার আর বিয়ের বয়স নাই ; দ্বিতীয়তঃ আমার পিতা পিতামহ কেউ কখনও বিয়ে করেন নি ; আমিও তাঁদের মত চিরকুমার থাকতে চাই।

এলক্যানটর। আচ্ছা, তবে আমি একবার বাড়ীর ভেতর থেকে ঘুরে আসি।

[ প্রস্থান ]

[ এল্‌সিয়াডিসের প্রবেশ ]

এলসিয়াডিস্। ( অত্যন্ত গোবেচারাভাবে ) আজ্ঞে।

সগানারেল। বলুন বলুন।

এলসিয়াডিস্। বাবা বলছিলেন যে আপনি ডোরিমেনকে বিয়ে করবেন না?

স্গানারেল। হ্যাঁ, আমি বড় দুঃখিত, কিন্তু—

এলসিয়াডিস্। থাক্ থাক্ তা'তে কি?

স্গানারেল। আমি বড়ই লজ্জিত, কিন্তু—

এলসিয়াডিস্। না, না, কোনও ক্ষতি নাই

[স্গানারেলকে দুটো তরোয়াল দিয়ে]

এর মধ্যে একটা দয়া করে বেছে নেবেন কি?

স্গানারেল। তরোয়াল?

এলসিয়াডিস্। (সবিনয়ে) আজ্ঞে যদি কিছু মনে না করেন—

স্গানারেল। মানে?

এলসিয়াডিস্। আপনি বলেছিলেন যে আমার সহোদরাকে বিয়ে করবেন, এখন বলছেন করবেন না; অতএব—

স্গানারেল। অতএব?

এলসিয়াডিস্। আর কেউ হ'লে হয়ত হট্টগোল ক'রে লোক ডেকে এনে গালাগালি করত। কিন্তু আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে চুপি চুপি জানাতে এসেছি যে যদি আপনার বিশেষ আপত্তি না থাকে তা' হলে আমরা পরস্পর পরস্পরের গলা কাটাকাটির চেষ্টা করি আসুন।

স্গানারেল। সর্ব্বনাশ!—সে কি?

এলসিয়াডিস্। কি করব বলুন? আসুন, নেন—(তরোয়াল প্রদান)

স্গানারেল। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, কিন্তু এতে আমার প্রবৃত্তি নাই। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ করলে।

এলসিয়াডিস্। আসুন তাড়াতাড়ি সেরে নেওয়া যাক্। আমাকে আবার একটু কাজে বাইরে যেতে হবে।

স্গানারেল। আমার দ্বারা এ কাজ হবে না।

এলসিয়াডিস্। আপনি যুদ্ধ করবেন না?

স্গানারেল। না।

এলসিয়াডিস্। খাঁটি?

স্গানারেল। একেবারে।

এলসিয়াডিস্। (হাতের বেত দিয়া স্গানারেলকে কয়েক ঘা প্রহার) কিছু মনে করবেন না; আমি নিয়মমত সব ঠিক করছি। আপনি কথা দিয়ে কথা ভাঙ্গলেন—আমি আপনাকে যুদ্ধে ডাকলাম—আপনি রাজী হলেন না—অতএব আমি বেত্রাঘাত করলাম। সব কেতামত ঠিক করেছি, কোনও খুঁৎ হয় নি। আসুন এবার (তরোয়াল প্রদান) নইলে কান টেনে দেব।

স্গানারেল। আপনি নিতান্তই যুদ্ধ করবেন?

এলসিয়াডিস্। আমি বৃথা জোর করব না। হয় ডোরিমেনকে বিয়ে করবেন, নয় লড়বেন, আসুন—

স্গানারেল। আমি একটাও পারব না।

এলসিয়াডিস্। বটে?

স্গানারেল। হুঁ।

এলসিয়াডিস্। কিছু মনে করবেন না, তা' হলে। (প্রহার)

স্গানারেল। ও রে রে রে থামুন্, থামুন

এলসিয়াডিস্। কি করব বলুন? যতক্ষণ না বিয়ে করতে রাজী না হন ততক্ষণ আমাকে এই রকমই চালাতে হবে। কিছু মনে করবেন না তা' হলে। (বেত উত্তোলন)

স্গানারেল। থামুন্ মশাই, আমি বিয়েই করব।

এলসিয়াডিস্। যাক্ গে, আমি ভারি খুসী হলাম; সত্যি আপনাকে আমার বড় ভাল লাগে। যাই ভেতরে খবর দিই গে।

(প্রস্থানোদ্যত)

[ডোরিমেন সহ এলক্যানটরের প্রবেশ]

এলসিয়াডিস্। বাবা ইনি রাজী হয়েছেন—

এলক্যানটর। ভালো, ভালো, এসো বাবাজী। এই আমার কন্যা, এই তুমি; চার হাত এক হ'ল। জয় ভগবান্—এবার আমি দায়মুক্ত; এবার থেকে একে তুমি সামলাবে। চলহে রাত হয়েছে, খাবারও প্রস্তুত।

[নিষ্ক্রামণ]

যবনিকা

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

# কীর্ত্তন-গানে অভিনয়—নাচে, সুরে, স্বরে

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভাগবতভূষণ

হিন্দু-সঙ্গীতের নৃত্য হইতেছে পুরাদস্তুর Scientific। নৃত্যই কলা-বিদ্যার আদি। গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটির সমাবেশকে আমাদের শাস্ত্রে "সঙ্গীত" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সেই জন্য হিন্দু-সঙ্গীতের আর একটি নাম হইতেছে—তৌর্য্যত্রিক। সাধারণতঃ কীর্ত্তন-গান হইতেছে পূর্ণভাবেরই তৌর্য্যত্রিক। কীর্ত্তন-গানের এরূপ অনেক পদ আছে, নাচে আর সুরের ও স্বরের বিশেষ বিশেষ প্রকারের অভিব্যক্তির ভঙ্গিতেই যাহাদের পূর্ণতা আমরা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বহুদিন পরে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া উল্লাসবশতঃ প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা লাস্যময়ী শ্রীরাধার উক্তি-সম্বন্ধে বিদ্যাপতির রচিত—

"আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহাইনু
পেখনু পিয়ামুখ চন্দা"

ইত্যাদি পদ হইতেছে আমাদের কথিত ঐ পদ-সকলের অন্যতম।

বাস্তবিক যখন আমরা সে কালের প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনিয়াদের মুখে ঐ পদ এবং ঐ ভাবের অন্যান্য পদ সব শুনিয়াছিলাম, তখন তাঁহারা শ্রীরাধা-চরিত্রের অনুকরণ করিয়াই আবেশে নাচিতে নাচিতে * ঐ সকল গাইয়াছিলেন; বেশ মনে পড়ে, তখন আমরা ক্ষণমাত্রের জন্যও বুঝিতে পারি নাই যে, আমাদের সামনে পুরুষের নাচ হইতেছিল; বরং মনে হয় সে নাচে যেন গোপীভাবেরই পূর্ণ জমাটে গানের আসর "জম-জম" করিতেছিল। গানে উক্ত সকল প্রকার অভিনয়ের সমাবেশই ইহার মূল কারণ বলিয়া মনে হয়। নাচিয়া নাচিয়া ঐ সকল পদ না গাইলে উহাদের কার্য্য-কারিতা শক্তি অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়। তাই বলিয়া যে-সে রকমে নাচিলে সে সব গানে ভাব ফুটিয়া উঠে না। ঐ সব গানে সুরে, স্বরে, তদ্ভিন্ন নাচেও সময়োপযোগী—ভাবোপযোগী প্রাগুক্ত অভিনয় করিবার মত বিলক্ষণ কিছু থাকে, যাহা জগতের যে-কোন বড় নাট্যশালার গৌরব-বৃদ্ধি করিতে পারে। কিন্তু সেরূপ অভিনয় ত সকলের আয়ত্ত হইতে পারে না; কারণ ভাবুক না হইলে শুধু "নাচিব" মনে করিয়া নাচিতে গেলে সে আসল নাচ হয়

---

* সাংসারিক আনন্দেই কত লোক নাচে, শ্রীরাধার কুলবতী হইয়া পরানন্দে নাচা তো অনেক দূরের কথা। আমি এক বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বাড়ীতে বহু পূর্ব্বের কোন এক বিবাহে স্ত্রীলোকদের এইরূপ নাচের কথা জানি। উৎসব-পূর্ণ সে বাড়ীতে ইংরেজী ব্যান্ড্ আসিয়া প্রথম বাজনা সুরু করিল; তাহা শুনিবামাত্র বরের ভগ্নি সম্পর্কীয়া দুইজন—বয়সে প্রায় প্রৌঢ়া, সেকালের বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে—উল্লাসে পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া অন্দর মহলে নাচ আরম্ভ করিয়া দিলেন। এটা হইল—এখন যে কথা বলিব, তাহার তুলনায়—যেন ছোট ঘরের ছোট কথা। স্বয়ং মহারাণী Victoriaর কথা কোন ইংরেজি পত্রিকায় এইরূপ পড়িয়াছি। খৃষ্টীয় ১৮৫৯ শতকের একদিন প্রভাতে মহারাণী একখানা টেলিগ্রাম্ হাতে লইয়া Windsor castleএর এ-ঘর ও-ঘর ছুটিয়া ছুটিয়া যাহাকে সামনে পাইতেছিলেন তাহাকেই বলিতেছিলেন, "মনে কর কি?—আমি মাতামহী হয়েছি যে।" পরক্ষণেই তিনি নাচিতে আরম্ভ করিলেন। সে নাচে তখন কোন ব্যক্তি-বিশেষের আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল। কারণ উহা সাধারণতঃ রাণী-পদবীর নারীর উচিত আদব-কায়দার—বিশেষতঃ মহারাণীর মত গম্ভীরভাবের চাল-চলনের বাজীর অনুপযোগী ছিল। ঐ টেলিগ্রামে Ex-Kaiserএর জন্মের সংবাদ ছিল। ঐ কাগজ হইতে কিছু উঠাইতেছি:—

The Queen ran from room to room in Windsor castle holding a telegram in her hand and calling to every body she met: "What do you think? I am a grandmother!" Then she danced on to astonish some body else not only with her news but with her unregal behaviour for as a rule the Queen was very severe in her deportment.

আনন্দে ঠাকুরদাদার নাচের কথাও আমি জানি। নাতি "জীবটি" সকল জাতিরই কাঙ্ক্ষিত বস্তু বটে। এই যেমন Tennyson তাঁহার "Dora"য় লিখিয়াছেন:—

—I would wish to see,
My grand child on my knees before I die.'

না। সে নাচে গানের সঙ্গে ভাবের ঝোঁকে হাব*—অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ প্রকারের অঙ্গ-ভঙ্গী—তৎসহ কখন অশ্রুপাত, কখনও বা মুখে ফুটন্ত হাসির রেখা—ইত্যাদি যথাযথ ভাবে আপনিই আসিয়া পড়ে। আশ্চর্য্যের বিষয় বৃদ্ধও সে নাচ নাচিলে রস-ভঙ্গ হয় না; বালক, যুবা, বৃদ্ধ—হয় ত বা বৃদ্ধা—সকলকেই সমানভাবে জড়াইয়া ধরিয়া কি যেন এক অপরূপ সৌন্দর্য্য উপরের কোন এক অজানা দেশ হইতে নামিয়া আসিয়া গানের আসর জুড়িয়া খেলিয়া বেড়াইতে থাকে।

সুরের বা স্বরের অভিনয়ও কীর্ত্তন-গানে বিলক্ষণ ভাবেই আছে। গাইবার সময় সুরের উচ্চতা, লঘুতা, কম্পন এমন কি শোক, দুঃখ ইত্যাদির ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সুরের বা কথার তত্তদুপযোগী ভঙ্গী ইত্যাদিতে তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়। † যাঁহারা কীর্ত্তন-গানে এই সকলের অবতারণা করিতে পারেন, অর্থাৎ ভাবাবেশে—অনেকটা নিজেদের অজ্ঞাতসারে—যাঁহাদের দ্বারা ঐ সকল কার্য্য হয়, তাঁহারাই যথার্থ কীর্ত্তন-সিদ্ধ। এ সকলে কৃত্রিমতা আসিলে অভিনয় ঠিক হয় না, ভাব নষ্ট হইয়া যায়—"ভাবের ঘরে চুরি" হয়। কেবল রাগিণী বজায় রাখিয়া কীর্ত্তন গাইবার দক্ষতা হইলেই "কীর্ত্তনীয়া" হওয়া যায় না। এখানে ইহাও বলা উচিত যে, কীর্ত্তন ব্যতীত আমাদের দেশে প্রচলিত অন্য সকল প্রকার গানে ঐ রূপ নাচের, সুরের ও স্বরের একত্রে অভিনয় নাই। কীর্ত্তন-গানের ইহা একটি বৈশিষ্ট্য। ‡

ব্রজলীলা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার-গানে (এই যেমন শ্যামা-বিষয়ক গীত ইত্যাদিতে) কীর্ত্তনের সুর খাপ খায় না। যে সকল রসের উপর ব্রজ-লীলা প্রতিষ্ঠিত, অন্যত্র তাহার অভাববশতঃ সেখানে কীর্ত্তনের সুরের কার্য্যকারিতা শক্তি থাকে না। কীর্ত্তনের সুরে গেয় ব্রাহ্ম-সঙ্গীত ও মিশনারিদের যীশুসম্বন্ধীয় সঙ্গীত তাহার প্রমাণ। কীর্ত্তনের মৃদঙ্গ (খোল) অদ্ভুত রকমের সঙ্গতের যন্ত্র। কীর্ত্তন-গানের ইহা প্রাণ বলিলেই হয়। এ হেন মৃদঙ্গও ব্রজ-লীলা ব্যতীত অন্য সকল কীর্ত্তন-গানে রসোদ্দীপনে অক্ষম। কেবল মাত্র মৃদঙ্গের বাজনা যাঁহারা শুনেন, তাঁহারাও মাতিয়া উঠেন। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার সুর বাঁধাই থাকে; ইহা বালক, যুবা, বৃদ্ধ, সকলের কণ্ঠের সহিত যখন-তখন মিলে।

কবিতার (গানের) ছন্দ আছে; নাচেরও উপযোগী ছন্দ আছে; সে ছন্দ ধরা পড়ে দর্শকের চোখে, যখন নাচ হয়। গীতি কবিতার ছন্দ-বিন্যাসের উপযোগী নাচ ঐ কবিতার ভাবের ব্যঞ্জনার পক্ষে অধিকতর সহায়ক; নৃত্য-কালে হস্ত-পদাদির বিশেষ ভাবে বিক্ষেপ বা বিন্যাস-ভঙ্গী প্রভৃতি যা-কিছু সব তাহার উদ্দীপন করার চেষ্টা মাত্র।

কীর্ত্তনের আর একটি বৈশিষ্ট হইতেছে গায়কের কীর্ত্তন গাওয়ার উপযোগী "গলা"। যেমন বেহালার সুর বা আওয়াজ তাহার নিজের, বাঁশীর সুর

---

* ভাব প্রথম আসে মনে, তখন তাহার বাহ্য প্রকাশ কিছুই থাকে না। মন ক্রমশঃ ভাবে বিভোর হইয়া উঠিলে ভাবুকের শরীরের যথাযোগ্য স্থান-সমূহে ভাবের স্বতঃ বিকাশ হইতে থাকে; এই যেমন চোখে, মুখে, চলা-ফিরায়, হাসি-কান্নায় এই সকলে। এই বিকশিত ভাবের নাম হইতেছে 'হাব'।

† এই জন্য কীর্ত্তনে হার্ম্মোনিয়ম, বেহালা প্রভৃতি গানের সহিত বাজাইবার (accompaniment) যন্ত্র-ব্যবহারের নিয়ম নাই। এমন কি কেবল সুর রাখার যন্ত্রের—এই যেমন তানপুরার ব্যবহারও কীর্ত্তনে চলে না। ঐ সকল যন্ত্র বাদিত হইলে কণ্ঠের সুর কিম্বা স্বরজনিত কার্য্য বা অভিনয় স্পষ্ট বুঝা যায় না, অনেক স্থলেই একেবারে বুঝা যায় না। ইহাতে রসভঙ্গ হয়।

‡ বহু বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার আমার বন্ধু প্রথিত-নামা অমৃতলাল বসু মহাশয়কে রঙ্গ-মঞ্চে যথার্থ কীর্ত্তন-গানের ও তৎসহ বর্ণিত প্রকারের অভিনয় প্রবর্ত্তন করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়াছিলাম; উত্তরে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, আমাদের দেশে সে সময় আসে নাই, সে কারণ অভিনেতা-শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে উপযুক্ত অভিনেতা পাওয়া দুর্ঘট, আর সাধারণ দর্শকেরা স্থূল ক্রিয়া (action) বহুল অভিনয়ই দেখিতে চাহেন; প্রেম-রাজ্যের মনস্তত্ত্বের গভীর তরঙ্গ লীলাসকল দুই একটি কথায় বা সুরে কিম্বা ভঙ্গীতে অথবা অন্য কোন প্রকারের অভিনয়ে তাঁহাদের চোখে তেমন করিয়া ফুটিতে পারে না। আমি তখন বুঝিয়াছিলাম, বন্ধুর কথাই খুব ঠিক। ইহার পর একদিন সন্ধ্যা বেলায় তিনি তাঁহার অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে "কীর্ত্তনে অভিনয়" বুঝাইবার জন্য আমাকে সঙ্গে লইয়া ষ্টার থিয়েটারের ষ্টেজে দুই ঘন্টারও অধিক কীর্ত্তন শুনাইয়াছিলেন। সে রাত্রি সে থিয়েটারের অভিনয় বন্ধ ছিল। পরে তিনি নিজের বাড়ীতেও এক রাত্রি ঐরূপ ভাবের কীর্ত্তন শুনিয়াছিলেন। তিনি কীর্ত্তনের একজন "গোঁড়া" ছিলেন।

তাহার নিজের, এসরাজের সুর তাহার নিজের, হার্ম্মোনিয়মের সুর তাহার নিজের—যেমন ঐ সকল যন্ত্রের প্রত্যেকটিই নিজস্ব, প্রধান—সে নিজস্ব হিসাবে তাহাদের কোনটিও অন্য কোনটির সঙ্গে মিল খায় না, সেইরূপ কীর্ত্তন-গানের আওয়াজেরও একটা নিজস্ব—একটা উপযোগী কণ্ঠ আছে। সে "গলা" তথা-কথিত কীর্ত্তনীয়াদের নাই। তাহা ঠিক পুরুষ-কণ্ঠ নয়, নারী-কণ্ঠও নয়; তাহা ঠিক কি বুঝান কঠিন। তবে সে গলা যেন কখন সুখের উচ্ছ্বাসে, কখনও বা দুঃখের আবেগে সদাই ভরপুর। আমার মনে হয়, এটা যেন একটা gift. Cowper বলেন—

There is, in souls a sympathy with
sounds.

* * * *

Some chord in unison with what we hear
Is touched within us and the heart replies.

কবিতায়, গানে আর নাচেও বটে, এ উক্তির সার্থকতা বিলক্ষণ বুঝা যায়।

নাচ হইতেছে এক প্রকার Mute কবিতা বা গান, নাচে ঐ "Sounds" যেন একটু সুপ্তভাবে থাকে; গান-বাজনার সাড়া পাইলে সেটা একেবারে জাগিয়া উঠে। ঐ যে শব্দের কথা Cowper বলিয়াছেন;—যে শব্দ-জনিত কম্পনের (Vibration) সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়-তন্ত্রী স্বতঃই কাঁপিয়া উঠে, ঠিক সেই শব্দের উদ্ভব করা সাধারণ-কবি বা কীর্ত্তন-গায়কদিগের কার্য্য নহে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ কবিদিগের কৃত "শব্দ"-জনিত অল্পাধিক স্পন্দন আমাদের হৃদয় ঘেঁষিয়া যায় মাত্র—তাহাকে ছোঁয় না—কাঁপাইয়া তোলে না। বাণীর যথার্থ বর-পুত্র কবিগণেই সে স্পন্দনের পূর্ণ মাত্রায় সৃষ্টি করিতে পাবেন। কীর্ত্তন-গানের "মহাজন"-গণ তাঁহাদেরই শ্রেণীর। কীর্ত্তনের পদের ও গানের "শব্দ" আমাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে ঘা দিয়া বিলক্ষণ ঝঙ্কার উঠায় এবং সমস্ত দেহে একটা সাড়া জাগাইয়া তোলে। সাধারণতঃ বৈষ্ণব-পদাবলী Cowper-কথিত "sounds"এ বিলক্ষণ ভরপুর। ঐ পদাবলী ও কীর্ত্তন-গান চিরদিনের মত আমাদের বাংলার Highest aesthetical culture এর আদর্শ স্বরূপ হইয়া থাকিবে। যদি কোন বিদেশীয় ব্যক্তি আমাদের বলেন, "বাঙ্গালীদের আবার আছে কি?" আমরা সদর্পে উত্তর দিব, "কেন—কীর্ত্তন?" আবার সঙ্গে সঙ্গে Goethe এর কথায় ইহাও বলিব—"And all at once is said"।

"মধু কান" প্রবর্ত্তিত ঢপ-কীর্ত্তন বলিয়া আর এক প্রকার কীর্ত্তনের অল্পাধিক প্রচলন বাংলায় আছে। উহা সাধারণ শ্রোতাদের (Mass) পক্ষে সহজ-বোধ্য, কিন্তু বৈষ্ণবদিগের কীর্ত্তন-গান হইতে উহা সর্ব্বপ্রকারেই সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন। "ঢপ" আমাদের এ প্রবন্ধের একেবারেই লক্ষ্য নহে, ইহা বলাই বাহুল্য। কালী-কীর্ত্তন সম্বন্ধেও আমাদের ঐ কথা। পূর্ব্বে "কীর্ত্তন" বলিলে কেবলমাত্র বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনই বুঝাইত। এ প্রস্তাব আমরা সেই কীর্ত্তনকেই উপলক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছি।

মনুষ্যত্বের বড় কিছুই নাই। হৃদয়বান্ হওয়া যদি মনুষ্যত্ব হয়, তবে এক কীর্ত্তন-গানেই সে মনুষ্যত্ব দিতে পারে, ইহাই আমার বিশ্বাস। কিন্তু সমাজের আর এক দিক—যাহা রজোগুণের—সে দিক হইতে দেখিলে বলিতে হয়, কীর্ত্তন-গান মানুষের পুরুষকারের এককালীন উচ্ছেদ সাধন করে। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সকলকেই গোপীভাবের দিকে—স্ত্রীত্বের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। সে আকর্ষণের ফলে এক হিসাবে সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায় না কি?

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

# ইন্দির

শ্রীঅবনীনাথ রায়

কলিকাতা হইতে দিল্লী আসিতেছিলাম। তুফান মেলে ভিড় বেশি হয় বলিয়া তার দু' ঘণ্টা আগে যে ট্রেণ ছাড়ে তার যাত্রী হইয়াছিলাম। গাড়ীটার নাম 15 Up. এটা তুফান মেলের আগে ছাড়িয়া পরে আসিয়া দিল্লী পৌঁছায়।

ট্রেণ চলিতে লাগিল—বাংলা দেশের ভিজা স্যাঁতসেতে মাটি ক্রমশঃ পিছনের দিকে হাঁটিতে লাগিল। খানা, ডোবা, জলাশয়ের প্রাচুর্য্য ক্রমশঃ কমিতে লাগিল। বন, বাদাড়, ঘাসের অবাধ উৎপত্তি ধীরে ধীরে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। অণ্ডাল জংসনে যখন গাড়ী থামিল তখন চারিদিকের শুক্‌নো খট্‌খটে লাল জমির মাঠ দেখিয়া মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সময়টাও ছিল সন্ধ্যার প্রাক্কাল। ট্রেণে বসিয়াই দেখিতে লাগিলাম একটি সরু পথ ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া ক্রমে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেছে। সহরের কোলাহল নাই, ব্যস্ততা নাই, কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া পরিচ্ছন্ন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গলা টিপিয়া ধরিতেছে না। ছোট্ট পাড়াগাঁর মত সহর—রেলের জংসন না হইলে লোকে এ জায়গার নামই হয়ত জানিত না।

ট্রেণ আবার চলিতেছে—রাণিগঞ্জ, আসানসোল পার হইয়া গেল। মনে করিলাম এইবার একেবারে ধানবাদ যাইয়া থামিবে। হঠাৎ গাড়ী থামিল দুর্গাপুর। হয়ত লাইন ক্লিয়ার ছিল না কিন্তু আবার থামিল সীতারামপুর। মন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। তুফান গাড়ীতে আসিলে এত জায়গায় গাড়ী থামিত না—এতক্ষণ কতদূর আগাইয়া যাওয়া যাইত—একস্‌প্রেসের এবং একস্‌প্রেসের সওয়ার লোকদেরও মর্য্যাদা রক্ষা হইত। মনে মনে বলিলাম, যত ভিড়ই হোক্‌, ভবিষ্যতে তুফান গাড়ীর চড়ন্দার হইয়া বসিতে হইবে।

পুনরায় এত শীঘ্র গাড়ী থামিবে মনে করি নাই—আমার বিরক্ত মনকে যেন অধিকতর উত্যক্ত করিবার জন্ম কয়েক মাইল গিয়া পরের ষ্টেশনেই গাড়ী থামিল।

কুল্‌টি.........

কুল্‌টি?

হাঁ, কুল্‌টি।

নাম শুনিয়া অনেকদিন আগেকার এক ইতিহাস মনে পড়িল। ঘটনাটির উপর মহাকাল আজ যবনিকা টানিয়া দিয়াছে। যাহারা জানিত তাহাদের অধিকাংশ বোধ হয় আজ বাঁচিয়া নাই। আর যদিও বা বাঁচিয়া থাকে তবে এ ঘটনা তাদের স্মৃতির বাহিরে চলিয়া গেছে।

* * *

বেঙ্গল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী যখন কুল্‌টিতে তাঁদের কারখানা প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন সে অনেক কাল আগের কথা। দেখিতে দেখিতে অখ্যাতনামা পল্লী সহর হইয়া ফাঁপিয়া উঠিল। বিলাত হইতে সাহেব আসিলেন, বাংলাদেশ হইতে আসিলেন আপিসের বাবুরা, পাঞ্জাব হইতে আসিল ফিটার মিস্ত্রি, প্রভৃতি। আপিস ঘর তৈয়ার হইল, কারখানা ঘর হইল, Blast Furnace এর হাপর দিনরাত হাঁপাইতে লাগিল। আকাশের শূন্যতাকে বিদীর্ণ করিয়া ক্রেণ ঝুলিতে লাগিল। কারখানার শ্রমিকদের এবং আপিসের বাবুদের চিকিৎসার জন্ম আসিলেন বাঙালী ডাক্তার সাহেব। বিজ্‌লি বাতি জ্বলিল, জলের কল হইল। বাবুরা থাকিবার জন্ম কোয়ার্টার পাইলেন। তাঁদের ছেলে-মেয়ের পড়াশোনার জন্ম ক্রমে একটি ছোট স্কুলেরও প্রতিষ্ঠা হইল।

কিন্তু কোথায় গেল চারিদিকের সেই দিগন্তপ্রসারী মাঠ, দুপুরের সেই নিরালা অবসর, অপরাহ্ণের শান্ত নিস্তব্ধতা! সকল মানুষই হঠাৎ যেন ব্যস্ত হইয়া উঠিল, সময়ের মূল্য সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হইয়া পড়িল। পরস্পর দেখা হইলে কেউ আর আগের মত পাঁচ মিনিট দাঁড়াইয়া কুশল প্রশ্ন করে না, সেই সময়টা কারখানায় কাটাইলে তাহার পরিবর্ত্তে অর্থ পাওয়া যাইবে। মাঠের মধ্য দিয়া গড়িয়া

উঠিল আঁকা বাঁকা রাস্তা, তাহার উপর দিয়া চলিতে লাগিল দলে দলে লোক। হর্ণ বাজাইয়া মোটর গাড়ী সকলকে সচকিত করিয়া তুলিল। বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ আলো কোথায়ও আর এতটুকু আড়াল আব্‌ডাল রাখিল না।

প্রতি সন্ধ্যায় শ্রমিক জীবনের অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিতে লাগিল। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর রাত্রে চলিতে লাগিল তাদের বেপরোয়া স্ফূর্ত্তির তাণ্ডবলীলা। যে পয়সা তারা কোম্পানীর কাছ থেকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উপার্জ্জন করিল তার অধিকাংশই রাত্রে অন্য রাস্তায় শুঁড়ির টাকার থলি পূর্ণ করিয়া তুলিল।

নৈতিক জীবনের শুচিতা বলিয়া কোথাও কিছু অবশিষ্ট রহিল না।

আপিসের বাবুরা ছিল সামান্য লেখাপড়া জানা। কাঁচা পয়সা হাতে পড়ায় তাদের অধোন্নতি হইতে দেরি হইল না। নগর-জীবনের যে বেড়াজাল আকাশে বাতাসে প্রসারিত হইয়াছিল তার কবল থেকে কাহারও মুক্তি ছিল না। কারখানার ধোঁয়া যেমন স্বচ্ছন্দ বায়ুর গতি পঙ্কিল করিল, নাগরিক জীবনের কদর্য্যতাও তেমনি পল্লীর স্বচ্ছন্দ জীবনের সরল পথ রুদ্ধ করিয়া দিল।

বাংলাদেশের এক পাড়াগাঁ থেকে বিপিন আসিল এই কোম্পানীতে চাকরি করিতে। বিপিনের শারীরিক শক্তি সম্বন্ধে নানা জনশ্রুতি ছিল। একবার নাকি বিনা হাতিয়ারে কেবলমাত্র মুষ্ট্যাঘাতের সাহায্যে সে বাঘ মারিয়াছিল। দুর্গাপূজার সময় নবমীর দিন তাদের গ্রামে বড় মহিষকে কামার যখন বলি দিতে সাহস করিত না তখন বিপিন দীর্ঘ খড়্গ স্বচ্ছন্দে উত্তোলন করিয়া অবলীলাক্রমে মহিষের মুণ্ড ছেদন করিয়াছে।

কারখানায় আট ঘণ্টা ডিউটি—কখনো সকালে, কখনো দুপুরে, কখনো বা রাত্রে সুরু হয়। রান্নাবান্না এবং বাসার আবশ্যকীয় কাজকর্ম্ম করিবার জন্য একজন লোক দরকার। লোক অবশ্য সহজেই পাওয়া গেল—কারখানার কুলিদেরই একটি মেয়ে। নাম ইন্দির। বাঙালী ভদ্রলোকের গলা দিয়া নামিতে পারে এমন রান্না যদিচ সে জানিত না কিন্তু কয়েকদিনেই দেখা গেল মেয়েটি চটপটে—জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া মোটামুটি সব কাজকর্ম্ম সে শিখিয়া লইয়াছে।

একদিন দেশ থেকে বিপিনের নিকট এক পত্র আসিল যে তার বিবাহের আয়োজন সব ঠিকঠাক হইয়া গেছে—সে যেন পত্রপাঠ বাড়ী আসে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এখন একটু চাকরি হইয়াছে, আর সংসার ধর্ম্ম না করিলে ভাল দেখায় না ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য সংসার ধর্ম্ম পালন করিবার ইচ্ছা বিপিনেরও কম ছিল না—সুতরাং সে কয়েকদিনের ছুটি লইয়া বাড়ী গেল এবং কয়েকদিন পরেই বিবাহ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু এমনি দুর্দ্দৈব যে একদিন রাত্রের ডিউটি করিবার সময় সাহেবের সঙ্গে বিপিনের ঝগড়া হইয়া গেল। ব্ল্যাক-বোর্ড সামনে রাখিয়া একখানি লোহার চেয়ারে বসিয়া বিপিন ঢুলিতেছিল—Blast Furnace এর ভিতর যত Slag পাঠান হইতেছিল মাঝে মাঝে তার হিসাব ঐ বোর্ডে লিখিতেছিল। হঠাৎ সাহেব আসিল ইন্‌স্পেকশান করিতে।

ওয়েল বাবু, এটা ঘুমোবার সময় নয়।

চোখ রগ্‌ড়াইয়া বিপিন বলিল, সাহেব, তোমরা যা' মাইনে দাও তার তুলনায় ঢের কাজ করছি। মাইনে বাড়াও, আরো ভাল কাজ পাবে।

সেই লেবার এবং ক্যাপিটালের সনাতন দ্বন্দ্ব।

বলা বাহুল্য এর ফল ফলিতে দেরি হইল না। কয়েক দিনের মধ্যেই বিপিনের চাকরিতে জবাব হইয়া গেল।

পাড়াগাঁয়ে দেশের বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া ব্যতীত আর গত্যন্তর ছিল না। আর একটা ষ্টীল কোম্পানীও খুলিয়াছিল, সেখানে হয়ত একটা চাকরিও মিলিত কিন্তু এই চাকরির উপর বিপিনের কি রকম একটা ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছিল।

যাওয়ার আগে ইন্দিরের হাত দু'টি ধরিয়া বিপিন বলিল, তোমাকে পর ব'লে ভাবতে পারি নে। এই বিদেশে তোমার যত্ন আত্তির জন্যেই বাড়ীর কথা একদিনও মনে পড়ে নি। কিন্তু আমার ত চাকরি গেল। তুমি অন্য কোন বাসায় চাকরি জোগাড় করে নাও।

মাটির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ইন্দির বলিল, আপনি এখন কোথায় যাবেন, কি করবেন?

কি যে করবো, তা নিজেই এখনো জানিনে। তবে দেশে একখানা ঘর যখন আছে তখন আপাতত সেখানে গিয়েই উঠ্‌তে হবে।

একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কুণ্ঠিতস্বরে ইন্দির কহিল, আমাকে দেশের বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারেন না ?

এরূপ প্রস্তাব একেবারে অপ্রত্যাশিত। সুতরাং বিপিন সত্যই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, কিন্তু সে কি সুবিধে হবে ? কত লোকে কত কথা বল্‌বে। পরের কথা তুমি সইতে পারবে কেন ? আর এখন ত আমার অবস্থাও সঙীন—নিজেদের খাওয়া-পরার সুবিধে নেই, তোমার মাইনে পত্র আমি কোথা থেকে দেব ?

টাকা-কড়ির কথা বলছিলেন কিন্তু আমার মত একটা লোকের কি-ই বা খরচ ? সে আপনাদের সংসারে একরকম ক'রে কুলিয়ে যাবেই। সেই বরং ভাল—আমাকে নিয়ে চলুন।

একথার সেদিন ওখানেই যবনিকাপাত হইল। কিন্তু যাওয়ার সময় দেখা গেল ইন্দির মিথ্যা বলে নাই। সে যাওয়ার জন্য মনস্থির করিয়া আসিয়াছে। সুতরাং তাহাকে সঙ্গে লইতেই হইল।

* * * *

দেশে একখানা পাকা ঘর এবং আম কাঁঠালের সামান্য একটু বাগান ব্যতীত বিপিনের আর কিছুই সঙ্গতি ছিল না। তখন গৃহে কর্ত্রী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—বিপিনের স্ত্রী নয়নকালী ইন্দিরকে সুনজরে দেখিল না। ইন্দির কাঁদিয়া কাটিয়া একসা করিল। বলিল, মা, তোমার ত চাকরাণিরও দরকার, আমি বাসন মাজা থেকে সুরু ক'রে তোমার সংসারের সমস্ত ঝিয়ের কাজ ক'রে দেবো। এই কথার পর নয়নকালী কেবলমাত্র পেটভাতায় একটা লোক পাওয়া গেল দেখিয়া মুখে আর কিছু বলিল না।

সংসারে কিন্তু কষ্টের অবধি রহিল না। কয়েক বৎসর যাইতে না যাইতে বিপিনের একটি কন্যা এবং একটি পুত্র জন্মিল। বাড়ীর উঠানে একটু শাক-সব্‌জি তরি-তরকারি তৈয়ার করিয়া অপরের নিকট হইতে বাগান জমা করিয়া লইয়া বাঁশ্‌-চিরিয়া বেড়া দিয়া কোন রকমে দিন গুজরাণ হয় কিন্তু মুস্কিল হইল সকলের কাপড় জামার খরচ লইয়া। নগদ এক পয়সাও হাতে নাই বলিলেই চলে। বিপিনের অঙ্গে কাপড়ের বদলে লুঙি উঠিল, চাকরি থাকিতে একটু মাছ মাংস প্রভৃতি সুখাদ্য খাওয়ার অভ্যাসও হইয়াছিল কিন্তু কোন দিক হইতেই এখন আর বাজার খরচের পয়সা সংগ্রহ হয় না। আবো সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিল অসুখ বিসুখের কৃপায়। ম্যালেরিয়ায় দেশ ভরা, ছেলেপুলে দু'দিন ভাল থাকে ত তার পরদিন জ্বরে পড়ে। একটা চ্যারিটেব্‌ল ডাক্তারখানা আছে, সেখানে একটা শিশি লইয়া গেলে খানিকটা কিসের গোলা শিশিতে ঢালিয়াও দেয় কিন্তু তাতে ফল বিশেষ কিছু হয় না। পেটের পিলেও ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠে, বুকের পাঁজরাগুলিও ক্রমশঃ বাহিরের দিকে ঠেলিয়া আত্মপ্রকাশ করে, মুখে কোন স্বাদ বা মনে কোন সাধ আছে বলিয়া বোঝা যায় না।

একবার অসময়ে একটি মরা ছেলে প্রসব করিয়া নয়নকালী অসুস্থ হইয়া পড়িল। ইদানীং সংসার একরকম অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পাশের গ্রামেই এক মুসলমান জমিদারের ব'স—তাদের জমিদারির ভিতর বিপিন আদায়-তশিলের একটু কাজ পাইয়াছিল। কিন্তু মুস্কিল হইল এই যে বিপিন মাঝে ম'ধ্যে ডুব দিতে সুরু করিল—বাড়ী আসিত না। জমিদারের ছেলেদের সঙ্গে নানা আমোদপ্রমোদে সেখানেই সময় কাটাইত।

এদিকে নয়নকালী অসুস্থ হইয়া পড়ায় ইন্দির বড় বিব্রত বোধ করিল। অনেক কষ্টে একটি লোককে বলিয়া কহিয়া পাশের গ্রামে বিপিনকে খবর পাঠাইল। দুপুর নাগাদ লোকটি ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে বিপিন সেখানে নাই, জমিদারের এক ছেলের সঙ্গে দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছে, কবে ফিরবে তাহা কেহ বলিতে পারিল না।

সেদিন সকালে উঠিয়া নয়নকালী ইন্দিরকে ডাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, হাঁড়িতে একটাও ত চাল নেই, মা। আজ তোমাদের রান্নার কি হবে ?

ইন্দির সাহস দিয়া বলিল, তার জন্যে কোন ভাবনা নেই, মা। আমি কাল মজুমদারদের বাসন মেজে দিয়েছিলুম কিনা, তারা আমাকে চাল দেবে বলেছে। আমি এখনি গিয়ে নিয়ে আসছি।

ইন্দির চলিয়া গেল। নয়নকালী কিন্তু কান্নার বেগে সেখানে একেবারে উপুড় হইয়া পড়িল। বাস্তবিক আজকাল এমনি করিয়াই দিন চলিতেছিল। এক মাসের উপর হইল স্বামীর কোন খবর নাই, ঘরে এমন কোন সঙ্গতি তিনি রাখিয়া যান নাই যাতে ছেলেমেয়েটির এবং ইন্দিরের দু'বেলা দু'মুঠো ভাত জোটে। তিনি নিজে খাওয়া দাওয়া এক রকম ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন কিন্তু ছেলেমেয়েটার মুখে দুটো ভাত ত দিতে হইবে। আর যে কুলির মেয়েটা অন্যত্র খাটিয়া আসিয়া তাদের আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া দিতেছে তাকেও দুটো খাইতে দিয়া সক্ষম রাখিতে হইবে।

অথচ তার বয়স তখনো বাইশ পেরোয় নাই। তার কি না হইতে পারিত! কিন্তু এমনি কপাল যে এই বয়সেই তার সাধ আহ্লাদ সব ফুরাইয়াছে। নিজে ভগ্নস্বাস্থ্য, তার উপর ইন্দিরের গতর খাটানো পয়সায় সকলের জীবিকানির্ব্বাহ। এই ব্যবস্থার কৃত্রিমতা এবং অপমান তাকে একেবারে পিষিয়া মারিতেছিল।

এক নিবিড় বর্ষার রাত্রে বৃষ্টির আর বিরাম ছিল না। যে চণ্ডীমণ্ডপখানায় তাদের শোওয়া চলে তার এক পাশের চাল বিদীর্ণ করিয়া ঘরের মধ্যে জল পড়িতে সুরু করিল। নয়নকালী ইতিপূর্ব্বেই বিছানা নিয়াছিল—আর উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইবার সাধ্য ছিল না। শরীরের দিকে তাকাইলে তাকে আর চিনিবার উপায় নাই—কয়েকখানি হাড়মাত্র অবশিষ্ট আছে। সে রাত্রে কেমন যেন হটাৎ সে চম্‌কাইয়া চম্‌কাইয়া উঠিতে লাগিল। মনে হয় দরজার দিকে সে যেন একটি কান সযত্নে পাতিয়া রাখিয়াছে। ব্যগ্র চোখ দুটিও যেন কার প্রতীক্ষায় আকুল। জ্ঞান বড় একটা ছিল না—কেমন একটা আচ্ছন্ন ঘোরের ভাব।

মাঝে মাঝে বিড় বিড় করিয়া কি বলিতেছিল। ইন্দিরের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ঔষধ খাওয়াইবার বিড়ম্বনা বড় একটা ছিল না—ডাক্তার কয়েকদিন আগেই বলিয়াছে আর কোন আশা নাই।

হঠাৎ যেন সম্বিৎ পাইয়া নয়নকালী বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। চুপি চুপি ইন্দিরকে কাছে ডাকিয়া বলিল, ইন্দির, শুনতে পাচ্চিস্? ঐ বোধ হয় তিনি আস্‌চেন। শুনতে পাচ্চিস্ তাঁর পায়ের শব্দ?

বিছানায় শোওয়াইয়া দিয়া ইন্দির বলিল, ও বাতাসের শব্দ, মা। বাইরে ঝড় উঠেচে।

সমস্ত রাত্রি এই রকম ধস্তাধস্তির পর ভোরের দিকে নয়নকালীর দেহ একেবারে ঠাণ্ডা হিম হইয়া গেল। কেবল মনে হইল ঠোঁট দুটি যেন তখনো কাঁপিয়া কাঁপিয়া বলিতেছে, দেখা হ'ল না।

পরের দিন সকালে ইন্দির কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিল না। পাড়ার সকলকে খবর দিয়া মৃত দেহের সৎকার করাইল এবং নিজের কাঁধে ছেলেটির এবং মেয়েটির সমস্ত ভার তুলিয়া লইল।

* * *

ইহার অনেক দিন পরে বিপিন একদিন দেশে ফিরিয়া আসিল। মথুরা, বৃন্দাবন, আজমীর, এলাহাবাদ প্রভৃতি দেশ বেড়াইয়া এবং জমিদারের ছেলের সঙ্গে স্ফূর্ত্তি করিয়া সে যখন গ্রামে আসিবার অবকাশ পাইল তখন দারুণ ব্যাধি তার শরীরকে আক্রমণ করিয়াছে। কেহ বলিল, থাইসিস্, কেহ বলিল, রক্তপিত্ত, কেহ বলিল, পুরানো জ্বর। কিন্তু শয্যা তাকে আশ্রয় করিতেই হইল। কয়েক দিন তার চিকিৎসার যখন কোন বন্দোবস্ত হইল না তখন জমিদারের লোক এক দিন গাড়ী করিয়া তাকে মহকুমার হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।

যাওয়ার আগে কিছুক্ষণের জন্য ইন্দিরের সঙ্গে বিপিনের কথা হইয়াছিল। তার চোখের দিকে তাকাইয়া বিপিন বলিল, অনেক কষ্ট দিলুম।

আপনি কষ্ট দিতে যাবেন কেন, আমার কপালে লেখা ছিল।

কিন্তু তোমার কষ্টের জন্য আমিই ত দায়ী। তোমাকে মাইনে কিছু দিতে পারিনে, এমন কি পেটভরে দু'বেলা দুটো খেতে দিতে পারিনে।

তাতে আমার কোন কষ্ট বোধ হয় না। মানুষের শরীরে ক্রমে সব সয়ে যায়। বিপিনের সেদিন সত্যই বোধ হয় অনুতাপ হইয়াছিল। তাই না থামিয়া আবার বলিল,

তোমার বাপ মা আত্মীয় বন্ধু সকলের মাঝখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এলুম কিন্তু কোন সুখীই করতে পারলুম না।

ইন্দিরের চোখ এবার অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। তবু নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, আপনি এসব কথা মনে করে আজ দুঃখ পাচ্চেন কেন? আমি ত আগেই বলেচি আমার মনে কোন কষ্ট নেই। আমি কল্যাণেশ্বরীর কাছ থেকে আদেশ পেয়েছিলুম তাই এখানে এসেছিলুম। আপনি ভালয় ভালয় সেরে ফিরে আসুন। ততদিন আমি এখানে রইলুম।

বিপিন বিচলিত হইয়া বলিল, আমি কি আর সারতে পারব? তুমি কি বুঝতে পারচ না যে এই শেষ? আমার এতদিনকার পাপের পূর্ণ ফল এইবার ফলবে।

যাওয়ার সময় অমন কথা বলতে নেই। ও সব অলক্ষণের কথা। অসুখ বিসুখ কি মানুষের হয় না? আপনি ভয় পাচ্চেন কেন? আপনি সেরে না উঠলে আপনার ছেলেমেয়েকে কে দেখবে?

ট্রেণের সময় হইয়া আসিয়াছিল। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের হাঁকডাকে বিপিনকে রওনা হইতে হইল।

* * *

তারপর বোধ হয় একমাসও পেরোয় নাই এমন সময় জানা গেল বিপিন সেই হাসপাতালেই তার অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে।

ইন্দিরের জীবনে একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল। ছেলেটির এবং মেয়েটির গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যতটুকু পরিশ্রম করা দরকার তার বেশি সে যেন আর পারিয়া উঠে না। কিসের একটা অপরিসীম ক্লান্তি তার দেহ এবং মনকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছে। পাড়ার অনেকে বেশি মাইনে দিয়া তাকে ঝি রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সে বিপিনের ভাঙা ঘর ছাড়িয়া কোথায়ও যাইতে রাজী হইল না।

একদিন সবিস্ময়ে সকলে দেখিল ইন্দির সেই ঘরে মরিয়া পড়িয়া আছে। কি করিয়া মরিল তার সঠিক খবর কেউ দিতে পারিল না। কেউ বলিল আত্মহত্যা করিয়াছে, কেউ বলিল ভূতে মারিয়াছে।

পাড়ার পরার্থপরায়ণ লোকেরা বিপিনের মেয়েটিকে কলিকাতা কর্পোরেশানের একটি স্কুলে বিনা বেতনে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসিল। কুলটির একটি বাবু ছেলেটিকে বাসায় স্থান দিল—সে বিপিনের সঙ্গে চাকরি করিয়াছিল।

* * *

উপরের কাহিনীটি বলিতে যত সময় লাগিল ভাবিতে তত সময় লাগে নাই। যখন ঘটনাটি আগাগোড়া মনে মনে আলোচনা করিয়া লইয়াছি তখন দেখিলাম ট্রেণ ধীরে ধীরে কুলটির প্লাটফর্ম্ম ত্যাগ করিতেছে। ইন্দিরের বিদেহ আত্মাই আমার মনে ঘোর লাগাইয়াছিল বোধ হয়। সে হয়ত সেই সুদূর পাড়াগাঁ হইতে এই কুলটিতেই আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

---

# কারাগার

শ্রীকর্ম্মযোগী রায়

আমার যৌবন ঘিরে সখী তব রূপকারাগার
এ বন্ধনে মুক্তি নাই, এ মিলনে বিচ্ছেদ যে নাহি,
এ জীবন তট ঘিরে তব প্রেম অশ্রু পারাবার
উদ্দাম উন্মত্ত হয়ে নিত্য—নিত্য ওঠে গান গাহি!

বিচিত্র বিশ্বের মাঝে হে বিচিত্রা মায়া-মন্ত্রে তব
ঘুমন্ত মনের মোর স্বপ্নগুলি জাগে ধীরে ধীরে;
আমারে আচ্ছন্ন করি রেখেছে ও স্পর্শের সৌরভ
আত্মার আত্মীয় তুমি রহিয়াছ আলিঙ্গনে ঘিরে।

আমার সঙ্গীতে আজ বিলাসিয়া ওঠে তব চোখ
আমার সকল ছন্দ অলি সম বন্দে তব পায়;
সর্ব্ব অন্ধকার আজ তোমার আলোকে লয় হোক
ওগো জ্যোতির্ম্ময়ী আজ জ্বলে ওঠো যৌবন বিভায়।

আমরা বেসেছি ভাল দেহ মনে পবিত্র মধুর
নশ্বর দেহের মাঝে অবিনাশী আমরা প্রেমিক;
মোদের দৃষ্টির সাথে মিলিয়াছে আকাশের সুর
মোদের অন্তর-বীণা ধ্বনিয়া তুলেছে দশ-দিক্।

মর্ম্মের নিগূঢ়-লোকে তব সহ-মর্ম্মীতা হে প্রিয়া
অপরূপ-অনুভবে তৃপ্তি আনে অদ্ভুত আবেশে;
আমার আমিত্ব আজ তব রূপে উঠেছে রাঙ্গিয়া
মোদের মিলনে তাই সারা সৃষ্টি উঠিয়াছে হেঁসে।

ক্রন্দন হয়েছে হাঁসি, ব্যথা হোলো নিগূঢ় পুলক
আজ মনে হয় মোর পরিপূর্ণ পরিপূর্ণ আমি;
তব রূপে তব প্রেমে একাকার ভূলোক দ্যুলোক
ব্যথাহীন এ বন্ধনে আছে প্রাণ চির অগ্রগামী।

বাপের বাড়ীর পথে

শিল্পী
শ্রীইন্দু রক্ষিত

# রাশ্যার সাহিত্য

**শ্রীসুনীল মজুমদার**

'Thou art the barren one,
And the abundant one
And the ascended one
Dear mother Rus' !'

—Nekrasov

রাশ্যার কবি নেক্‌রাসভের কথার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্যে বা যে কারণেই হোক রাশ্যার সাহিত্যেরও আর সেদিন নেই। বিগত একশো বছরের ভেতর রাশ্যার সাহিত্য এমনি একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁচেছে যে সমগ্র জগতের যুগপৎ দৃষ্টি পড়েছে গিয়ে তার ওপর। তার ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ রত্নগুলো এখন নানা ভাষায় অনুবাদিত হ'য়ে পৃথিবীর এক সীমা থেকে সীমান্তরে তারই বিজয়পতাকা ওড়াচ্ছে। তাই আমরা সুদূর বাঙ্‌লার নিভৃত কোণে বসেও গোগোল, ডষ্টয়েভ্‌স্কী, টলষ্টয়, টুর্গেনিভ প্রভৃতি কথাসাহিত্যিকদের— ইভান ক্রিলভ, জুকোভ্‌স্কী, পুস্কিন, লারমনটভ, টুচেভ, নেক্‌রাসভ প্রভৃতি যশস্বী কবিদের সাথে পরিচিত হ'বার সুযোগ পাই।

রাশ্যার সাহিত্যকে উন্নতির এই তুঙ্গশৃঙ্গে বসাবার জন্যে তার কত সাধককে যে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হ'তে হ'য়েচে তার ইয়ত্তা নেই। আবার এই উন্নতির পথে ঘোর অন্তরায় ছিল রাজরোষ। রাশ্যার মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা তখন ছিলনা, এখনো নেই। রাজশক্তির অত্যাচার অনাচারের দুর্বিসহ ভার সইতে সইতে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল। দুর্ভিক্ষ অরাজকতা রাশ্যার বুকের ওপর তাণ্ডবনৃত্য কোরতে ছিল। কে কোথায় অযথা কিছু লিখে গোলমাল বাঁধিয়ে তোলে এই ভয়ে গভর্ণমেণ্ট সদাই সন্ত্রস্ত থাকতেন। কারুর লেখার ভেতর যদি রাজদ্রোহের কোন একটু ছাপ থাক্‌তো তাহ'লে তার আর রক্ষে ছিলনা। তাকে সাইবেরিয়ায় রওনা করিয়ে দিয়ে তবে গভর্ণমেণ্ট শান্ত হ'তেন। এর ফলে সাহিত্যের সাধনা চুলোয় গেল। এ বিষয়ে দেশের ধনীসম্প্রদায় ও মধ্যবিত্ত লোকদের ত্রুটি ছিল যথেষ্ট। তারা সাহিত্যের উন্নতির জন্যে কোন চেষ্টাতো কোরতই না বরং ওটাকে অবজ্ঞার চোখে দেখতো। তখন সবে মাত্র ফরাসী সভ্যতার আলোক-রশ্মি তাদের চোখে পড়েছে। তখন সবাই ফরাসী ভাষায় কথাবার্ত্তা বলতো আর খাঁটি রাশ্যার ভাষা বলতো কুলী-মজুরেরা। সেখানে রাজভাষাও ছিল ফরাসী। চিঠিপত্র, বক্তৃতা—এসবই চল্‌তো ফরাসী ভাষায়।

'নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'য়ে' রাশ্যার জাতীয়-ভাষা যখন সমাজের অনেক নীচুতে আশ্রয় গ্রহণ কোরেছিল তখন সেই পঙ্কিল থেকে সর্ব্বপ্রথম উদ্ধার কোরতে চেষ্টা করেন —সাইমন পোলোটোস্কী। তার বাড়ী ছিল কিভ্‌ নগরে। তখনকার দিনে রাশ্যার প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ছিল মস্কোতে। মস্কোতে এসে পোলোটোস্কীই প্রথম রুশভাষায় পদ্য লেখবার পথ দেখান। তাঁর কবিতা পড়ে সবারই মাতৃভাষার ওপর টান আসতে সুরু হোল—সে-সব কবিতার রস-মাধুর্য্যের সন্ধান পেয়ে। তখন সব শিক্ষিত লোকই ফরাসী জার্ম্মান ভাষার মোহ দূর করে রাশ্যার ভাষায় বই লিখতে সুরু কোর্‌ল। সাহিত্য হিসেবে এগুলোর মূল্য বেশী না হ'লেও এগুলোর সাময়িক মূল্য ছিল বেশী। এদেরই ভিত্তির ওপর বর্ত্তমান রাশ্যার সাহিত্য গড়ে উঠেছে।

সংস্কৃতে পশুপক্ষীর উপাখ্যান নিয়েই পঞ্চতন্ত্র রচনা হয়েছে—রাশ্যান্ সাহিত্যে সেই উপাখ্যানের স্রষ্টা ইভান ক্রিলভ। ক্রিলভের উপাখ্যানের ভেতর আছে—রাশ্যান জীবনের সুদৃঢ় যোগ ও বিশ্বজনীনতা। রাশ্যায় তাকে Grandfather Krylov বলে জানে। রাশ্যায় এমন কোন শিক্ষিত লোক নেই যে ক্রিলভ থেকে দু'চার লাইন আওড়াতে না পারে। রাশ্যার বল্‌শেভিক নেতা লেনিন তাঁর কথায়, বক্তৃতায় প্রায়ই ক্রিলভের উপাখ্যান থেকে উদাহরণ দিতেন।

ক্রিলভের এই উপাখ্যানের অন্তরালে জাতির ওপর দোষ ত্রুটির তীব্র কশাঘাত রয়েছে। সে-আত্মচেতনার

দগ্ধ বাণী ক্রিলভই পরবর্ত্তী সব কথা-সাহিত্যিকদের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন ; তাই তারা বুকের রক্ত ঢেলে লেখনী চালাতে পেরেছিলেন।

ক্রিলভ অত্যন্ত দরিদ্র সংসার থেকে আসেন। আবার অল্প বয়সেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। মা ছোট শিশুপুত্রটীকে নিয়ে অকূলসাগরে ভাসলেন। অনেক নির্য্যাতন সহ্য কোরে অনেক কষ্টে তিনি ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। ক্রিলভের বয়স যখন পনেরো তখন থেকেই তাঁর সাহিত্যের প্রতি এক অনুরাগ আসে। কিন্তু অর্থচিন্তা সে চিন্তাকে দাবিয়ে রাখে। তাইতে তাঁর রাজধানীতে এসে অল্প বেতনে চাকরী নিতে হ'য়েছিল। অবসর সময়ে তিনি লেখাপড়া ও পত্রিকা পরিচালনায় মন দিলেন। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি তাঁর উপাখ্যানগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তাঁর প্রতিভার বিকাশে রাশ্যার তদানীন্তন সকল কবিগণ তাঁকে আদরে দলভুক্ত কোরে নিলেন। এবং রাজাও তাঁকে Imperial Libraryর প্রধান কর্ত্তা কোরে দিলেন। তাঁর মৃত্যু হয় ছিয়াত্তর বছর বয়সে অতিরিক্ত আহারের জন্যে। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সব খরচ দিয়েছিলেন রাজা এবং বহু গণ্যমান্য রাজকর্ম্মচারী তাঁর শববাহক হ'য়েছিলেন।

রাশ্যার রোমান্টিক কবি জুকোভ্স্কীর জীবন চরিত একটু বিচিত্র। তার পিতা ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ জমিদার— কিন্তু মা ছিলেন তুর্কী ক্রীতদাসী। তাঁর জন্ম হ'য়েছিল বিগত ১৭৮৩ সালে। সৎ-ভাইদের সাথে লালিতপালিত হওয়ায় জুকোভ্স্কীর আদরের সীমা ছিলনা। যৌবনে তিনি aristocratic familyর ছেলেদের কলেজ University Pension for Noblesএ ভর্ত্তি হন। কলেজের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে তিনি প্রথম নিকোলাসের পত্নীর সাহিত্যের শিক্ষকরূপে নিয়োজিত হ'ন। কিছুকাল পরেই যুবরাজদের গৃহশিক্ষকের কাজে ব্রতী হয়ে এক রকম রাজপরিবারভুক্তই হ'য়ে যান।

জুকোভ্স্কী রোমান্টিক কবি। রাশ্যার সাহিত্যের বেদনার অশ্রুমতী অন্তরলক্ষী প্রথম তাঁর কবিতাতেই অশ্রুর বন্যা বইয়েছিলেন। জুকোভ্স্কী একজন ভাল অনুবাদকও ছিলেন। তাঁর Grayর Elegy, Byronএর The Prisoner of Chillion, Schiller প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতার অনুবাদ রাশ্যার সাহিত্যে এক বিশেষ আসন দখল করেছে। তিনিই প্রথম সোরাব-রুস্তম ও নল-দময়ন্তীর অনুবাদ করেন রাশ্যান ভাষায়। যখন নেপোলিয়ন মস্কোতে প্রবেশ করেন তখন জুকোভ্স্কী তাঁর বিখ্যাত কবিতা "Bard in the Camp of the Russian Warriors." রচনা করেন। তাতে এক জায়গায় আছে—

"This brimful goblet Love to thee!
Amid the fighting gory,
Throb, comrades with a sacred glee:
Love is at one with glory."

আবার ভগ্ন-আশা ক্লান্ত সৈনিক দেখতে পায়—

"She on the standard flutters high,
She is close to us in battle."

রাশ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি পুস্কিন জুকোভ্স্কীর কবিতা সম্বন্ধে বলেছেন,—When harking to them, youth will sigh fcr greatness. তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৮৫২ সালে।

রাশ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি—পুস্কিন। তিনি রাশ্যার জনসাধারণের বড় আদরের কবি। কারণ রাশ্যার অন্তরের দুঃখ, জনসাধারণের দুঃখের ইতিহাস মূর্ত্ত হ'য়ে ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতার ভেতর। তাঁর লেখায় আছে একটা মুক্ত সহজ, সরল ভাব। তাতে পর্দ্দার কোন ঢাকনা নেই। যেমন এক-দিকে রাশ্যার অন্তরের কাম্য কথা—Ode to Libertyতে

"Hark to the Truth, Ye Tsars and Kings
Neither rewards nor persecutions,
Nor prison's gloom. nor altars wings
Can shield you, safe from revolutions,"—

"ওহে জার,নির্ম্মম সত্য শোন—পুরস্কার নির্য্যাতন, কারাগারের ভয়াবহ আঁধার, ধর্ম্মের আবরণ—এর কোনটাই আজ তোমাকে বিপ্লবের বহ্নি থেকে রক্ষা কোরতে পারবে না।" এই হ'য়েছে পুস্কিনের অন্তরের একদিক। তাঁর দৌর্ব্বল্য আমরা দেখতে পাই Tenth Commandmentএ। সেখানে তিনি ভগবানকে উদ্দেশ্য কোরে বলেছেন—হে ভগবান, দশটা অনুজ্ঞা সবই আমি পালন কোরতে প্রস্তুত, প্রতিবেশীকে ভাই বলে গ্রহণ কোরতে পারি—

"But if his youthfullest maid-servant
Is pretty—Lord! There I am weak."

একদিকে যেমন তাঁর তেজদীপ্ত উক্তি আবার আর একদিকে তেমনি হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য। এ দৌর্ব্বল্য কেবল পুস্কিনের নয়—সমগ্র রাশ্যান জাতির। রাশ্যার জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা ও দুর্ব্বলতার সাথে পুস্কিনের কবিতা সমভাবে যাতায়াত করেছে। তাই পুস্কিন রাশ্যার আদরের, গৌরবের কবি।

পুস্কিনের জীবনচরিতও বিচিত্র। তিনি ছিলেন বড় ঘরের ছেলে। তিনি যে ঘরের ছেলে, সেখানে অভিজাত রাশ্যার সকল দোষ পরিপূর্ণ মাত্রায় এসে গিয়েছে। পুস্কিনের পিতা ছিলেন খাঁটি রাশ্যান, তাছাড়া রাশ্যার নিজস্ব বলতে সে বাড়ীতে আর কিছু ছিল না। তখন ফরাসী সভ্যতা, ফরাসী সাহিত্য রাজপরিবার থেকে আরম্ভ কোরে সকল অভিজাত মহলে এসে আস্তানা গেড়েছিল। পুস্কিনের বাড়ীর সবাই এই ফরাসী আওতায় পড়ে গিয়ে একেবারে খাঁটি ফরাসীদের মতো হ'য়ে গেলেন। কাজে কাজেই পুস্কিনও বারো বছর বয়সেই রুশো, ভলটেয়ার মেলোয়ারের সাথে পরিচিত হ'বার সুযোগ পেয়েছিলেন। এবং সেই সময় বালক পুস্কিন মেলোয়ারের অনুকরণ কোরে ফরাসী ভাষায় এক নাটক লিখে ভাইবোন ও পাড়াপরশীদের নিয়ে ওর অভিনয় করেন।

রাশ্যায় তখন বড়লোকের ছেলেদের শিক্ষার জন্যে Lyceum খোলা হ'ল। পুস্কিন বারো বছর থেকে সতেরো বছর পর্য্যন্ত Tsarskoyeselia Lyceumএ অধ্যয়ন করেন। সেখানে পড়া মানে to enjoy life to the lees. এই কলেজে মোট তিরিশটি ছেলে পড়তো। কিছুদিন যেতে না যেতেই তার পরিচালক গেলো মরে। তাঁর স্থান অধিকার কোরে কলেজ চালাবার মতো সামর্থ্যের একটী লোকও জুটলো না। পুস্কিন নিজে একটী দল গঠিত কোরে তিনি নিজে তার Anacreon হ'লেন, আর তাদের মদ, প্রেমাভিযান, কাব্যচর্চ্চা—এই তিনটে সোনার চাকায় তাদের জীবন-রথ চলতে সুরু কোরল।

একবার Lyceumএর বাৎসরিক সভায় রাশ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ critic বৃদ্ধ D'erjavin সভাপতি হ'লেন। একে একে Lyceumএর সকল ছেলেই তাদের রচনা পড়ে যেতে লাগলো। তারপর সুরু হ'ল পুস্কিনের পালা। বৃদ্ধ সভাপতি এতক্ষণ চোখ বুঁজে সব শুনছিলেন। কিন্তু পুস্কিনের রচনায় তাঁর প্রতিভার সম্যক পরিচয় পেয়ে চোখ খুলে চেয়ে দেখলেন। তারপর পুস্কিনকে ডেকে এনে আলিঙ্গন কোরলেন।

এ ঘটনার পর পুস্কিনের নাম সমস্ত দেশ ও রাজপরিবারে ছড়িয়ে পড়লো। জুকোভস্কী নিজে তরুণ কবি পুস্কিনকে ডেকে আত্মীয়তা কোরলেন। ক্রমে এমন মিল হ'য়ে গিয়েছিল যে জুকোভস্কী কোন কাব্য লিখে পুস্কিনকে না শুনিয়ে সেটা ছাপাতেন না। জুকোভস্কী মারা যাওয়ার আগে তাঁর নিজের একখানা photo পুস্কিনকে দিয়ে যান,—তার নীচে লেখা ছিল—

"To the victorious pupil from his conquered teacher."

পুস্কিন সতেরো বছর বয়সে পড়া শেষ কোরে রাশ্যার Foreign Officeএ Civil Serviceএ যোগদান কোরলেন। এখানে থেকেই তিনি তাঁর প্রথম কাব্য 'Ruslan and Ludmilla' প্রকাশ করেন।

রাশ্যা আনন্দে বিস্ময়ে এই কাব্যের কবির দিকে ফিরে চাইলো। তার কারণ পুস্কিনের কাব্যে তারা পেলো তাদের প্রতিদিনের সুখদুঃখের কথা, তাদের দিনরাত্তির, তাদের আকাঙ্ক্ষা, উচ্চাভিলাসের কথা—অর্থাৎ Realism বা Naturalism যাকে বলে তাই।

চিরপ্রচলিত বিধি ব্যবস্থার চাপে মানুষ যখন অস্থির হ'য়ে ওঠে, সে চায় তার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন—সে চায় পুরাতনকে ভেঙ্গে ফেলে নতুনকে গড়ে তুলতে। অত্যাচারে অনাচারে নিষ্পেষিত হ'য়ে রাশ্যার জনসমাজ জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দল প্রতিষ্ঠিত কোরতেছিল। এ সময় রাশ্যায় Decembrist দল গড়ে ওঠে। পুস্কিনও আভিজাত্যের দল ছেড়ে এই দলে যোগ দিলেন। তখনই তার লেখনী দিয়ে বিখ্যাত কবিতা 'Ode to Liberty' বেরিয়েছিল।

"Looking around I ever face
Whips upon whips and fetters groaning,

Law's peril in a world's disgrace
And helpless slaves forever moaning."

—যেদিকে মুখ ফেরাই, সেদিকেই দেখি আঘাতের পর আঘাত চল্‌ছে—যেদিকে কান পাতি সেদিকেই শুনি শৃঙ্খলের ক্রন্দনধ্বনি, বিচার আজ পৃথিবীর নির্লজ্জতায় আত্মগোপন করেছে আর অসহায় সম্বলহীন ক্রীতদাসগুলো অনন্তকাল ধরে বিলাপ কোরে চলেছে।

এ সকল কবিতা সাধারণে প্রকাশিত হচ্ছে দেখে আলেকজান্দার পুস্কিনকে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন করবার হুকুম দিলেন। কিন্তু জনকতক গণ্যমান্য ব্যক্তির অনুরোধে অবশেষে তাকে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত না কোরে Bessarabiaতে এক রাজকার্য্যের ভার দিয়ে পাঠানো হ'ল। এই নির্ব্বাসনের অবসরে কাব্য-লক্ষ্মী পুস্কিনের অন্তরকে নানা কবিতায় পুষ্পিত কোরে দিলেন। তারপর সেখান থেকে Pskov প্রদেশে তাকে নির্ব্বাসিত করা হ'ল। এখানে বাস করার পর তাঁর লেখনী জয়যুক্ত হ'য়ে ওঠে। রাশ্যার তুহিনভরা তেপান্তরের মাঠ—তার নিশীথের নিস্তব্ধতা—শীতের আবির্ভাবে তুহিন ঝঞ্ঝা সব ছবি তাঁর কবিতার স্তরে স্তরে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠলো। এ সময় তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'Autumn', 'The Devils' ও কাব্য 'Evgini On'egnin' রচনা করেন।

Poet of Superhumanity বা জীবনাতীতের কবি লারমন্‌টভের জন্ম হ'য়েছিল ১৮১৪ সালে। পুস্কিনের কাছে প্রকৃতি বা চিন্তারাজ্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলে মনে হ'ত যখন এই জীবনের সাথে আত্মীয়তা স্থাপিত হ'ত। কিন্তু লারমন্‌টভ্‌ এই পৃথিবীর লোক হ'য়েও ছিলেন—প্রবাসী। পৃথিবীর সমুদ্রসৈকতে কতো সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত হ'য়েছে—কতো তারা আকাশে ঝল্‌মল্‌ কোরে সূর্য্যালোকে নিবে গিয়েছে—এ সবই তাঁর মনে গভীর ছোপ লাগিয়ে দিয়েছিল। তাই তাঁর কাব্যে আমরা অনন্তের কথাও দেখতে পাই। তাই Merejkovski বলেছেন—He remembered the future of Eternity.'

ছোটবেলা থেকেই বালকের প্রতিভা লোকচক্ষু এড়ায়নি। রীতিমত শিক্ষালাভ কোরে কৈশোরে পদার্পণ করার সাথে সাথেই তিনি বহু য়ুরোপীয় ভাষা আয়ত্ত কোরে ফেললেন।

যখন লারমন্‌টভের বয়স পনেরো বছর তখন তিনি তাঁর ঠাকুরমার সাথে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে ককেসাস্‌ পাহাড়ে বেড়াতে যান। সেখানে নিবিড় সৌন্দর্য্যের ভেতর বালকের কবি-প্রতিভা বেড়ে উঠ্‌তে লাগলো। তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'The Demon' এই পাহাড়ের পাদমূলেই আরম্ভ হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত কোরে লারমন্‌টভ্‌ প্রবেশ কোরলেন সৈন্য বিভাগে। এ সময়ই তার কাব্য The Demon প্রকাশিত হয়। তখন সমগ্র রাশ্যা যুগপৎ নেত্রে এই কাব্যের কবি-সৈনিকটীর দিকে চেয়ে রইলো।

এক ওজস্বিনী ভাষার কবিতার জন্যে লারমন্‌টভ্‌কে বন্দী করা হোল। এবং বিচারে তাঁকে ককেসাস্‌ পাহাড়ে নির্ব্বাসিত করা হয়। এই নির্ব্বাসনকে লারমন্‌টভ্‌ পুরস্কার বলে মেনে নিলেন। কারণ ককেসাস্‌ পাহাড়ের নিবিড় সৌন্দর্য্যে নিত্য অবগাহন করা তাঁর কাছে বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলে মনে হোল। লারমন্‌টভ্‌ ককেসাস্‌ পাহাড় থেকে কাব্য লিখে রাজধানীতে পাঠাতে লাগলেন প্রকাশিত করবার জন্যে। এ ধারে তাঁর ঠাকুরমার করুণ আবেদনে লারমন্‌টভ্‌ নির্ব্বাসন দণ্ড থেকে মুক্তি পেলেন। কিন্তু ১৮৪০ সালে আবার তাঁকে নির্ব্বাসিত করা হয়। এখানেই তাঁর জীবনশিখা নিবে যায়। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৮৪১ সালে।

রাশ্যার জনসাধারণের বড় আদরের কবি নেক্‌রাসভের জন্ম হয়েছিল ১৮২১ সালে। তখন রাশ্যায় ক্রীতদাস প্রথা বিশ্রীরূপ ধারণ কোরেছে। দেশের চারদিকে তখন ভয়ানক অবস্থা। দুর্ভিক্ষ, মহামারী গ্রামের পর গ্রামকে শ্মশান কোরে তুলছিলো। এ সময়ই রাশ্যার এক আমূল পরিবর্ত্তনের কল্পনা চলছিলো। রাশ্যার সাহিত্যের সম্মুখে তখনো মুটে, মজুর, কুলী আর সব নতুন মানুষের দল। এ সব দলই নির্য্যাতনের ভেতর দিয়ে মানবতার কল্যাণ স্বপ্ন এনে দিল।

নেক্‌রাসভ্‌ এ সব নতুন মানুষদের কবি। তখনকার রাশ্যার প্রকৃত রূপ নেক্‌রাসভের কবিতায় মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। নেক্‌রাসভের জীবন বড় দুঃখে কেটেছিলো। তাঁকে কখনো

কখনো পথের ভিখারীর জীবন অতিবাহিত কোরতে হয়েছে। এ সময় তাঁর জীবনের পরিচয় আমরা পাই তাঁর—'Who lives in mother Russia now quite happily and free ?'

আজকালও প্রত্যেক রাশ্যানদের মুখে শুনতে পাওয়া যায়—

'Thou art the barren one,
And the abundant one
And the ascended one
Dear mother Rus' !''

'হে জননী রাশ্যা, তুমি আজ রিক্ত, কাল তুমি পূর্ণ হবে। আজ তুমি নিপীড়িত—কাল, তুমি আবার মহীয়সী হবে—হে জননী রাশ্যা!' রাশ্যার বিরাট নবজাগরণের সাথে মিলিয়ে পড়লে কবির ভবিষ্যৎ বাণী সফল হ'য়ে ওঠে।

* * * *

রাশ্যার প্রথম নামজাদা ঔপন্যাসিক হচ্ছেন নিকোলাস গোগোল। তিনি জাতিতে ছিলেন কসাক। এঁর জন্ম হয়েছিল ১৮০৯ খৃঃ আর মৃত্যু হয়েছিল ১৮৫২ সালে। প্রথম জীবনে গোগোল গভর্ণমেন্টের আফিসে কেরাণীগিরি কোরতেন। শেষে কিছুকাল পর তিনি সেন্ট্ পিটার্সবর্গ ইউনিভার্সিটীর ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হ'লেন। 'ইনস্পেক্টার জেনারেল' নামে একখানা হাস্যরসাত্মক নাটক লিখে গোগোল অসামান্য যশ অর্জ্জন কোরেছিলেন। য়ুরোপের সকল দেশের নাট্যশালায় সেখানা অভিনীত হ'য়েছিল।

পুস্কিনই রাশ্যার কথাসাহিত্যের প্রবর্ত্তক গোগোলকে আবিষ্কার কোরে 'মৃত-আত্মা' ও 'ইনস্পেক্টার জেনারেল' নামক দু'খানা বিখ্যাত বইয়ের plot বলে দিয়েছিলেন। গোগোলের লেখা পড়ে পুস্কিন বলেছেন—'That rascal robs me in such a bewitching way that it is impossible to be angry with him. —অর্থাৎ পুস্কিনের দেওয়া বিষয় গোগোল এ ভাবে আত্মস্থ কোরেছেন যে তাতে পুস্কিনের বড় একটা দাবী থাকতে পারে না।

'মৃত-আত্মা' বইখানা তিনি লিখেছিলেন রোমে। তাঁর মতলব ছিল বইখানাকে তিন খণ্ডে লেখার। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রথম খণ্ড লিখে দ্বিতীয় খণ্ড খানিকটা লেখার পরই তাঁর এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়, বইখানা তাই শেষ হয়নি। তাঁর উপন্যাস সৃষ্টি করবার ক্ষমতা যে ছিল অসীম তা তাঁর বই দু'খানা পড়লেই বেশ বোঝা যায়। আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে যে তিনি রাশ্যার সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী কোরে তুলতে পারতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রাশ্যার সাহিত্যকে রাশ্যার বাইরে জনসাধারণের কাছে সুপরিচিত কোরে দিয়েছিলেন আইভান টুর্গেনিভ। প্রায় সকল রাশ্যার সাহিত্যিকদের মতো গভর্ণমেন্টের অপ্রীতিকর কটাক্ষের ভেতর দিয়ে টুর্গেনিভকেও আপনার আসন নির্দ্দেশ কোরতে হয়েছিল। রাশ্যার গভর্ণমেন্ট তাঁকে কোন কারণে তাঁর নিজের বাড়ীতেই নজরবন্দী কোরে রেখেছিলেন। তারপর সেখান থেকে জার্ম্মানী হয়ে প্যারীতে একেবারে আস্তানা গেড়ে বসলেন।

টুর্গেনিভের লেখার ভঙ্গীই আলাদা-রকমের। রাশ্যা থেকে দূরে থাকতে থাকতে তিনি সে-সময়কার রাশ্যার সমাজের চিত্র আঁকতে কৃতকার্য্য হতে পারেন নি। লেখার সময় প্যারীর পারিপার্শ্বিক প্রভাব তাঁর উপন্যাসে বিস্তার লাভ কোরেছে। আর অল্প কথায় বক্তব্য শেষ করা ছিল তাঁর অভ্যাস-বিরুদ্ধ। তাই সুযোগ পেলেই কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে তবে ছাড়তেন।

টুর্গেনিভের প্রথম লেখা 'খেলোয়াড়ের নক্সা'। তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'পূর্ব্ব ও উত্তর পুরুষ' হলেও তিনি দেশ বিদেশে নাম কোরেছেন 'ভদ্র-ঘরাণা' লিখে। তাঁর বুড়ো বয়সের লেখা 'অক্ষত ক্ষেত্র' অন্যগুলোর তুলনায় তেমন ভাল হয় নি।

রাশ্যার চরিত্র সম্বন্ধে যাদের অভিজ্ঞতা আছে তাদের মতে থিওডোর ডষ্টয়েভ্স্কিই হচ্ছেন রাশ্যার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। যৌবনের প্রারম্ভেই ডষ্টয়েভ্স্কির আশা ছিল যে তিনি সমর-বিভাগে চাকরী করিবেন। তাই তাঁর শিক্ষাও তেমনি ভাবে সুরু হোল। সাহিত্যচর্চ্চা শেষে সখের খাতিরে

আরম্ভ কোরেছিলেন! তিনি জনসমাজে পরিচিত হ'ন 'গরীব লোক' নামক একখানা উপন্যাস লিখে। তারপর রাজদ্রোহীদের সাথে ষড়যন্ত্র করায় অভিযোগে পুলিশ একদিন তাঁকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছিল কিন্তু কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তির পরামর্শে এ দণ্ডাজ্ঞা রহিত হয়ে তাঁকে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত করা হয়। এই নির্ব্বাসনের স্মৃতি তাঁর মনে এক গভীর ছাপ রেখে গিয়েছিল।

সাইবেরিয়ায় কয়েদীদের ওপর যে অমানুষিক অত্যাচর হোত তা দেখে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে এ ভাবে মানুষ আর বেশী দিন মানুষের ওপর অত্যাচার কোরতে সক্ষম হবেনা। তাঁর আরো ধারণা ছিল যে শীগ্‌গিরই ভগবানের কাছ থেকে একটা প্রতিক্রিয়া এসে পৌছবে যাতে মানব-জাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। মানুষ তখন আর কুকাজ কোরে পাপের বোঝা বাড়াতে চাইবে না।

'সাইবেরিয়ায় জীবন্ত কবর' নামক বইয়ে ডষ্টয়েভ্‌স্কি তাঁর কারা জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ কোরেছেন। রাশ্যার তখনকার গভর্ণমেণ্টের পৈশাচিক অত্যাচারের বিবরণ যদি কারুর জানবার আগ্রহ হয় তবে তাঁকে সে-বইটে পড়ে দেখতে বলি। 'দোষ ও দণ্ড' নামক উপন্যাসেও তিনি সাইবেরিয়ার অত্যাচারের কথা লিখেছেন। যে বইখানা লিখে তাঁর যশ রাশ্যার এক সীমা থেকে সীমান্তরে পৌছেছিল তার নাম 'বোকা'। তাঁর রচনার ভেতর এমন একটা মধুর করুণ-বিষাদের ভাব আছে যে তা' পড়ে বিশ্বের সাহিত্যরসসন্ধিৎসু ব্যক্তি বিস্মিত হ'য়ে থাকেন।

ডষ্টয়েভ্‌স্কি মারা যান ১৮৮১ খৃঃ। মৃত্যুর পর তিনি যে সম্মান পেয়েছিলেন বোধ হয় এ পর্য্যন্ত কোন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক তেমন সম্মান অর্জ্জন কোরতে পারেন নি। মৃত্যুর পর রাশ্যার প্রত্যেক প্রদেশ থেকে অসংখ্য নর-নারী শবানুগমন কোরতে এসেছিল।

টুর্গেনিভ ও কাউণ্ট টলষ্টয় যদিও শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলে খ্যাত হয়েছেন কিন্তু জগতের লোক লিও টলষ্টয়কে বেশী আপনার বলে চেনে। তার একটী কারণ হচ্ছে যে টলষ্টয় বেশীর ভাগই জনহিতকর বই লিখেছেন। তিনি তাঁর উপন্যাসের ভেতর কথার ছলে—রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্ম ও সামাজিক নীতিকে ঠিক এমনি ভাবে বুঝিয়ে লোকের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছেন যে যারা সে সব বই পড়েছে তারাই মুগ্ধ হ'য়েছে প্রস্তাব তুলির আঁকে। একজন ইংরেজ লেখক তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন—'Count Tolstoy is the landmark in the world of literature.' —কাউণ্ট টলষ্টয় সাহিত্যের জগতে একটী দেখবার জিনিষ—কথাটা মিথ্যে নয়। সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে তার শ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে—'শান্তি ও সংগ্রাম' ও 'অ্যানা-কারেনিনা'। তাঁর অন্যান্য বই 'হাজি-মুরাদ', 'হারানো নিদর্শনপত্র,' রিসারেক্সন' ও 'ক্রুয়েজার সোনাটা' প্রভৃতি।

টলষ্টয় ছিলেন খাঁটি রাশ্যার লোক। তাঁর চরিত্রের ভেতর রুশ চরিত্রের সঙ্কীর্ণতা, একগুঁয়েমি প্রভৃতি দোষগুলোও যেমন ছিল আবার তেমনি সদাশয়তা, আতিথেয়তা প্রভৃতি গুণগুলোও তাঁর ভেতর ছিল যথেষ্ট।

সাইমন পোলোটোস্কী যে ব্রত আরম্ভ কোরেছিলেন কাউণ্ট টলষ্টয় তার উদ্‌যাপন করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। সৃষ্টি—বাধা বিপত্তি বা সমালোচনা থেকে বড়। তাই সৃষ্টির জলন্ত শিখায় যুগান্তব্যাপী অবহেলা বাধাবিপত্তি পতঙ্গের মতো জলে পুড়ে আজ রাশ্যার সাহিত্য আপনার বাঞ্ছিত স্থানে এসে পৌঁচেছে।

শ্রীসুনীল মজুমদার

# হীরাবাই

## শ্রীযামিনীমোহন কর

১

ডিসেম্বরের X'masএর ছুটীতে বন্ধু নন্দগোপাল বললে—"চল তোমাকে আমাদের গ্রাম রেওয়ারী দেখিয়ে আনি।" চিরকাল সহরে থাকি, কখনও গ্রাম দেখিনি। তাই দেখবার জন্য মনটা নেচে উঠল। মাকে বল্লুম, মা মত দিলেন। চলে গেলুম দু'জনে রেওয়ারী।

হিন্দুস্থানী বন্ধু—খাওয়াত পেটভরে ডাল আর রুটী। রাত্রিবেলা দরজা বন্ধ করে ষ্টোভে ডিমটাও চলত। সমস্ত দিন বসে বসে গল্প করে কাটত। বিকেলে বেড়াতে বেরুতুম। এক নূতন বন্ধুও জুটেছিলেন। তিনি হ'লেন সেখানকার বৈদ্য ও সংস্কৃত পণ্ডিত।

দু' তিন দিন এই রকমেই কাটল। একদিন বিকেলে বেড়াতে যাচ্ছি পথে দেখি পায়ে 'লেডি শু' ও গায়ে ওভার-কোট পরা একটী মহিলা। আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম—জিজ্ঞেস করলুম—"এ মরুভূমিতে ফুল ফুটল কি করে?" পণ্ডিতজী বল্লেন—"এখানকার Municipalityর Health Visitor"। "এর নাম জানেন" বলতে নন্দগোপাল বল্লে, "তোমার তাতে দরকার কি হে বাপু।" হেসে বল্লুম—"আহা চট কেন? তোমাদের দেশের ফুল তোমাদের দেশেই থাকবে—আমি তো আর নিয়ে পালাচ্ছি না।" পণ্ডিতজী বল্লেন—"নাম হীরাবাই"। মেয়েটী চলে গেছে গলি পেরিয়ে।

"আচ্ছা পণ্ডিতজী, এর বাড়ী কোথায় জানেন?" প্রশ্নটা নিজের কানেই কেমন শোনাল। নন্দগোপাল বল্লে—"তোমার বাড়ী জেনে কি হবে?" উত্তর দিলুম না। একটু এগিয়ে যেতে পণ্ডিতজী বল্লেন—"ঐ ওর বাড়ী।" নির্লিপ্ত ভাবে বল্লুম—"হুঁ।" এইবার তিনি জিজ্ঞেস কর্লেন—"বোস্, ওর সম্বন্ধে তোমার জানবার এত আগ্রহ কেন?" বল্লুম—"অমনি"।

২

পরদিন সকালে উঠেই দাড়ী কামাচ্ছি দেখে নন্দগোপাল বল্লে—"কি হে, হঠাৎ সকালেই—" কথাটা শেষ হবার আগেই আমি বল্লুম—"তোমায় কতকগুলি কথা জিজ্ঞেস করি তার জবাব দাও তো।" সে বল্লে—"বেশ বল।" বল্লুম—"এই মেয়েটীকে তুমি বা পণ্ডিতজী কেউ চেন কি?" বল্লে—"আমি চিনিনা, পণ্ডিতজী চেনেন।"

জিজ্ঞেস করলুম—"এর সম্বন্ধে এখানকার লোকের কিরূপ ধারণা।" সে বল্লে—"খারাপ।"

বল্লুম—"হুঁ, আর কিছু এর বিষয়ে আমায় বলতে পার।"

সে বল্লে—"শুনেছি একজন Municipal Commissionerএর সঙ্গে সে এখানে আসে; তারিস্থ পারিশে চাকরী পেয়েছে। তবে এখন চাকরী নিয়ে একটু টানাটানি পড়েছে কারণ আর সব মেম্বারেরা একে রাখতে চাইচে না, তারা এর নামে রিপোর্টও করেছে।"

আমি বলে উঠলুম—"ঠিক হয়েছে।"

সে অবাক হয়ে মুখের দিকে চেয়ে বললে—"কি ঠিক হয়েছে?"

আমি উত্তর দিলাম—"হীরাবাইএর বাড়ী যাব—আজ খেয়ে দেয়ে। দুপুরবেলা সে নিশ্চয়ই বাড়ী থাকবে। কারণ, এখন জিজ্ঞেস কোরোনা—এসে তোমায় বিকেলে সবই বলব।"

বল্লে—"কিন্তু তাকে তো চেননা—আলাপ করবে কি কি করে?" একটু হেসে বল্লুম—"বুদ্ধির জোরে"।

খেয়ে দেয়ে উঠে নূতন স্যুট বাক্স থেকে বার করলুম। Stiff কলারের উপর টাই বেঁধে হাতে রিষ্ট ওয়াচ লাগিয়ে পায়ে নূতন জুতো পরে মাথায় হ্যাট দিয়ে যখন নন্দগোপালের ঘরে গিয়ে দাঁড়ালুম, সে একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। বল্লে—"এ বেশ কেন?"

উত্তর দিলুম—এখন আমি এ Districtএর Divisional Superintendent. হীরাবাই তাকে চেনেনা, বাকী কথা বিকেলে—এসে চা খাব"—বলে বেরিয়ে গেলুম।

৩

পণ্ডিতজীর নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে গিয়ে শুনলাম হীরাবাই সেখানে আগে ছিল এখন নাই, তবে যদি আমি ইচ্ছা করি নূতন বাড়ী তারা বলে দিতে পারে। তারা দেখিয়ে দিলে। সেইখানে গিয়ে সাহসে ভর করে কড়া নাড়লুম। একটী ষোল সতের বছরের ছেলে এসে দরজা খুলে দিলে এবং একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে—"সাহেব আপনি কাকে চান্?" আমি বল্লুম—"হীরাবাই এখানে থাকেন?" সে বল্লে—"হাঁ, ভিতরে এসে বসুন, আমি ডেকে দিচ্ছি।" একবার দ্বিধা হ'ল, কিন্তু এখন আর ফেরা যায় না—গিয়ে বসলুম। সে ভিতরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে একটী তরুণী এসে নমস্কার করে দাঁড়াল। বয়স বাইশ কি তেইশ হবে। চেহারাটা—যাক, সে বর্ণনাটা না হয় নাই করলুম, অবিবাহিত যুবকের পক্ষে খারাপ দেখায়। তবে দেখতে মন্দ নয়। বল্লুম—"তোমার নামই তো হীরাবাই।" বল্লে—"আজ্ঞে হাঁ।"

আমি বল্লুম—"দেখ তোমার বিরুদ্ধে কতকগুলি রিপোর্ট হেড আপিসে গেছে তাতে তোমার চাকরী না থাকবারই সম্ভাবনা বেশী। আমি হঠাৎ এখানে এক বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে এসেছিলুম—তাই জানতে এলুম কতদূর সত্যি। যদি মিথ্যা হয়, তবে আমি একবার চেষ্টা করে দেখব।" বল্লে—"আপনি বিশ্বাস করুন সব মিথ্যা কথা। দুষ্ট লোকে কত কথা বলে সবই কি সত্যি হয়। আর আপনি একবার ভেবে দেখুন এ চাকরী গেলে আমাদের কি অবস্থা হবে। দেশে বিধবা মা আছেন, ছোট ছোট ভাই বোন আছে, তারা সব—"বলতে বলতে দু'চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল।

মনটা খারাপ হয়ে গেল, বল্লুম—"আর সময় নেই, আমায় এখুনি যেতে হবে।" চোখের জল মুছে বল্লে—"আচ্ছা, আপনাকে আর আটকাব না; কাল কিন্তু একবার গরীবের বাড়ী পায়ের ধুলো দেবেন"—বলে এমন হাসল যে আমি একেবারে—

"কাল আসব"—বলে বেরিয়ে পড়লুম।

বাড়ীতে আসতে বন্ধু জিজ্ঞেস করলে—"কি রকম হোল—গিছ্‌লে?"

বল্লুম—"হ্যাঁ"।

"কি বুঝলে?" "ধাঁধাঁ, বুঝতে পারলুম না।"

৪

পরদিন আবার গিয়ে পৌঁছলুম। হীরাবাই আমার জন্য অপেক্ষা করছিল, ডাকতেই সঙ্গে করে একেবারে তার ঘরে নিয়ে গেল। বল্লে,—"জলটল কিছু খাবেন?" বল্লুম—"না, কি বলবে বল।"

ঈষৎ হেসে মিনতিভরাকণ্ঠে বল্লে—"আপনার জন্য আমি সরবৎ করে পান সেজে রেখেছি, খাবেন না?" বল্লুম—"আচ্ছা দাও।" সরবৎ খেলুম, পান খাই না তাও খেলুম।

বল্লে—"আপনাকে আমার সমস্ত ঘটনা আজ বলব বলে ডেকেছি, আপনি শুনে বিচার করবেন। আমি ইন্দোরে থাকতাম। আমরা দুই বোন তিন ভাই। বাবা মারা যেতে আমরা বড় মুস্কিলে পড়েছিলুম। আমার ভাই কিছু কিছু রোজগার করত, তাইতেই আমাদের চলত'। আমি নাগপুরে গিয়ে নার্সিং শিখতে লাগলাম। সেখান থেকে পাশ করে মথুরায় এসেছিলুম একটা চাকরীর সন্ধানে। ধর্ম্মশালায় গোবর্দ্ধনলালজীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁকে দুঃখের কথা জানাতে তিনি এখানে এনে আমার এই চাকরীটা করে দিয়েছেন—এতে কি কোন দোষ দেখেন?"

আমি বল্লুম—"যা বল্লে তাতে কিছু নেই বটে, কিন্তু কতকগুলি কথা জিজ্ঞেস করব, ঠিক উত্তর দেবে কি?" বল্লে—"করুন"।

"তুমি যা বল্লে তাই কি সব সত্যি, কিছুই কি লুকোও নি"—বলে দেখলাম সে যেন হঠাৎ কি রকম চমকে উঠল, পরে সামলে নিয়ে বল্লে—"সত্যি বইকি।"

তার চমকান দেখে ব্যাপারটা আন্দাজ করে অন্ধকারে

ঢিল ছুঁড়লাম —"গোবর্দ্ধন লালের সঙ্গে তোমার আর কোন সম্বন্ধ নেই—লোকে যা বলে তা কি সত্যি নয় ?"

হঠাৎ কেঁদে ফেল্লে, বল্লে—"আপনি তাই বিশ্বাস করেন ?"

বল্লুম—"যা রটে তা কিছু তো বটে।"

চোখ মুছে বল্লে—"তিনি আসেন বলে লোকেদের চোখ টাটায়। অনেকে অনেক কথা বলে পাঠায়, আমি শুনিনা বলে তারা আমার নামে রিপোর্ট করেছে। আমি একেবারে নির্দ্দোষী, ভগবান আমার সহায়।"

বল্লুম—"তা বটে, তবে যাই।"

বল্লে—"এখনই যাবেন ?"

বল্লুম—"তিনটে বেজেছে, তোমার হাসপাতালে যাবার সময় হয়েছে।"

বল্লে—"হোক, হাসপাতাল তো রোজই আছে, আপনাকে তো আর চিরদিন পাবনা।"

কথাটা শুনে একটু অবাক হয়ে গেলুম—উঠে দাঁড়ালুম, বল্লুন—"না যাই, আমার একটা বিশেষ কাজ আছে।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—"বেশ তবে যান, আপনাকে ধরে রাখবার ক্ষমতা তো আমার নেই।" দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে হঠাৎ হাতটা ধরে বল্লে—"কাল একবার আসবেন।" বলে ঈষৎ চাপ দিয়ে এমন ভাবে হাসলে যে আমি লজ্জায় "আসব" বলে কোন রকমে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। মোড়ে গিয়ে ফিরে দেখি, তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

৫

এমনি করে রোজ রোজ যাওয়া আসাতে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠল। সেদিন দুপুরে গেছি, হীরা জিজ্ঞেস কর্লে—"মুখটা শুকনো দেখাচ্ছে, অসুখ করেনি তো।"

আমি বল্লুম—"না, মাথাটা একটু ধরেছে।"

হীরাবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে বল্লে—"তবে বসে থেকনা, একটু শুয়ে বিশ্রাম কর।" বলে আমার হাতটা ধরে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলে। মাথায় হাত বুলোতে ও হাওয়া করতে লাগল।

চোখ বুজে পড়ে রইলুম। সে চুপি চুপি জিজ্ঞেস কর্লে —"তুমি কি শীগ্‌গীরই চলে যাবে।" তেমনি ভাবেই থেকে বল্লুম—"হাঁ, কেন ?" বল্লে—"বোধ হয় আমায় ভুলে যাবে।" কথার উত্তর দিলুম না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—"তা ত' যাবেই, তোমরা পাঁচ কাজের মানুষ। মধ্যে মধ্যে চিঠি দেবে কি ?" তবুও চুপ করে রইলুম। কিছুক্ষণ পরে আবার বল্লে—"একটা কথা বিশ্বাস করবে ? আমি জানি তুমি আমায় ঘৃণা কর, বিশ্বাস করনা, কিন্তু অনুরোধ কর্চ্ছি একথাটা মিথ্যে বলে মনে কোরো না; পাপ আমি করেছি কিন্তু দায়ে পড়ে—আজ থেকে আর করব না। গোবর্দ্ধনলালকে এখানে আর আসতে আমি কাল বারণ করে দিয়েছি।"

বিদ্রূপ করবার ইচ্ছেটা চাপতে পারলুম না। মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল—"এযে পৈতে পুড়িয়ে ভটচাযি্য—" বলেই চোখ চেয়ে দেখি তার মুখটা একেবারে নীল হয়ে গেছে। বড় অপ্রস্তুতে পড়ে গেলুম—সামলে নেবার মত কোন কথাও মনে পড়ল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বল্লে—"হয় ত' তাই—" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বাইরে এলুম। দেখলুম সেই রৌদ্রে ছাদের উপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কাছে এসে তার মাথাটা কোলের উপর তুলে নিলুম—জোর করে মুখটা তুলে তার দিকে চাইতে কি রকম অভিভূত হয়ে গেলুম। পাগলের মত তাকে বুকে চেপে ধরে অজস্র চুম্বনে তার মুখ ভরিয়ে দিলুম। সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে—"বাড়ী যাও।" লজ্জায় অপমানে চোখ দিয়ে আগুন বেরোতে লাগল। চীৎকার করে বল্লুম—"তোমাদের মত মেয়ে মানুষদের আবার লজ্জা কিসের। এ সব তো তোমাদের নিত্যকর্ম্ম"—তার মুখের দিকে চেয়ে কথাটা আর এগোল'না।

বজ্রের মত গম্ভীর স্বরে বল্লে—"বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে।"

মাথা হেঁট করে চলে এলুম।

* * *

দিন চার পাঁচ পরে রেওয়ারী থেকে নন্দগোপালের চিঠি এল—হীরাবাই আত্মহত্যা করেছে।

শ্রীযামিনীমোহন কর

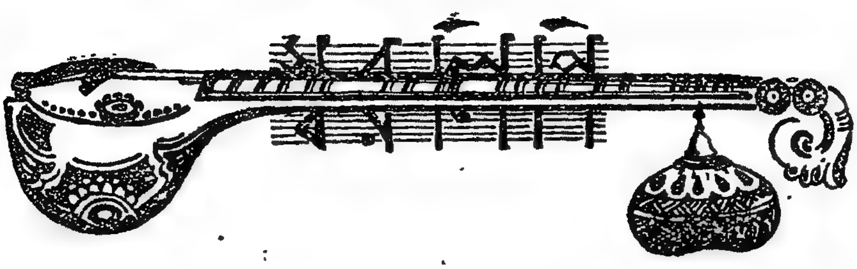

## মিশ্র তিলক কামোদ—দাদ্‌রা

শোন শোন ওগো
বিজন বনের পাখী,
নদীর ওপারে
কোথায় যেতেছ ডাকি ?
সারা রাতি ধরে কাহারে খুঁজিলে
বিদেশী বনের আঁধারে কি ছিলে ?
আকাশের পথে কোথায় চলিলে
শুক তারা ডাকে নাকি ?

ওগো পাখী শোন শোন'
বিদেশের কথা কিছু কয়ে যাও
পাতিয়া রেখেছি কান,
যেও চলে শেষে যেথা যেতে চাও
যত দূরে চ.হে প্রাণ।
ভোরের বাতাসে এই ফুলবাসে
ক্ষীণ অরুণের আধেক আভাসে
সুরে সুরে মনে কোন্ কথা আসে
কিছু কয়ে যাবে তাকি ?

কথা—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র, বি-এল্‌ সুর—ডাঃ সুধামাধব সেনগুপ্ত, বি এস্‌-সি, এম্‌-বি

### স্বরলিপি—কুমারী মণিকা রায়

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ।। | রা | পা | পা | পা | পা | পা | । | মা | মধা | পা | মা | গা | রগা | I |
| | শো | ন | শো | ন | ও | গো | | বি | জ | ন | ব | নে | র | |
| | সরা | গরা | সা | ন্‌া | -া | -া | । | প্‌া | ন্‌া | -া | সা | সা | রা | I |
| | পা | ০ | খী | ০ | ০ | ০ | | ন | দী | র | ও | পা | রে | |
| | গা | নসা | -া | -া | -া | -া | । | রা | গা | পমা | গরা | ন্‌া | সা | I |
| | কো | থা | য় | ০ | ০ | ০ | | যে | তে | ছ | ০ | ডা | কি | |
| | মা | মপমমা | মরা | রা | সা | সা | । | মরা | রা | মা | মা | পা | পা | I |
| | সা | রা | রা | তি | ধ | রে | | কা | হা | রে | খুঁ | জি | লে | |
| | পণা | ণা | ণা | ধা | ণা | ণা | । | ধা | র্সা | র্সণা | ধা | ধা | পা | I |
| | বি | দে | শী | ব | নে | র | | আঁ | ধা | রে | কি | ছি | লে | |

মা পা না র্সা র্সা র্সা । নসা পনা র্সর্রা ণা ধা পা I
আ কা শে র প থে বো থা য় চ লি লে

পা ধা পা মা গা রগা । সরা গরা সা ন্া -া -া I
শু ক তা রা ডা কে না • কি • • •

নদীর ওপারে কোথায় ইত্যাদি—

I মা পা না র্সা র্রা র্রা । র্সর্রা র্গর্রা নর্সা -া -া -া I
ও গো পা খী শো ন শো • ন • • •

র্সা র্রর্সা র্রা ণা ণা ণা । ধা ধর্সা র্সণা ধা পা -া I
বি দে শে র ক থা কি ছু ক যে যা ও

পা ধা পা মা মা গমা । রা রা -া ণা -া -া I
পা তি বা রে খে ছি কা ন • • • •

ধা ধর্সা র্সণা ধা ধা ধণা । পা পা -া -া -া -া I
পা তি রা রে খে ছি কা ন্ • • • •

গরা রপা মা গা রা রা । সা সগা গা রা সা ন্া I
যে ও চ লে শে ষে যে থা যে তে চা ও

পা ন্া সা সা রা গা । সা সা -া -া -া -া I
য ত দূ রে চা হে প্রা ণ্ • • • •

II মা পা -া না না না । র্সা র্সা র্সা র্সা র্সা র্সা I
ভো রে র বা তা সে এ ই ফু ল বা সে

নর্সা র্রর্মা র্রা র্রা র্সা র্সা । নর্সা নর্সা র্রর্সা ণা ণা পা I
ক্ষী ণ অ রু ণে র আ ধে ক আ ভা বে

গরা রপা মা গা রা রা । সা সগা গা -রা সা ন্া I
র ঙে র রে খ রে কো ন্ ক থা আ সে

পা ন্া সা সা রা গা । রগা মমা গরা সা না -া II
কি ছু ক যে যা বে তা • • কি • •

এই গানটি কুমারী মণিকা রায় কর্ত্তৃক হিন্দুস্থান রেকর্ডে গীত হইয়াছে।

## ভীমপলশ্রী—তেতালা

হরি ছবি দেখি নৈন ললচানে,
একটক রহে চকোর চন্দ্র জ্যোঁ নিমিষ বিসরি ঠহরানে।
মেরো কহো সুনত নহি শ্রবণনি লোকলাজন লজানে
গয়ে অকুলায় ধায় মো দেখত নেকহু নাহি সকানে।
জৈসে সুভট জাত রন সনমুখ পরত ন কবহুঁ পরানে
সুরদাস ঐসে হী ইনকে শ্যাম রঙ্গ লপটানে।

কথা—সুরদাস

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ
(সঙ্গীত রত্নাকর)

আস্থায়ী—

০ ১ ২´ ৩
পা জ্ঞমা পণা ণা । পা মা ধা পা I মজ্ঞা জ্ঞ সা জ্ঞা । মা পা -া পা I
হ রি • • • ছ বি • দে খি নৈ • • ন ল ল চা • নে

০ ১ ২´ ৩
পা মা ধা পা । মজ্ঞা মজ্ঞা মা -া I ণ্‌া সা মা জ্ঞা । মজ্ঞা -া রা সা I
এ ক ট ক র • হে • • • চ কো • র চ • • ন্দ্র জ্যোঁ

০ ১ ২´ ৩
ণ্‌া সা মা জ্ঞা । মা পা মজ্ঞা মা I পর্সা নর্সা -া -া । ণা -া ধা পা II
নি মি ষ বি স রি ঠ • হ রা • • • • • নে • • •

১ম অন্তরা—

০ ১ ২´ ৩
পা পা -া পা । পধা পপা মজ্ঞা মা I পা না না না । র্সা না র্সা র্সা I
মে রো • ক হো • • • সু • • ন ত ন হি শ্র ব ণ নি

০ ১ ২´ ৩
পণা র্সর্মা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্রা র্রা র্সা -া I র্সা ণর্রা র্সর্সা ণা । ণা ধা পা -া I
লো • • • ক লা • জ ন • ল জা • • • • নে • • •

০ ১ ২´ ৩
পা পর্সা ণা ধা । র্সণা ধা পা -া I পধা পপা মজ্ঞা মা । পা -া পা পা I
গ যে • অ কু লা • • যে • ধা • • • য • মো দে • খ ত

০ ১ ২´ ৩
ণা সা মা জ্ঞা । পা মা ণা পা I পা পণা র্সর্রা র্সর্সা । ণা -া ধা পা II
নে • ক হু না • • হি স কা • • • • • নে • • •

২য় অন্তরা—

০ ১ ২´ ৩
পা -া পা পা । পা ধপা মজ্ঞা মা I পা না না -া । র্সা -া র্সা -া I
জৈ ০ সে হু ভ ট ০ জা ০ ত র ন স ন সু ০ খ ০

০ ১ ২´ ৩
পা ণা র্সা র্মজ্ঞা । র্মজ্ঞা র্রা র্সা -া I র্সা ণর্রা র্সর্সা ণা । র্সণা ধা পা -া I
ল র ত ন ০ ক ০ ব হু ০ প রা ০ ০ ০ ০ পে ০ ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
পণা -া পা পর্সা । -া র্সা ণর্রা র্সর্সা I ণা ধা ণা -া । পধা ধা পা পা I
হু ০ ০ র দা ০ ০ স ঐ ০ ০ ০ সে ০ হী ০ ই ০ ০ ন কে

০ ১ ২´ ৩
ণ্া সা মা জ্ঞা । পা মা ণা পা I পনা র্সর্রা র্সনা র্সা । ণা -া ধা পা II
জ্ঞা ০ ম র ০ জ ল প টা ০ ০ ০ ০ ০ ০ সে ০ ০ ০

তান—

০ ১ ২´ ৩
১। ণ্সা জ্ঞমা পা -া । মধা পপা মজ্ঞা মা I পণা -া পধা পা । মপা মধপা মজ্ঞা মা I
আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
২। জ্ঞমা পণা র্সর্রা -া । র্সা ণা ধা পা I পা মপা জ্ঞা মা । সমা জ্ঞপা মণা পর্সা I
আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
৩। ণ্সা জ্ঞমা পমা জ্ঞমা । পণা ধপা মজ্ঞা রসা I জ্ঞমা পণা র্সর্রা র্সণা । ধপা মজ্ঞা রসা ণ্সা I
আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
৪। র্সণা র্রর্সা র্জ্ঞর্রা র্সণা । ধপা মপা জ্ঞমা পণা I পণা র্সা ণধা পমা । জ্ঞমা পা মজ্ঞা রসা I
আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

# কাঙ্গালের দান

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন

১

মেয়েটার নাম ছিল কুড়ানী। আর এই কুড়ানী নামই তাহার একমাত্র পরিচয়। তাহার সম্বন্ধে ইহার অধিক কেহ কিছু জানেনা। সে যে কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিয়াছিল, শেষ পর্য্যন্ত তাহা কিছুই নির্ণয় হয় নাই।

যেদিন সে চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে প্রথম আসিয়া জুটিল, সেদিন রবিবার। মহেন্দ্র চক্রবর্ত্তী সকালে চা পান করিয়া গামছা হাতে বাহির হইয়াছেন, তখনও বাজার করিয়া ফিরেন নাই। জজ্-আদালতের চাকরি, সারাদিনের খাটুনির পর বাড়ী আসিতে বিলম্ব হয়। কাজেই, ছুটির দিন ছাড়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় পাঁচটা বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবার বা একটু গল্প-গুজব করিবার অবসর পাননা। আজ সেইজন্যই ফিরিতে এত বিলম্ব হইতেছে।

যাহা হউক, সেজন্য কোন উদ্বেগ নাই,—মহেন্দ্রের স্ত্রী সারদাসুন্দরী বেশ নিশ্চিন্ত মনে রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত। একবার কি জন্য বাহিরে আসিতেই দেখিল, রান্নাঘরের দাওয়ায় খুঁটি ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছে এক মলিনবসনা ভিক্ষুকবালা। সে যে কতক্ষণ আসিয়া এমন চুপ্ করিয়া বসিয়া আছে, সেই জানে। সারদাকে দেখিয়াই সে ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিল—"বুম্মা, বাত!"

সারদা তাহার এই অস্ফুট ধ্বনির অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সরায় করিয়া কিছু চাউল আনিয়া তাহাকে দিতে গেল। সে তাচ্ছিল্য ভরে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল—"বাত দাও, কাবো।" এবং ইঙ্গিতের দ্বারা তাহার বক্তব্য বুঝাইয়া দিল। সারদা তখন দু'টি পয়সা আনিয়া দিতে গেল। বলিল—"এই নে, দোকান থেকে কিছু কিনে খাস্।" ভিখারিণী তাহাও লইল না, বলিল—"না, বাত দাও।" তাহার বড় বড় চোখ দু'টি জলে ভরিয়া উঠিল।

সারদা আর থাকিতে পারিল না। উঠানে আমগাছের তলায় কলাপাতা পাতিয়া অন্ন-ব্যঞ্জন আনিয়া দিল। ভিখারিণী পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া উচ্ছিষ্ট পাতা ফেলিয়া, খিড়কীর ঘাটে হাত মুখ ধুইয়া আসিল। তারপর রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া আবার সেই খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া বসিল। তাহাকে পয়সা দু'টি আনিয়া দিয়া সারদা বলিল—"খাওয়া হ'ল, এবার ঘরে যা।" সে পয়সাও লইল না, নড়িলও না, প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া অন্যদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

এত বড় মুস্কিল করিল,—কিছুতেই বিদায় হইতে চায় না।

সারদা বলিল—"তুই কোথায় থাকিস্?"

সে মাথা নাড়িয়া উত্তর করিল,—"কুত্তাও না।"

"তোর আর কে আছে?"

"কেউ না।"

"তোর নাম কি?"

"কিচ্ছু না।"

"কোথায় যাবি, কোথায় থাক্‌বি?"

"কুত্তাও না"—বলিয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িল।

সারদা হাল ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় রন্ধনকার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

২

মেয়েটা সেই অবধি চক্রবর্ত্তী—বাড়ীতেই থাকিয়া গেল। তাহাকে বিদায় করিবার জন্য অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই,—মহেন্দ্র বহুতর লোককে তাহার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু সে যে কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছে কেহই তাহার কোন সন্ধান দিতে পারিল না। মহেন্দ্র তখন সারদাকে

বুঝাইলেন—"ও যেমন আছে এখন তেমনই থাক। পাগলের মন ত,—কোন সময় হয়ত নিজেই সবে পড়বে। আর, থাকলে তোমরাও ত কতকটা সাহায্য হয়,—যতটুকু পার খাটিয়ে নাও না।"

সারদা বলিল—"তা' না হয় এখন হ'ল। কিন্তু ওকে বরাবরের মতন বাড়ীতে রাখা যায় কি করে? কে, কি জাত, তা'র ঠিক নেই। তাছাড়া উঠ্‌তি বয়েস,—দেখ্‌তে অমন রোগা হ'লেও পনেরো-ষোলর কম নয়,—আর চেহারাও নেহাৎ ছলে বাগ্‌দির মতন ত নয়। বাড়ীতে একটা জোয়ান ছেলে থাকতে, অমন সোমত্ত মেয়েটাকে—"

মহেন্দ্রকে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিতে দেখিয়া সারদা হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"হাস্‌চো কি! অসম্ভব কিছুই নয়। তোমাদের পুরুষ জাতটাকে মোটেই বিশ্বাস নেই। এই দেখনা, আমার মামার বাড়ীতেই—"

"আর থাক্‌না, তোমার মামার বাড়ীর কীর্ত্তির কথা ত ঢের শুনেচি।"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, অমন কীর্ত্তি অনেকেরই আছে,—ধরা পড়েচে কেবল বস্তু-মামা।"

যে জোয়ান ছেলের কথা হইতেছিল সে আর কেহ নয়, মহেন্দ্রের ছোট ভাই নরেন। তাহার বিদ্যাশিক্ষা কিছুদিন মন্দগতিতে চলিয়া সম্প্রতি হঠাৎ থামিয়া গিয়াছে। এখন সে আদালতের সেরেস্তায় একটু আধটু নকল-নবীসের কাজ করে, বাকী সময়টা মাছ ধরিয়া, তাস খেলিয়া, বাঁশি বাজাইয়া কাটায়। এ অবস্থায় অবিলম্বে তাহার একটা বিবাহ দিয়া ফেলাই সনাতন ব্যবস্থা। আর তাহাতে সংসারের একটু সুবিধাও হয়। আজকাল সারদার নিজের শরীর ভাল থাকে না। এক এক সময়ে পেটের যন্ত্রনায় উঠিয়া বসিবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা থাকে না। এ অবস্থায় সে একা কি কষ্টে যে সংসার চালাইতেছে মহেন্দ্র তাহার কোন খবরই রাখেন না। তাই ভা'য়ের বিবাহ দিবার কোন চেষ্টাই নাই।

সে যাহা হউক, তখনকার মত এই অজ্ঞাতকুলশীলা কুড়াইয়া পাওয়া মেয়েটাকে 'কুড়ানী' নাম দিয়া সারদা গৃহে আশ্রয় দিল বটে, কিন্তু একটা অস্বস্তি থাকিয়া গেল। কিরূপে মেয়েটাকে বিদায় করা যায় এ চিন্তা ঘুচিল না। স্ত্রীজাতির নাকি স্বভাবতঃ একটু কূট বুদ্ধি হয়; তাই সারদা ভাবিয়া চিন্তিয়া একবার চাণক্য পণ্ডিতের 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্' নীতি অবলম্বন করিয়া দেখিল।

একদিন সে নরেনকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল—"কোথা থেকে এক হাবা পাগলা মেয়ে এসে জুটেছে, জালিয়ে পুড়িয়ে খেলে। না একটা কথা বল্‌লে বোঝে, না ওর কথা আমরাই বুঝি। মাথায় একরত্তি বুদ্ধি নেই,—কচি ছেলেরও অধম। ওটা বিদেয় হ'লে যে বাঁচি গা! কিন্তু ছুঁড়িত কিছুতেই নড়বে না। কি বিপদেই পড়া গেছে!"

নরেন এই কথা শুনিয়া কুড়ানীকে তাড়া করিয়া যাইতেই, সে উঠান হইতে আঁশবঁটি তুলিয়া লইয়া এমন রণরঙ্গিনী ভঙ্গীতে উঠিয়া দাঁড়াইল, যে সারদা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। নরেনের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া তাহাকে বুঝাইয়া বলিল—"ও পাগলকে আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই, ঠাকুরপো,—কখন কি করে বস্‌বে শেষে। তার চেয়ে এসে জুটেছে যখন, থাক। কি আর হ'বে।"

এই ঘটনার পর হইতে নরেনকে দেখিলেই কুড়ানী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে, নরেনও দূরে দূরে থাকে। তাহাতে আর যাহাই হোক, ইহাদের সম্বন্ধে সারদার মনে যে উদ্বেগ জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহার আর কোন ভিত্তি রহিল না। এইরূপে সারদা উপাখ্যানের হরিণের মত নিঃশঙ্কচিত্তে কেবল যে কুড়ানীকে আশ্রয় দিল তাহা নয়, ক্রমশঃ নিবিড় স্নেহের বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল।

## ৩

চৌদ্দ বৎসর হইল সারদার বিবাহ হইয়াছে, এখন তাহার বয়স পঁচিশ। বহুদিন পূর্ব্বে তাহার একটি সন্তান হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার পর আর হয় নাই, আর হইবার আশাও অল্প। এতদিন আশায় আশায় এক রকম কাটিয়াছে। যখন সে আশার অবলম্বন ক্ষীণ হইয়া আসিল, তখন বহুদিন পূর্ব্বে যে শিশুটিকে সে হারাইয়াছে তাহার স্মৃতি সারদার প্রাণে নূতন করিয়া একটা বেদনার

সৃষ্টি করিল। মনে হইল, দু'দিনের জন্য আসিয়া সেই শিশুটি কি শত্রুতাই করিয়া গিয়াছে,—হৃদয়ে কেবল একটা ক্ষুধা জাগাইয়া দিয়া গিয়াছে, সারা জীবনে যাহা মিটিবার নয়। নারী হৃদয়ের এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা যখন নিতান্তই নিষ্ফল হইতে বসিয়াছে, ঠিক সেই সময়েই সারদা এই একটি প্রাণীকে কুড়াইয়া পাইল, যে বয়সে তাহার সন্তান-স্থানীয় না হইলেও শিশুরই মত জ্ঞানহীন, ভাষাহীন, অসহায়।

তাই কুড়ানীর আদর-যত্ন দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মহেন্দ্রকে বলিয়া তাহার জন্য নূতন জামা-কাপড় আসিল। বাড়ীতে ফেরিওয়ালা ডাকিয়া জামা, কাপড়, চুড়ি, খেলনা প্রভৃতি কেনা হইল। সদর দরজা দিয়া বাড়ী ঢুকিতেই নীচের তলায় যে ছোট ঘরখানি এতদিন পুরাতন জিনিসপত্রে বোঝাই ছিল, তাহা খালি করিয়া কুড়ানীকে থাকিতে দেওয়া হইল।

ক্রমে কুড়ানী এই ছোট পরিবারটির সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়া গেল। দিন দিন তাহার শারীরিক ও মানসিক উন্নতিও হইতে লাগিল। একটি একটি করিয়া সে এখন অনেক জিনিসের নাম শিখিয়াছে এবং অস্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিতেও চেষ্টা করে। গোড়ায় গোড়ায় সে সারদাকে বলিত 'বুম্মা',—সম্ভবতঃ 'বৌমা' শব্দের অপভ্রংশ, আর মহেন্দ্রকে বলিত 'বাব্বু'। এই দুইটি শব্দ তাহার রহস্যাবৃত অতীত জীবনের স্মৃতি। সারদা কিন্তু 'বৌমা' কথাটার উপযোগিতা দেখিল না, তাই তাহাকে 'দিদি' বলিতে শিখাইল।

ঘরের খুঁটিনাটি অনেক কাজ কুড়ানী এখন করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু তাহার উপর নির্ভর করা চলেনা, খেয়ালের মাথায় যখন যতটুকু ইচ্ছা করে। আবার যখন ঝোঁক চাপে, তখন তাহার কাজ আর শেষ হয় না। একদিন তাহাকে আলু ছাড়াইবার প্রক্রিয়া হাতে ধরিয়া শিখাইয়া দিলে, কাজটা তাহার এত ভাল লাগিয়া গেল, যে ঝুড়িতে যত আলু ছিল—দু'সের আন্দাজ—সবগুলি ছাড়াইয়া শেষ করিয়া তবে উঠিল। কিন্তু বলিয়া না দিলে নিজের ইচ্ছায় প্রায় কোন কাজই করেনা। কেবল একটা কাজ সে নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছে,—মহেন্দ্রের পরিচর্য্যা। সকালে গাড়ু, গামছা যোগাইয়া দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া, রাত্রে আহারের পর পান আনিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত, সমস্তই সে নিজের মনে নিয়মিত ভাবে করিয়া যায়।

মহেন্দ্র দেখিলেন সারদা ঠিকই বলিয়াছিল। খাইতে পরিতে পাইয়া কুড়ানীর চেহারা বেশ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। তাহার শীর্ণ দেহ পুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে, গাত্রবর্ণ পরিচ্ছন্নতার গুণে উজ্জ্বল হইয়াছে, সর্ব্বোপরি যৌবনের তুলিকাস্পর্শে তাহার সারা অঙ্গে একটা নূতন শোভা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু তাহার দেহের রূপ যেমন বয়সের অনুপাতে বিকশিত হইয়া উঠিল, মনোবৃত্তির তেমন ক্রমোন্নতি হইল না,—হইলেও তাহা বাহিরে প্রকাশ হইবার উপায় ছিল না। হয়ত তাহার প্রাণেও নব নব আশা—আকাঙ্ক্ষা উন্মিষিত হইয়া গন্ধ-কুসুমের মত শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু এ সংবাদ তাহার অলস চক্ষু দুটির মৌন ভাষায় যতটুকু প্রকাশ হইতেছিল কেহ তাহা বুঝিল না।

## ৪

একদিন বৈকালে মহেন্দ্র কাছারি হইতে আসিয়া শুনিলেন কুড়ানীকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। বাড়ীর বাহিরে সে বেশী যায় না; তাহাকে লইয়া রঙ্গ করে বলিয়া পাড়ার কাহারও সহিত তেমন মিশে না। আজ কখন বাহির হইয়া গিয়াছে এতক্ষণেও ফিরিল না দেখিয়া সারদা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

সংবাদ শুনিয়া মহেন্দ্র একটু শুষ্ক হাসিয়া বলিলেন—"আমি ত আগেই বলেচি,—পাগলের মন, যখন খেয়াল হ'বে আপনিই চ'লে যা'বে। তুমি ত তখন ওকে তাড়াবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলে। নিজেই যখন চলে গেল—"

সারদা বলিল—"ও কি কথা গো! সন্ধ্যে হ'তে যায়, সোমত্ত মেয়েটা কোথায় চলে গেল,—তোমার একটু ভাবনা হচ্চে না? তখনকার কথা ছেড়ে দাও। এখন আমাদের আশ্রয়ে যখন রয়েচে—"

"না না, আমি তামাসা করে বলেছিলাম,—সত্যি কি আর—"

"ও রকম তামাসা ভাল লাগে না, হ্যাঁ। চট্ করে জল

খেয়ে নিয়ে তুমি একবার বেরিয়ে দেখ। ঠাকুরপোকে পাড়ায় খুঁজতে পাঠিয়েছিলাম,—পাওয়া গেল না। এখন আবার দক্ষিণ-পাড়ার দিকে গেছে,—যদি কেউ ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে। ও সব কাণ্ড যত ঐ দিকেই ত হয়।"

পথে বাহির হইয়া, মহেন্দ্র কোথায় খুঁজিতে যাইবেন ভাবিয়া পাইলেন না। শেষে মনে করিলেন থানায় খবর দিয়া পরে খোঁজাখুঁজি করা যাইবে। ষ্টেশনের রাস্তার মোড়ে পৌঁছিয়া ভাবিলেন, যদি কেহ ভুলাইয়া লইয়া গিয়া থাকে, ট্রেনে পলাইবার চেষ্টা করিবে। ষ্টেশনের দুই-একজন কর্ম্মচারীর সঙ্গে তাঁহার আলাপ ছিল, মনে করিলেন তাহাদের একটু নজর রাখিতে বলিয়া যাইবেন।

ষ্টেশনের কাছে আসিয়া মহেন্দ্র দেখিলেন একটা ময়রার দোকানের সম্মুখে কুড়ানী খাবারের ঠোঙা হাতে উদাস নয়নে চাহিয়া বসিয়া আছে। মহেন্দ্রকে দেখিয়া সে ঠোঙা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল এবং তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁপিতে লাগিল,—মুখে একটা অস্ফুট করুণ ধ্বনি।

ঠিক সেই সময়ে দুইদিক হইতে দুইজন লোক তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিল। একজনের হাতে ছোরা দেখিয়া মহেন্দ্র তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। লোকটা কাছে আসিলে তাহার পেটে এক লাথি মারিতেই সে পড়িয়া গেল। কিন্তু ছোরার আঘাতে মহেন্দ্রের পায়ে বিষম চোট লাগিল,—তিনি বসিয়া পড়িলেন।

ইতিমধ্যে চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিতেই আক্রমণকারীরা পলাইল। কয়েকজন তাহাদের ধরিবার চেষ্টায় ছুটিল। যাহারা রহিল তাহারা মহেন্দ্রের ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়া, গাড়ী ডাকিয়া তাঁহাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

গাড়ীতে উঠিয়াও কুড়ানীর ভয় ভাঙিল না। মহেন্দ্রের পাশে বসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া রহিল। তাহার কোমল স্পর্শে মহেন্দ্র ক্ষতের জ্বালা ভুলিয়া, একটা মধুর আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

এই ঘটনার পরে কুড়ানীর প্রাণে যে একটা ভয় ঢুকিয়াছে তাহা বেশ দেখা গেল। সে আর এখন একবারও বাড়ীর বাহির হয়না, সর্ব্বদাই শঙ্কিত সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে। কেবল যতক্ষণ মহেন্দ্রের কাছে থাকিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করে, ততক্ষণ তাহার চোখে-মুখে একটা শান্ত নিরুদ্বেগের ভাব ছড়াইয়া থাকে।

৫

পায়ের ঘা সারিতে বেশীদিন লাগিল না। তথাপি ছুটি পাওনা ছিল বলিয়া, এই সুযোগে মহেন্দ্র এক মাসের ছুটি লইয়া বাড়ী বসিয়া রহিলেন। প্রথম যে কয়দিন পা লইয়া ভুগিতে হইয়াছিল, কুড়ানী সদাসর্ব্বদা তাঁহার কাছে কাছে থাকিত। তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ বুঝিত একান্ত মনে তাঁহার সেবা করিয়া যাইত। রাত্রেও নিজের ঘরে গিয়া শুইতে চাহিত না, বলিত—"না, বয়!" অগত্যা মহেন্দ্রের শয়নকক্ষেরই এক প্রান্তে পড়িয়া থাকিত।

মহেন্দ্র বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলে পর, সারদা একদিন বৈকালে দেখিল কুড়ানী তাহার বিছানা-মাদুর গুটাইয়া লইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছে। সারদা বলিল—"কি রে, তল্পিতল্পা নিয়ে কোথায় চল্লি?" নীরব অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে কুড়ানী তাহার নিজের ঘরটি দেখাইয়া দিয়া গম্ভীর ভাবে চলিয়া গেল।

ছুটি ফুরাইতে তখনও বিলম্ব ছিল। সুস্থ শরীরে দিবা রাত্র বাড়ীতে বসিয়া থাকিয়া মহেন্দ্রের ক্রমে বিরক্তি ধরিয়া গেল। কাজেই সন্ধ্যার সময় একবার বেড়াইতে বাহির হওয়া আর আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইল। আড্ডা দিবার ঝোঁক তাঁহার কোনদিনই ছিলনা, কালে ভদ্রে ছুটির দিনে তাস-পাশার আসরে গিয়া জুটিতেন। এখন তাহা ক্রমে নিত্যকর্ম্ম হইয়া পড়িল। সন্ধ্যার সময় বাহির হইয়া এক একদিন ফিরিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া যায়, সারদাকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত হেঁসেল আগ্‌লাইয়া থাকিতে হয়। তাই মহেন্দ্র সন্ধ্যার পরেই আহার সারিয়া বাহির হইতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে এই নেশাটা বেশ ভাল করিয়াই জমিয়া উঠিল। তাই ছুটি যখন ফুরাইল, তখনও কাছারি হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যার পর বাহির হওয়ার অভ্যাসটা থাকিয়া গেল। রাত্রের আহার সারিয়া যান, সুতরাং বাড়ী ফিরিবার তাড়া

থাকে না। সারদা প্রায়ই ঘুমাইয়া পড়ে। শিকল নাড়ার শব্দে ঘুম ভাঙ্গিলে নীচে নামিয়া আসিবার পূর্ব্বেই কুড়ানী সদর-দরজা খুলিয়া দেয়। কাজেই সারদা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে, মহেন্দ্র কখন আসেন অনেক দিন জানিতেই পারে না।

কুড়ানীকে লইয়া আর কোন গোল হয় নাই। কিন্তু মহেন্দ্রের বোধ হয় মনে মনে ইচ্ছা যে এই গলগ্রহটাকে সরাইয়া দিয়া একটা দায়িত্বের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। কিছুদিন হইতে তাহারই উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। একদিন সারদাকে বলিলেন, দেওয়ান-পাড়ায় একটা অনাথ-আশ্রম আছে, সেখানেই কুড়ানীকে রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সারদা প্রথমে এ প্রস্তাবে রাজি হয় না। কিন্তু মহেন্দ্র বুঝাইলেন, যে, এই অজ্ঞাত কুলশীলা অপরিণত বুদ্ধি মেয়েটাকে চিরকাল পুষিতে হইলে পরে অনেক ভুগিতে হইবে। সেখানে থাকিলে তাহাদের কোন ভাবনা বা দায়িত্ব থাকিবে না, সেও বেশ যত্নে থাকিবে, কোনও কষ্ট হইবে না। এতগুলি যুক্তিতর্ক শুনিয়া সারদা অগত্যা রাজি হইল।

৬

তাহার পর প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। মহেন্দ্র সারদাকে মধ্যে মধ্যে কুড়ানীর সংবাদ আনিয়া দেন। পূজার ছুটিতে তাহাকে কয়েকদিনের জন্য বাড়ীতে আনাও হইয়াছিল। তখন তাহার নূতন শ্রী দেখিয়া সারদার চোখ জুড়াইল। সে যে এখন বেশ সুখেই আছে তাহা বুঝিয়া সারদা আশ্বস্ত হইল। তাই সেবার কুড়ানী যখন আবার চলিয়া গেল, সারদা বেশ সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাকে বিদায় দিল।

মহেন্দ্রের এখনও রাত্রে বাড়ী ফিরিতে সেইরূপ বিলম্ব হয়। তবে নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ বাহির হওয়ার অভ্যাস আর নাই। কাজের ভিড়ে যেদিন কাছারি হইতে ফিরিতে বিলম্ব হয় সেদিন আর যাওয়া ঘটেনা।

একদিন মহেন্দ্র বাহির হইয়াছেন; সারদা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এখন কুড়ানী নাই যে দরজা খুলিয়া দিবে। নরেনের ঘর হইতে শিকল নাড়ার শব্দ ভাল শোনা যায় না। কাজেই সারদা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারে না। আজও হঠাৎ একবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিল একটা বাজে,—মহেন্দ্র তখনও আসেন নাই। তাই ত! এত দেরি ত কখনও হয় না। ভাবিল আর একটু দেখিয়া নরেনকে তুলিয়া একবার খোঁজ লইতে পাঠাইবে।

কান খাড়া করিয়া বসিয়া থাকিয়া ক্রমে যখন দেড়টা বাজিয়া গেল, তখন নরেনকে ডাকিয়া তুলিতে হইল। তাদের আসর সব দিন একস্থানে হয়না। কোথায় কোথায় সন্ধান লওয়া দরকার, দু'জনে মিলিয়া তাহা ঠিক করিয়া, লণ্ঠনটা জ্বালিয়া লইয়া নরেন বাহির হইল।

মহেন্দ্র তখন সহরের এক প্রান্তে একটা ছোট একতলা বাড়ীর একটি কুঠরিতে তক্তপোষের উপর বসিয়া তামাক ধরাইতেছেন,—অদূরে কুড়ানী বিষণ্ণ মুখে উপবিষ্ট।

* * *

এদিকে নরেন পাঁচ-সাত জায়গায় ঘুরিয়াও মহেন্দ্রের কোন সন্ধান না পাইয়া ম্লানমুখে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সারদার উদ্বেগ ও আশঙ্কার সীমা রহিল না। বাকি রাত্রিটুকু কোনরূপে কাটাইয়া ভোর হইতেই নরেন যখন আবার বাহির হইতেছে, তখন মহেন্দ্র ফিরিলেন।

ও-পাড়ার গয়লাদের একটি ছেলের নাকি কলেরা হইয়াছিল,—তাই তাহারা মহেন্দ্রকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল। বলিলেন—"অমুকুল ডাক্তারকেও আনা হয়েছিল। কিন্তু তিনি ওষুধের ব্যবস্থা করেই চলে গেলেন। আমাকে থেকে যেতে হ'ল,—অমন সঙ্গীন্ কেস্, ফেলে আসি কি করে।...কিন্তু আমি ত খবর দিতে লোক পাঠিয়েছিলাম—আসেনি?"

সারদা শুষ্ক মুখে উত্তর করিল—"কই, আসেনি ত কেউ। কিংবা হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ডেকে ফিরে গেছে।"

আদালতের চাকরি জুটিবার পূর্ব্বে মহেন্দ্র কিছুদিন হোমিওপ্যাথিক স্কুলে পড়িয়াছিলেন। ওরকম অনেকেই পড়ে, আবার একটা কাজকর্ম্মের সুবিধা হইলেই ছাড়িয়া দেয়। মহেন্দ্র কিন্তু হোমিওপ্যাথির চর্চ্চা বরাবরই রাখিয়াছেন। এখনও ছেলেপুলের সর্দ্দি কাশি হইলে পাড়ার

অনেকেই আসিয়া ঔষধ লইয়া যায়। কিন্তু এমন 'সঙ্গীন্ কেস্' কখনও তাঁহার হাতে আসিতে সারদা দেখে নাই। তথাপি এ সব সংশয়ের কথা সারদার মনে আসিল না, মহেন্দ্র যে ভালয় ভালয় বাড়ী ফিরিয়াছেন ইহাই যথেষ্ট।

ইহার পর কয়দিন মহেন্দ্রের কাছারি হইতে ফিরিতে বিলম্ব হয়। রাত্রে আর তাস খেলিতে যাওয়া ঘটেনা।

৭

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন সকালে কুড়ানীর আবির্ভাব। সেদিনও রবিবার। মহেন্দ্র বাজার গিয়াছেন, সারদা হেঁসেলে। কুড়ানী নিঃশব্দে আসিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় তাহার সেই পূর্ব্ব-পরিচিত খুঁটিটিতে ঠেস্ দিয়া তেমনই ম্লান মুখে বসিয়া রহিল।

সারদা বাহিরে আসিয়া কুড়ানীকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল। সে এমন সময়ে কি করিয়া কাহার সহিত আসিল। কুড়ানী তাহার নিজের ভাষায় সংক্ষেপে যে উত্তর দিল তাহাতে সে যে একলা আসিয়াছে কেবল এইটুকুই বোঝা গেল।

সারদা বলিল—"হঠাৎ এমন চলে এলি যে? পালিয়ে এসেচিস্ বুঝি,—কেন রে?"

ভীতি-বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া কুড়ানী বলিল—"বয়। ওরা মারবে।"

তাহাকে প্রবোধ দিয়া সারদা বলিল—"না না, মারবে কি, শুধু শুধু অমনি মারলেই হ'ল। আচ্ছা আমি বাবুকে বলবো—ওরা তোকে কক্ষনো মারবে না। এখন এসেচিস্, দু-চার দিন থাক। তারপর একদিন ওঁর সঙ্গে যাস্'খন। তোর কোনও ভয় নেই, বুঝ্লি?"

কিন্তু কুড়ানী কিছুতেই প্রবোধ মা'নল না। সেখানে ফিরিয়া যাইতে যে তাহার ঘোর অনিচ্ছা, তাহা সে বেশ জোরের সহিত জানাইয়া দিলেও, সারদা যখন আবার বুঝাইতে গেল, তখন সে উচ্ছ্বসিত অভিমান ভরে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—"আঁই যাবো না, আঁর যে ছেলে অবে।"

কথাটা সারদা ঠিক বুঝিতে পারিল না। কুড়ানী তখন ছেলে কোলে করার ভঙ্গীতে হাত দু'খানি বুকের কাছে তুলিয়া ধরিয়া তাহার কথার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিল। শুনিয়া সারদা একেবারে কাঠ হইয়া গেল। রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল —"কি বল্‌চিস্ কুড়ানী, তোর ছেলে হ'বে? তোর আবার ছেলে হ'বে কি রে? না না, কে বল্‌লে?"

কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কুড়ানী মুখ টিপিয়া হাসিল; বলিল—"হুঁ, ওরা যে বল্‌লে।"

এই 'ওরা' যে কাহারা তাহা কুড়ানী বুঝাইয়া বলিতে পারিল না। কিন্তু তাহার দেহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সারদার বুঝিতে বাকি রহিল না যে কুড়ানী যাহা বলিয়াছে তাহা মিথ্যা নয়। সারদা হতবুদ্ধি হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

মহেন্দ্র বাজার করিয়া আসিলে, সারদা তখনই তাঁহাকে কুড়ানীর কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সাম্‌লাইয়া গেল। ভাবিল মানুষটা তাতিয়া পুড়িয়া আসিয়াছে, এমন দারুণ সংবাদটা এখন শুনাইয়া কাজ নাই।

তারপর মহেন্দ্র যখন আহারান্তে পান মুখে দিয়া হুঁকা লইয়া বসিলেন, তখন সারদা তাঁহাকে কুড়ানী সংক্রান্ত এই কুৎসিত কাহিনী না শুনাইয়া আর থাকিতে পারিল না। শুনিয়া মহেন্দ্র নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

সারদা দৃপ্তকণ্ঠে বলিতে লাগিল—"সাধে কি বলেছিলাম তোমাদের পুরুষ জাতটাকে মোটেই বিশ্বাস নেই। এমন একটা অজ্ঞান, অনাথা, অসহায়া মেয়ে—যে শিশুর মতন নির্দ্দোষ, ফুলের মতন পবিত্র—তা'র এত বড় সর্ব্বনাশ যে কর্‌তে পারে সে কি মানুষ! ছি ছি, লজ্জায় ঘেন্নায় আমার মরে' যেতে ইচ্ছে কর্‌চে। আর দোষ সত্যি আমাদেরও আছে। এখানে ছিল, বেশ ছিল,—কেন মর্‌তে তোমার কথা শুনে—"

উদ্গত অশ্রুর বেগ রোধ করিতে না পারিয়া সারদা সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইয়া, অন্তরালে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অকস্মাৎ এই বিস্ময়কর কাহিনী শুনিয়া এবং পুরুষজাতির এতবড় একটা কলঙ্কের প্রমাণ পাইয়া, তীব্র গ্লানি ও ক্ষোভে

মহেন্দ্রের হৃদয় ভরিয়া গিয়া থাকিবে,—নতুবা এমন মুহ্যমান হইয়া এতক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন কেন?

তখন হইতে সারদার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ,—মহেন্দ্রও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

দিন চারেক পরে মহেন্দ্র কুড়ানীকে পুনরায় 'অনাথ-আশ্রমে' রাখিয়া আসিবার কথা উত্থাপন করিতেই সারদা বলিয়া উঠিল—"ওমা, তুমি কি গো! ওটাকে আবার সেই নরকে ফেলে রেখে আসতে চাইচো?"

মহেন্দ্র একটু নরম সুরে উত্তর করিলেন—"সেখানে না হ'ক, আর কোথাও ওর একটা ব্যবস্থা করে দিতে হ'বে ত।"

"না, ও আর কোথাও যাবে না"—সারদা দৃঢ়স্বরে সংক্ষেপে এই উত্তর দিল।

মহেন্দ্রের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। বলিলেন—"তবে কি নিজের ঘরে এ পাপ পুষে রাখ্‌তে হ'বে? তা' হবে না, ওকে এখান থেকে বিদেয় করতে হ'বে।"

সারদা তীব্র কণ্ঠে উত্তর করিল—"ও কি কথা গো! তুমি কি মানুষ? ওর এখন এই অবস্থা, এ সময়ে…। না, সে হ'বে না,—ও এখানেই থাক্‌বে। আর পাপ ত ওর নয়,—ও ত আমাদের চেয়েও নিষ্পাপ, পবিত্র। আর একজনের পাপের শাস্তি এই নিরপরাধিনী মেয়েটাকেই ভুগ্‌তে হ'বে? ও কথা আর মুখে এনোনা—যাও।"

৮

যথা সময়ে কুড়ানীর ছেলে হইল। সারদা অম্লানচিত্তে সুতিকাগৃহে যাইয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কিন্তু ছেলেটাকে দেখিলেই একটা বিজাতীয় ঘৃণায় তাহার দেহমন ভরিয়া যায়। পাপে যাহার জন্ম তাহাকে অশুচি জ্ঞানে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারে না।

কিন্তু ঘটনাচক্রে এই অস্পৃশ্য ছেলেটার সকল ভারই ক্রমে সারদাকে লইতে হইল,—যখন কঠিন রোগে কুড়ানীর জীর্ণ দেহখানি শয্যার সহিত মিশিয়া গেল। দুই তিন মাস রোগ ভোগ করিয়া সে অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গেল, উঠিয়া বসিবার শক্তি পর্য্যন্ত রহিল না। রোগের দারুণ ক্লেশ নীরবে সহ্য করিয়া অসীম ধৈর্য্যের সহিত সে যেন কাহার প্রতীক্ষায় উৎসুক হইয়া থাকে। তাহার বড় বড় উজ্জ্বল চোখ দুটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন কাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়।

সারদা বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। এদিকে সংসারের কাজ, ওদিকে ছেলেটার পরিচর্য্যা,—রোগিনীর কাছে বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না। নরেন মাঝে মাঝে আসিয়া বসে বটে। কিন্তু তাহার সহিত এতদিনেও কুড়ানীর বনিবনাও হইল না। তাই নরেন যতক্ষণ থাকে, সে বিষম অবজ্ঞাভরে চোখ বুজিয়া নীরবে পড়িয়া থাকে।

সারদা মাঝে মাঝে ছেলেটাকে তাহার কাছে আনিয়া দেয়। তখন তাহার পাণ্ডুর মুখে একটা আনন্দের ছটা ফুটিয়া উঠে। ছেলেকে আদর করিয়া অস্ফুটস্বরে সে কত কি বলিবার চেষ্টা করে এবং থাকিয়া থাকিয়া সারদাকে বলে—"দিদি, বাব্‌?"

মহেন্দ্রকে সারদা বলে—"ছুঁড়িটা তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে হেদিয়ে মরে, সময় মত মাঝে মাঝে একটু কাছে গিয়ে বস না।" মহেন্দ্র বিনা আপত্তিতে কুড়ানীর কাছে গিয়া একটু বসেন।

একদিন মহেন্দ্র কাছারি হইতে আসিলে সারদা বলিল—"আজ বড় ছট্‌ফট্‌ করচে। কাজকর্ম্ম ফেলে আমি সারাদিন ওর কাছেই ছিলাম। জলটল খেয়ে তুমি গিয়ে একটু বস্‌বে? আমি তা'হ'লে কাপড়টা কেচে এদিককার একটু ব্যবস্থা করি।"

মহেন্দ্রকে কুড়ানীর কাছে বসাইয়া সারদা বাহির হইয়া গেল। একটু পরেই মনে পড়িল কুড়ানীকে ঔষধ দিবার সময় হইয়াছে। মহেন্দ্রকে সে কথা বলিতে গিয়া কুড়ানীর ঘরের কাছে আসিতেই, ঘরের ভিতরে একটা মৃদু অথচ সুস্পষ্ট, শতসুখস্মৃতিবিজড়িত সুপরিচিত ধ্বনি শুনিয়া সারদা থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। অদম্য কৌতুহলের বশে জানালার ফাঁকে চোখ দিয়া দেখিল—কুড়ানী মহেন্দ্রের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছে, ডান হাতে মহেন্দ্রের হাত ধরিয়া নিজের বুকের উপর চাপিয়া রাখিয়াছে এবং বাঁ হাতখানি মহেন্দ্রের গলা বেষ্টন করিয়া আছে,—আর মহেন্দ্রের মাথাটা কুড়ানীর

আনন্দোজ্জ্বল শীর্ণ মুখের উপর অনেকখানি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

সারদা অবসন্ন দেহে সেইখানেই বসিয়া পড়িল। তারপর উঠিয়া দেওয়াল ধরিয়া অতি সন্তর্পণে চলিয়া গিয়া, রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে তাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে যেন একটা মেঘ সরিয়া গিয়া চারিদিক পরিষ্কার হইয়া গেল, তাহার বিবর্ণ মুখের প্রসন্নতা ফিরিয়া আসিল। ছুটিয়া গিয়া কুড়ানীর ঘুমন্ত শিশুটিকে তুলিয়া লইয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিল এবং অজস্র চুম্বন বৃষ্টি করিয়া তাহাকে জাগাইয়া, কাঁদাইয়া বিষম বিব্রত করিয়া তুলিল।

৯

কুড়ানীর তৈলহীন জীবন-প্রদীপের ক্ষীণ শিখাটি এক সময়ে নিতান্ত অতর্কিতভাবে নিবিয়া গেল। একটা দীন নিষ্ফল মানব-জীবনের অবসান হইল।

তাহার মৃত্যুতে চক্রবর্ত্তী পরিবারে একটা বিষাদের ছায়া পড়িয়া গেল। সারদা কয়েকদিন ধরিয়া কাঁদিল, তারপর মাতৃহীন শিশুটিকে লইয়া অত্যধিক ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহার জন্ত ভাল জামা, নূতন বিছানা, নিজহস্তে প্রস্তুত করিয়া, তাহাকে সাজাইয়া, খাওয়াইয়া, নাচাইয়া, খেলাইয়া সারদার দিন কাটে। সংসারের কাজ কতক হয়, কতক পড়িয়া থাকে।

মহেন্দ্রের মনটা কিন্তু এত সহজে হাল্কা হইল না, কি যেন একটা দুশ্চিন্তা লাগিয়া রহিল।

একদিন কয়েকজন লোক আসিয়া মহেন্দ্রকে ডাকিলে, তিনি তাহাদের বসিতে বলিয়া সারদাকে আসিয়া বলিলেন—"ছেলেটাকে একবার দাও ত।"

সারদা তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"কেন?"

"ঐ একজনরা ওটাকে নিতে রাজী হয়েচে, তাই এসেছে একবার দেখ্‌তে।"

"সে কি! তা' হ'বে না। ছেলে আমি দেবো না।"

মহেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কেন মিছামিছি মায়া বাড়াচো? কি হ'বে ওটাকে পুষে,—কোথাকার কে, কা'র ছেলে—"

সারদা দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর করিল—"এ আমার ছেলে! কেবল পেটে ধরতে পারিনি এই যা। দুদিনের তরে এসেছিল একটা কাঙাল। কিন্তু ঐ কাঙালের দান পেয়েই আমার আজ রাজরাণীর ঐশ্বর্য্য। আমি আজ মা হয়েচি,—সত্যিকার মা। এখন কার সাধ্যি মায়ের কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিয়ে যায়।"

মহেন্দ্র মূঢ়ের মত শূন্য বিহ্বল দৃষ্টিতে সারদার মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অসীম ক্ষমার আধার নারী এইবার তাহার মহীয়সী মূর্ত্তিতে দেখা দিল। মাতৃত্বের বিরাট গাম্ভীর্য্য মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গিয়া তাহার স্থানে ফুটিয়া উঠিল প্রেয়সীর পরিপূর্ণ অনুরাগের দীপ্তি। স্নিগ্ধ প্রসন্ন হাসিতে সকল গ্লানি মুছিয়া ফেলিয়া সারদা বলিল—"অমন করে চেয়ে দেখ্‌চো কি? একে যে আমি কিনে ফেলেছি, আর ত ছাড়্‌বো না। এখন যাও, ওদের ফিরে যেতে বল।"

মহেন্দ্র স্খলিত-চরণে—বাহির হইয়া গিয়া, মুখে একটু ম্লান হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন—"না, মেয়েরা দিতে চাইচে না।"

"বেশ ত, তা'র ওপর আর কি কথা আছে?"—বলিয়া তাহারা বিদায় লইল।

মহেন্দ্র একাকী দাঁড়াইয়া কি একটু ভাবিলেন। তারপর চোরের মত অতি সন্তর্পণে গৃহে প্রবেশ করিয়া, আন্‌লা হইতে জামা-চাদর পাড়িয়া লইয়া আবার তেমনই নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন।

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন

# বিতর্কিকা

## ১। ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা

### শ্রীকরুণাকেতন সেন

ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা কি হওয়া উচিত এ নিয়ে অনেকদিন থেকেই আলোচনা চ'ল্‌ছে। আষাঢ় সংখ্যা বিচিত্রার দেশের কথায় এসম্বন্ধে আলোচনা পড়ে দু'একটা কথা বল্‌তে উৎসুক হয়েছি। যদি ভাল মনে করেন, বিচিত্রার বিতর্কিকায় অথবা অন্যত্র এই চিঠিটা প্রকাশ ক'র্‌লে সুখী হ'ব।

একথা সত্য যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কৃষ্টির আদান প্রদানে যে ভাষা প্রয়োজন ইংরাজী ভাষাই এখন তার কাজ ক'রছে। খবরের কাগজে, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ধর্ম্ম, সামাজিক তথ্য প্রভৃতি যে সব ব্যাপার শুধু এক প্রদেশের নয় সে সব সম্বন্ধে পুস্তকে, রাজনৈতিক আলোচনায় এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথোপকথনে আজকাল ইংরাজীরই ব্যবহার। কিন্তু ভারতীয় কোন ভাষাই যে ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত এর সপক্ষেও কতগুলো যুক্তি আছে। কথোপকথনের সময় ভাষা যদি অন্ততঃ একপক্ষের মাতৃভাষা না হয় তাহ'লে তার স্বাচ্ছন্দ্য এবং মূল্য অনেকটা কমে যায়। দেশে থাকতে হয়ত ততটা বোঝা যায় না; কিন্তু বিদেশে, বিশেষতঃ বিদেশীর সামনে যখন দুজন ভারতীয়কে ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা বল্‌তে হয়, তখন আপনা থেকেই লজ্জাবোধ হয়। ইউরোপ একথা বল্‌তে পারে যে ভাষার দিক দিয়ে ভারতবর্ষের চেয়ে ইউরোপের ঐক্য বেশী, কেননা দুজন ইউরোপীয় যখন কথা বলে তখন তারা ইউরোপীয় ভাষাতেই কথা বল্‌তে পারে। দুজন ভারতীয়কে কথা বল্‌তে হয় সম্পূর্ণ অভারতীয় এক ভাষায়। দ্বিতীয় কথা এই, আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন আজকাল জনসাধারণের ব্যাপার। রাজনীতি যতদিন শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চর্চ্চার বস্তু ছিল, ততদিন ইংরাজীতে আলোচনা হ'লে কোন ক্ষতি হ'ত না। জনসাধারণের পক্ষে ইংরাজীর চেয়ে যে কোন ভারতীয় ভাষা অধিকতর সুবোধ্য এবং নূতন শিখ্‌তেও অনেক সহজ। এক প্রদেশের নেতা যদি অন্য প্রদেশে এসে সেখানকার জনসাধারণের সঙ্গে কথা না বল্‌তে পারেন, সেখানকার লোক যদি তাঁর বক্তব্য বুঝ্‌তে না পারে তাহ'লে ভারতবর্ষের ঐক্য কি করে সম্ভবপর হবে জানিনা। অনুবাদে অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। আমার মনে আছে, বিহারের ছোট একটি জায়গায় মহাত্মাজী একবার বক্তৃতা দিয়েছিলেন; শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত লোক; কিন্তু তাঁর কথাগুলো তাদের হৃদয়কে কি রকম স্পর্শ করেছিল কয়েক বৎসর পরেও আমি তার পরিচয় পেয়েছি। মহাত্মাজী যা বলেছিলেন তাতে রাজনীতির কথা খুব কমই ছিল— দৈনন্দিন জীবনের পবিত্রতা সম্বন্ধে খুব সহজভাবে কয়েকটি উপদেশ। তার যা কিছু জোর কেবল মহাত্মাজীর নিজের মুখের কথা বলে। মহাত্মাজী যদি ইংরাজী কিংবা তেলেগুতে বল্‌তেন এবং হিন্দীতে অনুবাদ করা হ'ত—তাহলে তার মূল্য যে অনেক কমে যেত সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা কি হওয়া উচিত—হিন্দী, উর্দ্দু, না বাংলা—সে সম্বন্ধে অনেক তর্ক উঠ্‌তে পারে।

কিন্তু সে প্রশ্ন উত্থাপন না করেও বলা যেতে পারে এবিষয়ে বাংলাদেশের একটা কর্ত্তব্য আছে। আমরা যদি চাই যে বাংলা ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা না হলেও অন্ততঃপক্ষে কৃষ্টির ভাষা হবে এবং অন্যান্য প্রদেশের লোক সে ভাষা শিখবে, তাহলে আমাদেরও অন্য প্রদেশের ভাষা শিখতে প্রস্তুত হওয়া উচিত। যে দেশে একাধিক ভাষার প্রচলন সে দেশে সাধারণতঃ একটা ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না —একের অধিক ভাষাই সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়। সুইজারল্যাণ্ডের সব অংশের লোকেরা ফরাসী এবং জার্ম্মান ভাষা দুই-ই শেখে। আমরা যদি হিন্দী অথবা উর্দ্দু শিখি তাহলে একথা আশা করা অন্যায় হবে না যে হিন্দীভাষীরা বাংলা শিখবে। দেশ ভ্রমণে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, সঙ্গীত-চর্চ্চায়, ভারতের মধ্যযুগের সাধনার আলোচনায় এবং আরও নানারকমে হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষার জ্ঞান আমাদের সাহায্য করবে। বাংলাদেশে আজকাল হিন্দী ভাষার চর্চ্চা কিছু কিছু হচ্ছে— কিন্তু আরও অনেক বেশী হওয়া দরকার। তার একমাত্র উপায় আমাদের বিদ্যালয়ে—বিশেষতঃ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হিন্দী অথবা উর্দ্দুকে অবশ্য-পাঠ্য বিষয়ের অন্যতম করা। সপ্তাহে একঘণ্টা করে তিন চার বৎসর পড়লে হিন্দী অথবা উর্দ্দুর বেশ খানিকটা জ্ঞান হওয়া অসম্ভব নয়—এতে বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা অযথা ভারাক্রান্ত হবে না। ইউরোপের অধিকাংশ দেশের উচ্চ বিদ্যালয়েই মাতৃভাষা ছাড়া দু'তিনটা বিদেশী ভাষা শিখতে হয়। জার্ম্মানীতে ফরাসী এবং ইংরাজী ভাষাও শিখতে হয়। হল্যাণ্ডে ডাচ ছাড়াও জার্ম্মান, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা শেখান হয়। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে হিন্দী অথবা উর্দ্দুকে অবশ্য শিক্ষণীয় ক'রলে আনুসঙ্গিকভাবে আর একটা সুফল হবে বলে আশা করি। বাংলাদেশের মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই বাংলা না পড়ে উর্দ্দু পড়ে। আমার মুসলমান বন্ধুদের মধ্যে এমন দু একজনকে জানি যাঁরা বাংলাদেশের স্কুলে অনেক বৎসর এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেও বাংলা পড়তে পারেন না। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে যদি উর্দ্দু অবশ্য-শিক্ষণীয় হয় তাহ'লে তার সঙ্গে বাংলাকেও মুসলমানদের জন্য অবশ্য-শিক্ষণীয় করায় কারও আপত্তি হবার কোন কারণ থাকতে পারে না। ভাষাগত পার্থক্য বাংলাদেশে হিন্দুমুসলমানের মিলনকে আরও কঠিন করে তুলেছে। এতে যদি সেই পার্থক্য যায়, তাহলে সে আমাদের একটা বড় লাভ।

## ২। ইংরেজি কালচারের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ

### শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত বি-এ

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার কোনও প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক কাগজে ইংরেজী "কালচার" শব্দটার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ নির্ণয়ে একটা সুন্দর বিতর্কিকার সৃষ্টি হইয়াছিল। উক্ত পত্রিকায় একপক্ষ কালচারের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ হিসাবে "শীল" অথবা অধিকতর শ্রবণ-মাধুর্য্যের জন্য "শীলতা" শব্দ ব্যবহারের যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। অপরপক্ষ বলিয়াছেন চলিত ভাষায় কৃষ্টি যেমন ক্ষেত্রকর্ষণ বুঝাইতে পারে, পারিভাষিক অর্থে তদ্রূপ উহা ইংরেজী Culture-এর লিপ্যন্তর 'কালচার'-এর বাঙ্গালা প্রতিশব্দও হইতে পারে। এবং এই অর্থে শব্দটা বিশিষ্ট লেখকগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াও আসিতেছে। তিনি আরো বলিয়াছেন, "কৃষ্টি যার সাধনোপায়, শীল তার ফসল।" তাঁহার মতে শুধু শ্রুতিকটু বলিয়াই 'কৃষ্টি' ত্যাজ্য হইতে পারে না— যেমন পারে না বৃষ্টি, সৃষ্টি, কৃষ্ণ প্রভৃতি নিত্য ব্যবহৃত শব্দসমূহ। প্রথম পক্ষ চাহিয়াছেন, 'কালচার' শব্দের বিশেষার্থবোধক একটা বাঙ্গালা পরিভাষা রচনা। তিনি 'শীল' ও 'কৃষ্টি'র অর্থভেদ কল্পিত বলিয়াই মনে করেন। তিনি বলেন, কেবল শীলই যে কালচারের পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে মাত্র তাহাই নহে, কালচারের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগেও শীল হইতে উৎপন্ন শব্দ বেশ খাটিয়া যায়—যে সব স্থলে কৃষ্টি বা তন্মূলক শব্দ একেবারেই অচল। কৃষ্টি শব্দটাকে তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে (?) কবরস্থ করিতে চাহিয়াছেন। উত্তরে দ্বিতীয় পক্ষ বলিয়াছেন 'কৃষ্টি' একেবারেই চলিবে না অথবা একমাত্র শীলই cultureএর পারিভাষিক প্রতিশব্দরূপে

প্রবর্ত্তিত হইয়া টিকিবে কিনা, তাহা ভবিষ্যতের উপরই নির্ভর করে। প্রথম পক্ষ শেষদফা আলোচনায় কালচারের প্রতিনিধি স্থানীয় হিসাবে 'সংস্কৃতি' ও 'শীলতা' এই দুই শব্দের তুলনামূলক সমালোচনা আহ্বান করিয়াছেন। এইখানেই উক্ত পত্রিকায় বিষয়টার উপর বিতর্কিকা শেষ হয়।

কৃষ্টি শব্দটার ব্যবহারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট ও দৃঢ় একটা মত ১৩৪০ সালের পৌষ মাসের 'ভারতবর্ষ' হইতে আমরা পাইয়াছি। স্পষ্টতর এবং দৃঢ়তর একটা মত ১৩৩৯ সালের ৩য় সংখ্যা 'পরিচয়ে' আছে। বলা বাহুল্য, কবি-সার্ব্বভৌম 'সংস্কৃতি' শব্দটা ব্যবহারের পক্ষপাতী। 'কৃষ্টি' শব্দের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় ১৩৪০ সালের পৌষ মাসের 'বঙ্গশ্রী'তে একটি প্রতিবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। 'কৃষ্টি' শব্দটার বিপক্ষে এত আপত্তি সত্ত্বেও বর্ত্তমান বর্ষের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবর্ত্তকের প্রথম প্রবন্ধের নামই দেখা গেল "ভারতের কৃষ্টিরক্ষা"। বস্তুতঃ আধুনিক সাময়িক পত্রিকাদিতে culture শব্দটার বাঙ্গালা প্রতিশব্দের বৈচিত্র্য একটা সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। কালচারের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ হিসাবে আমরা পাইয়াছি সংস্কৃতি, কৃষ্টি, অনুশীলন, পরিশীলন, কর্ষণা, চর্চ্চা, সাধনা, মনঃপ্রকর্ষ, চিৎপ্রকর্ষ (চিত্তপ্রকর্ষ), উৎকর্ষ, শীলতা, বৈদগ্ধ্য এবং সম্ভবতঃ আরো অনেক। ১৩৪০ সালের আশ্বিন মাসের উদয়নে (৬২৩ পৃষ্ঠায়) শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের লেখায় 'কৃষ্টি' শব্দটার ব্যবহার দেখা যায়। উক্ত সালের মাঘ মাসের উদয়নে (১২৮৬ পৃষ্ঠায়) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ও তাঁহার প্রবন্ধে কৃষ্টি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ রায় এবং আরো অনেক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক 'সংস্কৃতি, শব্দটা ব্যবহার করিয়া থাকেন। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলিতে 'চর্চ্চা' ও 'অনুশীলন' শব্দ দুইটার প্রয়োগ লক্ষ করিবার বিষয়:—(১ম) "এইজন্য একদিকে যেমন সংস্কৃত আরবী পারসীর অনুশীলনের প্রয়োজন, অপরপক্ষে তেমনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিশিষ্ট চর্চ্চা ও অনুবাদ প্রচারের আবশ্যক। [লেখক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১] (২য়) "মানসবুদ্ধির অতিরিক্ত চালনায়, প্রত্যেক বিদ্যার অনুশীলনে যে অহংজ্ঞান ও ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি পায় তাহাতে, সর্ব্ববিদ্যার অতিরিক্ত যে বিদ্যা—জীবন-জিজ্ঞাসা বা আত্মজ্ঞান —তাহার অবকাশ আর থাকে না, বিদ্যা ও অবিদ্যার ভেদ অন্তর্হিত হয়।" (শনিবারের চিঠি, বৈশাখ, ১৩৪১)। নিম্নের উদাহরণগুলিতে কালচার বুঝাইতেই বোধ হয় উৎকর্ষ, উৎকর্ষতা প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছে: (১ম) "হজম করিবার শক্তি থাকিলেও কেবল পুস্তকের সংখ্যার উপর মনের উৎকর্ষ নির্ভর করে না।" (শনিবারের চিঠি, বৈশাখ, ১৩৪১)। (২য়) "জ্ঞানেন্দ্রমোহন ও আরো অনেক বাঙ্গালীর মুখে বিগত বাঙ্গালার উৎকর্ষতার বিবরণ শুনিয়াও আমরা মনে করি ইত্যাদি। (লেখক—ডাঃ প্রসন্নকুমার আচার্য্য, উত্তরা, চৈত্র, ১৩৪০)। তারপর পরিশীলন, শীলতা প্রভৃতি শব্দের 'কালচার'এর অর্থে কয়েকটা প্রয়োগ দেখা যাউক:— "প্রত্যেক পরিশীলনোৎসুক বাঙ্গালীর এই বইখানি পড়া উচিত।" (লেখক—শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, উত্তরা, ফাল্গুন, ১৩৪২)। "এ সমস্ত রচনা, সকল শীলতার (culture) পক্ষেই লজ্জার ব্যাপার।" (লেখক—শ্রীযামিনীকান্ত সেন, উদয়ন, পৌষ, ১৩৪০)। শ্রীযুক্ত ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'কৃষ্টি' ও 'পরিশীলন' শব্দ দুইটা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষের আষাঢ় মাসের উত্তরায় প্রকাশিত উক্ত লেখকের "আষাঢ়ে" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদাহরণ উৎকলিত হইল:—"……প্রধান কারণ হল আমাদের পরিশীলনের সম্পূর্ণ রূপ-সম্বন্ধে অজ্ঞানতা।"……"আমাদের কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য হল ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক ও মানসিক ধারার সমন্বয়-সাধন।"……"কৃষ্টির বিধিনিয়ম জানতে হবে, জানলে বোধ হয় আমাদের পরিশীলন সম্বন্ধে লজ্জা কি সঙ্কোচের কোন কারণ থাকবে না।" তবে কি সত্যই "কৃষ্টি যার সাধনোপায়, শীল তার ফসল?" মনঃপ্রকর্ষ, চিৎপ্রকর্ষ শব্দগুলিও সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা উত্তরা হইতে একটী উদাহরণ দেওয়া গেল:—"স্বয়ং রাষ্ট্রনায়কেরা যেকালে তাঁদের স্বেচ্ছাচারের স্খালনে ঐতিহাসিক যুক্তির দোহাই দিতে বাধ্য, তখন চিৎপ্রকর্ষের পক্ষে পূর্ব্বগামী চিন্তাধারার আত্মীয়তা অস্বীকার

করা অসম্ভব।" (লেখক—শাহেদ সুরহর্দি।) অনেক লেখক cultureএর কোন প্রতিশব্দ ব্যবহার না করিয়া ও-কথাটার লিপ্যন্তর বাঙ্গালায় ব্যবহার করেন। যথা—"তাঁদের ভাষার শব্দ একেবারেই সংকীর্ণ—ভাবকে ফোটাতে পারে ঠিক তাদের যতটা প্রয়োজন ততটাই। তাই সেখানে 'কালচার' বা আর্ট নেই।" যতদূর মনে পড়ে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় ইংরেজি cultureএর জন্ম বাঙ্গালায় 'সাধনা' শব্দটা ব্যবহার করিতেন। Cultureএর প্রতিশব্দ হিসাবে 'বৈদগ্ধ্য' শব্দটার ব্যবহার সম্প্রতি বড় একটা দেখা যাইতেছে না।

বাহুল্য ভয়ে আর উদাহরণের সংখ্যা বৃদ্ধি করা গেল না। মনে হয় 'কালচারে'র প্রতিনিধি হিসাবে একাধিক শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় চলিবে। ইহা বাঙ্গালা ভাষার দুর্ব্বলতা না হইয়া বলিষ্ঠতার পরিচায়কও হইতে পারে। শ্রুতিলালিত্যের জন্ম, অনুপ্রাসের খাতিরে, বাক্যকে গাঢ়বদ্ধ করিবার নিমিত্ত cultureএর বিভিন্ন বাঙ্গালা প্রতিশব্দ রচনায় স্থান পাইতে পারে কিনা সে সম্বন্ধে গভীর ও বিস্তৃত আলোচনা বাঞ্ছনীয়। উপরি উদ্ধৃত উদাহরণগুলির প্রত্যেকটীতে cultureএর প্রতিশব্দ হিসাবে বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ সম্যক সুষ্ঠু হইয়াছে কিনা তাহাও অবশ্য বিবেচ্য। বিশ্বপ্রেম, বিশ্বসভ্যতা, মানবধর্ম্ম প্রভৃতির মত বিশ্ব-সংস্কৃতি, মানবকৃষ্টি, সার্ব্বজনীন শীলতা প্রভৃতি চলিবে কিনা জানিনা। আশা করি বঙ্গভাষাভাষী মনীষীগণের দৃষ্টি এই প্রবন্ধের বিষয়ের উপর আকৃষ্ট হইবে।

## ৩। ছন্দ-জিজ্ঞাসা

### শ্রীমমতা মিত্র

কিছুকাল আগে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন 'বিচিত্রা'য় বাংলা ছন্দের তিনটি রূপের বিশদ আলোচনা ক'রেছিলেন। সে সময়ে তাঁর সুলিখিত ও মূল্যবান প্রবন্ধগুলি মনোযোগের সঙ্গে পড়েছি এবং ছন্দতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখেছি। আধুনিক ছন্দের ঠিক রূপটি তিনি উপলব্ধি ক'রতে পেরেছেন ব'লে আমি মনে করি। তাঁর অবলম্বিত সূত্রানুসারে রবীন্দ্রনাথের কাব্য গ্রন্থাবলী আবার পড়েছি, তাঁর উদ্ভাবিত নিয়ম খাটে না এমন জায়গা চোখে পড়ে নি এত দিন।

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের "ক্ষণিকা" কাব্য গ্রন্থখানি প্রবোধ বাবুর "ছন্দ পাটির অনুসারে পাটিয়ে" দেখ্‌ছিলুম। দু'তিন জায়গায় একটু খটকা বেধেছে ব'লে আজ এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে সেই কথা বল্‌ছি। আশা করি প্রবোধচন্দ্র "বিচিত্রা" মারফৎ তাঁর মতামত জানাবেন।

প্রবোধবাবুর মতে দিও, নিও প্রভৃতি শব্দগুলি স্বরবৃত্ত ছন্দে দুই সিলেব্‌ল্ ব'লে গণ্য হয়, এর বানান কখনও 'দি্ও', আবার কখনও বা 'দিয়ো' লেখা হয়। কিন্তু বাজিয়োনাক' কথাটি প্রবোধবাবু কয় সিলেব্‌ল্ ধরেন জানতে পারলে খুসী হ'ব। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'র অধিকাংশ কবিতা চতুঃস্বর স্বরবৃত্তে রচিত। ঐ পুস্তকের "অতিথি" কবিতার প্রথম দিকে আছে :—

পায়ে পায়ে | বাজিয়োনাক | মল,
ছুটোনাক, | চরণ চঞ্চল,
হঠাৎ পাবে | লাজ |

উল্লিখিতভাবে ছন্দ-বিভাগ ক'রলে প্রথম লাইনের দ্বিতীয় পর্ব্বে "বাজিয়োনাক" পাঁচ সিলেব্‌ল্ হয়। প্রবোধবাবু অবশ্য নাচিয়ে, ঘুমিয়ে প্রভৃতি শব্দগুলি পর্ব্বের প্রথমে থাকলে দুই সিলেব্‌ল্ ও হাওয়া, নাওয়া শব্দের 'ওয়া'কে এক সিলেব্‌ল্ ধরতে ব'লেছেন স্বরবৃত্ত ছন্দে। কবি সত্যেন্দ্রনাথও তাই ব'লেছিলেন তাঁর "ছন্দ সরস্বতী" নামক সরস প্রবন্ধে। "অতিথি" কবিতাটি চতুঃস্বর স্বরবৃত্তে রচিত, অথচ "বাজিয়োনাক" পাঁচ সিলেব্‌ল্ দেখ্‌ছি। প্রবোধবাবু তাঁর প্রবন্ধে লিখেছিলেন "স্বরবৃত্ত" ছন্দের পর্ব্বগুলিতে কখনও পাঁচ বা ছয় সিলেব্‌ল্ চালানো যায় না। এ ছন্দের পর্ব্বে যদি চারের অধিক সিলেব্‌ল্ থাকে তবে অমনি ছন্দপতন ঘটে।" এই কবিতাটির পর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ চালিয়েছেন পাঁচ সিলেব্‌ল্, তা'তে কানে ত' কিছু বাধ্‌ছে না। এই শব্দটি চার সিলেব্‌ল্ ব'লে ধ'রবার কোন উপায়

আছে কিনা যদি প্রবোধবাবু 'জানান ত' বিশেষ উপকৃত হ'ব।

আর একটি কথা বল্‌বার আছে। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় একবার লিখেছিলেন, "চতুঃস্বর স্বরবৃত্তে ত্রিস্বর পর্ব্ব চতুঃস্বর পর্ব্বের সঙ্গে চমৎকার কাঁধ মিলিয়ে চল্‌তে পারে।" একথা কিন্তু প্রবোধবাবু কোন জায়গায় ব'লেছেন ব'লে স্মরণ হয় না। চতুঃস্বর পর্ব্বের সঙ্গে ত্রিস্বর পর্ব্ব অনেক লক্ষ ক'রেছি। 'অতিথি' কবিতাতেই আছে :—

ছুটোনাক' | চরণ চন | চল্

যদি পর্ব্ব-বিভাগে ভুল না হ'য়ে থাকে ত' এর দ্বিতীয় পর্ব্বে তিন স্বর পাওয়া যাচ্ছে। ক্ষণিকার আরও কয়েক স্থানে এমন দৃষ্টান্ত আছে। এ সম্বন্ধে দিলীপবাবুর সঙ্গে প্রবোধবাবুর মতের মিল আছে কি না জান্‌বার কৌতূহল হয়।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে চতুঃস্বর পর্ব্বে পাঁচ সিলেব্‌ল্ শুধু যে 'অতিথি' কবিতায় আছে তা' নয়, 'ক্ষণিকা'র "যাত্রী" কবিতাতেও আছে :—

এলে যদি | তুমিও এস,
যাত্রী আছে | নানা।

আমার প্রশ্ন দুটির উত্তর প্রবোধবাবুর কাছ থেকে পাব আশা করি।

## ৪। নারীনৃত্য ও নারীর মর্য্যাদা

### ব্রহ্মচারী সরলানন্দ

কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলার সহর ও নগরে নারীর নৃত্য প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। প্লাবন বা ভূমিকম্পে বিপন্ন দুঃস্থ মানব-সমাজের জন্য নারী-নৃত্যের অনুষ্ঠান করিলে দর্শকের ভিড় হয়, অর্থ সংগ্রহ সহজে হয়। এইরূপ মানব-প্রীতির দোহাই দিয়াও অনেক সময় নারীনৃত্য চলিতেছে। তা' ছাড়া, আমোদ আনন্দ উপভোগের জন্য বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভায়, বিবাহ-সভায় এমন কি শ্রাদ্ধ-বাসরেও নারীনৃত্যের অনুষ্ঠান এই দেশে প্রচলিত হইতেছে। ভদ্রঘরের নারীকে সহস্র অজ্ঞাত পুরুষের সম্মুখে তার প্রস্ফুটিত রূপ যৌবন নিয়া নৃত্য করিতে হইলে; সমাজের স্বাস্থ্যে তাহা উচ্ছৃঙ্খলতা আনিবে কিনা, নারী-প্রগতির নামে, নারী-মর্য্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে কিনা, ইহা বর্ত্তমান সমাজের প্রত্যেক চিন্তাশীল মানব-মানবীর ভাবিবার বিষয়।

দেশে সহ-শিক্ষা ধীরে ধীরে অনেক বিদ্যালয়েই প্রচলিত হইবে—এইরূপ ধারণা করিলে তাহা নিতান্ত অমূলক হইবে না। আজ সহ-শিক্ষা চলিয়াছে, কাল হয়ত সহ-নৃত্য চলিবে। এইরূপ আশঙ্কা একান্ত বাতুলতা বলিয়া মনে হয় না। সেইদিন ঢাকায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এক বক্তৃতায় ভদ্রললনাদের প্রকাশ্যে অর্থের বিনিময়ে নৃত্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। স্বাস্থ্য বা 'আর্টে'র খাতিরেও যদি ইহার আবশ্যকতা সমর্থন করি, তবে য়ুরোপীয় সমাজে যুবতীদের নৃত্যের পরিণামের কথা ভাবিয়া দেখিতে হয়। নারী-নৃত্যের জন্য ঐ দেশে অসংখ্য শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সব শিক্ষালয়ের ভিতরের কথা জানিলে, নারীর রূপ ও যৌবন নিয়া 'প্রগতি', 'আর্ট', ও 'কাল্‌চারে'র নামে কি বীভৎস ছিনিমিনি খেলা চলিয়াছে, তার স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

য়ুরোপীয় সমাজ সহ-শিক্ষায়, নারীনৃত্য এবং সহ-নৃত্যে কতদূর সমৃদ্ধ বা সুসভ্য হইতে পারিয়াছে এবং এই জাতীয় নারীজাগরণের প্রবর্ত্তনে নারীকে তার আপন সুখ ও মর্য্যাদায় কতটুকু সুপ্রতিষ্ঠ করিতে সক্ষম হইয়াছে, আমাদের উৎসাহী তরুণ ও তরুণী ভাইবোনেরা ধীরে সুস্থে তাহা ভাবিয়া দেখিলে উত্তম হয়।

নারীকে নাচাইয়া, ভদ্রঘরের যুবতী কন্যাকে, অনূঢ়া নিরপরাধাকে নৃত্য-কলা শিখাইয়া তার সতীত্ব ও রূপ যৌবনে শকুনীর মত তীব্র নখর বসাইয়া লালসার পূর্ণ চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়া ব্যবসা দ্বারা ঐ দেশে শত সহস্র নর-পশু অর্থ উপার্জ্জনের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। নির্ব্বোধ কন্যা নৃত্য শিখিবার মোহে বা অর্থার্জ্জনের লোভে একবার শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি হইলে তাহাকে শত শত দালালেরা

বিপণির পণ্যের মত দেশে দেশে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সহস্র লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিতা করিয়াছে এবং করিতেছে। এই পাপ-ব্যবসায় ক্রমশঃ য়ুরোপের সমাজ-কল্যাণকামী মনীষীদের নিকট এক মহা ভাবনার বিষয়ে দাঁড়াইলে তাঁহারা 'বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘে' (League of Nations)র সাহায্যে ইহার উচ্ছেদ-সাধন করিতে যত্নশীল হইয়াছেন।

এই সেইদিনের দৈনিক কাগজে* দেখিলাম, য়ুরোপীয় সমাজে সভ্যতা ও শিল্পকলার নামে নারীনৃত্যের পরিণাম ক্রমশঃ কোন্ রসাতলে যাইয়া আত্মসমর্পণ করিতেছে। ছায়াচিত্রের ভিতর সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া নারী না নাচিলে, রূপ-যৌবনসম্পন্না কুল-ললনারা বাজারের টিকেট-কেনা দর্শকদের নয়ন সমক্ষে একেবারে বিবস্ত্রা হইয়া নৃত্য না করিলে য়ুরোপীয় রুচির আর তৃপ্তি হয় না। সভ্যতার ক্ষুধা কতদূর বিগর্হিত হইলে নারীর রূপ, যৌবন ও মর্য্যাদার উপর এমন লুণ্ঠন চলিতে পারে, প্রাচ্যের প্রগতিপরায়ণা ভগিনীরা সেই কথা ভাবিয়া দেখিবেন কি?

উলঙ্গ হইয়া নৃত্য করার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইয়া সেই দিন উনিশ বছরের এক বালিকা ইংলণ্ডের বিচারালয়ে অভিযোগ আনিয়া পাঁচশত পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পাইয়াছে। চলচ্চিত্রে 'ষ্টার' হওয়ার কামনায় বালিকা প্রয়োগ-শিল্পী ওয়াল্টার সামারসের (Capt. Walter Summers) ফিল্ম তুলিবার সময় নৃত্য প্রদর্শন করিতে গেলে শিল্পী তাহাকে বিবস্ত্রা করিতে থাকে। ইহাতে সে আপত্তি জানায়। কিন্তু, তাহাকে নানা যুক্তি দ্বারা প্রবোধ দেওয়া হয়। শেষে, এই চিত্র জনসাধারণে প্রদর্শিত হইবে না এবং এক সপ্তাহের ভিতর ছবির 'নেগেটিভ' তাহাকে ফেরৎ দিতে হইবে, সর্ত্তে, বালিকা বিবস্ত্রা হইয়া নৃত্য-প্রদর্শন করে। প্রয়োগ-শিল্পী কিন্তু তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই। জনসাধারণে এই বালিকার উলঙ্গ নৃত্য চলচ্চিত্রের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিলে বালিকা বিচারালয়ে অভিযোগ আনয়ন করে এবং উল্লিখিত মুদ্রা ক্ষতিপূরণস্বরূপ পায়।

এই সব জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা য়ুরোপীয় সমাজের নারী-প্রগতির এবং নারী নৃত্যের ভয়াবহ পরিণতি হইতে সময়োপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি। আমাদের দেশের ও সমাজের আন্তর্ভৌমিক প্রাণধারার সহিত যাঁহাদের নিবিড় পরিচয় আছে, সেই মার্জ্জিত-রুচি-সম্পন্ন সমাজ-কল্যাণ-চেতা মানব-মানবীরা আজ নারী নৃত্যের 'সার্থকতা এবং ব্যর্থতা' —এই উভয় দিক্ বিশদভাবে 'বিতর্কিকা'য় আলোচনা করুন—এই অনুরোধ।

* 'অমৃতবাজার পত্রিকা'; ২৪ জুলাই, পৃঃ ৫

## ৫। নামের পদবী

### শ্রীমণি গঙ্গোপাধ্যায়

ফাগুনের বিচিত্রায় আমার লেখা "নামের পদবী" সম্বন্ধে এর মধ্যেই বেশ সমালোচনা আরম্ভ হয়েছে। বিষয়টা যে acute এবং একটা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে আজকালকার প্রগতির যুগে—এটা দেখ্‌ছি সকলেই প্রায় স্বীকার করেছেন। কিন্তু গোলযোগ বেঁধেছে—বিষয় বস্তুটা নিয়ে।

বোশেখের 'বিচিত্রা'য় নীহারবাবু অনেক কথা আপন খেয়ালে বলে' গেছেন। আমার জিজ্ঞাস্য ছিল—'মেয়ে বন্ধুদের ডাক্‌তে হ'লে এক সামাজিক সম্বোধন ছাড়া আর কি সম্বোধন পুরুষরা ব্যবহার কর্‌তে পারে?' কিন্তু নীহারবাবু মেয়ে মেয়ে বন্ধুকে ডাক্‌তে হ'লে—কেন নাম ধরে ডাক্‌বে না—এবং পুরুষ মেয়ে বন্ধুকে ডাক্‌তে হ'লে—'দিদি' 'বৌদি'—বল্‌তেই বা দোষ কি—ইত্যাদি অনেক রকমের অবান্তর কথা বলে' কাটান্ দিতে চেয়েছেন। কেবল শেষে একটা গল্পের অবতারণা করে' বলেছেন যে অত ভীড়ের মধ্যে ছেলে তা'র বাবাকে 'বাবা' সম্বোধন হাতের পাঁচ থাকা সত্ত্বেও অমন অমুক বাবু বলে ডেকেছিল —তখন মেয়ে বন্ধুদের নাম ধরে' ডাক্‌তে দোষ কি? নীহারবাবু হয়ত জানেন না যে কোন কাল্পনিক গল্পের দোহাই দিয়ে সত্যিকাবের কোন আলোচনা বা তর্ক চালানো যায় না—তা'তে কেবল বুদ্ধিহীনতার পরিচয়ই বাড়ে। আর নীহারবাবু বোধ হয় তাঁর গল্পের ঝুলি খুঁজে কোথাও বার কর্‌তে পারবেন না—যেখানে ঐ রকম ভীড়ের মধ্যে কোথাও

কোন ছেলে তা'র মাকেও নাম ধরে' ডেকেছিল। নীহারবাবুর গল্পের ভিতর যদি সত্যির কোন রকম আঁচও থাকে—তবে সেটা পুরুষ-পুরুষের সম্বোধন বলেই সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এটা খুবই সত্যি যে এ ব্যাপারটা কোন মুখ চেনা বা একটু অন্তরঙ্গ মেয়েকে সম্বোধন করতে গেলে কখনই চল্‌তো না—ছেলে ও মায়ের মধ্যেত নয়ই।

নীহারবাবু আরও বলেছেন—কোন মেয়ে যদি কোন পুরুষের intimate friend (?) হন—তবে তাঁর নাম ধরে' ডাকতে বাধা কি? কিন্তু কোন মেয়ে পুরুষে আলাপ হ'লেই যে একেবারে পুরোপুরী intimacyতে দাঁড়িয়ে যাবে—তা'ও ত সব সময়ে হয় না। সুতরাং যতক্ষণ অন্ততঃ দুজনের মধ্যে intimacy না হয়—ততক্ষণ হয়ত নীহারবাবুর মতে—সেই দিনের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতে হ'বে—কবে intimacy হ'বে—এবং সেইদিন সম্বোধনটা সরল হ'য়ে দাঁড়াবে। এটা কতদূর সম্ভব তা' পাঠক পাঠিকাদের উপরই ভার রইল।

জৈষ্ঠের 'বিচিত্রা'য় নামের পদবী সম্বন্ধে আরও দুটো সমালোচনা পড়লুম। স্বরূপবাবু বলেছেন—"যখন সুরেন-বাবু বা উপেনবাবু বলে থাকি পুরুষ বন্ধুদের বেলায়—নারী বন্ধুদেরই বা নাম ধরে' ডাকতে কেমন কেমন লাগে কেন?" এই 'কেন'র জবাবের জন্যইত এত মাথা ঘামানো। Ladies' Prestige বলে—একটা কথা আছে সেটা সকলেই প্রায় অল্প বিস্তর মেনে চলেন। আর এও ঠিক মেয়ে-মেয়ে বন্ধুদের ভিতর যেমন অসঙ্কোচ ব্যবহার আছে, পুরুষ-পুরুষ বন্ধুদের ভিতরেও ঠিক তেমনিই আছে। কিন্তু পুরুষ যদি সামাজিক পরিচয়ের দাবী নিয়ে কোন স্বল্প পরিচিতা নারী-বন্ধুকে নাম ধরে' ডাকে—সেটা কি স্বরূপবাবুর মতে খুব সুরুচি সঙ্গত হ'বে? তিনি মেয়েদের সম্বোধন ব্যাপারটা এক "ভদ্রে"তেই সার্‌তে চেয়েছেন। কিন্তু 'ভদ্রে' শব্দটা একটাত general term. কোন ভীড়ের মধ্যে 'ভদ্রে' বলে ডাকলে কেইবা শুন্‌বে আর কেইবা সাড়া দেবে। উপরন্তু 'ভদ্রে' শব্দটা যেন অনেকটা পোষাকী কথা বাংলা ভাষায়।

স্বরূপবাবু এও বলেছেন যে Missএর পরিবর্ত্তে 'শ্রীমতী' এবং Mrsএর বদলে 'শ্রীযুক্তা' প্রতিশব্দ নামের আগে বসিয়ে মেয়েদের সম্বোধন করা যেতে পারে। কিন্তু যাঁদেব পরিচয় অজ্ঞাত—কোন gatheringএ যাঁদের সঙ্গে স্বল্পকালের জন্য আলাপ—তাঁদের নামেব আগে 'শ্রীমতী' বস্‌বে কি 'শ্রীযুক্তা' বস্‌বে—যদি তাঁরা ব্রাহ্ম, খৃষ্টান বা মুসলমান নারী হন—যাঁরা সিঁদুর ব্যবহার করেন না। তখন কি বলে তাঁদের সম্বোধন চল্‌বে? তখন শ্রীমতীও খাটবে না—শ্রীযুক্তাও খাটবে না। তবে যদি সব জায়গায় 'শ্রীমতী' বসানো যায়—তা'হ'লে হয়ত সমস্তটা কিছু হাল্‌কা হয় কিন্তু নামটা একটা প্রকাণ্ড বড় হ'য়ে দাঁড়াবে।

আমি লিখেছিলুম "মিস্ বা মিসেস্ শব্দটা কানে বড় বিশ্রী বাজে।" তার উত্তরে শ্রীবিনয়কুমার মিত্র এম্, এ—এল্, এল্, বি, লিখ্‌ছেন "আমার বোধ হয় যে আমাদের পক্ষে মিস্ মিসেস শব্দদ্বয় ব্যবহার করা উচিত নয়, এইজন্য নয় যে তা' ব্যক্তি বিশেষের কানে বাজে, কিন্তু এইজন্য যে ঐ শব্দ দুটি ব্যবহার করতে হ'লে—আমাদেরকে অনাবশ্যক ভাবে ইংরাজদের অনুকরণ করতে হবে—আর সকলেই স্বীকার করবেন যে অনাবশ্যক অনুকরণ সর্ব্বদাই পরিত্যাজ্য।" বিনয়বাবুর একথা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু আমি যে লিখেছিলুম "মিস বা মিসেস শব্দটা কানে বড় বিশ্রী বাজে' —বিনয়বাবু এটা আমার ব্যক্তিগত শ্রুতিকটু বলে উপহাস করেছেন—কিন্তু তিনি একটু ভাল করে ভেবে দেখ্‌লে সহজেই বেশ বুঝতে পার্‌তেন যে 'মিস বা মিসেস' শব্দদ্বয় ইংরাজি শব্দের অনুকরণ বলেই কানে বিশ্রী বাজে বলা হয়েছিল। তাঁর মত ডিগ্রীধারীব এটুকু বোঝা উচিত ছিল না কি? কারণ এমনি শুনতে মিস বা মিসেস শব্দ দুটো মোটেই শ্রুতিকটু নয়—যদি না তা'রা ইংরাজি শব্দ হ'তো।

অনেক গবেষণা করে, বিনয়বাবুব মতে দুটো শব্দের প্রয়োগ কবে' নারীবন্ধুদের আহ্বান করা যেতে পারে—একটী 'দেবী' অপরটী 'শ্রীমতী'। তবে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে 'দেবী' শব্দেব তত পক্ষপাতী নন কারণ তাঁর মতে নাকি—"পুরুষও যেমন দেব নন্—নারীও তেমনি দেবী নন্।" সুতরাং তিনি তাঁর রায়ে বলেছেন—'শ্রীমতী' শব্দ প্রয়োগ করে' মহিলাদের আহ্বান করা যেতে পারে—এবং "তা'তে

তাঁদের সম্মানেরও কোন হানি হ'বে না। কিন্তু বিনয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করি 'দেবী' শব্দ প্রয়োগ করতে গেলে—তাঁর ব্যক্তিগত ভাবে যদি আপত্তি থাকে—তবে 'শ্রীমতী' শব্দের প্রয়োগেই বা তাঁর এত পক্ষপাতিত্ব কেন? কারণ এমনও ও হ'তে পারে—পুরুষ মাত্রেই যেমন 'শ্রীমান' নন্—নারী মাত্রেই বা 'শ্রীমতী' হ'বেন কেন?

যাক্—নারীর নামের পদবী নিয়ে যে এতদিন পরে একটা আলোচনা চল্‌ছে—এই যথেষ্ট। সংস্কার আমাদের এমনিই হ'য়েছে যে হঠাৎ কোন নূতন সম্বোধন করে' কোন নারী বন্ধুকে ডাকা সহজ হ'য়ে উঠ্‌বে না। প্রথম প্রথম সেটা ওষুধ খাওয়ার মত করেই চালাতে হ'বে। যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হয়ত সেটা সহজ স্বচ্ছগতিসম্পন্ন হ'য়ে যাবে। এমন হয়ত দিন আস্‌বে যেদিন নামের আগে কোন প্রতিশব্দ যোগ কর্‌বার বালাই হয়ত থাক্‌বে না। কিন্তু যতদিন না সে ceremonious দিনটী আসে—ততদিন একটা 'popular' শব্দ ঠিক কর্‌তেই হ'বে। আশা করি শ্রদ্ধেয় প্রবীণ সম্পাদক উপেনবাবু ঐ বিষয়ে তাঁর পাকা মতামত জানাবেন।

---

# প্রেম ও কামনা

শ্রীধীরেন মুখার্জ্জি

প্রেম ও কামনা, মানবের মনে,
পাশাপাশি দুটি রহে;
প্রেম গড়ে মনে আনন্দ-ভবন,
কামনা তাহারে দহে।

কামনার মনে প্রিয়-জন-সনে,
দেহ মিলাইতে আশ,
প্রেম গড়ে তার প্রিয়রে মধুর
কল্পনায় করি বাস।

কামনা প্রিয়রে আপনার করে,
প্রতিদান যদি পায়,
প্রেম শুধু খোঁজে প্রিয়-জন-সুখ,
নিজেরে বিলা'তে চায়।

ক্ষণিকের মোহ টুটিলে কামনা
অবহেলা করে পরে;
যুগ-যুগ ধরি ধ্যান-রত-প্রেম
প্রিয়-স্মৃতি বুকে ধরে।

কামনা ক্ষুদ্র দেহের মিলনে
সসীমের মাঝে রহে;
প্রেমের প্রবাহ অসীম-প্রসারী,
নিখিল জগতে বহে।

# রূপকথা

আমার সাত বছর বয়সের বন্ধু, রেণু, আমার গলাটি জড়িয়ে ধরে বলে উঠ্‌ল, অনুদা', তুমি আজ আমায় একটি রূপকথা ব'লো না।

রূপকথা শুন্‌তে রেণুর এত আগ্রহ কেন?

রেণুর মন হচ্ছে সংসারের অভ্যস্ত জীবন-যাত্রার বাইরে—সে ত যুক্তি শুন্‌তে চায় না, সে চায় এমন কাহিনী শুন্‌তে যার সাথে সামঞ্জস্য হবে তার অসীম আকাশভরা কল্পনার। বস্তু-জীবনের উপর তার মুঠি যে শিথিল, তার সময়হীন মনের গতি যে রূপকথার রাজ্যে।

কী মোহিনীশক্তি এই রূপকথায়।...সেই কোন্ অচিন্‌দেশের রাজপুত্ত্‌র, তার পক্ষীরাজঘোড়া সাগর লঙ্ঘন করে এক লাফে, আকাশ দিয়ে উড়ে যায় নক্ষত্রবেগে।

রেণু প্রশ্ন করে, এই আমাদেরও উপর দিয়ে চলে যেতে পারে, অনুদা'?

আমি বলি, নিশ্চয়ই...শুধু আমাদের উপর দিয়ে কেন, সবারই উপর দিয়ে...ঐ যে সেদিন মস্তবড় পাহাড় দেখেছিলে তারও উপর দিয়ে।

রেণু বিস্ময়ে বিভীষিকায় হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে।...না জানি কী তেজীয়ান্ সে ঘোড়া, আর কেমন সে রাজপুত্ত্‌র।

আমি বলি, অমন ক'রে তাকিয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না, রেণু। একদিন রাজপুত্ত্‌র সত্যি সত্যি ঘোড়ায় চড়ে আস্‌বে তোমার কাছে।

এর তাৎপর্য্য রেণু একটু বুঝ্‌তে পারে। তার সুন্দর চোখ ঘুরিয়ে, পাত্‌লা ঠোঁট ফুলিয়ে তর্জ্জন করে বলে, আমার সাথে এমন দুষ্টুমি কর্‌লে আমি কিন্তু আর তোমার কাছে আস্‌ব না।

তা' কি হয়। রেণুর সাহচর্য্য যে আমার চাই-ই। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে বলি, না, লক্ষ্মীটি, তোমার সাথে আর দুষ্টুমি কর্‌ব না।

রেণুর অভিমান তবু ভাঙ্গে না। মুখখানা শ্রাবণ মেঘের কালোতে ঢেকে রেখে সংক্ষেপে বলে, ভারী ত গল্প বল্‌ছ তুমি।...দেমাক হয়েছে, না?

আমি মনে মনে হাসি, মনের হাসি ঠোঁটের ফাঁক দিয়েও ছিট্‌কে বেরিয়ে পড়ে। কোনক্রমে তা' রোধ করে রেণুকে আবার আদর করে বলি, সত্যি বল্‌ছি, রেণু, আর দুষ্টুমি কর্‌ব না, এবার দেখ্‌বে কী রকম লক্ষ্মীছেলের মত গল্প বলে যাব।

রেণু শান্ত হয়, বলে, আচ্ছা, এবার ব'লো ....

ছিন্নবন্ধন গল্পের সূতো ধরে আমি আবার চল্‌তে থাকি।...রাজপুত্ত্‌র গেছে শীকার কর্‌তে, গহন বনে। সে কী দুর্য্যোগ আর অন্ধকার। সঙ্গী সাথী সব কোথায় গেল হারিয়ে...ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টির মধ্য দিয়ে পথহারা পথিক চল্‌ল অনুদ্দিষ্টের উদ্দেশে......

—সবাই হারিয়ে গেল, অনুদা'?

—সবাই, রেণু।...ভয়ানক দুর্যোগ ছিল কিনা।...এই ধরো এখন যদি ভীষণ ঝড় আর বৃষ্টি আরম্ভ হয় আর সাথে সাথে বিদ্যুৎ চম্‌কাতে সুরু করে এবং আমরা দু'জনে বাড়ীর দিকে ছুট্‌তে আরম্ভ করি তাহ'লে আমরা দুজনেই হারিয়ে যাবো!

রেণু বিশ্বাস করেনা।... সেই সেবার বোশেখি ঝড়ে কী ভীষণ ছুট্‌তে ছুট্‌তে সে বাড়ীর আমবাগানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল—কৈ, হারিয়ে যায়নি ত।

আমি তার চোখে অবিশ্বাসের সুর দেখ্‌তে পাই। শশব্যস্তে বলি, তুমি ত রাজপুত্ত্‌র নও, রেণু, তুমি যে রাজকন্যা। ...রাজকন্যারা কখনও পথ হারায় না।

পার্থক্যটা রেণু বোধ হয় ঠিক বুঝ্‌তে পারে না, কিন্তু অবিশ্বাসের কুয়াসা তার স্বচ্ছ চোখের সাম্‌না থেকে সরে যায়। আনন্দোজ্জ্বল আঁখিদুটি আমার দৃষ্টির উপর ন্যস্ত করে বলে, সত্যি?

পরক্ষণেই প্রশ্ন করে, আচ্ছা, অনুদা', হঠাৎ এরকম বিশ্রী ঝড় এলো কেন ?

কী জবাব দেব খুঁজে পাই না। রেণুর পেলব সুকুমার মনের স্বপ্নময় ইন্দ্রজালের সামনে আমার বাহ্য বহির্মুখ কাহিনীর ধারা প্রতিহত হয়ে আস্বার উপক্রম হয়।

খানিকক্ষণ ভেবে বলি, ঝড় আসা যে দরকার, রেণু, নইলে রাজপুত্তুরের সাথে রাজকন্যার দেখা মিল্বে কেমন করে ?

রেণু আমার ব্যাখ্যা বোঝে কি না জানিনা, কিন্তু বেশ শান্ত তৃপ্তস্বরে জবাব দেয়, ওঃ……

আমি আবার সুরু করি।…রাজপুত্তুর খানিকটা দূর যেতে যেতে দেখ্তে পেলে একটা আলোর রেখা। ক্লান্তিতে তার শরীর অবসন্ন—তাড়াতাড়ি সে ছুটে চল্ল সেই রেখার আগুন লক্ষ্য করে। জনমানবশূন্য পুরী, সবাই আছে ঘুমিয়ে, হাতী, কুকুর, সিপাই, শান্ত্রী, উজীর, নাজির সব।

অস্ফুটকণ্ঠে রেণু প্রশ্ন করে, কেন, অনুদা ?

—সে আরেক রূপকথা, রেণু।…আরেকদিন শুনো।

রেণু কোন প্রতিবাদ করেনা, তার ছোট্ট নরম হাত দু'খানি দিয়ে আমার গলাটি আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে বলে, তুমি ভারী সুন্দর গল্প বল্তে পারো, অনুদা' আমার কী চমৎকার ঘুম আসছে!

রেণুর দিকে তাকাই। রূপকথার মোহনস্পর্শে তার অঙ্গ হয়ে এসেছে শিথিল, তার মন ঘুরছে শান্ত-সোনালি সুখের রাজ্যে।

আস্তে আস্তে প্রশ্ন করি, ঘুম পাচ্ছে, রেণু ? ''আজ থাক্, আরেকদিন গল্প শেষ করা যাবে, কেমন ?

তন্দ্রালস স্বপ্নরাজ্য থেকে সচকিত হয়ে ফিরে এসে রেণু বলে, না অনুদা', আম র একটুও ঘুম পায় নি'…তুমি গল্প ব'লো।

রেণুর আদেশ লঙ্ঘন কর্বার মত মনের জোর এবং সাহস আমার নেই। কাহিনী আবার সুরু করি।

সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে বিদ্যুৎ চম্‌কায়—রাজপুত্তুরকে যে বিদ্যুতের আলো পথ দেখিয়েছিল বুঝিবা তারই একটি ছিট্‌কে-পড়া কণা। রেণু শিউরে ওঠে, বলে, আমার ভয় কর্‌ছে অনুদা'।

তাকে আরও নিবিড় ক'রে বুকে ধরে বলি, ভয় কিসের, রেণু ? রাজপুত্তুর আস্‌ছে তারই আলো যে ঐ।

এবার কিন্তু রেণু রাগ করেনা। দিগন্তে সন্ধ্যার মত শান্ত নিষ্কম্প চোখ দুটি তুলে আমায় শুধু মনে করিয়ে দেয়, গল্প কিন্তু তুমি এখনও শেষ কর্‌লে না অনুদা'!

কোথায় গল্পের সূতো শেষ হয়েছিল ভুলে গিয়েছিলুম। একটুখানি ভেবে নিয়ে আবার চল্‌তে আরম্ভ করি।

……সেই বিরাট্ থমথমে নিস্তব্ধতার মধ্যে রাজপুত্তুরের শরীরটা একবার কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল, তবু তার বুকের অদম্য সাহস নিয়ে সে প্রাসাদের ভিতর ঢুক্‌ল। গিয়ে দেখে সোনার পালঙ্কে শুয়ে আছে এক রাজকন্যা, তার হাত থেকে পাখা স্খলিত হয়ে পড়েছে শাদা পাথরের মেঝেতে, আর চারদিকে মাকড়সা এসে করেছে প্রহেলিকাময় গোলকধাঁধার সৃষ্টি।.. রাজপুত্তুর খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে শিয়রের কাছে এগিয়ে এল। দেখ্‌ল, দুটো কাঠি সেখানে পড়ে আছে, সোনার আর রূপোর। মন্ত্রমুগ্ধের মত রাজপুত্তুর একটা কাঠি তুলে ধর্‌তেই আচম্‌কা তার পরশ লেগে গেল রাজকন্যার অধরে, অমনি চারদিকে জীবনের বাঁশী উঠ্‌ল বেজে।…সে কী রব। সবাই উঠ্‌ল জেগে, আর আলোর বর্ণাধারার মধ্যে রাজকন্যা দেখ্‌ল সম্মুখে দাঁড়িয়ে এক কান্তিমান্ যুবা। অমনি আর কোন দ্বিধা না ক'রে তার গলায় পরিয়ে দিল বরমাল্য।

রেণুর দিকে তাকিয়ে দেখি আমার গল্পের মোহন বাঁশীর মূর্চ্ছনায় তার অঙ্গ হয়ে এসেছে শিথিল, তার চোখের পাতায় এসে লেগেছে সোনালি সুখের আলো।

রূপকথার মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল বন্দিনী সে।

# হিমাদ্রি-শৃঙ্গে

শ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ রায় বি, কম

কোনও দিন বাংলার বাহির হই নাই, পূজার ছুটীটা পশ্চিমে কোথাও কাটাইব এই জল্পনা কল্পনা কয়েক বন্ধুতে মিলিয়া ছুটীর বহুপূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল। হাজারিবাগ, বিন্ধ্যাচল, আগ্রা, চুণার, দেওঘর প্রভৃতি কত স্থানেই যাইবার কল্পনা নিত্য গড়িতেছিলাম ও ভাঙ্গিতেছিলাম। ছুটীর সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুগণ রণে ভঙ্গ দিয়া যে যাঁর বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন, আমি পড়িলাম একা। একসঙ্গে কয়েকজন থাকিলে বিদেশ-ভ্রমণটা বেশ উপভোগ্য করিয়া তোলা যায় এবং সকল বিষয়েই সুবিধা। এ সৌভাগ্য আমার আর ঘটিয়া উঠিল না। ছুটী আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, আর ভাবিবার সময় নাই; সঙ্গে সঙ্গেই স্থির করিলাম দার্জ্জিলিঙ্গ যাইব। এক বন্ধু ঠাট্টা করিয়া বলিলেন,—ভ্রমণটা পশ্চিম হইতে উত্তরে ফিরিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত হইবে বোধ হয় পূর্ব্বের দিকে। ইঙ্গিতটা এই যে ভ্রমণ করা আর হইবে না, বাড়ীর দিকে রওনা হইতে হইবে। বন্ধুর এ অনুমান সত্য হয় নাই; আমি সত্য সত্যই দার্জ্জিলিঙ্গ মেলে চড়িয়া বসিলাম।

জলপাইগুড়ি পৌছিতেই ভোর হইল। সকলকেই দেখিলাম গরম কাপড়-চোপড়ে দেহাচ্ছাদিত করিতেছেন। কিছুমাত্র শীত বোধ না করিলেও আমাকেও দেখাদেখি গরম বস্ত্রাদি পরিধান করিতে হইল। নূতন স্থানে চলিয়াছি, পাঁচজনে যা করে তাই করাই ভাল, কি জানি বিদেশে বিভূঁয়ে কিসে কি হইয়া পড়িবে। একজনে বলিলেন—ঐ পাহাড় দেখা যাইতেছে। দেখিলাম দূরে—বহুদূরে চক্রবালে দিগন্তবিস্তৃত কতকগুলি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ জলভরা মেঘ। জিজ্ঞাসা করিলাম—পাহাড় কোথা? ভদ্রলোকটী উত্তর করিলেন—ঐ যে মেঘের মত দেখিতেছেন ঐগুলিই পাহাড়। বিশ্বাস হইল না। আমি পূর্ব্বে কখনও পাহাড় দেখি নাই, নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলাম।

গাড়ী প্রায় সাতটায় শিলিগুড়িতে পৌছিল। এইখান হইতে দার্জ্জিলিঙ্গ হিমালয়ান রেলওয়ে আরম্ভ। শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিঙ্গ ৫১ মাইল। গাড়ী বদল করিয়া narrow gauge এর গাড়ীতে উঠিলাম। খানিক পরে গাড়ী ছাড়িল। ক্রমেই পাহাড়ের শীর্ষ-দেশের গাছপালা অস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইলাম। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, গাছপালা ততই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। মেঘগুলিই যে পাহাড় ইহাতে এখন আর কোন সংশয় রহিল না। পঞ্চানাই ষ্টেশন ও তিস্তানদীর সাঁকো পার হইলাম। সমতল ভূমির উপর মাত্র আর একটী ষ্টেশন। এই ষ্টেশনের নিকট কতকগুলি চা-বাগান। এইবার পাহাড়ে উঠিতে হইবে। দুর্গম পার্ব্বত্য পথে উঠিতে হইবে বলিয়া এঞ্জিনের সঙ্গে মাত্র আট দশ খানি গাড়ী সংযুক্ত। একটা বিরাটকায় সরীসৃপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া রেল গাড়ীখানি ধীরমন্থর গতিতে বন জঙ্গলের ভিতর দিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে ক্রমেই উপরে উঠিতে লাগিল। দুইদিকে বহু শিশু, শাল এবং নাম-না-জানা কত কি গাছ চোখে পড়িল। তিনধেরিয়া ষ্টেশনের নিকট হইতেই ঢালু পর্ব্বত-গাত্রে গাড়ীর দুই পার্শ্বে বহু চা-বাগান। আমরা এখন ২,৮২২ ফুট উপরে উঠিয়াছি। বহুদূরের পাহাড়গুলি শ্যামল, শষ্পাচ্ছাদিত মনে হইতেছিল; উহার উপর অসংখ্য চা-বাগান। অপেক্ষাকৃত নিকটে চা গাছগুলি ছোট কপির চারার মত দেখাইতেছিল। একদিকে, যতদূর দৃষ্টি চলে অভ্রভেদী হিমাদ্রি-গাত্রে শুধু গাছপালা আর বনজঙ্গল; আর একদিকে, নিম্নে অতলস্পর্শী গভীর খাত। কোথাও ঘোর নিবিড় অরণ্যানী; কোথাও কঠিন ধূসর, রুক্ষ শিলা। কোথাও নির্ঝরিণীর শুভ্র, স্বচ্ছ, উপল-ব্যথিত বারিরাশি কোন্ অদৃশ্য, অজ্ঞেয় গিরি-গহ্বর হইতে নির্গত হইয়া অতি উচ্চ হইতে বনজঙ্গলের ভিতর দিয়া সহস্রধারায় ফুলিয়া

ফুলিয়া, লক্ষ হস্তে করতালি বাজাইয়া, অট্টহাস্যে নৃত্য করিতে করিতে মহাসাগরের সন্ধানে বিপুল উল্লাসে ছুটিয়া চলিয়াছে। এইরূপ কত ঝরণাই চোখে পড়িল। পাগলাঝোরার তাণ্ডব নৃত্য দেখিলাম।

"যতকাল আছে বহিতে পারি,
যত দেশ আছে ডুবাতে পারি।"

এই সঙ্গীত গাহিয়াই যেন সকলে নিরুদ্দেশের যাত্রা করিয়াছে।

আমাদের বহু নিম্নে কোথাও পর্ব্বত-গাত্রে শুভ্র মেঘগুলি সংলগ্ন হইয়া আছে; কোথাও কুয়াসা আসিয়া ঘেরিয়া ফেলিয়াছে; কোথাও সূর্য্য একবার দেখা দিয়াই আবার মেঘের আড়ালে লুকাইতেছে। আঁকিয়া বাঁকিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, কখনও আগাইয়া, কখনও পিছাইয়া পর্ব্বত-গাত্রের উপর দিয়া ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে রেল-গাড়ীখানি ছুটিতে লাগিল। যতই উপরে উঠিতেছি, ততই আনন্দে আত্মহারা এবং বিস্ময়ে অভিভূত হইতে লাগিলাম। দার্জ্জিলিঙ্গ হিমালয়ান রেলওয়েতে চার পাঁচটী "লুপ" আছে। "লুপের" উপর দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাড়ীখানি বড় সুন্দর ভাবে উপরে উঠিতে থাকে। দুই দিকে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্য অপলক নেত্রে দেখিতে দেখিতে চলিলাম। মাঝে মাঝে গভর্ণমেণ্টের রিসার্ভ করা বন। যদিও অভ্রান্ত জানিতাম গাড়ীখানি পড়িবার কোনই সম্ভাবনা নাই, শুধু মনে অকারণ ভয় হইতেছিল কখন বুঝি গাড়ীখানি উল্টাইয়া পড়ে। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের, এই সুবিশাল সৌরজগতের সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট কঠিন শিলারাশির দ্বারা এই যোজন-বিস্তৃত, গগনচুম্বী পর্ব্বত নির্ম্মাণ হয়ত কিছুই নয়—কিন্তু মানুষ কি করিয়াছে, বিজ্ঞান কি করিয়া এই দুর্গম, শঙ্কিল পথকে সহজ ও সুগম করিয়াছে, কি করিয়া দুর্ল্লঙ্ঘ্য পাহাড়ের উপর লৌহবর্ত্ম নির্ম্মাণ করিয়াছে ভাবিয়া একেবারে বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। প্রথমেই মনে পড়িল ডিনামাইট আবিষ্কর্ত্তা নোবেল সাহেবের কথা।

উভয় পার্শ্বে, পর্ব্বতগাত্রে লতায় পাতায় ঘেরা পাহাড়-বাসীদের ছোট ছোট কুটীর। লাউ, শশা, ঝিঙ্গা ও কত রকম শাকসব্জীর গাছ এবং গাঁদা প্রভৃতি ফুলের গাছ গৃহপ্রাঙ্গণ আলোকিত করিয়া আছে। গৃহপালিত লোমশ গাভী ও ছাগ এবং হাঁস ও মুরগীও চোখে পড়িল। কোথাও ঝরণার জলে পাহাড়িয়া রমণীরা স্নান করিতেছে, কোথাও কাষ্ঠের মুগুর দ্বারা পিটিয়া পিটিয়া জামা কাপড় কাচিতেছে; পার্শ্বেই প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিতপালিত পার্ব্বত্য বালকবালিকারা উল্লাসে নৃত্য করিতেছে। ইহাদের এই সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা প্রণালী বড়ই মধুর লাগিল।

হঠাৎ দেখিলাম এক জায়গায় গাড়ী থামিয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম একখণ্ড শিলা পর্ব্বত হইতে ভ্রষ্ট হইয়া লৌহপথ অবরুদ্ধ করিয়াছে। গাড়ী এইখানে প্রায় আধঘণ্টা বিলম্ব হইল। ক্রমে কার্সিয়ঙ ছাড়াইয়া ঘুমে পৌছিলাম, বেশ শীত করিতে লাগিল। ঘুমের উচ্চতা ৭,৪০৭ ফুট, অর্থাৎ সমতল ভূমি হইতে আমরা প্রায় দেড় মাইল উপরে উঠিয়াছি। দার্জ্জিলিঙ্গ ঘুম হইতে প্রায় ৬০০ ফুট নীচে। ঘুম ষ্টেশনে বহু আলুর বস্তা দেখিলাম। এখানে প্রচুর পরিমাণে আলু উৎপন্ন হয়। ঘুমে পৌছিতেই প্রায় ছটা বাজিয়া গেল, পরের ষ্টেশনেই দার্জ্জিলিঙ্গ, পৌছিতে আর বিলম্ব নাই। উভয় পার্শ্বের দৃশ্য এতই চিত্তাকর্ষক যে মনে হইতেছিল যতক্ষণ দিনের আলো থাকে গাড়ী চলিলে মন্দ হয় না; ক্ষুধাতৃষ্ণা একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। দার্জ্জিলিঙ্গে নামিতেই বহু মেয়ে কুলি আসিয়া বাক্স বিছানা টানাটানি করিতে লাগিল। অতঃপর নির্দ্দেশমত একজনে মোট পিঠে তুলিয়া আগে আগে চলিতে লাগিল। আমাদের দেশের মত এ দেশের কুলিরা মোট মাথায় করিয়া বহন করে না, মোট পিঠে লইয়া একটা মোটা দড়ির সাহায্যে মাথায় আটকাইয়া দেয়। মাথায় করিয়া ঢালু পাহাড়ের পথে মোট বহন করা অসুবিধা বলিয়াই পৃষ্ঠে করিয়া মোট বহনের ব্যবস্থা। খর্ব্বাকৃতি হইলেও ইহারা বেশ বলিষ্ঠ এবং বড় বড় মোট অনায়াসেই বহন করিতে পারে। একটা বোর্ডিং-এ আপাততঃ উঠিলাম; একটী মাত্র সীট খালি ছিল, ঐটী অধিকার করিলাম। তিনটা বাজিয়া গিয়াছে, স্নানের জল পাইলাম না, কোন রকমে নাকে মুখে দুটী ঠাণ্ডা ভাত গুঁজিয়া উঠিয়া পড়িলাম। রান্নাঘরে প্রবেশ করিতেই মনে হইল, পদ্মার উপর ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ

লাইনের ষ্টীমারের কথা। পাঁউরুটী সেকার উনুনের মত বড় বড় উনুন। নেপালী ঠাকুর ও চাকরগুলির মাথায় টুপি, পরণে কোট ও পায়জামা—ঠিক জাহাজের খালাসীদেরই মত। হাতাবেড়ী লইয়া যেন এঞ্জিনের কয়লা দিয়া জাহাজ চালাইতেছে।

খাওয়ার পর বাহির হইয়া পড়িলাম। যে দুইটী বোর্ডিংএর খবর জানিতাম সন্ধান লইয়া জানিলাম কোনটীতেই সীট খালি নাই। অগত্যা ঐখানেই থাকিতে হইল। পূজার সময় এত লোক সমাগম হয় যে ধর্ম্মশালা বা বোর্ডিংএ স্থান দিয়া কুলাইতে পারে না; অনেকের বেশ অসুবিধায় পড়িতে হয়। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরিয়া দেখি—আমাদের ঘরে আরও দুইটী অতিরিক্ত লোকের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঘর একেবারে গুলজার। কলিকাতার একজন এম, বি ডাক্তারের সীট আমারই পার্শ্বেই। তিনি পূর্ব্বের দিন আসিয়াছেন, মাসখানিক থাকিবেন শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। ইনি নেপালের মহারাজার Chief Medical Officer ছিলেন। তাঁহার নিকট অনেক পাহাড় পর্ব্বতের গল্প শুনিতাম। যতটা অসুবিধা হইবে ভাবিয়াছিলাম তাহা মোটেই হয় নাই। সকলেই ভাল লোক, দুইদিনেই তাঁহাদের সঙ্গে বেশ হৃদ্যতা জন্মিয়া গেল। এরূপ অবস্থায় বোধ হয় আলাপ পরিচয় ও হৃদ্যতা একটু সহজেই হয়। কেহ হয়ত দুই চারিদিন পরে বিদায় লইয়া যাইতেছেন; তাঁহার বিদায়-ব্যথা হৃদয়ের এক নিভৃত তন্ত্রীকে আঘাত করিত বেশ বুঝিতাম।

এ কোন্ স্বপ্নরাজ্যে আসিয়া পড়িলাম। আমাদের ভারতে, এই বাংলায় এমন সুন্দর দেশ থাকিতে পারে কোনও দিন কল্পনাও করিতে পারি নাই। এ যেন প্রকাণ্ড একটা চিত্রশালা, যত বড় বড় শিল্পীর চিত্র বহু অর্থব্যয়ে ও যত্ন চেষ্টায় একত্রিত করা হইয়াছে; যতই দেখা যায় ততই বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। যে দিকেই দৃষ্টি পড়ে শুধু পাহাড় আর পাহাড়; চারিদিকেই পাহাড়ের প্রাচীর। হিমাদ্রি আকাশের গায় সগর্ব্বে তাহার শতসহস্র শৃঙ্গ তুলিয়া একটা বিরাট দৈত্যের মত অনন্তকাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেবল কয়েকটী মাত্র পাহাড়ের উপর ঘরবাড়ী, আর বাকী সবগুলিই তরু-লতা-তৃণ-গুল্মাবৃত গভীর বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। দিগন্তের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গগুলি যেন বাত্যা-বিক্ষুব্ধ সাগরোর্ম্মি, কোন অদৃশ্য যাদুমন্ত্রে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। কোথাও পাহাড়গুলি ধূসর, ধূম্র; কোথাও রৌদ্রকরোজ্জ্বল; কোথাও কুয়াসাবৃত। পর্ব্বতগাত্রে, ঊর্দ্ধে, নিম্নে, সানুদেশে ভাসমান শুভ্র, লঘু, খণ্ড মেঘগুলি বড়ই নয়ন-বিমোহন। দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা কতদিন নয়ন সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে; উহার অমল, ধবল ও নয়নাভিরাম রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। কাঞ্চনজঙ্ঘার উচ্চতা ২৮,১৫৬ ফুট এবং ইহা দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

পাহাড় কাটিয়া কি সুন্দর বাড়ী, ঘর, রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে! উঁচু, নীচু ঢালু পাহাড়ের গায় লতায় পাতায় ফুল গাছে ঘেরা বাড়ীগুলি যেন সব ছবি! প্রকৃতি মুক্তহস্তে তাঁহার সৌন্দর্য্যরাশি এখানে বিলাইয়াছেন—কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। সারি সারি পাইন গাছগুলি আকাশের গায় ঋজুভাবে কি সুন্দর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে! রাস্তার আশে পাশে পিচ, বার্চ, ওক, ধুবি মস প্রভৃতি কত রকমের গাছ; প্রতি গৃহের চারিদিকে, রাস্তার ধারে ধারে, ড্যালিয়া, কসমস, অর্কিড, ক্রিসেনথামাম, গোলাপ প্রভৃতি কত বিচিত্র বর্ণের ফুল! পথে পথে ছায়া-ঘেরা তরু-বীথি। যেদিকে দৃষ্টি যায়, চক্ষু জুড়ায়। এ যেন বাংলার সুইজারল্যাণ্ড। ইট পাথরের সঙ্গে প্রকৃতির একি অপূর্ব্ব সমাবেশ! লতায় পাতায়, ফলে ফুলে ও কুঞ্জবনে শোভিত এক একটা বাড়ী যেন মুনি ঋষিদের এক একটা আশ্রম-গৃহ—স্নিগ্ধ শান্তির আগার। আলোকমালা শোভিত দার্জ্জিলিঙ্গের দৃশ্য রাত্রিতেও অতীব মনোহর। প্রতি রজনীতেই দীপালির উৎসব।

দিনের অধিকাংশ সময়েই সূর্য্য অদৃশ্য থাকে। কখনও হয়ত সূর্য্য উঠিল, পরক্ষণেই বন্যার জলের মত ছুটিয়া আসিয়া কুয়াসা চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিল। সময় সময় কুয়াসা এত নিবিড় হয় যে কয়েক হাত দূরের লোকও দৃষ্টি-গোচর হয়না। সব সময়েই কেমন একটা মেঘলা ভাব, প্রতি নিয়তই ছায়া ও রৌদ্রের, আলো ও আঁধারের

বিচিত্র খেলা চলিতেছে। আমি যতদিন এখানে ছিলাম বৃষ্টি হয় নাই; এই সময়টাই নাকি বৎসরের মধ্যে সব চেয়ে ভাল। দুইদিন আগেই গরমে ছট্‌ফট্ করিতেছিলাম। আর এখানে আমাদের দেশের পৌষ মাঘ মাসের চেয়েও বেশী শীত। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে যেরূপ শীত পড়ে, তাহাতে এখানকার অধিবাসীদেরও কষ্ট হয়। ঘরে ঘরে আগুন জ্বালার বন্দোবস্ত আছে। অনেকেই তখন পাহাড় হইতে নামিয়া সমতল ভূমিতে চলিয়া যান। এখানে যাঁহারা নূতন বেড়াইতে আসেন, তাঁহাদের বিশেষ সাবধানে থাকিতে হয়; একটু বেশী ঠাণ্ডা লাগিলেই নিমোনিয়া প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হওয়া অসম্ভব নয়। উদরাময় রোগেও (Hill Diarrhœa) অনেকে আক্রান্ত হন। স্নানের পূর্ব্বে খানিকক্ষণ খালি গায়ে আছি, অনেকেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ঠাণ্ডা লাগাইবেন না, ঠাণ্ডা লাগাইবেন না। ভয়ে ভয়ে গরম জলে স্নান করি, সর্ব্বদাই গরম জামা কাপড় পরিয়া থাকি। রাস্তায় বাহির হইলেই চোখে পড়িবে কুলি মজুর হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই গরম বস্ত্রে দেহাচ্ছাদিত করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে চলিয়াছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গেলে এই দৃশ্যই দেখা যাইবে। স্বামী স্ত্রী সন্ধ্যার পূর্ব্বে যতদূর সম্ভব গরম বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, পিছনে পিছনে ভৃত্য আরও কতকগুলি গরম কাপড়-চোপড়ের বোঝা বহিয়া লইয়া যাইতেছে—এ দৃশ্যও চোখে পড়িল।

এখানকার লোকেরা বেশ কর্ম্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু হয়। শীতপ্রধান দেশের বিশেষত্বই এই। অধিকন্তু পাহাড়ের উপর দিয়া সর্ব্বদা চলাফেরা করাতেও অধিবাসীদের পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা অনেকাংশে বাড়িয়া যায়। এখানে নেপালী, ভুটিয়া, তিব্বতী, লেপচা প্রভৃতি নানাপ্রকার পার্ব্বত্যজাতির বাস। ইহারা সাধারণতঃ খর্ব্বাকৃতি; অনেকের নাক চ্যাপটা ও চক্ষু ছোট। আকৃতিতে ছোট হইলেও ইহারা বেশ পরিশ্রম করিতে পারে। স্ত্রী বা পুরুষ কেহই আলস্যে দিন কাটায় না। নয় দশ বৎসরের বালিকা পর্য্যন্ত এক একটী ঘোড়া বা গাধা লইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়, আরোহী পাইলে পৃষ্ঠে চড়াইয়া সারাদিনে বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করে। ছোট ছোট বালকবালিকারা কুলির কার্য্যও করিয়া থাকে। মেয়েদের দোকান পশারও আছে। যান বাহনের মধ্যে মোটর, ঘোড়া ও রিক্স। ইহা ব্যতীত অন্য যান-বাহন পাহাড়ের ঢালু পথে উঠা-নামা করিতে পারে না। একটী রিক্স টানিতে চার পাঁচ জন বলিষ্ঠ লোকের দরকার। দুইজনের সম্মুখে টানিতে হয় এবং দুই তিনজনের পশ্চাৎভাগ হইতে ঠেলিতে হয়। এখানে শ্বেতাঙ্গ মহিলারাও বীরদর্পে বেশ ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ায়।

দার্জ্জিলিঙের বাড়ী ভাড়া অত্যন্ত বেশী। সাধারণ তরিতরকারী, স্কোয়াস, শালগম, বীট, গাজর কপি প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া যায়। মাছ অপেক্ষা মাংস সুলভ। বোর্ডিংগুলিতে কলিকাতার প্রায় তিনগুণ খরচ দিয়া থাকিতে হয়। স্থানটী স্বাস্থ্যকর কিন্তু জল একটু বিস্বাদ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিজনক। উদরসম্বন্ধীয় পীড়ার পক্ষে এ স্থান মোটেই ভাল নয়।

একদিন Observatory Hill দেখিতে গেলাম। ইহার উপরে চতুর্দ্দিকে ধ্বজা-পরিবেষ্টিত একটী ভুটিয়া মন্দির, মন্দিরের দ্বারে ধাতুনির্ম্মিত করাল-দশন দুইটী ভয়ঙ্কর জন্তু সংস্থাপিত। মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতার নাম দুর্জ্জয়লিঙ্গ বা মহাকাল। খুব সকালে গিয়াছিলাম, দেখিলাম ঘণ্টা বাজাইয়া পুরোহিত দেবার্চ্চনা করিতেছেন এবং স্থানে স্থানে মধুর স্তোত্রপাঠ হইতেছে। সহরটী এখান হইতে বেশ দেখা যায়। দার্জ্জিলিঙের পূর্ব্বে ভুটান, উত্তরে সিকিম, উত্তর-পূর্ব্বে তিব্বত এবং পশ্চিমে নেপাল অবস্থিত। দার্জ্জিলিঙ হইতে এই দেশগুলি যে খুব বেশী দূরে নয় নিম্নে প্রদত্ত পর্ব্বত-শৃঙ্গগুলির দূরত্ব দেখিলেই বুঝা যাইবে।

নার্সিঙ (সিকিমে) ৩২ মাইল।
টিউললা (ভুটানে) ৪৫ মাইল।
জাম্নু (নেপালে) ৪৬ মাইল।
টাকেহাম (তিব্বতে) ৪৯ মাইল।

আকাশ মেঘ-নির্ম্মুক্ত থাকিলে এখান হইতে এই পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি দেখা যায়। পশ্চিম দিকটা পরিষ্কার থাকায় নেপালের শৃঙ্গগুলি এক ভদ্রলোক দেখাইলেন।

শুনিয়াছিলাম Observatory Hill হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা বেশ দেখা যায়। তিন দিন এখানে আসিয়াও কাঞ্চনজঙ্ঘা ভাল দেখিতে পাই নাই, একদিন কয়েকটী শৃঙ্গের সামান্য অংশমাত্র দেখিয়াছি। অথচ কতদিন পথ চলিতে চলিতে অথবা নির্জ্জন পাহাড়ের নিরালা পথ প্রান্তে বসিয়া তুষার-কিরীট কাঞ্চনজঙ্ঘা নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছি।

Observatory Hill এর উপর একটী গুহার মুখ দেখিলাম। এ সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী আছে। কুচবিহার, কাশী অথবা নেপাল পর্য্যন্ত এই গুহার পথ চলিয়া গিয়াছে, নানালোকে এইরূপ নানা কথা বলিয়া থাকেন। এই পাহাড়স্থিত একটী লোক, সম্ভবতঃ মন্দিরের কোনও পুরোহিত হইবেন, বলিলেন পনর বৎসর পূর্ব্বে তিনি ঐ গুহায় প্রবেশ করিয়া চলিতে চলিতে তিনটী পথের সন্ধিস্থল পর্য্যন্ত যাইয়া ফিরিয়া আসেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নাকি কয়েকজন ইংরেজ ঐ গুহায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, আর ফিরেন নাই।

লিবঙে ঘোড়দৌড়ের মাঠ, বহু নিম্নে অবস্থিত। কার্ট রোড দিয়া গেলে পাঁচ মাইল পথ, ভুটান পল্লী দিয়া গেলে প্রায় অর্দ্ধেক রাস্তা, তবে পথ খুব ঢালু। সে দিন Governor's Cup ছিল। ভুটান পল্লী দেখিতে দেখিতে চলিলাম। পল্লীগুলি অপেক্ষাকৃত নোংরা। পাহাড় কাটিয়া প্রকাণ্ড ঘোড়দৌড়ের মাঠ প্রস্তুত করা হইয়াছে। এখানে একটী মিলিটারী ক্যান্টনমেণ্টও আছে। ছোটলাট বাহাদুরের Cup বিতরণের পর ভুটান পল্লী দিয়াই পদব্রজে ফিরিলাম, উপরে উঠিতে বেশ কষ্ট হইতে লাগিল।

কয়েকজন মিলিয়া একদিন সিঞ্চল হ্রদ দেখিতে গেলাম। এই হ্রদ দার্জ্জিলিঙ হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে। মিউনিসিপ্যালিটীর একটী পাশ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলাম —পাশ ছাড়া এই হ্রদ দেখিতে দেওয়া হয় না। সিঞ্চল পাহাড় হইতে ঝরণা বহিয়া যে জল নামে উহা এই হ্রদে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া সমস্ত সহরে সরবরাহ করা হয়। সিঞ্চল পাহাড়ের উচ্চতা ৮৬০০ ফুট। হ্রদটী কৃত্রিম, তলদেশ ইটদ্বারা বাঁধান। দুই ভাগে বিভক্ত হ্রদটীর একটী অংশ ছোট পুকুরের মত, অপরটী দীঘির ন্যায়। নলদ্বারা ঝরণার জল হ্রদে আসিয়া পড়িতেছে। নলের পার্শ্বে জল পরিমাপক একটী যন্ত্রও সংস্থাপিত রহিয়াছে। হ্রদের চতুর্দ্দিকে সিঞ্চল পাহাড়ের উপর গভীর অরণ্য। নিম্নস্থ হ্রদ হইতে চারিদিকের সুউচ্চ পাষাণ-প্রাচীরের উপর ঘন-বিন্যস্ত বনরাজির দৃশ্য মনে কেমন একটা ভীতির সঞ্চার করে। শুনিলাম সময় সময় দিনের বেলাও ভল্লুক বাহির হয়।

ঐ দিনই ঘুমের বৌদ্ধমন্দির দেখিয়া আসি। মন্দিরে যাইবার পথে কিয়দ্দূরে কতকগুলি দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড প্রোথিত। উহার শীর্ষভাগ হইতে প্রায় তলদেশ পর্য্যন্ত পতাকার মত বস্ত্র সংলগ্ন রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম মৃতব্যক্তির আত্মার সদ্গতির জন্য ঐরূপ এক একটী দণ্ড প্রোথিত করা হয়। মন্দিরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। বুদ্ধের নয় দশ হাত উচ্চ সোনালি রঙের একটী বড় মূর্ত্তি এবং ছোট ছোট আরও কয়েকটী বুদ্ধমূর্ত্তিও রহিয়াছে। ঐ মন্দির স্থাপনকর্ত্তা কি এক লামার মূর্ত্তিও দেখিলাম। বহুমুণ্ড ও ভুজবিশিষ্ট একটী মূর্ত্তিও রহিয়াছে, শুনিলাম উহা মহাকালের মূর্ত্তি। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রাচীর গাত্রে পৌরাণিক অনেক চিত্র খোদিত রহিয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের বহু পাণ্ডুলিপি ঐ মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে। শুনিলাম পাণ্ডুলিপিগুলি নেপালী ভাষায় লিখিত।

একটী মাত্র বারোয়ারী পূজা এখানে হয়। কৃষ্ণনগর হইতে দশভুজার মূর্ত্তি গড়াইয়া আনা হইয়াছে—গঠন প্রণালী দেখিয়াই বুঝিলাম। আনন্দময়ীর আগমনে দুঃখ-দৈন্য-ক্লিষ্ট বাংলায় আবার আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বৎসরান্তে মা আসিয়াছেন, তাই বাঙ্গালীর প্রাণ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলে দলে মার দর্শন করিতে সমবেত হইয়াছে তাহাদের দুঃখ, দৈন্য, ব্যথা ও অভিযোগ জানাইতে—হৃদয়ের ভক্তির অর্ঘ্য অর্পণ করিতে। হিমাদ্রি-শৈল-শিখরে-গিরিরাজ-সুতা-দশভুজার অর্চ্চনা দেখিলাম। কাগঝোরা ঝরণার জলে প্রতিমা বিসর্জ্জন হইবে—দেখিতে গেলাম। মাটী দ্বারা বাঁধ প্রস্তুত করিয়া জল অবরুদ্ধ

করিয়া রাখা হইয়াছে। অতি কষ্টে প্রতিমাটী নীচে নামাইয়া দেড় হাত দু' হাত জলে বিসর্জ্জন দেওয়া হইল।

একদিন Birch Hill দেখিতে গেলাম। Mall-এর রাস্তা অতিক্রম করিয়া Government House-এর পাশ দিয়া ঐ পাহাড়ে যাইতে হয়। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম রাস্তা ততই খাড়া এবং দুই পার্শ্বের বনজঙ্গলও নিবিড় বোধ হইতে লাগিল। অনেক স্থান দেখিলাম যেখানে সূর্য্যদেব একেবারেই প্রবেশ করিতে পারেন না। আমরা ছায়াপূর্ণ তরু-বীথির নীচ দিয়া চলিতে লাগিলাম। আঁকা বাঁকা বহু সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়া এই পাহাড়ে উঠা যায়। কতকগুলি রাস্তা দেখিলাম বনজঙ্গল কাটিয়া নূতন প্রস্তুত করা হইতেছে। উপরে Birch Hill Park, নানারকম ফুল ফুটিয়া আছে। Parkটীতে দোল খাইবারও ব্যবস্থা আছে। নিম্নে লিবঙ্গের ঘোড়দৌড়ের মাঠ অতি ক্ষুদ্র দেখাইতেছিল। চারিদিকেই বহু চা-বাগান। এখানে অনেকে বন ভোজন করিতে আসেন—চুল্লীর বন্দোবস্তও আছে। ভিন্ন রাস্তা দিয়া নীচে নামিতে লাগিলাম। Forest আফিসের দুই একজন বড় কর্ম্মচারীর বাসা পথে পড়িল। চা বাগান কোনও দিন দেখি নাই, ইচ্ছা হইল বহু নিম্নস্থ বাগানগুলি দেখিয়া ঐ রাস্তায় বাসায় ফিরিব। ইংরেজদের গোরস্থানের ভিতর দিয়া নীচে নামিতেই এক বৃদ্ধ সাহেবের সহিত দেখা হইল। আমাদের অভিপ্রায় জানাইতে, তিনি উত্তর করিলেন, "You are very bold men, I see." আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম "Why do you call us bold? সাহেবটী উত্তর করিলেন, "You want to take this long and tedious road. It is half past eleven now. When do you like to reach home? "আমরা উত্তর করিলাম, "No matter when we reach home. We are strange in this absolutely strange land. The steeper the road, the longer the journey, the more we enjoy. And we have come here for sight-seeing. একটু হাসিয়া সাহেবটী বেশ ধৈর্য্যের সহিত রাস্তাঘাট বুঝাইয়া দিলেন। সুবিখ্যাত Happy Valley Tea Estate এর ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম। ঢালু পাহাড়ের গায় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে চা-গাছগুলি রোপিত হইয়াছে। গাছগুলি দু' আড়াই হাত উচু হইবে। সাদা ছোট ছোট চা-এর ফুল অনেক ফুটিয়া রহিয়াছে। নবপল্লবিত পত্রগুলি দ্বারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট চা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কুলিরা কি ভাবে কাজ করে দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কোথাও কুলি দেখিতে পাইলাম না। কেবল দুই একটী বাগানে দেখিলাম কয়েকজন কুলি জঙ্গল পরিষ্কার করিতেছে। আমরা অনেকটা নীচে নামিয়া আসিয়াছি, পূর্ব্বেই অনেকটা পাহাড় ভাঙ্গিয়া আসিয়াছিলাম—শ্রান্তি বোধ করিতে লাগিলাম। চা-বাগান হইতে বাহির হইয়া দুই পার্শ্বে স্কোয়াসলতায় বহু ফল ধরিয়াছে দেখিলাম। লাউ, শশা প্রভৃতি গাছও চোখে পড়িল। Botanical Gardenএর ভিতর দিয়া বাসায় ফিরিলাম।

এখানে আসিয়া অবধি পাহাড়ের পশ্চাদ্দেশে কখন সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্ত হয় টের পাই নাই। Tiger Hill হইতে সূর্য্যোদয়ের দৃশ্য নাকি খুবই সুন্দর। য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে অনেকেই এই দৃশ্য দেখিতে আসেন। Tiger Hill দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে প্রায় সাত মাইল দূরে; কয়েক দিন যাবৎ দেখিতে যাইব ভাবিতেছি, কিন্তু কোনও সুযোগ ঘটিয়া উঠিতেছিল না। একদিন আমরা কয়েকজন মিলিয়া যাইবার আয়োজন করিলাম। পূর্ব্বোক্ত ডাক্তার বাবু এবং ঢাকা ও কলিকাতা বারের কয়েকজন উকীলও পার্টিতে ছিলেন। একটা বাস ভাড়া করা গেল। যাইবার উৎসাহ ও উত্তেজনায় রাত্রিতে মোটেই ঘুম হইল না। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সেখানে পৌছিতে হইবে, রাত্রি একটায় রওনা হইলাম। দুই জোড়া মোজা, গোটা চারেক জামা, আণ্ডার-ওয়ার, র‍্যাপার, টুপি, মাফলার প্রভৃতি পরিধান করিয়া শীতের হাত হইতে পরিত্রাণের যথাসম্ভব উপায় করিলাম। কেহ কেহ পুরা সাহেব সাজিয়াও তার উপর একখানা র‍্যাপার লইলেন; কাহারও দেখিলাম ওভার-

কোটের উপর মোটা একটা র‍্যাগ চড়ান। এ যেন সব ল্যাপল্যাণ্ডের অধিবাসী। বাস হইতে জোড়-বাংলায় নামিলাম। এখান হইতে প্রায় সাড়ে তিন মাইল পাহাড়ের পথ হাঁটিয়া ক্রমেই উপরে উঠিতে লাগিলাম। সঙ্গে দুইটা টর্চ্চ-লাইট ছিল। একজন সুগায়ক ছিলেন, গান ধরিলেন। হাস্য কৌতুকে, গল্প গুজবে ক্লেশ বিশেষ বুঝিলাম না। শুক্লপক্ষ হইলেও চন্দ্র তখন অস্তমিত হইয়াছে। আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল, নক্ষত্র-খচিত এমন সুনির্ম্মল আকাশ দার্জ্জিলিঙ্গে প্রায়ই দেখা যায় না। পূর্ব্বদিনে সারাদিন রৌদ্র দেখা গিয়াছে বলিয়াই আমরা ঐ সময়ে সূর্য্যোদয় দেখিতে যাইব স্থির করিয়াছিলাম। উভয় পার্শ্বে নিবিড় অরণ্যানীর ভিতর সূচীভেদ্য অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। ঘন-বিন্যস্ত বৃক্ষরাজির শীর্ষভাগ অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাইতেছিল। একপার্শ্বে অভ্র-ভেদী পর্ব্বত-গাত্রে ঘুমন্ত গাছের সারি, আর একদিকে অতলস্পর্শী গভীর খাত। রাস্তা অতি সঙ্কীর্ণ, পা পিছলাইলেই Tiger Hillএর সূর্য্যোদয় দেখা এইখানেই শেষ হইবে।

"দুর্গমগিরি…লঙ্ঘিতে হবে, যাত্রীরা হুশিয়ার" বলিয়া যাত্রীদের সাবধান করা হইতেছিল। শুনিলাম ভল্লুক ও চিতাবাঘ এই পথে সময় সময় দেখা যায়—গা ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল। চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। কোথাও নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ঝিল্লী ঝিঁ ঝিঁ রব করিতেছে; কোথাও অদৃশ্য ঝরণার কল কল শব্দ। দুই মাইল আড়াই মাইল পথ অতিক্রম করার পর পথ এত খাড়া যে উপরে উঠা ক্রমেই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল; মনে হইতেছিল একটা পঞ্চাশ তালা বাড়ীর সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতেছি। এইরূপ পথ প্রায় এক মাইল চলার পর আমরা গন্তব্যস্থানে পৌছিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। Tiger Hill এর উচ্চতা ৮,৫১৪ ফুট। আলোক-মালা-শোভিত দার্জ্জিলিঙ্গ মনে হইতেছিল আমাদের অতি সন্নিকটে এবং কয়েক মিনিটেই পৌঁছান যায়।

সূর্য্যোদয় দেখিবার জন্য পাহাড়ের উপর ছোট একটী ইষ্টক গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে; ছাদের উপর হইতে সূর্য্যোদয় দেখিতে হয়। স্থানটী সঙ্কীর্ণ, বেশী লোক একসঙ্গে দাঁড়াইতে পারে না এবং সময় সময় ভিড় এবং ঠেলাঠেলিও বেশ হয়। আমরাই সর্ব্বপ্রথমে সেখানে পৌঁছিয়াছিলাম। পাছে স্থানাভাব হয় এই ভয়ে উন্মুক্ত স্থানে ছাদের উপর ভোরের প্রতীক্ষায় অত রাত্রে বসিয়া রহিলাম। সঙ্গে কিছু পুরাতন খবরের কাগজ নিয়াছিলাম, আগুন জ্বালিয়া হাত পা সেকিলাম। কিছুক্ষণ থাকার পর হাত পা খুব কণ কণ করিতে লাগিল, গা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং শীতে আমাদের এইবার বেশ কষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমেই লোক সমাগম হইতে লাগিল। ভোর হইবার পূর্ব্বেই দেখি "ন স্থানং তিলধারণম্।" দুইজন জাপানী ছিলেন, সাহেব মেমের সংখ্যাও কম নয়। কখন ভোর হয় এই প্রতীক্ষায় সকলেই বসিয়া আছি, মনে কত কি সন্দেহ জাগিতেছে—সূর্য্যোদয় দেখিতে না পাইলে এতটা শ্রম সব পণ্ড হইয়া যাইবে। আরও কিছুক্ষণ কাটিল। কয়েকজন রমণী সুললিত কণ্ঠে সূর্য্যদেবের একটী স্তবগান করিলেন। গানটী খুবই মধুর এবং মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। একজন হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—ঐ এভারেষ্ট দেখা যাইতেছে। সকলেই সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া দেখিলাম হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চশৃঙ্গ গৌরীশঙ্করের কয়েকটী মাত্র চূড়া দেখা যাইতেছে এবং তাহাও অতি অস্পষ্টভাবে। চূড়াগুলি ঈষৎ লোহিতাভ মনে হইতেছিল। কিছু বেলা হইলে একজন আরমেনিয়ান মহিলার নিকট হইতে একটী দূরবীক্ষণ যন্ত্র লইয়া গৌরীশঙ্কর দেখিয়াছিলাম। এই সেই গৌরীশৃঙ্গ যাহার অভিযানে কত ইংরেজ, আমেরিকান, ইটালীয় প্রভৃতি নির্ভীক পাশ্চাত্যজাতি দলে দলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ম্যালোরি ও আরভিং ২৭,৫০০ ফুট উচ্চে উঠিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। গৌরীশঙ্করের উচ্চতা ২৯,০০২ ফুট এবং ইহা দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে ১০৭ মাইল দূরে অবস্থিত।

আরও কিছুক্ষণ কাটিল; সংশয়াকুল চিত্তে আমরা সকলেই প্রতিমুহূর্ত্ত কাটাইতেছি। ক্রমেই মেঘ ও কুয়াসা চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিল—সূর্য্যোদয় দেখিতে পাইব এই আশা একেবারে ছাড়িয়াই দিয়াছিলাম। মনটা খুবই দমিয়া গেল। হঠাৎ দেখিলাম দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া একটী

সোনার থালার মত, ধীরে ধীরে পাহাড়ের পশ্চাদ্দেশ হইতে সূর্য্যদেব উঠিতেছেন এবং লাল, নীল, হরিৎ, পীত প্রভৃতি কত বিচিত্র বর্ণ পূর্ব্বাকাশে প্রতিমুহূর্ত্তেই ছায়াচিত্রের দৃশ্যের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এ যেন রঙের একটা মেলা বসিয়া গিয়াছে। আকাশের গায়, পাহাড়ের আশে পাশে, আলোয় আলোয় গলাগলি, রঙে রঙে কোলাকুলি—বিচিত্র বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া প্রমোদ-মত্ত সুরবালারা যেন নন্দনবনে লুকোচুরি খেলিতেছে। বালারুণের স্নিগ্ধ, কান্ত, চূর্ণ রশ্মিগুলি সুন্দর উজ্জ্বল, প্রশান্ত প্রভাতের নির্ম্মল, মুক্ত, উদার ব্যোমপথে কত বিচিত্র বর্ণে প্রতিফলিত ও বিচ্ছুরিত হইয়া দর্শকের মন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রসে অভিষিক্ত করিতেছিল। পূর্ব্বাকাশে আঁকিয়া বাঁকিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত কতকগুলি গলিত স্বর্ণের নদী বহিয়া যাইতেছে। চারিদিকে সূর্য্যরশ্মি পড়ায় দিগ্বলয় এক অপূর্ব্ব দৃশ্য-ধারণ করিয়াছে। একটীর পর একটী কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গ নয়নপথে পতিত হইতেছিল; ক্রমে যোজন-বিস্তৃত শুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘা আকাশের একদিক জুড়িয়া দাঁড়াইল। প্রথম প্রভাত-সূর্য্য-কিরণ-সম্পাতে সহসা দেখিলাম কাঞ্চন-জঙ্ঘার একটী শৃঙ্গ স্বর্ণ বর্ণ ধারণ করিয়াছে তারপর আর একটী—তারপর আর একটী—নিমিষেই সবগুলি শৃঙ্গ কনকাঞ্চিত হইয়া গেল। সত্যসত্যই কাঞ্চনজঙ্ঘা সোনার পাহাড়ে পরিণত হইল—কাঞ্চনজঙ্ঘা নামের সার্থকতা বুঝিলাম। মুক্ত, উদার, বিরাট গগনের চন্দ্রাতপতলে হিমগিরির তুঙ্গ শৃঙ্গে, আঁধার ও আলোকের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া সূর্য্যোদয়ের অপূর্ব্ব শোভা মুগ্ধ ও বিহ্বলচিত্তে নয়ন ভরিয়া পান করিলাম। যে দৃশ্য দেখিয়াছি, যে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছি, জীবনে তাহা ভুলিতে পারিব না; আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে এ সৌন্দর্য্যের শতাংশও বুঝাইয়া বলিতে পারিব না। এমন সৌন্দর্য্য কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবারও নয়, স্বচক্ষে দেখিবার জিনিষ—অনুভূতির জিনিষ। এ সৌন্দর্য্য দেখিলে—এই ভীমকান্ত অনির্ব্বচনীয় রূপ প্রত্যক্ষ করিলে আমাদের কল্পনার ক্ষেত্র সুদূর প্রসারিত হইয়া যায়—অভিভূত মন চিরদিনের অভ্যাস ভুলিয়া গ্রহে গ্রহে, ছায়াপথের বীথিপথে তারায় তারায়, নীহারিকার অস্ফুট অন্ধকারে ধ্যানধনের সন্ধান করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ে। বারম্বার মনে পড়ে তাঁহাকে যিনি এই বিরাট বিশ্বশিল্পের রচয়িতা; বিপুল সম্ভ্রমে ও বিস্ময়ে সেই নিখিল শরণের চরণোপান্তে মস্তক স্বতঃই নত হইয়া পড়ে। বুঝিলাম পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে কেন লোকে Tiger Hillএর সূর্য্যোদয়ের দৃশ্য দেখিতে আসেন। সৌন্দর্য্য-পিপাসা মানব মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহান্ তাহাই মানব মনকে আকর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারে না। পর্ব্বত-গাত্রে কোথাও বরফের নদীর মত শুভ্রমেঘগুলি ভাসিয়া যাইতেছে, কোথাও কুয়াসা আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিতেছে, পরমুহূর্ত্তেই আবার কোনও পর্ব্বতশৃঙ্গ সূর্য্যকরোদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, কোথাও ধূসর, ধূম্র, পাহাড়গুলি অপূর্ব্ব মহিমায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। একটীর পর একটী চলচ্চিত্রের ন্যায় কত বিচিত্র দৃশ্য নয়নপথে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। মহাযোগীশ্বরের ন্যায় গিরিরাজ মৌনভাবে প্রকৃতির লীলা-নিকেতনে অচল আসনে বসিয়া কতকাল ধরিয়া এই অপূর্ব্ব লীলা দর্শন করিতেছেন কে জানে? কিছু বেলা হইলে আমরা দুই ধারের নয়ন-বিমোহন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বাসা অভিমুখে ফিরিলাম। পৌঁছিতে প্রায় দশটা বাজিয়া গেল।

ভিক্টোরিয়া প্রপাত, বোটানিক্যাল গার্ডেন, হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কীম প্রভৃতি এখানে আরও দর্শনীয় জিনিষ আছে। এখানকার মিউজিয়মটী অতি ছোট। জনাকীর্ণ হাটবাজার, রাস্তাঘাট অপেক্ষা, জলা পাহাড়, কাটাপাহাড় ও কত নাম-না-জানা পাহাড়ের নির্জ্জন পথে পথে, প্রকৃতির ছায়া-সুনিবিড় রম্য কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরিয়াই বেশী আনন্দ পাইতাম। এই শৈল-বিহারের স্মৃতি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না—আমার মনের মণিকক্ষে দুর্ল্লভ রত্নের মতই তাহা চিরদিনের জন্য সঞ্চিত থাকিবে।

শ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ রায়

# প্রমোদ-কুঞ্জ

শ্রীমতী পুষ্পময়ী বসু এম-এ

ফুলের বাগান।

প্রত্যেকটি কেয়ারীতে কেয়ারীতে, প্রতিটি গাছের আশে পাশে, ও লঘুছন্দে নেচে নেচে ঘুরে বেড়ায়। ফোটা ফুলের অজস্র প্রাচুর্য্য, মিষ্টিগন্ধের একটা আমেজ—। রূপ, রস, গন্ধের এই আমন্ত্রণ নারীর মনে আনন্দের হিল্লোল জাগায়।

দুহাত ভরে ও ফুল তোলে ·······।

········ধীরে, ধীরে অতি ধীরে, পাণ্ডুর, বিবর্ণ অথচ সুস্পষ্ট মূর্ত্তি নিয়ে 'কর্ত্তব্য' এসে দাঁড়ায় ওর সামনে·····। নারীর ফুল তোলা হঠাৎ থেমে যায়। কিন্তু হাতের তোলা-ফুলগুলি নিয়ে হেসে ও ফুলের ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

·········আরো বিবর্ণ, আরো পাণ্ডুর মুখ নিয়ে। কর্ত্তব্য আবার আসে, ওর চোখের দিকে তাকায়, কিন্তু ও মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। শেষ পর্য্যন্ত ওই করুণ শুভ্রতা ওর চোখ এড়ায়না। হাত মেলে সব চাইতে সুন্দর ফুলটি ও পেছনে রেখে যায় নীরবে।

········আবার আসে। এধারে নারীর বুকে কিসের দোলা লাগে—আর্ত্তনাদ ক'রে উঠে নতশিরে ও বাগানের খোলা দরজার দিকে পা বাড়ায়—কি জানি কেন। ছোট ছোট আলোর টুকরোগুলি ফুলের বুকে নাচে—পেছন ফিরে তাই দেখে, আর এক না-জানা-বেদনায় ওর চোখে অশ্রুর বন্যা নেবে আসে। ধীরে বেরিয়ে চলে যায়—বাগানের দরজাখানি চিরদিনের মত রুদ্ধ হয়ে যায়।

·········ফুলগুলি তখনও ওর হাতে—আর তার একটা মিষ্টি গন্ধ—সেই সীমাহারা মরুভূমির সমস্ত কঠোরতার মধ্যে ওর প্রাণে তখনও একটা আব্‌ছা স্পন্দন তোলে।

·········'কর্ত্তব্য' তবুও আসেই—মুখখানা মৃত্যুর মত স্তব্ধ, বিবর্ণ, প্রাণহীন। এধারে নারী যেন বোঝে সে কি চায়। ধীরে কোমল আঙুলগুলির বাঁধন শিথিল করে ফুলগুলি এক এক করে ঝরিয়ে দেয় বালির নীরসতার ওপর—। পাঁজরাগুলো টন্ টন্ করে ওঠে—এ ফুলের প্রত্যেকটি যে ওর—।

তারপর শূন্য হাতে চলে সামনে—আঁখির পাতা শুষ্ক, দৃষ্টি জ্বালাময়ী। চোখ দুটো যেন ফেটে পড়ে।

কিন্তু কর্ত্তব্যও ছাড়ে না। আবার এসে সামনে দাঁড়ায়। নারী শূন্য হাত দেখায়—আর কি দেবে ও—নাই—ওগো আর কিছুই যে নাই। তবুও—তবুও সে নির্নিমেষ চোখে চেয়েই থাকে অবশেষে·········এবারে নারী ওর হৃদয়খানি খুলে তারই গহন কোণে ছোট্ট একটী কুঁড়ি ও লুকিয়ে রেখেছিল সংগোপনে—তাই উপড়ে নিয়ে তপ্ত বালির বুকে রাখে।

·········লক্ষ্যহারা—পথের বাঁকে ওর করুণ ছায়াখানি মিলিয়ে যায়—আর বালিরাশি তাণ্ডব নৃত্যে মেতে ওঠে।*

---

* Olive Schrener-এর Gardens of Pleasure-এর অনুবাদ।

# জেনারেল ক্ল্যদ্ মার্টিন

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-আর-এস, বি-এল

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

কাউন্ট আশের মত অযোগ্য ব্যক্তিকে নৌবহরের অধ্যক্ষ করিয়া পাঠান ফরাসী সরকারের ঘোর অনুচিত হইয়াছিল। বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিবার মত সাহস তাঁহার ছিলনা। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে করমণ্ডল উপকূলে পোককের সহিত কয়েকটী খণ্ডযুদ্ধে তিনি লিপ্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ২৯শে এপ্রিল

ক্ল্যদ্ মার্টিন

এবং ১লা আগষ্টের জলযুদ্ধই উল্লেখযোগ্য। উহাতে কোন পক্ষ সুস্পষ্ট বিজয়লাভ না করিলেও ফরাসী রণপোতগুলিরই সমধিক ক্ষতি হইয়াছিল। লালীর নিষেধ না মানিয়া আশে জাহাজগুলি মেরামতের জন্য মরিশসদ্বীপে লইয়া চলিয়া গেলে মান্দ্রাজ অবরোধকালে লালীকে কতকটা হীনবল হইতে হইয়াছিল এবং পোকক অবরুদ্ধ ইংরাজসেনার জন্য সাহায্য আনয়নকালে বাধাপ্রাপ্ত হন নাই। পর বৎসর আশে পুনরায় বঙ্গোপসাগরে আসিয়া দেখা দিলেও তাঁহারই অক্ষমতার জন্য মসলিপত্তনের পতন হইয়াছিল। ইহার পর ত্রিণকমলির যুদ্ধে ( ১০।৯।১৭৫৯ ) বিপক্ষের নিকট পর্য্যুদস্ত হইয়া তিনি এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। তখন ইংরাজরা জলপথে পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিল। পর বৎসর বন্দীবাসের ভীষণ যুদ্ধে ফরাসীরা পরাজিত হইল, বুসী শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন। ইহার পর প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধেই ইংরাজদের জয় হইতে লাগিল। বিজয়োদ্দীপ্ত ইংরাজসেনা জলে স্থলে পন্দিচেরী অবরোধ করিল। সাগরবক্ষে তাহাদের একাধিপত্য থাকার ফলে ফরাসীদের স্বদেশ হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির আশা ছিলনা। অর্থ ও সামর্থ্যহীন লালী অসন্তুষ্ট সেনাদল লইয়া বিষম বিপদে পড়িলেন। কিন্তু এ অবস্থাতেও তিনি অসমসাহসে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। ইংরাজরা বাহুবলে পন্দিচেরী অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই। দীর্ঘ অবরোধের পর খাদ্যাভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ফরাসীসেনা শত্রুকরে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল (১৭।১।১৭৬১)। অবরোধকালে অধিবাসীগণ অশ্ব, গর্দ্দভ, কুকুর, বিড়াল যাহা পাইয়াছিল তাহাই উদরসাৎ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে বাধ্য হইয়াছিল। শুনা যায় একটি দেশীয় কুকুর তখন চব্বিশ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। ইংরাজরা চন্দননগরের মত পন্দিচেরীর দুর্গপ্রাচীরও সমূলে উৎখাত করিয়া ফেলিলেন। তখন গিঞ্জিছাড়া ফরাসীদের এদেশে আর কোন অধিকৃত স্থান রহিল না। কিন্তু তাহারও শীঘ্রই পতন হইল।

লালীকে ইংলণ্ডে পাঠান হইল। সেখানে তিনি শুনিলেন

যে ফ্রান্সে তাঁহার নামে বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বদেশদ্রোহের অভিযোগ আরোপিত হইতেছে। ইহাতে কাহারও নিষেধ না মানিয়া তিনি বর্ত্তমান যুদ্ধে নিষ্ক্রিয় থাকিবার অঙ্গীকার দিয়া ইংরাজদিগের নিকট হইতে মুক্তিলাভ করিলেন এবং ফ্রান্সে গিয়া রাজদ্বারে বিচারপ্রার্থী হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে ধৃত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল। দুই বৎসর পরে তাঁহার বিচার আরম্ভ হইল। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বিচারের নামে প্রহসনের * পর লালীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। ১২ই মে ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত আদেশ কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। লালীর প্রাণদণ্ড এদেশে সুপরিচিত নন্দকুমারের ফাঁসির মত বিচারের নামে নরহত্যা ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। তাঁহার অপর সহস্র দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি স্বদেশদ্রোহী বা বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। ভারতবর্ষে পরাজয়ের জন্য তিনি একা দায়ী ছিলেন না। অপর্য্যাপ্ত সৈন্য লইয়া মান্দ্রাজ অবরোধে প্রবৃত্ত হওয়াই তাঁহার ব্যর্থতার প্রধান কারণ; সে কথা ক্লাইভ, ফোর্ড এবং পোকক সকলেই বলিয়াছিলেন। কিন্তু সেজন্য লালী অপেক্ষা ফরাসী গভর্ণমেণ্টের দায়িত্বের পরিমাণ অধিক। পন্দিচেরীর গভর্ণর ও কাউন্সিলের তাঁহার সহিত সহযোগিতার অভাব, অধস্তন ব্যক্তিবৃন্দের কর্ত্তব্যচ্যুতি, নৌবহরের অধ্যক্ষের ভীরুতা এ সকলও তাঁহার ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। ঘোর প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তিনি যেভাবে দীর্ঘকাল যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার বীরত্বের ও কৃতিত্বের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কথিত আছে লালী যখন মান্দ্রাজ অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তখন পন্দিচেরীর কর্তৃপক্ষীয়গণ স্পষ্টই তাঁহার অসাফল্যে উল্লাস প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাদল এক বৎসরেরও অধিক কাল বেতন না পাইয়া বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল; তাহাদের পরিচ্ছদ ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের উদর পূরিয়া আহার জুটিত না, না ছিল তাহাদের পর্য্যাপ্ত গোলাগুলি বারুদের সংস্থান;—তবুও এ অবস্থায় যে যুদ্ধ এত দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়াছিল ইংরাজ সেনাপতি কূট বলেন তাহার একমাত্র কারণ লালী। তাঁহার স্বদেশীয়গণের মধ্যে যাহারা তাঁহার উচ্ছেদ কামনা করিত তাহারাই সুধু তাঁহাকে দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, অযোগ্য বলিয়া চিত্রিত করিয়াছিল। ভারতবর্ষে পরাজয়ের জন্য ফ্রান্সের সকলে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলে মন্ত্রিসভা সকল অপরাধের বোঝা লালীর স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছিলেন এবং দুর্ব্বল পঞ্চদশ লুই অর্দ্ধ-বিদেশী সৈনিককে রক্ষা করিবার চেষ্টা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে পারীনগরীর সন্ধির ফলে যুদ্ধের অবসান হইল। ফরাসীরা তাহাদের অধিকৃত রাজ্যসমূহ ফিরিয়া পাইলেও এদেশে তাহাদের সকল শক্তি চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আর তাহাদের মস্তকোত্তোলনের সামর্থ রহিল না। ভারতবর্ষে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় অতঃপর ইংরাজদের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না।

এদেশে ফরাসীদের ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। সাধাণতঃ ইতিহাসে উক্ত হইয়া থাকে যে উভয়পক্ষ বাহুবলে সমকক্ষ হইলেও এবং অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্য শত্রু-পক্ষে থাকিলেও ক্লাইভ, লরেন্স, ফোর্ড, কূট, প্রমুখ ইংরাজ সেনাপতিগণের শ্রেষ্ঠত্বই তাঁহাদের বিজয়লাভের কারণ। উঁহাদের নৈপুণ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছু নাই; কিন্তু শুধু একমাত্র ঐ কারণে ফরাসীদের পরাজয় হইয়াছিল একথা কোনমতে বলা চলে না। তদ্ভিন্ন এ কথাও এখানে বলা প্রয়োজন যে সাহস, বীরত্ব ও সামরিক বিদ্যার জ্ঞানে লালী ও বুসী ইঁহাদের সকলকার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যে ফরাসীরা পরাজিত হইয়াছিল, তাহার কারণ স্বদেশ হইতে আবশ্যকমত সাহায্য ও সহানুভূতির অভাব। ম্যালিসন স্পষ্টভাবেই দেখাইয়াছেন যে ইংরাজ কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ দীর্ঘকাল হইতেই যে কোন প্রকারে হউক ভারতবর্ষে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্পে

* "Nothing whatsoever was proved, except that his conduct did not come up to the very perfection of prudence and wisdom, and that it did display the greatest ardour in the service, the greatest disinterestedness, fidelity and perseverence, with no common share of military talent and of mental resources". Mill's History Bk. IV, Ch. V. p. 265.

উপনীত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের রাজ্যবিস্তারের সকল প্রচেষ্টার শুধু সমর্থন নহে, পরন্তু রীতিমত উৎসাহদান করিতেন; এবং আবশ্যকীয় সর্ব্ববিধ সৈন্য ও অর্থসাহায্য জোগাইতে তাঁহারা সদাই তৎপর ছিলেন। দেশের রাজা হইতে জনসাধারণ সকলেরই কোম্পানীর সকল কার্য্যের প্রতি সবিশেষ সহানুভূতি দেখা যাইত। কিন্তু ফরাসীদের অবস্থা ছিল ঠিক ইহার বিপরীত। ডিরেক্টররা কর্ম্মচারীদের রাজ্যবিস্তারের চেষ্টার সমর্থন করিতেন না। তাঁহারা বারম্বার উঁহাদিগকে উক্ত কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বাণিজ্য ব্যাপারে মনঃসংযোগ করিবার আদেশ দিতেন। ডুপ্লে যাহা কিছু করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে নিজের দায়িত্বে, স্বদেশ হইতে প্রাপ্ত আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াই, সাধন করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের জনসাধারণ কোম্পানীর ব্যাপারে উদাসীন ছিল। ফরাসীরাজের কোম্পানীর প্রতি সহানুভূতি থাকা দূরের কথা, তিনি স্পষ্টই তাহাদের বিরোধী ছিলেন। বোর্ব্বোঁ নৃপতিগণ ইউরোপের রাষ্ট্রনীতি লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, সাম্রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা করিবার তাঁহাদের অবসর কোথায়? ইউরোপীয় রাজনীতির চালবাজির জন্য তাঁহারা কানাডা ও ভারতবর্ষের আধিপত্য শত্রুকরে অবলীলাক্রমে তুলিয়া দিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিলেন না। বোর্ব্বোঁদিগের একটা সুনির্দ্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য বলিয়া কোন জিনিস ছিল না। সাম্রাজ্যস্থাপনের চেষ্টায় ইংলণ্ডের ফ্রান্সই একমাত্র যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। রাইনতীরে সমরে লিপ্ত হইয়া ফ্রান্সের ইংলণ্ডের পাতা ফাঁদে পা দেওয়া উচিত হয় নাই। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স প্রুসিয়ার মিত্ররূপে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া ফ্রেডারিক দি গ্রেটকে সাইলিসিয়া প্রদেশ অধিকারে সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ অবসানে আ-লা-শাপেলের সন্ধিসর্ত্তে ভারতবর্ষে মান্দ্রাজ প্রত্যর্পণ ও কানাডায় ইংরাজ করে কেপব্রেটন সমর্পণ ফরাসীসরকারের সমীচীন হয় নাই। কেপ ব্রেটনের অধিকার পাওয়ার ফলে ফরাসীদের সহিত পুনরায় যুদ্ধ বাধিলে ইংরাজদিগের পক্ষে সমগ্র কানাডা বিজয় করা সহজসাধ্য হইয়াছিল। বার বৎসর পরে ফ্রান্স আবার প্রুসিয়ারাজের নিকট হইতে সেই সাইলিসিয়া প্রদেশ মারিয়া থেরেসাকে পুনরুদ্ধার করিয়া দিবার জন্য অষ্ট্রিয়ার সুহৃদরূপে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। ফলে যুদ্ধকালে প্রুসিয়ার মিত্র ইংলণ্ডের হস্তে ফরাসীরাজ কানাডা ও ভারতবর্ষ উভয়ই হারাইলেন। কিন্তু যখন সন্ধি স্থাপিত হইল তখন পূর্ব্ববর্ত্তী সমরে ইংরাজদিগের মত ফরাসীদিগের কানাডা ও ভারতবর্ষে নিজেদের পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইবার কোনই আগ্রহ পরিলক্ষিত হইল না। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে আবার অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেবারও দীর্ঘ যুদ্ধের পর (১৭৭৮-৮৩) দক্ষিণভারতে মহিশুররাজ হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের এবং ফরাসীদের সম্মিলিত সেনাদল

লা মার্টিনিয়ার—লক্ষ্ণৌ

ইংরাজদিগকে পর্য্যুদস্তপ্রায় করিয়া তুলিলেও ঠিক সাফল্যের মুহূর্ত্তে ফরাসীরাজ ভার্সাইয়ের সন্ধির ফলে পরিশ্রমলব্ধ সকল সুবিধা হেলায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ফলতঃ দূষিত বোর্বোঁ সরকারের ইতিহাস মধ্যে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রকৃত কারণ পাওয়া যাইবে।

ডুপ্লে যে কি অসাধারণ প্রতিভাশালী মনীষী ছিলেন তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। দাক্ষিণাত্যে ফরাসী প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা তিনি শুধু স্বীয় অনন্যসাধারণ শক্তি ভরে করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ডুপ্লে-ফতেহাবাদ জয়স্তম্ভের প্রত্যেকটী উপলখণ্ড তাঁহার স্বহস্ত আহৃত ও সযত্নবিন্যস্ত। উহার পরিকল্পনায় বা নির্ম্মাণে অপর কাহারও অংশ ছিল না। ফরাসীদের দুর্ভাগ্য, তাহারা ডুপ্লের মর্য্যাদা বোঝে নাই। ডুপ্লে, লালী ও লাবোর্দ্দোনের সহিত ফরাসীদের ব্যবহার এবং ক্লাইভ, ওয়ারেণ হেষ্টিংস এবং ওয়েলেসলির সহিত ইংরাজদিগের ব্যবহার হইতে উভয়জাতির পার্থক্য এবং ব্যর্থতা ও সাফল্যের কারণ প্রতীয়মান হইবে।

ভারতবর্ষে আগমন হইতে পন্দিচেরীর পতন পর্য্যন্ত দশ বৎসরব্যাপী কালের মধ্যে সংঘটিত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কর্ণাটিক সমরের অনেক যুদ্ধে মার্টিন প্রথমে সাধারণ সৈনিক এবং পরে নন-কমিশণ্ড অফিসররূপে উপস্থিত ছিলেন। তখনকার দিনে সরকারী কাগজপত্রে অধস্তন সৈনিকদের কার্য্যের বিবরণ যথাসম্ভব ভাবে রক্ষিত হইবার প্রথা ছিল না। এজন্য মার্টিনের জীবনের এই সময়ের সকল কথা জানা নাই। নানা বিভিন্ন সূত্র হইতে সামান্য যেটুকু জানা যায় তাহা বলা যাইতেছে। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি গভর্ণরের দেহরক্ষীদলে একজন সওয়ার ছিলেন। পরে তিনি Cavalry d'Aumont নামক রেজিমেণ্টে প্রবেশ করেন এবং উহাদের সহিত পোর্টো নোভো নামক স্থানে দুর্গরক্ষায় প্রেরিত হন। ১৭৫৮ সালে তিনি বিখ্যাত "লোরেন রেজিমেণ্টে" প্রবেশ করেন। লালীর কুদ্দালুর ও ফোর্ট সেণ্ট ডেভিড অধিকারে, তাঞ্জোর অভিযানে এবং অন্যান্য বহু খণ্ডযুদ্ধে তিনি সবিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। কর্ণেল ফোর্ড মসলিপত্তন অবরোধে প্রবৃত্ত হইলে বিপন্ন ফরাসীসেনার সাহায্যে পন্দিচেরী হইতে এক অভিযান পাঠান হইয়াছিল। এক পল্টন অশ্বারোহীসৈন্যের সার্জ্জেণ্ট-মেজররূপে মার্টিনও এই দলে ছিলেন। এই অভিযানের বিবরণ মার্টিনের সহকর্ম্মী মাদেক প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে; পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। বহু ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর উভয় সুহৃদশত্রু কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ পন্দিচেরীতে গোপনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পন্দিচেরীর পতনের পর অপরাপর বহু ফরাসীসৈনিকের মত মার্টিন ও মাদেকের জীবনের গতি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইল।

মার্টিন ঠিক কোন সময়ে ইংরাজের কর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কীণ পন্দিচেরীর পতনের পূর্ব্বেই ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে তাহার কালনির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন তখনকার দিনের প্রথামত মার্টিন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের চুক্তিতে সেনাবিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মেয়াদের সময় অতিক্রান্ত হইলে তিনি উচ্চবংশসম্ভূত নহেন বলিয়া ফরাসী সেনাদলে আশানুরূপ পদোন্নতিলাভ সম্ভব নহে দেখিয়া আর নূতন করিয়া সর্ত্তবদ্ধ না হইয়া ইংরাজদের কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে লজ্জা বা অসম্মানজনক কিছু ছিল না। সুতরাং তাঁহাকে স্বজাতিদ্রোহী বা নিয়োগত্যাগী পলাতক সৈনিক (deserter) বলা অনুচিত। এখানে বলা প্রয়োজন যে এ মতের পোষক কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। স্বদেশের সেনাবিভাগে পদোন্নতিলাভ কঠিন হইলে ইংরাজ সেনাবিভাগে বিদেশীর পক্ষে তাহা যে আরও সুকঠিন তাহা সহজেই অনুমেয়। তখনকার দিনে বৃটিশ সেনাদলে বিদেশীর অভাব না থাকিলেও কর্ত্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ ছিল যে তাহাদের মেজর অপেক্ষা উচ্চতর পদ কোনমতে দেওয়া হইবে না। অধিকাংশ লেখকের মতে পন্দিচেরী অবরোধকালে লালীর যে বডিগার্ডদল বিদ্রোহ করিয়া শত্রুশিবিরে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিল ক্ল্যাদ মার্টিনও তাহাদের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু এ কথাও সত্য নহে বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে।

লালীর কঠোর শাসনে উত্যক্ত হইয়া সামরিক বা বে-সামরিক অনেক ব্যক্তিই শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে শত্রুপক্ষে যোগদান করিয়া স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে কুণ্ঠিত হয় নাই।

পন্দিচেরী অবরোধকালে মার্টিন নামক দুই ব্যক্তি কর্ণেল আয়ার কূটের নিকট আশ্রয় লইয়াছিল। উহাদের সম্বন্ধে তিনি ১৪ই মে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের গভর্ণরকে লিখিয়াছিলেন, —"আমার নিকট মার্টিন নামক দুইজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। মিঃ লালী ইঁহাদের সহিত অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন। * এই দুই ব্যক্তিকে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া আমার মনে হয়। উহারা ইহার মধ্যেই আমার যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন এবং যে কোন বিপজ্জনক কার্য্যে যাইতে প্রস্তুত আছেন। ফরাসী পলাতকসৈন্য লইয়া গঠিত দলটীর নেতৃত্বে আমি ইহাদের একজনকে আমাদের সেনাবিভাগে কোন কমিসন বা পদ না দিয়া শুধু লেফটেনাণ্টের এবং অপর ব্যক্তিকে এনসাইনের বেতন দিয়া নিযুক্ত করিব স্থির করিয়াছি। আশা করি ইহাতে আপনার কোন আপত্তি হইবে না। আমার মতে এই ধরণের লোকদিগকে কার্য্যে লাগাইবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়।" ঐ দলে প্রায় ৬০ জন ফরাসী সৈন্য ছিল। পার্ম্মা কোয়েল, বিল্লপুরম্, থিয়াগার এবং গিঞ্জির যুদ্ধে উহারা স্বজাতির বিরুদ্ধে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। স্বজাতিদ্রোহী ঐ দুই মার্টিনের পূর্ণ নাম এবং পরবর্ত্তী ইতিহাস অজ্ঞাত। পন্দিচেরীর অবরোধকালে লালীর বডিগার্ডদল বিদ্রোহ করিয়া শত্রুশিবিরে পলায়ন করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যেও মার্টিন নামক একাধিক ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ক্লাদ মার্টিন বিখ্যাত "লোরেন রেজিমেণ্টে"র অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। উহারা কখনও কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হয় নাই; খাদ্যাভাবে শেষ মুহূর্ত্তে বাধ্য হইয়া শত্রুকরে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। উত্তরকালে ক্লাদমার্টিন প্রসিদ্ধি লাভ করায় এবং তাঁহার প্রথম জীবনের ইতিহাস সবিশেষ জানা না থাকায় অনেকেই তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন মার্টিনের অন্যতম বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপে অন্যের কাহিনী তাঁহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়া ক্লাদের প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত করিয়া তুলিয়াছিল। আধুনিককালে ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধানের ফলে তাঁহার প্রকৃত ইতিহাস জানা গিয়াছে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে।

ইংরাজরা তাঁহাদের সমস্ত বন্দীগণকে মান্দ্রাজে আনিলেন। তাঁহাদের নিকট তখন প্রায় দুই সহস্র ফরাসী বন্দী ছিল। উহাদের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিনশত ব্যক্তি স্বদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য করা হইবে না ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এ প্রকার অঙ্গীকার পাইয়া কারাগারে কষ্টভোগ করা অপেক্ষা তাঁহাদের কর্ম্ম গ্রহণ শ্রেয় বিবেচনা করিয়াছিল। উহাদের তিনটী দলে ভাগ করা হইল। প্রথম যে দলটী গঠিত হইয়াছিল তাহা পলাতকগণের মধ্য হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল; ইহাতে ১০৯ জন সৈন্য ছিল। ইহাদের অধিনায়কত্বে নিযুক্ত করিবার মত কোন ইংরাজ অফিসার পাওয়া সম্ভব না হওয়ায় বন্দীদের মধ্য হইতে, সম্ভবতঃ উপরিওয়ালাদের সুপারিশে, একজন তরুণবয়স্ক, কর্ম্মঠ, নন-কমিশণ্ড সৈনিকপুরুষকে সাময়িক ভাবে লেফটেনাণ্ট পদের বেতন দিয়া নিযুক্ত করা হইল। ইনিই ক্লাদ মার্টিন। বিজেতৃপক্ষের উর্দ্দি পরিয়াই যে ফরাসীরা বন্দীদশা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল তাহা নহে; কারণ সমরনিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত উহারা যুদ্ধবন্দী ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট যে কোন মুহূর্ত্তে দল ভাঙ্গিয়া দিয়া উহাদের কারাগারে পুনর্নিক্ষেপ করিতে পারিতেন। প্রধানতঃ বঙ্গদেশে দেশীয়গণের বিরুদ্ধে তাহাদের নিযুক্ত করা হইবে এই আশ্বাস পাইয়া উহারা কারাগারের

* তখনকার দিনে এ ধরণের ব্যাপার খুব সাধারণ ছিল। উর্দ্ধতন ব্যক্তির নিকট নিজেকে অপমানিত বিবেচনা করিয়া সে যুগে অনেকেই শত্রুপক্ষে যোগ দিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে সঙ্কোচ বোধ করিত না। নবাব সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা অধিকারকালে ইংরাজ সেনাদলে লেফ্‌টনাণ্ট লেবোম নামক জনৈক ফরাসী সৈনিকের নাম দেখা যায়। কলিকাতার পতনের পর ম্যানিংহাম ও উহার মারফৎ সে সংবাদ ফলতা হইতে মান্দ্রাজ পাঠান হইয়াছিল। শুনা যায় ঐ ব্যক্তি আত্মসম্মানে আঘাত লাগায় চন্দননগর ছাড়িয়া ইংরাজের কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিল। পর বৎসর টেরেনু নামক ঐরূপ একটী আত্মমর্য্যাদাশীল সৈনিক গুপ্তপথের সন্ধান দেওয়াতেই ক্লাইভ ও ওয়াটসনের পক্ষে চন্দননগর অধিকার করা সম্ভব হইয়াছিল। মার্টিন ও মাদেক যখন মসলিপত্তন উদ্ধারে যাত্রা করিয়াছিলেন তখন তাঁহাদের দলে ৮০ জন ইংরাজ সৈনিক ছিল শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া উহারা তাহাদের কারাগার অপেক্ষা সেনাদল পছন্দ করিয়াছিল।

কঠোরতা অপেক্ষা ইংরাজদের কর্ম্ম নির্ব্বাচন করিয়াছিল এই মাত্র। কূট সাহেবের গঠিত দলের মত এই ফরাসী কোম্পানীকে স্বজাতিদ্রোহী আখ্যায় অভিহিত করা যায় না।

"ফতে সালাম" নামক জাহাজ যোগে অন্যান্য রেজিমেন্টের সহিত মার্টিনের কোম্পানীও মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে পথিমধ্যে উক্ত পোত জলমগ্ন হওয়ায় আরোহীগণের মধ্যে অনেকে সলিলসমাধি লাভ করিয়াছিল। মার্টিনের সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে অনেকে নৌকাযোগে কূলে অবতরণ করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহাতে প্রীত হইয়া কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে আর একদল সৈন্য আনিবার জন্য পুনরায় মান্দ্রাজ পাঠাইলেন। এই দ্বিতীয় কোম্পানীতে ১০৫ জন সৈন্য ছিল, ইহারা সকলেই যুদ্ধে বন্দী হইয়াছিল। মাদেক এই দলে সার্জ্জেন্ট ছিলেন। পরবৎসর অর্থাৎ ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ইহারা "নরফোক" জাহাজে কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হইল। ইংরাজরা যখন তাঁহাদের বন্দীদিগকে এইভাবে কার্য্যে লাগাইতেছিলেন তখন ফরাসী এডমিরাল পালিয়ের-ও তাঁহার হস্তে পতিত ইংরাজ নৌসেনা ও মাল্লাদিগকে লইয়া বিব্রত বোধ করিতেছিলেন। অপরিসর জাহাজ মধ্যে আহত ও পীড়িতদের যথোচিত পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। অনর্থক লোকক্ষয় নিবারণার্থ তিনি উহাদের সকলকে ছাড়িয়া দিলেন এবং সমসংখ্যক ফরাসীবন্দীকে মুক্তি দিয়া মরিশসদ্বীপে পাঠাইয়া দিবার জন্য ইংরাজদিগকে বলিলেন। তদনুসারে তাঁহারা একদল ব্যক্তিকে "Ganges" নামক জাহাজে করিয়া রওনা করিয়া দিলেন। জাহাজটী নিতান্ত জরাজীর্ণ এবং সাগর যাত্রার একান্ত অনুপযুক্ত ছিল। উত্তালতরঙ্গমালাসঙ্কুল দীর্ঘপথ উহাতে পাড়ি দিতে ফরাসীরা ভরসা না করিয়া সাগরদ্বীপ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল; ক্ল্যদ মার্টিনও এই দলে ছিলেন (এপ্রিল ১৭৬৩)। ফেব্রুয়ারী মাসে ইউরোপে সন্ধিস্থাপিত হইয়াছিল। সে সংবাদ্ আগষ্টমাসে এদেশে আসিয়া পৌছিল। তখন ফরাসী সৈনিকগণ সকলেই বন্দীদশা হইতে মুক্তিলাভ করিল।

যে সকল ফরাসী সৈনিক ইংরাজদের কর্ম্ম লইয়াছিল তাহারা এবার ইচ্ছা করিলে অবসর লইতে পারিত। কিন্তু ঠিক এই সময় (সেপ্টেম্বর ১৭৬৩) মীরকাশিমের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় তাহারা নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে থাকাই পছন্দ করিল। ভারতবর্ষে ফরাসী-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার আশা চিরতরে বিনষ্ট হইয়াছে, আর ইংরাজদের বাধাদানের চেষ্টা নিষ্ফল, ভবিষ্যতে এদেশের আধিপত্য তাঁহাদের অদৃষ্টেই ঘটিবে একথা তখনকার দিনে অন্যান্য অনেকের মত মার্টিনও বুঝিয়াছিলেন। ফরাসী সেনাদলে থাকিয়া এদেশে আর কৃতিত্ব দেখাইবার সম্ভাবনা নাই, স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াও কোন লাভ নাই দেখিয়া মার্টিন বুঝিলেন যে ঘটনাচক্র তাঁহাকে যে অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে চিরকালের মত তাহাতে থাকাই এক্ষণে তাঁহার পক্ষে সমীচীন। ইহার মধ্যে লজ্জাস্কর বা অপমানজনক কিছু নাই অথবা একার্য্যে স্বদেশ বা স্বজাতিদ্রোহিতাও করা হইতেছে না। কারণ ভবিষ্যতে পুনরায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে যুদ্ধ বাধিলে তাঁহাদের স্বদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে বাধ্য করা হইবে না এ আশ্বাস ইংরাজ গভর্ণমেন্ট দিতেছেন। মার্টিনের অবশিষ্ট জীবন অতঃপর ইংরাজের কর্ম্মে অতিবাহিত হয়। কিন্তু তিনি মনে প্রাণে বরাবরই ফরাসী ছিলেন, কখনও জাতীয়তা বিসর্জ্জন দিয়া ইংরাজের প্রজা (naturalised) হন নাই। কর্তৃপক্ষের শত অনুরোধ উপরোধও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। ইংরাজনাগরিকত্ব গ্রহণ করিলে তাঁহার পক্ষে আরও পদোন্নতি অথবা নাইট উপাধিলাভ হয়ত অসম্ভব হইত না। ফ্রান্সকে তিনি বরাবরই স্বদেশ বিবেচনা করিতেন এবং পরিণত বয়সে তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিশ্রাম সুখ-উপভোগের কথা প্রায়ই বলিতেন, যদিও শেষ পর্য্যন্ত অদৃষ্টচক্রে কল্পনা আর কার্য্যে পরিণত হইয়া উঠে নাই। তাঁহার উইলে ফ্রান্সে অবস্থিত ধনসম্পত্তির ব্যবস্থা করিতে তাঁহাকে দেখা যায়। তিনি যে Deserter ছিলেন না ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, কারণ সেরূপ অবস্থায় তিনি ফরাসী নাগরিকের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইতেন এবং তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইত।

মীরকাসিমের সহিত যুদ্ধকালে ফরাসী সৈন্যগণও রণস্থলে প্রেরিত হইয়াছিল। যুদ্ধের বিবরণ সমরু, জাঁতিল ও মাদক প্রসঙ্গে বলা যাইবে। ৫ই সেপ্টেম্বর ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী মার্টিনকে সেনাবিভাগে 'এনসাইন' পদ দিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি লেফটেনাণ্ট পদের বেতন পাইলেও কোন স্থায়ী পদ তাঁহাকে প্রদত্ত হয় নাই। পলাতক মীরকাসিমের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াই ইংরাজবাহিনী কর্ম্মনাশাতীরে আসিয়া উপনীত হইল। জামাতাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলে মীরজাফর সৈন্যদের প্রচুর অর্থ পুরস্কার দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু যথাকালে সে অর্থ প্রদত্ত না হওয়াতে তাহাদের অসন্তোষের সীমা ছিল না। একদিন সমস্ত শ্বেতকায় সৈন্যগণ একযোগে বিদ্রোহ করিয়া শিবির পরিত্যাগ করিল। সৈন্যাধ্যক্ষ মহাশয়কে তাহারা স্পষ্টভাবেই জানাইল যে গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাসভঙ্গ দেখিয়া তাহারা একার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং যতদিন না এ অবিচারের প্রতিকার হইবে ততদিন তাহারা কোন কার্য্য করিবে না। তাহারা অতঃপর প্রতিশ্রুত অর্থ আদায়ের জন্য পাটনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবে একথাও তাঁহাকে বলিল। কাপ্তেন জেনিংস বিপদে পড়িলেন। অবাধ্য সৈন্যদের প্রতি বলপ্রয়োগ করা সম্ভব ছিল না। কাহাকে দিয়াই বা করিবেন? তিনি উহাদের মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে অফিসরগণকে আদেশ দিলেন। কিন্তু মার্টিন, এনসাইন ডেভি ও সার্জ্জেণ্ট এলেন এই তিনজন ভিন্ন অপর কাহারও উত্তেজিত সৈনিকগণের সম্মুখীন হইতে সাহস হইল না। একজন ফরাসীসৈনিক মার্টিনকে নিভৃতে জানাইল টাকার কথাটা ছলমাত্র, সুজাউদ্দৌলার নিকট যাওয়াই তাহাদের আসল অভিপ্রায়; পরে হিন্দুস্থানের অভ্যন্তর প্রদেশে নিজেদের জন্য একটা রাজ্যস্থাপন করা তাহাদের উদ্দেশ্য। মার্টিন যদি তাহাদের সহগামী হন তবে তাহারা তাঁহাকে অধিনায়কত্বে বরণ করিতে প্রস্তুত আছে সে কথাও ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে জানাইল। তাহার কথায় মার্টিন স্তম্ভিত হইলেন। একবার ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের আনুগত্য স্বীকারের পর নিজ প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গিবার পাত্র তিনি ছিলেন না। সৈনিকের কথার কোন স্পষ্ট উত্তর না দিয়া তিনি ধীরে ধীরে পিছাইয়া পড়িলেন এবং সবেগে অশ্বধাবন করিয়া একেবারে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ফরাসীদিগের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া মহাভয়ে ভীত ইংরাজসৈন্যগণ আর অবাধ্যতাচরণ না করিয়া তৎক্ষণাৎ শিবিরে ফিরিল, জর্ম্মণরাও তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। ফিরিল না শুধু দেড়শতজন ফরাসীসৈনিক, মাদেক ও দেলামারের নেতৃত্বে উহারা অযোধ্যা নবাব সকাশে গমন করিয়া তাঁহার কর্ম্মে প্রবেশ করিল।* বিদ্রোহ দমন কার্য্যে মার্টিনের চেষ্টার পুরস্কার স্বরূপ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে লেফটেনাণ্ট পদে উন্নীত করিয়াছিলেন (১৮।৪।১৭৬৪)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

---

* ব্রুম প্রমুখ ইংরাজ লেখকগণ সকলে সার্জ্জেণ্ট দেলামায়কে পলাতক ফরাসী সৈন্যগণের নেতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন জন্য মেজর এডামস তাহাকে একটি কমিশন দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দেহান্তের পর কর্ত্তৃপক্ষ সে কথা মনে না রাখায় ইংরাজদিগের প্রতি তাহার বিরাগ হওয়া স্বাভাবিক। দেলামারের আর কোন উল্লেখ দেখা যায় না। মাদেকের চরিতাখ্যায়ক এমিল বার্ব্বে তাঁহাকে ফরাসীদের অধিনায়ক বলিয়া লিখিয়াছেন। বিদ্রোহ ব্যাপারে ইঁহারা উভয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন মনে করায় কোন বাধা নাই। অতঃপর দলে যে কয়জন সামান্যসংখ্যক ফরাসীসৈনিক অবশিষ্ট রহিল তাহাদের লইয়া মার্টিন কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনে আদিষ্ট হইলেন। পরে আবার বহুব্যক্তি যোগ দেওয়ার ফলে কালক্রমে ইংরাজদের ভৃতিভুক ফরাসীসৈনিকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কাশীরাজ চেতসিংহের সহিত যুদ্ধকালে রামনগর আক্রমণে ফরাসী কোম্পানী বিধ্বস্ত হইয়া যায়। শতাধিক ব্যক্তির মধ্যে মাত্র ১৪ জন কোনমতে রক্ষা পাইয়া চুণারে হেষ্টিংসের নিকট পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

# সন্ধ্যা

## শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা সেন

বড় বাড়ীর ছোট বৌ সে—রং যাই হোক, সুশ্রী গড়ন, তার লক্ষ্মী শ্রীর প্রশংসা একদিন সকলের মুখেই ছিল, আজ কিন্তু তার শ্রীর কথা কেউ বলে না—তার গড়নে আজ অনেক খুঁৎ ধরা পড়ে, আগেই অনেক বুঝেছিল ইত্যাদি।

সন্ধ্যা বিধবা—কোলে ছেলেপুলেও কিছু নেই, খালি হাত পা। নিয়মিত বরাদ্দ রান্না বান্না তো করেই, আরো কত কাজ করে, উদয়াস্ত হাত পা তার কাজ হতে একটু রেহাই পায় না। মুখকে তাই সে রেহাই দিয়েছে—কথা খুব কম বলে। একটু মিষ্টি হাসি—তা সেটুকু সব সময়েই লেগে আছে—শোকও তাকে মলিন করে নাই। ছেলের আবদার। বুড়োর ফাইফরমাস্, সবই সে অম্লানবদনে হাসিমুখে পালন করে।

শ্রাবণ মাস, সারাদিন টিপ টিপ কোরে বৃষ্টি পোড়্ছে, কাল থেকে একবারও রোদের মুখ দেখা যায়নি; ছেলে-পুলের কাঁথা কাপড় শুকোয়নি; বড় বৌয়ের মেজাজ খারাপ হোয়ে আছে। মেজ জাও বাড়ীর গিন্নীর সঙ্গে চিত্রায় ছবি দেখতে যাবেন, সব ঠিক ঠাক। এখন বৃষ্টিটা একটু না ধরলে কি করে চলে, তাঁরও মনটা ভাল লাগছে না। শাশুড়ীর মত হবে না, নতুবা এ আর এমন কি বৃষ্টি, এর চাইতে কত জল-ঝড়ে মানুষে বাইরে যায়, ইত্যাদি নানা রকম কথা অস্পষ্টভাবে বলেই চলেছেন। সন্ধ্যার বাদলা দিন বড় ভাল লাগে—দুপুরের কাজকর্ম্ম সেরে ঘরে যেতে অন্যদিন তার দুপুর পেরিয়ে যায়—আজ বৃষ্টির জন্য একটু আগেই সে ছুটি পেয়েছিল। বিছানায় অলসভাবে শুয়ে শুয়ে রবিবাবুর বর্ষার কয়েকটা কবিতা প'ড়বে ব'লে কাব্য-গ্রন্থখানি বাক্স থেকে বার ক'রে নিল। বই হাতে জানালার ধারটিতে এসে শুয়ে প'ড়ল। এ বইখানা তার স্বামী তাকে উপহার দিয়েছিলেন, স্বামীর দেওয়া অল্প কয়েকটী উপহারের মধ্যে এই বইখানি একটী—কত যত্নেই না সে আজ এগুলিকে নাড়ে চাড়ে। বিয়ের পর কটা দিনই বা রমেন বেঁচেছিল—অন্তরের স্মৃতি-কোটা যেমন সেই কটি দিনকে সে কৃপণের ধনের মত সঞ্চয় ক'রে রেখেছে—রমেনের দেওয়া জিনিষ-গুলিকেও সে তেমনি যত্নে আগ্‌লে রেখেছে। প্রত্যেকটী জিনিষের সঙ্গে কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে—বই হাতে নিয়ে মন তার চ'লে যায় কোন্ অতীতে—কত কল্পনা, কত স্বপ্নের জালই না তারা সেদিন বুনেছিল। একের হৃদয়ে অন্যের প্রবেশ, আনন্দের জোয়ার তাদের দুকূল সেদিন ছাপিয়ে উঠেছিল, বিপুল সম্ভাবনায় তাদের কিশোর মন সংসারে স্বর্গ রচনা ক'রেছিল—আর আজ?

সন্ধ্যার মনে পড়ে বিয়ের পর এমনি এক বাদল দিনে রমেন চুপি চুপি ঘরে ঢুকে সন্ধ্যার খোঁপাটী খুলে দিয়ে ঠাট্টা ক'রে ব'লেছিল—"বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময়ী বেণী। —খুলে দাও, আজকে আর খোঁপা বাঁধে না।" কৌতুকে আনন্দে সন্ধ্যার মুখ খানি রাঙ্গা হয়ে উঠেছিল, কি বল্‌বে ভেবে না পেয়ে সে শুধু ব'লেছিল—"কি কর, কেউ এসে পড়ে যদি—"

রমেন, দুষ্টু রমেন, কোন কথা শোনে নাই। দুরন্ত শিশুর মত জোর কোরে তাকে ছাদে নিয়ে যায়, তারপর চঞ্চল সেই বয়স্ক শিশু দুটীর বৃষ্টিতে সে কি ভেজা, দুরন্ত বাতাসের সঙ্গে ছুটোছুটি—আর জল-ঝড়ের দাপটে লুটোপুটি খেয়ে দুজনে আত্মহারা। হঠাৎ নীচে মায়ের গলার সাড়া পাওয়া যায়,—সন্ধ্যা দ্রুত নেমে আসে, রমেনও সঙ্গে সঙ্গে। সিঁড়ির গোড়ায় মা দাঁড়িয়ে, তাঁর মুখে মৃদু তিরস্কার, বধূ লজ্জায় ঘরে যেতে পথ পায় না। ধরা পড়ে যাওয়ায় সন্ধ্যার সেদিন কি লজ্জা আর সঙ্কোচ, জায়েদের কাছে যেতেও ভয়। রমেন কিন্তু পরোয়া করে না, বরং সন্ধ্যার ভয় দেখে

খুব হাসে। সন্ধ্যা রান্না ঘরে যেতে যেতে শোনে, তাদের এই পাগলামির কথাই হোচ্ছে—সব শোনা যায় না, তবু বোঝে, ছোট দেওর-জায়ের এই ছেলেমানুষি বড় জায়ের বেশ মিষ্টি লাগে। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সাহস ক'রে ঘরে ঢোকে। আজও ভাবতে ভাবতে নিঃশ্বাস পড়ে—তার হতাশ সুরে সন্ধ্যার মনে চমক লাগে। কত প্রভেদ আজ। সেই রমেন যে শুধু দ্বিরাগমনের সময় ছাড়া আর একটা দিনও সন্ধ্যাকে বাপের বাড়ী গিয়ে থাকতে দেয় নাই, কেউ নিতে এলেই মুখ ভার ক'রে, অসুখের ভাণ ক'রে অনর্থ বাধাত,—সে আজ নিজেই এতদূরে কোথায় গিয়ে রইলো? গোণা গুণ্‌তি কটি দিনের মধ্যেই তাদের আনন্দের অবসান হবে, জেনেই বুঝি সে কয়টি দিন সন্ধ্যাকে চোখের আড়াল ক'রতেও চাইত না।

তারপর সন্ধ্যার জীবনে চিরসন্ধ্যা নেমে এল, মৃত্যুর আঁধারে রমেন কোথায় মিলিয়ে গেল—এতটুকু আলোর রেখাও যে এ জীবনে আর দেখা যায় না। ভাবতে ভাবতে মন উদাস হ'য়ে যায়, একের পর এক আর সেই কটি পুরাণো দিনের অতি প্রিয় স্মৃতিগুলি মনের সামনে ভিড় করে আসে, ও ভাবে রমেনের দেওয়া এই বুঝি তার মণিমালা। তাদের ও সম্মানিত অতিথির মত যত্ন ক'রে কাছে বসায়, কাঁদে হাসে, আবার পরম যত্নে সরিয়ে রাখে। জানালার বাইরে আকাশের দিকে ওর চোখ পড়ে—টিপ্‌ টিপ্‌ ক'রে বৃষ্টি এখনও প'ড়ছে—পূবের দিকে এখনও ঘোর কালো মেঘ, এ বৃষ্টি শীগ্‌গির থামার মত নয়—অলস উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে ওর মনে হয় রমেনের কথা—এমনি এক দুপুরে রমেন ওকে বর্ষামঙ্গল পড়িয়ে শুনিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে গুন্‌ গুন্‌ ক'রে কটা গানও শুনিয়েছিল, কি মিষ্টি অথচ গম্ভীর ওর গলাটা ছিল। আপন মনে সন্ধ্যাও গুন্‌ গুন্‌ স্বরে দু-ছত্র গেয়ে চলে,—"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর—" চোখে ওর জলের ধারা।

ওদিকে বাইরে শ্রাবণের জলধারা বেড়ে চলে, শাশুড়ী ডাকেন, "ও ছোট বৌমা, বাদলা দিনে ছেলেদের দুটি গরম ঘুঘনি ভেজে দাওনা মা।" বড় জা ছোট ছেলের কাঁথাগুলি এনে বলেন, "ছোট বৌ, তোর তো খালি হাত পা, দেনা ভাই এগুলি একটু উনুন ধারে শুকিয়ে।" এমনি আরও কত। ছেলে বুড়োর বিবিধ কাজ—সন্ধ্যার সংসারের কাজ মিটে গেছে—হাত পা ঝাড়া মানুষের কি ব'সে থাকা সাজে।

শ্রীস্বর্ণপ্রভা সেন

---

# শেষ-চুম্বন

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কল্লোলিনী ভাগীরথী তীরে,
ধীরে, ধীরে,
সে-দিন যে সন্ধ্যা নেমে এলো,
সমীরণ বহে—এলোমেলো;
বুঝি মোর এ পরাণ সম,
—গাঢ়তম,
দুঃখে অভিভূত।
শুধু পূত,
জাহ্নবীর জল,
প্রিয়ার সে-তনু দেহ স্তব্ধ অচঞ্চল,
তট দেশে।
সেথা এসে,
দাঁড়ানু যখন,
এ-বাহু তখন,
মানিলনা বিঘ্ন কিছু,
হয়ে নীচু,
বাঁধিলো তাহারে নিবিড় বন্ধনে।
নীরব ক্রন্দনে,
ভাঙ্গিয়া পড়িলো বুক।
সেইটুকু,
মনে আছে শুধু;
শেষ-মধু
করেছিনু পান
কানে এসেছিল ভেসে, ভাগীরথী তরঙ্গের গান।

**দেবারু**—উপন্যাস শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত প্রণীত। ২০৪নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে বরেন্দ্র লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত। ২০৮ পৃঃ দাম দেড় টাকা।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত যে কয়টি গল্প ও উপন্যাস প্রকাশ করেছেন, তাতে বাংলার কথা-সাহিত্য যে সমৃদ্ধ হ'য়েছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কথা-সাহিত্যিকের যা' প্রধান গুণ,—কল্পনা-শক্তি ও মানব-জীবনের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি,—সেগুণ যে লেখকের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে আছে, তার পরিচয় তিনি তাঁর প্রত্যেক লেখার মধ্যেই দিয়েছেন। তাঁর কল্পনা-শক্তি ও সমবেদনা অনায়াসেই সমাজের বিভিন্ন স্তরের জীবনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হ'তে পারে, তাই তিনি সমাজের যে স্তর থেকেই তাঁর চরিত্র আহরণ করুন না কেন, তাকে একটা অপরূপ জীবন্ত রসমূর্ত্তি দিতে পারেন।

দেবারু উপন্যাসের নায়ক দেবারু এক কুলেনীর সন্তান। তার পিতা আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন ধনী জমিদার, কিন্তু দেবারুর মায়ের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীপুরুষের সনাতন স্বাভাবিক আকর্ষণ ছাড়া অন্য কোনো সামাজিক সম্বন্ধ ছিল না। এমন অবস্থায় সমাজের যা' ব্যবস্থা,—দেবারু ও তার মায়ের প্রতি সেই ব্যবস্থাই হ'য়েছিল। সে ব্যবস্থা অবশ্যম্ভাবি, সকলকেই,—দেবারুর পিতামাতাকেও এবং পাঠককেও তা বিনাবাক্যে মেনে নিতে হ'য়েছে,—তাই আগাগোড়া উপন্যাসটির ঘটনা সমাবেশের মধ্যে একটা অনির্ব্বচনীয় করুণার সঞ্চার হ'য়েছে। বলা বাহুল্য লেখকের কল্পনা ও সমবেদনা কোথাও বাস্তবের সম্ভাব্যতাকে ছাড়িয়ে যায়নি, তাই উপন্যাসের আগাগোড়া এই করুণ রসটি বড়ই উপভোগের বস্তু। যে দরদ দিয়ে লেখক জন্ম থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত দেবারুকে সৃষ্টি করেছেন, সেই দরদ দিয়েই তিনি তার মাকে, বাবাকে ও বিমাতা বৌরাণীকেও সৃষ্টি করেছেন, তাই উপন্যাসের মধ্যে এই চারটি চরিত্রই বেশ জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে, এবং তাদের সুখদুঃখ পাঠকের চিত্তকে বেশ আকর্ষণ করে। বিশেষতঃ দেবারুর মা, মালতী লেখকের একটি অপরূপ সৃষ্টি। গল্পাংশের বর্ণনা কোথাও সামাজিক বা অন্য কোনো বিষয়ের সমস্যা আলোচনার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়নি, অথচ তা' অনেক কিছু বিষয়ের দিকেই চিন্তাশীল পাঠকের চিন্তার উদ্রেক করে।

উপন্যাসের শেষের দিকে ললিতা ও তার পিতামাতা, এই তিনটি চরিত্রকে নিয়ে এসে লেখক উপন্যাসটিকে ভারাক্রান্ত করেছেন বলেই মনে হয়। তাদের নিয়ে যে কাহিনীটি তিনি রচনা করেছেন, তা উপন্যাসটির মাধুর্য্য বাড়িয়েছে বলে মনে হোলো না। রায়নগরের জমিদার গৃহ থেকে দেবারু যখন বিদায় গ্রহণ করল, সেইখানেই গল্পের স্বাভাবিক ধারায় উপন্যাসটির শেষ হওয়া উচিত বলে মনে হয়। তথাপি মোটের উপর বিচার করলে বলতেই হয় যে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে দেবারু অন্যতম।

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

**শান্তি-সোপান বা পান্থ প্রদীপ।** খান বাহাদুর মৌলবী চৌধুরী কাসেমদ্দীন আহমদ সিদ্দিকা, জমিদার, বলিয়াদী, (ঢাকা)। দাম ২।০। পাওয়া যাবে, গ্রন্থকারের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাছে কিংবা ইস্‌লামিয়া লাইব্রেরী পটুয়াটোলী, ঢাকায়।

বইখানা দার্শনিক পণ্ডিত হজরত এনাম গাজালার লেখা "মেনহাজোল আবোদন" আর "ছেরা জোছালোকন" নামে দু'খানা ধর্ম্মগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। গ্রন্থকার ভূমিকায় যা বলেছেন, তাতে বোঝা যায়, বাস্তবিক তার উদ্দেশ্য মহৎ। উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রাচীন ও প্রকৃত মোস্‌লেম ধর্ম্মের স্বরূপ প্রতিষ্ঠা। গ্রন্থকার দুঃখ করে বলেছেন আজকালকার মোস্‌লেম ভায়েরা—তাঁদের খাঁটি মুসলমান ধর্ম্মের আদর্শ হারিয়ে পরদেশী ভাবের ছায়ায় মানুষ হ'য়ে, নিজেদের ঘরে কতো বড় সম্পদ রয়েছে সে বিষয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেল্‌ছেন। আলো জ্বলছে ঘরে, অথচ তারা বুদ্ধি হারিয়ে আলোর সন্ধানে চলেছেন বাইরে—বিপথে। যাতে তারা প্রকৃত মোস্‌লেম ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝ্‌তে পারেন, সেই জন্যে গ্রন্থকার তার বয়সের অসুবিধা আর রোগের যন্ত্রণা উপেক্ষা কোরে এ অনুবাদে হাত দিয়েছেন। খাঁটি বাংলায় সহজ, সরল করে লেখবার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য, সে ঐকান্তিক চেষ্টা বাস্তবিক সফল হ'য়েছে।

বইখানা আগাগোড়া ধর্ম্মতত্ত্বে পূর্ণ। কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্ব বল্‌তে যা বোঝায়, সে ধাঁচের নয়; এতে প্রকৃত ভাব্‌বার জিনিষ আছে। বিশেষ করে, "আওয়ারেজের ঘাটী" বলে চতুর্থ অধ্যায়টী বেশ গভীর।

হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ছেড়ে দিয়ে, মানুষকে মানুষ বলে ধল্লে, যে সব কথা মানুষের অন্তর-চৈতন্যকে স্বতঃই আলোড়িত করে সেগুলোর সমাধান আজো হোলো না। কিন্তু সমস্ত ধর্ম্মেই তার চেষ্টা হয়েছে। এই বই এর ভেতর এই অধ্যায়টীতে অদৃষ্টবাদ নিয়ে বেশ গভীর ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পড়্‌লে বোঝা যায়, আগে মোস্‌লেম ধর্ম্মে, কী ক'রে এ সব প্রশ্নের সমাধান করবার চেষ্টা হয়েছিলো। নিরাসক্ত হয়ে সংসার ভোগ করা, নিষ্কাম কর্ম্ম, ভগবানে আত্মসমর্পণ, অহঙ্কার বর্জ্জন করা, বা কামনার নাশ ক'রে শান্তির সন্ধান করা ইত্যাদি কথা,—এসব কারু নিজের কথা নয়···এসব চিরদিনের, চিরকালের, বিশ্বজনের কথা। গ্রন্থকারকে প্রশংসা করতে হয় এই ভেবে, তিনি ঠিক উপযুক্ত সময়ে, বিচক্ষণের মত হাত দিয়েছেন ঠিক প্রয়োজনীয় জিনিষে। মনে হয়, এ সময় অন্য কোনো জিনিষের অনুবাদ করতে বস্‌লে তাঁর পণ্ডশ্রম হোতো। কিন্তু একটা চিরন্তন জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন বলে, একথা না বলে পারা যায় না যে তিনি ঠিক সময়ে ঠিক জিনিষের অনুবাদ করে, একটা প্রকৃত কিছু আশা করেছেন; আশা সঙ্গত; শোভন। আমরা প্রার্থনা করি, তাঁর আশা সফল হোক্।

শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার বসু

## নারীজীবন ও প্রসূতি-পরিচর্য্যা—ডাঃ শ্রীঅভয়কুমার সরকার প্রণীত, প্রকাশক সরকার এণ্ড সন্স, কলেজ রোড্, ফরিদপুর।

অজ্ঞ ধাত্রীরাই প্রধানতঃ, বাংলাদেশের প্রসূতি ও শিশু-মৃত্যুর ভয়াবহ হারের জন্য দায়ী। মোটামুটি ভাবে ধাত্রী বিদ্যাশিক্ষার জন্য অধিক বিদ্যার আবশ্যক না হইলেও, প্রসূতি-পরিচর্য্যা সম্বন্ধে আধুনিক-জ্ঞান-সম্পন্না ধাত্রীর সাহায্য অধিকাংশ স্থলেই পাওয়া যায় না। সুখের বিষয়, মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড সমূহের দৃষ্টি এদিকে পড়িয়াছে—ধাত্রীবিদ্যার প্রসার কল্পে তাঁহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

ডাঃ সরকারের পুস্তকখানি লিখন-পঠনক্ষমা নারী মাত্রেই পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন। বইখানির উৎকর্ষতা সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বইখানির একাধিক সংস্করণ বাহির হইয়াছে এবং মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড সমূহের ধাত্রী-বিদ্যাশিক্ষার ক্লাসগুলির অনেকগুলিতে পাঠ্য-পুস্তকরূপে পুস্তকখানি ব্যবহৃত হইতেছে। বস্তুতঃ, পুস্তকখানি সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত; ডাক্তারের সাহায্য ব্যতিরেকেই সকলে ইহা পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন।

## বসন্তরোগের প্রতিকার ও চিকিৎসা

ডাঃ শ্রীঅভয়কুমার গুহ প্রণীত। মূল্য ৷৵০

উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিলে, কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতির ব্যাধি সমূহের অনেকগুলির প্রকোপ যথেষ্ট প্রশমিত করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বৎসরের পর বৎসর এই সকল রোধ-যোগ্য ব্যাধি-সমূহেই বঙ্গদেশে লক্ষ লক্ষ লোক অকালে ভবলীলা সাঙ্গ করেন।

অবশ্য শিক্ষার অপ্রসার ও গবর্ণমেন্টের উদাসীনতাই এজন্য দায়ী।

এক বসন্তরোগেই প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হন; যদিও, উপযুক্ত সময়ে টীকা লইলেও রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় সাবধানতা অবলম্বন করিলে এই রোগকে অতি সহজেই দমন করা যায়। ডাঃ সরকার বসন্তরোগের হাত হইতে কি ভাবে রক্ষা পাওয়া যায় তাহা পুস্তকখানিতে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পঠন-ক্ষম ব্যক্তিমাত্রই পুস্তকখানি পড়িয়া অতিমাত্রায় লাভবান হইতে পারিবেন। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

**মনসিজা**—শ্রীনীলরতন কুমার। মূল্য ৷৷০। প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১০নং কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২।

লেখক কবিতা লেখা আর কিছুদিন অভ্যাস করিয়া কবিতার বই প্রকাশ করিলে ভাল করিতেন।

ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

**জেনেভা-ভ্রমণ**—শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। মূল্য ৸০। প্রকাশক—শ্রীনিখিলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী, ২০ সুরিলেন, কলিকাতা।

১৯৩০ সালে "লীগ্‌ অব নেসনসের" সদস্যরূপে লেখক জেনেভায় গিয়াছিলেন। লেখকের মতে, ভারতবর্ষ অনেক দেশ অপেক্ষা অধিক চাঁদা লীগকে দিলেও, লীগের সভায় অন্যান্য দেশের সদস্যদের ন্যায় ভারতীয় সদস্যদের প্রতিপত্তি নাই। কিন্তু তবুও, লেখক ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা যে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া লীগের সভায় ভারতের সম্মান কিছু বর্দ্ধিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহার কাহিনী জেনেভা ভ্রমণ প্রসঙ্গে পুস্তকখানিতে বর্ণিত হইয়াছে। কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে লীগের নিকট হইতে কিছু সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা তাহাও লেখক বলিয়াছেন।

পুস্তকের অন্যান্য অংশ সাধারণ ভ্রমণ-যাত্রার বিবরণের ন্যায়। পুস্তকখানি সহজ-পাঠ্য। ছাপা ও কাগজ ভাল।

শ্রীসুশীল কুমার বসু

**শনির দশা**—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। প্রাপ্তিস্থান, বরেন্দ্র লাইব্রেরী ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। পৃষ্ঠা ১৬০। দাম এক টাকা।

এখানি যতীন বাবুর প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসখানি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ইহার আখ্যানভাগ বেশ চিত্তাকর্ষক, উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীগুলি বেশ সজীব, কথাবার্ত্তাগুলিও বেশ সময়োপযোগী ও প্রাণ শক্তিতে পরিপূর্ণ। আজকালকার পনেরো আনা উপন্যাস যেমন একঘেয়ে ও নিতান্ত সাধারণ গোছের, এখানি তেমন নহে। আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে ইঁহার চিন্তা শক্তিও বেশ গভীর ও নির্ভীক-উজ্জ্বল। বইএর ছাপা, কাগজ, বাঁধাই চমৎকার।

**বিদ্রোহী বালক**—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত প্রাপ্তিস্থান, ১০ নং ইন্দ্ররায় রোড্‌, ভবানীপুর। পৃষ্ঠা ১৮৪, দাম এক টাকা।

আজকালকার ছেলেদের বইএ আমরা দুইটি জিনিষ দেখিতে পাই—হয় সামান্য চুটকি গল্প, না হয় রোমাঞ্চকর এ্যাড্‌ভেনচারাস উপাখ্যান। ছেলেদের ও তাহাদের ছাত্র-জীবনের কথা লইয়া বাংলাভাষায় উপন্যাস নাই বলিলেও চলে। এই গ্রন্থখানি আমাদের সেই অভাব দূর করিয়াছে। গোবিন্দ নামে একটি দুরন্ত ডানপিটে ছেলের দুষ্টুমি কথাতে এই বইখানি পূর্ণ; অথচ গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত গল্পাংশ ঘটনার পর ঘটনা লইয়া বেশ দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। আমাদের ঘরের ছেলেরা গোবিন্দের দুষ্টুমির কথা পড়িয়া প্রচুর আমোদ পাইবে অথচ দুষ্টুমি করা ও শিক্ষকের অবাধ্য হওয়া যে নিতান্ত খারাপ তাহাও বুঝিবে। প্রত্যেক অভিভাবকের কর্ত্তব্য ছেলেদের বিদ্রোহী বালক পড়িতে দেওয়া। ইহাতে তাহারা একাধারে শিক্ষা ও আমোদ পাইবে।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

# মধুপর্ক

শ্রীআশীষ গুপ্ত

## যারা কাঁচা মাংস খায়

পৃথিবীতে সমগ্র এস্কিমো জাতির সংখ্যা বত্রিশ হাজার। এ্যালাস্‌কা, উত্তর ক্যানাডা, গ্রীণল্যাণ্ড ও ল্যাব্রাডর ছাড়া অন্ত কোনও দেশে এস্কিমো নাই।

যে দেশে এস্কিমোদের বাস সেখানে বেঁচে থাকা বিশেষ সহজ ব্যাপার নয়। ছ'মাস দিন আর ছ'মাস রাতের দেশে, সিল, সাদা ভালুক, সিন্ধুঘোটকের সঙ্গে অহরহ যুদ্ধ করে কায়ক্লেশে কোনও রকমে তারা জীবনযাপন করে।

এস্কিমোদের প্রধান খাদ্য সিল—কাঁচা বা পুড়িয়ে। তারা

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

পুরুষ মাত্রেই শিকারী কারণ শিকার না করলেই অনাহার সাদা ভালুক, সিল, সিন্ধুঘোটক, ক্যারিবু, বল্গা হরিণ ও কদাচিৎ দু'চারিটি পাখী—যখন যা পাওয়া যায়, এস্কিমোর তাই শিকার করে।

সাহসে তারা দুর্জ্জয়; একেলা ভালুকের সন্ধানে যেতে দ্বিধা করে না। প্রকাণ্ড বরফের স্তূপগুলি যখন গল আরম্ভ করে, শিকারের নেশায় মত্ত হয়ে কখনও কখন তারই উপর ভাস্‌তে ভাস্‌তে শিকার আর 'শিকারী দু'জ চলে যায়—কেউ আর ফিরে আসে না। এস্কিমোরা তি

সিলের চামড়ায় তৈরী কায়াক ও উম্-ইয়াক নামক নৌকা

শিকার করে। ছোট্ট ছোট্ট নৌকায় তীর বেগে ছুটে গিয়ে বৃষ্টিধারার মত হারপুন্ বা বর্শা বিদ্ধ করে অতিকায় তিমিকে জর্জ্জর করে ফেলে। কিন্তু সভ্যজাতির ক্রমাগত তিমি শিকারের ফলে তিমির সংখ্যা এত কমে গিয়েছে যে এখন কদাচিৎ দু'একটি তিমি দেখা যায়।

এস্কিমোদের নৌকার মতন দ্রুতগামী জলযান পৃথিবীতে আর নাই। এদের নৌকাগুলি দু'রকমের। তিমির হাড়ের কাঠামোর উপর সিলের চামড়া দিয়ে ঢেকে ক্যারিবু কিংবা বল্গা হরিণের শিরা ও পেশী দিয়ে সেলাই করে ১৭ ফুট লম্বা আর দু'ফুটেরও কম চওড়া তারা যে ক্ষুদ্র নৌকাগুলি তৈরী করে তার নাম কায়াক্ (Kayak)। এগুলিতে একটি মাত্র লোকের বসবার ব্যবস্থা থাকে এবং নৌকাটি এমন ভাবে তৈরী যে লোক বসলে আর একটুখানিও ফাঁক থাকে না। এস্কিমোদের নৌকার দাঁড় একটি করে আর তাও আবার দু'দিকেই চ্যাপ্টা।

মৎস্য-শিকার রত এ্যালাস্কা-দেশীয় স্ত্রীলোক

এর চেয়ে বড় যে নৌকাগুলি তার নাম উম্‌ইয়াক্ (Umyak)। এগুলি তৈরী হয় হাড়, কাঠের টুকরো, আর চামড়া দিয়ে। দৈর্ঘ্যে এগুলি ৪০ ফুট, জিনিষপত্র আর শিশুদের নিয়ে এতে আট দশ জন নারীর বসবার স্থান থাকে। সাধারণতঃ এ নৌকাগুলি নারীরাই চালনা করে—পুরুষেরা বেশী পছন্দ করে কায়াক্।

বরফের উপর চলতে হলে এস্কিমোরা শ্লেজ্ ব্যবহার করে। পাঁচটি কুকুর সাধারণতঃ শ্লেজখানি টেনে নিয়ে যায়। জিনিষপত্র আর লোকজন নিয়ে এক একটি শ্লেজ্ আট দশ মণ ভারী হয় ও বরফের উপর দিয়ে এদের গতি হয় ঘণ্টায় ৫ মাইল। কুকুরগুলি একসারি বেঁধে শ্লেজ্ টানে না, শ্লেজটি চলতে আরম্ভ করলেই ছত্রাকারে তারা ছড়িয়ে পড়ে। চারদিক বরফে ঢাকা পড়ে গেলেও কিংবা গভীর রাত্রেও এস্কিমোরা পথ হারিয়ে ফেলে না। কেমন করে যে তারা দিক্ নির্ণয় করে, 'সভ্য' মানুষ তার কিছুই বুঝতে পারে না।

শীতের আবির্ভাবে চারিদিক যখন বরফে ঢাকা পড়ে যায়, তখন শিকার পাওয়া অতি কঠিন। সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়ে গেলে সিলগুলি নিশ্বাস নেবার জন্ম বরফের তলে অনেকগুলি ছোট ছোট ছিদ্র করে ফেলে। এস্কিমোরা এই ছিদ্রগুলির পাশে বর্শা হাতে চুপ করে বসে থাকে, কখনও কখনও হয়ত তিন চার দিনও বসে থাকতে হয়;

মেরু প্রদেশের শীতের উপযোগী পোষাক-পরিহিত এস্কিমো স্ত্রী ও পুরুষ

নিশ্বাস নেবার জন্ম ছিদ্রের কাছে আসতেই নিশ্বাসের শব্দটুকু পেয়ে তারা সিলকে বর্শাবিদ্ধ করে।

কখনও বা আর এক উপায়ে সিল শিকার করা হয়। ছ'মাস রাতের পর যখন রোদ দেখা দেয়, সিল তখন জল ছেড়ে ডাঙ্গায় আসে। দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে শিকারী হামাগুড়ি দিয়ে তার দিকে অগ্রসর হয়। এমন ভাবে গড়াতে গড়াতে সে এগিয়ে আসে, দেখে মনে হয় যেন আর একটি সিল। শিকারীর এ চাতুরী সিল ধরতে পারে না তাই সহজেই নিহত হয়।

এস্কিমোদের পোষাকের যোগাড় হয় সিল, সিন্ধুঘোটক প্রভৃতির চর্ম্মে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই সিলের চামড়ার পাজামা পরে আর সিন্ধুঘোটকের চামড়ার বুটজুতা পায়ে দেয়। এই জুতার নাম ক্যানিকার (Kaniker)। জুতা বা পোষাক তৈরী করবার জন্ম কাঁচা চামড়া তারা 'ট্যান্' করে অদ্ভুত উপায়ে। এস্কিমো নারীগুলি কাঁচা চামড়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন চিবোতে থাকে; মুখের লালায় ও দাঁতের পেষণে চামড়া নরম হলেই তখন সেলাই করা আরম্ভ হয়। কিন্তু এই চর্ম্ম-চর্ব্বণের ফলে দু'এক বছরের মধ্যেই তাদের দাঁত ও মাড়ির গোড়া পর্য্যন্ত একেবারে ক্ষয়ে যায়।

এস্কিমোদের বাড়ীর নাম ইগ্লু (Igloo)। গ্রীষ্মকালে তারা তিমির হাড়, পাথর, চামড়া, যা পায় তাই দিয়ে ঘর তৈরী করে বা শুধু চামড়ার তাঁবুতে থাকে, কিন্তু শীতকালে বাস করে বরফের ঘরে। বাইরে যখন প্রচণ্ড শীত, বরফের ঘরগুলি তখন ভারী আরামপ্রদ। কিন্তু এ ঘরগুলির প্রধান অসুবিধা যে আলো বা বাতাস আসে না। ঘরের মধ্যে সিলের চর্ব্বির প্রদীপ জেলে এস্কিমোরা বসে থাকে, ধোঁয়া বার হবার কোনও পথই তারা রাখে না। চিম্‌নী বা জানালা তৈরী করতে তারা জানে না; ঘরে প্রবেশ করবার যে সরু সুড়ঙ্গ থাকে তার ভিতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তারা ঘরে আসে যায়; তার মুখে চামড়ার একটি পর্দ্দা ঝোলান থাকে আর তারই ফাঁক দিয়ে মাসে মাসে বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঘরে ঢোকে।

পণ্ডিতেরা বলেন এস্কিমোদের পূর্ব্বপুরুষেরা ছিল মঙ্গোলিয়ার অধিবাসী। এস্কিমো কথাটির উৎপত্তি হয়েছিল যে কথাটি থেকে তার মানে "যারা কাঁচা মাংস খায়"।

এস্কিমোদের কথা কইবার ধরণটি অদ্ভুত। "আমি যাবো" বা "তুমি আসবে" না বলে তারা বলে, "একজন যাবে," "একজন আসবে"। শিকার ছাড়া একদিনও এস্কিমোরা বাঁচতে পারে না। গ্রীষ্মকালে শিকার করে তারা যে মাংসাদি সঞ্চয় করে, সারা শীতকাল তাতেই চালাতে হয়। সভ্য জাতির সংস্পর্শে এসে তারা এখন অল্প অল্প ব্যবসা করতে আরম্ভ করেছে; কড্‌মাছ, সিল বা ভালুকের চামড়ার বিনিময়ে এখন তারা বন্দুক, গুলিবারুদ, কাপড় ও কখনও বা বিলাস সামগ্রী নিতে লালায়িত। কিন্তু এই সভ্য জাতিরাই তাদের সর্ব্বনাশ করেছে। প্রথম প্রথম এস্কিমো দেখলেই নাবিক ও শিকারীরা অসভ্য মনে করে তাদের গুলি করত। এখন অবশ্য তাদের গুলি করে আর মারা হয় না কিন্তু সে দেশে হাম, বসন্ত প্রভৃতি যে সব রোগ কোনদিন ছিল না, ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসী সেই রোগগুলি বহন করে নিয়ে গিয়ে তাদের উচ্ছেদ সাধন করছে।

এস্কিমোরা স্বভাবতঃ শিশুপ্রকৃতি ও অত্যন্ত সরল। তারা সহজেই বিদেশীর কথায় বিশ্বাস করে' আপনার যথাসর্ব্বস্ব

এস্কিমো পুরুষ ছুরি পেলে যতটা পারে খাবার মুখে পুরে ছুরি দিয়ে কেটে নেয়

এস্কিমোরা কড়ি ও পাথরে তৈরী 'ল্যাব্রেট' নামক অলঙ্কার চামড়া ফুঁড়ে পরে' থাকে

তার হাতে স'পে দেয়। সভ্যজাতির কপটতা বা মিথ্যাচার তাদের মধ্যে একেবারে নাই। এস্কিমোরা চুম্বন করতে জানে না, নাকে নাক ঘষে তারা প্রীতিজ্ঞাপন করে।

এস্কিমোরা অতি দ্রুত ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। গ্রীণল্যাণ্ডে এখন বার চৌদ্দ হাজারের বেশী এস্কিমো নাই, ল্যাব্রাডরে আছে মাত্র ১৫০০। খাদ্যাভাবে, রোগের পীড়নে এই অতি পুরাতন জাতি আরও অনেকের মতই হয়ত অল্পদিনেই একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে।

## নব্য-বিভীষিকা

ইউরোপ-আমেরিকার লোকেরা যা করে সবই অদ্ভুত। জার্ম্মানী দেশে ম্যাক্স হিউল নামে একটি মুচি বাজি রেখে সাড়ে দশ মিনিটে ৭৫টি ডিম গলাধঃকরণ করেছে। এর কাছে যে হেরে গিয়েছে তার বাড়ী আমেরিকায়, নাম জন উইলিয়াম্‌স্। মাত্র দেড় মিনিট বেশী তার সময় লেগেছিল।

আমেরিকায় একটি রমণী ৬০০ টাকা বাজী রেখে ক্রমাগত ১০৬ ঘণ্টা গ্রামোফোন শোনার পর বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি জিতলেন ঠিক্, কিন্তু তাঁকে হাঁসপাতালে পাঠাতে হল।

আজকাল হুজুগ উঠেছে কে কতক্ষণ নাচতে পারে। ১৯২৭ সালে আফ্রিকায় চার্লস্ নিকোলাস্ নামে একজন ফরাসী অবিরাম ২৬৬ ঘণ্টা নেচেছিলেন। তাঁর বয়স তখন চল্লিশ। আমেরিকায় মিস্ মার্গারেট মিলার নামে ১৮ বৎসর বয়সের একটি যুবতী নাচতে নাচতে সাড়ে উনচল্লিশ মাইল পথ চলে গিয়েছেন।

এ-ত গেল একলা একজনের নাচের কথা। কিন্তু একদল যুবক আর যুবতী অনেক সময় জোড় বেঁধে এই রকম নাচ আরম্ভ করেন।

যারা এই রকম নৃত্য-প্রতিযোগিতার আয়োজন করে তারা যে শুধু মজা দেখবার জন্ম করে, তা নয়। এতে তাদের হাতে বেশ দু' পয়সা আসেও। কোনও একটা সহরে বেশ ভালো, প্রকাণ্ড একটি ঘরভাড়া নিয়ে তারা বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করে যে, যে যুবক-যুবতী অন্ত সকলের চেয়ে বেশীক্ষণ নাচতে পারবে, তাদের প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কার অবশ্য বেশ ভালোই দেওয়া হয়—প্রায় দশ পনর হাজার টাকা এবং কখনও কখনও আরও বেশী।

এই পুরস্কারের লোভে অনেকে, এবং হুজুগে মেতে আরও অনেকে নৃত্য প্রতিযোগিতায় এসে যোগ দেয়। সকলকেই টাকা দিয়ে ভর্ত্তি হতে হয় আর এই সব টাকা যায় যারা নাচের আয়োজন করে তাদের পকেটে। টাকা দিয়ে যে কেউ ভর্ত্তি হতে পারে কিন্তু তার আগে ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে দেখে নেয় অতখানি অত্যাচার সহ্য করার ক্ষমতা শরীরে আছে কিনা। যে কোনও নারী যে কোনও পুরুষের সঙ্গিনী হতে পারে; কিশোর-কিশোরী থেকে আরম্ভ করে প্রৌঢ়েরা পর্য্যন্ত এই নৃত্য প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন।

রাতদিন সমানে এই নাচ চলে। ব্যাণ্ড বাজাবার লোকেরা আট ঘণ্টা অন্তর বদলী হয়, দিনরাতে তিন দল লোক ব্যাণ্ড বাজায়। প্রতি ঘণ্টায় ৪৫ মিনিট করে নাচতে হয় আর এক মিনিট করে ছুটি। এই পনর মিনিটের মধ্যেই খাওয়া, ঘুম ও বিশ্রাম।

যেখানে নাচ হয় ঠিক তার গায়েই দুটি ছোট্ট ঘর—স্ত্রী ও পুরুষদের আলাদা আলাদা। পনর মিনিট ছুটির মধ্যে ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করা যেতে পারে। নাচিয়েদের খুব ভালো খাবার দেওয়া হয়—অনেকে নাচের শেষে বাড়ী ফেরে বেশ একটু হৃষ্টপুষ্ট হয়ে। কোনও মাদক দ্রব্য খাওয়া একেবারে নিষেধ, সিগারেট বা চুরুট যত ইচ্ছা পাওয়া যায়। যে ৪৫ মিনিট নাচ চলে তার মধ্যে নিশ্বাস ফেলবার অবকাশটুকুও থাকে না। যে কোনও কারণে হোক্ এই সময়ের মধ্যে এক মুহূর্ত্ত নাচ থামলেই সেই "যুগলের" পরাজয়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই নাচ চলে। কত দর্শক আসে, চলে যায়, আবার আসে;—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত নাচের বিরাম নাই। দু' একদিনের মধ্যেই অনেককেই সরে যেতে হয়, দল ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসে। দল যত ক্ষীণ হয়, দর্শকদের উত্তেজনা ততই বেড়ে ওঠে; উত্তেজনা যত বাড়ে তত বেশী দর্শক আসতে আরম্ভ করে; যত বেশী দর্শক আসে, যারা নাচের আয়োজন করে তাদের পকেট ততই ভারী হয়।

নাচতে নাচতে বহু যুবক-যুবতী প্রেমে পড়ে যায়। নাচের সঙ্গী বা সঙ্গিনী নাচের শেষে জীবন-সাথী হয়ে ওঠে। অনেকে আবার পরিণয় পাশে আবদ্ধ হতে চায় না; নাচের সময়টুকু প্রেমের অভিনয় করেই তারা ক্ষান্ত হয়।

যারা নাচে তাদের জাগিয়ে রাখা এক বিষম সমস্যা। দু'একদিন নাচের পরেই পা আর ওঠে না, চোখ দুটি রক্তজবার মত হয়ে ওঠে, চোখের পাতা মনে হয় যেন পাথরের চেয়েও ভারী। সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হয়ে যায়, নাচতে নাচতেই অনেকে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের জাগিয়ে রাখতে হবেই, এক মুহূর্ত্ত থামলে চলবে না। যারা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না তাদের সরিয়ে দেওয়া মাত্র চেতনাহীন হয়ে তারা ঘুমে লুটিয়ে পড়ে। অনেকে বিকারগ্রস্ত হয়ে ভুল বকতে আরম্ভ করে বা অজ্ঞান হয়ে

যায়। আবার অনেক সময় পুরুষ কিংবা নারীর অর্দ্ধচেতন দেহখানি জড়িয়ে ধরে তার সঙ্গী বা সঙ্গিনী শুধু জিদের বশেই নাচতে থাকে।

এদের জাগিয়ে রাখবার জন্ম পটকা ফাটান হয়, বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করা হয়, তুমুল কলরব করে বাজনা বাজান হয়, ও সকলে মিলে থেকে থেকে চীৎকার করে ওঠে।

অনেকে এই অত্যাচারের ফলে পাগল হয়ে যায়। বেশীর ভাগ দেখা যায় যে পুরুষের চেয়ে নারীর সহ্য করার ক্ষমতা অনেক বেশী। সঙ্গী যখন ক্লান্তিতে লুটিয়ে পড়তে চায় তখন তাকে জড়িয়ে ধরে রাখে তার সঙ্গিনী।

প্রচণ্ড করতালি আর আকাশ-কাটা হট্টগোলের মাঝখানে নাচ যখন শেষ হয় তখন বিজয়ী "যুগল" বোধ হয় টাকার তোড়া ছুঁড়ে ফেলে ঘুমে লুটিয়ে পড়তে পেলে বাঁচে।

## যে দেশে সর্দ্দি হয় না

মেরুর দেশের নাম শুনলেই আমরা ভয়ে কেঁপে মরি, না জানি কতই ঠাণ্ডা। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন যে আশঙ্কার কোনই কারণ নাই; সেখানে না কি ঠাণ্ডা লেগে অসুখ হতেই পারে না। নানারকম রোগের জীবাণু-বিষ বহন করে এনে আমাদের অসুখ ঘটায় কিন্তু মেরু প্রদেশে এই জীবাণুগুলি ঠাণ্ডায় একেবারেই বাঁচতে পারে না। যারা মেরু অভিযানে যায় আমরা ভাবি তাদের সর্দ্দি-কাশি বুঝি লেগেই থাকে, কিন্তু সত্যি সেখানে সর্দ্দি-কাশী হওয়া একেবারে অসম্ভব। এমন কি যদি একরাশ নরম বরফের ওপরে কেউ ঘুমিয়ে পড়ে তবুও তার নিউমোনিয়া হবার আশঙ্কা নাই; ঘুম ভেঙ্গে শুধু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা মনে হবে।

সে দেশে ঘা, ক্ষত খুব শীঘ্র শুকিয়ে যায়, কাটা দেখতে দেখতে জোড়া লাগে। একবার অভিযান-যাত্রীদের মধ্যে একজনের মাথায় বিষম আঘাত লেগে মাথা প্রায় দু'টুকরো হয়ে ফেটে গিয়েছিল। ধরাধরি করে তাঁকে কিছুদূর নিয়ে গিয়ে সঙ্গীরাই যেমন তেমন করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। দিন কয়েক পরেই ফাটা মাথা সম্পূর্ণ জোড়া লেগে শুধু একটি ক্ষীণ দাগ সাক্ষী থেকে গেল।

## যদি বাঁচতে চাও, ঘাস খাও

জাপানের অধিবাসীরা প্রায়ই দীর্ঘজীবি হয় ও অনেকেই শতাধিক বৎসর বেঁচে থাকে। ডাক্তার বেকার নামে জনৈক বৈজ্ঞানিক জাপানীদের খাদ্যতালিকা পরীক্ষা করে বলেছেন যে তারা প্রধানতঃ ভাত, সমুদ্রের মাছ ও সামুদ্রিক ঘাস (sea-weed) খেয়ে জীবনধারণ করে। জাপানীদের মতন সুন্দর দাঁত ও চুল আর কোনও দেশের অধিবাসীদের নাই। তাদের সমাজে টাকপড়া বা দন্তরোগ—অকালবার্দ্ধক্যের কোনও চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। ভাত ও মাছ অনেকেই খায় কিন্তু ডাক্তার বেকার বলেন যে সামুদ্রিক ঘাস খেয়ে পরীক্ষা করা উচিৎ যে অন্যান্য জাতি জাপানীদের মতন স্বাস্থ্যসম্পন্ন হতে পারে কি না?

## ডিমের দীর্ঘজীবন লাভ

যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিভাগের বৈজ্ঞানিকেরা সঞ্চিত ডিমের সুনামবৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করেছেন। তাঁদের আবিষ্কৃত প্রণালীর সাহায্যে ডিমের মধ্যে তার প্রাথমিক আর্দ্রতা এবং কার্ব্বণ ডায়ক্সাইড এমনভাবে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় যে নয় মাস পরেও তা প্রথম দিনকার মতই টাট্‌কা এবং তাজা থাকে।

সাধারণতঃ শীতল অবস্থায় ডিমকে সঞ্চিত করে' রাখ্‌তে গেলেই তার আর্দ্রতার এবং কার্ব্বণ ডায়ক্সাইডের পরিমাণ কমে' যায় এবং এই দুই বস্তুর হ্রাস মানেই হচ্ছে ডিমের গুণেরও অবনতি।

ডিমের খোলাটা হচ্ছে ছিদ্রবহুল, কিন্তু তেলে ডোবালে এইসব ছিদ্রগুলো বন্ধ হ'য়ে যায়। ডিমব্যবসায়ীরা ইতঃপূর্ব্বে আবিষ্কার করেছিল যে ভাণ্ডারে সঞ্চিত করবার পূর্ব্বে উন্মুক্ত পাত্রে ডিমগুলোকে চুবিয়ে নিলে তাদের আর্দ্রতার এবং কার্ব্বণ ডায়ক্সাইডের অপচয় কথঞ্চিৎ নিবারিত হয় এবং ফলে তাদের আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত হয়। এখন যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকেরা আরও এক ধাপ অগ্রসর হ'লেন, তাঁরা বায়ু প্রতিরোধক পাত্রের ভিতর হ'তে পাম্পের সাহায্যে বাতাস বের করে' দিয়ে তারই মধ্যে ডিমগুলোকে তৈলনিমজ্জিত

আংশিকভাবে বায়ুহীন পাত্রে ডিম রাখিয়া কার্ব্বণ ডায়ক্সাইড এবং তেলের সাহায্যে দীর্ঘজীবন দান করা হইতেছে·

করলেন। আংশিক বায়ুহীন তার দ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে ডিমগুলো যে শুধু তেল গ্রহণ করে তাই নয়, নিজেদের মধ্য থেকে খানিকটা বাতাস নির্গত করেও দেয়। পাত্রের মধ্যে কার্ব্বণ ডায়ক্সাইড প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য। বাহিরের বায়ুর চাপ পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছোলেই, ডিমগুলো খোলার ভিতরে কার্ব্বণ ডায়ক্সাইড আকর্ষণ করে নেয়। কার্ব্বণ ডায়ক্সাইড ভিতরে প্রবেশ করবার সময় পাত্লা পর্দ্দার মতন কিছু তেল বহন করে' ভিতরকার ঝিল্লীতে নিয়ে যায়।

এই কাজে খনিজ তেল ব্যবহার করা হয় এবং দেখা গিয়াছে যে এর ব্যবহারের দ্বারা ডিমের গুণের কিছুমাত্র তারতম্য হয় না। দশমাস পরের এই ডিম ভেঙ্গে দেখা গিয়েছে যে মাত্র দু'একদিন হ'ল পাড়া ডিমের সঙ্গে এর কিছুমাত্র ভেদ নেই, না চেহারায়, না স্বাদে!

## সেলিউলয়েড ট্যাক্সিডার্ম্মি

বাংলায় বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় কোনও কিছু লেখা যে কতদূর কঠিন কাজ তা এই অনুচ্ছেদের নামকরণের পদ্ধতি দেখেই বুঝ্তে পারা যাবে,—নামটা আমাদের অতিরিক্ত রকমের ইংরাজীপ্রীতির পরিচয়রূপে গ্রহণ না করে' বাংলাভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষার দৈন্যের উদাহরণরূপে গ্রহণ করাই ঢের বেশী সঙ্গত হ'বে। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

মৃত জীবজন্তুর দেহের চাম্ড়া প্রস্তুত করে' নিয়ে তার ভিতরটা পূর্ণ করে পুনরায় তাকে আকৃতি প্রদান করার নাম ট্যাক্সিডার্ম্মি। এ্যামেরিকার ফীল্ড্ মিউজিয়াম্ অভ্ ন্যাচার্যাল হিষ্ট্রীর একজন কর্ম্মচারী আবিষ্কার করেছেন যে কোনও আংশিক স্বচ্ছ বস্তুর সহিত নানাবিধ রংয়ের সংমিশ্রণে স্বাভাবিক বর্ণ প্রস্তুত হ'তে পারে। এর নাম "সেলিউলয়েড

ছবির সম্মুখভাগে কৃত্রিম উপায়ে আংশিক প্রস্তুত চামড়া

প্রণালী", যদিও অন্যান্য ব্যবহৃত উপাদানের মধ্যে সেলিউলয়েড অন্যতম মাত্র। জীবজন্তুর স্বাভাবিক বর্ণের নকল করতে হ'লে, সেলিউলোজ সলিউশ্যনের সঙ্গে রং মেশাতে হ'বে এই কাজে সাধারণতঃ সেলিউলোজ্ নাইট্রেট, সেলিউলোজ্ এ্যাসিটেট্ অথবা পায়রোক্সাইলিন ব্যবহৃত হয় ও তারপর এই রং ছাঁচে লাগান হয়,—ছাঁচের অন্তর্ভাগে যেখানে যে রংয়ের প্রয়োজন সেইখানে তা লাগানো হ'য়ে থাকে। তৎপরে স্তরে স্তরে কাপড়, তারের কাপড় ইত্যাদির ব্যবহারের দ্বারা মূর্ত্তিটিকে দৃঢ় করে' তোলা হয়। রংয়ের দিক দিয়ে নিখুঁত এই প্রতিকৃতিটিকে এইবার ছাঁচ থেকে স্থানান্তরিত করা হয়।

## অভ্যর্থনা

ইংলণ্ডের জনৈক প্রধান মন্ত্রী একদা ছদ্মবেশে একটি পাগলা গারদ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। দ্বারদেশে উপস্থিত হয়ে তিনি বললেন, "গুড্ মর্ণিং, আমি তোমাদের প্রধান মন্ত্রী।" একটু হেসে দ্বারী উত্তর দিলে, "এইদিকে এসো—আরও তিনজন আগেই এসেছে।"

## বিশুদ্ধ

কলিকাতায় টাইফয়েড ও বেরিবেরির আবির্ভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে বাবু একদিন তাঁর হিন্দুস্থানী গোয়ালাকে ডেকে বললেন, "এই, তোম্ আচ্ছা দুধ দেতা কি না? দুধমে বেমারকা পোকা থাকতা নেই ত?"

খৈনী খাওয়া, কালো দাগ ধরা দু'পাটি দাঁত বিকসিত করে গোপ উত্তর দিলে, "নেহি বাবু, পোকা কাঁহাসে আয়েগা? হম্ ত পানি গরম্ কর্ তব্ দুধমে ডাল্তা।"

## প্রেমের পারিশ্রমিক

অতি আধুনিক প্রেমিকা ছায়াচিত্রে প্রেমাভিনয় দেখে পাশে উপবিষ্ট যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, "একেই বলে প্রেম; তুমি ত কোনও দিন এম্নি করে ভালবাসলে না আমাকে।"

একরাশ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে অতি আধুনিক যুবক বললেন, "বাপ্ রে! ও কত মাইনে পায় জানো?"

একটি সম্পূর্ণ হিপোপটেমাস—ছবি হইতে প্রতিকৃতির সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে; বর্ণ-রঞ্জিত আংশিক স্বচ্ছ কৃত্রিম চামড়ার সাহায্যে এই নিখুঁত হিপোপটেমাসটি গঠিত; হইয়াছে

## শুধু বই পড়ে' কিছু হ'বে না সাঁতার শেখো

নিম্নলিখিত কাহিনীটি কোনও চৈনিক ডাক্তারের সম্পর্কে বর্ণিত হ'লেও পৃথিবীর অন্য যে কোনও দেশের চিকিৎসক সম্বন্ধে প্রযুক্ত হওয়ায় বাধা দেখ্ছি না। এই ধন্বন্তরিটিকে একটি রোগী দেখতে ডাকা হয়, তিনি রোগীর এমনই চিকিৎসা করেন যে, বাড়ীর লোকেরা ক্রুদ্ধ হ'য়ে তাঁকে ধরে' বেঁধে রাখে, কিন্তু রাত্রিতে ভিষকমহাপ্রভু বাঁধন খুলে একটি নদী সাঁতার দিয়ে পার হ'য়ে পালিয়ে যান। বাড়ী পৌছে তিনি দেখেন, তাঁর চিকিৎসা-বিত্থালয়ের নূতন ছাত্র পুত্রটি মনোযোগসহকারে তাঁর চিকিৎসা গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করছে। তিনি প্রথমে তাঁর ভিজে কাপড়গুলি নিঙড়ে ফেললেন, পরে তাঁর ছেলেকে বললেন, "বাপু হে, শুধু বই পড়ে' কিছু হ'বে না, যদি তুমি ডাক্তার হ'তে চাও তাহ'লে তোমার প্রতি একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের প্রথম এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপদেশ হচ্ছে, সাঁতার শেখো!"

## ঠোঙ্গায় করে' দিয়ো, বুঝ্লে?

গোব্রা তার কাকার সঙ্গে মনোহারীর দোকানে গিয়েছিল, দোকানদার তাকে গোটা তিন লজেঞ্জ্স্ দিলেন।

কাকার ইচ্ছে গোব্‌রা তার জন্য দোকানীকে ধন্যবাদ দেয়, তাই তিনি গোব্‌রাকে বল্‌লেন, "কারও কাছ থেকে কিছু পেলে কি বল্‌তে হয় গোবরা ?"

মুহূর্ত্তে গোব্‌রা প্রস্তুত হ'য়ে উঠ্‌ল, দোকানদারকে বল্‌ল, "বাঃ এই কটি "লজেন" দিলে যে! আরও দাও, 'আর একটা ঠোঙায় করে' দিয়ো, বুঝ্‌লে ?"

## না জুড়ে দিলেও চলে

হ্যারিসন রোডে একখানা নূতন দোকান খোলা হ'য়েছে—এখনও টেলিফোনের কানেকশন পাওয়া যায় নি। তবু দোকানের ম্যানেজার পশার জমাবার জন্য টেলিফোনের রিসিভার তুলে "কথাবার্ত্তা" চালাচ্ছিলেন। এমন সময়ে একজন লোক একটি ব্যাগ হাতে দোকানে ঢুকল। তাকে দেখে দোকানদারের টেলিফোনে "হ্যালো হ্যালো" এবং হাসিঠাট্টার পরিমাণ বর্দ্ধিত হ'ল। খানিক পরে রিসিভার যথাস্থানে রেখে সে হাসিমুখে আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করল, "মশাইয়ের কি প্রয়োজন ?

"আমি টেলিফোনের কল জুড়ে দিতে এসেছি। কিন্তু দেখছি না জুড়ে দিলেও আপনার চলে !"

## ঘটক-বিদায়

যুগোশ্লোভিয়ার কাটুচানিটুচ্‌কা প্রদেশে বোজা (Bozha) নামে একটি তরুণ কৃষকের বিয়ে করতে সাধ হল। কিন্তু তার দেশাচারের বিধান জ্যেষ্ঠা সহোদরা অবিবাহিতা থাকা পর্য্যন্ত তার বিয়ে হতে পারে না। তাই ভগ্নীর কুমারী নাম দূর করতে প্রয়াসী হয়ে একদিন নিরালা মাঠে বোজা একটি বন্ধুকে বললে, "আমার বোন্‌কে বিয়ে করবে ?" উত্তর হল, "না"। খাপ থেকে দীর্ঘ একটি ছুরিকা বার করে বোজা আবার বললে, "করবে না বিয়ে ?" আবার উত্তর হল, "না।" তৎক্ষণাৎ বোজা ও বন্ধুতে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। বোজার জ্যেষ্ঠা দৈবগতিকে ঐ পথে চলেছিল ধস্তাধস্তির শব্দ শুনে এগিয়ে এসে দেখে বোজার ছুরিকাঘাতে বন্ধুটি জখম হয়ে পড়ে আছে। পরম মমতাভরে সে তার শুশ্রূষায় রত হল ও শেষে একদিন সেই ছেলেটি তাকে ভালোবেসে ফেলতেই দু'জনার বিয়ে স্থির হয়ে গেল। ছেলেটি একটু সেরে উঠলেই তাদের বিয়ে হবে আর ইতিমধ্যে যতদিন বিচার না হয় ততদিন বোজার কারাবাস।

লক্ষ্মী ভাই ষাঁড়, একটু স্থির হয়ে দাঁড়াও।

# বালুচর

শ্রীশান্তি পাল

সোনার বালুর চর—
কিনারে তোমার সুন্দর কোরে বাঁধিব পাতার ঘর।
ছোনের ছাউনি, পাট-খড়ি-বেড়া, খেজুর ছড়ির পাটি,
থাম খুঁটি দিয়া ভাল্ কো বাঁশের নিবমিয়া পরিপাটি,
তারি চারিধারে বুনিয়া বুনিয়া ছোট ছোট ঝাউ চারা,
স্নিগ্ধ তাহার শ্যামল ছায়ায় ঘুরিব পাগল পারা।
যে বাঁশরী কবি হারাইয়া চরে ফিরে নাই আর গাঁয়ে,
সে বাঁশরী আমি কুড়াইয়া এনে বাজাব সাঁঝের বায়ে।
তারি সাথে সাথে কচি ঝাউ চারা কাঁপিয়া উঠিবে দুলি,
কিশোরী মেয়েরা পথ হারাইয়া আসিবে ও-পথে ভুলি।
গাঁয়ের গোধন আবার চরিবে সোনার বালুর চরে,
গোখুর ধূলায় রাঙাইয়া পথ ফিরিবে গাঁয়ের ঘরে।
গোধূলির রাঙা-রক্তিম-রাগে কৃষ্ণচূড়ার তলে,
সন্ধ্যা যখন ধীরে ধীরে এসে নমিয়া পড়িবে চলে ;—
ম্লান হোয়ে যাবে ভাঁটিফুলগুলো আঙিনার মাঝে যত,
রক্ত-করবী লাজে নত হবে বিয়ের কনের মত,
ডালিমের ফুল ধূলায় লুটিয়া কেঁদে যাবে গড়াগড়ি,
স্নেহাবেশে তারে বুকে তুলে লবে বুনোলতা শতনরী ;—
তারি মাঝে আমি বালকের মত কুড়াইব নানাফুল,
প্রিয়ার লাগিয়া কত না ভূষণ গড়িব সে নির্ভুল।
বিনি সুতো দিয়ে সুন্দর কোরে তিলফুলে গাঁথিমালা,
পঞ্চ-খোঁপায় পরাইয়া দিব আসিলে সে বনবালা।
বিনায়ে বিনায়ে কতনা ছন্দে গাঁথিয়া চন্দ্রহার,
পিরীতির রসে ভিজাইয়া আনি' তুলে দিব গলে তার।
বনফুল দিয়ে সাজাইব তারে যত কিছু মনে আছে,
বাঁশরীটি এনে বাজাইব আমি সদা থাকি' কাছে কাছে।
বড় ব্যথা পেয়ে তাই আসিয়াছি ফুল কুড়াইতে গাঁয়ে,
জুড়াইতে দেহ তনু মনপ্রাণ কৃষ্ণচূড়ার ছায়ে।

কোথা বিরহিণী সই,
আজি দেখে যাও বালুর চরেতে জল করে থই থই !
আষাঢ়ের জল আকুলি' ব্যাকুলি' দু'কূল প্লাবিয়া যায়
ঢেউগুলো ভেঙে বিদরিয়া বাঁধ উপছিয়া উগরায়।
তারি সাথে সাথে ঝিনায়ের ফুল ভেসে আসে তীরে কত,
কদম কেশর রজনী-গন্ধা চম্পক শত শত।
আথালিয়া আমি সে ফুল তুলিতে হাতে বিঁধে গেলো কাঁটা,
সেই ক্ষতখানি আজো শুকাল না এখনো রয়েছে ঘা-টা !
জানিতাম যদি ওই ফুলগুলো ঘেরা আছে কাঁটা দিয়ে,
কণ্টকগুলি নির্মূল করি' ফুল লইতাম গিয়ে !
কাহার খোঁপার ফুল সে যে ওগো এমনি করিয়া হায়,
কূলেতে আসিয়া কূল না পাইয়া ভেসে যায় নিরুপায় !
এ-দশা দেখিয়া ঝাউচারাগুলো কেঁদে ভিজাইল মাটি,
পাতা দোলাইয়া বেদনা জানায় মুখেতে নাহিকো "রা"-টি।
কলার বাগুরা আথালি' বিথালি' ঝির্ ঝির্ করি' দুলে,—
বনের পাখীরা সম-বেদনায় গান সব গেলো ভুলে !
চকাচখী বক, ডাহুক ডাহুকী, সারস সারসী জলে,—
সারি শুক শ্যামা, দোয়েল কোয়েল কপোত কপোতী থলে;—
ডানার ভিতর মুখ লুকাইল—নির্ব্বাক নিশ্চুপ,
কার ব্যথা গিয়ে বাজে কার বুকে—অদ্ভুত অপরূপ !
পাগল বাতাস উন্মনা হোয়ে বারতা পাঠাল বনে,—
গুরু গম্ভীরে আষাঢ় আসিল বাদলের বরিষণে !
আবরিল সারা পথ,
অশোক নেহালী রঙ্গন মতি শ্বেত-জবা কত শত !
বকুল মালতী কদম্ব কেয়া এ-ওর-পানেতে চেয়ে,
তারাও আজিকে লুটাইছে পথে বরষার গান গেয়ে !
ফুলে ফুলে আহা গলাগলি করি' চুপি চুপি কথা বলে,—
মোর মনে লয় ও-ফুলের সাথে ভেসে যেতে চায় জলে !

জলের মেয়েরা মৃণালে ছুঁইয়া জলের আঙিনায়,
ছোট ছোট পথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া চারিদিকে বাহিরায়।
অমনি তখন পানা-ফুল বলে,—"কেন কেঁদে মরি ঘুরে?
আমরাও আজ ঘর-ছাড়া হব জলের বুকটি জুড়ে।
পঙ্কিল জলে আমরা ফুটি-গো সেওলা হাবড় মেখে,
তবুও আমরা গন্ধ বিলাই তারি মাঝখানে থেকে!"
রক্ত-শাপ্‌লা বাহু পসারিয়া শ্বেত-শাপ্‌লারে কয়,—
"আজি হতে তবে ফুলগুলো সই করিব না অপচয়;
যে দিন আসিবে বাঁশরীর গানে বনের দুলালী মেয়ে,
সেদিন আমরা আবরিয়া দিব সারা তনুখানি ছেয়ে।"

এস প্রিয়তম, আর কতকাল থাকিবে এমনি দূরে,
বাদলের দিনে খুঁজিতেছি মোরা সারা গাঁওখানি ঢুঁড়ে।
তুমি এস সই আলুলিয়া কেশ, আষাঢ়িয়া মেঘে আজ,
আমরা বেড়িয়া বিজলীর মত পরাব কুসুম সাজ।
আর কতকাল এমনি করিয়া নিশীথ নয়ন জলে,
পল্লব ছায়ে মুখ লুকাইয়া ঝরে ঝরে যাব গলে?
আর কতকাল পরিজন মাঝে ম্লান হাসিখানি ঢাকি',
এমনি করিয়া আড়ালে আড়ালে কেমনে সলনা থাকি?
তুমি এস সই আমরা আজিকে দোঁহে দোঁহা পানে চেয়ে,
আপনি ফুটিব, আপনি টুটিব, বাদলের জলে নেয়ে।

কোথা তুমি প্রিয়তম,
ওগো প্রাণময়ী, ওগো মধুময়ী সুন্দর অনুপম!
একবার এসো এ-ঘোর বাদলে রঙের কুহেলি মেলে'
বাহিয়া তোমার সোনার নাও-টি উজাইয়া অবহেলে।
আর কতকাল আমারে ছাড়িয়া থাকিবে এমনি দূরে,
বাঁশরী আমার ডুকারি' কাঁদিছে মরম বিদারী সুরে!
আর কতকাল স্বপনের জালে তোমারে লইয়া ঘিরি,
এমনি করিয়া উধাও হইয়া বাউলের মত ফিরি?
আজি দেখে যাও কত যে আরতি কত আরাধনা করি,
বালুর চরেতে বসিয়া বসিয়া বালুর প্রতিমা গড়ি!
কি করিব সখি, মন যে বোঝেনা,—তাই ডাকি বারেবার—
সমুখে থুয়ে পুষ্প অর্ঘ্য সম্ভার উপচার;
কস্তুরী-মৃগ কুঙ্কুমরাগ চন্দন চুয়া লয়ে,
ফিরিতেছি আমি চর হতে চরে মাথায় করিয়া ব'য়ে।
আমি জানি তুমি ফুল ভালবাস, তোমার ফুলের প্রাণ,
তাই গড়িয়াছি ফুল-আভরণ—পাতার কুটীরখান।
তুমি এসো সই, তোমারি অঙ্কে উজোরিয়া সব ভার,
ব'সে ব'সে শুধু বাঁশরী বাজাই, চরণ করিয়া সার।
আজি উতরোল আষাঢ়িয়া বায়, দিন হল অবসান
তুলে লও তবে ফুল সম্ভার হ'ক সব সমাধান।

শ্রীশান্তি পাল

# দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

## কংগ্রেস্ কাহাদের দাবী শুনিয়াছেন

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, শ্বেতপত্রে প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র গ্রহণ না করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু হিন্দু জনমত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিপক্ষে এবং মুসলমান জনমত ইহার পক্ষে বলিয়া ইহাকে গ্রহণ বা বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

কংগ্রেস, হিন্দু, মুসলমান, পার্শী শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আন্তঃসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান যদি হইত, তাহা হইলে, তাঁহাদের পক্ষে একথা বলা অন্যায় হইত না যে, কোনও বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে যখন, দুই বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র মত ভেদ রহিয়াছে তখন, এই সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-সংঘ হিসাবে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে তাঁহারা কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলির সম্ভবযোগ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের মতের উপর ইহার মীমাংসার ভার দেওয়া উচিত। কিন্তু কংগ্রেস এইরূপ কোন আন্তঃসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নহে; ইহা জাতি, ধর্ম্ম, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল জাতীয়তাবাদী, দেশের মুক্তিকামী ভারতবাসীর রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান। জন্মের পর হইতে, কংগ্রেস সকল সম্প্রদায়ের ভারতবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তার সবচেয়ে বড় শত্রু বলিয়া, বরাবর ইহার বিরুদ্ধতা করিয়াছেন এবং জনসাধারণের মধ্য হইতে এই মনোভাব দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহাদের উৎসাহে, চিন্তায়, যত্নে, অর্থে ও পরিশ্রমে এবং বহু লাঞ্ছনা ও দুঃখ বরণের ফলে কংগ্রেস বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠা ও শক্তির অধিকারী হইয়াছেন, প্রধানতঃ তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোক। তাহা হইলেও, কংগ্রেস কখনও তাঁহাদের কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সমর্থন করেন নাই; সাম্প্রদায়িক অনেক ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও হিন্দুদিগকে হিন্দুসভার মধ্যবর্ত্তিতা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কংগ্রেস, যে জাতীয়তার আদর্শ বহু পরীক্ষার মধ্যেও রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের বর্ত্তমান দুর্ব্বলতার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা মুখে বলিয়াছেন বটে, হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের পরস্পর-বিরোধী দাবীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে না পারিয়া তাঁহারা এই মধ্যপথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে হিন্দুরা অথবা অন্যান্য সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের লোকেরা কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িক দাবী উপস্থিত করেন নাই; প্রত্যেক স্বাজাতিক ভারতবাসীর যাহা দাবী করা উচিত ছিল, তাঁহারা তাহাই করিয়াছেন। এমন কি হিন্দুসভাও সাম্প্রদায়িকতার সমর্থন করেন নাই। তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ট সম্প্রদায়, কাজেই, 'দেখিতে অসাম্প্রদায়িক' তাঁহাদের এই দাবী পূর্ণ হইলে, তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থই কার্য্যতঃ সিদ্ধ হইত, এরূপ কথাও তাঁহাদের বিরুদ্ধে বলা যাইবে না, কারণ, যে সকল প্রদেশে তাঁহারা সংখ্যাল্প সে সকল প্রদেশেও তাঁহারা সাম্প্রদায়িক স্বার্থ চাহেন নাই। কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত যাহা হওয়া উচিত ছিল, হিন্দু ও অন্যান্য কোন কোন সম্প্রদায়ের দাবী যখন ঠিক তাহাই হইয়াছে, তখন এই দাবীকে হিন্দুর দাবী না বলিয়া, স্বাজাতিক ভারতীয়দের দাবী বলা যাইতে পারে। স্বাজাতিক মুসলমানদেরও অনেকে ইহার সমর্থন করিয়াছেন। কাজেই, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় কংগ্রেসকে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে, ন্যায়তঃ সে কথা বলা চলে না। বরং এই কথা বলা চলে, শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক মনোভাববিশিষ্ট মুসলমানদের অন্যায় জেদের নিকট তাঁহারা আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই

কার্য্য আরও এই কারণে অধিকতর অন্যায় হইয়াছে যে, ইহা দ্বারা তাঁহারা স্বাজাতিক ভারতবাসীদের একান্ত ন্যায়সঙ্গত দাবীকে, মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাবীর বিপরীত প্রান্তের সাম্প্রদায়িক দাবী বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

মুসলমানদের সম্পর্কে কংগ্রেস অবশ্য বরাবরই এই প্রকার দুর্ব্বলতা দেখাইয়া আসিয়াছেন। তাহার কারণ, কংগ্রেস দেশের যে-রাষ্ট্রিক মুক্তি চাহিতেছেন, তাহার জন্য সকল সম্প্রদায়ের সহযোগিতা প্রয়োজন। মুসলমানদের মধ্য হইতে স্বাজাতিক নেতা কেহ কেহ বাহির হইলেও, সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানেরা রাষ্ট্রিক আন্দোলন হইতে দূরে রহিয়াছেন এবং তাঁহাদের এই বিশিষ্ট গুণটির (?) দোহাই দিয়া সরকারের নিকট হইতে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করিয়াছেন। কাজেই, ইঁহাদিগকে হাত করিবার জন্য কংগ্রেসকে বরাবর দুর্ব্বলতা দেখাইতে হইয়াছে। কিন্তু, পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতেই বুঝিতে পারা উচিত ছিল যে, এই প্রকার নীতির দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না—বরং ইহাতে সাম্প্রদায়িকতা বাড়িয়াই যাইবে। ইহাতে আপাত লাভ যদি কিছু হয়ও, তাহা হইলেও, জাতীয়তার অক্ষুণ্ণ আদর্শের দ্বারা ভবিষ্যতে জাতির যে লাভ হইতে পারিত, তাহার তুলনায় ইহা নিতান্তই নগণ্য।

## কোন্‌টি অধিক ক্ষতিকর—শ্বেতপত্র না সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা

শ্বেতপত্রে প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র এইজন্য গ্রহণীয় না হইতে পারে যে, ইহাতে আমাদের জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা কিছুমাত্র প্রতিফলিত হয় নাই। ইহাতে আমাদের সুখ সুবিধা ও অধিকার বিশেষ কিছু বাড়িবে না, অথচ ইহা পোষণ করিবার জন্য আমাদিগকে অনেক অর্থব্যয় করিতে হইবে, ইহার পশ্চাতে আমাদের শ্রম ও উৎসাহের অপব্যয় কম হইবে না এবং ইহাতে স্বরাজতন্ত্রের ছায়া আছে বলিয়া ইহা অনেককে অধিকতর রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের চেষ্টা হইতে বিরত করিবে।

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন নীতির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহা আমাদের মধ্যে জাতীয়তার বৃদ্ধিতে বাধা প্রদান করিবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে, কোন কোন সম্প্রদায়ের অনুকূলে পক্ষপাত দেখান হইয়াছে এবং অন্য কোন কোন সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে বলিয়া ইহাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ এবং বিদ্বেষের সৃষ্টি হইবে, এবং তাহা আমাদের রাষ্ট্রিক ভবিষ্যৎকে বিশেষভাবে সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিবে।

বর্ত্তমানের মূল্য কোন সময়েই কম নহে; রাষ্ট্রেও বর্ত্তমান লাভালাভের মূল্য জাতির পক্ষে উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু, যাহা জাতির ভবিষ্যতে বড় হইবার এবং শক্তিশালী হইবার পথে বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহার ক্ষতি করিবার ক্ষমতাকে অধিক ভয় করিতে হয়। শ্বেতপত্রে প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার অংশ বাদ দিলে, ইহার অবশিষ্ট ভাগের ফলাফল অনেকটা বর্ত্তমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু, সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ও বাঁটোয়ারার কুফল শুধুমাত্র বর্ত্তমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না। ইহা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কলহ এবং অবিশ্বাস সৃষ্টি করিবে যাহাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একযোগে রাষ্ট্রিক প্রগতির চেষ্টা করা সম্ভবত অসম্ভব হইবে। এই জন্য জাতির উপর ইহার ক্ষতিকর প্রভাবকে কোনক্রমেই অবহেলা করা জাতির উন্নতিকামী কোনও লোক বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই উচিত হইত না; ভারতবর্ষে জাতীয়তার প্রবর্ত্তক ও পরিপোষক, আমাদের সর্ব্বপ্রধান রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের পক্ষে ত উচিত হয়ই নাই। বিশেষ দৃঢ়তার সহিত, অন্য কোনও আপাত সুবিধার কথা না ভাবিয়া, তাঁহাদের ইহার বিপক্ষে মত দেওয়া উচিত ছিল। তাহাতে তাঁহাদের নৈতিক শক্তির হ্রাস ঘটিত না, সকল সম্প্রদায়ের স্বাজাতিক লোকদের বিশ্বাস তাঁহাদের উপর অটুট থাকিত এবং কংগ্রেসের ভিতর হইতেই বিরুদ্ধতা এবং সমালোচনার সম্মুখীন হইতে না হওয়ায়, সম্ভবতঃ সাময়িক লাভও তাঁহাদের বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিক হইত।

## শ্বেতপত্র বাতিল হইলে বাঁটোয়ারা বাতিল হইবে কি না

শ্বেতপত্রের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় সফল হইতে পারে এবং কোনও সম্প্রদায়ের

লোকের স্বার্থ (?) যাহাতে উপেক্ষিত না হয়, সেইজন্য, বাঁটোয়ারা প্রয়োজন হইয়াছে এবং সেইজন্যই ইহা প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হইয়াছে। এইজন্য সংস্কারের প্রস্তাব বাতিল হইবে, বাঁটোয়ারা আপনা হইতেই বাতিল হইয়া যাইবে, সে কথা সত্য।

শাসনতন্ত্র যাহাতে দেশের লোকের কাছে আরও অধিক দায়ী হয় এবং দেশের লোক যাহাতে আরও নানাবিধ রাষ্ট্রিক অধিকার বর্দ্ধিত পরিমাণে পায়, বর্ত্তমান অবস্থা সত্ত্বেও হয়ত তাহার জন্য দেশের সকল সম্প্রদায় একযোগে চেষ্টা করিতে পারেন, কারণ তাহাতে সকলেরই স্বার্থ আছে। যদিও বর্ত্তমান ব্যবস্থার ফলে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অবস্থার উদ্ভব হওয়া খুবই সম্ভব যাহাতে কোনও প্রকার মিলিত চেষ্টার সুযোগ থাকিবে না। কিন্তু, এ সকল সত্ত্বেও যদি অধিকতর অধিকার লাভের আশায়, শ্বেতপত্র বাতিল করা সম্ভব হয়, তাহা হইলেও, বিশেষ সুবিধা পাইবার ফলে, সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সম্বন্ধে এরূপ লুব্ধতার সৃষ্টি হইবে যাহাতে, যে কোনও শাসনতন্ত্রই প্রতিষ্ঠার কথা হউক না কেন, তাহাতে কোন্ সম্প্রদায়ের কতটুকু স্বার্থ থাকিবে, তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি চলিবে।

কাজেই, যদিও বা শ্বেতপত্র বাতিল হইলে, বাঁটোয়ারা বাতিল হইয়া যায়, তবুও, ইহাতে যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সৃষ্টি হইল, এবং কংগ্রেস তাহাকে পরোক্ষে স্বীকার করিয়া-নেওয়ায় ইহা এতটা শক্তি পাইল, যে, শীঘ্র এই দুর্দ্দৈবের অবসান হইবে, এরূপ মনে হয় না।

## কংগ্রেস ও স্বাজাতিক দল

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পূর্ণ সুস্পষ্টভাবে বর্জ্জন করিতে না পারিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে অন্যায় করিয়াছেন ও দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছেন, সে কথা, আমরা পূর্ব্বে আলোচিত কারণ সমূহের জন্য নিঃসন্দেহে মনে করি। কংগ্রেস মতাবলম্বী এবং কংগ্রেস কর্ম্মীও অনেকে এই কথা মনে করিয়াছেন। আমরা এ কথাও মনে করি যে, কোনও প্রতিষ্ঠানের নীতি, আদর্শ বা কার্য্য কাহারও বিবেক বা মত বিরুদ্ধ হইলে, সেই প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিবার স্বাধীনতা ও অধিকার সকল লোকেরই আছে।

আর যদি কেহ কোন প্রতিষ্ঠান ও আদর্শকে বিশেষভাবে ভালবাসেন এবং দেশের প্রয়োজনের পক্ষে সেই প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য্য আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন, অথচ দেখিতে পান যে, তাঁহার প্রিয় প্রতিষ্ঠানটি চিরদিনের আদর্শ হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে তখন, প্রতিষ্ঠানটিকে পুনরায় যথাস্থানে আনিবার জন্য তিনি সর্ব্ববিধ নিয়মানুগ উপায়ে চেষ্টা করিতে পারেন। ইঁহাদের উপর জনমতের চাপ দিবার চেষ্টা করিতে পারেন বা যাঁহাদের দ্বারা ইহার নীতি নির্দ্ধারিত ও কার্য্য পরিচালিত হয়, তাঁহাদের প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করিতে পারেন।

পণ্ডিত মালবীয় ও শ্রীযুক্ত আণে বর্ত্তমান অবস্থায় যদি কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করা অসম্ভব মনে করিয়া থাকেন তাহা হইলে, সেজন্য তাঁহাদিগকে কেহ দোষ দিতে পারিবেন না। কিন্তু, তাঁহার বিশেষ চেষ্টা করিয়া কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী যে স্বাজাতিক দলটি গড়িয়া তুলিলেন, কংগ্রেস নেতা হিসাবে, দেশের শক্তিশালী কর্ম্মী হিসাবে তাঁহাদের সে কার্য্য সমর্থনযোগ্য কিনা, তাহা বিশেষভাবে বিচার্য্য। একথা সত্য যে, সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতাহীন উদার জাতীয় আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এ পর্য্যন্ত কংগ্রেস কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন এবং এই আদর্শই প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের প্রাণস্বরূপ এবং ইহার শক্তির উৎসস্বরূপ হইয়াছে। কিন্তু, তাই বলিয়া এ কথা সত্য নহে যে, যে কোনও প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের আদর্শ লইয়া দাঁড়াইলেই, তাহা কংগ্রেসের ন্যায় শক্তিশালী হইবে অথবা ইহার ন্যায় কাজ করিবার সামর্থ্য ও সুযোগ পাইবে। কংগ্রেসের এই আদর্শের পশ্চাতে বহু সহস্র লোকের বহু দিনের যে দুঃসাধ্য সাধনা রহিয়াছে তাহাই কংগ্রেসকে ইহার বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠা এবং শক্তি দান করিয়াছে। রাষ্ট্রিক প্রগতির জন্য আমাদিগকে যখনই শক্তির পরিচয় দিতে হইবে তখনই, সেজন্য আমাদিগকে কংগ্রেসের উপর নির্ভর করিতে হইবে। কংগ্রেসের কোন সাময়িক ভুলের জন্য এমন কোন কার্য্য যদি কেহ করে, যাহাতে কংগ্রেসের শক্তি

অথবা সম্মানের হানি হয়, তাহা হইলে তাঁহার সে কার্য্যের দ্বারা দেশের প্রভূত ক্ষতি হইবে।

আমরা যতটুকু রাষ্ট্রিক অধিকার লাভ করিয়াছি, তাহা কংগ্রেসের মধ্য দিয়া নিয়মানুগ উপায়ে আমরা যে শক্তির পরিচয় দিতে পারিয়াছি সেইজন্য সম্ভব হইয়াছে। আমাদের এই ঐক্যবদ্ধ শক্তির হ্রাস ঘটিলে, আমরা সেই অধিকার রক্ষা করিতে পারিব কি না, অথবা আরও লাভ করিতে পারিব কি না, তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়। কংগ্রেসের আদর্শই প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস, কংগ্রেসের নামের বিশেষ কোন মূল্য নাই, একথা সত্য নহে। দেশের লোকের উপর কংগ্রেসের নামের যে প্রভাব রহিয়াছে, বাহিরের লোকের নিকট ইহার নাম যে মর্য্যাদা লাভ করিতেছে, এবং যে ব্রিটীস সরকারের উপর ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে, সেই ব্রিটীশ সরকার যাহাদের মতের দ্বারা পরিচালিত হয়, সেই গ্রেট ব্রিটেনের জনসাধারণের সহিত কংগ্রেসের নামের যে সামান্য পরিচয় আছে তাহা, আমরা সহজে উপেক্ষা করিতে পারি না। কংগ্রেসের নামকে আমরা সহজেই উপেক্ষা করিতে পারিতাম যদি বুঝিতাম, কংগ্রেস কোন একটি বিশেষ ব্যাপারে আদর্শচ্যুত হইবামাত্র অন্য কোন নবসৃষ্ট দল সেই আদর্শ গ্রহণ করিলে, কংগ্রেসের সকল শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে এবং এই নবসৃষ্ট দল সেই শক্তির অধিকারী হইবেন।

কাজেই, কংগ্রেসের নাম প্রকৃত কংগ্রেস নহে, ইহার আদর্শই মাত্র ইহার সব, একথা সত্য নহে এবং অদূর ভবিষ্যতে তাহা সত্য হইবারও নহে। এই প্রকার কথা বলিয়া জনসাধারণের মনে মিথ্যা মোহের সৃষ্টি করা হইতেছে মাত্র।

এই প্রকার কার্য্য এবং উক্তির দ্বারা যে কোন সময়েই কংগ্রেসের এবং ফলে দেশের ক্ষতি হইতে পারিত, কিন্তু, বর্ত্তমানে কংগ্রেস যে অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন তাহাতে ক্ষতির পরিমাণ সাধারণ সময় অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতায় যদি দেশের সর্ব্বত্র কংগ্রেস জয়লাভ না করিতে পারেন, তাহা হইলে, ইহার শক্তি সম্বন্ধে দেশের লোকের মনে সন্দেহ জাগিবে, বিদেশীদের মনে ইহার সব কথাবার্ত্তা এবং দাবী-দাওয়া অসার বলিয়া ধারণা জন্মিবে এবং প্রতিপক্ষীয়দের নিকট কংগ্রেস হাস্যাস্পদ হইবেন।

কাজেই, যাঁহারা কংগ্রেসকে ভালবাসেন এবং এখনও কংগ্রেসের নামে কাজ করিতে চান, কংগ্রেসের কোন কার্য্য তাঁহাদের বিবেক-বিরুদ্ধ হইলে, তাঁহারা ইহার সংস্রব আপাততঃ ত্যাগ করিতে পারিতেন, এবং নিজেদের অনুকূলে জনমত সৃষ্টি করিয়া, প্রকাশ্য সাধারণ অধিবেশনে, কংগ্রেসকে তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী করিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন। অথবা কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়াও, নিজেদের মতকে ভিত্তি করিয়া একটি দলের সৃষ্টি করিতে পারিতেন এবং ক্রমে দলবৃদ্ধির দ্বারা নিজেরা প্রাধান্য লাভ করিতে পারিতেন।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় এবং শ্রীযুক্ত এম এস আণে যে আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, তাহার প্রতি সহানুভূতি থাকিলেও এবং এ সম্বন্ধে তাঁহাদের যুক্তিতর্ক ঠিক বলিয়া মানিলেও, তাঁহারা একটি পৃথক দল গড়িয়া কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা কোন প্রকারে সমর্থনযোগ্য বলিয়া আমরা মনে করি না।

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারায় বাঙ্গালী হিন্দুদের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবিচার করা হইয়াছে, এবং ইহার অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাবের কথা বাদ দিয়া এজন্যও ইহার বিরুদ্ধে তাঁহাদের তীব্র অসন্তোষ আছে। এই কারণে বাংলাকে হাত করা সহজ হইতে পারে, সম্ভবতঃ এই আশায়, সে চেষ্টা কৌশলের সহিত চালান হইতেছে। বাঙ্গলা অথবা বাঙ্গালী হিন্দুদের প্রতি অবিচারের জন্য ইহার পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইতে দেখা যায় নাই, তাঁহারা যে সহসা আজ বাংলাকে প্রাধান্য দিতেছেন, তাহার পশ্চাতে রাজনীতিক চা'ল আছে।

সম্প্রদায় হিসাবে যাহাতে বাঙ্গালী হিন্দুর ক্ষতি হইতে পারে, এমন কোন ব্যাপারের প্রতিই কোন হিন্দুর প্রীতি থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু, তাই বলিয়া, তাহার প্রতিকারে এমন কোন কার্য্য করা সঙ্গত হইবে না, যাহাতে কোন দিক দিয়া সমগ্র জাতির কোন ক্ষতি হইতে পারে। কারণ, জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইলে, হিন্দু বা মুসলমান কাহারও স্বার্থ রক্ষা হইবে না।

## স্বাজাতিক দল কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত কিনা

কোন প্রতিষ্ঠান বা দলের সদস্যেরা নিজ প্রতিষ্ঠান বা দলের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া এবং অবশ্য পালনীয় নিয়মগুলি মানিয়া ঐ প্রতিষ্ঠান বা দল হইতে কোন আদর্শ বা নীতির উচ্ছেদের জন্য অথবা কোন নূতন আদর্শ বা নীতি প্রবর্ত্তনের জন্য দল বাঁধিতে পারেন। কিন্তু, কোন প্রতিষ্ঠানের নির্দ্দিষ্ট নীতি এবং কর্ম্মপদ্ধতির বিরুদ্ধতা করিবার জন্য তাহার কোন কোন সদস্য তাহার সহিত যদি সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া সেই প্রতিষ্ঠানকে নানাদিক দিয়া লঘু করিবার কার্য্যে সহায়তা করেন এবং বাহির হইতে দল বাঁধিয়া তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন তাহা হইলে, তাঁহাদের কার্য্যকে সেই প্রতিষ্ঠানের কার্য্য বা সেই দলকে সেই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে না। স্বাজাতিক দলটিকে এইজন্য কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত বলা যায় না।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সারা ভারতের কংগ্রেসের প্রতিনিধি স্থানীয়; যে পর্য্যন্ত না তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস হারাইয়া পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন, অথবা যে পর্য্যন্ত না সাধারণ অধিবেশনে ইঁহাদের সিদ্ধান্ত বাতিল হয়, এবং নূতন ওয়ার্কিং কমিটি আসিয়া নূতন সিদ্ধান্তানুযায়ী কাজ না করিতে পারেন, ততদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত প্রত্যেক কংগ্রেসকর্ম্মীর অবশ্য প্রতিপাল্য। ইহা মানিবার ইচ্ছা না থাকিলে, কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কিন্তু, ইঁহারা তাহা না করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; ইহা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহ। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি ইঁহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইলেই মাত্র ইঁহারা কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন। ইঁহারা শুধুমাত্র কংগ্রেসের সভ্য বলিয়া ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদন লাভ না করা পর্য্যন্ত, কংগ্রেসের নামে কোন কংগ্রেস বিরোধী কাজ করিতে পারেন না। এরূপ অধিকার থাকিলে যে কোন স্থানের কতকগুলি কংগ্রেস সভ্য মিলিয়া যে কোনও প্রকার কার্য্য কংগ্রেসের নামে করিতে পারিতেন। স্বাজাতিক দলের কতকগুলি সদস্য যদি স্বাজাতিক দলেরই নাম করিয়া নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী নীতি এবং কর্ম্মপদ্ধতির অনুসরণ করিতেন; তাহা হইলে পণ্ডিত মালবীয় কি তাঁহাদের কার্য্যকে সমর্থন করিতেন।

কংগ্রেসের নাম আমাদের রাষ্ট্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার এমন প্রতীকস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে যে, কাহারও পক্ষে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সাফল্য লাভ করা বা কংগ্রেসের ক্ষতি করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় এবং শ্রীযুক্ত আণে উভয়েই বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা বলিয়া এবং ইঁহাদের নামের সহিত কংগ্রেসের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া, ইহাদের পক্ষে এই কাজ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। ইঁহারা যে খ্যাতি, প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা কংগ্রেসের মধ্য দিয়া করিয়াছেন বলিয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ইঁহাদের শক্তি প্রয়োগ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে।

## বাংলা সংবাদপত্রের অভাব

আমরা কোনও রাজনৈতিক দলভুক্ত নহি; তাহা হইলেও, দেশ রাষ্ট্রনীতিক প্রগতির পথে অগ্রসর হ'ক ইহা সকল ভারতবাসীর ন্যায় আমরাও কামনা করি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও চাই যে, সর্ব্বপ্রকার প্রগতিমূলক চিন্তার সহিত দেশের পাঠক সাধারণের সংযোগ থাকুক এবং সর্ব্বপ্রকার মতামতের সহিত পরিচয়ের মধ্য দিয়া তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ক স্বাধীন মতামত গড়িয়া উঠুক।

অন্যান্য সভ্যদেশের ন্যায় আমাদের দেশে সংবাদপত্র জনসাধারণের মধ্যে আজও প্রবেশ করিতে পারে নাই; দেশে শিক্ষার অভাই ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ। শিক্ষিত এবং অল্প শিক্ষিত লোকের মধ্যে গণজীবন ও বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য কম বলিয়া, দেশের সাধারণ লোক দরিদ্র বলিয়া, খবরের কাগজ পড়িতে পারেন, এমন সকল লোকেই অবশ্য কাগজ পড়েন না। তাহা হইলেও, আমাদের দেশে গণজীবন দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে এবং নানাবিষয় সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া সংবাদপত্রের পাঠক কয়েক বৎসরের মধ্যে আশ্চর্য্য রকম বাড়িয়া গিয়াছে। অল্প কিছুদিন পূর্ব্বেও ভাল বাংলা সংবাদপত্র ছিল না বলিলেই হয়, এবং ইহার পাঠক সংখ্যাও

...য় নগণ্য ছিল। কিন্তু, বর্ত্তমানে দেশের উপর বাংলা পত্রের প্রভাব উপেক্ষা করিবার মত নহে। যাঁহারা ...ী জানেন ও ইংরাজী সংবাদপত্র পাঠ করিতে পারেন, ...া প্রধানতঃ অপেক্ষাকৃত অধিক শিক্ষিত বলিয়া, তাঁহাদের কোন একটি বিশেষ মতের দ্বারা চালিত ...র সম্ভাবনা কম। একমাত্র বাংলা সংবাদপত্রের ...র্ত্তিতায় সকল প্রকার মতামত জনসাধারণের মধ্যে ...হতে পারে।

...াংলার বর্ত্তমান কংগ্রেসী দলের কোন বাংলা দৈনিক ...াকায়, জনসাধারণের মধ্যে তাঁহাদের মত ও কর্ম্ম-...ের কথা প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। বাংলাব ...বও একখানা বাংলা দৈনিক থাকা উচিত।

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টা

...দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত ...কমিটির সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলর, ...আর, সি, মজুমদার এবং ডাঃ মহম্মদ সহীদুল্লা, শিক্ষামন্ত্রী ...ীয় আজিজুল হকের সহিত দেখা করিয়া অবিলম্বে ...র ভাষা প্রবর্ত্তনের আবশ্যকতার কথা দৃঢ়তার সহিত ...ন। ইঁহাদের সুপারিশ অনুসারে কাজ করা হইবে, ...নীয় মন্ত্রী মহাশয় এরূপ আশ্বাস প্রদান করেন।

বাংলার দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহনরূপে বাংলার ...র্ত্তন হইলে, আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন জীবন দেখা ...র আশা করা যাইতে পারে। ইংরাজী ব্যতীত অন্যান্য ...ও ইংরাজীর সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয় বলিয়া, ইংরাজীর ...র এবং ইংরাজী জ্ঞানের অভাবে শিক্ষিতব্য বিষয়গুলি ...দের ভালভাবে আয়ত্ত হয় না—এবং নানাকারণে ...ক্ষেত্রে অনুর্ব্বর রহিয়া যায়।

...াতৃভাষায় শিক্ষাদানের স্বাভাবিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ...র অন্য কিছু না থাকিলেও, কেহ কেহ এরূপ আশঙ্কা ...হেন যে, ইংরাজীর জ্ঞান কমিয়া গেলে, আমাদের ... পাওয়া উকিল হওয়া এবং আরও দু'একটি কাজে ...ল্য লাভ করা কষ্টকব হইবে। কিন্তু, একথাটি ...দের মনে রাখা দরকার যে, কোনও জাতির শিক্ষানীতি, ভাল চাকুরীর প্রস্তুত করিবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরিচালিত হয় না। শিক্ষায় যদি আমাদের অধিকতর মানসিক উপযুক্ততা লাভ হয়, জীবন যুদ্ধে জয়ী হইবার পক্ষে আমরা অধিকতর যোগ্যতা লাভ করিতে পারি, তাহা হইলেই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

কেহ কেহ এমন কথাও মনে করেন যে, ইংরাজী সাহিত্যের সহিত আমাদের সম্বন্ধ শিথিল হইলে, তাহা বাংলা সাহিত্যের পক্ষে ক্ষতির কারণ হইতে পারে; কারণ, ইংরাজী সাহিত্য হইতেই আধুনিক বাংলা সাহিত্য তাহার প্রেরণা এবং সমৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু, প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় ইংরাজীকে বাদ দেওয়া হইতেছে না, অথবা তাহাকে কোণঠাসা করিয়াও রাখা হইতেছে না। যদিও এইপ্রকার ব্যবস্থার দ্বারাই মাত্র, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটিসমূহের প্রকৃত সংশোধন হইতে পারিত।

একদিন ইংরাজী শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আমাদের ছিল। কিন্তু, এতদিনের ইংরাজী শিক্ষার ফলে বর্ত্তমানে আমরা যে অবস্থায় পৌঁছিয়াছি, তাহাতে শিক্ষার জন্য মাতৃভাষার উপর নির্ভর করিবার সময় আসিয়াছে।

সাহিত্য ইংরাজী-শিক্ষিত সর্ব্বসাধারণের দ্বারা পুষ্ট হয় না। যাঁহাদের নিকট হইতে সাহিত্য, মূল্যবান জিনিস আশা করিতে পারে এমন প্রতিভাশালী লোকেরা যাহাতে ইংরাজী এবং অন্যান্য বিদেশীভাষা শিক্ষা করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা সব সময়েই রাখিতে হইবে এবং ইংরাজী শিক্ষার বাধ্যতা সম্পূর্ণভাবে উঠিয়া গেলেও, নানাকারণে তাঁহারা ইহা শিক্ষা করিবেন ইহা আশা করা অযৌক্তিক নহে।

## নারী-নিগ্রহ-মূলক অপরাধ বৃদ্ধি

১৯৩৩ সনের পুলিশ রিপোর্টে প্রকাশ, আলোচ্য বর্ষে ৩৬৬ ও ৩৫৪ ধারার অন্তর্গত নারী-নিগ্রহের অপরাধের সংখ্যা গত বৎসর ('৩২) অপেক্ষা ৫২টি বেশী হইয়াছে। ১৯৩২ সালে তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা উক্ত দুই ধারায় ৯৪টি অধিক অপরাধ হইয়াছিল; কাজেই দুই বৎসরে বৃদ্ধির সংখ্যা ১৪৬ হইয়াছে। ১৯৩৩ সনে উক্ত দুই ধারায়

অপরাধের সংখ্যা ৭৪৫ হইয়াছে: ইহার মধ্যে ৩৭৬ ধারার অন্তর্গত অপরাধগুলি ধরা হয় নাই। যে সকল অপরাধে বরাবর আদালতে নালিশ রুজু হইয়াছে, যে সকল ক্ষেত্রে আসামীকে চালান দেওয়া হয় নাই, অথবা যে সকল ক্ষেত্রে পুলিশ ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন নাই, এই রিপোর্ট হইতে সে সকল বাদ পড়িয়াছে।

কিন্তু, দেশে যত নারী নির্য্যাতীতা হন তাঁহাদের প্রকৃত সংখ্যা এতদপেক্ষা অনেক বেশী। ব্যাপার যেখানে নিতান্ত গুরুতর না হইয়া পড়ে, এবং সকলে ঘটনা জানিয়া না ফেলে, সে সকল স্থলে সমাজের ভয়ে লোকলজ্জার ভয়ে লোকে কোন প্রকার অত্যাচারের কথা চাপিয়া যায়। সমাজ ও লোকলজ্জার ভয়ের সহিত, দুর্বৃত্তদের দ্বারা আরও অত্যাচারিত হইবার ভয়ও অনেক ক্ষেত্রে লোককে প্রতিকারের চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করে। যে সকল ক্ষেত্রে নারী অপহৃতা হন, এবং সহজে তাহার কোন খোঁজ না পাওয়া যায়, এমন অনেক ক্ষেত্রেই মাত্র প্রতিকারের চেষ্টা হইয়া থাকে। দারিদ্র্যের জন্য অথবা দুর্বৃত্তদের ভয়ে, এরূপ সকল ক্ষেত্রেও যথোচিত চেষ্টা হয় না। ধর্ষিতা নারীদের সমাজে গ্রহণ করিবার সহজ পথ না থাকায়, অনেক সময় দরিদ্র লোকেরা অপহৃতা আত্মীয়াদের উদ্ধার সাধনে কতকটা উদাসীন হইয়া পড়েন। অশিক্ষিত এবং দরিদ্রলোকদের মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে, এই প্রকার লোকের কোন আত্মীয়ার উপর যখন অত্যাচার হইয়াছে, এবং ইঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন, অত্যাচারিতাকে সমাজে গ্রহণ করায় নানাবিধ অসুবিধা এবং বিপদের সম্ভাবনা আছে, তখন, দুর্বৃত্তদের নিকট হইতে গোপনে কিছু টাকা লইয়া ইঁহারা সমগ্র ব্যাপারটি চাপিয়া গিয়াছেন। হিন্দু-সমাজে বিধবা-বিবাহের প্রচলন না থাকায়, ছেলে বড় এবং উপার্জ্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বে নারী বিধবা হইলে, অনেকক্ষেত্রেই অসহায় এবং অপরের বোঝাস্বরূপ হইয়া পড়েন। এইরূপ কোন বিধবার উপর অত্যাচার হইলে, তাঁহার পক্ষ হইয়া দৃঢ়তার সহিত লড়িবার মত লোকের অভাব অনেক ক্ষেত্রেই হয়। এ সকলই, স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচারের সংখ্যাবাহুল্যের পরোক্ষ কারণ।

ইহা ত গেল যে সকল ক্ষেত্রে অত্যাচার শেষ পৌঁছায়, সেই সকল ক্ষেত্রের কথা। আদালতে যে অপরাধের প্রতিবিধান হওয়া সম্ভব নয়, এমন ছে অত্যাচার যে কত হয়, বিশেষ করিয়া হিন্দু নারীদের তাহা বাংলার পল্লীজীবনের সহিত যাঁহাদের পরিচয় তাঁহারা জানেন। বাংলার পশ্চিমাংশ ব্যতীত, অন্য পল্লীতে হিন্দুরা অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যায় বাস ক তাহাও তাঁহারা আবার পরস্পরের সহিত সংযো বহু শ্রেণী এবং উপশ্রেণীতে বিভক্ত। যে কোন সম্ যে কোন নারীর উপর অত্যাচার হইলেই যে, ধর্ম্মের এবং সকল সমাজের লোকেরই তাহার প্রতি আছে, আমাদের মধ্যে এখনও সে বোধ জাগ্রত হয় কাজেই, এই প্রকার অপরাধের হাত হইতে আ করিতে হইলে, লোককে সাধারণত নিজের সামাজিক উপরই নির্ভর করিতে হয়। এই শক্তিতে দুর্ব্বল ব হিন্দুদের অনেকস্থলেই নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। হইতেছে দেশের সাধারণ অবস্থা।

## প্রতিকারের উপায়

দেশের লোকের পক্ষ হইতে নারীর বিরুদ্ধে অ নিবারণের জন্য সংঘবদ্ধ চেষ্টা চলিলে, সকল সমা লোক ইহার প্রতিকারের জন্য বদ্ধপরিকর হইলে, দুর্বৃ নিজ নিজ সমাজে আশ্রয় না পাইলে, অত্যাচারিতা সমাজে গ্রহণ করিবার পক্ষে বাধা না থাকিলে, সামাজি ভাবে হিন্দু বিধবাদের বিবাহের প্রচলন হইলে, শি বিস্তার হইলে, বিশেষ করিয়া নারীদের মধ্যে শি স্বাধীনতার প্রসার ঘটিলে, এইপ্রকার অপরাধ নি হইবে, অথবা বহুল পরিমাণে কমিয়া যাইবে।

কিন্তু, এই সকলের জন্য অবহিত হইয়া চেষ্টা ক আবশ্যকতা সকল লোকেরই থাকিলেও এবং সফলতা লাভ করা অসম্ভব না হইলেও, তাহা নিঃ দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। এই দীর্ঘ সময়, অসহায় অ নারীরা দুর্গতি ভোগ করিবেন ইহা ন্যায় বা যুক্তি কথা হইতে পারে না।

ান সভ্য দেশেই আত্মরক্ষার জন্য লোককে নিজশক্তি র সামাজিক শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয় না। রেও সর্বপ্রকার আত্মরক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের উপর বা অন্যায় নহে। এই অনাচার এমন আকস্মিক যে ইহা দমন করিবার জন্য সরকার প্রস্তুত হইয়া পারেন নাই। কাজেই এই প্রকার অপরাধের সরকারের পক্ষে লজ্জার কথা। যদিও, বর্ত্তমানে ও অন্যান্য রিপোর্ট হইতে, অবস্থার গুরুত্ব কতকটা হইতেছে, তবুও, বাংলাদেশে এই প্রকার অবস্থা দিন হইতেই চলিতেছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। লোকে এসম্বন্ধে কতকটা সচেতন হইয়াছে বলিয়া, যে সকল ঘটনা পুলিশের গোচরীভূত হইত না, অনেক ঘটনার প্রতিকারের জন্য লোক চেষ্টা হ।

যে বর্ত্তমানে সরকারের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট তাহা সুখের কথা। ঢাকায় পুলিশ বাহিনীর প্যারেডে বক্তৃতার সময় বাংলার গভর্ণর এজন্য বিশেষ প্রকাশ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের উপর অপরাধ য় অপরাধে বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করা ছে। কঠোর দণ্ডের বিধান অপরাধ দমনে অনেক তা করিতে পারে বটে, কিন্তু, তাহার পক্ষে বেত্রদণ্ড পর্য্যাপ্ত বলিয়া আমরা মনে করি না। ইহার অপরাধীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার এবং এই ব্যাপারে যাহারা পরোক্ষে সহায়তা করে, অথবা কাবে সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহাদেরও কঠোর দণ্ডদানের কতকটা ফলপ্রদ হইতে পারে।

ন্তু, আমরা মনে করি, এবিষয়ে পুলিশের তৎপরতা আন্তরিক চেষ্টায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া এই শ্রেণীর অপরাধের সংবাদ পাইবামাত্র যদি ঘটনাস্থলে যায়, অপরাধীদের অনুসন্ধানের জন্য বিশেষ করে, এবং অত্যাচারিতেরা প্রতিকারেচ্ছু হইলে, তাহারা সামান্য মাত্রও বিপন্ন না হয়, এরূপ ব্যবস্থা ভাবে অবলম্বন করে, তাহা হইলে অপরাধের সংখ্যা কমিবে। এই প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিতে যাহাতে পুলিশ বাধ্য হয়, এরূপ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন আশু ফলপ্রসূ হইবে বলিয়া আশা করা অন্যায় নহে।

## ডাঃ লঙ্কাসুন্দরমের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান

আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের গুরুত্ব যাহাতে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, ভারতের বহির্দেশিক সমস্যাসমূহের প্রতি যাহাতে আমরা মনোযোগী হইতে পারি, ভারতবর্ষের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব রহিয়াছে ভারতের বাহিরের এমন সকল ব্যাপারের সংবাদ এবং তথ্যের সহিত যাহাতে আমাদের ভালভাবে পরিচয় থাকে, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ যাহাতে ভারত সম্পর্কীয় সমস্যাসমূহ ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করিতে পারেন, এসকল বিষয়ক পুস্তক, দলিল, প্রমাণ ও তথ্য সমূহ যাহাতে সংগৃহীত হয়, ও তাহা উৎসুক পাঠকেরা পাইতে পারেন, তাহার জন্য, কোন একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া, ভালভাবে চেষ্টা চালাইবার প্রয়োজন আছে।

ডাঃ লঙ্কাসুন্দরমের "ইনষ্টিটিউট অব ইণ্টারন্যাশান্যাল অ্যাফেয়ার্স" এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য ও কর্ম্মতালিকানুযায়ী কাজ হইলে, ইহা আমাদের একটি বিশেষ অভাব মোচন করিবে এবং জাতীয় উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

ইঁহারা অন্যান্য কাজের মধ্যে, এই সকল বিষয় সম্বন্ধীয় পত্রিকাদি প্রকাশ করিবেন, ভাল পুস্তকাগার রাখিবেন, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের এই প্রকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত যোগ রক্ষা করিবেন, এবং এই সকল বিষয়ে ভালভাবে শিক্ষাদান করিবার জন্য, গ্রীষ্মকালীন স্কুল চালাইবেন ও সম্ভব হইলে বিভিন্ন বৎসরে ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে এই স্কুল খুলিবার ব্যবস্থা করিবেন।

## আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ

পৃথিবীর কোন দেশেরই রাজনীতি এবং ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং সমগ্র পৃথিবীর ঘটনাসমূহের প্রভাব বহির্ভূত নহে। ভারতবর্ষেরও রাষ্ট্রিক এবং অন্যবিধ উন্নতির জন্য আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ এবং পৃথিবীর জনমতকে

আমরা কোনক্রমেই উপেক্ষা করিতে পারি না। এ কথা সাধারণভাবে আমরা অনেকেই বুঝি কিন্তু, ইহার প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী, সে কথা যখনই কেহ ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে গিয়াছেন, তখনই তিনি তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। ভারতবর্ষের উন্নতি যাঁহাদের স্বার্থের বিরোধী, তাঁহারা ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কিরূপ উত্তমের সহিত চেষ্টা করিতেছেন, তাহা দেখিয়াও ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের কতকটা ধারণা জন্মিতে পারে। ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে কি ভাবে কি প্রকার মিথ্যা প্রচারিত হয়, তাহার অনেক প্রমাণ অনেকের উক্তি হইতেই দেওয়া যাইতে পারে, এখানে সুভাষচন্দ্রের কিছুদিন পূর্ব্বের একটি বিবৃতির কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

"অনেক দেশে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যদিগের বিরুদ্ধে কেন; ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অস্পৃশ্যদিগের স্বার্থের বিরুদ্ধতা করিবার জন্য কেন তিনি উপবাস ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন? গত বৎসর যখন ভিয়েনায় আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন আমি মনে করিয়াছিলাম ইহা প্রশ্নকর্ত্তার অজ্ঞতা-প্রসূত। কিন্তু, পরে যখন একই প্রশ্ন অন্যান্য নানাদেশে আমাকে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করা হইতে লাগিল, তখন আমি আবিষ্কার করিলাম যে ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরে ইউরোপের সকল দেশেই ইহা প্রচারিত হইয়াছে যে, মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যদিগের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছেন।

"মহাত্মা গান্ধীর সুনামের আরও হানি করিবার জন্য কয়েক মাস পূর্ব্বে ইউরোপের সকল দেশেই এই কথা প্রচারিত হইয়াছিল যে, মহাত্মা গান্ধী কমিউনিষ্ট হইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইউরোপের সকল দেশেই ওঁ কমিউনিষ্ট বিরোধী বলিয়া, এইরূপে তাঁহার এবং জাতীয়দলের সুনাম নষ্ট করিবার জন্যই এই প্রচা চালান হইতেছিল।

"কলিকাতার মেয়রের পদে এক মুসলমান ভদ্র নির্ব্বাচন উপলক্ষ্য করিয়া কলিকাতার হিন্দু মু দাঙ্গার ন্যায় একটা কিছু ঘটিয়া গিয়াছে, এইরূপ ইউরোপীয় সংবাদপত্রসমূহে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়. ইহা বলার বিশেষ আবশ্যকতা নাই যে, ভারতবর্ষে মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা লাগিয়াই রহিয়াছে এবং গভর্ণমেণ্টই এখানে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে প্রকারের সংবাদ ও প্রবন্ধ ইউরোপের সংবাদপ প্রায়ই প্রকাশিত হয়। নীতিকুশল এবং অভিজ্ঞ ধারাবাহিক প্রচারের প্রতিকার কল্পে আমার ন্যায় চেষ্টা ফলপ্রদ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্য পক্ষ হইতেও সুব্যবস্থিতভাবে প্রণালীবদ্ধ প্রচার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। যত শীঘ্র আমরা এজন্য প্র ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারি, ভারত ও ভারতের পক্ষে ততই লাভ।"

ভারতবর্ষ অতীতে বরাবরই সমগ্র জগত হইতে ছিল। আমরা এখনও কতকটা এই বিচ্ছিন্ন অ বাস করিতেছি। কারণ, আমরা যদি আমাদের সমূহ জগৎবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিতা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে যথেষ্ট ঔৎসুক্য পারিতাম, তাহা হইলে, ৩৫ কোটি লোকে দুঃখ ও ভাগ্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকা জগতবাসীর প হইত না।

শতাধিক বর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান
জীতরাম নাথ
বলাইচাঁদ নাথ
৯৫ মনোহর দাস ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা

পূজার বাজার আরম্ভ হইয়াে
সকল প্রকার দেশী তাঁতের কাপে
একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান
দ্রষ্টব্য—কাটা ছেঁড়া হইলে যতদিন পরেই বদলান হয়।

## লোকে কবি অতুলপ্রসাদ সেন

কবি অতুলপ্রসাদ সেনের মৃত্যুতে বাংলাদেশে এমন ন দেশপ্রেমিক কবি হারালো, যাঁর বীণায় দেশের নের আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা ভাষা ও সুর খুঁজে পেয়েছিল। ীতি ছিল তাঁর কাব্যের মূল সুর ; সে কাব্য যে দেশের র মর্ম্মস্পর্শ করেছে, তার প্রমাণ রোজই পাওয়া যায়, বাংলা-দেশের গোধূলি-ধূসর আকাশে বাঙালী গৃহস্থের  থেকে সুর ভেসে ওঠে—"হও ধরমেত ধীর, হও তে বীর, হও উন্নতশির, নাহি ভয়।"

অতুলপ্রসাদের জীবনের অধিকাংশই কেটেছে প্রবাসে। ী-এ তিনি আইন-ব্যবসায়ীদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার ছিলেন, কিন্তু এর জন্য তাঁকে যে-সাধনা করতে হ, সে-সাধনা কোনো দিনই তাঁর প্রকৃত পরিচয়কে রিত করতে পারে নি। তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি ত অণুতে তিনি ছিলেন বাংলাদেশের কবি,—তাই প্রবাস জীবনের মধ্যে প্রবাসী বাঙালীদের সঙ্গে বাংলা র একটা অনায়াস ও সহজ যোগসূত্র স্থাপিত হবার গ হ'য়েছিল, এবং এই দিক দিয়ে বৃহত্তর বঙ্গের ল্পনা তাঁর মধ্যে কতকটা রূপলাভ করেছিল। তাঁর ত বৃহত্তর বঙ্গের যা ক্ষতি হোল, সহজে পূরণ করা না।

তাঁর বহুমুখী প্রতিভা একটা বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রের ন্ধান করেছিল। প্রবাসী বাঙ্গালীর সাহিত্যিক মুখপত্র রা'র তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। এছাড়া যখনই  ক্ষেত্রে তাঁকে আহ্বান করা হ'য়েছে, তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে যোগ দিয়েছেন। বেনারসে ও লক্ষ্ণৌ-এ লিবারেল কনফারেন্সে তিনি দু'বার সভাপতিত্ব করেছিলেন। এ ছাড়াও স্বদেশী প্রচারে, শিক্ষাবিস্তারে হিন্দু মুসলমানের একতা সাধনে তিনি অনেক পরিশ্রম করেছিলেন। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করি।

## পরলোকগত গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সুপ্রসিদ্ধ কথাশিল্পী ও বিহার ও উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব মুনসিফ গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় গত ৩রা ভাদ্র সোমবার বৈকাল ৫½ ঘটিকার সময়ে পরলোকগমন করেছেন। বহুদিন হ'তে তিনি গ্যাষ্ট্রিক আলসার রোগে ভুগ ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুকালে মাত্র চারদিনের রোগ ভোগের পর মারা যান। গিরীন্দ্রনাথ প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের খুল্লতাত মাতুল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহোদর এবং উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের খুল্লতাত ভ্রাতা ছিলেন। ছোট গল্প লেখক হিসাবে গিরীন্দ্রনাথ বাঙ্গলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। বিচিত্রায় বহুবার তাঁর গল্পাদি প্রকাশিত হয়েছে এবং বাংলাদেশের সমস্ত বড় কাগজগুলিতেই তাঁর লেখা সর্ব্বদা প্রকাশিত হোত। গিরীন্দ্রনাথ একজন জনপ্রিয় লেখক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বাঙ্গলা সাহিত্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হোল।

৺গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

গিরীন্দ্রনাথ আমাদের অতি নিকট আত্মীয় ছিলেন শুধু তাই নয়, আশৈশব তাঁর সঙ্গে প্রাণের যোগ; চিরদিনের সাহিত্য-বন্ধু। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা বিহ্বল হয়েছি। তাঁর দেহবিমুক্ত আত্মা অক্ষয় শান্তি লাভ করুক, এই এখন আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

## নিখিল-বঙ্গ জলধর সম্বর্দ্ধনা

বাংলার প্রবীণ সাহিত্যিক ও সম্পাদক রায় জলধর সেন বাহাদুরের পঞ্চসপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষে সমগ্র বাংলা দেশের পক্ষ হ'তে দিবসত্রয় তাঁকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়েছিল। গত ২রা ভাদ্র রবিবার, সেনেট হলে তাঁকে দেশবাসী এবং বিভিন্ন সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অভিনন্দন প্রদান করা হয়। উক্ত উদ্বোধন সভায় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সুযোগ্য ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। অভিনন্দনের পরবর্তী দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসে যথাক্রমে সালিখা নাট্যপীঠে সাহিত্য সম্মেলন ও এলবার্ট হলে প্রীতি-সম্মেলন অনু[ষ্ঠিত] হয়েছিল। তৃতীয় দিবসে তরুণ সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত জয়কৃ[ষ্ণ] সান্যালের সুপরিচালনায় ভারতীয় প্রচলিত সঙ্গীতের জল[সা] সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল।

নিখিল-বঙ্গ জলধর সম্বর্দ্ধনার সাফল্য বাঙ্গলা দেশে[র] জলধর প্রীতির নিদর্শন। আমরাও শ্রীযুক্ত জলধর সে[ন] মহাশয়কে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। ঈশ্বর কৃপায় তিনি শতায়ু হোন।

## শরৎচন্দ্র

আজ আটান্ন বছর পূর্ব্বে ৩১শে ভাদ্র তারিখে বাং[লা] দেশে শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই শুভদিনটি স্ম[রণ] করে আমরা শরৎচন্দ্রকে সশ্রদ্ধ প্রণিপাত করি।

শরৎচন্দ্রের সাধনায় আধুনিক বাংলা দেশের আকাঙ্ক্ষা অনুভূতি ভাষা লাভ করেছে, দেশ অনেকখানি আত্ম-চেত[না] লাভ করেছে। অজ্ঞ মানুষের প্রতি জ্ঞান-সমৃদ্ধ ঋষি[র] আদেশ, "আত্মানং বিদ্ধি"। শরৎচন্দ্র দেশের মধ্যে [এই] আত্মবোধ জাগাবার জন্যে অনেকখানি সহায়তা করেছেন। তিনি যে শুধুই আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও বেদনাকে ভা[ষা] দিয়েছেন, তা নয়,আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীব[নে] যেখানে যত সঙ্কীর্ণতা ও গ্লানি আছে, সেগুলোকে তাদে[র] নগ্ন কদর্য্যতায় উদ্ঘাটিত করে সংস্কারের প্রেরণা জাগাব[ার] চেষ্টা করেছেন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কুসংস্কার[ের] ঔদ্ধত্যের অন্ধকারে আমরা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি যে নিদা[রুণ] অবিচার করে থাকি, তিনি দরদ দিয়ে তার প্রতিব[াদ] করেছেন। শরৎ-সাহিত্যে আমাদের জীবন সম্বন্ধে চি[ন্তা] করবার অনেক কিছু উপকরণ আছে, জীবনের সংস্কার উন্নতি করবার জন্য অনেকখানি অনুপ্রাণনা আছে। [এ] সব স্মরণ করে আজ তাঁর অষ্টপঞ্চাশৎ জন্মদিনে আম[রা] তাঁকে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য নিবেদন করে তাঁর দী[র্ঘ] জীবন-কামনা করি।

## শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র

স্বনামধন্য স্বর্গীয় সার বিনোদচন্দ্র মিত্রের প[ুত্র] শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্রের বাংলার সরকার কর্তৃক ডে[...]

.রক্টর অফ্ ইন্ডাষ্ট্রীজ্ এর পদে নিয়োগে আমরা ম আনন্দিত হ'য়েছি। এই পদটি অনেকদিন ধরে লি ছিল, এখন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্রকে এই পদে নিযুক্ত রে বাংলার সরকার যে বিশেষ সুবিবেচনার পরিচয় য়েছেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সরকারের ন্ডাষ্ট্রিয়াল্ এঞ্জিনিয়র হিসাবে, গত কয়েক বৎসর ধরে শের ছোট শিল্পগুলিকে পুনর্জীবিত করে বেকার সমস্যা াধান করবার জন্য সতীশচন্দ্র যে অক্লান্ত পরিশ্রম রছেন, তার তুলনা বিরল। এই দিকে গত কয়েক সর ধরে তিনি যা' গবেষণা ও পরীক্ষা করেছেন, তার ফল পিবদ্ধ করে তিনি শীঘ্রই "Recovery Plan for engal" নাম দিয়ে একটি পুস্তক প্রকাশ করছেন। তীশচন্দ্রের বয়স অল্প, মাত্র ৩৩ বৎসর, কিন্তু তাঁর সাধনা ভীর ও ব্যাপক। তাঁর সর্ব্ববিষয়ে জয়লাভ কামনা করে ামরা তাঁকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

## াঁশবেড়িয়ায় স্বায়ত্ত্ব-শাসন মন্ত্রী

বিগত ১২ই আগষ্ট বাংলার স্বায়ত্ব-শাসন মন্ত্রী অনারেবল ার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় বাঁশবেড়িয়ায় পানীয় জল সরবরাহ বস্থার (Water Works) দ্বোধন, মিউনিসিপ্যালিটীর বগৃহ, হাঁসপাতাল ও মাতৃ- দনের দ্বারোদ্ঘাটন এবং াস্থ্য-প্রদর্শনীর উদ্বোধন রেন। বাঁশবেড়িয়া মিউনিসি- ালিটীর চেয়ারম্যান কুমার নীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের ক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার লে বাঁশবেড়িয়ায় যে সব ন্নতিকর কার্য্য হয়েছে এবং চ্ছে, যেমন বাঁশবেড়িয়ায় লিকাতার মত পীচের রাস্তা, াকা পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা, লের কল, বৈদ্যুতিক ালোক, চারিটী নগরোদ্যান (Park), অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থ তিনটী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন, দুটী গ্রন্থাগার, একটি শিশু পাঠাগার, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, শান্তিরক্ষ সেনাদল গঠন, হাঁসপাতাল এবং মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা—স্য বিজয়প্রসাদ সে সকল কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটী, হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সমিতি এবং শান্তিরক্ষক সেনাদলের পক্ষ হ'তে তাঁকে অভিনন্দ পত্র দেওয়া হয়। তদুত্তরে মাননীয় মন্ত্রী যা বলেন তা কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল—"আপনারা নাগরিকদে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান জন্য যে সব আধুনিক প্রণালী অবলম্ব করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমি বস্তুতঃই আনন্দিত হইয়াছি সুপ্রসিদ্ধ বাঁশবেড়িয়া রাজবংশের এখানে বাসভূমি, সেই বং যেমন সম্মানিত বংশধরগণের সংস্কৃতিও তদুপযোগী উচ্চ- তাঁহারা দানধর্ম্মে এবং হিতজনক কার্য্যমাত্রেই অগ্রগণ্য এই বংশের কার্য্যকুশলতা স্থানীয় প্রতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে নিবিড় ভাবে দেদীপ্যমান, তাঁহাদের বাদ দিয়া বাঁশবেড়িয়া কথা কেহ ভাবিতে পারে না। আপনাদের কলের জ সরবরাহের কৃতকার্য্যতায় আমি বিশেষভাবে আনন্দিত

বাঙ্গলার স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী কর্ত্তৃক বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটির নবগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন
মধ্যস্থলে—মন্ত্রী স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় বামদিকে—জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডোনাল্ড্ ম্যাক্‌ফার্সন্
দক্ষিণে—মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এম্, এল্, সি

সরকার এইজন্য বত্রিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন আর বাকী টাকা চাঁদা তুলিয়া দেওয়ায় বিনাকর্জ্জে কাজটী সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই সদনুষ্ঠান মিউনিসিপ্যালিটীর বড় রকম উন্নতি সূচিত করিতেছে, এই কার্য্যের দ্বারা নাগরিক সভার প্রাথমিক কর্ত্তব্য সম্পূরণ হইয়াছে। আপনাদের জলনিকাশ সংক্রান্ত ( Drainage Scheme ) ব্যবস্থায় সরকারের সাহায্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচিত হইবে। স্বাস্থ্যোন্নতির ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। আপনাদের মিউনিসিপ্যাল সীমার মধ্যে ত্রিবেণী ও বাঁশ-বেড়িয়ায় দুইটী দাতব্য চিকিৎসা-লয় স্থাপিত হইয়াছে ইহা বাস্তবিকই আনন্দের বিষয়। আপনারা রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলোক দিতেছেন—সরকার সেজন্য কর্জ্জ দিতে পারেন, বর্ত্ত-মান অর্থসঙ্কটের দিনে অর্থ সাহায্য করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নহে। আপনারা নাগরিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নগরোদ্যান স্থাপনে এবং অবৈতনিক প্রাথ-মিক শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী দেখিয়া আমি পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এই সব উন্নতিকর কার্য্যের দ্বারা আপনারা অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে আদর্শ স্থানীয় হইয়াছেন।" হুগলী জেলার গ্রন্থাগার সমিতির অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেন, "বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন এবং বঙ্গীয় স্বায়ত্ব-শাসন আইন দ্বারা গ্রন্থাগার স্থাপন ও পরিপোষণ জন্য আপনারা যে সুব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন আমি তাহা অনুমোদন করিতেছি। যাঁহারা শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারে সমুৎসুক, লাইব্রেরী আন্দোলনকে সমর্থন করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আইনের সংশোধন দ্বারা আপনারা শেষতঃ আপনাদের সভাপতি কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, এম্, এল্, সি যে মহৎ আন্দোলন চালাইতে তাহাকে শক্তিমান করিয়া তোলাই গবর্ণমেণ্টের উদ্দে লাইব্রেরীগুলির উন্নতিকল্পে কুমার মুনীন্দ্রদেবের প্রচে সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। আপনাদের প্রস্তাব মত আমি স্বায় শাসন প্রতিষ্ঠান সমূহে বিজ্ঞপ্তি জারির দ্বারা সংশো আইনের লাইব্রেরী সংক্রান্ত ধারাগুলির প্রতি দৃষ্টি আক করিব।" বাঁশবেড়িয়া শান্তিরক্ষক সমিতির অভিনন্দ উত্তরে তিনি তাঁহাদের নিঃস্বার্থ জনসেবার কার্য্যের প্রশ

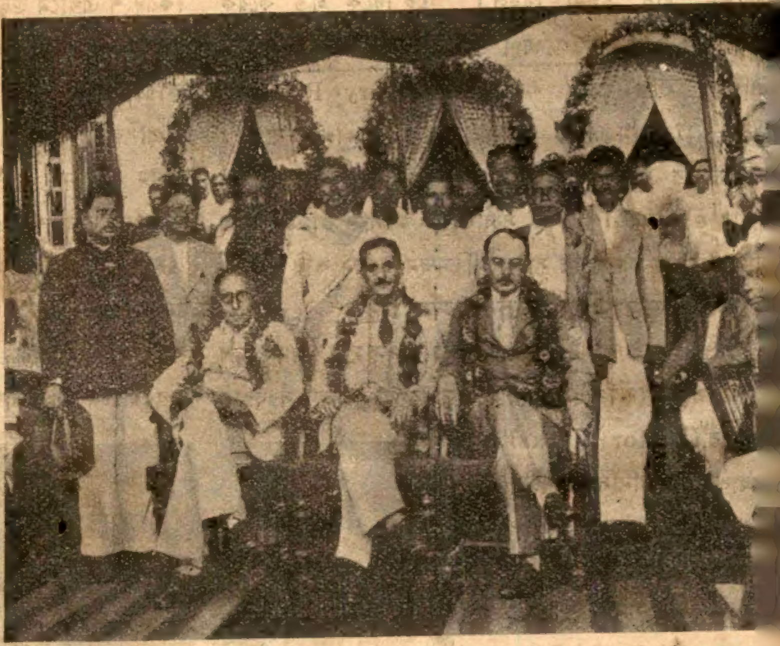

বিগত ১২ই আগষ্ট মান্যবর স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় কর্তৃক বাঁশবেড়িয়া জল সরবরাহ ব্যবস্থা (Water Works) উদ্বোধন, হাসপাতাল ও মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা
উপবিষ্ট—মধ্যস্থলে স্বায়ত্ত শাসন মন্ত্রী, বামদিকে হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি, ম্যাকফার্সন্ ও ডানদিকে—মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এম, এল, সি ও
পশ্চাতে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ

করেন। বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগারে স্বাস্থ্য-প্রদ শিশু-মঙ্গল সপ্তাহের উদ্বোধন উপলক্ষে তিনি স্বাস্থ্যোন্ন এই হিতজনক অনুষ্ঠানে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন

## ভ্রম সংশোধন

গত ভাদ্রমাসের বিচিত্রায় প্রকাশিত 'পরলোকে দেবী' প্রবন্ধের 'পুরুষ ও প্রকৃতি' নামক চি